

ପ୍ରେମ କହ ହୁଏ

ଆଚିନ୍ତ୍ୟକୁମାର ଦେବଗୁପ୍ତ

ପ୍ରକାଶ ଭବନ

୧୫, ବହିମ ଚାଉଁଜ୍ୟ ସ୍ଟ୍ରିଟ, କଲିକାତା-୧୨

দ্বিতীয় সংস্করণ : আবেণ ১৩৬৭,

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন

১৫, বঙ্কিম চাট্টোজ্যে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

মুদ্রক :

শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

বিজ্ঞানাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩৫এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭

প্রচ্ছদশিল্পী :

শ্রীকানাই পাল

১৮৮৮
STATE CENTRAL LIBRARY.
56A, B. T. Rd., Calcutta-50
১৯. ৩. ৬৮

...১.....

খাঁচার দরজাটা খুলে দিতেই ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল কাকলি। আর তখনই কোথেকে হস্তদস্ত হয়ে হাজির হুকাস্ত।

লিফটম্যান এক পলক তাকাল আগন্তকের দিকে। কিন্তু হুকাস্ত তাকে দ্বিধা করতে দিল না এতটুকু। অবধারিতের মত ঢুকে পড়ল।

উপায় নেই, প্রায় গা ঘেঁষেই দাঁড়াল কাকলির।

অন্তত, একে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়ানোই বলে। একটা চারকোনা বাস্ক, জায়গা কম, এ কে না জানে। তবু এরই মধ্যে বরাদ্দ দূরত্ব রাখা অসম্ভব ছিল না, শালীন দূরত্ব। লিফটম্যানের ওপাশের দেয়ালের দিকে হেলতে পারত অনায়াসে। এ যেন স্বপ্নিগে মারবে বলে ছুরি উচিয়ে এসেছে। কিংবা শাড়ির বুনটটা হাতে নিয়ে উদাসীন মমতায় দেখবে পরখ করে। দাম জিজ্ঞেস করবে।

বিরক্ত মুখে কাকলি বললে, ‘আপনি! আপনাদের—’

‘হ্যাঁ, আমাদের, ছেলেদের বারণ। তবে যারা কপ্প, যাদের হার্ট দুর্বল—’

‘আপনি কি কপ্প?’

কাকলির চোখে একটু বা প্রশংসার রঙ মাখা।

‘না।’ হাসি-হাসি মুখে হুকাস্ত বললে, ‘তবে, বলতে বাধা নেই, হৃদয় বড় দুর্বল।’

‘হার্টের মানে বুঝি হৃদয়?’ বলবে না ভেবেছিল তবু কথার পিঠে বলে ফেলল কাকলি।

‘আরো একটা মানে করা যায়।’ বললে হুকাস্ত : ‘আঘাত। প্রহার। যন্ত্রণা।’

কথা বললেই কথা বাড়ে, চূপ করে রইল কাকলি। কয়েক সেকেন্ডের তো মামলা। এখনি উঠে আসবে তেতলা। বারোটা চল্লিশে তার ক্লাশ।

‘কিন্তু এখন হার্টের যে অবস্থা, মানে যে রকম বুক কাঁপছে, সহজেই ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে, সিঁড়ি ভাঙা বিপজ্জনক লিফটই প্রশস্ত।’ বুক ফুলিয়ে নিখাস নিল হুকাস্ত : ‘তবে হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ না করলে কিছু হবার নয়।’

কাকলি চোখ নিচু করে রইল।

কিন্তু, এ কি, লিফ্ট হঠাৎ আটকে গেল মাঝখানে। দোতলা আর তেতলার মধ্যে। ঘোর-ঘোর আধছায়ার রাজ্যে।

‘কি সর্বনাশ!’ প্রায় আর্জনাৎ করে উঠল কাকলি।

‘কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।’ লিফ্টম্যানের হয়েই যেন বললে স্বকান্ত।

তার কথা কে গ্রাহ্য করে? সে তো চালাচ্ছে না। সে কলকন্নার জানে কি!

‘কারেন্ট অফ হয়ে গিয়েছে?’ চোখ কপালে তুলে লিফ্টম্যানকে জিজ্ঞেস করলে কাকলি।

‘কল বিগড়ে গিয়েছে।’ নিশ্চেতনের মত বললে লিফ্টম্যান।

এ যেন তেমনি একটা নিষ্পৃহ-নিশ্চল থাকবারই অবস্থা। দু হাতের মুঠি তুলে অস্থিরের মত কাকলি বললে, ‘তা হলে কী হবে?’

‘যতক্ষণ না কারেন্ট আসে অপেক্ষা করতে হবে।’ বললে স্বকান্ত।

‘আর যদি অল্প কোনো গোলমাল হয়?’ কাকলির মুখ আতঙ্কে প্রায় শাদা।

‘যতক্ষণ মিস্ত্রি না আসে—’

‘বলেন কি। ততক্ষণ খুলব ত্রিশছুর মত?’ কাঠ-কাঠ গলায় বললে কাকলি।

‘কিন্তু নিঃশব্দ হয়ে।’ যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে আগাপাশতলা মুখস্থ জানা উত্তর—এমনি উৎসাহ স্বকান্তের ভঙ্গিতে।

‘নিঃশব্দ হয়ে?’ ভিতরে-ভিতরে যুহু-যুহু কাঁপছে যেন কাকলি: ‘বলতে চান কোনো ভয় নেই?’

‘না, কিসের ভয়?’ যেন এক পা এগিয়ে এল স্বকান্ত: ‘আমিই তো আছি।’

ইঙ্গিতটা বুঝি লিফ্টম্যানকে। মানে লিফ্টম্যান যদি অশোভন কোনো আচরণ করে তবে প্রতিকর্তা স্বয়ং স্বকান্ত। যেন স্বকান্তের থেকে কোনো ভয় নেই। সে যেন বনে বাঘ নয়, ঘরে কালসাপ নয়। সে এক দেবশিশু।

আর, সত্যি, লিফ্টম্যানের ব্যবহারকেও বলিহারি। কলকন্না যদি কোথাও খারাপ হয়ে থাকে, তবে হাতের যত্নপাতি নিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করবে তো, বুঝুক বা না বুঝুক, কোথাও করবে তো একটু তদন্ত-তদারক। তা নয়, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে অনড় পুতুলের মত। লক্ষ্য নিজের দিকে নয়, অল্প দূরী আয়োহীর দিকে।

‘চোঁচাবে? শুনতে পাবে কেউ? শুনলেই বা উদ্ধার করবে কে? কে করবে সাহায্যের তোড়জোড়?’

ছটফট করতে লাগল কাকলি।

‘আপনি অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন?’ স্বকান্ত বললে, ‘বহ্ন সিটটায়। বিশ্রাম করুন।’

ঝলসে উঠল কাকলি : ‘এটা এখন বিশ্রাম করবার সময়?’

‘উপায় কি। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন দু পায়ে?’ বললে স্বকান্ত। ‘পা ধরে গেলে এক সময় বসতে তো হবেই।’

‘এখনো ধরে নি।’

‘আমার উপরে অকারণ চটছেন। আমি ভালো কথাই বলছি। কখন মেরামত হয়ে লিফ্ট আবার চালু হয় ঠিক নেই। চাই কি এই সিটটায় বসে ঘুমুতেও হতে পারে—’

‘ঘুমুবে এখানে?’ করুণ কান্নার মত করে বললে কাকলি। ‘আর আপনি?’

‘যদি জায়গা দেন—’

‘এখানে জায়গা কোথায়?’ কাকলি দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়াল।

‘জায়গা নেই, জায়গা নেই এই তো এই যুগের হাহাকার।’ আরো কিছুটা যেন এগিয়ে এল স্বকান্ত : ‘সেটা তো স্থানের দিক থেকে, প্রাণের দিক থেকে নয়। কেননা, যদি হৃদয়ে জায়গা থাকে তা হলে ঘরে কেন, খাঁচায়ও জায়গা আছে। ঐ যে কি বলে, যদি হয় স্বজন তেঁতুল পাতায় দু-জন—দু-জন নয় ন জন। কথাটা হয়তো ঠিক তা নয়। কথাটা হচ্ছে, আমি যাব কোথায়? যতই কেননা রাগ করুন, এই মুহূর্তে আমাকে ফেলবারও তো কোনো জায়গা নেই। স্থতরাং—’

আরো কি এক চুল এগিয়ে এল নাকি স্বকান্ত? আপনার শাড়ির উপর এ কি একটা ছারপোকানা না ভেঁয়ো পিঁপড়ে এই অছিলায় গায়ে হঠাৎ হাত দিয়ে ফেলবে নাকি? কাকলি আরো কঁকড়ে গেল, শিটিয়ে গেল।

‘স্থতরাং আসুন সিটটায় বসি।’ স্বকান্ত সরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করল।

‘আপনিও বসবেন?’

‘বাধা কি। এটা তো আর ট্রাম বাস্-এর লেভিজ সিট নয়! এখানে সবাই পাশাপাশি, সবাই সমান-সমান।’

‘আপনি বহ্নন। আমি দাঁড়িয়ে থাকব।’

‘কিন্তু কতক্ষণ থাকবেন!’ স্বকান্ত দার্শনিক হবার তান করল, মাহুবে কখনো কোনো অবস্থায়ই খুশি নয়। কেবলই সে ভোল বদলাচ্ছে, ভঙ্গি বদলাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছেন— দাঁড়িয়ে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু বসতে পাব। বসে আছেন— বসে আছেন, মনে হবে কতক্ষণে একটু পা টান করে উতে পাব। উরে আছেন—

শুয়ে আছেন, মনে হবে, আর নয়, এবার উঠে পড়ি। উঠে পড়েছেন কি, আবার সেই বসে পড়ার, শুয়ে পড়ার জন্তে কারা। স্বতরাং যতই কেননা দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে থাকুন, বসতে ইচ্ছে করবেই আপনার এক সময়, আর যখন বসবেনই শেষ পর্যন্ত—

‘তখন কোন না শুয়ে পড়ব !’ কাকলির রাগের স্বরটা কোঁতুকের মত শোনা।

‘আশ্চর্য হবার কিছু নেই।’ এতটুকুও কি বিচলিত হবে না স্বকান্ত ? ‘বলা যায় না ক ঘণ্টা ক রাত্রির এমনি বন্দী থাকতে হয় আমাদের।’

‘ক রাত্রির !’

‘তা ছাড়া আবার কি। কিছুই তো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কোথাও। আর সবই যখন অন্ধকার, নিশ্চল নিঃশব্দ, তখন রাত ছাড়া আর কি। প্রত্যেকটি মুহূর্তই এক গহন রাত্রি। কথাটা তা নয়—’

‘তা নয় ?’ চোখ তুলল কাকলি।

‘না। আপনি যদি নিতান্ত শুয়েই পড়েন আমি না হয় এই মেঝেতেই কুকুরকুণ্ডলী হবে, নিরীহের মত ঘুমব শান্তিতে।’

‘ঘুমবেন ? পারবেন ঘুমতে ?’

‘দেখুন না পারি কিনা।’ হাসতে লাগল স্বকান্ত।

‘আপনার এতটুকু ভয় করছে না ?’

‘কেন করবে ? কিসের ভয় ? সঙ্গী যদি ভালো হয় মানে সৎ, কি বলে, স্বন্দর হয়, তা হলে ভয় থাকে না। সেই কারণে আপনিও নির্ভয় হতে পারেন হয়তো। পারেন না ?’

‘কিন্তু আপনি কি স্বন্দর ?’

‘স্বন্দর ভাবলেই স্বন্দর।’ একটু লাজুক হবার ভঙ্গি করল স্বকান্ত : ‘স্বন্দর না হই, সৎ তো বটে। ভালো মানে ইউনিভার্সিটির ভালো ছেলে নই। ভালো মানে ভালোবাসার ভালো ছেলে। কিন্তু কথাটা তা নয়—’

‘তা নয় ?’ কাকলির চোখে কে গাঢ় করে কালো রেখা টেনে দিল।

‘না। আমি বলছিলাম আপনার বসবার কথা। বলছিলাম, যখন শেষ পর্যন্ত আপনাকে বসতে হবেই, তখন আগেভাগেই বসে পড়ুন। আমার দরকারি কথাটা সেয়ে নিই।’

‘দরকারি কথা !’ একটু বা চমকাল কাকলি। বললে, ‘এই বিপদে কাক আবার দরকারি কথা থাকে নাকি ? থাকলেও মনে পড়ে নাকি ?’

‘পড়ে। কে জানে হয়তো ঐ দরকারি কথাই জন্তেই এই বিপদ।’ চোঁক গিলল
স্বকান্ত : ‘কথাটা আর কিছু নয়, আপনার বাড়ির ঠিকানাটা ভুলে গেছি—’

‘ভুলে গেছেন মানে?’ চমকে উঠল কাকলি, ‘কোনোদিন জানতেন নাকি?’

‘জানতাম।’

‘কি করে? কে বললে?’

‘কেউ বলে নি।’

‘তবে?’

চোখের উপর স্থির চোখ রাখল স্বকান্ত, ‘আপনিই লিখেছিলেন।’

‘আমি?’ চোখের পলক ফেলল না কাকলি, ‘আপনাকে?’

‘হ্যাঁ, আমাকেই। আর কাকে!’

লিফটটা ফের চলতে শুরু করল নাকি? যেন একটু দূরে উঠেছিল, নিজেকে
সামলাল কাকলি। দেখল লিফটের নয়, ছুপিঙের দোলা।

‘কী লিখেছিলাম? চিঠি?’

‘তা তাকে চিঠি ছাড়া আর কী বলে?’

‘বা, আমি আপনার ঠিকানা জানলাম কি করে?’ কাকলি প্রায় ঝংকার দিয়ে উঠল।

‘সে চিঠি আমার বাড়িতে পোস্টে পাঠান নি। তাই আমার বাড়ির ঠিকানা
না জানলেও চলে। সেটা আমাকে কলেজেই পৌঁছে দিয়েছেন এবং বেয়ারা মারফৎ।
কি, মনে পড়ে?’

খুব একটা নির্দোষ ব্যাপার, এমনি হালকা হাওয়ার ঢেউ তুলে কাকলি বললে,
‘কলেজ সেমিনারে কোনো বক্তৃতা ব্যবস্থা করে দেবার জন্তে অহরোধ। মনে পড়েছে।
কি, তাই না?’

‘হ্যাঁ তাই।’ গর্বের নিশ্বাস ফেলে স্বকান্ত বললে, ‘আমাদের গলিতে থাকেন এক
বিখ্যাত সাহিত্যিক, তাঁকে সেমিনারে ধরে নিয়ে এসে কিছু বলাবার জন্তে প্রার্থনা—’

‘প্রার্থনা!’ বাক্যের নির্বাচনে আপত্তি কাকলির।

‘নয়তো বলুন আদেশ। আপনি যখন সেমিনারের সেক্রেটারি তখন আপনার
বলাই হুকুম করা। কিন্তু,’ একটু কান চুলকোল স্বকান্ত : ‘কোথাও একটু মিনতিও
হয়তো ছিল। নচেৎ, কোনো দরকার নেই, ঐ চিরকুট চিঠিতে ফলাও করে আপনি
আপনার বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন কেন?’

‘দিয়েছিলাম বৃষ্টি?’ চোখের কোণের কাছটিতে লজ্জার রেখা ফোটাল কাকলি :
‘ওটা কেমন হাতের টানে অভ্যেসের বশে এসে গিয়েছিল।’

‘তাই হবে। কিন্তু কী বিচ্ছিন্ন ঠিকানা। বাড়ির নম্বর নয় তো ধারাপাতের অঙ্ক। ধারাপাতের অঙ্ক বলা ভুল হল, কেননা তাতে একটা শৃঙ্খলা থাকে। আপনাদের নম্বরটা তো অঙ্ক নয়, আতঙ্ক। কোনো ছিরিহাঁদ বা নিয়মকানুন নেই। তিন শ তিয়াস্তর না ছ শ সাতাস্তরের সতেরো, তার আবার বাই—সাতাশ না সাতাশি। কখনো এমন বিদগ্ধটে নম্বর হয় শুনেছেন?’ মুখচোখ গম্ভীর করল স্বকান্ত : ‘সতেরোর সাতাশ না সাতাশের সতেরো এই ঠিক করতেই প্রাণান্ত। তারপর ঐ তিন শ তিয়াস্তর—আচ্ছা, বলুন, এমন কখনো নম্বর হয়?’

এত বিপদেও মাথুবে হাসে! দিবি হাসি বেরুল কাকলির। বললে, ‘মোটাই তিন শ তিয়াস্তর নয়।’

‘নয়! তবেই দেখুন কিরকম অসম্ভব গোলমেলে ব্যাপার, কারু সাধা আছে তা মনে রাখো!’

‘মনে রাখবার কী দরকার! চিরকুটটা দেখে নিলেই পারেন।’

‘চিরকুট বলতে আপনার লেগেছে বুঝি। চিরকুট বলুন বা গেট-পাশ বলুন, দলিলটা হারিয়ে গেছে।’ মুখ অবিস্মিত করণ করল স্বকান্ত : ‘আমার সব জিনিস খালি হারায়।’

‘তাই দেখছি। স্মৃতি-শক্তি ধ্বতি-শক্তি দুইই।’ মুখ টিপে একটু হাসল কাকলি।

‘ধ্বতি-শক্তি মানে?’

‘ধরে রাখবার শক্তি। না পারলেন ঠিকানাটা মনে রাখতে, না বা চিরকুটটা ধরে রাখতে। অতএব আপনাকে ঠিকানা দিয়ে লাভ কি।’

‘আর না দিলেই বা ক্ষতি কি।’ নৈরাশ্রে মুখ ধূসর করল স্বকান্ত : ‘কে জানে এই পিঞ্জরই হয়তো আমাদের শেষ ঠিকানা।’

‘তাই যদি হবে, এই পিঞ্জরই যদি আমার শেষ বাড়ি,’ বেশ সরল হতে পারছে কাকলি, ‘তবে ঘটা করে প্রাক্তন বাড়ির খোঁজ করছিলেন কেন?’

‘বুঝতে পারছি, অনর্থক করছিলুম। স্মরণ্য,’ স্বকান্ত সিটের দিকে ইঙ্গিত করল, ‘আসুন, হতাশ হয়ে বসে পড়ি।’

‘না, হতাশ হবার তো কিছু দেখছি না।’ সহাস্ত নির্ভয়ে বলতে পারল কাকলি, ‘খাঁচার বাইরে কোথাও এক আকাশ আছে। সমস্ত জনতার মধ্যেও আছে এক নির্জনতা।’

এত সুলভ করে কথা বলতে পারে নাকি কেউ? কাকলির চোখের মধ্যে তাকিয়ে রইল স্বকান্ত।

কথাটা শেষ করে নি কাকলি। জের টেনে বললে, ‘সমস্ত ঠিকানার বাইরে
মাছুষের আরেক বাসস্থান।’

‘হ্যাঁ,’ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্বকাস্ত, ‘মাছুষের সে আবাস স্থানে নয়,
কি বলেন—’

‘হ্যাঁ, মনে।’

লাফিয়ে উঠল স্বকাস্ত। ‘তার মানেই হৃদয়ে। তার মানেই—’ স্থির হয়ে তাকাল
লিফ্টম্যানের দিকে। বললে, ‘ঠিক আছে।’ চোখের ইঙ্গিত করলে।

লিফ্ট উঠতে শুরু করল।

বাস্ত হয়ে কাকলি বললে, ‘চট করে আপনার ঠিকানাটা বলুন এবার।’

‘আমার ঠিকানা?’ লিফ্ট কি বাড়ি ছাড়িয়ে শূণ্যে উঠে যাচ্ছে নাকি? এমন
হতচেতন চেহারা করল স্বকাস্ত।

‘আপনার ঠিকানা না পেলে আমার ঠিকানা আপনাকে জানাব কি করে? কি,
বলছেন না কেন? খুব কঠিন? মনে রাখতে পারব না?’ ঠিক আচল বেঠিক
করে আবার ঠিক করল কাকলি।

‘না, একটুও কঠিন নয়, খুব সোজা। দু নম্বর কাঁটালতলা লেন।’

লিফ্ট থামল তেতলায়। এক দঙ্গল লোক দাঁড়িয়ে আছে, সবাই হৈ-হৈ
করে উঠল।

যান্ত্রিক গোলমাল। কিছু বলবার নেই। স্বয়ং লিফ্টম্যানই তার প্রবক্তা।
আর এ দু-জনকে যে একসঙ্গে দেখেছ এও যান্ত্রিক গোলযোগ ছাড়া কিছু নয়।

দু-জন বেরিয়ে এসে দু দিকে পালাল। একটা হুর্থটনার বেশি কিছু নয় এমন
ভাব দেখিয়ে একসঙ্গে হাঁটল কয়েক পা। যা দৈবের ব্যাপার, অপ্রতিকাৰ্য, তার
সম্পর্কে অভিযোগ করে লাভ নেই।

ফাঁকায় এসে, চলতে চলতে ব্যবধান কত বড় হয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে গলার
স্বর চড়া করল কাকলি। বললে, ‘অমন বিচ্ছিরি গলির নাম এখনো আছে নাকি?
আপনাদের অঞ্চলে কোনো গ্রেট ম্যান হয় নি?’

‘গ্রেট ম্যান মানে?’

‘কোনো মন্ত্রী-টন্ত্রী? নিদেন কোনো কাউন্সিলর—’

‘গলিটা আমার জন্তে অপেক্ষা করছে।’ উপর-ঠোঁটের উপর হুটো আঙুল
বুলোল স্বকাস্ত।

‘আর আপনি অপেক্ষা করার জিনিস পেলেন না? একটা হতছাড়া গলি—’

‘গলিটা বিচ্ছিন্ন হতে পারে, কিন্তু যাই বলুন বাড়ির নম্বরটা ভালো।’

‘নম্বরটা?’

‘নম্বরটা দুই। ভুলে গেলেন এরই মধ্যে? খুব ভালো নম্বর। কিছুতেই ভোলা যায় না। দুই। ‘বৈত, দু’হ’। এক আর দুই।’ স্বকান্ত আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে পরে লক্ষ্য করল কাকলিকে : ‘আমি আর আপনি।’

‘কি বুদ্ধি!’ শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি, ‘দুইয়ে বুঝি আমি আর আপনি হয়? দুইয়ে আমি আর তুমি।’

ক্লাশে ঢুকে পড়ল কাকলি।

... ২ ...

কত রাত কে জানে, স্বকান্তর ঘুম ভেঙে গেল। বুকে-পিঠে অসহ্য ব্যথা। এ কি, কী হয়েছে তার? যেন ঠিকমত নিশ্বাস নিতে পারছে না। পারছে না পাশ ফিরতে। মনে পড়ল, দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। দুঃস্বপ্ন দেখছিল, যেন সর্বস্বাস্থ্য হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা দিতে এসে শুনছে, পরীক্ষা দিতে পারবে না। এ কী ভয়ংকর কথা! দু’বেলা টুইশানি, কত কষ্ট করে ফী জোগাড় করা, বাবার ঐ তো গ্র্যাকটিল, পরীক্ষা বন্ধ করে দিলেই হল? এক বছর ড্রপ করার মত গতরও নেই, রসদও নেই। কিন্তু কেন, কী হয়েছে, পরীক্ষা নামঞ্জুর কেন? অঙ্কের পেপারে তোমার পার্সেন্টেজ নেই। অঙ্ক কী মশাই? এম-এ দিচ্ছি হিষ্টিতে, একমাত্র সাল-তারিখ ছাড়া সেখানে আর অঙ্ক কোথায়? অঙ্ক তো ইস্কুল থেকেই পলাতক। ওসব শুনছি না, অঙ্ক পাশ নেই বলে বি-এই নাকচ হয়ে গিয়েছে। কী সর্বনাশ! বি-এ বাতিল হয়ে গেলে চাকরি পাব কি করে, খাব কি, দাঁড়াবে কোথায় সংসার? তা জানি না। অঙ্ক আগে বসতে হবে, বেরিয়ে আসতে হবে বেড়া টপকে। এই নাও কোন্সেন পেপার, বসো, শুধু ফলটা মিলিয়ে দাও। কী অঙ্ক? পারব তো? খুব সোজা, সামান্য যোগ-বিয়োগ। এ আবার কে না পারে? দিন, দেখি। খাতাপত্র নিয়ে বসে পড়ল স্বকান্ত। কিন্তু এ কি, কলম আনে নি তো? লিখবে কি দিয়ে? এ-পকেট ও-পকেট পাগলের মত হাটকাতে লাগল। এই যে,

কী আশ্চর্য, একটা কলম বেরিয়েছে। কিন্তু, শুকনো, খড়ের মত শুকনো, এক ফোঁটা কালি নেই। তবে আর কি, হল থেকে বেরিয়ে যাও, নেমে যাও অন্ধকারে, নিরালায়। তাই নামতে লাগল স্বকাস্ত। সিঁড়ি নেই, লিফ্ট নেই, তবু নামতে লাগল। নামতে-নামতে পা ঠেকল এসে শোবার ঘরে, তক্তাপোশে।

এমন আজগুবি স্বপ্নও হয়! না, ভয় পাবার কিছু নেই, হতাশ হবার কিছু নেই, নিজের ঘরে তক্তাপোশেই সে ঠিকঠাক শুয়ে আছে। পাশে আলাদা তক্তাপোশে শুয়ে আছে ছোট ভাই স্ববীর। জ্বর হয়ে ছটফট করছিল প্রথম রাতে, এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার আলো এসে পড়েছে মশারির উপর। খুঁটখাট ইঁদুরের শব্দ হচ্ছে এখানে ওখানে, গুমুগু শিশিটা বুঝি ফেলল কাত করে। রাস্তায় কাকে দেখে কটা কুকুর উঠেছে হুলা করে, আর, একবার আওয়াজ তুললে, সে লোকটা থাক বা চলে যাক, কিছুতেই যেন আর ঠাণ্ডা হবার নাম নেই। হস করে একটা মোটর বেরিয়ে গেল। হর্ন দিচ্ছে কেন? পথ জুড়ে গরু শুয়ে আছে বোধ হয়। না কি রাস্তার মাঝখানে এক রিকশাওয়ালার সঙ্গে এক মাতালের ঝগড়া?

মামুলি, মুখস্থ পরিবেশ। একেবারে স্ববহ। কিছুই স্বকাস্তর খোয়া যায় নি, না পার্সেন্টেজ, না বা কলমের কালি। তার বি-এ পাশ বহাল আছে, অঙ্ক কিছুই ঘটাতে পারে নি গরমিল। সব তার মজুত আছে, নিখুঁত আছে, কিছুই হয় নি তছরূপ। চোখবোজা অন্ধকারে চারদিক সে ভালো করে চেয়ে দেখল। সব যে-কে-সে।

শুধু তাই? শুধুই পূর্বাভাস? শুধুই একটা বাসি, পুরোনো হিসেবের মিটমাট? নতুন কিছুই হয় নি? নতুন কিছুই আসে নি জমার ঘরে?

কী যেন এসেছে, কী যেন হয়েছে, কী যেন পেয়েছে—আশ্চর্য, মনে করতে পারছে না। টিক-টিক-টিক-টিক, টেবিলের উপরে টাইম-পিস ঘড়িটার আওয়াজ সুনতে পাচ্ছে—এক, দুই, তিন, চার—তবু ভাবনার স্নেটে স্থিতির দাগ পড়ছে না। কী যেন একটা ভালো খবর, পথে কুড়িয়ে-পাওয়া কিছু টাকা, একটা হয়তো বা শাসালো টিউশানি, নয়তো বা পরীক্ষার কটা নির্ধাত ফাস প্রশ্ন—সৌভাগ্যের চেহারাটা কল্পনায় কিছুতেই দাঁড় করাতে পারছে না। হাতড়ে-হাতড়ে মরছে।

অস্থির-অস্থির লাগছে। কষ্ট হচ্ছে নিশ্বাস নিতে।

হবেই তো, বুকে অসহ্য ব্যথা। পাশ ফিরতে পারছে না।

যন্ত্রণাটা কি রকম, সমস্ত চেতনা ঘন করে, একত্র করে অসহ্যব করতে চাইল স্বকাস্ত। কী অজুত, ব্যথা কোথায়? এ যে স্বথ। উত্তাল স্বথ। এ যে সৌরভের সমুদ্র।

স্থ থখন খুব বেশি হয় তখন বুঝি ব্যাখার মতই লাগে।

আশ্চর্য, বুকের কত কাছে দাঁড়িয়েছিল কাকলি।

কত কাছে! প্রায় নিশ্বাসের নাগালের মধ্যে। এক ছুঁয়ে ধুলো উড়িয়ে দেবার কাছাকাছি।

পাশ ফিরতে কষ্ট হচ্ছে নাকি স্বকাস্তর? কোথায় কষ্ট? এ তো গভীর আরামের ঢেউ। দিবি পাশ ফিরল। উপুড় হল। আগ্রাস্ত বিহ্বত হল। ঘুমের নবনীর মধ্যে ধীরে-ধীরে নেমে যেতে লাগল, ডুবে যেতে লাগল।

এত কাছে, তবু তাকে একটুও ছুঁতে পারল না। গহ্বরে নেমেও ধরতে পারল না বিগ্রহ।

কাঙালের মত কটি রূপণ আঙুল ধরলে হত কী! উঃ, সে কতকেলে পুরোনো কবিতার ঢং। তার চেয়ে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে হুর্জয় হুই বাহর মধ্যে সেই এক তাল কোমল ভয়কে পারত লুফে নিতে? কই, পারল কই? কেউ পারে?

কেউ পারে না। ভারতেও পারে না।

চূপ করে ঘুম যাও। কলিতার সামনে অন্ধকারে এখন সাহস দেখাচ্ছ কিন্তু সাধা নেই দিনের বেলায় ছাঁও সেই বাস্তবী তহু। সাধা নেই তার এক তত্ত্ব বসনকে বিশৃঙ্খল করে। কষ্ট করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেই ধরা যায় না চক্রমা।

যে সমস্ত জোরকে স্থগিত রাখে, তটস্থ রাখে, দাঁড় করিয়ে রাখে একটা ধারালো ক্ষুরের উপর, তারই শক্তি অসীম।

আর যে তুচ্ছতম শৃঙ্গে উঠেও নিচের অন্ধকার গুহায় ঝাঁপ দেয় না, পুরস্কার উপনীত হয়েও ফিরে দাঁড়ায়, হায়, তার কোনো শক্তি নেই!

আঙুনের উপশম জলে, ক্লাস্তির উপশম ঘুমে, থিদের উপশম আহারে। কিন্তু যন্ত্রণার উপশম যন্ত্রণায়।

পাহাড়ের চূড়া যত উচুই হোক পায় না চাঁদকে। কিন্তু সমুদ্র, যে অনেক নিচে প'ড়ে, তারই উষ্মে বুকে শত-কোটি অজস্র হয়ে ভেঙে পড়ে চাঁদ।

আহা হা, যাবার সময় কী না জানি বললে। কান খাড়া করল স্বকাস্ত।

পাশের ঘরে সেটু কেঁদে উঠেছে বুঝি। গুর মা ওকে ধমকাচ্ছে। যত ধমক খাচ্ছে তত চড়ছে তার চিংকার। কী চাইছে ছেলেটা? যেমন অবুঝ মা, তেমনি অবুঝ ছেলে। উঠে ওকে নিয়ে এলে হয় এ-ঘরে। স্বকাস্তর কোল পেলে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়বে নিশ্চিন্তে। সকাল হতে আর কত বাকি? সকাল হলেই দরজা খোলা পেয়ে ঠিক চলে আসবে গুটি গুটি। মশারি তুলে মুখ বাড়াবে। ডাকবে ছুগ্গা ছুগ্গা।

বলে। কবে আর ভোরের সূর্য দেখেছে স্বকান্ত, রোজ দেখেছে এই শিশুর মুখ।
প্রত্যাহার একটি পরিচ্ছন্ন আরম্ভ।

মাকে হারিয়ে দিয়েছে সেন্টু। যা আদায় করবার করে নিজের থেকেই শাস্ত
হয়েছে।

আহা, কী যেন কথাটা, কেমন করে না জানি বলেছিল! সঙ্গে ছিল কি
একটু হাসি, একটু বা হাসির অতিরিক্ত ইশারা?

হাসির শব্দটা মনে-মনে নির্মাণ করতে পেরেছে স্বকান্ত।

হাসি কোথায়, ধমধমে জমাট আকাশে মেঘ ডাকছে। ঝেঁপে বৃষ্টি এল, সঙ্গে
সঙ্গে শুরু হল রাস্তাময় মাছুষের শোরগোল। ছাদহারা ঘুমহারা মাছুষ। যার যা
কাঁখা-কাতা চট-মাদুর সব গুটিয়ে নিয়ে উঠে এসে বসেছে উবু হয়ে। যারা মাথার
উপরে ঝুলবারান্দা পায় নি তারা এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তোড় বেশি হলে
বা বেশিক্ষণ ঝরলে এ বিরাট বিনীত জনতা কোথায় গিয়ে মাথা রাখবে কে জানে।
আহা, বৃষ্টিটা ধরুক, ফুটপাথ শুকিয়ে যাক দেখতে-দেখতে। ওদের আবার নতুন করে
ঘুম আসুক। ওরা জেগে আছে জানলে এই বাকি রাতটুকু বুকের মধ্যে বৃষ্টির শব্দ
নিয়ে, হাসির শব্দ নিয়ে, সে ঘুমোয় কি করে?

কিন্তু কাকলি জেগে আছে জানলে?

আমি আর তুমি। আমি আর তুমি। সূর্য আর সোম। নাদ আর বিন্দু।
প্রাণ আর মন।

ছোট-ছোট হাতে বন্ধ দরজায় কে ধাক্কা মারছে। ভোর হয়ে গিয়েছে বুঝি।
অগ্নি দিন হলে সূর্যেরই আগে থেকে উঠে দরজা খুলে দিত, ধাক্কা মারবার দরকারও
হত না সেন্টুর, টুক করে ঢুকে পড়ত, আর তাকে নিয়ে বিছানায় আরো খানিকটা
গড়িমসি করতে পারত স্বকান্ত। কিন্তু আজ যে সূর্যের জ্বর। তাই স্বকান্তকেই
উঠতে হল উত্তোষ করে। কিন্তু, আশ্চর্য, বিরক্ত হল না। কেন বিরক্ত হল না?
খোলা জানলা দিয়ে উল্লনের ধোঁয়া আসছে, তবু না। ও! কী যেন তার হয়েছে,
কী যেন তার এসেছে—মনে করতে পারছে না। দাঁড়া, খুলছি। তার আগে
হোঁড়াটাকে একটু দেখি। সূর্যের বিছানায় গিয়ে তার ঘুমন্ত কপালে হাত রাখল
স্বকান্ত। ঠাণ্ডা, জ্বর নেই। সূর্য চোখ চাইল। এ কি, তুমি? এ যেন সূর্য
ভাবতেও পারত না—ধড়মড় করে উঠে বসল। অপরাধীর মত মুখ করে বলল,
‘ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজাটা খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছি।’

‘না, তোর উঠতে হবে না। আমিই খুলছি।’ স্বকান্তর হাতে-কণ্ঠে মমতা

ঝরে পড়ছে : ‘তোমার শরীর দুর্বল, সারা রাত তোমার জ্বর গিয়েছে। তুমি শুয়ে থাক চুপ করে।’

বাধ্য ছেলের মত স্ববীর শুয়ে পড়ল।

নিজেই দরজা খুলল স্বকাস্ত। আর তার বাড়ানো দুই হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেন্টু।

‘কতক্ষণ তোমাকে ডাকছে।’ ঘুম-খসা শাড়ির আঁচলটা মেঝেতে লুটোচ্ছে, এলোমেলো পায়ে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে বন্দনা।

এখন সেন্টুকে গল্প বলো—অন্ধকার-দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করে তাকে ধরে হটিয়ে দিয়ে গায়ে রক্ত মেখে কেমন করে পাহাড়ের উপর উঠে এল সূর্যমামা, কেমন করে আলোর বাণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে জাগিয়ে দেয় পাখিদের, ফুলদের, শিশুদের—ঝন্টু-সেন্টু দেয়—কত হাসি ফোটায়, গান ফোটায়, রঙ মাথায়—

‘আমাকেও জাগিয়ে দেয়?’ চোখ বড় করে জিজ্ঞেস করে সেন্টু।

‘তোমাকেও।’

‘কিন্তু রাত্রে যখন জাগি?’

‘তখন তো অন্ধকারের দতিটা আসে। তখন তো তুমি কাঁদো—’

‘দতিটা তো খারাপ। আমার ভয় করে। আর, শোনো কাকা’, স্বকাস্তর চিবুক ধরে মুখটা নিজের দিকে পুরোপুরি ঘুরিয়ে নেয় সেন্টু : ‘সূর্যমামা খুব ভালো। তার বাণে একটুও ব্যথা নেই।’

‘কি করে থাকবে। তার বাণ যে আলোর বাণ। চুমুর মত মিষ্টি। ছোট-ছোট কচি আঙুলের মত।’

‘সুড়সুড়ি দেয়, তাই না?’ বলতে-বলতেই চিবুকের নিচে কাকার প্রত্যাশিত আঙুলের আদর পেয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে সেন্টু।

মৃণালিনী ঘুম থেকে উঠেই সংসারবন্দনা শুরু করে দিয়েছে। প্রথমেই চাকর-ধোলাই। এত দেবি ক’রে উঠুনে আগুন দিয়েছে কেন? আর ধোঁয়ার পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, কত বেশি খোরাক পোরা হয়েছে গহ্বরে। চারদিক থেকে এমনি যদি অপচয় চলে, তা হলে ভরাডুবির আর বাকি কি।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে বিজয়া। খরখরে গলায় পালটা জবাব দেবার লোভ সে সামলাতে পারে না : ‘হরিপদ কোথায়! ভোর রাতে কয়লাঘর থেকে খুঁটে আনতে গিয়ে তার হাতে বিছে কামড়েছে। তাই আমিই আগুন দিয়েছি।’

‘সেই যখন দিলে ঠিক টাইমে দিলেই হত।’ কথার পিঠে কথা বলতে কখনো

নিবৃত্ত নয় মৃণালিনী : ‘চায়ের পাট উঠবে, তারপরে প্রশান্তর অকিসের ভাত । ছুটো ঠিকঠাক আজ খেয়ে যেতে পারলে হয় ।’

‘কেন, প্রশান্তর বউ কি করে ?’ ঝামটা দিয়ে উঠল বিজয়া ।

‘সে তো রাঁধবেই এ-বেলা । শুধু উছন ধরিয়ে চায়ের জলটা গরম করে রাখা ।’

‘কিন্তু যার তা করবার কথা সেই চাকরের যদি কোনো বিপদ হয় তা হলে দেবি তো একটু হবেই ।’ মৃণালিনীর মুখ আবার কুটকুট করে উঠছে দেখে বিজয়া দাবড়ে উঠল : ‘একটা লোক কষ্টের মধ্যে পড়লে তাকে একটু দেখতে-শুনতে হয় তো ! সেই বিছেটাকে যেরে ঘবে দিতে হয় তো সেই যজ্ঞগায় জায়গায় । আমি তো আর উপরতলার বাসিন্দে নই যে, নিচেরতলার লোকের কান্না শুনব না । যান না, দেখুন না কেমন ছটফট করছে হরিপদ ।’

সে পরে দেখা যাবে । এখন এই উপরনিচ বলে ‘খোঁটা দেবার মানেরটা কি ! কে থাকতে বলছে নিচে ! সোজা বেরিয়ে গিয়ে তেতলার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকলেই তো হয় আলাদা । মৃণালিনী মারমুখো হয়ে উঠল ।

বিজয়াও মরীয়া হতে জানে । বললে, ‘তা হলে মাস মাস গুনে গুনে এক মূঠো টাকা পেতে হত না । সংসারের তলা ছুটো হয়ে যেত ।’

‘সংসারটা ছিল বলেই, গায়ে লাগে না তো, চলছে বরফটাই ।’ কাটান ঝাড়ল মৃণালিনী : ‘ঐ যে কি না বলে, উপরে চিকনচাকন ভেতরে খ্যাড় ।’

মূল নেই তুমুল শুরু হয়ে গেল । চটি পায়ে ভূপেন নেমে এল উপর থেকে । পিছু-পিছু বন্দনা । নিচের ঘর থেকে বেরিয়ে এল হেমন ।

‘ভালো করে এখনো কাক ডাকে নি, আর তোমাদের ডাক এরই মধ্যে তারস্বর হয়ে উঠছে ।’ ভূপেন সালিশির ভঙ্গিতে বললে, ‘এদিকে চাকরটা যে যজ্ঞগায় মারা যাচ্ছে তার খেয়াল করলে না ? একজন ডাক্তার ডাকতে হয় তো !’

দু পক্ষ চূপ করল । শোনা গেল হরিপদের গোঙানি ।

‘গান খামে তো বাজনা খামে না । আমার ঘুমের পরিশিষ্টা এখনো বাকি ।’ হেমন ক্রিয়ে গেল নিজের ঘরে । নিজের মনে বললে, ‘ঘুমের পরিশিষ্টা মানে বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙা । আর বেড-টির জন্তে অপেক্ষা করা ।

‘বেড-টি ! ব্যাড টি-ও জুটবে না আর এখানে ।’ বিজয়া ঝাঁজিয়ে উঠল ।

যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বিছানায় আবার ঢুকে পড়ল হেমন ।

‘ও কি, আবার শুচ্ছ যে ।’

‘তখন সেটা ঠিক ওঠা হয় নি, ছোট হয়েছ ।’ ভয়ে-ভয়ে হাসতে চাইল হেমন :

১-১-১-১

‘ঘুম থেকে ওঠা আর বিছানা ছেড়ে ছোট ছোট আলাদা জিনিস। তোমাদের ঝগড়া শুনে আমি তখন বিছানা ছেড়ে ছুটে এসেছি, ঘুম থেকে উঠে আসি নি। আমার ঘুম তাই একটু বাকি আছে। কীর্তনের পরে বাতাস। ঘুমের পরে ঘুমো-ঘুমো একটু আলস্য করা—’

গজগজ করতে লাগল বিজয়া।

যত খুশি বকো আর বকো রাজি আছি, দয়া করে কান্দতে বোসো না।

এ বাড়িতে কাকে আর বলবে, ভূপেন নিজেই গেল ডাক্তারকে খবর দিতে।

প্রশান্তও উঠেছে, একটা সিগারেট ধরিয়ে বসেছে জানলায়। সংসারের বাধিগভের ঐকতান শুনে এতটুকুও সে বিচলিত হচ্ছে না। শুধু ভাবছে, বন্দনা না তার কানিটা জুড়ে দেয় এর সঙ্গে।

পেট দিয়ে সেন্টুর দাঁত মেজে দিচ্ছে স্বকান্ত। বলছে, ‘ওরা-ওরা ঝগড়া করুক, আমরা কোনোদিন ঝগড়া করব না।’

এক মুখ ওখলানো পেট নিয়ে সেন্টু বললে, ‘না।’

‘আমরা সব সময়ে মিলে-মিশে থাকব, মিষ্টি করে কথা কইব।’

মুখ খোলসা করে নিয়ে সেন্টু বললে, ‘কইব।’

‘আমরা খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কথা কইব না, খারাপ কথা শুনব না—’

‘আমরা, না কাকা?’

‘হ্যাঁ, আমরা।’

‘আমি আর তুমি—খুব মিষ্টি—না, কাকা?’

‘ভীষণ মিষ্টি। ভয়ংকর মিষ্টি।’ অবোধ শিশুটাকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে চেপে ধরল স্বকান্ত : ‘আমি আর তুমি। জগৎসংসার উচ্ছল যাক, ভেসে যাক প্রলয়ের জলে, তবু আমাদের ছাড়াছাড়ি নেই।’

মৃণালিনী বাজারে পাঠাবার লোক খুঁজছে।

‘তুই ছাড়া আর লোক নেই।’ পড়ার টেবিলে বসে কি লিখছিল স্বকান্ত, মৃণালিনী আর্জি পেশ করল।

‘আমি? আমি বাজারে যাব?’ যেন নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে এমনি মুখ করল স্বকান্ত।

‘উপায় নেই।’ গান্ধীঘর্ষে মুখ কঠিন করল মৃণালিনী : ‘হরিপদ অচল। স্ববীরের জয়। কাজে কাজেই—’

কাজে কাজেই? আমি যাব ঐ চটের থলে নিয়ে, এমনি লুপ্তি পরে, গেজি-গায়ের,

লক্ষীছাড়া চেহারায়? আর কোন বেশবাস বা মিল থাকে ঐ থলের সঙ্গে? জলকানার মধ্যে বাজার ঘুরে-ঘুরে জিনিসের দর করব, নেড়ে-চেড়ে, টিপে-টুপে, উলটিয়ে-পালটিয়ে? তারপর ঠকে আসব? থলের মুখ দিয়ে আনাজপাতি বেরিয়ে থাকবে আর তাই বয়ে নিয়ে আসব অশালীনের মত? আমি কি উদ্ভ্রান্ত না মতিচ্ছন্ন?

‘বাবাকে বলো।’ উদাসীনের মত বললে স্বকান্ত, ‘বাইরের ঘরে নিশ্চয়ই বলে আছেন নিশ্চিন্ত হয়ে। মক্কেল নেই—’

‘তোরাও তো আক্কেল নেই।’ আর্জি নয়, ফরমাশ জারি করল মুণালিনী: ‘ওঠ বলছি। প্রশান্তর আফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে—’

‘সে আফিস আর কদিন!’ একটা নাটুকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বকান্ত।

‘উঠলি?’ টেবিলের কাছ ঘেঁষে মুখিয়ে এল মুণালিনী। বোধ হয় গায়ের জোরে টেনে তুলবে হাত ধরে।

‘বা, আমার এ বছর শেষ পরীক্ষা না? নোটগুলো তুলে না নিলে চলবে কেন? যার নোট তাকে তার খাতা বিকেলের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। তোমরা কি চাও আমি একটা খাডডো ক্লাশ নিয়ে বেরিয়ে আসি? এরই জন্তে আমি সকালের টিউশানিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিলাম—’

‘তাই বলে বাজার ছেড়ে দেওয়া যায় না। তা ছাড়া, তুই নোট টুকছিল কোথায়?’ লেখাটার উপর মুণালিনী উপুড় হয়ে পড়ল: ‘এ তো বাড়লা লেখা। নীল কাগজের প্যাড, এ তো তুই কাকে চিঠি লিখছিল—’

অসম্ভব। কতগুলো বইখাতা দিয়ে লেখার কাগজটা চাপা দিয়ে উঠে পড়ল স্বকান্ত। এম-এ পরীক্ষার্থী ছেলের লেখাপড়ায় আড়ি পাততে আসে, কী দুর্ধর্ষ যা দেখে একবার! ‘দাও, টাকা দাও, ফর্দ দাও।’ হাত বাড়াল স্বকান্ত: ‘দরৈ যদি ঠকে আসি কিছু বলতে পারবে না কিন্তু। খুঁত ধরতে পারবে না। যা আনব তাই গিলতে হবে।’

মুণালিনীর চোখ তখনো নীল কাগজটা খুঁজে বেড়াচ্ছে: ‘কিন্তু কাকে চিঠি লিখছিলি?’

‘কাকে আবার চিঠি লিখব? আমার কি কোনো লোক আছে, না, কার আমি ঠিকানা জানি? আমি অমনি শুধু একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম। এক লাইব্রেরিতে একটা এসে-কম্পিটিশন হচ্ছে—ক্যাশ প্রাইজ আছে, ভাবছি পাঠালে হয় একটা রচনা। তারই একটু মন্তব্য করছি। দাও, দাও, আর দেবি কোনো না। দাদার আবার নটায় হাজিরা।’

মৃণালিনী একটু আড়াল হতেই প্যাণ্ডের কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরল স্বকাস্ত। নইলে মার যখন একবার নজর পড়েছে তখন আর ওটাকে বাঁচানো যাবে না।

মনে-মনে একটা চিঠি লিখছিল কাকলিকে। নিভৃতে-নেপথ্যে ঐ লেখাটুকুই মনে মনে লেখা। যদি লেখবার অধিকার থাকত, যদি ঠিক মুখস্থ থাকত ঠিকানা, তা হলে কিভাবে লিখত তারই নির্জন নিদর্শন।

আপনি মনেও ভাববেন না, আমি লিফ্টম্যানকে হাত করে আপনাকে খাঁচায় পুরে বুলিয়ে রেখেছিলাম। দুর্ঘটনায় কত কি বিপরীত কাণ্ড ঘটে কেউ অল্পমানও করতে পারে না। একটা জাহাজডুবির পর দেখতে পারি শুধু আমি আর আপনিই বেঁচে আছি, আর, শুধু বেঁচে আছি নয়, পাশাপাশি বসে আছি সমুদ্রতীরে। সবই দৈবের ব্যবস্থা।

না, না, এভাবে লিখলে ভারি বিসদৃশ শোনাবে। তার চেয়ে মনের কথা সোজাসজি লিখে ফেলাই ভালো। প্রাণ যাতে জল হয় সেই প্রাঞ্জল কান্নায়।

মোর্টুসকি—বলো, এছাড়া আর কী বলে তোমাকে সম্বোধন করতে পারি? তোমার নাম কাকলি, আদর করে সম্বোধন করতে হলে কাক বা কাকু বলে ডাকতে হয়—তুইই ভয়াবহ। তার চেয়ে তোমাকে মধুমুখী, তাজিল্যো মুড়কিমুখী ডাকা অনেক মিষ্টি। শোনো, তোমার জন্তে কত কিছু করতে পারি, এ তো সামান্য একটু কৌশল। এ কি তুমি মার্জনা করে নেবে না? এটুকু না করলে কি করে পাই তোমার সান্নিধ্যের সৌরভ, তোমার উষ্ণতার স্বীকৃতি? বলো, আমার কি খুব অপরাধ হয়ে গিয়েছে? তুমি কি উপরওয়ালার কাছে আমার নামে নালিশ করবে? এনকোয়ারি বসাবে? একটা গরিব লিফ্টম্যানের চাকরি খাবে?

না, না, তুমি তো বুঝতে-পারা টলটলে চোখ মেলে হাসলে, আমি-তুমি বললে। এটুকু নৈকট্য না হলে এতটুকু কি হত?

কী স্বন্দর তোমার চোখ, তোমার দাঁড়াবার ভঙ্গি, তোমার নাকের ঠিক নিচে আর উপর-ঠোঁটের ঠিক উপরে ছোট্ট এক তিল চেউ, তোমার ঘননিবন্ধ লাবণ্যের দুটি স্তূপ—
ছি, অমনি করে কি লেখা যায়?

বা, এ তো মনে-মনে লেখা। এ তো কেউ পড়বে না, কেউ দেখবে না। যে জানলে খুশি হত সেই কাকলিও নয়।

চিঠির কাগজটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো পকেটের মধ্যেই রাখল স্বকাস্ত। রাস্তায় জায়গায়-জায়গায়, এখানে-ওখানে কিছু-কিছু করে ছড়িয়ে দেবে।

নইলে, বাড়িতে; টেবিলের নিচে ঝুড়ির মধ্যে ফেললে, মার যা উৎসাহ, কে জানে, হয়তো বা ভাড়া প্রাণ জোড়া দিতে বসবেন। ধরা পড়ে গেলে কিছুতেই তাঁর কাছে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই। টিউশানির মাইনের পর্যন্ত চুলচেরা হিসেব নেবেন। তার মানে অগুস্তি মিথ্যে কথা বলাবেন। কদাচিৎ একটা পয়সা এদিক-ওদিক হলে ভিথিরিকে দিয়েছি বলে পার পেতে দেবেন না। ছাড়া পাঞ্জাবির পকেটে, এমন-কি ঘড়ির পকেটেও, হাত ঢোকাবেন লুকিয়ে।

স্বথের চেয়ে স্বস্তি ভালো, স্বাধীনতার চেয়েও সতর্কতা।

বাজারের খলে আর টাকা নিয়ে এল মৃণালিনী। স্বকান্ত বললে, ‘একটা ফর্দ লিখে দাও।’

‘নিত্যিকার বাজারে আবার ফর্দ কি। যা বলছি তাই মনে করে নিয়ে আসবি। নইলে মাথাওয়ালা ছাত্র হয়েছিস কি করতে?’ মৃণালিনী বিব্রত ফিরিস্তি মেলে বসল।

‘কার কি দর?’ অঙ্ককার দেখল স্বকান্ত।

‘নিজে দেখে-শুনে দেখে নিবি, ঘুরে-ঘুরে—’

হরিপদকে দেখতে গেল স্বকান্ত। এতক্ষণে স্নহ হয়েচে খানিকটা। তাকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করে জেনে নিল দরাদর।

হরিপদর বাজারদরের সঙ্গে সমতা রাখতে গিয়ে স্বকান্ত দেখল নিট বারো আনা পকেটে।

তুমি আমার এ মূর্তিটা দেখো না। আমি খলে হাতে বাজার করে ফিরছি, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, এ আমার পরিচয় নয়। তুমি কোন না একদিন কোমরে শাড়ি জড়িয়ে ঝাঁটা হাতে করে তোমার শাওলা-পড়া নোংরা উঠোন পরিষ্কার করবে, কোন না ছুটো মিছে কথা বলবে, খরচ-বাঁচা টাকা ছুটোর একটা কোন না সরাবে এদিক-ওদিক। তবু সেই তোমার পরিচয় নয়। আমি চাকর নই, তুমিও দাসী নও। আমি আসলে রাজা, তুমি আসলে সম্রাজ্ঞী।

তারপর একটা চিঠি এল।

যেন কী একটা তুচ্ছ অকেজো জিনিস এমনি অবহেলায় পিওন ছুঁড়ে দিয়ে গেছে জানলা দিয়ে। কান্নার মতন উপুড় হয়ে রয়েছে মেঝের উপর। আফিস-কাছারি টাইমের তাইথে চলছে, গিন্নিবান্দিরা দিতে-থুতে ব্যস্ত, চাকরটা ছুঁচো-বাজির মত এখানে-ওখানে ছুটছে, ঠিক এ সময়টাতেই জমাদার আসে। যাতে থোলা নর্দমার মুখে ভর্তি-জল বালতি-সময়েত চাকরের সঙ্গে না মুখোমুখি দেখা হয়। যাতে কাঁটা-গাছটা শিল্পীর তুলির মত এখানে-ওখানে এক-আধটু বুলিয়েই পালিয়ে যেতে পারে। যদি গোলমেলে হাওয়া উঠত আর চিঠিটা ঘুরে-ঘুরে উড়ে চলে যেত বারান্দায় তা হলে জমাদারের হাত থেকে তাকে আর বাঁচানো যেত না। গ্যাসপোস্টের নিচে যেখানে আবর্জনা জমা তারই উপর মাতৃহীন শিশুর মত পড়ে থাকত। আর ঐ যে নোংরা বস্তা হাতে কাগজকুড়োনো লোকটা আসে, দেখতে আধপাগল, সে ছোঁ মেরে কেড়ে নিত—জানতেও পারত না কী সে কুড়িয়েছে।

ভাগ্যিস হঠাৎ এদিকে এসে পড়েছিল স্বকাস্ত।

একটা শাদা খামে কালো কালির অক্ষর। মেঝের দিকে তাকাতাই নিজের নামটা স্পষ্ট চোখে পড়ল। স্ট্যাম্প দেখা যাচ্ছে না। স্ট্যাম্প বুঝি ওপিঠে সাঁটা। সেটাই বুঝি সম্ভ্রাস্ত। ঠিকানার পিঠটা নিটুট রাখা। আর যেখানেই স্ট্যাম্প, সেখানেই সীল। যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিবৃত্তি। কে জানে কী চিঠি! হয়তো হাতে করে তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওলটালে দেখবে একটা বুকভাঙা বুক-পোস্ট! মুখটা পেটের মধ্যে ঢোকানো। তার নামে আবার স্বস্থ-মস্ত খামের চিঠি এল কবে? যে দু-একটা এসেছে ঐ আজ্ঞে-বাজে বুকপোস্ট ছাড়া আর কী! হয় কোনো বিজ্ঞাপনের ছাওবিল, নয়তো কোনো বারোয়ারির নিমন্ত্রণ। আর কখনো-সখনো পোস্টকার্ড। পোস্টকার্ড তো নয় খান ইট। লাইব্রেরির বইয়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে—শিগগির ফেরত দিয়ে যাও, নয়তো কোনো ক্লাবের মেম্বর হয়ে টাকা বাকি কেলেছে, তার এক আর্থিক হৃৎকম্প।

নিচু হয়ে স্বকান্ত ভুলল চিঠিটা। চোখ বুজল। লাগ ভেলকি লাগ, যেন বুকপোস্ট হয়—তা হলেই উলটোটা হবে। চোখ বুজে ওলটাল খামটা—ধীরে ধীরে চোখ মেলল—না, আশ্চর্য, আগাপাশতলা মোড়া পরিপূর্ণ মাণ্ডল চাপানো আন্ত-স্বস্তি স্বরক্টিত চিঠি। আঠার আহ্লাদ একেবারে খামের সীমা পেরিয়ে বাইরে চলে এসেছে; তার মানে খুব সতর্ক হয়ে নিবিষ্ট যত্নে এঁটে-সঁটে দিয়েছে, যাতে সহসা না কেউ মুক্ত করতে পারে, আলগা করতে পারে প্রাণ-ভ্রমরের কোটো। কিন্তু কে লিখেছে এ চিঠি?

আর কে!

হাওয়া-আশা গলার স্বর শুনে মেয়ে বলা যায়, বলা যায় জুতো দেখে, আরো কটু স্বস্তি গেলে, তেলের বা সাবানের গন্ধে, তেমনি বলা যায় হয়তো হস্তাক্ষরে।

আর একটু গভীর গবেষণা করলে বলেও দেওয়া যায় কত বয়সের হস্তাক্ষর। যায়ে যদি নতুন যৌবনের গর্ব থাকে সাধ্য কি অক্ষরে সেই গোলালো গরিমা না মানো। সাধ্য কি না ফোটাও একটু ছিমছাম টানটান। তা ইংরেজিতেই লেখো। বাংলাতেই লেখো। মেয়ে ভাবতেই অত উৎসাহিত হবার আছে কী! মাসিমা-মাসিমার তো হতে পারে, কিংবা পিসিমা-টিসিমা। কার কী দরকার পড়েছে, চিঠিতে লিখতে তো বাধে না, ফরমাশ করে পাঠিয়েছে। চিঠিটা ওজনে বেশ ভারি, যতো কাক ছেলেমেয়ের বইয়ের ফিরিঙ্গি, ওল্ড বুকশপ থেকে কিনে দেবার বায়না। আগের ভাঙারে কত রসিকতাই আছে। হালকা একটা ইচ্ছেকে হোঁচট খাওয়াবার স্ত্রে পথচলতি কত নিষ্ঠুরতার ইট। কিন্তু যাই বলো, বনগাঁবাসী মাসিপিসিমা কেউ য, স্ট্যাম্পের কালি খেবড়ে গেলেও টি-টি-এ পড়া যায়। কলকাতা ছাড়া অমন মের ঘটা-ছটা আর কার। গড়বেতা বরপেটা দীনহাটা হরিণঘাটা যাই ভাবো, যাই লো, সব একটা টি। শুধু কলকাতাতেই ডবল টি।

সন্দেহ কি, কাকলির চিঠি। কলকাতায় কাকলি ছাড়া আর মেয়ে কই? বেশ হা, স্থির হলে, এখন খুলে দেখলেই তো হয় কে লিখেছে! অচল-অনড় হয়ে আছে। কী করে? আহা, কী লিখেছে সে কি আর জানে না? নেহাতই মামুলি নীরস টা কথা, পড়া-পরীক্ষা নিয়ে নিম্ম্রাণ এক-আধটা প্রশ্ন এবং শেষকালে ‘শুভেচ্ছা’ ও সেই। জানে, জানে, ওদিক থেকে গাছে উঠে মই খোয়াবার তার ভয় নেই। তো বা তার ব্যবহারের ক্ষুণ্ণিতে আপত্তি করে পাঠিয়েছে। ফৌজদারিতে কান্ড দি়ো নো হয় না, অপরাধের তামাদি নেই। আর যদি কিছু লেখেও ভাষার টানে, খবে, ইচ্ছে করেই ঠিকানাটা উল্লেখ করে নি। যাতে ছটফট করলেও উত্তরে উপশম পায় কোনোদিন।

জানে, জানে, সব স্বকাস্তর জানা। আরো জানে, যা লিখেছে দু'লাইন, সামান্য একটা পোস্টকার্ডেও তা লিখতে পারত অকপটে। কিন্তু ছাড়া পোস্টকার্ড না পাঠিয়ে সজ্জিত ও আবৃত যে একটি থাম পাঠিয়েছে তাইতেই স্বকাস্ত ভরপুর। থামের মধ্যে চিঠিতে লিখিত তেমন কিছুই নেই, না থাক, কিন্তু চিঠির অতিরিক্ত, অলিখিত কিছু আছে, সেইটাই মহৎ। কাকলি আহুক আর না জাহুক, থামের মধ্যে সে শুধু চিঠির কাগজই ভরে নি, ভরে দিয়েছে একটি প্রতীক্ষা বা একটি আকাজ্জক কল্পরি। চিঠির আর মূল্য কি, চিঠির মূল্য আমি তার মধ্যে কী পড়ছি তাতে নয়, কী অলিখিত উদ্ধার করবার আশা করে আছি তাতে। কী লিখেছে তার চেয়ে কে লিখেছে সেই আমার অনেক। এ সামান্যটিই অমূল্যের পোশাক পরতে পারে শুধু আমার দেখবার গুণে, একান্ত করে আমার কাছে। ধানের শিবে শিশিরটিকেই দেখি না, দেখি সেই হালিখুশি স্বর্ঘ, গগন ছাড়া যার স্থান নেই। তাই চিঠি কে দেখে! এক মুহূর্তের জন্তে তাকে দেখি। তার নত একটি দৃষ্টি, নত্ব একটি পৃথুলতা, নিবিড় একটি নিভৃতি, নিটোল একটি বিন্দুর মত মন। তোমরা তট দেখ আমি তল দেখি।

চিঠিটা রাখবে কোথায়, লুকোবে কোথায়? ছি ছি, এ তার কী পোশাক, গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি। লোকে ঠিক রকবাজ হামলাবাজ মনে না করলেও বাউগুনে ভাববে। কে জানবে তার ভিতরের কথা। পাখে কি আর মাহুবে নেমপ্লেট লাগায়, পদবীর পদ্ববনে ঘুরে মরে! আমার ভীষণ ভূষণে দরকার নেই, গায়ে একটা শুধু জাম থাকলেই আমার এখন চলে যেত, চিঠিটা অপ্রকট করতে পারতাম। থামের চিঠি প্রকাশে কেউ খুলবে না, তা ঠিক, কিন্তু কৌতুহলী তো হবে। আর মেয়েদে কৌতুহল গলাকাটা ছুরির চেয়ে বেশি।

তাকের থেকে বাবার একটা আইনের বই তুলে নিল স্বকাস্ত। তার মধ্যে গুঁজ চিঠিটা। কি একটা আইনের বই দরকার এমনি ভাব দেখিয়ে তাড়াতাড়ি উঠ উপরের দিকে।

বাবা খাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নিলি?'

'এই বইটা।' কনট্রাক্টের বইটা দেখাল কাত করে।

'লাগবে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'আবার কিরিয়ে দিস মনে করে। যে বই সরে সে বই আর ফেরে না।'

একে লাক্ষে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে স্বকাস্ত চলে এল তার নিজের ঘরে বইটা টেবিলের উপর রেখে পোশাক বদলাতে লাগল। চোখ রাখল নিরুপমা, শেষকা

না ভুলে যায়। ষাঁড় ফেলে ভাঁড় নিয়ে না বেরিয়ে পড়ে। একবার একটা দশ টাকার নাট এমনি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রেখে কী কেলেকারি, কোন বই আর মনে করতে না। বই সরে গেলে আর ফেরে না, যে নিয়েছে দশ টাকা বেশি নিয়েছে। বোঝা তো নিয়েইছে, শাকের আঁটিটাও নিয়েছে।

সে ভুল যেন না হয়!

লুপ্তি ছেড়ে পরল ট্রাউজার্স, গেঞ্জির উপরে শার্ট। বইটা তুলে নিল। না, অটুট আছে চিঠি, উড়ে যায় নি অবাস্তব হয়ে। না, বাড়িতে বসে পড়বে না—পরে আরো এক শ সাতবার না হয় পড়বে যদি পড়ার, মত কিছু থাকে—প্রথমবার পড়বে নির্মল কটি নির্জনে। চিঠিটা বুকপকেটে রাখল। আর নিল ছুরিটা। অপারেশন করার ছুরি।

বইটা হাতে নিয়েই নামল নিচে। বাবা আঁচাচ্ছেন মানে মুখ আর দাঁত আলাদা রে ধুচ্ছেন, দেখতে পেলেন। বললেন, ‘কি, হয়ে গেল পড়া?’

‘একটা সেকশান একটু দেখে নিলাম—’

কোন সেকশান জিজ্ঞেস না করলে হয়। তাড়াতাড়ি বইটা রেখে কেটে পড়ছিল, মা ধরলেন : ‘পড়া-টড়া ছেড়ে এখন চললি কোথায়?’

‘একজন ছাত্রের কাছে যাচ্ছি প্রফেসরের নোট আনবার জন্তে।’ বেমালুম বললে সুকান্ত।

দোহাই গুরুকম ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিও না। খামটা যে পকেটের থেকে চ্যাড়া এ মার নজরে পড়লেই হয়েছে! অবশ্য পাশ কাটিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মার চোখে দন্দেহের সাপ মরবে না। সসর্প ঘরে কি বাস করা যায় শাস্তিতে?

তার চেয়ে চিঠিটাকে ভাঁজ করে ছোট করে নিলেই হত। ও বাবা, চিঠিটা তা হ’লে ভুমড়ে দাগি হয়ে যেত যে। যে দাগি তার কি আর দীপ্তি আছে?

‘ফিরতে দেরি করিস নে যেন।’ মা মনে করিয়ে দিল।

‘না, যাব আর আসব।’ সুকান্ত বাইরের রকে দাঁড়াল এক পা : ‘আর যদি দেরি হয় তোমরা খেয়ে নিও, বসে থেকো না।’

‘তার মানেই হচ্ছে’, বউদি টিপ্পনি কাটল : ‘ভাত নিয়ে বসে থাকবার লোক ঠিক রে দাও।’

‘মন্দ কি, পরীক্ষার পর স্বকুর এবার বিয়ে দিয়ে দি।’ বললে কাকিমা।

‘বিয়ে দি!’ মা উঠল ঝামটা দিয়ে : ‘বউ নিয়ে উঠবে তার ঘর কোথায়?’

কাকিমাও ধমুকে ছিলা চড়াল : ‘আমাকে বলছ তো? বেশ তো, তুমি বিয়ে ও, বউ আসবার আগের দিনই আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।’

‘আমি সেই কথা বললাম!’ মা ছুজু হুঁকল: ‘বউ-বরণের সময় তুই বাড়ি থাকবি না?’

‘নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠালে থাকতেও পারি বা—’ কাকিমা ছাড়বার পাজী নয়: ‘তবে কতদূরে ঘর পাই, কি রকম স্ববিধে-অস্ববিধে হয় কে জানে।’

ঠাণ্ডা লড়াই। বারুদ বিদীর্ণ হয় বুদ্ধি। তাড়াতাড়ি বাড়ি ছেড়ে পথে বেরুন স্বকান্ত। অনেক ভিড়, অনেক গাড়ি-লরি, ট্রাম-বাস, রিকশা-ট্যাক্সি, হ্যানো-ত্যানো, ঠেলাঠুলি-ঝুলাঝুলি, অনেক গিজগিজ-গমগম—সব পেরিয়ে এগুতে লাগল ফাঁকায়-ফাঁকায়। হাঁটাপথে জায়গায়-জায়গায় অনেক নিরিবিলি, ঐ গাড়িবারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে অনায়াসে পড়ে নেওয়া যায়। কিংবা ঐ বিজ্ঞাপনের বাক্সটার আড়ালে।

কী যে মাহুষের কথা! এ কি একটা খবর যে এক ঢোঁকে গিলে নেবে? মাথা উচু করে এক চমক দেখে নেবে কী হচ্ছে ভিড়ের মধ্যে? এ কি শুধু চিঠি পড়া? এ একজনকে পাশে নিয়ে বসা। তাই মাঠ বা ছায়া বা একটি জলের ধার পেলে ভালো হত। সুন্দর সবুজ ঘাস, নয়তো ঝিলিমিলি-ছায়া গাছ, নয়তো ঝিকিঝিকি-আলো জল।

কিংবা কে জানে ডাক্তারের নির্জন চেম্বার আর একাকিনী কুগিলী।

আরো খানিকদূর এগিয়ে একটা পার্কে ঢুকল স্বকান্ত। এখন আর লোক কোথায়! ঝোপের কোলে একটা বেঞ্চি বেছে নিয়ে বসল সন্তর্পণে। চারদিকে চেয়ে দেখল ধারে-পারে কেউ কোথাও নেই। এ যেন কাকে ও একটু আদর করবে। অস্ত্রে না দেখে, অস্ত্রের চোখে পড়ে আদর না তার কদর হারায়।

চিঠিটা বার করল পকেট থেকে। খুলে ফেললেই তো খোলসা। এক শক্তিশেলেই লক্ষণপতন। প্রতীক্ষার রথ ভেঙে পড়া। আশার বাসা ছাড়া। স্বপ্নের মহাপ্রয়াণ।

তবু খুলতে তো হবে। কগীর যন্ত্রণায় ডাক্তারের রোগ। পকেট থেকে ছুরি বার করল স্বকান্ত। কত বাঁধনেই যে বেঁধেছে। সর্বজ দড়ির দারোয়ানি। চুলে, বুকে, কোমরে—পায়ের ওপর হয়তো। সুন্দর নৈপুণ্যে শল্য প্রয়োগ করল স্বকান্ত। খামের মাখার দিকে ছুরি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে স্বজ্বরেখায় দীর্ঘ করতে লাগল। একটুকু কোথাও এবড়োখেবড়ো না হয়, শাদা একটি স্রতোর মত পরিচ্ছন্ন ধার থাকে তারই জন্তে ধারালো মনোযোগ।

আবরণ সরে গেছে, দু আঙুলে আলতো করে বায় করল চিঠিটা। ধীরে-ধীরে মেলে ধরল পায়ের দিক—ইতিতে কী আছে দেখি। পরে মাখার দিক, সন্ধ্যা

দেখব। ইতিতে কাকলী। ঈ-কার দিয়ে লিখেছে। হৃদয়দীর্ঘ ছেড়ে দিয়ে প্রায় ইউরেকা বলে চোঁচিয়ে ওঠবার মত। কিন্তু সম্বোধন? সপ্তমীর বহুবচনওয়াল গালভরা কিছু একটা থাকবে নির্ধাত—তা কাকলির দোষ কী, বাঙলা ভাষার কার্পণ্য। প্রীতিভাজনেয়। ঠিকানা? ঠিকানাটা দিয়েছে তো? আঃ, যেন হার্ডল রেসের সব বেড়া ডিঙিয়ে এসে শেষ বেড়ায় পড়তে পড়তে লাফিয়ে গিয়ে ফার্স্ট হওয়া। দিয়েছে, বেশ বিস্তীর্ণ ভাবেই দিয়েছে। দেশ, কাল, সম্বন্ধ ঠিকই আছে, এখন বস্তু কী? বক্তব্য কী?

কিছু না। পরীক্ষার আগে ক্লাশ ভেঙে গিয়েছে, ছোট-ছোট ক্লাশ এখনো হচ্ছে, কিন্তু কাকলি যেতে পাচ্ছে না। তার বাবা বলছেন, যা পড়েছ তাতেই হবে। কিন্তু আপনি বলুন, যা দিয়ে কি তা হয়?

আপনি নিশ্চয়ই যাচ্ছেন। যদি কিছু দরকারি হতে পারে বলে মনে করেন চিঠি লিখে জানাবেন দয়া করে। বাড়ি ভীষণ প্রাচীনপন্থী, কিন্তু চিঠির উপরে স্বাধীনতা আছে এই যা সোয়াস্তি।

তারপরে শেষদিকটাতেই অশেষ।

কি, ভালোবাসা জানিয়েছে? দূর! অগ্নি কিছু? আঘাতে গল্প! তবে, প্রীতি-শুভেচ্ছা? গাঁজার কলকে। তবে, শ্রদ্ধা? গলায় দড়ি।

তবে কী!

লিখেছে: ‘আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?’

আমি ভালো আছি—এ কেউ লেখে? স্বস্তরবাড়ি থেকে মেয়ে বাপকে লেখে, নয়তো প্রবাসী স্বামী স্ত্রীকে সাস্থনা দিতে। কি রকম শাদাসিধে বোকাসোকা মেয়েটা। মনে-মুখে ভালো-ভালো গন্ধ। আর, আপনি কেমন আছেন? এ আবার একটা প্রশ্ন? সাধু, সরল, বিশ্বাসী—ভাবখানা এই, যেহেতু উনি ভালো আছেন সেহেতু আমিও ভালো থাকব এইটেই স্তনতে চায়।

আসলে আপনিটা আর্ষ প্রয়োগ। আপনি কেমন আছেন না, তুমি কেমন আছ? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছ—এ কথার কোনো মানে নেই। ওটা কোনো বিবৃতি নয়, প্রশ্ন নয়—ও হচ্ছে শাস্ত্রত একটা শ্লোকের দুটি ঘনিষ্ঠ চরণ। স্বধা-সমুদ্রের পাশাপাশি দুটি চোঁউ।

শুধু এতেই খুশি?

না, তারপরে আরো একটু আছে।

একটি ‘তারপর’ আছে।

মানে ?

পড়ছি, পড়ে শোনাচ্ছি। স্বকাস্ত আবার পড়ল : ‘আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ? তারপর— ? ইতি কাকলী’

তারপর ? তারপর ?

লাফিয়ে উঠল স্বকাস্ত। গাছপালা ঘাস-ফুল পর-ঘর লোকজন সবাই জ্বর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল—তারপর ? একটি অনন্তকালের প্রশ্ন জড়ে প্রাণে মনে সর্বত্র সর্বদা ছলতে লাগল চোখের উপর : তারপর ? তারপর ?

এক কবি লিখেছিল কে যেন রোদ হয়ে গিয়েছে। তখন কথাটা বোঝে নি স্বকাস্ত। আজ মনে হল সে যেন সত্যি রোদ হয়ে গিয়েছে, আলো হয়ে গিয়েছে, তারপর হয়ে গিয়েছে।

ঈশ্বরের স্রষ্টা কে ? ঈশ্বর। তার স্রষ্টা কে ? ঈশ্বর। যদি শেষ স্রষ্টা কল্পনা করতে পারো সেই ঈশ্বর।

তার পরের পরে কী ? তার পরে ? তার পরে ? তার পরের শেষ সংহর্তা তারপর। ঈশ্বরের জন্ম নেই। তারপরের মৃত্যু নেই।

এখন যাই কোথায় ?

একবার দীপঙ্করের কাছে যাই।

পকেট ফাঁকা মাঠ, হেঁটেই যাই। হাটতেই ভালো লাগছে। দিবারাত্র কত নাশিষ করেছে ঘরে-পরে, ভালো লাগে না। এই মেয়েলি কান্নাই তো জীবনের নিশ্বাসবায়ু হয়ে আছে, কিন্তু, আশ্চর্য, এখন যেন অভাব বলে কিছু নেই, অভিযোগও দেশান্তরী। এই রোদ এই পথ এই চলবার ইচ্ছে, চলতে পারার শক্তি, এই অনেকানেক। দীপঙ্করও তাই বলে। বলে, চাকরি-বাকরি নেই, ধারে-ভারে দুঃখে-কষ্টে আছি, তবু এত সন্তোষে নিজেকে অসুখী বলে ভাবতে লজ্জা করে। একেক সময় মনে হয়, আমি তো রাজা। কখন জানিস ?

‘যখন কবিতা লিখি।’

‘সত্যি ?’

‘একটা গোটা রাত কেটে যায় কখনো। একটা কবিতাকে মেলতে-ঢালতে সাজাতে-গোজাতে, ভাঙতে-চুরতে। সে যে কী সুখ কাকে বোঝাই। ভাবি, কত লোকের এ আনন্দে অধিকার নেই। কত লোক কবিতা পড়ে একটুও রোমাঞ্চিত হতে জানে না, এক আকাশ তারা বা এক মাঠ মানুষ কোনোই অর্থ আনে না তাদের কাছে। ভাবি, ওদের চেয়ে আমার পাল্লা কি ভারি নয় ওজন ? আমার এই

ঘোষবার মত মন বোষবার মত মন এ কি আমার একটা সম্পদ নয় ? না-এর মধ্যেও কি ইয়া নেই ?’

‘সাধে কি আর তোকে কবি বলি ?’

‘কিন্তু যখন চাকরি পাব, প্রাচুর্যের ঘরে আসব, তখন কে জানে এই মন থাকবে কিনা, এতখানি থাকবে কিনা। তখন কে জানে, নরুন পাব নাক খোয়াব। কত লোক জানি আরাম পেয়ে অভিরামকে হারিয়েছে। স্থূল পেয়ে সূক্ষ্মকে। স্বী পেয়ে প্রেয়সীকে।’

‘তবু দরকার তো উদর আর স্ত্রী আর টাকা—’

‘এক শ বার দরকার। শুধু দরকার নয় ফুল আর তারা, প্রেম আর স্ত্রী, ধর্ম আর কবিতা—’

‘আমরা তোমাকে এমন স্টেট দেব যেখানে তুমি আরামে থাকবে আর কবিতা লিখবে।’

‘কে জানে স্বচ্ছন্দে থাকলে ছন্দ বাজবে কিনা। যন্ত্রণা না থাকলে হবে কিনা সৃষ্টি। আর যদি সংগ্রামই না থাকে থাকবে কিনা ভালোবাসা !’

‘কী বলছ তুমি ? সংগ্রাম তো ঘৃণায়, আক্রোশে।’

‘না, যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ঘৃণা নয়, ক্রোধ নয় ; যাদের জন্তে সংগ্রাম করছি তাদের প্রতি ভালোবাসা। এই ভালোবাসা কাজ করছে না বলেই কিছু হচ্ছে না।’

তাই ভালোবাসি বলো, জীবনকে ভালোবাসি। কোনো কিছু কেটে-ছেঁটে নয়, বাদ-সাদ দিয়ে নয়, না মাথার দিকে, না পায়ের দিকে। বিরাটের বার্তাবহ মাছুষ, তার পা পাতালে, মাথা আকাশে।

আজ যদি এসব কথা বলে দীপঙ্কর, তবে স্বকান্ত বলবে, ‘তারপর ?’

তাকে স্তব্ধ করে দেবে।

‘দীপঙ্কর কোথায় ?’ ঘর খালি দেখে থমকে দাঁড়াল স্বকান্ত।

‘আপিসে। চাকরি পেয়েছে যে।’ মেসের বাসিন্দে একজন বললে।

‘চাকরি পেয়েছে ?’ উৎফুল্ল হল স্বকান্ত : ‘কোথায় ?’

‘ধীরেন এও সনসে।’

‘ও, আমাদের বরেনদের ফার্মে।’ এ যেন আরো খুশির খবর।

কিন্তু—তারপর ?

বুকপকেট থেকে চিঠিটা আবার বার করল স্বকান্ত। একটা একসারসাইজ

খাতার মাঝখান থেকে ভল পৃষ্ঠার আন্ত পাতা ছিঁড়ে প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে দ্বিতীয়টা শালা রেখেছে। তবে, তারপরে কি শৃঙ্খতা, স্তব্ধতা, নিশ্চিন্ততা ?

তবুও থেকে যাচ্ছে প্রশ্ন। তারপর ?

•৪

সকলের আগে যাবে আর সকলের শেষে ফিরবে, এই ছিল ভূপেনের গুরু-মন্ত্র : আর কখনো হাকিমের সঙ্গে ঝগড়া করবে না। তোমার আইন না-জানা থাকলেও চলবে, হাকিমকে জানো, লোকচরিত্রে ব্যুৎপন্ন হও। হাকিম যদি ত্যাগী হয় তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শিথিয়ে-পড়িয়ে নাও, আর যদি তুথোড় হয় তুমি বোকা সাজো। নইলে তুমি কিসের উকিল ? কিসের তোমার কথাবেচা পেশা ? কিসের তবে তোমার তুচ্ছতাক, উচাটন-বশীকরণ ? যেমন তরবার তেমন দরবার। যে ব্রতে যে কথা। শনিপুজোয় নারকেল, হরির লুটে বাতাসা, সত্যনারায়ণে সিরি। হাকিম যদি স্তম্ভ হয়, যদি সাত চড়েও রা না কাড়ে তা হলেই গেছ। যদি শতং লিখ মা বদ এই মন্ত্র ধরে, বলে, বলব না, শুধু লিখব তা হলেই কঠিন। তখন তাকে তোয়াজ করা, যা করে পারো কথা কওয়াও। যে বউ হাসে না কাঁদে না কথা কয় না তাকে নিয়ে ঘর করবে কি করে ? তবে তুমি উকিল, তোমার অসাধ্য বলতে কিছু নেই, হয় তুমি তাকে হাসাও, নয় রাগাও, নয়তো পিছনে লেগে তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ো। বোবার শত্রু নেই ভেবেছ, কিন্তু উকিল কার মিত্র নয়, এমন-কি নিজের মকেলেরও নয়।

‘এত সকালে যাচ্ছ কি, কোর্টে গিয়ে ঝাঁট দেবে নাকি ?’ শৃণালিনী গোড়ায় গোড়ায় বিজ্রপ করত : ‘এখন তো লাইব্রেরিও খোলে নি।’

‘উকিলের লাইব্রেরি কি ঘর নাকি ? উকিলের লাইব্রেরি তো সমস্ত বটতলা।’

‘বটতলা ?’

‘ভুলসংসারে এমন কোনো আদালত পাবে যেখানে বটগাছ নেই ? বটতলার বই কথাটা চলেছে স্তনতে পাই, কেন চলেছে জানি না। আসলে কথাটা হবে বটতলার বউ, মানে উকিলের স্ত্রী—’

এমনি সকাল সকাল গিয়েই এক মকেল গাঁথেছিল ভূপেন। কে একটা লোক দূর মফস্বল থেকে এসেছে বোধ হয়, ফ্যাফ্যা করে ঘুরছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে

ভ্যালভ্যাল করে। ভূপেনের খপ্পরে পড়ে গেল। ভূপেন তাকে একটাও মিথ্যা কথা বলল না, একটুও বাকভাঙ্গা মায়ল না, ভুল পথ বা ঘুর পথ দেখাল না—ফেলল না খরচের নর্দমার মধ্যে—মোলায়েম কথায় তার বিশ্বাস জন্মিয়ে সফল পাকা করে নিল। পরে দেখা গেল শাঁসালো মজ্জল—ক্ষীরের বাটি—হাত লাগাতে না লাগাতেই ভূবে যায় কজ্জি পর্যন্ত।

‘আশেপাশের সমস্ত বাবুবা কখন সঙ্গে হতে না হতেই ফিরে আসে। তোমারই আর দেখা নেই।’ মুণালিনীর এ আরেক অভিযোগ।

‘ওদের আপিস, আমার আদালত। কর্তব্য শেষ হয় ধর্তব্য শেষ হয় না, মানে কখন কাকে ধরা যাবে কেউ বলতে পারে না।’

তেমনি সন্দের দিকে বেশ খানিকক্ষণ বসে ভূপেন ধরেছিল আরেক মজ্জল। হাকিমরা চলে যায় বটে, কিন্তু আমলারা থাকে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকে, সরকারি আলো জালিয়ে কাজ করে। আর যতক্ষণ আমলা ততক্ষণ হামলা। এ নথি ঘাঁটো ও নথি হাটকাও। এর থেকে চোরাই নকল নাও, ওর থেকে সিল খুলে দলিল দেখ। ঘুষ দেওয়া অপরাধ হতে পারে, কিন্তু ধুলো দেওয়া তো অপরাধ নয়। অনেকে আছে হাত পেতে ঘুষ নেবে না, কিন্তু চোখ পেতে ধুলো নেবে না এমন চোখ কার। স্বয়ং বটবৃক্ষকেই ধুলো দিতে পারো এ তো ভূগণ্ডায়। আর ধুলো দিয়ে দলিল সরাও, কাটাকুটি করো, তোলাপাঠ মারো কিংবা টিপটাপ ধেবড়ে দাও। আর এই সব কৌশলের কার্তিক, যে যাই বলো, উকিলই। আমলার ঘরও যদি বন্ধ হয়, আছে খাবারের দোকান, পানের দোকান, অবশেষে বারান্দা। উকিলের সেরেস্তা ট্রামস্টপ পর্যন্ত প্রসারিত।

তেমনি একদিন অনেকক্ষণ থেকে, শেষ পর্যন্ত থেকে, এক সাহেব ধরেছিল ভূপেন। রেল কোম্পানির সাহেব।

আসতে আসতে দেরি করে ফেলেছে। বিদেশী মাছুষ, কায়দাকাহুন কিছু জানে না, জানে না অঙ্কিসঙ্কি, চারদিক কালো দেখছে। তার মধ্যে আরেক কালো, কালোর কালো দেখে উৎফুল্ল হল।

হালো ব্ল্যাক—হাত তুলে ভূপেনকে ডাকল সাহেব।

ভূপেন বুঝল, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো নয়, ব্ল্যাক মানে এখানে কালো কোট।

এত বড় সম্মান তাকে আর কে দিয়েছে? এতখানি আদান!

সাহেব জিজ্ঞেস করলে, তুমি উকিল?

হ্যাঁ।

সিভিল না ক্রিমিনাল ?

চেহারায নিঃসন্দেহ সিভিল, চরিত্রে কিরূপ, মাথা চুলকে ভূপেন বললে, তুমি বলবে।

আমাকে উপশম দিতে পারো ?

উকিল উপশম করতে জন্মায় নি। তবে আইন যতদূর সিঁড়ি ফেলে রেখেছে ততদূর নিয়ে যেতে পারে উকিল—এই পর্যন্ত।

ভূপেনকে ভালো লাগল সাহেবের। ভূপেনের জুটল আরেক কাঁকুড়ের খেত।

কয়েকটা বছর নথিতে নাক ডুবিয়ে প্র্যাকটিস করেছিল ভূপেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তার কেমন বেহুসরো লাগতে লাগল। সে দেখল সত্যের স্থান খুবই সংকীর্ণ আদালতে—শুধু স্থান কেন, সম্মানও। যার মামলা নিরাবরণ সত্য তাকেও মিথ্যের গয়না পরাতে হয়—গয়না না-পরা থাকলে কোনো মামলাই পাবে না ছাড়পত্র। আর যার মামলা ডাছা মিথ্যা, নির্বনেদ, বক্যাপুঞ্জের মত বানানো, সে শুধু টাকার জোরে, সাক্ষীর জোরে, উকিল-ব্যারিস্টারের চোপার জোরে ঠিক জিতে নেবে মামলা। পর-পর কটা মিথ্যে মামলা জিতে হতাশ হয়ে গেল ভূপেন।

জিতবে না কেন ? আইনকে যেখানে ভাষায় বেঁধেছে, আর ভাষা যখন বহু ক্ষেত্রে প্রকাশের উপায় না হয়ে প্রকাশের বাধা, তখন সেখানে বিচার স্বল্পে চলে গিয়েছে, চলে গিয়েছে কমায়-সেমিকোলনে, শ্রেফ ভাষাতত্ত্বে। সত্য স্বল্প হতে জানে না, মিথ্যেরই স্বল্প হবার নৈপুণ্য। মাহুঘের সোজাসুজি বিচার নয়, আঁকিবুঁকি বিচার। বিচার ভাবগ্রাহী নয়, ভাষাগ্রাহী। তাই কারুকার্যের জয়, আঙ্গিকের জয়। বস্তুর জয় নয়, শিল্পের জয়। স্বাস্থ্যের জয় নয়, চাকচিক্যের জয়, পারিপাট্যের জয়। আর সে-ই হারবে যে গরিব, যে দুর্বল, যে মূর্খ। তবে আজকাল গরিবও জালসাজ, দুর্বলও দুষ্ট আর যে মূর্খ সে আসলে দুর্ঘোষনের মাতুল।

যতই এগুতে লাগল ততই বিতৃষ্ণা ধরল ভূপেনের। এফিডেভিট, যাকে গাঁয়ের লোকেরা বলে এপিঠ-ওপিঠ, এপিঠ-ওপিঠই মিথ্যে। উপায় কি, একটা সাক্ষীরও পুরো সত্য কথা বলার স্বাধীনতা নেই। মামলার যেভাবে স্বরলিপি করা হয়েছে সেভাবেই তাকে তাল মান রেখে গাইতে হবে। স্বাধীন স্বর দিয়েছ কি মামলা ফাল্গুস হয়ে গেছে। হলফ দেওয়া কেন ? সত্যের পাকা গোঁফে মিথ্যের কলপ দেওয়ার জন্তে।

‘আইন যদি এ চালাকি করতে দেয় আপনি করবেন না কেন ?’ সহযোগীরা কেউ বলে : ‘আমরা তো আইনেরই খিদমৎ করতে এসেছি।’

‘মাহুষের জন্তে আইন, আইনের জন্তে মাহুষ নয়।’ ভূপেন বলে : ‘চালাকির জ্বরে আরেকজনের শ্রাঘ্য দাবি ভঙুল হয়ে যাবে তাতে আমি নেই।’

এ উকিলের পসার হয় কি করে ?

‘আপনি তো দোষ করেছেন, গিলটি প্লিড করুন, দোষ স্বীকার করুন।’

‘বা, আমি বাঁচবার চেষ্টা করব না ?’

‘তার মানে আইনকে কলা দেখাবেন ?’

‘দেখালামই বা। আইন যদি কলা দেখাবার জন্তে বাজার বসায় আমি ছাড়ি কেন ? আমার কলাই যে পণ্য।’

‘ওসবের মধ্যে আমি নেই।’ ভূপেন কাঠখোঁট্টা : ‘মিথো ডিফেন্স আমি নিতে পারব না।’

‘কিন্তু ও পক্ষের তো প্রমাণ করতে হবে। সেইখানে আপনি লড়ুন। ওদের প্রমাণের পাহাড়ে চিড় ধরিয়ে দিন।’

‘অত শত আমি বুঝি না। দোষ করেছেন যখন, তখন পকুন হাতকড়া। নয়তো অস্ত্র উকিল দেখুন।’ ভূপেন মুখ ফেরাল।

‘আপনি আমাকে, ব্যক্তিটাকে দেখছেন কেন ? আপনি মক্কেলকে দেখুন। আইনের ফল বিচার, অবস্থার ফল মক্কেল। বিশেষ অবস্থায় পড়ে মক্কেল যদি অনাচার কিছু করে থাকে তবে তার পক্ষে বলবার বা ধরবার কিছুই থাকবে না ? সে নিজের থেকে গলা বাড়িয়ে কোপ নেবে ?’

‘না, কোপ নেবে কেন ? গলা বাড়িয়ে মালা নেবে। রেপ কেসের আসামী, তাকে গলায় ফুলের মালা দেবে। নিয়ে যাবে মিছিল করে।’

ক্রমে ক্রমে প্র্যাকটিস আরো পড়ে গেল ভূপেনের। সংসারে দেখা দিল অনটন। পেণ্টালুন ছোট হতে শুরু করল। জলে গেল কালো কোট।

যেটা সত্যি-মামলা বুঝব সেটা নেব। তেমন আর কটা ? এ প্রায় শিশিরের আশায় চাষ করা। ভূপেনের যদিও সং উকিল বলে স্নানাম, সং মামলার ইনাম পাবার স্নানাম নেই। তা হারলে হারব, সত্য প্রতিষ্ঠা করতে লড়ছি এই আমার তৃপ্তি। কারু তৃপ্তি টাকায়, কারু তৃপ্তি সাধুতায়।

‘সাধু, সাধু হয়েছেন !’ ঝুণালিনী কত গল্পনা দিয়েছে। ‘সত্যপীর এসেছেন চেরাগ জ্বলে !’

উকিল উকিল, তার মধ্যে সাধু-অসাধু কি। টাকা টাকা, তার মধ্যে ভিত্তি-উপরি কি। প্রেম প্রেম, তার মধ্যে বৈধ-অবৈধ কি !

কোর্টে যাওয়া ছাড়ে নি ভূপেন। তার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে বই লেখা। গল্প-উপন্যাস নয়, গীতা-ভাগবতের ব্যাখ্যা-ভাষ্য নয়, লিখছে আইনের বই। স্ট্যান্স অ্যাক্ট, রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, কোর্ট-ফিজ অ্যাক্ট। সব বই-ই বাজারে চালু, নাম-দামও যথেষ্ট কিন্তু ঢালাঢালি টাকা কই? প্রকাশকরা ঠিকমত হিসেব দেয় না আর দিলেও বেশি ছাপিয়ে কম দেখায়।

হ্যাঁ, বিছাই তৃপ্তি; বিছাই সকল অভাবের ভরণপূরণ।

উন্নতির সৰু ভগায় এসে উঠলেও সকল উন্নতেরই যে বুদ্ধির ভগা সৰু নয় তাই তার বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ভূপেন। যারা নজির সৃষ্টি করছে তাদের নজর যে নিভুল নয়, বহু জায়গায় তাই প্রতিপন্ন হয়েছে। আর আজকাল হাকিমদের রায়ের কি ছিরি! না আছে রস না আছে গন্ধ। বলে আইনে আবার রস কি। আইন নীরস হোক, আইনে যে কাহিনীটি আছে তাকে দেখার গুণে লেখার গুণে সরস করা যায়। কাঠঠোকরা পর্যন্ত শুকনো কাঠের মধ্য থেকে চিনির বাসা আবিষ্কার করে।

বড় কর্তাদের অন্তর্দৃষ্টি আর শৈথিল্য শাসন করছেন, গুঁরটা করে কে। দিব্যরাজ গজগজ করে মৃণালিনী। তবু যদি বুঝতাম লিখেই, ঘর ভরা দূরে থাক, পেট ভরছে। টাকা এক দিক দিয়ে এলেই হয়, ঘোড়ায়, নয় তাসে, নয় বইয়ে। আর সে বই প্রসিদ্ধই হোক কি নিষিদ্ধই হোক। রোজগার দিয়ে কথা। হালালিতে না পারো হালালিতে। কাঁচি দিয়ে পকেট মেরে নয়তো কলম দিয়ে। এ জাতও গেল, পেটও ভরল না।

‘স্বকু!’ ডাক দিল ভূপেন।

শনিবারে জজকোর্ট খোলা থাকে কিন্তু মুংফরাক্কা মামলায় সেদিন তো সমস্ত আদালত বোঝাই। তিনটের মধ্যেই বাড়ি চলে আসে কে? বার-লাইব্রেরিতে দিবি ফরাশ আছে, গড়গড়া আছে, আড্ডা আছে, কেছা আছে, ওসব ছেড়েছুড়ে অসময়ে কে প্রত্যাবৃত্ত হয়! তারপর যা একথানা হাঁক দিয়েছেন, নিশ্চয়ই ফরমায়েশের হাঁক। কী বিপদে ফেলেন না জানি!

‘কেন?’ কাছে এসে দাঁড়াল স্বকান্ত।

‘শোন, একবার প্রেসে যাবি। এই অর্ডার প্রফগুলি দিয়ে আসবি। আর নতুন প্রফ যা হয়েছে নিয়ে আসবি। সাত ফর্ম পর্যন্ত ছাপা হয়েছে। যদি আরো কিছু ছাপা হয়ে গিয়ে থাকে নিয়ে আসবি ফাইল-কপি।’

‘এ কি বকম প্রেস!’ গলার কাছে বালি-বালি লাগতে লাগল স্বকান্তর: ‘ওদের লোক দেওয়া-নেওয়া করতে পারে না?’

‘তাই তো করে। তবে এ প্রকৃষ্ণলি ভারি জকরি। ওদের লোকের জন্তে বসে থাকলে ভীষণ দেরি হয়ে যাবে। বইটা খুব শিগ্গির বার করে দেওয়া দরকার।’

‘বা, আমার পড়া নেই?’

‘শুধু যাবি আর আসবি। কতকণের বা মামলা।’ একটু যেন অপরাধী শোনাল ভূপেন : ‘পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে ফেরা যাবে।’

‘তারপর ফেরবার সময় বাসন্তীকে একবার দেখে আসিস।’ বললে মৃণালিনী, ‘কাছেই তো বাড়ি। আর যদি আসতে চায়—’

‘নিয়ে আসিস—’ ভেঙে উঠল হুকান্ত।

বিজয়া এসেছে উপরে।

‘কি, তোমার জন্তে ক্ল্যাট কোথাও দেখে আসতে হবে?’ হুকান্ত মুখিয়ে উঠল।

‘না, তুমি যদি বলো তো তোমার সঙ্গে যাই। আমার বোনপোর ছেলেটার কি অস্ব্থ শুনেছি।’ বললে বিজয়া, ‘আমাকে সেখানে রেখে গ্রেসে যাবে আর ফেরবার সময় নিয়ে আসবে।’

‘তোমার বোনপো থাকে তো সেই কারবালায়। ভায়তবর্ষের বাইরে।’

‘না, না, বাসন্তী যদি আসতে চায় তা হলে বাস-এ ট্র্যামে দু-জনকে ও সামলাবে কি করে?’ বললে মৃণালিনী, ‘বাসন্তী এলে তার আঙাবাচ্চা কোন-না নিয়ে আসবে!’

‘কেন যে তোমাদের চলনদার লাগে কাকিয়া—’

‘ট্র্যাম-বাস লাগবে না। ট্যাক্সি নেবে।’ ঝলক দিল বিজয়া : ‘এপিঠ-ওপিঠ হু পিঠেরই না হয় ভাড়া দেব।’

বন্দনা বেরচ্ছে ঘর থেকে।

‘তোমার কিছু ফরমায়েশ?’ হুকান্ত তাকাল চোখ তুলে।

‘আমার কথা তুমি কত শোনো।’ মুখ ভার করল বন্দনা।

‘তোমার কথাটা দাদার কথা বলে এলে না শোনে সাধ্য কার।’

‘তোমার দাদা বলছিল—’

‘ঐ তো—’

‘তোমার দাদা বলছিল’, হাসতে-হাসতে গম্ভীর হল বন্দনা : ‘তোমার দাদা বলছিল, যদি ঠুর ওষুধটা একবার খোঁজ করো।’

‘কেউ পায় না খেতে, কেউ আবার পারে না হজম করতে।’ দার্শনিক হবার ভাব করল হুকান্ত : ‘শুধু খাবার হলেই চলে না, আবার হজম করবার ওষুধ চাই।’

‘তা তো বটেই।’ বন্দনা ঝোড়ন দিল : ‘শুধু পরীক্ষা পাশ করলেই চলে না, তারপর আবার চাকরি চাই।’

‘শুধু চাকরি পেলেই চলে না, মাসান্তে আবার মাইনে চাই। তুমি চটছ কেন?’ একটু মোলায়েম হল স্বকান্ত : ‘তুমিই বলো কখন খোঁজ করব গুপ্ত।’

‘তা জানি না—’ হলকা ছুটিয়ে চলে গেল বন্দনা।

‘কেন, প্রেসে যাবার পথেই না হয় খোঁজ করলি।’ মৃণালিনী বললে, ‘একটু আগে না হয় বেরো—’

‘একটা লোক আর সতেরো গুণ্ডা ফরমাশ।’ বিজয়ার দিকে তাকাল স্বকান্ত : ‘তাই তো বলি কাকিয়া, যদি শাস্তি চাও, একটা ফ্যাতেট নাও, নয়তো হোটেল গিয়ে ওঠো—’

‘অতশত কাজের বোঝা দিও না ওকে।’ ভূপেন হাঁক দিল : ‘আমার প্রফ ঠিক আনা চাই।’

নিজের ঘরে ফিরে এল স্বকান্ত। এরা কী জানে কত কী কাণ্ড হয়ে গেছে এর মধ্যে এই তারপরের পৃথিবীতে। আজ কি সমস্ত দুপুরটা পথে-পার্কের ঘুরে ঘুরে এখানে-ওখানে ছোটখাট আড্ডা দিয়ে চলন্ত মাহুষের মুখ দেখে-দেখে কাটাবার মতন নয়? কাকলি যেহেতু ছটার সময় দেখা করতে বলেছে, ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে পাঁচটার সময়ই সে বেরুবে ঠিক করেছিল। এমন লয়কেও সে আনতে চেয়েছিল হিসেবের মধ্যে, বাঁধতে চেয়েছিল ঘড়িঘণ্টায়? বেশ হয়েছে। কাজলের ঘরে থাকা মানেই গায়ে কালি লাগানো। সংসারে বসবাস করা মানেই পাঁচজনের ফরমাশ খাটা।

কত জল চলে গেল গঙ্গায়। কত হাওয়া বয়ে গেল মাঠ দিয়ে। কত মেঘ ভেসে গেল আকাশে-আকাশে।

কত মুহূর্ত তার দিনরাত্রির সবুজে ঝরে পড়ল সোনার শিশিরের মত।

তারপর?

তারপরের পাপড়ি মেলতে-মেলতে এটুকু পর্যন্ত খুলেছে। এটুকু রঙ এটুকু রস এটুকু স্বগন্ধ।

‘তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করছে। বিপ্লবের চোখে নয়, বিনিহিতের চোখে নয়, আত্মীয়ের চোখে। আত্মীয় কথাটার মানে কমে গিয়েছে অভিধানে, তাই না?’

তোমাকে বাড়িতে ডাকি সাহস নেই। কিন্তু যদি ডাকতে পারতাম, ছাদে নিয়ে গিয়ে দেখাতো পারতাম দেয়াল-ঘেঁষা রাস্তার কদমগাছে কেমন স্বন্দর ফুল ফুটেছে। দেখেছ কদমফুল? ছুঁয়েছ? ধরেছ? শুঁকেছ?

তাই বলছি, ‘স্বাতী’ সিনেমার সামনে আগামী বুধবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে দেখা করতে এসো। আমি থাকব। এসো কিন্তু। কাকলী।’

পায়ের কদাকার কাবলিটার দিকে তাকাল স্বকান্ত, শ্রাওলটা আরো রোমহর্ষক। কে তাকাবে পায়ের দিকে? ধূতি আর শার্ট একেবারেই বিদখুটি। কে দেখবে ধূতি-শার্ট? আর পকেট তো গগন-ললাট। কে উকি মারবে পকেটে?

স্বকান্তর কত হুশিয়ারি কত ক্লেশ। পড়ে কিছুই মনে থাকছে না, রাত জাগতে পারছে না। কী খাতা না জানি রেখে আসে সে পরীক্ষায়। টিউশানি ছেড়ে দিয়েছে, দাড়ি কামাবার তুচ্ছ যে স্নেহ তাও ঠিক দিনে কিনতে পাচ্ছে না। তবু, এত সব সন্তোষ, তার স্বথ কেন? তার তো এখন দেয়ালে মাথা কোটা উচিত, যাতে পরীক্ষাটা মানে-মানে উত্তরে যায়, যাতে একটা চলনসই চাকরি হয়, মার মেজাজটা একটু বশে আসে, বাবা একটু ছেলে নিয়ে গর্ব করতে পারেন, দাদাকে খাটতে না হয় ওভারটাইম, বউদি নিজেকে একটু কম হুঁখী বলে মনে করে, কাকিমার অহংকারটা একটু নরম হয়, সুবীরের একটা মাস্টার জোটে আর বাসস্তীর নিষাতন-নিবারণের পথ মেলে— তার কত সমস্তা, কত অভাব, কত দায়িত্ব, কত যত্না, কত সংগ্রামের ভূমিকা— তবু, তবু তার স্বথ কেন? এত কালো বর্ষায়ও আকাশ আবার নীল কেন? কেন না চাইলেও স্বথ আসে? এত এত স্বথ। কেন স্বথকে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না? কেন বলা যায় না, আমি সংগ্রামী, আমার সময় নেই, তুমি চলে যাও? বললেও যায় না কেন? মাটি চায় না তবু কেন আসে বজা? মরাকার চায় না তবু কেন মঞ্জরীরঞ্জন?

‘শোন, সন্তেরো-আঠারো এ ছুটোর অর্ডার গেল।’ ভূপেন বলছে যখন স্বকান্ত বেরুচ্ছে, ‘আর পরের গ্যালিগ্রাফ যেন মেক-আপ করে দেয়। উনিশ-কুড়ি যা দেয় নিয়ে আসবি। শোন, দেখে যা—’

তুমি কি এখনো গ্যালিগ্রাফ না মেক-আপ?

...৫.....

কিন্তু কোথায় নীলাকাশ ?

দেখতে দেখতে মেঘ করে এল পশ্চিমে। বাস-এর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল একবার স্বকান্ত। চোখ-জুড়ানো কিন্তু হৃদয়-জ্বালানো কালো। মনে হল যেমনি আছে তেমনি লেগে থাক আকাশে, চিত্রাঙ্গিতের মত। আর যেন না ছড়িয়ে পড়ে। যেন আর না জমাট বাঁধে।

বাস-এ একজন সোয়ারি তার পাশের বন্ধুকে বললে, ‘কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখেছিস ? এবার ঝরবে।’

ওদিক থেকে আরেকজন টিটকিরি দিয়ে উঠল : ‘তাকাবেন না মশাই। নজর দেবেন না।’

‘হ্যাঁ’, প্রথমোক্তর বন্ধু বললে, ‘নজর দিয়েছেন কি লক্ষ্যসরে গেছে নববধূ।’

স্বকান্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তার দৃষ্টির কি কোনো শক্তি আছে, সম্মোহনী কি উচাটনী ? সে কি ভ্রমলোচন ? তার চোখের দৃষ্টিতে মেঘ কি ভস্ম হয়ে যাবে ? চলে যাবে দূরান্তরে ?

কত মেঘ তো আসে আবার চলে যায়। এও যেমনি এসেছে তেমনি চলে যেতে পারে না ? একবেলা দেরি করে ঝরলে কলকাতা কী এমন অন্তরু হবে ?

‘ঝরুক মশাই ঝরুক। প্রাণ ভরে ঝরুক। হাড়মাস সেক্ষ হয়ে গেল।’

‘ফ্যানের হাওয়া খেতে খেতে বাত ধরে গেল শরীরে।’

‘কী ঘাম আর ঘামাচি রে বাবা। মশা-মাছি তো গা-সওয়া। এ রাম আর স্ত্রীবা একসঙ্গে। ঘাম আর ঘামাচি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।’

সবাই খুশি। তাই যে যার মনে টীকা-টিগুনী কাটছে।

প্রথমোক্ত বললে, ‘মাইরি যদি বৃষ্টি নামে তা হলে কাজটা হবে না। ঠিক বলবে বৃষ্টির জন্তে দেখছেন না বিজ্রিবাটার অবস্থা। মাইরি দেবে না টাকা।’

‘বা, তুই তো বৃষ্টির আগেই গিয়ে পড়বি।’

‘জানি না পারব কিনা পৌঁছতে যে রকম তোড়জোড় চালিয়েছে। বৃষ্টির আগে

পৌছুতে পারলেই বা কি। বলবে, দেখেই খন্দেরবা হাঁটা-চলা বন্ধ করে দিয়েছে।
মাইরি, সব ভুল হয়ে যাবে।’

‘তবু নামুক বৃষ্টি। সব ভুল হয়ে যাক।’

‘তোমার কী—’

‘কান্নরই কিছু না। আকাশের খেয়াল। বৃষ্টি হলে আমি মাইরি গান ধরব।’

‘আমি মশাই ভিজব গা খুলে।’

‘খুব তো উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তারপর যখন খানিক ঝরার পর রাস্তাঘাট এক হাঁটু
কি এক কোমর হবে, ট্রাম-বাস বন্ধ হবে, তখন কী করবেন?’ বললে আরেকজন।

‘হ্যাঁ, সে কথা কেউ ভেবে দেখে না।’ বলে ফেলল স্বকান্ত। ‘তখন কী?’

‘যে মুখে প্রশস্তি করেছি সেই মুখেই গালাগাল দেব।’

‘দোষ বৃষ্টির কী মশাই। দোষ করপোরেশনের।’

‘করপোরেশান নয় মশাই, পারকোরেশান। টালা থেকে টালি আর ট্যাংরা থেকে
খ্যাংরা এফোড়-ওফোড়

‘শহরে লহর খেলে।’

‘আহাহা, তবু আনন্দ। মাটি ঠাণ্ডা হোক। ঘাস-পাতা সবুজ হোক।’

‘বলুন না ব্যাঙ ডাকুক, সাপ বেরোক, পিপড়ের পাখা গজাক, বাদলা-পোকারা
করফর করুক।’

চাষারা আশা করে বসে আছে।’

‘তা চাষার মাঠেই বরুক না। কে বারণ করছে?’ বললে স্বকান্ত। ‘কলকাতা
যেখানে ঝরলেই সমুদ্র, সেখানে এ উৎপাত কেন?’

‘বেশ রাত্রে খেয়েদেয়ে ঘুমব, ঘুম আসবার আগমুহুর্তে বৃষ্টি নামবে, থামবে
ভোররাত্রে। উঠে দেখব রাস্তাঘাট জলে ভোবা। স্বপ্নের মত লাগবে।’

‘আপিস দেয়ি করে যাব।’

‘কিংবা যাবই না। বৃষ্টির অভূহাত দেব। বৃষ্টি কল্যাণকারিণী।’

‘আগে বৃষ্টি নেই বৃষ্টি নেই বলে হাহাকার, পরে বেশি বৃষ্টি বেশি বৃষ্টি বলে
অর্তনাদ।’

‘সব জিনিসেই তাই। আগে কাজী পরে পাজি।’

‘তারপরেই বজ্র।’ যার যা মনে আসছে বলে যাচ্ছে : ‘সব মুখস্থ মশাই। তার
পরেই বজ্রাঝাণ। উপশমের চেউ। তারপরেই ভোট। বজ্রাতে তাই কাক কাক
পিঠের পৌষমাস।’

‘তেমনি আগুনেও।’ বৃষ্টির সজ্জাবনায় সকলেই প্রায় প্রগল্ভ হয়ে উঠেছে। বললে আরেকজন : ‘আগুন লেগে বস্তি ছাই হয়ে গেল। তার পরেই নিয়ে এস খাণ্ড-বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম। তার পরেই ভোট।’

‘দুই লোকে বলে ভোট পাবার জন্তে নিজেই নাকি আগুন লাগিয়েছিল। যাতে উপশমে ভুলিয়ে ভোট-কুহুম তুলতে পারে।’

‘সব মুখস্থ মশাই, সব মুখস্থ। তারই জন্ত প্রতি বছরে বস্ত্র, প্রতি বছরেই ধন।’

কে একজন কবি-কবি ছিল, বলে উঠল, ‘নতুনত্বের মধ্যে শুধু এই নীল মেঘ।’

এক দল লোক বৃষ্টি চায়, আরেক দল লোক চায় না। বৃষ্টি আর না-বৃষ্টি কোনো দিকেই স্বকান্ত নেই। তার শুধু এক ইচ্ছে, ছোট্ট এক ইচ্ছে, কাকলির সঙ্গে দেখা হোক। বৃষ্টি হলে ও আসবে কি করে? ফিরবে কি করে? ওর বাড়ি ফিরে যাবার পর বৃষ্টি হোক, যত পারুক ঢালুক আকাশ। তার এক সমুদ্র স্নেহ ঢেলে দিক পৃথিবীর ক্ষয়ে। প্রলয় নামুক। কলকাতার ভঙ্গতার বেশটা ঝড়ের তাড়নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। যত ইচ্ছে তার নিজের কষ্ট হোক, অস্থবিধে হোক, অস্থ হোক, শুধু যেন লাক্ষ্যটা নির্বিন্দ হয়।

কত সামান্ত প্রার্থনা। স্বকান্ত তাকাল আকাশের দিকে। নির্বোধ নিহিত্র আকাশ। তার গুনতে তো ভারি মাথাব্যথা পড়েছে। কিন্তু কত সময় তো মেঘ শুধু জমাটই বেঁধে থাকে, বরষায় না। কত ব্যথা পুঞ্জিত হয়ে থাকে, বলা হয় না। কত ভাব সঞ্চিত হয়ে থাকে, লেখা হয় না। যত্নে কত তারের বন্ধনের পরেও আর বাজনা নেই, কারা নেই।

তার ক্ষুদ্র একটা অভিলাষকে ধুয়ে মুছে দেবার জন্তে নিষ্ঠুর ভাগ্য এক আকাশ অভিযানের আয়োজন করেছে। যে অল্পবল তারই উপর নিয়তির ক্রকুটি।

সেই মেয়ে-বাপের গল্পের কথা মনে পড়ল স্বকান্তর। বাপ মুম্বু, সেবাময় মেয়ে রাত-দিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে, বাবাকে নিও না, বাবা ছাড়া আমার কেউ নেই। কত কাঁদছে মেয়ে, কত মাথামুড় খুঁড়ছে, বাবাকে বাঁচাও। তবু কিছুতেই কিছু হল না, টলল না ভগবান। বাপ মারা গেল। স্বপ্নে মেয়েকে দর্শন দিল ভগবান। মেয়ে নানা কথা বলে ভগবানকে গল্পনা দিতে লাগল, নিষ্ঠুর, একচোখো, থামখেয়ালী ভগবান বললে, ‘আমি করি কি, আমি কার প্রার্থনা শুনি? তুমি বলছ, বাবাকে বাঁচাও, আর বাবা বলছে আমাকে নাও। আর সইতে পাচ্ছি না এ ভবদাহ। নিচুকলে জ্বলেছি আমাকে উচুকলে পুনর্জন্ম দাও। আমি কাকে লই, কাকে খুই?’

তেমনি কত লোক হয়তো প্রার্থনা করছে, আজ, এই লয়ে বৃষ্টি হোক। হয়তো

কেউ তার মনের মাহুষের থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, বৃষ্টির জন্তে আটকে গেল, সঙ্গী
দীর্ঘতর মনোহরতর করবার স্বযোগ পেল। তার প্রার্থনা শুনল অস্বরীক্ষ। হয়তো
কত কঙ্গী কষ্ট পাচ্ছে গরমে, বৃষ্টি তাদের আরাম দেবে, ঘুম দেবে। কত বিচ্ছিন্নকে
তাপভৃগু সান্ধিয়া দেবে। কত মনে পড়িয়ে দেবে জন্মান্তরের স্মৃতির কথা।

বৃষ্টি যারা চায় তাদেরই দল ভারি। আর, স্বকাস্ত দেখল তাদের প্রার্থনাই গ্রায্য।

বাস থেকে নেমেছে, অমনি ঝড় উঠল। সতর্ক-অসতর্ক সকলকে মুহূর্তে নাজেহাল
করবার জন্তে এসেছে উড়নচণ্ডী। এসেছে বেহিসেবী। ঝরাপাতা, ধুলো তো বটেই,
উড়তে লাগল টুপি, উড়তে লাগল ছাতা, দোকানের ঝাঁপ, চালের টিন, সাইনবোর্ড।
ভাঙতে লাগল গাছের ডাল, তছনছ তছনছ—

বাবা, এত মারণমূর্তি কেন? বৃষ্টি নামাও। শাস্ত হও প্রভঙ্কন।

কি আশ্চর্য, কখন স্বকাস্ত বৃষ্টির জন্তেই প্রার্থনা করে বসেছে। ঝড়ের প্রেক্ষিতে
বৃষ্টিই বুঝি কামনীয়। ছুটতে ছুটতে ভিজতে ভিজতে ঢুকে পড়ল সে
ছাপাখানায়।

‘দিন মশাই বাকি প্রফটা দিয়ে দিন।’ ম্যানেজারের সামনে টেবিলের উপর প্রফের
তাড়া রেখে মূর্তিমন্ত ঝড়ের মত দাঁড়াল স্বকাস্ত।

‘বসুন।’ বললে ম্যানেজার।

‘বসবার সময় নেই। দিন তাড়াতাড়ি।’

কথাবার্তা বলে ম্যানেজার বুঝল, কিসের প্রফ কী বৃত্তান্ত—

‘না বসে উপায় কী। এত বৃষ্টিতে যাবেন কোথায়? বৃষ্টিটা ধরবে তবে তো
যাবেন।’

নিরুপায়। চেয়ার টেনে বসল স্বকাস্ত। বৃষ্টি হচ্ছে, যেন গলানো সিলে ঢেলে
দিচ্ছে। হাতঘড়ি নেই, স্বকাস্ত জিজ্ঞেস করলে, ‘কটা বেজেছে বলতে পারেন?’

প্রশ্ন নিরর্থক। সামনে দেয়ালেই ঘড়ি। তাকিয়ে দেখল পাঁচটা দশ।

আধ ঘণ্টা বসে যায় বোধ হয়। এখান থেকে স্বাতী সিনেমায় আধ ঘণ্টায় যাওয়া
যাবে। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যে রাস্তার কী অবস্থা হবে কে জানে। সঙ্গে একটা
ছাতা নেই যে, মাথা ঢেকে চলে যাবে হাঁটু ডুবিয়ে। এদিকে বাস-ট্রাম কোথায়?
থাকলেও হয় মরছে, নয় নাস্তিখাস উঠেছে। একটা রিকশা লাগবে, কী বাস্তব
তাড়া চায় তা কে জানে। অত পরসা কোথায় পাবে? সবচেয়ে অনিশ্চিত, রিকশা
পাবে কিনা।

‘দিন না, দয়া করে বাকি প্রফটা তুলে দিন না—’

‘দিচ্ছি—ওরে—’ ডাক ছাড়ল ম্যানেজার। তারপর স্বকান্তকে লক্ষ্য করে বললে,
‘অত তাড়া কিসের? এই অঝোর বৃষ্টিতে যাবেন কি করে?’

‘যেতেই হবে। আমার একটি ছাত্রীর মরণাপন্ন অস্থখ।’ বলে ফেলল স্বকান্ত।

‘খুব খারাপ অবস্থা? থাকে কোথায়?’

‘এই কাছাকাছি।’ বলে ফেলল স্বকান্ত।

সমস্ত পাড়া নথদর্পণে, জিজ্ঞেস করলে ম্যানেজার, ‘কোন বাড়ি?’

‘নম্বরটম্বর জানি না।’

‘কায় বাড়ি?’

‘তাও না। শুধু এইটুকু জানি মেয়েটির নাম আশা। ডাক-নাম আশা, পোশাকি নাম প্রতীকা। আমার অদর্শনে তার যদি আজ মৃত্যু হয়—’

স্বরাশ্রিত হল ম্যানেজার। ভিতরে নিজেই গেল খোঁজ নিতে। ফিরে এসে বললে, ‘আধ ঘণ্টাটাক দেরি হবে। তা এক কাজ করুন না। আপনি চলে যান। প্রফ কাল পাঠিয়ে দেব।’

‘না, আমি যে এসেছি তার প্রফ দেখাতে হবে বাবাকে।’

‘তা হলে একটু না বসলে তো চলে না।’ অপরাধীর মত মুখ করল ম্যানেজার।

‘বসছি। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে ধরে যেতে পারে বৃষ্টি, কি বলেন?’

বৃষ্টি-ধরার নাম নেই। অচ্ছিন্ন ঝরে চলেছে।

ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই তুলে দিল প্রফ।

‘যাবেন যে, প্রফ সব ভিজে যাবে।’ বললে ম্যানেজার।

‘প্রফ ভিজলে কী হয়? তবু প্রমাণ গরম থাকবে। প্রমাণ ভিজে গেলেই মুশকিল।’

‘যাবেন কী করে? একটা রিকশা ভেকে দি।’ দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিল ম্যানেজার। বললে, ‘বলবে ভীষণ জরুরি। একজন কণী মরতে চলেছে—’

কোথায় দারোয়ান! কোথায় রিকশা! পৌনে ছটা প্রায় হল।

আর কি, নিজেই বসে বসে এখন প্রফ দেখি। ভাবল স্বকান্ত। ‘ম’-কে কেটে দস্ত্য ‘স’ করি। প্রেমকে কেটে প্রেস করি।

এসেছে রিকশা। কিছু দরদস্তর না করেই উঠে পড়ল স্বকান্ত। ঘেরাটোপের মধ্যে বন্ধ হল।

রিকশাওলা জিজ্ঞেস করলে, ‘কোথায় যাবেন?’

‘স্বাতী সিনেমা।’

‘হু টাকা লাগবে !’

এ কী জুলুমবাজি ! এমনতে পাঁচ আনা ছ আনা বড় জোর। আজ মোঁকা পেয়েই হামলাদার হয়ে উঠেছে।

‘বলুন হু টাকা দেবেন কিনা। নয়তো নেমে যান। কিংবা বলুন আমি গাড়ি ছেড়ে দিই। কি রকম জল !’

ঝগড়া-বচসা করে লাভ নেই। পকেটে হুড়িয়ে-জড়িয়ে দুটো টাকাই হয়তো আছে। নে, চল, তাই দেব।

ঝপঝপ ঝপঝপ চলেছে রিকশা। উপরে সমুদ্র নিচে সমুদ্র, মাঝখানে ডুবুডুবু পানসি।

কোথায় চলেছে কে জানে। সমস্ত অবাস্তব মনে হচ্ছে স্বকাস্তব, সমস্ত বিদেশ। যেন শহর-পসার নয়, পাখর-দেয়াল নয়, অনাস্তব জল। জলের মকড়ুমি।

গাড়িবারান্দার নিচে কতগুলি লোক দাঁড়িয়ে ছিল ভিড় করে, তার মধ্য থেকে একটা লোক সোজা রিকশার দিকে ধাওয়া করলে।

‘আমি দেখেছি রিকশায় শুধু একজন আছেন।’ লোকটা বললে আকুল হয়ে, ‘আমাকে দয়া করে তুলে নিন মশাই। ভীষণ জরুরি।’

সত্যি হয়তো কেউ মরতে বলেছে।

প্রায় জোর করে রিকশা নামিয়ে তার মধ্যা ঢুকে পড়ল আগন্তুক।

গাইগুঁই করে লাভ নেই। স্বকাস্ত বললে, ‘কদ্দুর যাবেন?’

‘ঐ বাজার পর্যন্ত। ভয় নেই আপনার ভাড়ার শেয়ার দেব। আপনি কোথায়?’

‘স্বাতী সিনেমা।’

‘বই দেখতে? কী হচ্ছে ওখানে?’ এক মুহূর্ত চিন্তা করল আগন্তুক। বললে, ‘হ্যাঁ, হাওয়া-দিয়ে-যাই। বইয়ের শেষটা মাইরি—কী প্যাথেটিক! মাঠ দিয়ে নায়িকা মাইলখানেক প্রায় ছুটেছে, মাঠ পেরিয়ে এসে পলকে নায়কের বৃকের উপর—ধ্বস—’

রিকশাটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল হোঁচট খেয়ে। সামলেছে।

‘কত ভাড়া হয়েছে?’

‘হু টাকা।’

‘বেশ, এক টাকা আমি দেব। আমাকে বাজারে নামিয়ে দিয়েই আপনি চলে যাবেন স্বাতীতে। ছটার শো আরম্ভ। তা ছটা এখন বেজে গেছে। তা আজ-বাজেতে আধ ঘণ্টা। সাড়ে ছটাতে ঢুকলেই চলবে। কী বৃষ্টি মশাই, কী বৃষ্টি!’

যাক এক টাকা স্বরাহা হল। স্বস্তির মুখ দেখল স্বকান্ত। পকেটে একটা ও টাকা না থাকলে কি রকম! যদি দেখা হয় কাকলির সঙ্গে, যদি আবার একটা রিকশা করতে হয় তাকে নিয়ে।

বাজার আসতেই নেমে গেল আগন্তুক। একটু দাঁড়ান, টাকাটা নিয়ে আসি। গেল আর এল না। গলে গেল। মিলিয়ে গেল।

চলল আবার রিকশাওলা।

নৈরাশ্রের মতই জল চারদিকে। কী হবে স্বাভীতে গিয়ে? এত বুষ্টিতে যে কাকলি আসে নি, কোনো মেয়েই যে আসতে পারে না, আসে না, সে তো জানা কথা। আর ও তো প্রাচীনপন্থীদের মেয়ে। তবে স্বকান্ত যাচ্ছে কেন? যাচ্ছে, সে যে কথা রেখেছে শুধু সেই প্রমাণের আনন্দে। সে যে তার কথা রেখেছে এইটুকুই তার ভূষ্টি, এইটুকুই তার প্রাপ্তি। বলতে পারবে চিঠিতে, আমি গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাই নি।

স্বাভীতে পৌঁছে দিল রিকশা। কিন্তু কাকলি কই?

শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবু লবিতে অনেক লোক। সব বুষ্টির ভয়ে আশ্রয় নিয়েছে। দারোয়ান হটিয়ে দিতে চাইছে, বলছে, টিকিটওলাদের ঢুকতে দিন, কিন্তু কেউই হটছে না। সকলেরই বুষ্টির টিকিট।

‘এ কী, স্বকু যে! এ তোর কী চেহারা! ভিজ্জে একেবারে চোল হয়েছিস যে।’
ওর কলেজের ছাত্র অনিমেঘ।

‘তুই এ পাড়ায় কেন? এ হাউসে বই দেখতে এসেছিস? রাবিশ বই। যোন ছাড়া আর সবই এর গোণ। সেলসর কি ঘুমোয়, না কি সেলসই ঐ রকম?’

‘ভাই, চার আনা পয়সা দিতে পারিস? সত্যি বাসভাড়া নেই।’

একটা সিকি দিল অনিমেঘ।

ভাগিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই দৈন্তের চেহারা। এই হাত পাতা।

‘যা, দেখি করিস নে। যখন পুরোপুরি ভিজ্জেছিস তখন আর দাঁড়ানো কিসের জন্তে। সোজা বাড়ি চলে যা। নইলে অসুখ করবে। যেমন চেহারা করেছিস না বাস-এও জায়গা দিলে হয়।’

‘না হয় হেঁটেই চলে যাব। কিন্তু জলে জুতোর ঝাঁপটাও ছিঁড়ে গেছে দেখছি।’
স্বকান্ত নিচু হয়ে তাকাল জুতোর দিকে। বললে, ‘খালি পায়েই মেরে দেব ঠিক।’

ভাগিস কাকলি আসে নি। দেখে নি তার এই কাতরতার মূর্তি।

তবু একবার তাকাল এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। কোথায় কাকলি! তার তন্তুলেশও নেই। বুষ্টির জলে তার মুখ যেন মুছে গেছে, কিছুতেই মনে করতে পারছে না স্বকান্ত। তবু যদি কেউ দেখবার থাকে, সে দেখেছে আমি এসেছি, আমি কথা রেখেছি। সত্যের মত স্বথ নেই। সবাক্কে তো জল নয়, স্বকান্তের মনে হল, সত্যের শান্তি।

বাড়ি ফিরে এলে সেন্টু বলে উঠল, ‘এ তুমি কী হয়ে এসেছ কাকা! কোথায় গিয়েছিলে?’

‘একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।’ বললে স্বকান্ত।

‘দেখা পেলে?’

‘তারও সেখানে আসবার কথা, কিন্তু জানিস’, মুখে ব্যথা আঁকল স্বকান্ত, ‘সে এল না।’

‘এল না? দেখা হল না তার সঙ্গে?’

‘না, না, দেখা হল বৈ কি।’

‘সে কি কথা কাকা? এল না অথচ দেখা হল?’ অবাক মানল সেন্টু।

‘জানিস সেন্টু, জীবনে এমন লোকও আছে যে আসে না অথচ তার সঙ্গে দেখা হয়।’

ছুদিন পরে থামে চিঠি এল কাকলির:

‘সেদিন স্বাতীতে দেখলাম আপনাকে, কী চেহারা নিয়ে নামলেন রিকশা থেকে! কাছে যেতে সাহস হল না। কে এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। আপনি আমাকে দেখেন নি। না দেখে ভালোই করেছেন। দেখতে পেলেই ভিজ়ে কাপড়ে আটকে থাকতেন অনেকক্ষণ। আপনার বন্ধুর কাছে আমিও ধরা পড়তাম। সত্যি কোথাও জায়গা নেই যে একটু নিরিবিলা দেখা হয়।

থোকা থোকা আরও কদমফুল ফুটেছে। আপনাকে যদি পারতাম দেখাতে।’

বাসাটা চিনে নিতে কতক্ষণ! এক সন্ধ্যায় ঠিক হাজির হল স্বকান্ত। এই তো সেই বিস্তীর্ণশয়ান ঠিকানা।

বাইরে সদরে চাকর বসে।

‘আচ্ছা, এ বাড়িতে কাকলি থাকে?’

‘কে, এম-এর দ্বিধিমনি? ই্যা, থাকে।’

‘কোথায় আছেন এখন?’

একবার আকাশের দিকে তাকাল চাকর। বললে, ‘বোধ হয় ছাদে বেড়াচ্ছেন।’
‘বাবুরা কোথায়?’

‘বড়বাবুর অস্থখ, ঘরের মধ্যে শোয়া। মা তাঁর কাছে। দাদাবাবু বেরিয়ে গেলেন।’
‘তোমার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হয়?’

‘কেন হবে না? আপনি কোনো আত্মীয়?’

‘হ্যাঁ, নিকট আত্মীয়।’

‘তবে সোজা উঠে যান উপরে। ছাদেই হয়তো পাবেন। নয়তো বারান্দায়।
সারা দিন ঘুরছেন আর পড়ছেন।’

স্বকাস্ত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যাই না চলে ভিতরে। কী হবে?
যা হবার তাই হবে। তবু একটা কিছু হোক। সেদিনের বৃষ্টির পর নদীর জল কি
একটুও বাড়ে নি? ঘাস কি হয় নি একটুও ঘনশ্রাম? কদম অনেক উচুতে, মাটির
কাছাকাছি কি ফোটে নি দোপাটি? লাল মেজেক্টা শাদা সোনালি!

পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল স্বকাস্ত।

•৬

একটু এগিয়ে আসতেই সিঁড়ি। নিচেটা ফাঁকা। কেউ নেই কি কোথাও? এ
কখনো হতে পারে? এ-দিক ও-দিক একটু উকিঝুঁকি মারল স্বকাস্ত। দুটো
টিকটিকি একসঙ্গে পড়ে গেল মাটিতে। ঝগড়া করছিল নাকি? কী দেখেছে
বাইরে, একটা কালো বেরাল বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে।

কেমন যেন ধমধম করছে চারদিক। নিজের নিশ্বাস নিজে শুনতে পাচ্ছে।

দরকার নেই, ফিরে যাই।

বাড়িটা, রাস্তাটা দেখে গোলাম—আজ এই পর্যন্ত থাক। কিন্তু কী আশ্চর্য, কদম
গাছটা তো দেখি নি। কোন দিকে গাছটা? ফুল কি গাছ ভরে ফুটে আছে,
নাকি একটি ছুটি? নিজের মনেই হাসল একটু স্বকাস্ত। গাছের চেয়েও আর কিছু
জীবন্ত আর কিছু ফুলন্ত দেখবারই বুঝি তাড়া ছিল। কই তেমন তো কিছু বুঝি
নি সজ্ঞানে। কে যেন টেনে এনে খোলা দরজা দিয়ে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।
ঢুকিয়ে দিয়েছে তো থামিয়ে দিচ্ছে কেন?

যাক, ফিরে যাই। যাবার সময় দেখে যাব'খন গাছটা। গলা তুলে দেখে নেব'খন কত উচু তার ফুল ধরা।

এতদূর এসে, শুধু এলে নয়, এতটা চুকে পড়ে, ফিরে যাবার কোনো মানে হয়? চোর হয়ে এলে বরং সহজ ছিল। এতক্ষণ স্বাপ্নর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত না, দোনামনা করতে হত না। টেবলের উপর টেবল ক্লথটা আছে, তাতে ঐ কটা বাসন-কোসন আর কাপড়চোপড় জড়িয়ে নিয়ে গলির মুখে থিড়কির দরজাটা খুলে সটকান দিলেই চলে যেত। আর যদি উপরে যাবার, ছাদে যাবার দরকার হত তা হলে সিঁড়িটা লাগত না। বাইরে থেকে গাছে চড়েই, গাছ বেয়েই, পারত হাজির হতে।

বাড়িটা অবশ্য ছোট, তাই বলে নিচে, কাছে-পিঠে, একটাও লোক থাকবে, না? লোক থাকলেই বা তার কী এমন সম্পদ বাড়ত? যদি সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলত, ও মশাই, শুনছেন, কাকলি দেবীকে ডেকে দিন, তা হলে কি সিঁড়িটা স্বগম হত? সভাস্থলে বেদীতে গুঁঠবার আগে লাটবেলাটদের জন্তে যে ঘাসের উপর লাল শালু পড়ে তেমনি শালু পড়ত সিঁড়িতে? যদি জিজ্ঞেস করত, কে আপনি, একটা চলনসই উত্তর না হয় দেওয়া যেত, কিন্তু যদি নিরস্ত না হয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করত, কী দরকার, তা হলেই গলার কাছে দলা পাকাত। বরং এই ভালো হয়েছে, কাছেপিঠে কেউ কোথাও নেই। খালি মাঠে বল ফাঁকায়-ফাঁকায় এগিলে শেষ মুহুর্তে বলটা গোল-কিপারের হাতে তুলে দেবার মত। আমি তো স্বোর করতে চাই না। ধরা পড়তেই চাই।

সিঁড়িটা যেন স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে গেছে। হয়তো এরই একটানে নাগাড়ে উঠে যাওয়া যাবে ছাদে। পাওয়া যাবে কাকলিকে। সিক্তকে যে উপেক্ষা করতে পারে সেই শুকাকে। আর, তখন, তারপর ধরা পড়ে গেলে স্বকান্তকে আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। কাকলির ডাক পড়বে। আর, কৈফিয়ৎ দিতে, বানিয়ে বলতে, বাঁচিয়ে বলতে, মেয়েদের জুড়ি নেই।

সিঁড়ির দিকে এক পা এগুলো স্বকান্ত। বুকের মধ্য থেকে কে খুঁট করে উঠল। আবার থামল, আবার তাকাল চারপাশ। মহাশূন্ততার ইতিহাস ছাড়া দেয়ালে আর কিছুই লেখা দেখল না।

আচ্ছা, কী করা উচিত, যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে কী করা উচিত? পিছু হটে সদর পর্যন্ত ফিরে গিয়ে চাকরের শরণাপন্ন হবে, আর চাকর যদি ততক্ষণে পানের দোকানে বা তাদের আড্ডায় সরে গিয়ে থাকে, তা হলে খোলা

দরজায় কড়া নাড়বে? কড়া কি খোলা দরজায় নাড়বার জন্তে? খোলা দরজা মানেই তো চলে এস, তোমাকে মোকাবিলা করবার জন্তে ভিতরে লোক আছে। ঠাকুর-ঠাকুর বলে ডাকবে? সেটা সম্ভ্রান্ত শোনাবে? নয়কি বন্ধ কাঠের জানলার গায়ে আঙুলের গিঁট দিয়ে শালীন শব্দ করবে? নিজের সৰু সৰু আঙুলগুলির জন্তে মায়ী হল স্বকান্তর। কাকলির হাতের আঙুল না জানি কি রকম দেখতে? মোটামোটা বেঁটে-বেঁটে ভোঁতা-ভোঁতা? নাকি ছুঁচলো ধারালো খরশান?

তুখু উকি মারলেই চলে না, বুঁকি নিতে হয়। দু ধাপ সিঁড়ি উঠে পড়ল স্বকান্ত। কিন্তু সত্যি যা সে করছে, করতে চাচ্ছে বা করে ফেলেছে তা আইনের চোখে রীতিমত অপরাধ। বিনামূল্যে তাকে ঢুকে পড়েছে এবং ঢোকার উদ্দেশ্য, সে নিজে যাই ভান বা ভাব করুক, খুব স্বচ্ছ নয়। স্বতরাং—আবার থামল স্বকান্ত, আঙুল না ভেবে লাড়ুল ভাবুক। আঙুল না দেখে লাড়ুল দেখিয়ে পালিয়ে যাক। ছোট একটা ছেলে মেয়েও বাড়িতে নেই? কাকলি কি একশব্দ? হয়তো আছে ভাই-বোন, কিন্তু এ সময় ভাই গিয়েছে হয়তো খেলতে আর বোন পাড়া বেড়াতে। আর ওরা থাকলেই বা এগোত কী? হয়তো গলার রগ ফুলিয়ে চৈঁচিয়ে উঠত, ও দিদি, নিচে তোমাকে কে ডাকছে দেখবে এসো। একতারার জিনিস মাটি হত ঢাকে-ঢোলে। আর, ভাই-বোন কেন, দিদিও তো এ সময়টায় একটু নিচে থাকতে পারতেন। তিনি একদম নিচে নামেন না এমন তো নয়। এবং কখনো-কখনো, এমন হওয়াও আশ্চর্য নয় যে যখন তিনি নেমেছেন তখন তিনি একলা আর নিচেটা এমনি হা-হা করা শাদা শূণ্যের দেশ।

নিচে, দোরগোড়ায় বা প্রথম উকিতেই, দেখা হলে লাভ হত কী! কী ধরনের আলাপ হত?

কাকলি বলত, এই দিকে এসেছিলেন বুঝি?

ও, ই্যা, এই পাড়ায় আমার মাসিমার বাড়ি।

কঙ্কুরে বলুন তো?

ঐ যে ওখানে—হাত দিয়ে দিশেহারী একটা প্রাচ্য নাচের ভঙ্গি করে দিত।

মাঝে মাঝে আসতে হয় বুঝি এদিকে?

কচিং-কদাচিং।

তারপরে আরো হয়তো একটু বলত কাকলি। বলত, সেদিন কী বৃষ্টি!

ই্যা, বেরাল-কুকুর। মানে ক্যাটস অ্যাণ্ড ডগসের বাংলা করলাম।

আর আপনি কেমন নামলেন রিকশা থেকে। নামবার কী দরকার ছিল!

বিকশাওলা আর যেতে চাইল না। আমতা-আমতা করে বলত স্বকান্ত।

আর এক পা এগিয়েই তো বাস-স্টপ। অন্ধুর পর্যন্ত নিয়ে গেলেই পারত। অত ভেজবার পর যত শিগগির সম্ভব বাড়ি চলে যাওয়া উচিত। নামবার বা থামবার কোনো মানে হয় না।

না, কিছু না। টোঁক গিলত স্বকান্ত। কিন্তু আপনি দেখলেন কোথেকে?

আমি যে ছিলাম ওখানে।

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন বুঝি?

না।

তবে?

ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বুষ্টি এসে পড়তেই আশ্রয়ের জন্তে ঢুকে পড়লাম। আমি ভিজিনি, আমার দাঁড়বার মানে হয়। আর আপনি ডোবা জাহাজের থেকে জ্যাস্ত তোলা খালাসি—আপনার ওখানে দাঁড়বার, দেরি করবার মানে হয় না—

আমার বন্ধু অনিমেঘের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিনা—

তাই। তবু—

আচ্ছা। আসি।

নমস্কার।

তার চেয়ে এ অনেক অনেক অনেকানেক ভালো যে কাকলি নিচে নেই, ছাদে আছে। ‘তারপরে’র দেশে আছে। সিঁড়ি না ভাঙলে ছাদ কই। যা হয় তাই হবে, পিছু হটব না। একটা কিছু বাধা না থাকলে চলায় হুথ কী! পাশ করতে চাই অথচ পড়ার পাশ কাটিয়ে যাব, এ হতে পারে না। বাধা আছে বলেই তো মজা। সরকার চালাব অথচ বিরুদ্ধবাদী রাখব না, জল কাত বললে সবাই একবাক্যে ঘাড় কাত করবে, এ একটা চালানোই নয়। ব্যাট করব অথচ ফাস্ট বল দেখলে উইকেট ছেড়ে আত্মসম্মতির পিছনে গিয়ে লুকোব এ ছেলেমানুষি বললেও বেশি বলা হয়, এ শিশুশালি।

একটার পর একটা করে স্বকান্ত সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। চাকরের যা বর্ণনা তাতে কোথাও ঠেকবার কথা নয়, একেবারে সোজা বন্দরে গিয়ে পৌঁছনো। আর যদি পৌঁছবার আগেই নৌকোর তলা ফুটো হয়ে যায় তো যাবে। ভরাডুবি করে দিয়ে এসেছি বলা যাবে সেপ্টম্বরে। হাতের দান আর কেবল হয় না।

দোতলা পেরিয়ে ছাদের সিঁড়ি ধরেছে, পিছন থেকে কে বলে উঠল : ‘এ কে?’

এ একটা ধূসর বিশ্বয়ের স্বর মাজ, স্বগতোক্তি, তাই স্বকান্ত গারে মাখল না। উপেক্ষা করেই উঠে চলল।

এবার যে স্বরটা নির্গত হল সেটা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পঙ্কবপ্রাথম্য ।

‘কে ?’

সিঁড়ির উপরেই থামল স্বকান্ত ।

‘কে যাচ্ছে উপরে ?’

একটা ঘুড়ি কাটা পড়ে উড়ে এসেছে ছাদে, এ যদি বলতে পারত স্বকান্ত, এ বলবার যদি তার বয়স থাকত । কাটা ঘুড়ি কোথায় না নিয়ে যেতে পারে, গোষ্ঠে-মাঠে-ময়দানে বনে-জলে-জঙ্গলে, বিদেশে-বিভূয়ে, ছাদ তো সামান্য । আর কাটা ঘুড়ি মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখলে মনে-মনে হাত তুলবে না এমন মাহুষও আছে নাকি পৃথিবীতে । তাই বলবে নাকি কাটা ঘুড়ি ? রঙিন ঘুড়ি ?

‘এ কি, কে তুমি ? কোথায় যাচ্ছ ?’ হমকে উঠল পঙ্কবস্বর ।

ফিরল স্বকান্ত । নেমে এসে দেখল স্থলাঙ্গ প্রাচীর এক ভদ্রলোক দোতলার বারান্দায় আধা-ইজিচেয়ারে আধাশোয়াভাবে হেলে আছেন আর তাঁর পাশে মেঝের উপর বসে তাঁর ছুই পায়ের পাতায় তেল মাখিয়ে দিচ্ছেন এক ভদ্রমহিলা ।

এগিয়ে এল স্বকান্ত । নিচু হয়ে একটা প্রণাম রুঁকে দিলেই চুকে যায়, থমকে দাঁড়াল । তাকিয়ে দেখল ভদ্রলোকের পা দুখানি অস্বাভাবিক ফুলো, তাতে আবার এখন তেল মাখানো । প্রণাম করতে প্রাণে রস পেল না । হু হাতে শুকনো নমস্কার সেরে বললে, ‘আমি স্বকান্ত বসু—’

‘আমি বনবিহারী মিত্র— শুধু এটুকু বললেই পরিচয় হল ?’ গর্জন ছাড়লেন ভদ্রলোক ।

‘আন্তে-আন্তে বলছি ।’ চোঁক গিলল স্বকান্ত : ‘আমার বাবার নাম—’

‘তোমার বংশ পরিচয়ে আমার কৌতূহল নেই । আমার জিজ্ঞাস্তা হচ্ছে তুমি কী স্ববাদে এ বাড়িতে ঢুকেছ ? কী চাই তোমার ?’

মম্বণা বাড়িয়ে লাভ নেই, স্বকান্ত বললে, ‘কাকলিকে চাই ।’

‘কে কাকলি ?’ পায়ে নিশ্চয়ই ব্যাধি ও ব্যাধা, একটানে ঝটকা মেরে দাঁড়াতে পারেন না ভদ্রলোক, তবু উদ্বেজনা নয় নড়ে-চড়ে উঠলেন ।

‘স্বকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল । বললে, ‘কাকলি এ বাড়ি থাকে না ?’

‘থাকে কি না থাকে তাতে তোমার কী ?’

‘তা হলে থাকে ।’ অক্ষুটস্বরে বললে স্বকান্ত ।

‘হ্যাঁ, থাকে । সে আমার মেয়ে । কিন্তু তোমার তাকে কী প্রয়োজন ?’ ভদ্রলোক বললেন আবার রোখা গলায় ।

এখানে আবার আরেকটা সম্ভাবনা ছিল। নত হয়ে স্বকান্ত তাকাল আবার ভ্রমলোকের পায়ে দিকে। ভরসা পেল না। কে জানে পায়ে হাত ঠেকলেই হয়তো তারস্বরে চিৎকার করে উঠবেন। চাকর যে বলেছে বাবুর অস্থখ তার মানে এই পায়ের অস্থখ।

বাড়টা আস্তে-আস্তে একটু চুলকে নম্রস্বরে স্বকান্ত বললে, ‘তার সঙ্গে আমি পড়ি।’

‘পড়ো তো এখানে কী, বাড়িতে কী? সটান উঠে যাচ্ছ সিঁড়ি দিয়ে তার মানেটা কী?’ বনবিহারী আবার হুমকালেন।

‘দরজাটা খোলা পেলাম—’

‘দরজা খোলা পেলেই উঠে আসতে হয়? নিচে থেকে খবর দিলে না কেন?’

‘লোকজন কীউকে দেখলাম না— একটা কলিং বেল নেই।’

‘কলিং বেল! তোমার জন্তে কলিং বেল ফিট করতে হবে।’ বনবিহারী আবার তড়পালেন: ‘কেউ নেই তো নিচে ওয়েট করো।’

‘সে এক ক্যাসাবিয়ানকা পরেছিল।’ স্বকান্ত তাকাল আরেকবার চারপাশ। বললে, ‘ভাবলাম নিচে নেই হয়তো উপরে পাব।’

‘তা আমাদের লক্ষ্য না করেই তো উঠে যাচ্ছ ছাদে। ছাদে কী! আজকাল পড়াশোনা ছাদে হচ্ছে নাকি?’

‘ঘরে-ছাদে কোথাও হচ্ছে না। তবে ঘরের মধ্যে তো গুমোট, ছাদে ঘুরলে মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে, রিক্যাপিচুলেশানটা ভালো হয়।’

‘কী ভালো হয়?’ বনবিহারী ছুঁড়লেন আরেক মেঘধ্বনি।

কথাটা পুনর্বার আঙড়াতে সাহস পেল না স্বকান্ত।

‘গোবর্ধন! গোবর্ধন!’ ডাকাত-পড়া আওয়াজ তুললেন বনবিহারী।

স্বকান্ত বুঝল চাকরকে ডাকছেন।

‘দাঁড়াও, আমি ডাকছি।’ এতক্ষণে মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। মালিশ কলে উঠে দাঁড়ালেন।

তবুও আশ্বাস নেই বনবিহারীর। এবার অগ্ন ডাক ডাকলেন। ‘বিজন, বিজন! বিজন বাড়ি নেই?’

স্বকান্ত বুঝল এবার ছেলেকে ডাকছেন।

একটা ফাটাফাটি না হয়ে আর যায় না। হাত দিয়ে নিজের মাথাটা একবার অস্থভব করল স্বকান্ত। যদি খাড়া পায়ে দাঁড়াতে পারতেন তা হলে বনবিহারী নিজেই প্রমাণ করে দিতেন যে তিনি বনেই ব্রাহ্মমাণ।

কোলাহলটা এমন আর যুঁহু কোথায়। যার লক্ষ্য, নিচের লোককে সম্ভ্রান্ত করা, বাড়ির আনাচে-কানাচে তোলপাড় জাগানো, বিজনকে পর্যন্ত সজনে নিয়ে আসা, তা এক নিভৃতচারিণী ছাদবিহারিণীর কানে চুকছে না!

তাকেও আর রাখা হল না শাস্তিতে। ভদ্রমহিলা উপরের দিকের সিঁড়ির ক ধাপ উঠে উজ্জল তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকতে লাগলেন : ‘কাকলি! কাকলি!’

এবার উনি এসে কী স্বর ধরেন দেয়ালগুলিই বলতে পারে।

একদৃষ্টে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

আহা, এক কি কলিং বেল টিপে কার্ড পাঠিয়ে দেখা করতে এলে দেখা যেত। নাকি দিনক্ষণ ঠিক করে এসে ড্রয়িং রুমের পারিপাট্যে চিত্রাংগিত করে।

ক্রমত পায়ের ধূপধূপ করে নেমে আসতে লাগল কাকলি।

সন্ধ্যার গা ধোয়া হয় নি তারই আগেকার শৈথিল্য শাড়িতে-শরীরে গুচ্ছীকৃত হয়ে আছে। চুল খোলা, খালি পা। পরনের আটপোরে শাড়িখানি আধময়লা। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য, এই একটু নিজের সঙ্গে নিজের নিঃসঙ্গ হয়েও অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, হাত ছুঁখানি খালি।

‘কে এই লোক তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—’ ভদ্রমহিলা বিরজিতে ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

‘ও, আপনি এসেছেন! আমি ভাবলাম স্তনতে পেলেন না বুঝি ডাক!’ কাকলি ঝলমলিয়ে উঠল। বনবিহারীর শিলীভূত দুই চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘আমাদের সঙ্গে পড়ে বাবা, খুব ভালো ছেলে, ফাস্ট ক্লাশ পাবে নির্ধাত। এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছাদ থেকে দেখতে পেলাম।’

‘দেখতে পেলে!’

‘হ্যাঁ বাবা, ঝুঁকে দাঁড়ালে দেখা যায়। দেখতে পেয়ে ডাকলাম হাতছানি দিয়ে। মনে হল দেখলেন না বুঝি, বুঝলেন না বুঝি।’

‘হাতছানি দিয়ে ডাকার মানে?’ বনবিহারীর চোখের পাতা যেন কাঁপছে না এখনো।

‘হঠাৎ দেখা কিনা। তা ছাড়া অত দূর থেকে চোঁচিয়ে কি ডাকা যায় নাম ধরে?’

‘তাই ইশারায় ডাকলে?’

‘বাবা, কতদিন ছোট-ছোট ক্লাশগুলি আটপোরে করি নি, তাই ভয় ছিল কত না জানি পিছিয়ে আছি। তাই গুঁকে ভেকে একটু দেখে-স্তনে ঝালাই করে নেওয়া—’

তারপর ভদ্রমহিলার কাছে এগুলি কাকলি। হঠাৎ করে, আবেগে স্বর বেঁধে করে

বললে, ‘জানো, মা, উনি এখনো নাকি কদমফুল দেখেন নি। বাঙালী ছেলের কী দুর্দশা। লেখাপড়ায় ওস্তাদ অথচ নিজের দেশের ফুল ফল চেনেন না। আস্থন, দেখবেন আস্থন,’ এবার লক্ষ্য করল স্বকাস্তকে : ‘কেমন কেঁপে ফুল হয়েছে ছাদের উপর।’

উঠে দাঁড়াবার ভাঙা-ভাঙা চেষ্টা করছেন দেখে কাকলি এল বাবাকে তুলতে। সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বনবিহারী স্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালেন। স্ত্রীর হাত ধরে উঠলেন, লাঠি নিয়ে ভর দিয়ে দিয়ে এগুতে চাইলেন ঘরের দিকে। পিছন ফিরে লক্ষ্য করলেন স্বকাস্তকে। বললেন, ‘যাও, দাঁড়িয়ে আছ কেন? ছাদে গিয়ে কদমফুল দেখে এসো।’

... ৭

সত্যিই দেখে নি বুঝি কদম ফুল। কিন্তু ও ফুল কি মর্তের তরুতে ফোটে? নাকি এ ফুলেরই আরেক নাম পারিজাত?

কি জানি কি।

এর পর ছাদে না ওঠার কোনো মানে হয় না। আর কাকলিকেও আসতে হয় পিছে পিছে। ছন্দ মিলিয়ে।

‘আপনার এভাবে আসাটা মোটেই ঠিক হয় নি।’ চোখে-মুখে বিরাগ-বিরক্তির ভাব আনল কাকলি।

‘ঠিক হয় নি।’ গলায় স্বরকে অহুতাপের প্রায় কাছাকাছি নিয়ে এল স্বকাস্ত। কিন্তু পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে বললে, ‘কিন্তু কী স্বন্দর তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিলে বলে তো! সিচুয়েশনটা সেভ করে দিলে। তুমি ক্রিকেট বোঝ?’

‘কিঁকিপোকা বুঝি।’

‘না, না, ঝিল্লি নয়, ঝিল্লি বনকিছে ঝিনিঝিনি নয়। এ হচ্ছে এক খণ্ড লগুড় দিয়ে এক অথণ্ড গোলককে তাড়না করা।’ আনন্দে টইটুস্বর স্বকাস্ত : ‘ক্রিকেট বুঝলে নতাম এক ইনিংসে হেরে যেতে যেতে ড্র করে ফেললে।’

‘না, ড্র নয়, কে জানে হেরেই গেলাম বুঝি পুরোপুরি।’ গাভীর্থে আরো স্পষ্ট হল কাকলি : ‘আপনাকে বাঁচালাম হয়তো, কিন্তু নিজে মরলাম।’

‘অসম্ভব ! আমাকে যদি তুমি বাঁচালে, তোমাকেও আমি বাঁচাব ।’

‘আপনার ক্ষমতা কী ?’

‘ক্ষমতা ?’ একটা বুঝি ধাক্কা খেল স্ফকান্ত । বললে, ‘মাটির কী ক্ষমতা তা মাটি কী জানে ! স্নান মৌন মাটি । একটা বীজ এসে পড়লে তবে বোঝে ।’

তবু স্পন্দিত হয় না কাকলি । বললে, ‘যাই বলুন, এভাবে আসাটা আপনার মোটেই উচিত হয় নি ।’

‘এভাবে না এলে তোমার এভাবে থাকারি দেখতাম কী করে ?’ ছু চোখে নির্গল স্নেহ নিয়ে তাকাল স্ফকান্ত ।

যথার্থ শাসনে না থাকলেও বসন বেশ বিস্তৃত হয়েই আছে । তবু কাঁধ ও কক্ষের দিকে হাত গেল একটু অধ্যাক্ষতা করতে । খোলা চুলও নিমেষে পিণ্ডীকৃত হয়ে উঠল । লঘুতাকে যেন লেশমাত্রও প্রশ্রয় দেবে না কাকলি । বললে, ‘সদরে যখন চাকর ছিল তখন আপনার উচিত ছিল ওকে দিয়ে খবর পাঠানো ।’

‘চাকর মানে গোবর্ধনের কথা বলছ ?’ প্রায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্ফকান্ত ।

‘হ্যা—’

এরকম কাঠখোঁটা হলে আর ‘তুমি’ বলে কোন নৈকট্যে ? তাই স্ফকান্তও দূরত্ব হল । বললে, ‘গো শব্দের অর্থ জানেন ?’

‘না ।’

‘অনেক অর্থ আছে শুনেছি । এক অর্থ নাকি ইন্দ্রিয় । আর ইন্দ্রিয় মানেই যন্ত্রণা । তাই গোবর্ধনকে দিয়ে খবর পাঠানো মানেই যন্ত্রণাবৃদ্ধি । কি বলতে কী বোঝে, কাকে ডাকতে গিয়ে কাকে নিয়ে আসে বা আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি ।’ কাকলির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল একটি কোমল রেখা ফুটল না কোথাও, না ঠোঁটে না চিবুকে না বা চোখের কোলে । হতাশের শেষ নিশ্বাস ফেলল স্ফকান্ত : ‘তাই গিরি নিজে ধারণ না করে লব্ধন করেই উঠে এলাম ।’

শুধু গম্ভীর নয়, এবার যেন কঠিন হল কাকলি । বললে, ‘আপনি জানেন না আমার বাবা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে রিটায়ার করেছেন । সারা জীবন ডিসিপ্লিন মেনে এসেছেন—’

‘তা উনি যদি রিটায়ার করে থাকেন তবে ডিসিপ্লিনও রিটায়ার করেছে ।’

‘না ।’ শুধু কঠিন নয়, এবার যেন উদ্ধত হল কাকলি । বললে, ‘দিনে দিনে আমরা যতই কেননা বদলাই, যতই কেননা চালাক হই, এমন কতকগুলি জিনিষ

আছে যার মূল্যের কোনো বদল হয়না। তার মধ্যে একটা হচ্ছে, যাকে বলে গিয়ে, ভদ্রতা, শালীনতা, ডিসেম্বলি—' সরে দু-পা দূরে গেল কাকলি।

'তা হলে আর কথা কি !' দরজার দিকে এগিয়ে গেল সুকান্ত। 'এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি। একজনের ভালোবাসা অন্যজনের অভদ্রতা। যে যেমন বোঝে। আচ্ছা, আসি, নমস্কার।' দু হাত যুক্ত করল সুকান্ত।

'বলি নমস্কার করতে তো খুব শিখেছ,' কাকলি হঠাৎ কাছে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। গলার স্বর অস্পষ্ট করে বললে, 'বাবাকে প্রণাম করেছিলে?'

'কী করে করি? দু পায়ে তেল মাখানো।'

মুচকে এবার একটু হাসল কাকলি। বললে, 'সারা জীবন লোকে এই পায়ে তেল দিয়েছে, তুমিও না হয় দিতে দু ফোঁটা। দুটো ঠোকরে দু ফোঁটা প্রণাম।'

মুখ শোকার্ত করল সুকান্ত। বললে, 'ভুল হয়ে গিয়েছে। আর গোড়ায় ভুল হলে আগাগোড়া ভুল। তোমার বাবাকে প্রণাম করা হল না বলে তোমার মাও বাদ পড়লেন।'

'দাঁড়াও, মা ডাকছেন নিচে। শুনে আসি। যেও না কিছু।' কাকলি ছুট দিল সিঁড়ির দিকে। আর নামতে যেতেই চুলের পিণ্ডটা ভেঙে গিয়ে নেমে পড়ল বৃষ্টির মত।

ছাদে এতক্ষণ থাকবার কী হয়েছে! গায়ত্রী প্রায় মুখঝামটা দিয়ে উঠল। এক ডাকের মামলা, কদম ফুল দেখিয়ে দিলেই তো চলে যায়। না হয় গোটা কতক ছিঁড়ে নিক হাত বাড়িয়ে। অতক্ষণ লাগে কিসে? না হয় পাঠিয়ে দিই গোবর্ধনকে।

'আমি ভাবছিলাম চা করে দিতে ডাকলে বুঝি—'

আবার যাচ্ছিস? আর এ কী তোর ছিরিছাঁদ? বেশভূষা? বিকেলের গা ধুস নি, চুল বাঁধিস নি, পরিকার-পরিক্ষর হোস নি। দু হাতের বালা খুলে ফেলেছিস? গলারটা আছে, না, গলাও খালি? আহা, কী অপক্লপ মূর্তিই ধরেছেন শ্রীমতী। যা, বৈকালিক প্রসাধন সাজ কর, ভদ্র সাজ, ভব্যতায় শালীনতায় ফিরে আয়—

'ততক্ষণ?' কাকলি ছাদের দিকে চোখ তুলল।

ততক্ষণ ও একা-একা হাওয়া থাক, নয়তো কেটে পড়ুক।'

'তার চেয়ে সরাসরি ওকে চলে যেতে বলি। সেইটেই ভালো।'

'তার আগে শাড়িটা পালটে নে।' গায়ত্রী আবার বাধা দিল : 'ভদ্র হ।'

'একবার ধরা পড়ে যাবার পর পালটাবার মানে হয় না। কেন, এ বেশবাস মন্দ

কি ! সরল শাদাসিধে থাক। কি দোষের ? বাড়িতে মেয়েরা কি সর্বক্ষণ পেথম চড়িয়ে থাকে ?’

‘তাই বলে তোর মত হাতছানি দিয়ে অকালের কালো মেঘ কেউ ভেকে আনে না।’ গায়ত্রী চোখের কটাক্ষকে কালো করল।

‘বেশ তো, কালো মেঘ তাড়িয়ে দিতে কতক্ষণ !’ কাকলি উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। মুখে ধ্বনি তুলল : ‘দেখছেন, শুভ্রন আপনি এখন—’

পিছন থেকে গায়ত্রী বলে উঠল, ‘এ আবার কোনদিশি ভদ্রতা ?’

মা-ও বুঝি উঠছেন পিছু-পিছু। পা না উঠলেও কান উঠছে নিশ্চয়ই। তাই ছাদে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির রেখে অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে চাইল কাকলি। কিন্তু কই, স্বকাস্ত কোথায় ?

‘এ কী, কোথায় গেলেন ?’

এপাশ ওপাশ কাকলি তাকাল ব্যাকুল হয়ে। ছাদ এমন কিছু ঘোড়দৌড়ের মাঠ নয় যে নজরে আসবে না। কিন্তু সত্যি, গেল কোথায় ? গাছটা যেখানে ডালে-ফুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে রেলিঙ ছাপিয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেদিকটাতেও নয়। এ কি আশ্চর্য, হাওয়া হয়ে গেল নাকি ? নাকি লাফিয়ে পড়ল ছাদ থেকে ?

কাকলি গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল। রেলিঙে ভর রেখে ঝুঁকল নিচে।

নাকি গাছ বেয়ে নেমে গেল রাস্তায় ?

তাকাল ফুলগুলির দিকে। যেন ওরা জানে। ওরাই বলতে পারবে। যেন ওদেরই একটি হয়ে রয়েছে লুকিয়ে। রয়েছে ঘুমিয়ে। স্বগন্ধি হয়ে।

কী অদ্ভুত ছেলেমানুষ ! জলের ট্যাকটার পিছনে লুকিয়েছিল গুড়ি মেরে ঝকঝকে দাঁতে এক ঝাঁক পাতিহাঁস উড়িয়ে বেরিয়ে এলেন কালো মেঘ।

‘কী সাংঘাতিক ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন !’ ফ্যাকাশে মুখের সব জায়গায় এখনো নিশ্চিন্ত রক্ত আসে নি, কাকলি বললে ধূসর স্বরে, ‘বুক এখনো কাঁপছে নিদারুণ।’

‘বিশ্বাস করি না।’ বললে স্বকাস্ত।

‘কী বিশ্বাস করেন না ?’

‘আপনার বুক যে কাঁপছে।’

‘মুখে বলছি—’

‘বুকের কথা কি মুখের কথায় অবগীত ? পরীক্ষা চাই।’

‘পরীক্ষা ! আপেনি কি ডাক্তার ! সঙ্গে আপনার স্টেথিসকোপ আছে ?’ তুহি

চালাক হতে পারো, আমি হতে পারি না—এমনি হ্রস্ব জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল কাকলি।

‘কিন্তু আমার পরীক্ষা আরো নিকট, আরো নিবিষ্ট।’ হাসল স্বকান্ত : ‘আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি তোমারি গান—’

‘আপনার ছাদ থেকে পথে যাওয়াই উচিত ছিল।

‘সেটা তো মাটিতে, রাস্তায় পড়া হবে। যদি পড়ব তো এভারেস্ট থেকে পড়ব। আর পড়ব এই ছাদের উপর।’

‘কেন, এই ছাদের উপর কেন?’ যেন এতে বিশেষ আপত্তি বর্তমান, এমনি ভাব করল কাকলি।

‘ছাদের উপর মানে তোমার কোলের কাছাকাছি।’ দিবি বলল, বলতে পারল স্বকান্ত : ‘যেখানে এভার-রেস্ট। চিরন্তন বিশ্রাম।’

আশিরপদনখ গম্ভীর হয়ে গেল কাকলি! ফিল্মের রিল ঘুরিয়ে যাচ্ছে এমনি দ্রুত শেষ করবার উত্তোকে বললে, ‘যার জন্তে এসেছিলেন ছাদে, এই দেখুন সেই কদম গাছ। দেখুন কী গাঢ় পাতা আর কী নিটোল ফুল, শাদায়-সোনায় গায়ে হলুদ।

এক ফুঁয়ে সব যেন উড়িয়ে দেবার মত। স্বকান্ত বললে, ‘মাছুষ পেলে গাছ কে দেখে!’

‘মাছুষ পেলে!’

‘হ্যাঁ, তা ছাড়া ঐ গাছ, কদম গাছ তো অগ্নীল।’

‘অগ্নীল?’ যেন বসে পড়ল কাকলি।

‘হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে যারা দেবদেবী মানে না নিরাকার মানে তারা কদম গাছকে অগ্নীল বলে। এই কদম গাছের উপরে-নীচে আমাদের রুক্ষ অনেক ছাড়া করেছেন, তারই জন্তে।’

‘উপরে-নিচে?’

‘নীচে থেকে বাঁশি বাজিয়ে ঘরের বউকে বার করে এনেছেন। আর’, চোখে মুখে হাসির কুসুম ছড়াল স্বকান্ত : ‘আর, উপরের কথা শুনেতে চেয়ো না। এবার কুল-চোর নয়, দুকুলচোর আনর্থিনীদের শাড়ি চুরি করে নিয়ে দিবি বসেছেন মগডালে। জলাঙ্গিনীদের কী দুর্দশা! দুর্দশা দেখেও দয়া নেই গুণমণির।’

‘জানো’, গলার স্বর আঁর্জ করল কাকলি : ‘মা তোমাকে কালো মেঘ বলেছেন।’

‘সে আমার গায়ের রঙ দেখে। আমি স্বভাবে রুক্ষ বলে নয়। তা ছাড়া আমার নাম তো শ্রীকান্ত নয়, আমার নাম স্বকান্ত।’

‘কিন্তু কালো মেঘ দেখে শ্রীমতীর কী আকৃতি!’ স্বকাস্তর চোখের মধ্যে তাকাল কাকলি।

‘কলির শ্রীমতীর তো কালো মেঘকে তাড়াতে পারলেই শাস্তি। বলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ুন। চম্পট দিন।’

‘কিন্তু আমি কি শ্রীমতী?’

‘তুমি এই কলকাতার সন্ধে। দেখ দেখি তাকিয়ে। এখনো জলে নি আলো, গায়ে হাতে পরে নি একটিও গয়নার ছিটে। শুধু আভরণহীনতার আভা। রংটি মাজা-মাজা, মৃদু-মৃদু মিষ্টি। আর খুব-ভাঙা চুল, আস্তে-আস্তে পড়ছে ছড়িয়ে-গড়িয়ে : আর চোখভরা বৃষ্টির মমতা। তুমি আরেকরকম শ্রীমতী।’

‘সন্ধে হয়েছে। এবার তবে রাড়ি যাও।’ যেন সত্যিসত্যিই বললে কাকলি।

‘যেতে ইচ্ছে করছে না।’ শিশুর মত মুখ করল স্বকাস্ত। মুখল করল বটে কিন্তু নিভুল ফিরে চলল দরজার দিকে। দুর্দাস্তের মত পা ফেলে।

‘ও কি, এখুনি চলে যাচ্ছেন কি!’ প্রায় আর্ত হাঁক দিল কাকলি : ‘একটা অন্তত ফুল নিয়ে যান। যার জন্তে এত কষ্ট করে আসা।’

ফিরল স্বকাস্ত। কাছে এল।

কাছে আসতেই কাকলি বললে, ‘ফুল একটু দেখবে না? ধরবে না?’

নিষ্ঠুর নির্লিপ্তের মত স্বকাস্ত গাছেরই একটা ফুল ধরল মূঠোতে। বললে, ‘জানো’ কদম খুব খাঁটি ফুল।’

‘খাঁটি?’ বিশেষণ শুনে আশ্চর্য হল কাকলি।

‘হ্যাঁ, একনিষ্ঠ। প্রথম থেকে, উদ্গম থেকেই গোল হয়ে দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গোলই থাকে। আকার বা অবয়ব কিছুই বদলায় না একটুকু! আদিম থেকে অন্তিম এক অবস্থিতি। জীবনে প্রথম ভালোবাসার মত।’

গোবর্ধন দু কাঁধে দুই বেতের চেয়ার নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

‘এ কি, চেয়ার কেন? চেয়ার দিয়ে কী হবে?’ কাকলি হকচকিয়ে উঠল।

‘বাবু পাঠিয়ে দিলেন। বললেন’ আপনারা পড়বেন বসে। ঘুরে ঘুরে পড়তে নাকি অসুবিধে হচ্ছে। তারপরে, যাচ্ছি, আবার সেই একটা টেবিল নিয়ে আসতে হবে।’

‘টেবিল? কিন্তু এখানে আলো কই?’

‘তা জানি না।’ চলে গেল গোবর্ধন।

‘তার মানে দু চেয়ারে হয়নি এবার অন্ধকারে টেবিল ছুঁড়ে মারা হবে। এবার পালাই।’ পিছন ফিরেও তাকাল না, নেমে চলল স্বকাস্ত।

‘সে কি, একটা ফুল নিয়ে যান :’ ভেকে উঠল কাকলি।

একটা ফুল হাতে করে নিয়ে না গেলে এখানে আসার সাধুতাটা সাব্যস্ত হয় কি করে ?

কিন্তু দাঁড়াল না স্বকান্ত।

দোতলায় নেমেই টেবিল কাঁধে গোবর্ধনের সামনে পড়ল। কি মাথায় এল, বলে বসল, বাবু কোথায় ?

ঘর দেখিয়ে দিল গোবর্ধন।

প্রণাম করবে কি, হু পা পুরু কবলে ঢেকে শুয়ে আছেন বনবিহারী।

‘আমি এবার যাই।’ বিনয়নম্র হয়ে বললে স্বকান্ত।

‘ও! তুমি ? তুমি এখনো আছ ? কি, এখন যাবে ? বেশ, যাও। এরপর আবার যখন আসবে, যদি আস, বাইরে থেকে প্রথমে জানান দেবে—বুঝলে ?’

‘কেন, এখন তো জানানোশোনা হয়ে গেল।’ স্বকান্ত মাথা চুলকালো : ‘এখন তো শটান চলে আসতে পারব।’

‘শটান ? অত টানে দরকার নেই। শোনো।’ বনবিহারী-খামালেন স্বকান্তকে : তোমার বাবা কি করেন ?’

‘বাবা উকিল।’

‘যে বাড়িতে থাকো সেটা নিজেদের বাড়ি ?’

‘না। ভাড়াটে বাড়ি।’

‘কে কে, কতজন থাকে সে বাড়িতে ?’

‘রাবণের গুপ্তি। আমরা একান্নবর্তী কিনা—এক-এক গুলি দো-দো চিড়িয়া—’ ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিচের সিঁড়ি ধরল স্বকান্ত। আর বনবিহারী পায়ের কবলে মাথা ঢাকলেন।

সিঁড়ির মুখেই কাকলি। তার হাতে একটা কদমের ডাল। তাতে তিনটি ফুল। কী ভেবে একটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে ডালটাকে হু-ফুল করলে। কোনো কথা বলল না। ডালটি দিয়ে দিল স্বকান্তর হাতে।

নিচের তলায় নেমেছে, গায়ত্রীর সঙ্গে দেখা। তার এক হাতে চায়ের কাপ আরেক হাতে খাবারের প্লেট।

‘এ কি, চা করেছিলাম যে—’

‘আরেকদিন এসে খাব।’ ক্ষত বেরিয়ে গেল স্বকান্ত।

বাড়িতে এসেই ভাক দিল সেন্টুকে। তাত তোর জন্তে কী এনেছি।



‘কী এনেছ কাকা?’ পড়ি-মরি করে ছুটল সেণ্টু।

‘দেখবি আয়। রাধাকৃষ্ণ এনেছি।’

‘খুব ভালো, খুব ভালো।’ ফুলের বৃন্ত ধরে সেণ্টুর খুশি আর ধরে না।

‘ভীষণ ভালো।’ বললে স্বকাস্ত, ‘বাসেও ভালো রসেও ভালো। রাতেও ভালো। দিনেও ভালো। স্বখেও ভালো স্বতিতেও ভালো। এমন ভালো আর হয় না।’

কদিন পরে এ বাড়িতে একটা হট্টগোল উঠল।

ওরে স্বকু, শিগগির আয় তোর কাছে কে এসেছে। চারিদিক থেকে সমস্তের কোলাহল উঠল।

এসেছে তো এসেছে, তায় এত ভূমিকম্প কিসের? এসেছে তো রাস্তায় দাঁড়ান, অপেক্ষা করুক। আমি এখন দাড়ি কামাচ্ছি।

বন্দনা চোখ মুখ স্বর ঝাপসা করে বললে, ‘এ তোমার স্ববল সখাদের কেউ নয়। এ মেয়ে। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ফুটানিকা ডিবা।’

...b.....

‘না না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না।’ মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী। অগ্নি বাড়ি দেখুন।’

মন-মেজাজ ভালো ছিল না মৃণালিনীর। আফিস থেকে ফিরে এসে থাকে বলে প্রশান্তর জন্তে এক বাটি মাছ মিটসেফের এক কোণে রেখেছিল লুকিয়ে, তাই বিজয়া খুঁজে পেতে বার করে খাইয়ে দিয়েছে হেমনেকে। এ নিয়ে খানিক আগে হয়ে গেছে খণ্ডপ্রলয়। স্বামীকে বেশি করে খাওয়াতে হয় আলাদা হয়ে গেলেই তো চলে। কে ধরে রাখছে! এ বেশি করে খাওয়ানো নয় এ গ্রায্য ভাবে, গ্রায্য ভাগে খাওয়ানো। অফিস-আদালত যানেওয়াল তিনজন—ভাস্করঠাকুর, ভাস্করপো আর উনি। তিনজনের থালার পাশে-পাশে মাছের বাটি রেখে খুব তো চলে গেলেন উপরে, কিন্তু কী কারুকার্যটা করে গেলেন, ভাবলেন, কেউ বুঝি দেখতে পেল না। একজন তো আছেন চোখ মেলে, তিনিই দেখিয়ে দিলেন। দেখলাম, নিজের স্বামী-পুত্রের বাটিতে

দুখানা করে আর দেওরের বেলায় একথানা। মনে হল এ ক্রটি নয়, এ ক্ষুদ্রতা, এ অজ্ঞায়, একে উচিত নয় সহ্য করা। কিন্তু আছে কি কোনো প্রতিকার? চারদিকে একটু সতর্ক হয়ে তাকাতেই মিলে গেল প্রত্যুত্তর। মিটসেফের ভিতরে, প্রায় নিগূঢ়, লুকোনো একটা বাটি, আর, তার ঢাকা খুলতেই, সন্দেহ কি, ঝোলে-ভাঙ্গা ছুঁ টুকরো চাকা-চাকা মাছ। কী কর্তব্য স্থির করতে একচুলও সরতে-নড়তে হল না, পলকের মধ্যে বাটি দুটো বদলাবদলি করে ফেললাম।

‘আমি ভাগ করে দিয়েছি, আমার উপরে আবার কথা কী।’ লকলক করে উঠল মুণালিনী : ‘আমি বড় নই? আমার মান রাখবে না তুমি?’

‘বড় শুধু মানে নয়, বড় প্রাণে।’ পালটা জবাব দিল বিজয়া। ‘আর, প্রাণ ঠিক বড় না হোক, অন্তত প্রমাণসাইজ হলেই হাতের মাপ ঠিক থাকে।’

‘প্রশান্ত রুগ্ন, ওকে একটু বেশি খেতে দিলে তোমার হিংসে হয় কেন?’

‘একলা ঘরে-বাইরে যত খুশি থাক না প্রশান্ত, কে দেখতে যাচ্ছে, কে বলতে যাচ্ছে? কিন্তু একসঙ্গে এক পঙক্তিতে বসিয়ে ছোটকে বেশি ও বড়কে কম দেওয়ার স্বৈচ্ছাচারকে শোধন করার নাম হিংসে নয়, গণতন্ত্র।’

‘টাকার গরমে খুব যে বড় বড় কথা বলতে শিখেছ।’

‘বড়র কথা যখন তুলছেন তখন প্রশান্তর চেয়ে তার কাকা বড় ছিল। কিন্তু এখানে বড়-ছোটর কথা নয়, সমানত্বের কথা। আর, আপনাদের কথামত, বড় হলেই যদি তার বেশি প্রাপ্য, তবে, সেদিক থেকে দেখলেও—’

‘বেশি খেতে হলে বেশি দিতে হয়।’ দু হাত মুখের কাছে তুলে কাকে বেশি বলা হয় গহ্বর রচনা করে দেখাল মুণালিনী।

‘এখানে আহরণ তো ঠিকই ছিল, বিতরণেই গোলমাল। মস্তিষ্কটা এবার বউয়ের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজে দাঁড়ান না সরে।’

‘কোন দুঃখে? তার চেয়ে তোমরা এ বাড়ি ছেড়ে দূর হয়ে যাও।’

‘কার বাড়ি কে ছাড়ে!’ দিক্কারের মত হেসে উঠল বিজয়া।

‘কার বাড়ি মানে? এ বাড়ির ভাড়া কার নামে চলছে? ট্যাক্সো দেয় কে? কার নামে লাইসেন্স?’ যত কিছু শুনেছে বুঝেছে, একধার থেকে বলে যাচ্ছে মুণালিনী।

‘ঐ স্থখেই থাকুন।’ বিজয়া তেজী ভঙ্গি করে দাঁড়াল মোজা হয়ে : ‘বাড়িওয়ার সঙ্গে উনি দেখা করে এসেছেন। গোটা বাড়ি উনি কিনে নেবেন একলা, তখন কে কাকে তাড়ায় দেখা যাবে।’

‘দেখা যাবে।’ থপথপ করতে করতে দোতলায় উঠে গেল ঝণালিনী।

উপরে ধোপা এসেছে, এক তাল ময়লা কাপড়ের মধ্যে বসে খাতায় হিসাব লিখছে বন্দনা। হিসাব লিখছে মানে যোগে বিয়োগে হিমসিম খাচ্ছে। ধোপার মোট গণতির সঙ্গে কিছুতেই ষটাতে পারছে না অঙ্কের সমানত্ব। মাছ কমায় তো ঝোল বাড়ে, ঝোল কমায় তো মাছ লুকায়। মাছে-ঝোলে-কাঁটায় ষাঁট পাকিয়ে যায়।

‘তুমি কী করো? তুমি গিয়ে একটু দেখতে পারো না?’ ঝণালিনী এবার বন্দনাকে নিয়ে পড়ল।

‘বা, কখন থেকে তো আমি রামধরমকে নিয়ে আছি।’ ভীকু চোখে তাকাল বন্দনা।

এবার রামধরমের উপর উজ্জত হল ঝণালিনী : ‘তোমাকে কতদিন বলেছি না এই আফিসটাইম ঘেঁষে এসো না, বিকেলের দিকে এসো। বাবুরা সবাই অফিস-কাচারি বেকুবার সময় একগাদা ময়লা কাপড় দেখে গেল তো! কি জানি কি আছে আজ অদৃষ্টে। গোড়াতেই যা নমুনা—’

‘কী হয়েছে?’ মায়ের মুখের উপর প্রশ্ন করাও উচিত নয় অথচ না করাটাও কেমন, বলেই ফেলল বন্দনা।

ঝণালিনী কাঁদ-কাঁদ মুখ করে বললে, ‘প্রশান্তর মাছ খেয়ে নিয়ে গেছে।’

প্রশান্তর হাত না পা কাটা পড়েছে দুর্ঘটনায়, ট্রামের চাকা না বাস-এর চাকা খেয়ে নিয়ে গেছে এমনি যেন স্তনল বন্দনা। ‘কোথায়?’ ফ্যাকাশে মুখে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

‘মিটসেফে। বিকেলের জগ্গে যে মাছ তুলে রেখেছিলাম ঢাকা দিয়ে তার আত্মোপাস্ত কিছুই রাখে নি।’

খাতস্থ হল বন্দনা। আঙুলের মধ্যে ঝরনা কলমটা স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ পেয়ে নড়ে উঠল। বললে, ‘কে খেয়ে গিয়েছে? বেড়াল?’

‘বেড়ালের বড়দিদি। বিজয়া’

‘কাকিমা খেয়েছেন?’ হাসতে গিয়ে আঁতকে উঠল বন্দনা।

‘ও একই কথা। সোয়ামীকে খাইয়েছে। আর সকলের দুখানা করে, ওর সোয়ামীর একখানা। এ সইল না ঠাকরুনের। মিটসেফ থেকে চুরি করে এনে সোয়ামীর পাতে ঢেলে দিল।’

‘সে কি কথা? আফিস যাবার আগে খুব লাইট, হালকা খাবেন এই তো কাকার হুকুম। এক হাতা ভাত, এক চিলতে মাছ—’

‘আর, এক চামচ দই ! তোমাকে আর সর্দারি করতে হবে না, বউমা ।’ কান ঠিক খাড়া রেখেছিল, নিচে থেকে বিজয়া ঝংকার দিয়ে উঠল : ‘কবে আবার ঐ ফরমান জারি করল তোমার কাছে ? কই আমি তো শুনি নি । ভাবখানা দেখাচ্ছ যেন ঐ নির্দেশের জন্তেই ঐ সব ব্যবস্থা । তাই যদি হবে তবে দু টুকরো মাছের ভরপুর ঝোলের বাটিটা উনি ‘না’ করলেন না কেন ? চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে যেন খেলেন চেটেপুটে ? সর্দার ! হালকা খাওয়াবার আর তুমি জায়গা পেলে না ?’

কী বলতে যাচ্ছিল বন্দনা, চোখে-মুখে নীরব তর্জন করে দমন করল মৃণালিনী । তারা দু-জন, শাশুড়ি-বউ, এক পক্ষে, ইঙ্গিতটা তাই বিশদ করল । বললে, ‘কিছু বলতে যেও না । ওরা এই বাড়ি কিনছে, কিনেই উচ্ছেদের নোটিশ দেবে আমাদের ।’

‘খাঁদা নাকে অনেকেরই নথ পরতে সাধ যায় ।’ মুখ টিপে হাসল বন্দনা । ‘তা স্নাকরার বাড়ি থেকে নথ আগে আসুক গড়িয়ে । যতদিন না আসে ততদিন নাক উচু করতে না চাওয়াই ভালো ।’

‘হ্যাঁ, ততদিন মানতে হবেই আমার কস্তান্তি । শোনো, আমি আবার বাজার থেকে মাছ আনাচ্ছি ।’ ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে টাকা বের করল মৃণালিনী : ‘তুমি গিয়ে রেঁধে ফেলো নতুন করে । রেঁধে মিটসেফে রেখে তাল দিবে বন্ধ করে এসো ভালো করে । হ্যাঁ, রুপোর মল আগে গড়িয়ে আসুক তারপর যেন গোদা পায়ের লাখি তোলে !’

বারান্দার একধারে ছোট আয়নাটাকে অনেক কায়দা কসরৎ করে ঢাঁড় করিয়ে লাড়ি কামাচ্ছে স্বকাস্ত, বুকের ভিতরটা এবার ছাঁৎ করে উঠল । এবার না তাকে স্মরণ হয় ! বাজারে যাবার লোকের দরকার, এবার না ঝোপ বুকে কোপ পড়ে । মাছ থাকে-অন্তে আর কাঁটা বিঁধবে তার নিজের গলায় । নতুন করে গালে সাবান ঘষতে লাগল স্বকাস্ত । ভাবখানা এমন যেন কারুকার্যের এই মোটে আরম্ভ ।

মৃণালিনী নিচেই নেমে গেল চাকরের খোঁজে । নিচে আবার না আরেক প্রশ্ন ওক হয় ! এক দেশের বুলি তো অন্য দেশের গালি । মায়ের কাছে কাকিমা চোর, কাকিমার কাছে মা জোচ্চোর । যেমন হিটলারের কাছে চার্চিল, চার্চিলের কাছে হিটলার । অথচ কী সামান্য নিয়ে কলহ, কী অসামান্য ক্ষুদ্রতা ! এ মিটেবে কবে, মিটেবে কিসে ?

ঘন করে ফের বৃকশ করতে লাগল স্বকাস্ত, কিন্তু, এ কী, নিচে আবার এ কিসের গোলমাল ?

হরিপদর খোঁজে মৃণালিনী সদরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, ব্যাগ কাঁধে অচেনা মহিলা সামনে পড়তেই ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘না, না, এ বাড়িতে নয়। এ বাড়িতে লাগবে না। অন্ত্র বাড়ি দেখুন।’

‘আমাকে বলছেন?’ সদরের মুখে, রাস্তার উপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি।

‘তু ছাড়া আবার কাকে! আপনি কী এনেছেন, কিসের স্ত্রাস্পল?’

‘স্ত্রাস্পল?’

‘হ্যাঁ, চা, না, সাবান, না গুঁড়ো দুধ? যাই আনুন, কিছু লাগবে না আমাদের?’ মৃণালিনী চাকরের জন্তে উকিরুঁকি মারতে লাগল।

‘না, চা হলে আমার লাগবে।’ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল বিজয়া; ‘এজমালি চায়ে ভীষণ ঝামেলা, তাই আমার আলাদা স্টোভ জলে। আলাদা টি-সেট। আনুন। আপনি কোন কোম্পানির এজেন্ট? দার্কিলিং না আসাম না মধ্যপ্রদেশ?’

হাসতে-হাসতে প্যাসেজটাতে উঠে এল কাকলি। বললে, ‘না, আমি এজেন্ট নই, আমি প্রিন্সিপ্যাল।’

‘প্রিন্সিপ্যাল?’ হাঁ হয়ে গেল মৃণালিনী।

‘কোন কলেজের?’ সবিস্ময় চোখে জিজ্ঞেস করল বিজয়া। সসঙ্কমে বললে, ‘আনুন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে আনুন। ফ্যান আছে ঘরে।’

বাইরেই দ্বিধা করতে লাগল কাকলি। বললে, ‘প্রিন্সিপ্যাল মানে বলতে চাচ্ছি, আমি নিজেই নিজের কর্তা, কারু আমি প্রতিনিধি নই। গোমস্তা বা আমমোক্তার নই। তা ছাড়া অধ্যক্ষ হব কোথেকে? আমি এখনো ছাত্রী।’

‘এত বড় মেয়ে এখনো ছাত্রী?’ মৃণালিনী আবার প্রায় হাই তুলল : ‘ঠিকমত প্রমোশন পাও না বুঝি?’

‘প্রায় তাই। এবার শেষ প্রমোশনের চেষ্টা।’ কাকলি বাড়ির মধ্যে তাকাল।

‘শেষ মানে?’ বিজয়া বেশি ওয়াকিবহাল, তাই গভীর আন্দাজ করল : ‘বি-এ দেবে বুঝি?’

‘এম-এ দেব।’

‘এম-এ!’ বিজয়ার কটাক্ষ মৃণালিনীর উপর। বললে, ‘এইটুকু ছোট এক চিলতে মেয়ে, এম-এ দেবে! বলো কি!’

মৃণালিনীও গভীর হতে জানে। বললে, ‘কেন, আমার স্বকু—স্বকাস্ত—সেও তো এবার এম-এ দেবে।’

‘ও! আপনিই তা হলে স্বকাস্তবাবুর মা?’ অক্লেশে মৃণালিনীকে প্রণাম করল কাকলি। বিজয়ার দিকে তাকিয়ে বললে, ‘আপনি?’

‘যাই হই, ঠুকে যখন করেছ আমাকেও করতে পারো।’ বিজয়া চিড়বিড় করে উঠল।

বিজয়াকেও প্রণাম করতে দেয়ি হল না। সহাস্ত নম্রমুখে বললে, আমি আর স্বকাস্তবাবু একসঙ্গে পড়ি, একই বিষয়। পরীক্ষাসমূহে আমরা একই জাঁহাজের সোয়ারি, যদিও উনি ফার্স্ট ক্লাশ কেবিনে আর আমি থোলা ডেকে। উনি বাড়ি আছেন? তাকাল মৃণালিনীর দিকে।

‘কী জানি আছে কিনা! সারাক্ষণই তো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়।’ মৃণালিনী পাশ কাটাতে চাইল: ‘পড়ার নামে ঠনঠন। কখন বেরিয়ে গেছে টো-টো কোম্পানি হয়ে কিছু ঠিক আছে?’

‘আপনি জানেন?’ কাকলি তাকাল বিজয়ার দিকে।

‘অনেককণ তো শুনি নি সাদাশব্দ। বোধ হয় নেই।’ মৃণালিনীর সঙ্গে চোখো-চোখি হল বিজয়ার।

‘দেখুন না একটু। ঠুকে আমার দরকার।’ যেন পুলিশ হয়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছে এমন শোনাৎ কাকলিকে।

‘কেন, দরকার কেন?’

‘আমার প্রোফেসর, মানে যিনি আমাকে বাড়িতে পড়ান, তিনি জানতে পেরেছেন কটা প্রশ্ন যা ঠিক আসবে পরীক্ষায়, নির্ঘাত আসবে।’ ঢোক না গিলে দ্বিবি বানাতে পারছে কাকলি: ‘যতই কম পড়ুন স্বকাস্তবাবু ঠিক পাবেন ফার্স্ট ক্লাশ, আর যদি এ প্রশ্নগুলিও তাঁকে পৌঁছে দিতে পারি তবে আর দেখতে হবে না, একেবারে সকলের মাথার উপরে। চুড়োর উপরে ময়ূরপাখা হয়ে বসবেন। তাই ঠুর জন্তেই ঠুকে দরকার, আমার জন্তে নয়!’ বলতে বলতে নিজেই হু পা এগিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

‘হু, হু!’ স্বর যতদূর কর্কশ করা যায় ডাক ছাড়ল মৃণালিনী: ‘ত্যাখ এসে কে এক মেয়ে তোকে ডাকছে, কে এক ছাত্রী—’

খালি পা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে হাত-কাটা গেঞ্জি, এক গালে সাবান, আরেক গাল কামানো, পড়ি-মরি ছুটে এল স্বকাস্ত। দেখল কাকলি দাঁড়িয়ে। অভ্যাসের দেশে আশ্চর্যের মত। যে মাধুরীর শেষ নেই, ইয়ত্তা নেই, যে মাধুরী আত্মদ করে জীবনে কেউ বললে না আমার আশা মিটেছে, সেই নিত্য-অক্লান্ত নিত্য-অপূর্বের মত। পাষণ্ডপুত্রের তলে অজানা নিৰ্বরিণী।

‘এ কী, আপনি?’ ন যথো ন তস্থোর মত করে উঠল স্বকাস্ত ।

যেন স্বকাস্তকে এখন দু চোখ ভরে দেখবার মত নয় এমনি উদাসীন চোখে ব্যাগ ঝাঁটতে লাগল কাকলি । বললে, ‘দাঁড়ান, যার জন্তে আসা, আপনাকে কটা ‘শিওর’ কোশ্চেন দিই । আপনাকে কিন্তু কপি করে নিতে হবে ।’

‘আপনি একটু বহন কাকিমার ঘরে । ঐ ঘরেই শুধু ফ্যান আছে এ বাড়িতে ।’
দিশেহারী উদ্যস্ত হয়ে উঠল স্বকাস্ত : ‘আমি একটু আসছি মাহুস হয়ে ।’

‘এখন বুঝি বনমাহুস আছেন !’ স্বচ্ছ শ্রোতে সারল্যের ধ্বনি তুলল কাকলি :
‘আর কাগজ-কলম নিয়ে আসবেন ।’

‘না, আমার ঘরে অত লেখালেখির জায়গা নেই ।’ বিজয়া কাঠ-কাঠ গলায় বললে,
‘তোমার নিজের ঘরেই নিয়ে যাও । সেখানেই ভালো জমবে ।’

‘তাই চলুন ।’ যেন বাঁচিয়ে দিয়েছে এমনি কৃতজ্ঞ চোখে বিজয়ার দিকে তাকাল কাকলি ! তারপরে নির্ভয়ে, যেন কতদিনের আনাগোনা, ভিতরে ঢুকে পড়ল । উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে । যেন স্বকাস্ত তাকে টেনে আনছে না । কাকলিই তাকে ঠেলে তুলছে ।

দুই জায়ে আর ঝগড়া নেই, তৃতীয় একটি মেয়ের বিষয়ে আলোচনার খাতিরে একত্র হয়েছে ।

‘কে এই মেয়ে?’ বিজয়া কোন হৃদিস দিতে পারে কিনা এমনি অসহায় চোখে তার দিকে তাকাল মৃণালিনী ।

‘আর কে ! স্বকাস্তের বন্ধু । নইলে, কী সাহস দেখলেন, সটান ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে?’ মৃণালিনীর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়াল বিজয়া ।

‘বন্ধু মানে?’ হতাশপাংগু মুখ করল মৃণালিনী ।

‘ঐ যে নাকে দড়ি বিঁধিয়ে টানে । মানে যে বেঞ্জে আর বাঞ্জে তাকেই বন্ধু বলে । কিন্তু যাই বলি মেয়েটা কিন্তু দেখতে মন্দ নয় ।’

‘আর বেশ বড়লোক, তাই না? বাপ না জানি কী করে!’ মৃণালিনী বিজয়ার কাছে আবার আশ্রয় খুঁজল ।

‘হাতে ঘুড়িচুড়িবিাগ জামায় ফাউন্টেন পেনের ক্লিপ এই সরঞ্জাম থেকে আর কী বোঝা যাবে?’

‘কিন্তু হাতে চুড়ি একগাছা দুগাছা নয়, চারগাছা করে । তা বুঝি দেখিস নি?’ আরো সন্নিহিত হল মৃণালিনী ।

‘আরো কত দেখব কে জানে ।’

এক রাজ্যের নোংরার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসছে কাকলিকে। নিচে এঁটো বাসনের পাহাড় পড়ে আছে, উপরে ময়লা কাপড়ের হুড়। সমস্ত শরীরে ছি ছি করে উঠল স্বকান্ত। আর তার নিজের এই রাজসজ্জা!

‘আপনাকে একটা জঙ্ঘালের জঙ্ঘলে নিয়ে এলাম’ উঠতে উঠতে স্বকান্ত বললে।

‘আহা, এতে কুণ্ঠিত হবার কী! এ সব আবর্জনাই তো সংসারের শোভা!’ এক কথায় জল করে দিল কাকলি।

‘আর এই আমার বউদি। গোময়ে কমলমণি।’ বন্দনাকে লক্ষ্য করল স্বকান্ত।

প্রস্তুত হতে দিল না, রূপ করে বন্দনাকে প্রণাম করল কাকলি।

‘আর এ কাকলি।’ কী বিশেষণ দেবে একসঙ্গে এতগুলি সিঁড়ি ভাঙবার পর স্বকান্তর মাথায় এল না।

একসঙ্গে ঘরে ঢুকল দু-জনে আর বন্দনা নিচে শায়িল হবার জগ্গে ছুট দিল! সম্মিলিত আলোচনার বৈঠকে তারও কোন না বক্তব্য পেশ করা যাবে!

‘তুমি কী জাহুকরী!’ বিগাঢ় চোখে তাকাল স্বকান্ত।

‘তার চেয়েও বেশি।’ হাসতে লাগল কাকলি: ‘সাবানের এজেন্ট। ওঁরা তাই আমাকে ভেবেছেন নিচে।’

‘সাবানের এজেন্ট! ঠিকই ভেবেছেন তবে।’

‘ঠিকই ভেবেছেন?’

‘ইয়া, কে জানে এ সংসারে অনেক ময়লা লাফ হবার জগ্গে তোমার সাবানের অপেক্ষা করে আছে। আগে থেকে খবর দিয়ে আস নি কেন?’

‘তুমি খবর দিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে একেবারে ধরে ফেলে দিলে স্বপ্নের মধ্যে।’ চোখের মধ্যে কোঁতুকের কুহক নিয়ে তাকাল কাকলি।

‘আমি তার চেয়েও স্বপ্ন।’ ত্র্যাকেটে হাত বাড়াল স্বকান্ত: ‘দাঁড়াও, জামাটা গায়ে দিই।’

‘কেন, মাহুঘ হতে চাও? বেশ তো দেবতা হয়ে আছ। তাই আরেকটু থাকো না দেবতা হয়ে।’

ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল স্বকান্ত। আশেপাশে দ্রুত তাকিয়ে বললে, ‘দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।’

পাশের ঘর থেকে দু হাতে করে কী একটা মস্ত পুতুলের মতন কাকে নিয়ে এল স্বকান্ত। বললে, ‘এই আমার সেন্টু। আর, সেন্ট,’ পুতুলটার দিকে তাকাল: ‘এই কে জানিস?’

কোল থেকে ঘাই দিতে-দিতে নেমে পড়ল সেন্টু। বললে, ‘কে?’

‘সেই তোকে বলেছিলাম না, এমন এক লোক আছে যে আসে অথচ দেখা দেয় না, সে।’

‘তুমি সেই?’ নিচু একটা তক্তাপোশের উপর বসেছে কাকলি, তার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল সেন্টু।

‘হ্যাঁ, সেই।’ দু হাতে তার চুলের মধ্যে আনন্দে হাত ঢুকিয়ে দিল কাকলি।

‘না রে, সে নয়। আরেকজন।’ ব্র্যাকেট থেকে জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল স্বকান্ত। বললে প্রায় বিষন্ন স্বরে, ‘যে দেখা দেয় অথচ আসে না সে।’

... ৯

পড়তে-পড়তে কাকলি তাকাল জানলা দিয়ে। আবার মেঘ! সকালবেলায়ই মেঘ কেন? সেদিন তো বিকেলবেলা করেছিল।

বিকেলবেলা বৃষ্টি হলে সকালবেলা হতে পারবে না? রাত্রে ভালবাসা এসেছিল বলে কি আসবে না ভোর হলেও?

আম্বক বৃষ্টি। নামবার আগেই ঠিক বেরিয়ে পড়বে কাকলি। ভিজবে। ক্লপণ আত্মরক্ষার জন্তে ছুটোছুটি করবে না। মন ভাসিয়ে দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁচাতে চাইবে না। বৃষ্টি না হলে যেমন যা করত বৃষ্টি হলেও তেমনি তাই করে যাবে। শাস্ত পায়ে হাঁটতে-হাঁটতে পৌঁছুবে তার গন্তব্যে। সর্বাঙ্গীণ শীতলতা হয়ে দাঁড়াবে সামনে।

তারপর?

জানি না। মনে-মনেই একটু হাসল বৃষ্টি কাকলি।

না, জানি। সোনা-চালা রোদ উঠবে। গায়ে-গায়েই শুকিয়ে নেব শাড়ি জামা। তত্ত্ব হতে সূক্ষ্ম হতে তপ্ত হতে পালাব না বাড়ি, নিষ্ঠুরির বন্ধ গুহায়। থাকব আকাশের নিচে। উন্মুক্তির দরবারে। যে আকাশ ভিজিয়েছে সে আকাশই শুকিয়ে দেবে।

যে প্রেম ঘরছাড়া করেছে সে প্রেমই মিলিয়ে দেবে ঘর।

সেদিন স্বকান্ত কি রকম ভিজিয়েছিল! ছি, ছি, এমন অবস্থায় কেউ আসে? সিনেমার টিকিট কাটা থাকলেও কেউ আসে না। বাতিল করে দেয়।

কিন্তু, যাই বলা, স্বকান্ত এসেছিল সত্যের টিকিট কেটেছিল বলে। কথা যখন

দিয়েছে, রেখেছে কথা। বৃষ্টি-আগুন, বজ্র-বজ্রা, কিছুই গ্রাস করে নি। আগাপাশতলা ভলের মধ্যে সত্যের মত অপূর্বের মত এসে দাঁড়িয়েছে।

সত্যি, কী অদ্ভুত হৃদয় দেখতে হয়েছিল স্বকান্তকে। মাথার চুলের কতকগুলি ভিজে রেখায় নেমে এসেছে কপালে, কপাল ছাপিয়ে চোখের উপর, ঠোঁটের কিনারে জল, দুই চোখের পলকে, চিবুক বেয়ে কানের লতি বেয়ে ঝরছিল ফোঁটা-ফোঁটা। জামা আর পরনের ধুতি জায়গায়-জায়গায় লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে— কী অমান হৃদয় দেখাচ্ছিল স্বকান্তকে, কী দুর্ধ্ব স্বাভাবিক! কাকলি যে কাছে যায় নি, দূরে তিড়ের আড়ালে লুকিয়েছিল, সে শুধু ভয়ে। ভয়ও একটা স্বথ! কিন্তু যাই বলো, এমন একটা জলজ্যাস্ত সমস্তার সামনে কী মীমাংসা নিয়ে দাঁড়াতে পারত সে! কী দাঙ্গনা ছিল তার সঙ্গে, কী তাপতাও! কিন্তু এ কথা ভোলা যায় কি করে, তার ভুলেই তো ভেজা। সারারাত কী কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে কাকলির। তারপর, কে জানে, ঠাণ্ডায় যদি অস্বথ করে! কাকলি জানতেও পারবে না। যদি বাড়াবাড়ি হয়! কে বলে দেবে তার ঠিকানা। কে বা মনে করে রাখবে সেই বিদ্যুটে প্রত নাহার! কে বা লিখবে। আর লিখবেই বা কেন?

টক করে কাছে এসে দেখা দিলে কী এমন অশুদ্ধ হৃত! বরং দেখা না দেওয়ার দরুন স্বকান্ত কী ভাবল তাকে? মিথ্যাবাদী ভাবল, নয়তো ভাবল, অসহায়, নিকৃপায়, পরাবীন অপোগণ্ড। নাবালক ভাবল। ছি ছি, কী স্বার্থপর কাকলি! নিজে কেমন অপলক চোখে দেখে নিল অপরূপকে, অথচ স্বকান্তকে জানতেই দিল না ভলের মকড়ুমির মধ্যে কোথাও রয়েছে একটি ফসলের খেত, তার সন্ধানের অদূরেই সোনার স্বীকৃতি। কেমন এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল গোবেচারার মত। মা-হারা শিশুর মত। অন্তত দেখা দিয়ে ওর মুখে আনতে পারত তো একটু তৃপ্তির রং। আর কিছু না হোক, তাকে দিতে পারত তো একটু কথার উত্তাপ, একটু বা চোখের দৃষ্টির সঁক। তাই নিয়ে রাজা হয়ে ফিরে যেতে পারত বাড়িতে। অন্ধ-প্রত্যঙ্কে এত ভিজল অথচ মনই ভেজাতে পারল না একটুকু। ও চলে গেলে পর, বৃষ্টি খামবার পর, গাড়ি ফিরতে কাকলিও কম কাঙালিনী সাজে নি। কাউকে বঞ্চিত করলে নিজেও বৃষ্টি কিছু সঞ্চিত থাকে না।

সাধে কি আর হাতছানি দিয়ে ডাকার কথা বলেছিল সেদিন বানিয়ে? স্বকান্তর কাছে সে ঋণী হয়ে আছে না? শঠের ঋণ শাঠা দিয়েই শোধ করা উচিত কিনা জানি না কিন্তু হঠকারীর ঋণ তো হঠ দিয়েই শোধ করতে হয়। আর, কেমন অসম্ভব হৃদয়ভাবে সে এল! সেই বৃষ্টিতে আসার চেয়েও হৃদয়। কাউকে জানতে দিল না।

বুঝতে দিল না। প্রস্তুত হতে দিল না, যেমন ঘুমের মধ্যে মৃত্যু আসে, তেমন সহজের মত অবধারিতের মত এল। কোনো বিধি কোনো নিষেধ মানল না, খাটলও না বুঝি। সবাইকে চটিয়েও কেমন পটিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাবা ভক্ত দিয়ে স্তনেন গিয়ে ঘরে। মা প্লেট সাজালেন খাবারের। জলখাবার দেবার পর কোথাও তর্জন-তিরস্কার হল না। না খেয়ে গেলেও পরিবেশটি মিঠে হয়েই রইল। শুধু ছাদে নয়, ঘরে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, কদম ফুল রেখে গেছে তার নিখাসের জাহ্ন।

কাকলিও প্রতিশোধ নিতে জানে। কেমন অসাবধানের মধ্যে ধরে ফেলেছি বলো। আক্সিটাইমে কর্তব্যাক্তিদেব বেরিয়ে যাবার পর, এলোমেলো সংসারের মাঝখানে কেমন চলে এসেছি ফিরিওলা সেজে। বাবুরা বেরিয়ে গেলেই তো ফেরিওয়াল আসে। কিন্তু আমার আসা মেয়েদের কাছে নয়, আরেকজনের কাছে। আর এ ফেরি বেচবার নয়, অমনি দিয়ে দেবার।

এখন তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছলেই বা কি, গেক্সির উপরে পাঞ্জাবি চড়ালেই বা কি, আমি দেখে নিয়েছি। কী দেখে নিয়েছ? আমার অপরিচ্ছন্নতা? আমার দারিদ্র্য? মোটেই তা নয়। দেখে নিয়েছি তুমি ছোট একটি শিশুর মতই সরল হয়েও ছুরস্তু, চঞ্চল হয়েও অসহায়। নইলে এখন তোমার মা, মৃণালিনী উপরে উঠছেন, হয়তো বা তোমাকে মোকাবিলা করতে, তাই দেখে কেমন ভয় পেয়ে গেলে। কি আশ্চর্য, মাকে অমন ভয়?

টেবিলের সামনে তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খাতা মেলে ধরে কলম উত্তত করল স্বকাস্তু। চৈটিয়ে বললে, ‘বলুন প্রশ্নগুলো।’ তারপর অহুচ্চ কণ্ঠে যোগ করল: ‘যা হয় কিছু বানিয়ে-টানিয়ে বলো। একটা পড়াশোনার অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করো। খবরদার, হাসি-হাসি মুখ নয়, সিরিয়স মুখ করো। মাস্টারি মুখ। পশ্চাৎ যা হবে তারই প্রাক্ছায়া আনো।’

‘তা হলে হাসি-হাসিই রাখতে হয়।’ হাসল কাকলি।

মৃণালিনী দরজার কাছে এসে থামল, ভিতবে ঢুকল না। স্বকাস্তুকে গন্তীর মুখে ডেকে নিল বাইরে।

কী না জানি আদেশ হয় মার। হয়তো সঙ্গচ্যুত করবার উদ্দেশ্যে বাজারে পাঠিয়ে বসবে। শুধু স্বর্গ থেকে বিদায় নয়, নরকে বদলি। যা, ঠোঙায় করে সিঁজাড়া সন্দেশ নিয়ে আস।

বাইরে, বারান্দায়, বেশ খানিক দূরেই মৃণালিনী টেনে নিলেন স্বকাস্তুকে। গলা খাটো করে বললেন, ‘ও কার মেয়ে?’

‘কার মেয়ে মানে? ভত্রলোকের মেয়ে।’ স্বকান্ত অবাক হয়ে রইল।

‘না, না, সে কথা নয়। বলছি ওর বাবা কী করে? কোনো বড় চাকরি? বড় ব্যবসা?’ গলা খুব খাদে রাখতে পাটু ন না মুণালিনী।

‘ওর বাবা কী করে তা দিয়ে কী হবে?’ স্বকান্ত বিরক্তির ধার ঘেঁষে দাঁড়াল : ‘ও আমার সঙ্গে পড়ে, এক ক্লাশে, এক সঙ্গে পরীক্ষা দেব’ এ বছর, এই ওর যথেষ্ট পরিচয়। ওর বাবাকে কী দরকার?’

‘আহা! সেই কথা নয়।’ চোখে মুখে অস্থিরের ভাব আঁকল মুণালিনী : ‘আমাদের মধ্যে একটা কথা উঠেছে, প্রায় বাজি ধারার মত। আমি আর বউমা একদিকে আর বিজয়া, তোর কাকিমা আরেক দিকে। আমরা বলছি ওর বাবা নিশ্চয়ই কেউ গোমরাচোমরা হবেন আর বিজয়া বলছে, হেঁজিপেঁজি, আজ্ঞেবাজের বেশি হবে না। তুই জানিস?’

‘জানি বৈকি।’

‘কী? উকিল, কেরানি, মাস্টার?’

‘না, না, চুনোপুঁটিদের কেউ নয়, বাঘসিংহ। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।’

উজ্জল চোখ উৎফুল্ল করে নিচে নামতে গেল মুণালিনী। সিঁড়িতে বন্দনার সঙ্গে দেখা। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে জজটাই তার পছন্দ হল। যার প্রতাপে তার স্বামী পর্যন্ত তটস্থ সে-ই নিশ্চয় মহা-মহিম। বন্দনাকে বললে, ‘বলো গে বিজয়াকে, জজসাহেবের মেয়ে।’

আর সেইটেই বাড়িয়ে বন্দনা বললে, ‘সুনেছেন কাকিমা, যে-সে নয়, হাইকোর্টের জজের মেয়ে।’

সুয়ে সুয়ে হাই তুলছিল বিজয়া। বললে, ‘হ্যাঁ, এমনি হাই-তোলা কোর্টের জজ। আর বিস্ত্র ফলিও না বউমা। সত্যিকার হলে বাড়ির গাড়ি করে আসত, পায়ে হেঁটে আসত না।’

‘কেন, গাড়ি তো ওদের আছে।’ এমনি ভাবে বললেই কথাটা জমে তাই বললে বন্দনা।

‘হ্যাঁ, জানি, আছে, কারখানায় আছে। যখনই জিজ্ঞেস করবে গাড়ি কোথায়, তখনবে কারখানায়।’ খাটে ম্যাগাজিন হাতে উঠে বসল বিজয়া : ‘গাড়ি না হয় হল, কিন্তু শাড়ি কোথায়? শাড়ি বুঝি শালকরের দোকানে?’

‘কেন, যেটা পরে এসেছে সেটা শাড়ি নয়?’

‘ওটা কাপড় নিশ্চয়ই, আর যখন চওড়া পাড় আছে রয়ে-সয়ে বলা যায় শাড়ি। কিন্তু আটপোঁরেরও একটা সীমা আছে।’

‘ভুলে যাচ্ছেন কেন, ও ছাত্রী।’

‘ছাত্রীদের চিনতে আর বাকি নেই। চিকনচাকন দিতে পারলে কেউ ছাড়ে না। তুমি যা বললে, ওই যজন-যাজনের মেয়ে হলে দেখতে কেমন জলে ঢেউ দিত। বললাম নেহাতই গরিব-গুরবো, অল্পপুঁজি—’

প্রত্যক্ষ শাস্ত্রাতের পরেও এই কথা। অসহ্য লাগল বন্দনার অকারণে পরনিন্দা, পিতৃনিন্দা, ঝাঁজিয়ে উঠল মুখের উপর : ‘যত পুঁজি আপনার। যত বিজ্ঞেবুদ্ধি সমস্ত আপনার একার পেটে।’

এখন আবার এই বউটার সঙ্গে ঝগড়া করো। বিজয়া বিতৃষ্ণায় মুখ কিয়িয়ে নিল। মাগাজিন হাতে আবার হেলান দিল বালিশে।

এদিকে একটা হাতপাখা কুড়িয়ে নিয়ে ঝগালিনী স্বকাস্তর ঘরে ঢুকল।

স্বকাস্ত কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, ‘হ্যাঁ, বলুন, তারপর—’

‘তুই কী!’ স্বকাস্তর উদ্দেশ্যে শাসনের ভঙ্গি করল ঝগালিনী : ‘তুই ওকে গাড়া তক্তপোশে বসিয়ে নিজে চেয়ার নিয়েছিস!’

‘উপায় কী! আমি যে লিখছি টেবিলে। উনি তো লিখছেন না, লেখাচ্ছেন হ্যাঁ, তারপর বলুন, কোশেন নাশ্বার কোর—’

‘এ ঘরটায় ফ্যান নেই।’ কাকলিকে ঝগালিনী মৃদু-মৃদু হাওয়া করতে লাগল।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল কাকলি। ‘কী সর্বনাশ!’ হাত থেকে শ্রায় জোড় করে কেড়ে নিল পাখা। উলটে ঝগালিনীকেই হাওয়া করতে লাগল।

ঝগালিনী সরল ঘরের বাইরে। বললে, ‘কী দেব তোমাকে? সরবৎ না চা?’

‘যা আপনার খুশি।’

‘বাতাস দিয়ে মাকে তাড়ালে।’ বললে স্বকাস্ত, ‘এবার তবে একটু আমাকে দাও। পরিশ্রম তো আর কম হচ্ছে না।’

‘বয়ে গেছে। এই সুযোগে আগাম সেবা পাবার চালাকি, তা বুঝি আমি বুঝি না?’ কাকলির চোখের শাদায় কালো তারা ছুটি টলমল করে উঠল। ‘বরং তুমি যদি দাও—’

‘দেব?’ উঠি-উঠি করল স্বকাস্ত।

‘আমি তাড়ালাম মাকে, তুমি তাড়াও আমাকে।’

‘রক্ষে করো। দরকার নাই পাখা। অন্ধ-বন্ধ হয়ে থাকাই ভালো।’ হাসল স্বকাস্ত : ‘কিন্তু দেখলে তো আমার মা কত মিষ্টি। চা চাইলে চা, সরবৎ চাইলে সরবৎ।’

‘সব মা-ই মিষ্টি। তুমি আমার মার হাত থেকে নিলে না কেন খাবারের প্লেট?’

‘মূলতুবি রেখে এলাম। আর, জানো তো, ময়রার মিষ্টি নয়, আমি গাছের ফল চাই। টাটকা ফল। আর সে ফল ধৈর্যের ফল।’

‘তার মানে,’ চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি, ‘বলতে চাও সবুরেই মেওয়া ফলে।’

চলে যাবার সময় আবার এক চালাকি করল কাকলি। বললে, ‘বড় রাস্তার শটকাটটা বলে দিন। আসবার সময় কত যে ঘুরেছি এদিক-ওদিক তার ঠিক নেই।’

শটকাট বন্দনাও বলে দিতে পারে কিন্তু যদি কেউ জেগেও চোখ বুজে থাকে, সরলকে জটিল করে রেখে তা হলে কার কী সাধ্য!

মুণালিনী বললে স্বকাস্তকে, ‘তুই যা না, একটুখানি দে না এগিয়ে।’

বাইরে রোদের দিকে তাকাল স্বকাস্ত। বললে, ‘এই রোদে বেরুলে ঠিক মাথা ধরে যাবে।’ তারপর কাকলির দিকে তাকিয়ে বললে, ‘যদি আসতে পারেন যেতেও পারবেন। বরং আসার চেয়ে যাওয়াটাই সোজা। চলে যান নাক ধরে—’

‘তুই কী!’ মুণালিনী গল্পনা দিল: ‘তোর জন্তে দরকারি প্রশ্ন নিয়ে এল বাড়ি।’
বয়ে আর তোর এতটুকু রুতজ্ঞতা নেই। ছু পা এগিয়ে দিতে পারিস না?’

‘মাথা ধরে যে।’

‘বেশ, আমি ছাতা দিচ্ছি।’ বন্দনাও কাকলির দিকে।

‘থাক, এক ধরা ছিল মাথা, আরেক ধরা হবে ছাতা।’ মুখভরা অনিচ্ছা নিয়ে কাকলির দিকে তাকাল স্বকাস্ত। বললে, ‘বলিহারি আপনাদের। তালুক-মূলুক চুড়িতে পারেন একা-একা, বাড়ির রাস্তায় গাইড চাই। ঐ যে বলেছে সারা ঘর লেপে এসে ছুয়ারে আছাড়—আপনাদেরও তাই হয়েছে। চলুন—’

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কয়েক পা এগুতেই কাকলি বললে, ‘উঃ, তুমি কী মিথ্যা কথাই যে বলতে পারো। মুখে এতটুকু বাধে না।’

‘আর তুমি? চালুনির কাছে ধুচুনি।’

‘হু-জনেই সমান।’ হেসে ফেলল কাকলি।

‘কার নিন্দা করো তুমি, এ আমার এ তোমার পাপ।’

‘খুব পাপ হচ্ছে, তাই না?’ চোখ মুখ আঁর্ত করল কাকলি।

‘মোটোও না। এ ব্যাপারে মিথ্যে দোষের নয়।’

‘কোন ব্যাপারে?’

‘প্রণয় ব্যাপারে।’

‘কে বলেছে?’

‘শাস্ত্র।’

‘না, না, সে কথা নয়। কে বলেছে তোমাকে যে এ ব্যাপারটা প্রশ্ন?’

‘না, না, কেউ বলে নি। তবে তো নিঃসংশয় মিথো। বিনিশ্চিত পাপ। নির্ধাত নরকবাস।’ চোখ মুখ কালো করল স্কাকান্ত।

‘হু-জনে একসঙ্গে তো?’ হেসে ফলল কাকলি।

কতক্ষণ চলবার পর স্কাকান্ত বললে, ‘সাত পার বেশি হাঁটলাম একসঙ্গে। সাত পা একসঙ্গে হাঁটলে কী হয়?’

‘কিছুই হয় না। বড় জোর একটা স্টেট লাইন হয়।’

‘শাস্ত্রে যে বলে—’

‘আবার শাস্ত্র! শাস্ত্রীয় কিছু হতে হলে একটা মণ্ডলের চারপাশে ঘোরা চাই।’

আবার হাসি।

জানলা দিয়ে আবার তাকাতেই কাকলি দেখল মেঘ নেই। রোদে পথঘাট দোকান-বেসাত ট্রাম-বাস লোকজন সব ঝলমল করে উঠেছে।

তোড়তোড় করে বেকুচ্ছে, বেলা প্রায় দশ, বিনতা এসে হাজির। বিনতা কাকলির এক কলেজের হলেও দু বছরের অগ্রণী, বি-টি পাশ করে চেতলার কোন মেয়ে-ইঙ্কলে মাস্টারি করছে। বয়সে কিছু বড় হলেও হুস্ততায় সমান-সমান। দয়ন্ত। নির্জন-গোপনের অংশীদার।

‘এ কি, বেকুচ্ছিস? কোথায়?’ বিনতা প্রশ্ন করল ব্যস্ত হয়ে।

‘ছাত্রীবন্ধুর বাড়ি।’ মুখ টিপে হাসল কাকলি। বললে, ‘সকালের দিকে হলে ছাত্রীবন্ধু, দুপুরের দিকে হলে লাইব্রেরি, সন্ধ্যের দিকে হলে প্রোফেসর। তার মানে বুঝতেই পাচ্ছিস—’

‘কী বুঝতে পারব?’ ইঁ হয়ে রইল বিনতা।

‘তার মানেই মিট করতে যাচ্ছি।’

‘কার সঙ্গে মকদ্দমা?’

সশঙ্কে হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘এ বাংলা মিট নয়, ঝগড়ার নিশ্চিন্তি নয়। এ ইংরিজি মিট, এর মানে নিভৃত-সাক্ষাৎ—’

‘কার সঙ্গে?’

‘এ জেনে তোরা লাভ নাই।’

‘ভেট কোথায় হবে? কোন কুঞ্জে?’

‘এও অবাস্তব।’

‘তোদের পরীক্ষা কবে শুনি?’

‘এক মাসও আর নেই।’

বক্তৃতা জুড়ল বিনতা। পরীক্ষাকে এত কাছে রেখে সময় নিয়ে হেলাফেলা করার কোনো মানে হয় না। আগে পরীক্ষা পরে প্রেম। আগে কেরিয়ার পরে আর সব। প্রেম একটা যায় আরেকটা আসে কিন্তু কেরিয়ার একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর তার মামোশোন চলে না। মনোবিলাসের জন্তে ফাঁকা মেঘ না কুড়িয়ে দূঢ় ভূমির উপর মজবুত বাড়ি তৈরির জন্তে শক্ত ইট কাঠ লোহা লকড়ের দরকার।

‘সব সত্যি কথা।’ বললে কাকলি, ‘কিন্তু তোর তো এখনো জোটে নি, তুই কী ঝুঁকি বল।’

‘জোটে নি তো জোটে নি!’ রাগ করে উঠল বিনতা: ‘জোটাবার জন্তে আমি কোটানো ফুল হয়ে মোমাছি ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়াই না। জীবনে প্রেমই সর্বস্ব নয়। তাব চেয়েও বড় জিনিস আছে। তা হচ্ছে কর্তব্য, তা হচ্ছে সংগ্রাম—’

‘হবে হয়তো। কে জানে প্রেমই আবার মহত্তম কর্তব্য কিনা, সংগ্রাম কিনা। তবু প্রার্থনা করি,’ বিনতার দিকে করুণ চোখে তাকাল কাকলি: ‘জীবনের সে আশ্চর্য অধ্যগ্রহ তোর হাতে একবার অন্তত আসুক। সে প্রসাদের স্বাদ পেয়ে তারপর তুই কথা বলিস।’

কে জানে কী করে আসে! বিনতার একটা শখ হচ্ছে গণ্যমান্যদের সঙ্গে বিশেষত সংস্কারমুক্ত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের সঙ্গে চিঠি লিখে-লিখে আলাপ করা, এবং দৈবী রূপা যদি ঘটে কারু সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, শেষ পর্যন্ত বা সর্বাধিক হওয়া।

তরুণতম ভাবের তীব্রতম কবি, বর্তমানে, ‘অনিরুদ্ধ’। চিঠি লিখে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল বিনতা। দেখল বাইরের ঘরে একটি স্বদর্শন যুবক ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একটা বই পড়ছে।

‘আপনিই কি অনিরুদ্ধ?’ রক্তের মধ্যে আনন্দের কল্লুবুহু তুলে জিজ্ঞেস করল বিনতা।

সাতাশ-আটাশ বছরের যুবকটি সসঙ্কমে উঠে দাঁড়াল। বললে, ‘বহন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।’ যুবক চলে গেল ভিতরে।

বিনতা প্রায় ধুলোর উপর বসে পড়ল।

‘যেমন ধর রসবোধ। সাহিত্যে-শিল্পে রসবোধ। যে কি সকলেরই আসে? কিন্তু কেন যে কার আসে কেউ বলতে পারে না।’ বলতে লাগল কাকলি। ‘কিন্তু

বনবিহারীর ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি।

‘একটি ছাত্রীর বাড়িতে বাবা।’

‘পেয়েছি। মা তোমাকে বলে নি?’

‘কই, না তো । কোথায় দেবনাথ ?’

‘শ্রীরামপুর স্টেশনে ধরা পড়েছে। ডবলিউ-টি, উইদাউট টিকেটে ট্রাভেল করছিল। ধরা পড়তে কাইন হয়েছে বিচারে। জরিমানা দিতে পারে নি। জামিন দাঁড়াবারও লোক পায় নি কোথাও। তাই সাত দিনের জেল। নরকাকাকে মা পাঠিয়েছেন শ্রীরামপুর।’

উদ্বেজনায় উঠে বসেছিলেন বনবিহারী, আবার শুয়ে পড়লেন।

কাকনির সঙ্গে-সঙ্গে বিনতাও বাইরে এল।

‘তুই তো অন্য দিকে।’ ক্লক মুখে বলল বিনতা।

‘হ্যাঁ’, স্বিতস্নিগ্ধ মুখে বলল কাকলি, ‘শ্রেমের দিকে। আর তুই কর্তব্যের দিকে, বিধেয়ের দিকে। যার যেমন বুঝ। যার যেমন মতি। আর যদি ডাক্তারি কথায় বলিস, যার যাতে এলাজি।’

... 

কী সেই ছুজের গহন শক্তি যে এমনি করে রোদে-বৃষ্টিতে ঘরের বার করে আনে।
অসাধ্যকে সাধ্য করার মন্ত্র শেখায়। আশ্চর্যের চোখে অসম্ভবকে দেখতে বসে।
অণু থেকে অণিষ্ঠ গুরু থেকে গরিষ্ঠ সে-শক্তির নাম কী! কোনখানে তার বাস।
কী চায় সে আমাদের কাছে?

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটকের সামনে দেখা হল দু-জনের।

কাকলিই পরে এল ।

‘ভাবলাম এলেই না বুঝি।’ এক পা এগিয়ে এল স্বকান্ত।

‘ওরকম সকলকেই ভাবতে হয়।’ কাকলি হাসল : ‘আমিও ভাবছিলাম গিয়ে হয়তো দেখতে পাব না। তবু ছেলে দাঁড়িয়ে থাকলে বড় জোর বোকা-বোকা দেখায়, কিন্তু মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে—ও, হোপলেস—চলো কোথাও একটু বলি।’

‘এখানে নয়।’ চলতে চলতে স্বকান্ত বললে।

‘এলাম এখানে অথচ এখানে নয় কেন?’ দুই কালো চোখে এক বলক আনন্দের রোদ নিয়ে তাকাল কাকলি : ‘চারদিক বেশ ফাঁকা—’

‘কিন্তু খুব সেকেকে-সেকেকে ঠেকছে না?’

‘সেকেকে?’

‘লোকে বলতেই বলে লেক, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইডেন গার্ডেন। কোনো একটা নতুন জায়গা ভাবা যাক। তা ছাড়া এখানটা কেমন একটা বাড়ি-বাড়ি গম্বুজ-গম্বুজ ভাব—চারদিকে আবার দেয়ালের বন্ধন—’

‘ওর চেয়ে ভালো জায়গা কোথায়?’ অসহায় চোখে অন্তর্দ্বন্দ্বে তাকাল কাকলি।

‘আছে ভালো জায়গা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না।’

‘কোথায়?’

‘বাইরের ঐ মাঠ। গড়ের মাঠ। ঐ অটেল মুক্তি। রুটির পরে কী ঘনসবুজ ঘাস হয়েছে দেখেছ!’

‘মাঠে গিয়ে বসব!’ হাঁ হয়ে রইল কাকলি।

‘প্রায় পথে বসার মত মুখ করছ দেখছি। কিন্তু কী সুন্দর মাঠ বলা তো। জগতে আর কোথাও আছে বলে শুনি নি। এত বড় মাঠ, কিন্তু আশ্চর্য, কার মাথায় আসে না।’

‘রাত্রে মাঝে মাঝে পুলিশের মাথায় আসে বলে শুনি।’ কটাক্ষে হাসল কাকলি।

‘কিন্তু আমরা তো অন্ধকারে আসি নি, দিনে এসেছি, রোদুয়ে এসেছি। পালিয়ে-এড়িয়ে নয়, সকলের চোখের উপর দিয়ে। জানিয়ে-শুনিয়ে।’

‘তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।’

কথাটা তিরস্কারের মত শোনাল না, মমতার মত শোনাল।

‘তা একটু যে না হয়েছে তা বলি কি করে? কিন্তু’, মমতার চোখে স্বকান্তও তাকাতে জানে : ‘তোমার মাথাও খুব স্বস্থ নেই।’

গম্ভীর হল কাকলি। বললে, ‘কিন্তু সব কিছুই মাত্রা আছে।’

‘আনন্দের মাত্রা নেই, ভালোবাসার মাত্রা নেই। চলো রেসকোর্সটার পাশে

চলো, নয় তো চলো ওদিকে, গাছের নিচে কেমন আঁচল-ছড়ানো ছায়া, দু-জনে বসি গিয়ে সেখানে—’

‘এখন ভরা আফিসটাইম। রাজ্যের গাড়ি যাচ্ছে রেড রোড দিয়ে। তারা সব দেখুক।’

‘দেখুক। শিখুক।’

‘শিখুক?’ চমকে উঠল কাকলি : ‘কী শিখবে?’

‘কেমন করে দেখাতে হয়। সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্য তো দেখাবার জন্তে। স্বর্ঘ থেকে ঘাস সকলেরই সেই এক চেষ্টা, এক পাগলামো। তেমনি কোথাও যদি ঠিক-ঠিক ভালোবাসা জন্মায়, তা হলে তাকে রাখতে হবে লুকিয়ে? ৷ পারা যাবে রাখতে? কাপড় দিয়ে ঢাকা যাবে আগুন? ঢাকা যাবে যৌবন? জগজ্জনে দেখুক না একটা ছবি। শুদ্ধ না একটা গান।’

‘পুলিসে খবর না দিক’, হাসল কাকলি : ‘খবরের কাগজের অফিসে খবর দেবে। চলে আসবে স্টাফ রিপোর্টার।’

‘আম্বক। এসে দেশের দুর্বস্থাটা দেখে যাক স্বচক্ষে।’

‘দুর্বস্থা?’

‘ই্যা, দেখে যাক, বাঙালি পরিবারের ঘরে ছাত্রছাত্রীদের কী নিদারুণ স্থানাভাব। পড়বার জন্তে সূচাগ্র জায়গা পাচ্ছে না, পাচ্ছে না তিলার্ধ নিরিবি। তারই মধ্যে যারা অধ্যবসায়ী, অমনিষ্ঠ, তারা কেমন দুপুরবেলায় গড়ের মাঠে চলে এসেছে, গাছের ছায়ার নিরিবিবিলিতে বসে পড়ছে একমনে—’

‘তবু যদি সঙ্গে একখানা বই থাকত!’

‘সে কি?’ চলতে চলতে দাঁড়াল সুকান্ত : ‘সঙ্গে যে একটা ঝোলা এনেছ তার মধ্যে একখানাও বই নেই?’

‘আমার কী আছে না আছে তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। বলি, তোমার তো কিছু নেই। তুমি তো রিক্ত।’

‘ই্যা, তা বলতে পারো বটে। আমি রিক্ত।’ স্বর দৃঢ় করল সুকান্ত : ‘রিক্ততাই আমার শক্তি।’

‘কিন্তু আমার যদি থাকে তা হলে তোমারও আছে।’ স্বর গাঢ় করল কাকলি। পরে লঘু হবার চেষ্টায় বললে, ‘কেন, এক বই পড়ে না দুই জনে? এক বই লেখে না? এক নৌকোয় একজন হাল ধরলে আরেকজন টানে না দাঁড়?’

‘তবে চলো, হাঁটুটি। বসে দরকার নেই। হাঁটতে হাঁটতে গল্প করি।’

হু-জনে হাঁটতে লাগল।

‘তোমার ঝোলাটা আমাকে দেবে নাকি?’ হাত বাড়াল সূকান্ত।

‘এত সামান্য ভার নিয়ে তুমি কী করবে? তোমার শক্তি আরো গুরুত্বের জন্তে প্রস্তুত।’ চোখের উপর চোখ রাখল কাকলি।

‘হ্যাঁ, প্রস্তুত।’

গল্পই করছে হু-জনে। আজেবাজে কথার ভুরভুরি তুলছে। কিন্তু হু-জনেই কান পেতে আছে গল্প কখন সংবাদ হয়ে ওঠে, কল্পনা কখন ইতিহাসের মাটি ধরে।

খনির সোনা কখন যায় বাজার দরে যাচাই হতে।

কত কথা বলার পর, কোন কথার পিঠে, কত পথ হেটে এসে, কোন ভঙ্গিতে প্রান্ত প্রাণকে বিশ্রাম দিতে বলা হবে সে কথা, আদিম আহুতির কথা। কে পাড়বে, কাকলি না সূকান্ত! কী ভাবে পাড়বে! কী রকম প্রথম লাগবে না জানি গুনলে!

আমার কী স্পর্ধা, আমি কী করে বলি, কথার ধার দিয়েও কেউ ঘেঁষছে না। তবু এক সময় তো কথাটা উঠবেই, ফসল পাকলে ফসল তোলবার কথা, সেই আশায় বসে আছে হু-জনে। কে না জানি আগে বলে! আর না জানি, কখন!

সজ্ঞানে কে না জানি আগে ছোঁয়। আমার কী দরকার, কী না জানি ভেবে বসবে, নিজের চৌকাঠের বাইরে একটি আঙুলও বাড়ায় না কেউ। যার যেই কোট তাতে নিটুট হয়ে বসে থাকে। তবু সজাগ রেখেছে চোখ, কখন না জানি শাদা কাগজে স্বাক্ষর পড়ে, কে না প্রথম উসখুস করে দাগ দিতে।

চোখ আর কানের পাহারায় সাহারা জাগিয়ে রেখে কথা বলে চলেছে হু-জন।

আর হাঁটছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্তহীন পথ যেন চলে যেতে পারে অতস্ত্র। রোদে এতটুকু কষ্ট নেই, চলায় নেই ক্লান্তি। চেতনার কোন গভীরতম ধামে এসে উপস্থিত হবে প্রতি পদে তার প্রত্যাশা। যেন কাছেই আছে কোনো মৌনী সমুদ্র, প্রতি নিশ্বাসে গুনছে তার নৈঃশব্দ্য।

‘এই বোধ হয় ঠিক জায়গায় এলাম এতক্ষণে।’ উৎসাহী স্বরে বললে সূকান্ত।

‘ও মা, এ তো জু। চিড়িয়াখানা।’ কাকলিও কম চঞ্চল হল না। বললে, ‘দাঁড়াও, কিছু কলা আর বাদাম কিনি।’

‘বাদাম আবার কার জন্তে?’

‘হরিণের জন্তে। কী স্বন্দর ছলছল বড় বড় চোখ হরিণের!’

কেনাকাটা করে এগিয়ে এসে জানোয়ারের এলাকার দিকে যাচ্ছিল কাকলি,

স্বকান্ত বাধা দিল। বললে, ‘ওদিকে গিয়ে আর কী লাভ? এসো ঐ জলের ধারে ছায়াতে বসি।’

‘বা, এগুলো কী হবে?’ হাতের ঠোঁড়ার দিকে লক্ষ্য করল কাকলি।

‘যা খিদে পেয়েছে, এগুলো আমরা নিজেরাই সম্ব্যবহার করতে পারব।’

‘আমরা?’

‘ই্যা, বাদামটা না হয় তুমিই খেয়ো, আর কলা— বুঝতেই পারছ—ও আমার প্রাপ্য। অসংকোচ সারল্যে হাসল স্বকান্ত।

দু-জনে বসল ঘাসের উপর।

বাদাম ছাড়িয়ে খেতে খেতে কাকলি বললে, ‘ওদের খাও খাচ্ছি দেখে লোকেরা না আমাদের ভুল করে।’

‘লোকেরা ভুল করবে না। যেরকম ব্যগ্রবাস্ত হয়ে দেখছে আমাদের, ঠিক ঠিক মৃগমর্কটই ভাবছে। আমার ভয় হচ্ছে জু-র কর্তব্যাক্তিদের—’

‘কেন, ভয় কেন? পাছে জঙ্ঘলে মনে করে খাঁচায় পুরে ফেলে?’

‘ঠিক বলেছ। কিন্তু এমন আসান কি হবে যে দু-জনকে এক খাঁচায় পুরবে?’

‘ওরা না পুরুক কিন্তু সংসার তো পুরতে পারে।’ বলেই চমকে উঠল কাকলি। এ কি, অগোচরে কাকলিই প্রথম কথা পাড়ল নাকি? নিত্যতরুণায়মান তৃষ্ণার ইঙ্গিত সেই আনল প্রথম?

যাক, বেঁচেছে, কথাটা ঘুরিয়ে নিল স্বকান্ত। মুখ গভীর করে বললে, ‘আমি খুব খেলো হয়ে যাচ্ছি তাই তোমার মনে হচ্ছে না? খুব হালকা, লঘু—যাকে বলে অব্যবহীন।’

জলে ছায়া দেখতে দেখতে কাকলি বললে, ‘তাই তো ভালো। গভীর কথা গভীর করে বলতে গেলে মানে পায় না। হালকা হাসির পাথায় উড়িয়ে দিলে ঠিক প্রজ্ঞাপতির মত হৃদয়ের উপরে এসে বসে।’

‘কিছুতেই শালীন হতে পারি না।’ মুখভাব কাতর করল স্বকান্ত।

‘শাল গায়ে না দিলে শালীন হওয়া যায় না।’ কাকলি হেসে উঠল।

‘খালি গায়ে থাকি— দেখেছ তো— তাই খেলো চলি খেলো বলি—’

‘তাই ভালো, খোলাখুলিই ভালো। কপাট না রাখাই অকপট হওয়া!’

‘তার মানে, বলতে চাও অকপাটই অকপট।’

কী সুন্দর কথা বলতে, কী সুন্দর কথা না বলতে! কথা বানাতে, কথা ভুলে যেতে। রোদ দেখতে, জল দেখতে, জলের ছায়া দেখতে। উপস্থিতি দিয়ে অস্তিত্বকে

মুখে ফেলতে। সময়ের কারবারে দেউলে হয়ে যেতে। নানা জাতের পাখির কলরব শুনতে। গাছের উপর থেকে একটা উল্লুক যে উকু-উকু করছে—তাও কত আনন্দের!

জীবনে কেন এত উচ্চারিত আনন্দ, কেন এত অব্যক্ত আরাম!

কে একজন এদিকে আসছে। সঙ্গে কটি ছেলে-মেয়ে।

‘আরে, দীপঙ্কর যে। কতদিন তোমাকে খুঁজছি। কোথায় আছ আজকাল? এরা কারা?’ উঠে দাঁড়াল সুকান্ত।

‘মেস ছেড়ে দিয়েছি। বাসা নিয়েছি আলাদা। বাসা মানে একতলার একটা এঁদো ছোট কুঠুরি। পাকিস্তান থেকে নিয়ে এসেছি মা-ভাই-বোনদের। আমার চাকরি হয়েছে জানো বোধ হয়।’

‘জানি। বরেনদের ওখানে তো?’

‘হ্যাঁ, তোমার সেই স্থলের পুরোনো বন্ধু, স্থায়ী বন্ধু বরেন। কিন্তু ভাই চাকরিটা অস্থায়ী, টেম্পারারি।’ লীর্ণ মুখে হতাশার রেখা ফোটাল দীপঙ্কর।

‘সমস্ত কিছুই অস্থায়ী।’ এই প্রসঙ্গে উচিত ছিল না, তবু কাকলির দিকে তাকাল সুকান্ত। বললে, ‘এই জীবনটাই স্বল্প মেয়াদের ইজারা। ইজারা শেষ কি বিনা ভাটিসে উৎখাত।’

‘অত সহজ নয়।’ হাসল বটে দীপঙ্কর কিন্তু চোয়ালের হাড় ছুটো যেন কঠিন দেখাল।

‘আমি বলব বরেনকে।’

‘বোলো।’ নরম হল চোয়ালের হাড়।

‘তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি। ইনি শ্রীমতী কাকলি, আর ইনি আমার বন্ধু দীপঙ্কর। দীপঙ্কর মানেই ইম্পাতের ফল। যে ইম্পাত শুধু অল্প নয়, যন্ত্রণ। তলোয়ার যেমন লাঙলও তেমনি।’

‘ঠিক বলেছ। শুধু জঞ্জালই কাটি না, ফসলও ফলাই।’ হাসল দীপঙ্কর।

‘ইম্পাত হচ্ছে হলে কঠিন, হচ্ছে হলে নরম। এই দেখ-না, সকলকে নিয়ে থাকবে বলে বাসা করেছে। ছোট ভাইবোনদের নিয়ে এসেছে চিড়িয়াখানায়।’

যাই বলো, পাকভেড়ে লোকটাকে পছন্দ হচ্ছে না কাকলির।

ঠিকানা দিল দীপঙ্কর। দু-জনকে বললে একদিন বেড়াতে যেতে। স্বচক্ষে দেখে আসতে মানুষ কীভাবে থাকে, কীভাবে রাস্তাকে বাড়ির শামিল করে নেয়, নিতে হয়, কীভাবে বাড়ির লোক রাস্তার লোক হয়ে যায়।

‘যাব একদিন ।’ চলে যাচ্ছে দীপঙ্কর, হেঁকে বললে স্বকান্ত ।

‘এবার তবে আমরাও উঠি ।’ কাকলি উজ্জোগ করতে চাইল : ‘এ কি, তুমি আবার বসছ যে !

‘বসছি মানে ? শুয়ে না পড়ি ।’

‘কেন, কী হল ?’

‘ভীষণ মাথা ধরেছে ।’

‘মাথা ধরেছে তো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো । বাইরে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাব ।’

তবু চঞ্চল হয় না স্বকান্ত । বললে, ‘সাবিত্রীর সঙ্গে বনে কাঠ কাটতে এসে সত্যবানের এমনি মাথা ধরেছিল—’

‘এমনি ?’

‘মাথা ধরতেই সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সত্যবান ।’

‘পড়ুক । কিন্তু এটা বন নয়, আর আমরা কেউ এখানে কাঠ কাটতেও আসি নি ।’

‘কিন্তু যাই বলে’, ঘাসের উপর গা এলিয়ে দেবার ভঙ্গি করল স্বকান্ত, ‘সাবিত্রী খুব ভালো মেয়ে । অস্তুত খুব ভালো উকিল ।’

‘জানো পাশ করে আমি ল পড়ব, উকিল হব ।’ মুখে-চোখে দীপ্ত হয়ে উঠল কাকলি : ‘কী সুন্দর দেখতে হয় মেয়ে-উকিলদের ! মাথায় খোঁপা, কালো শাড়ির উপরে কালো গাউন, গলায় শাদা ব্যাণ্ড ঝোলানো । যেন ক্লঙ্কলক্লঙ্কসায়ের শ্রীরাধিকা । মাথায় খোঁপা, মুখে চোপা—সে এক দেবতাদের দেখবার মত । দেখো আমি ঠিক উকিল হব ।’

‘কিন্তু সাবিত্রীর মত হতে পারবে না । সওয়ালজবাবে কেমন ঘায়েল করল যমকে । মরা স্বামীকে ফিরিয়ে আনল ।’

‘ফিরিয়ে আনল সে সাবিত্রীর ওকালতির জোরে নয়, যম নিতান্ত ভালোমানুষ ছিল বলে ।’

‘তার মানে ?’

‘তার মানে তাই । একটার পর একটা বর দিয়ে যাচ্ছে যম । সাহস পেয়ে সাবিত্রী বললে, আমার এক শো পুত্র হোক । যম বললে, তথাস্ত ।’

‘তথাস্ত । তাতে কী ?’

‘তখন সাবিত্রী প্যাঁচ কবর্তে গেল । বললে, আমার স্বামী ছাড়া আমার শতপুত্রতা বর সিদ্ধ হয় কি করে ? সুতরাং আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন । যম হাবাগোবার মত ভাবাচ্যাকা খেয়ে গেল । বললে, তথাস্ত ।’

‘এ ছাড়া আর কী বলতে পারত যম ?’ অজ্ঞানের মত মুখ করে তাকাল স্কাস্ত ।
‘যম যদি টেকনিক্যাল হত, বলতে পারত, তুমি শতপুত্র চেয়েছ নাও শতপুত্র ।
তাতেই পর্যাপ্তত্ব হও । ঐ বরের সিঁদুরি জন্তে সত্যবানকে না হলেও চলবে ।’

‘যমটা বোকা ।’

‘অন্তত উকিল হিসেবে আনাড়ি ।’ খিলখিল করে হাসল কাকলি । বললে,
‘স্বতরাং যমকে ভয় নেই । আমি কি যমেরে ডরাই, যে বলেছে সে ঠিকই বলেছে ।’

বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিল দু-জনে ।

মাঝামাঝি একটা মোড়ে এসে দু-জনে ছাড়াছাড়ি হবে ।

তার আগেই প্রায় হয়ে উঠেছিল । পাশ থেকে একটা ছুটন্ত জিপ হুমড়ি খেয়ে
প্রায় পড়ছিল ট্যাক্সির উপর । ভাড়া সেকেন্ডের ডগায় ব্রেকটা সজোরে কষতেই
দেঁচে গেল ট্যাক্সি ।

নিজের সিটের সীমার মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে স্কাস্ত বললে, ‘কী
কেলস্কারিটাই হত বলো তো অ্যাকসিডেন্ট হলে ?’

অতরূপ সমতায় কাকলিকেও প্রত্যাবৃত্ত হতে হল । বললে, ‘অ্যাকসিডেন্টের চেয়েও
কেলস্কার ।’

‘এবার ঠিক আসত স্টাক রিপোর্টার । খবরের কুাগজে ঠিক দু-জনের ছবি
বেরুত ।’ স্কাস্ত তাকাল কাকলির দিকে : ‘আর আমাদের জন্তে তো যম নয়,
যমদূত আসত, তখন তোমার শত তর্কেও কিছু হত না ।’

‘দু-জনে একসঙ্গে সাবাড় হয়ে গেলে কে মিছিমিছি তর্ক তুলত ।’ এততেও কাকলি
হাসছে : ‘জন্ম হয়ে নিশ্চন্দ পড়ে থাকলেই বিপদ । তখন ননদিনি বলো নগরে
ডুবেছে রাই-রাজনন্দিনী—’ মাথার চুলটা ঠিক করল কাকলি ।

তারপর, পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, দু-জনে সন্ধ্যার শোতে এল এক সিনেমা-ঘরের
দরজায় । একটা বাজে ঘর, আর একটা পচা ছবি ।

‘এ তোমার মামূলি হয়ে যাচ্ছে না ?’ আপত্তিভরা চোখে তাকাল কাকলি ।

‘বোধ হয় নয় । একটু আশ্চর্যের আলো জ্বলবে হয়তো কোথাও ।’

উপরে, ব্যালকনির দুটো টিকিট নিয়েছে । শেষ লাইনে কোণের দুটো চেয়ার ।

উপরে আর জনমনিষ্টি নেই । ঢালা শূণ্যতায় অচেল অঙ্ককার ।

‘এ কি, আর একটাও লোক নেই ?’ কাকলি কলধনিত হয়ে উঠল ।

‘যারা পাশে দেখে তারাও আজ পাশ কাটিয়েছে । হাউসের ঐ টর্চওলা লোকটা
যদি বিরক্ত না করে, শাস্তিতেই দেখতে পাব ছবি ।’

‘অন্ধকার দেখ ।’

‘অন্ধকার ?’

‘ই্যা, আশ্চর্যের আলো ।’

শানানো স্কুরের ধারের উপরে বসে আছে পাশাপাশি । যে নড়বে সেই কাট পড়বে ।

কে আগে নড়ে ।

কে প্রথম হয় ।

১১

‘আমাদের ধারা দেখছে তারা আমাদের কী ভাবছে বলো তো ।’ হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি ।

‘এসকেপিষ্ট ভাবছে ।’ বললে স্বকান্ত ।

ফল বেরিয়ে গেছে পরীক্ষার । এখন তাই আরো ফলের দিকে, স্কুলের দিকে যাত্রা ।

‘না, আমি এসকেপিষ্ট নই । যুদ্ধ থেকে আমি পালাব না ।’ ছুরিবৈধা মাংসের টুকরোটা মুখে তুলল স্বকান্ত । বললে, ‘নিধিরামও যুদ্ধ-পলাতক ছিল না ।’

‘কে নিধিরাম ?’ প্লেটের আলুটাকে বিদ্ধ করবার চেষ্টা করছিল কাকলি, তার আগে চোখই সে আলু করে তুলল ।

‘সে কি, নিধিরামকে চেনো না ?’

‘তোমার সব বন্ধুকেই কি আমি চিনি ?’

‘আহা, শুধু আমার বন্ধু হতে যাবে কেন ? সকলের বন্ধু । জগজ্ঞানের বন্ধু ।’

‘সে আবার কে ?’ আলুটা মুখে পুরল কাকলি ।

‘আমাদের সেই নিধিরাম সর্দার । ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার । অথচ ইয়া গালপাট্টা ইয়া শুঁড়তোলা নাগরা ইয়া কোমরবন্ধ ।’ ছুরিতেকাঁটায় টুং-টং শব্দ তুলল স্বকান্ত : ‘সাজসজ্জার জুটি ছিল না । কিন্তু বিসমিল্লায় গলদ । ঢাল-তলোয়ারই নেই ।’

‘তুমি কি নিধিরাম ?’

‘তা ছাড়া আর কী!’

‘তুমি কি নিরস্ত? নিরস্ত? প্রতিশ্রুতিশূন্য?’ কোল থেকে স্থাপকিন তুলে
চৌচের প্রান্ত দুটো মুছল কাকলি।

‘কিন্তু বর্তমানটা তো দেখবে। রূঢ় বাস্তব বর্তমান।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, বর্তমানই দেখছি।’

‘দেখছ?’ কাকলির চোখের মধ্যে চোখ ফেলতে চাইল স্বকান্ত।

দু চোখের পাতা সবলে বন্ধ করে কাকলি বললে, ‘আজ্ঞোপাস্ত দেখছি।’

‘অতক্ষণ চোখ বুজে থাকটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।’ হেসে ফেলল স্বকান্ত :
‘বর্তমান দেখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ ভবিষ্যৎও না দেখে ফেলো সেই সঙ্গে।’

‘ভবিষ্যৎ থাক ভবিষ্যতের জায়গায়।’ চোখ খুলল কাকলি : ‘আমার এই
বর্তমানই স্বন্দর।’

‘স্বন্দর? আমার চাকরি নেই—এখনো হয় নি, আর ঐ আমাদের বাসা। তুমি
স্বন্দর বলো?’

‘বলি।’ চিবোতে চিবোতে থামল কাকলি। রসাল মুখে বললে, ‘যেখানে তুমি
সেখানেই আমার স্বন্দর।’

‘এটা কোনো কাজের কথাই নয়।’ গম্ভীর হল স্বকান্ত : ‘মনে রেখো কাবোর
কথা ছেড়ে আমরা এখন কাজের কথায় নেমেছি।’

‘তার মানেই হৃদয় থেকে উদরে নেমেছি।’ নিটোল হাঁ করে দিবিয়া এক গ্রাস
মুখে তুলল কাকলি : ‘নামলায়ই বা। দিবিয়া পেট ভরবে। হিসেবে ভুল হবে না।’

‘হবে না?’ কাকলি কি দয়া করে বলছে এমনি করুণ জিজ্ঞাসায় তাকাল
স্বকান্ত।

‘না। যা হোক তোমার কিছু একটা আয় আছে, আয়ের পথ আছে—এম-এ
হবার পর তোমার টিউশনির বাজার তেজী হবে নির্ধাত—’

‘তুমি কী বলছ? এ একটা আয়?’

‘চরিত্র যাই হোক চেহারাটা আয়ের মতই। আর কে না জানে, তিল কুড়িয়েই
তাল, হাঁটি-হাঁটি করেই হাওয়াগাড়ি—’

‘হাওয়াগাড়ির মধ্যে নয়, হাওয়াগাড়ির তলায়।’ হাসল স্বকান্ত।

‘আজ্ঞে নয়, অত পঙ্কুতা দেখিয়ে না।’ সম্ভ্রহ শাসনের চোখে তাকাল
কাকলি : ‘তা ছাড়া তুমি একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছ। ছ-জনের পক্ষে
বেশ একটা মোটা টাকা দিয়ে দিতে পারবে সংসারে।’

‘হু-জনের পক্ষে।’ কথাটা মৃদুগম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করল সুকান্ত। একটু বৃষ্টি।
বা চিন্তাকুল শোনাল।

‘যখন বর্তমান নিয়ে কথা বলছ, আপাতত তো হু-জনই।’ হাড়টা শেষ পর্যন্ত
ছুরির অধীন থাকবে, না, হাতে করে ধরতে হবে, কাকলি বললে চোখ
নামিয়ে।

‘কত টাকাই বা স্ফলারশিপ। সবটা দিয়ে দিলেও মোটা টাকা হয় না। তবে,
যখন হু-জন, হু-জনের ব্যাপার, তখন তুমিও যদি হাত লাগাও—’

‘তার মানে?’ হাড়টা হাতে করেই তুলল কাকলি: ‘আমাকেও চাকরি
করতে বলছ?’

‘মন্দ কি।’

‘ওসব হবে না।’ চুলভরা স্নন্দর মাথাটা মৃদু মৃদু নাড়তে লাগল কাকলি:
‘ওসব মনের কোণেও স্থান দিও না। বিয়ের পর চাকরি করতে পারব না বলে
রাখছি। এক জীবন জলেছি পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, আরেক জীবন জ্বলতে
পারব না চাকরি নিয়ে। জানো পেটপুরে খেতে পারি নি এ পর্যন্ত। এই স্কুলেব
বাস, ঐ কলেজের ঘণ্টা, ঐ ক্লাশের রুটিন, ঐ পরীক্ষার হুটিস—দিন-রাত চড়কে
চড়িয়ে রেখেছে। বিয়ের পর আবার আফিস নিয়ে, ট্রামে-বাসে ওঠা-নামা নিয়ে,
পাগল হতে রাজি নই। বিয়ে মানেই বিশ্রাম। বিয়ের পরে শ্রেফ বিশ্রাম করব।’

‘বিশ্রাম করবে?’

‘জানো, বাড়ির সমস্ত রান্না শেষ হয়ে যাবার পর কোনোদিন থাই নি।
এবার খাব।’ হাসতে লাগল কাকলি: ‘চচ্চড়ির ডাঁটা খাব চিবিয়ে চিবিয়ে।
মাছ-পাতুরির ল্যাজা খাব চুবে চুবে। কত চাটনি আচার, কত কুলচুর আমচুর।
পান খাব গাল পুরে। তারপর গা ঢেলে ঘুম্ব ঘুপুববেলা। উঃ, কতদিন ঘুমুই
নি নিশ্চিন্ত হয়ে। আর খারাপ হবার ভয় নেই, এর-ওর-তার এস্তার উপন্যাস
পড়ব। বিকেলবেলা আলতাউলি আসবে,—শোনো, আর নাপতেনি বলা চলবে
না—ঝামা দিয়ে পা ঘষে মোটা করে আলতা পরিয়ে দেবে। সিনেমায় যাব।’

‘জীবন সার্থক করবে।’ গদগদ হবার ভাব করল সুকান্ত।

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, করব। নইলে শুধু শুধু এত পরিশ্রম কেন?’

‘পরিশ্রম?’

‘প্রেম প্রচণ্ড এক পরিশ্রম ছাড়া আর কি।’ ইতিমধ্যে বয় চা দিয়ে গিয়েছে,
নিজের কাপে চামচ নাড়তে লাগল কাকলি: ‘মজুরি ছিল বলেই মেহনত, তেমনি

য়ে ছিল বলেই প্রেম। বিয়েই হচ্ছে প্রেমের রোজগার। বিয়ে হবে না অথচ প্রম করো, এ যেন ঘোড়া নেই তবু চাবুক হাঁকড়াও। ওসব ফাকা আওয়াজে আমি নেই মশাই। আমার কাছে সাক্ষ্য কথা, ফেলো কড়ি মাথো তেল। য়ে করতে রাজি আছ তো এসো প্রেম করতে। নচেৎ দূর হও, অর্থাৎ দূরে যাকো।’

কী সুন্দর কথা বলছে কাকলি, যেন একটা কোয়ারা খুলে গিয়েছে, সানন্দ সাথে তাই দেখছে স্বকাস্ত। দেখতে দেখতে বললে, ‘তুমিই ঠিক বুঝেছ।’

‘আর এও বুঝেছি যিনি প্রেম করছেন অর্থাৎ যিনি স্বামী হবেন তাঁরই ারোপুরি দায়িত্ব স্ত্রীকে ভাত-কাপড় দেবার, ঘরবাড়ি দেবার। স্ত্রীর দায়িত্ব নই যে, স্বামীকে খাওয়াবে, পরাবে, বসবাসের সুবিধে করে দেবে। ঘুরে ঘুরে দখে এনো দেশবিদেশ। সর্বত্র এক বিধি এক ব্যবস্থা। স্বামীর ঘাড়েই স্ত্রীর পড়া। স্ততরাং আমার মুখের দিকে দীন নয়নে তাকিয়ে না। তোমাকেই একা-একা সমস্ত বহন করতে হবে, পালন করতে হবে—পালিয়ে যাবার, এসকেপিষ্ট হবার আর উপায় নেই।’

‘কিন্তু বাড়িতে যে ঘরে তুমি থাকবে, তা তুমি দেখেছ?’ ভয়ে ভয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল স্বকাস্ত।

‘আমি থাকব মানে? আমার দু-জনে থাকব।’ কাকলি প্রায় বিজয়িনীর দ্বি করল।

‘ঐ হল। দু-জনের ঘর। দেখেছ?’

‘দেখেছি বৈকি। ঘরটা ছোট। দু ভায়ের পক্ষে না হলেও স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে ছোট। তা ছাড়া স্ববীরকে সরতে হবে। যেতে হবে আর কোথাও, তোমার মায়ের ঘরে, নচেৎ ঢাকা বারান্দায়। উপায় নেই। কিন্তু,’ কাকলি পেয়ালায় উপর টোট নামাল; ‘এবার এতদিনে, তোমার কাকা-কাকিমা সরবেন না?’

‘সরা তো উচিত।’

‘সরলে ঐ ঘরটা আমরা নিয়ে নেব। স-আসবাব আমাদের কুলিয়ে যাবে।’

‘কিন্তু যদি না সরেন?’

‘সরাবার চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণ।’

‘তবু যদি না পারি?’

‘থাকবে। থেকে যাবে। আমাদের এই ব্যবস্থাটাই বা কদিনের জন্তে! দিন তোমার না একটা চাকরি হয়। একটা আস্ত-সুস্থ চাকরি পাওয়া মানেই

বড় একটা অধিকারের মালিক হওয়া। তখন ইচ্ছে হলে বেশি দামের টিকিট কেটে সংসারের প্রথম লাইনের উঁচু আসনে বোসো গ্যাট হয়ে, নয়তো একান্ত বিতাড়িত হলে কেটে পড়ো, তাঁবু ফেলো অত্যা।’

‘সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ একটি শাঁসালো মজবুত চাকরি দরকার।’ নিখাম ফেলল স্ফাস্ত।

‘সেটা কে না বুঝছে? কিন্তু অন্তর্বর্তী সময়টাতে কী হবে সেইটেই প্রশ্ন।’

বিল এনেছে বয়। দু-জনে একসঙ্গে হাত রাখল—স্ফাস্ত তার মনিব্যাগে কাকলি তার বটুয়ায়।

শাসনরুপ চোখে তাকাল স্ফাস্ত।

‘ও, হ্যাঁ, তুমিই তো দেবে। তোমারই তো একার দায়িত্ব।’ হাত সংবৃত্ত করল কাকলি। দু-জনে বেরিয়ে এল রেষ্টুরান্ট থেকে। হাঁটতে লাগল পাশ; পাশি। খানিকক্ষণ কথা কইল না কেউ। আবছায়ায় চুপচাপ হাঁটতেই শান্তি মনে হল।

‘চলো জলের ধারে গিয়ে একটু বসি।’ বললে স্ফাস্ত। ‘মনে যখন কোনো আলোড়ন আসে তখন জল দেখতে খুব ভালো লাগে।’

‘সম্প্রতি যে আলোড়ন এসেছে এতে জল-মাটি, আলো-আঁধার লোকজন ইট-পাথর ট্রাম-বাস ট্যাক্সি-রিকশা সমস্ত ভালো লাগছে। যেন বহিস্থের দেশে অপূরণ পোশাক পরে দাঁড়িয়েছে সকলে। স্বয়ং নিধিরামকেও মনে হচ্ছে হদিরাম! হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘রাত বেশি হয় নি তো? চলো তবে। আরেকটু বসি।’

‘কথাটা শেষ করি।’

অনেক খুঁজে পেতে জলের কাছাকাছি ঘাসের উপর বসল দূরে-দূরে। যেন সহসা সন্দেহের না ছায়া পড়ে। কিন্তু দূরে বসলেও মনে হয় কত কাছে, কাছে বসলেও মনে হয় কত দূর। এ যেন বিরহের পর মিলন বা মিলনের পর বিরহ নয়, এ যেন মিলন-বিরহ একত্র গাঁথা।

কার মুখে কোনো কথা নেই।

কৌতুহলে কত সজাগ ছিল কাকলি, সে দেখবে কুঁড়ি কি করে ফুল হয়ে ফোটে। কুঠার কপাট খুলে কি করে প্রথমে কথা আসে। কি করে ইচ্ছা তার আঙুল বাড়ায়। মাঝখানে কাকলি ঘুমিয়ে পড়েছিল নাকি? কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল টের পেল না। সহসা চোখ চেয়ে দেখল এক বাগান গোলাপ, এক

হু পাখি, এক হৃদয় জ্বলন্তরঙ্গের শব্দ। আর বাসনা রক্তের ছোয়া পেয়ে সোনার
উ-ধরা।

আর স্বকান্তকে কে বিশ্বভুবনের আনন্দের খনির মালিক করে দিয়েছিল এক
হৃত। বলেছিল, যত পারো, যত ধরে, যত ভরে, তুলে নাও দু হাতে। স্বকান্তও
ত পেরেছে উন্নাদের মত তুলে নিয়েছে বুকে করে। সেই একতৃপ স্বথকেই
খন সে বসিয়েছে ঐ ঘাসের উপর, তার চোখের সামনে, তার আকাঙ্ক্ষার
লেকায়।

‘তোমার কথা তো বললে, কিন্তু আমারও একটা বিকল্প প্রস্তাব ছিল।’ নতুন
র কথা পাড়ে স্বকান্ত।

‘তোমার আবার কোন বিষয়ে প্রস্তাব?’ লঘু করতে চাইল কাকলি।

‘ঐ একই বিষয়ে। অন্তর্বর্তী সময়টা কীভাবে যাবে সেই সম্পর্কে।’

‘তোমার প্রস্তাব তো জানা।’

‘জানা?’

‘হ্যাঁ, মাঙ্কাতার আমলের সেই মামুলি প্রস্তাব। ধৈর্যের প্রস্তাব। এ কে না জানে?’
লোনো ভঙ্গি ঋজু করল কাকলি: ‘তার মানে যতদিন তোমার স্বস্থ-সমর্থ চাকরি না
জাটে ততদিন আমি বাপের বাড়িতে ভাত মারি আর তা-না-না-না করে দিন
টাটাই। তুমি চাকরির জন্তে ঘোরাও। আর আমি ঘুরি তুমি চাকরি পেলে কিনা সেই
বাদের জন্তে। দিনের পর দিন দিনমণি অন্ত যাক।’

‘মন্দ কি।’

‘তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বের কাছে থেলো করে দিতে চাও?’

‘না, থেলো করে দিতে চাইব কেন?’

‘তা ছাড়া আর কি। জগৎ সমক্ষে তুমি এই প্রমাণ করতে চাও যে আমি একটি
গাঙলি মেয়ে যতই কেননা ভালোবাসি আমার পুরুষকে, যেহেতু সেই পুরুষ রোজগারে
মজোর, যেহেতু তার জোটে নি এখনো হুটপুট চাকরি, খোলামেলা বাড়িঘর, আমি
মাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নই। যেন আমার সম্মতির শর্তই এই যে, তুমি আমাকে
মারাম দেবে, প্রাচুর্য দেবে, বিলাসের জীবন দেবে। আর যতদিন তা না দেবে
ততদিন আমি গালে হাত দিয়ে বসে থাকব। আমার সাধের যৌবন ভেসে যাবে।
লোনো, আমি অত সন্তায় বিকিয়ে যেতে আসি নি।’

‘কিন্তু পুরুষের চালচলোটা দেখবে তো।’ হাসল স্বকান্ত: ‘পুরুষ যখন, তখন,
হি নয়, পুরু করেই দেখতে হবে। যে পুরু নয় সে এখনো পুরুষ নয়।’

‘থাক। দেখেছি। কিন্তু ধরো, বসে আছি, এক বছর গেল দু বছর গেল তোমার তেমন চাকরি কিছু জুটল না, পারলে না পুরু হতে, তখন কী হবে? সিনে হতে হতে মিইয়ে যাব আমি, মিলিয়ে যাব আমি? আমাকে তুমি ছেড়ে দেবে চলে যেতে বলবে?’ যেন কথায় একটু কান্নার ছোঁয়াচ লাগল কাকলির।

‘অত সোজা নয়। শোনো, সরে এসো।’ চোখের ইশারা করল স্নকাস্ত।

‘কেন, এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি।’

স্নকাস্তই এগিয়ে গিয়ে বসল। বলল, ‘আমার প্রস্তুতাবস্থা, তুমি যেমন বলছ, অসেকলে নয়?’

‘কিছু নতুনত্ব আছে?’

‘নিশ্চয়ই। নইলে অসংলগ্ন তুমি গালে হাত দিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকবে আর আমি পথে-পথে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াব—ব্যাপারটা মোটেই স্বথেরও হবে না গৌরবেরও হবে না। তা ছাড়া গালে হাত আর কদিন থাকবে? গালের হাত শেষে কপালে এসে উঠবে। আমাকে ফ্যা-ফ্যা করতে দেখে শতমুখে ছ্যা-ছ্যা করে থাকবে। আর, ফিকির বুঝে সটকান দেবে থিড়কি দিয়ে।’

‘আমি?’ নিজের বুকের উপর হাত রাখল কাকলি।

‘ভয় শুধু আমার দিক থেকে নয়, দু দিক থেকেই। ভয় ভয়—সময় কেন রাখাই ভয়। সময় বয়ে যেতে দেব না। দু দিক থেকেই তার পথ আটকাব।’

‘তার মানে?’

‘একুনি-একুনি বিয়ে করব।’

‘মানে, এই মুহূর্তে? অন দিস্ স্পট?’ কাকলির উল্লাসের মধ্যে আগ্রহ এসে মিশল।

‘মানে যৎপরোনাস্তি শিগগির। তোড়জোড়ে অন্তত মাসখানেক তো লাগবেই আশ্রয় করল স্নকাস্ত। বললে, ‘বিয়ে করব কিন্তু ইনটেরিম পিরিয়ডটা, মানে অন্তর্বর্তী সময়টা—আমার চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত—আমরা আলাদা-আলাদা থাকব তুমি তোমার বাপের বাড়িতে আমি আমার মায়ের হাঁড়িতে।’

‘আলাদা-আলাদা?’ প্রায় আকাশ থেকে পড়ল কাকলি: ‘বিয়ে হবে অথ একত্র হবে না? মাহুবে বলবে কী!’

‘মাহুবে জানতেই পারবে না।’

‘জানতেই পারবে না? সে কী কথা!’

‘বিয়েটা গোপনে হবে। রেজেষ্ট্রি করে হবে।’

‘গোপনের কী দরকার!’ গম্ভীর হল কাকলি : ‘তাতে কী হুবিধে?’

‘হুবিধে অনেক। তোমার-আমার বাড়ি দুইই সন্দেহের বাইরে বসে ঘুমবে, আমরা যে যার মনে থাকতে পারব, চলতে পারব এদিক-ওদিক। আমি কাজের চেষ্টায়, তুমি না হয় আরো পড়ার চেষ্টায়। দু-জনের ঘন-ঘন দেখা হবারও কোনো দরকার পড়বে না। তেমন কোনো অহুবিধের জায়গায় যদি দেখা হয় এমন ভাব করলে চলবে যেন আমাদের মুখ চেনা। নিৰ্বাঙ্কাটে দিন যাবে। পাকা দলিল হয়ে থাকবে, কারু ফরকে বা কসকে যাবার পথ থাকবে না। আর এ দলিল শুধু বিয়ের দলিল নয়, আমার গৌরবের দলিল—আমাকে অকৃতী জেনেও তুমি আমাকে দিয়েছ বরমালা। জগৎ সমক্ষে সেই বাঙালি মেয়েটিকে আমি খেলো হতে দিই নি, তার হাত থেকে নিয়েছি রাজ্যটাকা। তারপর যখন চাকরি পাব, আসবে সে প্রার্থিত মুহূর্ত, চন্দ্রবেশ খুলে ফেলব, সগর্বে নিয়ে যাব তোমাকে, স্থানে-মানে দেব অনেক স্বাচ্ছন্দ্য। কোথাও কোনো হৈ-চৈ হবে না, সব সুন্দরে শেষ হবে।’

করণ করে তাকাল কাকলি। বললে, ‘তোমার কষ্ট হবে না ছেড়ে থাকতে?’

এক মুহূর্ত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে রইল স্বকান্ত। পরে বললে, ‘কিছু এখনি যদি তুমি আমাদের বাড়িতে চলে আসো এই আয়হীন স্থানহীন সংকীর্ণতার মধ্যে, সে কষ্ট আরো কঠিন হবে।’

‘হোক। তবু বিয়ের পর, স্বামী বর্তমানে থাকতে পারব না বিধবার মত।’ সশব্দে হেসে উঠল কাকলি : ‘কী অপরূপ ব্যবস্থা, সর্বাক্ষে দৃষ্ট হয়ে বসে থাকো সমুদ্রের পারে কিন্তু খবরদার, স্নান করে স্নিগ্ধ হতে পারবে না। এতে আমি রাজি নই। আর এ সমুদ্র আমার অস্তিত্বের সমুদ্র, অমৃতের সমুদ্র। আর স্নানে শুধু স্নিগ্ধ হওয়া নয়, শুদ্ধ হওয়া, স্নানান্তে জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করা—’

দু-জনে উঠে পড়ল।

‘চলো, একটা ট্যান্সি পাই কিনা দেখি।’ স্বকান্ত বললে।

‘তুমি রেজেন্সি করার কথা ভাবছিলে কেন? আমরা কি আলাদা জাত, আলাদা দেশ, আলাদা ধর্ম?’

‘না, না, তার জন্তে নয়। যেখানে কোনো বাধা নেই তেমন সাধারণ বিয়েও রেজেন্সি করে করা যায়। রেজেন্সি করায় হাঙ্গামা কম। খরচ কম। নেমস্তম্ভপত্রও ছাপতে হয় না। তারপর যদি একটু গোপন করে রাখতে হয় রেজেন্সিই প্রশস্ত।’

‘না, অস্ত্রায় তো কিছু হচ্ছে না, কোনো অর্থেই নয়।’ চলতে-চলতে বললে কাকলি, ‘তবে কেন গোপন করতে যাব? তারপর সাজব-গুজব না, লোকজন আসবে

না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না, আসর-বাসর বসবে না—সে আবার একটা বিয়ে কী ! বাপ জানে না মা জানে না, হোগলা বনে বিয়ে—তাতে আমি রাজি নই ।’

‘বাবা-মাকে বলবে ?’

‘নিশ্চয় বলব । বাজনা যখন বাজিয়েছি, তখন মিউজিক ফেস করব ।’

অঙ্ককারেও কী স্বন্দর দেখাচ্ছে কাকলির মুখ । স্বকাস্ত বললে, ‘যদি অহুমতি না পাও ?’

যেন হৌচট খেল কাকলি । বললে, ‘তখন দেখা যাবে । কিন্তু তুমি ? তুমি যদি না পাও ।’

‘আমার ভয় কি ! আমি তো এসকেপিষ্ট নই ।’ মুঠো করে কাকলির ডান মণিবন্ধটা ধরল স্বকাস্ত : ‘আমি রণমুখো সেপাই ।’

ট্যান্ডি ডাকতে হল না । কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল অপেক্ষায় । উঠল হু-জনে ।

কাকলি বললে, ‘হ্যাঁ, লড়ব, দাঁড়াব, তৈরি করব । আমি তোমার চিত্রাঙ্গদা ।’

১২

‘তোমার জন্তে একটা ক্ল্যাট দেখে এলাম, কাকিমা ।’ যতদূর সম্ভব চোখে ও গলায় ফুটন্ত উৎসাহ নিয়ে বললে স্বকাস্ত ।

যেমন পড়ছে, বিজয়া তেমনি পড়তে লাগল ম্যাগাজিন ।

‘বেশ বড়-বড় ছুখানা ঘর, সামনে বারান্দা—’

গ্রাহণ করছে না । চোখ ডুবিয়ে পড়ছে তন্ময় হয়ে । কী একটা উৎকট উৎকণ্ঠার মুহূর্তে এসেছে না জানি ।

‘দক্ষিণ খোলা—’ টেবিলের ওপর এটা-ওটা নাড়তে লাগল স্বকাস্ত : ‘নিতে হলে এখুনি গিয়ে ধরতে হয় ।’

এত তাড়া কিসের, এখুনিই ঘর ছাড়ব কেন, সরাসরি এমন স্থলের প্রব্রুট করবে এ অবশিষ্ট স্বকাস্ত আশা করে নি । কিন্তু ক্ল্যাটটা কোথায়, কোন পাড়ায়, একতলা না দোতলা, তা ছাড়া শেলের মধ্যে শক্তিশেল, প্রব্রুটের মধ্যে মূল প্রব্রুট, ক্ল্যাটটার ভাড়া কত, তা অন্তত তো জিজ্ঞেস করবে । কিন্তু অ্যাক্সেস নেই বিজয়ার । চোখ ছুটো এতদূর খুলেছে যে মুখ খুলতে পারছে না ।

অথচ কথা বলাতে না পারলে অলি-গলি করে সে-কথায় আসে কী করে। আর বাড়ির কথা বলতে-বলতেই তো বিয়ের কথা বলা সহজ।

‘বড় রাস্তার উপরেই ক্ল্যাটটা—হ্যাঁ, দোতলায়, আর ভাড়া—’ তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল স্বকান্ত।

পত্রিকার থেকে চোখ না তুলেই বিজয়া বললে, ‘আমরা আর ক্ল্যাট ভাড়া নেব না ঠিক করেছি।’

‘নেবে না?’ চক্ষে অঙ্ককার দেখল স্বকান্ত।

‘না।’

‘কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে ছিল।’ প্রায় যেন মিনতির স্বর বেরুল স্বকান্তর : ‘ভাড়াও বেশ সম্ভা বলতে হবে।’

‘হোক গে।’ মুখ তুলল বিজয়া, চোখ ফেরাল। গম্ভীরস্বরে বললে, ‘ভাড়াটাড়া আর নেব না, গোটা বাড়ি কিনব।’

‘বাড়ি কিনবে? খুব ভালো, খুব ভালো।’ লাফিয়ে উঠল স্বকান্ত : ‘আমি আজই দালাল ধরি। ক হাজারের মধ্যে? কম পক্ষে কথানা ঘর চাই? উপরে-নিচে ছ’খানা তো বটেই, দুটো অন্তত বাথরুম। আর সামনে একটু জমি, একটু ফুলটুল লতাপাতা—কী বলো?’

‘তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।’ বিজয়া পত্রিকার পৃষ্ঠা ওলটাল : ‘দালাল অলরেডি লাগানো হয়েছে।’

‘হয়েছে? তবে এত দেরি করছে কেন? একটা ডিল হতে সাত দিন, বড় জোর দু সপ্তাহ—’

‘পছন্দসই বাড়ি চাই তো—’

‘তা তো এক শো বার। কিন্তু যাই বলো, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকব।’ ঈর্ষাতরে যেন প্রায় পাড় ধরল স্বকান্ত : ‘বাড়ির বড় দুই ছেলে—দাদা থাকবে মার কাছে, আমি তোমার কাছে। আমি ছাড়া, আমরা ছাড়া, কে দেখবে তোমাকে? অত বড় ফাঁকা বাড়িতে দুপুর-সন্ধ্যে একা তোমার কাটবে কী করে?’

একটা সন্দেহের দৃষ্টিও ফেলল না বিজয়া। তোলা বিছানায় হেলান দিয়ে খাটের উপর আধশোয়া ভক্তিকা মেরামত করে খাড়া করে তুলল। বললে, ‘আমার বাড়িতে কোনো আত্মীয়স্বজনের স্থান হবে না।’

‘হবে না?’ স্বকান্তর বুকে যেন কে ছুরি বসাল, অস্তিম নিশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বললে, ‘যদি বাড়তি ঘর থাকে—’

‘তা হলেও না।’ রস করে গল্পটা পড়া যাচ্ছে না, মেজাজ তাই সমে নেই বিজয়ার। বললে, ‘তাই দালালকে বলে দিয়েছি ছিমছাম বাড়ি না পেলে সোজাসুজি জমি দেখতে।’

‘জমি!’ সে না জানি আরো কত দূরের পাল্লা। চারদিক ধু-ধু দেখল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, কেনা বাড়িতে বাড়তি কটা ঘর কোন না থাকবে! আর বাড়তি ঘর দেখলেই কাঁথাকবল নিয়ে ঢুকে পড়বে আত্মীয়ের দল। আর, দেখছি তো, একবার ঢুকলে কার বেকুব নাম নেই। আজকাল লাঠিই ভাঙে, ধনঞ্জয় নড়ে না। তাই ভাবছি,’ পাশ ফিরল বিজয়া : ‘গোড়াতেই পথ বন্ধ করে দেব।’

‘কী করে?’ যদি এখনো মরীচিকা দেখা যায় স্বকান্ত প্রার্থনার চোখে তাকাল মরুভূমির দিকে।

‘জমি যাই পাই, বাড়িটা ছোট করে তুলব। ঠিক দু-জনের আন্দাজ। কোথাও এক ফালি ফালতু রাখব না। যাতে এক বেলার জন্তেও অতিথি না মাথা পাততে পারে!’

কী বিপদের মধ্যেই ফেলল কাকলি! বিয়ে করে ফেলেছি, ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, এ বলা কত সোজা। এই দেখ আমার বউ, কাকলিকে সঙ্গে নিয়ে সটান বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়াও কিছু দুঃস্থ ছিল না। কিন্তু, গুগো, আমি বিয়ে করব, আমার বিয়ের জোগাড় করে দাও, নাপিত-পুরুত ডাকো, গ্যাস-বাগু বায়না করো, আমাকে কনের বাড়িতে নিয়ে চলো মিছিল করে, কই আমার টোপের কই, এ একটা আস্ত-স্বস্ত পুরুষ হয়ে কেউ বলতে পারে? ভূ-ভারতে বলেছে কেউ কোনোদিন? রব তুলেছে?

কী জেদী মেয়ে! যত জেদ তত যদি থাকত যুক্তি।

কাকলি বলে, তার দিকে যুক্তি আছে বলেই তো তার জেদ। কেন, কিছু অপরাধ করছি যে লুকিয়ে-চুরিয়ে করব? গোপন রাখব? গায়ে চোর-চোর গন্ধ মেখে বেড়াব? সমুদ্রের পারে বসে ঘটি করে জল তুলে মাথায় ঢালব? সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে ভিজিয়ে স্নান করতে পারব না?

কিন্তু কত নিশ্চিন্ত হওয়া যেত যদি স্বকান্তের পরামর্শটা শোনা হত। রেজেস্ট্রি করে বিয়েটা হয়ে থাকত, শুধু বর্তমান থাকা-খাওয়ার অসুবিধের জন্তে ফুলশয্যাটি থাকত কিছুকাল পিছিয়ে। এ একটা এমন অসাধ্য কী! কত অদর্শনই লোকে সম্ব করে, এ তো শুধু একটু অস্পর্শন। আগুন পোয়াতে বসে আগুনে হাত না দেওয়া। আর কটা দিনেরই বা এ কুচ্ছ। দেখতে-দেখতে শীত যেতে-না-যেতেই, একটা চাকরি জোটাতে পারবে না? পারবে না ঘরেদোরে প্রশস্ত হতে?

যদি না পারো? যদি চাকরি জুটলেও বলো, এটা অভাব ঠেঙাবার পক্ষে যথেষ্ট মজবুত নয়? অর্থাৎ যদি কোপ বুঝলেও কোপ না মারো? পাশ কাটাও? প্রতীক্ষার দিন খালি লম্বা করো? আমি শুকিয়ে মরব? এ কাকলির কথা। যাতে কেউই পালাতে না পারি তারই জন্তে যখন বাঁধা পড়ছি, তখন যাতে বাঁধা না পড়তে পারি তার জন্তে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

‘আর শোনো, অনেস্ট সাধু হওয়া ভালো।’ চোখ মুখ গম্ভীর করল কাকলি।

‘সাধুরা কি বিয়ে করে?’

‘সাধুরাই তো বিয়ে করে। এবং সেটা প্রকাশ করে। বলতে চাচ্ছি সত্যের আশ্রয়ে থাকাই শাস্তি। বিয়ে যখন করছি পুরোপুরিই করছি। না, ওসব ভাবিনী ভাবের দেহী হতে পারব না। সিনান করব অথচ কেশ ভিজবে না, নীর ছোঁব না, এ অসম্ভব।’

‘তার মানে ঔষধার্থে সুরাপানের মতো তুমি নেই।’

হেসে উঠল দু-জনে।

কিন্তু যাই বলো, ছলনাটুকু থাকলে মন্দ হত না। যাই বলো, মন্দের একটু গন্ধ না থাকলে কোনো ভালোই বুঝি আলো দেয় না।

হয়তো কোনো মেলায় বা সভায়, ভিড়ে-ভাড়ে কোথাও তাদের দেখা হয়েছে। পরস্পর এমন মুখ করে থাকবে যে চক্ষের ঘৃণাক্ষরেও কেউ কাউকে চেনে না। দেখতে কুমারী স্তনতে মাধুরী, কত যুবক, গাঢ় ও প্রোচ, সপ্রতিভ হয়ে ঘুরবে আশেপাশে, ঝিলিক দেবে। আর প্রতিধ্বনিতে কত রকম চেউ তুলবে কাকলি। কোথাও মৃদু কোথাও প্রগল্ভ। কোথাও বা কঠিন কোথাও বা ধূর্ত। কোথাও কুন্দলতা কোথাও বা লজ্জাবতী। কিন্তু এক কলার ক্ষুদ্র একটি অংশই শুধু নিচ্ছ কুড়িয়ে, আর আমি যে দূরে, আমি যে ঘুমিয়ে, আমারই সে বোলকলা, আমারই সে পূর্ণিমার পরমা প্রতিমা। কী গৌরব সে ভাবনায়! কী অপূর্ব সে স্বাদগন্ধ। অস্ত্রের হতে-হতে-না-হয়ে সে আমার। আকাশে অনেক কিছুই ওঠে-ফোটে, কিন্তু আকাশ জানে সে শুধু সূর্যের। কারা সব তপস্বী ভাঙাবার উদ্দেশ্যে ঘুরঘুর করছে, ঐ ক্ষামমধ্যা অপর্ণার আমিই সেই মহাদেব।

দিব্য ল পড়ত কাকলি, অন্তত দু-তিন বছরের গড়িমসি, আর মক্কেল-মক্কেল চেহারায় স্বকান্ত ঘুরতে পারত আশেপাশে।

হঠাৎ সমস্ত ভিড়ের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে একটু নিরালায়, রাস্তায় বা দোকানে, তার বুকের খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত কাকলি, দ্রুত তপ্ত স্বরে জিজ্ঞেস করত, ‘কেমন আছ?’

স্বকাস্ত বলত, ‘ভালো। তুমি?’

হেসে উত্তর দিত কাকলি, ‘তোমার মত।’ তারপর দ্রুত পায়ে চলে যেত আঁচল উড়িয়ে।

এমন আশ্চর্য সম্ভাষণ কেউ আর কোথাও শুনেছে? যারা সমস্ত বাক্য ও ব্যবহারের আবরণ নিমেষে দূর করে দিতে পারে তাদের এ কী করুণ কার্পণ্য! যার উপর যে কোনো মুহূর্তে খাসদখল জারি করতে পারে তাকে অবলীলায় চলে যেতে দিচ্ছে স্বকাস্ত, পিছন থেকে একবার ডাকছে না পর্যন্ত। ‘ও খানিকদূরে গিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকায় কিনা তা দেখতেও একবিন্দু প্রতীক্ষা করছে না।

সেবার কী হল জানো না বুঝি? স্বপ্ন দেখছে স্বকাস্ত। সেবার একটা টুরিস্ট পার্টির সঙ্গে জুটে গিয়েছিল তারা। মুখ্যত ছাত্রছাত্রীর দল, বয়স্কেরাও কেউ আছেন অবধায়কের পর্যায়ে। ট্রেনের কামরা থেকে শুরু করে আস্তানায় থাওয়া-শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত আলাদা। প্রবীরেরা এক দিকে, প্রমীলারা আরেক দিকে। শুধু বেড়াতে বেরুবার সময়, মাঠে পড়লেই, একাকার হতে পারত, দাগ-দড়ির বা দলাদলির বালাই থাকত না। তেমনি একবার মাঠে পড়ে স্বকাস্ত আর কাকলি হঠাৎ মাঠছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ছোট একটা পাহাড়ের ঢিলার আড়ালে বসেছিল ঘন হয়ে। কী লনাটের গ্রন্থি, গুঁঠাধরে একটু অসাবধান হতে চেয়েছিল। চরচক্ষু পাহাড়কেও ভেদ করে। পাথার বাতাস খেতে-খেতে আগুন লেগে গেল ক্যাম্পে, অবধায়কদের কানে উঠল। কী প্রতিকার এবং কিসে, কানের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবতে বসল মাথারা।

শাস্তভাবে বাস্তব থেকে দলিল বের করল স্বকাস্ত। ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের সার্টিফিকেট। কাকলি বনে-ওড়া পক্ষীর কাকলি নয়, পাজর-ভাঙা বক্ষের কাকলি।

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

সেবার যা ঘটেছিল, তা আরো মারাত্মক। রাজে গঙ্গায় জাহাজ দেখতে গিয়েছিল দু-জনে। জাহাজ দেখে ফিরে ষ্ট্যাণ্ডে একটা ট্যান্ডি নিয়েছিল। জল আর জাহাজ দেখলে, দেখে আবার স্থলে ফিরে এলে কার মন না উচাটন হয়! কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সার্জেন্ট এসে ধরবে এ কে পেরেছিল কল্পনা করতে? কোনো কথাই শুনলে না, একেবারে থানায় এনে উপস্থিত করলে। তখন, পকেটেই ছিল, ঘরের প্রত্যক্ষ আলোতে দলিলটা বার করে দিল স্বকাস্ত।

* দেখে পুলিশ বোকা বনে গেল।

একটা বাকতাল্লা মারছে এই এতক্ষণ ভেবেছিল পুলিশ কিন্তু কুণ্ডলকবচ সঙ্গেই বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এ স্বপ্নের অতীত।

তখন ক্ষমা চাইতে পথ পায় না কর্তারা। নিজেদের গাড়িতে যার-যার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে সসন্মানে।

এসব স্বপ্ন একটুও দেখতে দিল না কাকলি। একেবারে গোড়াতেই সিঁচুরে-গয়নায় স্নাতাজোবড়া হয়ে এসে দাঁড়াল। কুমারী-কুমারী থাকল না, থাকতে পেল না, একেবারে প্রথম থেকেই সধবা। অহল্যা মাটিতে দিল না একটু হাওয়া খেতে। মাথায় কোটেশন-চিহ্ন ও পায়ে ফুটনোট দেওয়া থাকলে কি পড়ে স্থখ হয়? সিঁচুর আর আলতাতে কি আবিল হবে না সেই শুভ্রতা? যে নিদাগ অবাধ মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম সে কি আর থাকবে? লালে-নীলে সর্বাঙ্গে আগুরলাইনড্ হলে সে কি অপার্থ্য হয়ে উঠবে না? স্বকাস্তকে কি কেউ কোঁয়ারহর বলবে? না। বলবে, বিবাহিত ভদ্রলোক।

‘ওসব বাছ। অল্প কথা বলো।’ চপল চোখে হাসতে গিয়ে কাকলি নিম্পলকে চেয়ে থাকে।

তুই চোখে শ্যামলসুন্দর স্নেহ, প্রস্নহীন প্রার্থনা।

আমি কি শুধু নৈবেদ্যের থালা? এক স্তূপ বসনভূষণ? শুধু অন্নজলের পাত্র?

না, তুমি এক আনন্দের চিঠি। কোন এক অচেনা পোস্টাпис থেকে তোমাকে কে পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ঠিকানা লিখে। নির্জনে বসে সেই চিঠিটি পড়ব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। সেই যে তোমার প্রথম চিঠি পেয়েছিলাম, খুলেছিলাম, পড়েছিলাম—তেমনি।

না, না, দাগে কি মানে কমে?

তবে এবার বউদিকে ধরতে হয়। সাধুদের পরিত্রাণের জন্তে যেমন অবতার তেমনি দেওরদের পরিত্রাণের জন্তে বউদি।

ছন্নছাড়ার মত চেহারা করে উপরে উঠছে বন্দনা, স্বকাস্ত বললে, ‘তোমার এত কষ্ট আর দেখতে পারি না।’

এত কষ্টও হাসল বন্দনা। বললে, ‘দেখতে তো পাচ্ছ না কিন্তু ব্যবস্থাটা কী করছ শুনতে পাই?’

‘ভাবছি তোমাকে একটি সঙ্গিনী জুটিয়ে দি।’

প্রস্তাবটা একবাক্যে ভূপাতিত করলে বন্দনা। বললে, ‘রন্ধে করো। একা জলছি জলছি, আরেকজনকে জলতে দিতে পারব না।’

বাস, হয়ে গেল।

কাটা স্ত্রীতে ধরবার জন্তে হাত বাড়াল স্বকাস্ত। বললে, ‘কিন্তু জ্বালায় প্রতিকারটা তো ভাববে।’

‘জ্বালায় প্রতিকার ঠাকুরানী নয়, ঠাকুর, একটি বামুন ঠাকুর। যে বাঁচাবে হু
বেলার এই আগুনের, উত্তনের তাপ থেকে।’

‘বা, ঠাকুর আমি আগামী মাস থেকেই রেখে দিচ্ছি।’ কথায় অগ্নি মানে পুরল
স্বকাস্ত : ‘কিন্তু মাহুঘের অগ্নি তাপও তো ছিল, যাকে বলে, সস্তাপ—’

‘ছিল বৈকি। তার জন্তে ঘরে ফ্যান দাও, কিনতে না পারো ভাড়া করো।’

‘বা, ফ্যানও দেব বৈকি। আজ-কালই যাচ্ছি আমি দোকানে, খোঁজ নিচ্ছি!’
কানের কাছটা চুলকোবার উত্তোষ করল স্বকাস্ত : ‘কিন্তু তাই বলে তোমার সঙ্গিনীর
কথাটা—’

‘রাখো।’ ধমক দিয়ে উঠল বন্দনা : ‘যে কুঁজো সে যেন কাত হয়েই শোয়। চিং
হয়ে শোবার সাধ না করে। ঘর নেই বারান্দা নেই চাকরি নেই বাকরি নেই, তার
আবার সঙ্গিনী। গিন্নি ধরে এনে তাকে আর সঙ বানিয়ে না।’ হাতের কাছে মুখ
খোরাল বন্দনা : ‘সঙ্গিনী না সঙ-গিন্নি!’

হু হাত যুক্ত করল স্বকাস্ত। বললে, ‘তোমাকে বন্দনা করি বউদি, ক্ষেমা দাও।
‘ও নাম আর উত্থাপন করব না।’

কী অনর্থক ঝামেলার মধ্যেই না ফেলেছে কাকলি। যদি সঙ্গিনী হতে না চেয়ে শুধু
রঙ্গিনী হয়ে থাকত বড় জোর দুই বসন্ত, তা হলে বউদির এই ঝংকারটা শুনতে হত না।
মেয়েরা সকলেই এত কম বোঝে।

ও ভাবে হলে চলবে না। পাত্রকে স্পষ্ট করতে হবে।

সেন্টুর শরণ নিল স্বকাস্ত।

‘সেন্টু, একটা কাজ করবি?’

কাঠের টুকরো দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছিল সেন্টু, গম্ভীর মুখে বললে, ‘কাজ-টাজ আমি
করতে পারি না।’

শোনো কথা! নক্ষত্র বিরূপ হলে সেন্টুও বিরুদ্ধে যায়!

‘শোন, কাজ করতে হবে না তোকে। শুধু একটা কথা বলবি।’

‘আমার সময় কই?’ তৎপর হয়ে ছবির সঙ্গে কাঠের টুকরো মেলাতে লাগল সেন্টু।

‘শোন, তোকে সেই একটা পিস্তল দিয়েছিলাম না—’

কাঠের টুকরোগুলো সেন্টুর হাত থেকে খসে পড়ল অনায়াসে। বললে, ‘জানো,
আমার আর ক্যাপ নেই।’

‘আর পিস্তল নয়। পিস্তল পুরোনো হয়ে গেছে। তোকে এবার একটা মেশিনগান
কিনে দেব।’

‘দেবে?’ উঠে এল সেন্টু। কাঁপিয়ে পড়ল গায়ের উপর। চোখ বড় করে বললে, ‘সেটা কী জিনিস কাকা?’

‘বন্ধুকের ঘোড়া টিপবি আর ঘটাঘট ঘটাঘট গুলির আওয়াজ হতে থাকবে। আর সঙ্গে সঙ্গে গুলির ঘরে-ঘরে জ্বলবে আগুনের চোখ—’

‘কবে দেবে বলো?’ স্বকান্তর বন্ধুর মধ্যে মুখ রাখল সেন্টু।

‘তার আগে একটা কথা শুনবি বল?’

‘শুনব।’ তারিক্কি চালে মাথা নাড়ল সেন্টু: ‘কিন্তু কী কাজ বলছিলে না?’

‘হ্যাঁ, কাজ, ঠিক বলেছিল। তারি লক্ষ্মী ছেলে তুই—’

‘কি, পিঠি চুলকে দেব? দাঁড়াব পায়ের উপর?’

‘না, ওসব নয়। কথা আর কাজ এক সঙ্গে।’ চোখের উপর চোখ রেখে গলা নামাল স্বকান্ত, ‘তোরা ঠাকমার গলা জড়িয়ে ধরবি আর কানে কানে বলবি, জানো, সেই যে একটা মেয়ে এসেছিল আমাদের বাড়ি, যাকে সবাই সাবানের ফিরিউলি ভেবেছিল, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। কী, পারবি বলতে?’

‘বিয়ে হলে অনেক জিনিস পাওয়া যায়, তাই না কাকা? তবে আমার বিয়ে কবে হবে?’ কান্নার স্বর বের করল সেন্টু।

‘আগে আমারটা হোক। তারপর তোরা।’ দু হাতের মধ্যে সেন্টুর দু গাল চেপে ধরল স্বকান্ত: ‘বল তো কী বলবি ঠাকমাকে?’

আবৃত্তি করিয়ে করিয়ে দোরস্ত করে দিল।

মুগালিনীর অত সোহাগ করবার সময় নেই। কোল থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সেন্টুকে। সেন্টুর হাতে আজ মেশিনগান, সহজে সে নিরস্ত্র হবার পাত্র নয়! তড়বড় তড়বড় করে ছোটাল সে গুলির ঝড়। হ্যাঁ, সাবানের ফিরিউলি, তার সঙ্গে কাকার বিয়ে হচ্ছে। হ্যাঁ, হচ্ছে, বিয়ে হচ্ছে। কাকার সঙ্গে সাবানের ফিরিউলির।

মুগালিনী ধমক দিয়ে উঠল।

ধমকে কি মেশিনগান থামে?

‘আমি কী জানি। কাকাই তো বললে বলতে।’ তারিক্কি চাল ঝাড়ল সেন্টু: ‘আর কাকার পরেই আমার বিয়ে। আমার বউ সাবান নয়, ঘটাঘট মেশিনগান। দেখো সব ঘরে কেমন আগুনের চোখ জ্বলে, আগুনের জিভ নড়ে—’

‘দেখ তো বউমা, থোকন কী সব বলছে—’

‘বারে, আমি বলব কেন, কাকা বলছে।’

হুতোর পর হুতোর জট খুলে রহস্য-উদ্বেদ করল বন্দনা। সঙ্গিনী মানে যে এই সঙ্গিনী অথবা তা কে বুঝেছে।

‘সেই যে কাকলি বলে একটি মেয়ে এসেছিল, হাইকোর্ট না ছাইকোর্টের জজের মেয়ে, সে ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে করতে চাচ্ছে। ঠাকুরপোও নিমরাজি। জাত-গোত্রের বাধা নেই। এখন আমাদের মত হলেই নৌকোতে বাদাম দেয়।’

চোখেমুখে বলমল করে উঠল মৃণালিনী। বললে, ‘বেশ হয়। দেখতে-শুনতে বেশ মেয়ে। তারপরে এম-এ পাশ। চারটিখানি কথা নয়। যেখানে মেয়েরা একখানা খবরের কাগজ উলটে দেখে না, সেখানে এত রাজ্যের পড়া—’

এ কটাক্ষ বন্দনাকে। কিন্তু কাকলির কৃতিত্বকে কে অস্বীকার করবে? বন্দনা তাই চুপ করে রইল।

‘তারপরে কত বড় বাপ। কত দেওয়া-খোওয়া করবে না জানি।’ মৃণালিনী স্বপ্নের রামধনু দেখল।

মানেটা সেটু বুঝতে পেরেছে আন্দাজে। বললে, ‘হ্যাঁ, বিয়ে করলেই অনেক পাওয়া যায় জিনিস। আমার জন্মদিন হয়ে গিয়েছে, এখন আছে শুধু বিয়ের দিন। কাকা বলেছে তার আর বেশি দেরি নেই। কাকারটা চুকে গেলেই আমারটা।’

বৈঠকখানার নিরিবিলিতে ভূপেনবাবুর কাছে কথাটা ভাঙল মৃণালিনী।

লেখার থেকে চোখ তোলবারও প্রয়োজন মনে করল না ভূপেন। বললে, ‘বাবুর বেটা গাড়োয়ান, ও বিয়ে করবে কী!’

‘কিন্তু সম্বন্ধটা তো ভালো।’

‘এই সম্বন্ধ ভালো করতে গিয়েই ঘোরাঘুরিতে ফার্স্ট ক্লাসটা পেল না।’

‘তিন নম্বরের জন্ত মিস করেছে।’

‘যারা পায় না দু-এক নম্বরের জন্তেই মিস করে।’

‘কিন্তু রিসার্চ স্কলারশিপ তো পেয়েছে।’

‘চাল নেই তার ভাতে ভাত। সামান্য দু শো টাকা আয়। তাও কত দিন?’

‘কেন ও কি অক্ষয়?’ ঝামটা দিল মৃণালিনী : ‘ও কি পাকাপোক্ত একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?’

‘সেইটি বন্দোবস্ত করে সম্বন্ধের দিকে গেলেই তো বুদ্ধিমানের কাজ হত।’

‘আজকালকার ছেলে অঘোরে-বিঘোরে কত কী কাণ্ড করে বসছে। বেজাত-বেহাত ধরে এনে ঘরে পুরছে। সেইদিক থেকে স্বকু কত ভালো, কত সৎ। অসামাজিক কিছু করে নি, চায় নি করতে। ধর্ম-কর্ম বজায় রাখতে চেয়েছে। আর

বড় বাপের মেয়ে। তুমি আর বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না। তুমি হলে কেমন উ আনতে, কেমন বউ এনেছ—’ ভিতরের দিকে জলন্ত চাউনি ছুঁড়তেই তক্ষুনি হরণ করলে মুণালিনী। বললে, ‘এ সম্বন্ধে খুব ভালো। এ সম্বন্ধই হবে।’

‘বেশ তো, হবে।’ এতক্ষণে চোখ তুলল ভূপেন : ‘কিন্তু সম্বন্ধের প্রস্তাবটা আগে রাখুক। মেয়েপক্ষ থেকে প্রস্তাবটা আগে আসবে তো। সামাজিক ব্যাপার, প্রথমত ময়ের বাপ তো একটা চিঠি লিখবে অন্তত—’

‘তা তো লিখবেই।’

‘নয়তো বাড়িতে এসে মৌখিক বলবে। একটা সরকারি প্রস্তাব তো চাই।’

‘তা চাই বৈকি।’

এ আবার আরেক ঝামেলা। আরেক কষ্টক।

এ লগ্নে বিয়ে বুদ্ধি আর হল না। ক্ষণ গেলে ক্ষণ আসে, কিন্তু লগ্ন গেলে আর করে কই।

১৩

ছোট ভাইবোনদের সঙ্গে এতক্ষণ কারাম খেলছিল কাকলি, এখন খেলা ফেলে রেখে, আবার এসে শুয়েছে তার খাটে। একটা উপন্যাস পড়ছিল, ভাবল সেটা আবার ধরবে কিনা। আলস্তে হাত বাড়াল সেদিকে। তক্ষুনি আবার হাতটা গুটিয়ে নিল। বইটার শেষ কী হবে তা যেন এখন, মাঝপথেই বোঝা যাচ্ছে। যদি শেষই বোঝা যায় তা হলে আর পথ চলে, জীবনের পৃষ্ঠা উলটিয়ে, স্থখ কই?

মরবে তো একদিন। তা কে না জানে। কাল সূর্য উঠবে হয়তো, তারই মত অবধারিত। কিন্তু সে তো একটা অবস্থার শেষ, অস্তিত্বের শেষ কই? আধার ভেঙে গেল বলে কি আধেয়ও উড়ে গেল? প্রিয় চলে গেলে কি প্রেমও চলে যায়? অন্ধ হলে কি আর থাকেই না দৃষ্টিশক্তি?

দেহে, দিনে-রাত্রে প্রতি মুহূর্তে আমরা মরছি। সামর্থ্য ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কই, আকাজ্জক তো ক্ষয় হচ্ছে না। ভাসতে-ভাসতে চরে এসে উঠছি, কিন্তু পার পাচ্ছি কই? মনে হচ্ছে মৃত্যুর পরেও আছে আরো পরিচ্ছেদ। আরো কামনা করবার সূর্য যন্ত্রণা। কিন্তু আরো যে আছে তার প্রমাণ কী! কাল সূর্য যে উঠবে

তারই বা প্রমাণ কী ! আর, স্বকান্ত যে হৃন্দর, বরণীয়, তাই বা আমি প্রমাণ করি কী দিয়ে ?

মৃত্যুই যদি শেষ হয়, বেশ, হোক । কিন্তু কিসে মরব, কবে মরব, কোথায় মরব, স্থলে না জলে, স্ববাসে কি প্রবাসে, এ জানতে দিচ্ছে না । জানতে দিচ্ছে না বলেই জাগিয়ে রাখছে, বাঁচিয়ে রাখছে । শুধু ঋণ করে ঘি খাবার কথা বলেই সরে পড়তে চাইছে না । চার্বাক এখন একবার এলে পারে । মনে-মনে হাসল কাকলি । মহাজনী আইন হয়ে যাবার পর এখন আর ঋণ কই ? আর কায়ক্লেশে ঋণ যদি বা মেলে ঘি কই বাজারে ? মৃত্যুই তো মৃত । সে ঘি খেয়ে যাবজ্জীবন সুখে থাকা হৃদয়ের কথা । শুধু খাওয়া, খেতে পাওয়াই কি সমস্ত ? জীবনে নেই কি সে এক শান্তিত আশ্বাস যা কোনোদিন বারিত হয় না, ব্যাহত হয় না ? সব খেয়ে-পেয়েও যে সমানে পায় নি বলে মাথা কোটে ?

ধরবার নয়, তবু ধরবার জন্তে হাত বাড়ানো । বাঁধবার নয়, তবু বাঁধবার জন্তে বাজার থেকে দড়ি কেনা । জানবার নয়, তবু নিরালায় নগ্ন হৃদয়ের উপরে কান পাতা ।

তাই বা মন্দ কী ! মরণের ঘাটের দিকে যেতে-যেতে জীবনের গাছতলায় বসে এই একটু চটুইভাতি করে নেওয়া ।

ভালোবাসা এলেই বুঝি মরণকে মনে পড়ে । ভালোবাসাই বুঝি সেই এক স্ত্রী, একান্ত স্ত্রী, যার পরে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই অর্থই থাকতে নেই । সেই এক ডাক যা বুঝি মৃত্যুর মতই অন্ধকার ।

‘কি রে, শুয়ে আছিস কেন ?’ গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল ।

‘এমনি ।’

‘শরীর খারাপ ?’ সন্দ্বিষ্ট পায়ে গায়ত্রী কাছে এগুল ।

‘না ।’ বাহু দিয়ে চোখ ঢাকল কাকলি ।

‘দেখ তো কী হল মেয়ের ।’ নিজের মনে বলছে না কাউকে সজ্ঞাবণ করছে দেখবার জন্য কাকলি চোখ খুলল না । দিবারাত্র স্তনছে, এখনো না হয় আরো কিছু বার হবে কানের পোকা । ‘সব তাতেই অকুচি, সব তাতেই অনিচ্ছা । এম-এটা খারাপ হয়েছে বলে এত কী মন খারাপ করা ! ফেল তো আর করিস নি ।’

‘এম-এ এম-এ । খাড়া ক্লাশ না কোন ক্লাশ কে জানতে আসছে ! এত যে সব ডক্টর-ফক্টর দেখি তাদের কে কোথেকে কী ভাবে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিনেকেটে এনেছে কে খোঁজ নেয় ! আর যারা গালভরা উপাধি ঝাড়ে ? কাব্য-বিনোদ না ভক্তিবিনোদ !

‘কে জিজ্ঞেস করে, কে মশাই আপনাকে বিনোদ করল? কিংবা কাকে আপনি বিনোদ করলেন?’

নরনাথ—নরকাকা এলোছে। বুধতে পারল কাকলি। তার শোকটা যে কত ভয়াবহ তা বোঝাবার জন্তে আঁচলটা মুখের উপরে টেনে নিল। এ কালোমুখ কি কাউকে দেখানো চলে?

‘বেশ তো, আরেক গুপ নিয়ে পরীক্ষা দে।’ গায়ত্রী রাগ-রাগ ভাব করে বললে, নইলে বি-টিতে গিয়ে ঢোক। ল পড়বি বলে এত তড়পেছিলি তাতে গিয়ে ভর্তি হ।’

‘না, না, ওসব ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই।’ নরনাথও এগিয়ে এল খাটের দিকে : দেখছ না, ওর ভঙ্গিটা দেখছ না, ও এখন আরাম চায়। আলস্য চায়।’

‘ও ওরকম মেয়ে নয়।’

‘সব মেয়েই ওরকম।’ পকেট হাটকে কি একটা বের করে সহসা গায়ত্রীর কাছে নরনাথ বললে, ‘এই দেখ কী এনেছি। বলো কেমন দেখতে?’

সানন্দ কৌতুহলে চোখ বড় করল গায়ত্রী : ‘কে এ?’

‘আমাদের কোম্পানিতে নতুন জয়েন করেছে। স্টার্টিং-এই পাচ শো টাকা। তারপর কোম্পানি থেকেই পাঠাবে ‘ফরেনে’। বিয়ে করে একেবারে বউ নিয়ে যেতে পারবে।’ ফোটোটা চশমার কাছে বাগিয়ে ধরল নরনাথ : ‘কেমন স্মার্ট দেখেছ?’

কাকলি কি নড়ে-চড়ে উঠল? পাশ-ফেরানো মুখটা সোজা করল? মুখের আঁচল কি এল শিথিল হয়ে?

‘স্মার্ট তো বটেই।’ দূর থেকেই আরেকবার চোখ বুলাল গায়ত্রী; ‘স্মার্ট না হলে সাহেব কোম্পানিতে নেবে কেন? বয়েসও তো বেশি নয়।’

‘না, না, সাতাশ-আটাশ। সুন্দর মানাবে। খাসা। আইডিয়াল।’ প্রায় স্বর্গে গলা তুলল নরনাথ।

‘পাশ-টাশ কন্দুর?’ মায়ের প্রশ্ন তো, জিজ্ঞেস না করে পারল না গায়ত্রী।

‘জাতে-গোত্রে যুগ্মি, নিটোল-নিটুট চাকরি, অল্প-বয়স, সুস্থ, সুদর্শন—আবার তি পালকে দরকার কী!’ উড়িয়ে দিতে চাইল নরনাথ।

‘ভবু মেয়ে তো আমার এম-এ।’

‘এম-এ দিয়ে তো ধুয়ে খাবে। ঐ কে এম-এ পাশ, জহরলালকে বলেছিল দোকানদার পান্নালালের বড় ভাই, ভাবে-কে বলেছিল বাঙলা ভাবার প্রেজেন্ট টেন্স, আর হরমোনকে বলেছিল—কী যেন বলেছিল রে?’ কাকলিকে লক্ষ্য করল নরনাথ।

এ অবস্থায়, মেয়ের সামনে গুরুজনদের মধ্যে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠলে, মেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়, হ্যাংলার মত বসে থাকে না। আর যদি কিছু শোনবার লাগলো হয়, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে উল বুনতে-বুনতে আড়ি পাতে। কিন্তু নরুকাকা কী অদ্ভুত ভালো, প্রায় ঈশ্বরপ্রেরিত। কেমন সুন্দর বিয়ের কথা নিয়ে এসেছে। বাড়িতে একটা বিয়ের কথা উঠুক এই এতদিন চাইছিল কাকলি। তারই জন্তে ভাবে-অভাবে আবহাওয়া তৈরি করে চলেছিল। এরা সব ভাবছিল শূণ্যতার কথা। পূর্ণতার খবর নিয়ে এই প্রথম এল নরুকাকা। প্রসঙ্গটা উঠলেই তো তবে আসক্তির কথাটা বলা যায়।

খুশিতে বলমল করতে-করতে উঠে বসল কাকলি। বললে, ‘হরমোনকে বলেছিল হার্মোনিয়ামের আবিষ্কার।’

‘দেখলে তো বউদি, কেমন বেজে উঠল হার্মোনিয়াম। সবগুলো দাঁত দেখা গেল, তাই না?’ কাকলির দিকে তাকাল নরনাথ : ‘একসঙ্গে সবগুলো রিড!’

অগত্যা গম্ভীর হল কাকলি। উপায় নেই, বইটা তুলে নিতে হল। অপেক্ষা করে রইল।

‘জানি বাজবেই, উঠবেই বেজে। যখন যেমন গান—’

‘কিন্তু কতদূর পাশ-টাশ করেছে বললে না তো—’ গায়ত্রী বাকিটুকুর জন্তে উলখুস করতে লাগল।

‘ক পাশ নয়, ধ—পাস।’ কাকলি টিপ্পনী না কেটে পারল না।

হাসল নরনাথ। গায়ত্রীকে বললে, ‘তোমার শিক্ষার খবরে দরকার কী? তুমি মা, তুমি শুধু বিত্ত দেখবে। ছেলের মাইনে ভালো, উন্নতি যতদূর চোখ যায়। আফিসের গাড়ি পাবে, আর যা আফিসের তাই গৃহের, গৃহ মানেই গৃহিণীর, মানে স্ত্রীর,—আর স্ত্রীর হলেই শান্তি। বাড়ি আছে দজ্জিপাড়ায়, আর ষা চাকরি বাগিয়েছে, বুঝতেই পারছ, মুকব্বির জোর কত। আজকাল যার মুকব্বির তারই মোরব্বা।’

‘তবু শিক্ষাদীক্ষার কথাটা জানতে হয়।’ গায়ত্রী বললে, ‘আর তা জানবার মাপকাঠিই হচ্ছে কী পাশ, কটা—’

বইয়ে মুখ ঢাকল কাকলি। শুধু দু’রস্তু দুটি চোখ বাইরে রেখে বললে, ‘ও ওপাশ ওপাশই করেছে বোধ হয়—’

‘তুই মেয়ে, তোর ও খোঁজে কী দরকার? তুই শুধু রূপ দেখবি।’ পকেট থেকে ফোটোটা ফের বার করল নরনাথ : ‘দেখবি? জাখ না। দেখতে কী দোষ!’

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল। বললে, ‘বিজ্ঞা ছাড়া বুদ্ধি রূপ হয়? আর যে প্রকৃষ বিয়ের অ্যাম্লিকেশনের সঙ্গে নিজের কোটো এনক্লোজ করে দেয় সে যে রক্তখানি শিক্ষিত তা আর বলতে হবে না।’

‘মোটাই তা নয়। আবেদনটা আমাদের, আর আমরা এনক্লোজ না করে ডিসক্লোজ করব, তাই উনি দেখতে আসবেন স্বচক্ষে। কে উনি আসছেন তারই পূর্বাভাসের জন্তে এই ছবিটা তার অ্যালবাম থেকে তুলে এনেছি। দিতে কী চায়! অনেক পিড়াপিড়ি ধম্মাধস্তির পর দিল। সিনিয়র অফিসার, আমাকে কি আর চোটে পারে! বললাম, কে তুমি যাচ্ছ তাদের একটা আইডিয়া তো দিতে হয়। সম্ভবত, অন দি ফেস অফ ইট, তুমি যে প্রত্যাখ্যেয় নও, বরং তুমি যে নির্বাচনের, নিয়ন্ত্রণের, এ সম্বন্ধে তো তাদের নিঃসংশয় হওয়া চাই। ফাইন্সালের আগে একটা হিট হতে দোষ কী! ঘটনা তার ছায়া ফেলে শোনো নি? এও ঘটনার আগে একটু ছায়া দেখানো। কই, দাদা কই, কেমন আছেন?’ অশ্রু ঘরের দিকে পা বাড়াল নরনাথ।

মহাভারতের এখনো অনেক পর্বই বাকি, গায়ত্রী পিছু নিল। কাকলি আবার চলল। উপরের দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

কতক্ষণ পরে ব্যস্ত পায়ে ছুটে এল গায়ত্রী। ঘনিষ্ঠ বড়ঘরীর স্বরে বললে, ‘ওনহিস, শুধু মুকবির জোরেই চাকরি পায় নি, ছেলের গুণ আছে।’

মায়ের ভর-ভর মুখের দিকে তাকাল কাকলি, কোনো কথা বলল না।

‘ছেলে এম-কম, তার উপর আবার ল পাশ। শুধু হুনেই কি হয়, স্বাদের জন্তে মিষ্টিও লাগে।’ ডগমগ হয়ে বলল গায়ত্রী, ‘ছেলের নিজের লিষ্টি আর মুকবির তদবিরের স্থান। চৌকস ছেলে। এখন আমাদের অদৃষ্ট। তা ছেলের চোখে নকুঠাকুরপো মধুর ছিটে দিয়ে দিয়েছে—তবু একবার দেখুক, দেখে যাক—’

‘আমাকে দেখবে?’ আতকে উঠল কাকলি।

‘আহা, এ কি সেই সরাসরি দেখা, না চুল খুলে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়ানো? সে একটা ডিসেন্ট কিছু হবেই। ঠাকুরপো যখন আছে তখন আর ভাবতে হবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, গায়ত্রী আবার ছুটল ব্যস্ত পায়ে : ‘ছেলের নামটাই তো জানা যায় নি। যখন সব ভালো, নামটাই বা না কোন ভালো হবে। আর নামে কী আসে যায়—’

‘লেখক তো নয়, যে নাম চলল না বলে বইও চলল না—’

‘আর আজকাল তো আকিলে-বাজারে উপাধি ধরে ডাকার রেওয়াজ—চক্রবর্তী না দাশগুপ্ত—’ চলে গেল গায়ত্রী ।

কতকণ পরে বেরিয়ে এল নরনাথ । পিছনে বনবিহারী । ঘর থেকে বাইরে, মিঁড়ির মুখে বারান্দার কাছে সবাইকে দেখতে পাচ্ছে কাকলি । কী আশ্চর্য, লাঠি ছাড়াই বাবা হাঁটতে পাচ্ছেন । তাঁর পায়ের ব্যথাটা হঠাৎ কম বলে মনে করছেন । যেন কী একটা কাঁটা ফুটে ছিল, থসে গিয়েছে । মুখে আর সেই ভার-ভার অবসাদের ভাব নেই । আর মা তো মুহূর্তে বয়স অনেক কমিয়ে ফেলেছেন হালকা হয়ে গিয়েছেন ।

বা হাতের তালুর উপরে ডান হাতের কিল মেরে নরনাথ বললে, ‘এ সম্বন্ধ হবেই । আমি জানি আমার কথা ও ফেলতে পারবে না ।’

মেয়ের জন্তে অগাধ মমতা, তাই বুঝি নৈরাশ্যকেও হিসেবের মধ্যে রাখছেন বনবিহারী । বললেন, ‘এখন পছন্দ হলে হয় !’

‘পছন্দ হবে না কী !’ নরনাথ চশমার কাঁচ মুছতে লাগল : ‘এমন মেয়ে কত পাবে কলকাতায় ? যদি ঝাপসা কিছু দেখে, তা মেয়ের দোষ নয়, ওর চোখের দোষ । তাই ঠিক পাওয়াবের চশমা পরিয়ে নিয়ে আসব ।’

‘কিন্তু মেয়ে আমার গৃহস্থ টাইপ—’ বনবিহারী আবার মমতা বরালেন ।

‘আর উনিই বা কোন গৃহহীন । যেমন সাজাবে তেমনি সাজবে । বউ সাজালে বউ, বিবি সাজালে বিবি । মেয়েদের কি, ছন্দ ধরে থাকলেই পছন্দ হয় শ্বেতপাথরের গ্লাস নয়তো ডিকেণ্টার । যা বলো । চীনেমাটির প্লেট নয় কলাপাতা—’

‘আমার ভয় হচ্ছে, বেশি কিছু দাবি-দাওয়া না করে বসে ।’ গায়ত্রী মুখ শুকনো করল ।

‘দাবি-দাওয়া না হাতি ! দিলে দেবে, না দিলে না দেবে—যা তোমাদের সাধ ।’

‘না, না, দেব ।’ বললেন বনবিহারী, ‘কাকলির জন্তে আলাদা টাকা রেখেছি ।’

‘তবে সেই কথাই রইল ।’ নরনাথ গায়ত্রীকে মনে করিয়ে দিল : ‘আগামী শনিবার দুপুর ছুটোর এসে আমি তোমাকে আর কাকলিকে নিয়ে যাব । ইন্দিরাও যাবে ।’

‘ও পক্ষে ?’

‘ছেলে আর তার দিদি আর ভগ্নীপতি । মা তো নেইই বলেছি—’

‘ছোট বোনটোন ?’

‘যদ্যুৎ জানি, তাও নেই।’

আরো হালকা হল গায়ত্রী। শান্তি থাকবে না, অন্ধনে নেমেই বোল আনা কর্তী হতে পারবে, আর, ননদ-ফনদের বিয়ের জন্তে টাকা জমাতে হবে না মাস-মাস, কত বড় উপশম সংসারে। চোখে ইঙ্গিত পুরে গায়ত্রী তাকাল নরনাথের দিকে। বললে, ‘কাকলিকে ভালো করে বলে যাও।’

বনবিহারী টলতে-টলতে আরো কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বললেন, ‘কাংশনটা কী?’

‘দেখি কী দাঁড়ায়! হয় কোনো হোটেলে চা, নয়, গঙ্গার পারে কোথাও পিকনিক। ডিটেলস পরে জানাব। ই্যা, কী জানি কথাটা? খবরের কাগজে বিশেষণ হিসেবে খুব চলে। ই্যা, মনোজ্ঞ—বাপারটা যতদূর মনোজ্ঞ করা যায়—’

ভয়ানক কথা, হাসলেন বনবিহারী। ‘আজ মঙ্গলবার—’ গুনলেন হয়তো শনিবারের দেরি কত।

নামবার আগে নরনাথ চুকল কাকলির ঘরে। নিমন্ত্রণের বিষয়টা বিশদ করতে চাইল।

হার্মোনিয়ামের সমস্তগুলি রিড খুলে বেজে উঠল কাকলি: ‘কিন্তু চা যেন হাই-টি হয় নরকাকা। বেশ হেভি।’

‘ই্যা, ই্যা, হবে—’

এবার কাকলি নীরবে হাসল। প্রায় আধ্যাত্মিক হাসি। এ হাসিই বলে, প্রভু, এদের তুমি ক্ষমা কর। এরা জানে না এরা কী করছে।

গায়ত্রী নরনাথকে দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল। বনবিহারী অসাহায্যে হেঁটে-হেঁটে চলে গেলেন নিজের ঘরে।

গায়ত্রী এল কাকলির কাছে। কতদিন তার স্বাস্থ্য-লাবণ্যের সরঞ্জামিন তদন্ত করে নি ভেবে অস্বস্তি পেল। মাথাভরা কত স্নেহের চুল ছিল, অস্বস্তি-আলসে উঠে যেতে বসেছে। চুলগুলি দু হাতে তুলে নিয়ে আদরে তেল মাখিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী।

কাকলি ডাকল: ‘মা।’

কি রকম অদ্ভুত লাগল গায়ত্রীর। কী কথা আছে সরলভাবে সরাসরি বলেই ফেল না। সম্বোধন করবার কী দরকার। বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠল।

ডেকেছিস তো কথা বলছিস না কেন?

‘মা!’

‘কী ?’

গায়ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মুখ দেখা যাচ্ছে না এই যা শাস্তি । বললে, কাকলি, ‘নরুকাকাকে বলে দাও শনিবারের ফাংশন বন্ধ করে দিক ।’

‘কেন ?’ গায়ত্রীর ছ-হাতে কাকলির চুল অচল হয়ে রইল ।

‘ওখানে হবে না ।’

‘কী হবে না ?’

ঢাক-ঢাক-গুড়গুড়ে লাভ নেই, স্পষ্ট কণ্ঠেই বললে কাকলি, ‘বিয়ে ।’

গায়ত্রী ভাবল, প্রত্যেক চাকরির উমেদারই যেমন সন্দেহ করে, তার বৈগুণ্য বেশি, সম্ভাবনা কম, তেমনি একটা অলস সন্দেহই কাকলিকে আচ্ছন্ন করে বসেছে । প্রত্যেক পরীক্ষার আগে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর যেমন হয় ।

‘তা না হোক । তার জন্তে দেখাতে বা দেখে আসতে দোষ কী ! না হয় তা ঠাকুরপো বুঝবে । আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার !’

‘কথাটার মানে তা নয় ।’

‘তা নয় মানে ?’

‘তা নয় মানে,’ একটুও ঢৌক গিলল না কাকলি, ‘আমার বিয়ে অন্তত ঠিক হয়ে আছে ।’

গায়ত্রীর হাত থেকে চুলের গোছা আলগোছে খসে পড়ল । বিবর্ণ স্বরে প্রায় চোঁচিয়ে উঠল : ‘কী হয়ে আছে ?’

‘ঠিক হয়ে আছে । মানে স্থির হয়ে আছে ।’

‘এখনো হয় নি তো ?’ সমস্ত শরীর যেন কাঁপছে গায়ত্রীর ।

‘না, হয় নি ।’

‘তবে জেনে রাখো, আর হবে না ।’ চুলের গোছা আবার তুলে নিল গায়ত্রী ।

স্বাস্থ্য যা বলেছিল তাই করলেই ভালো হত । এত কথা কইতে-সইতে হত না । সোজাহুজি বলে দিলেই হত, হয়ে গিয়েছে, চুকে-বুকে গিয়েছে—এই দেখ সরকারি দলিল । সিলমোহর মারা । এ আর নাকচ হবার নয় । আমি নাবালক নই, আইনের কোনো বাধানিষেধের মধ্যে আমরা পড়ি না । এখন পারো তো ভোজ্য ডাকো ।

‘কেন হবে না ?’ কাকলি ঘাড় ফেরাল মার দিকে ।

‘না, হবে না ।’ গায়ত্রী চুল ধরে টান মারল সজোরে ; ‘আমরা যাকে মনোনীত করব তাকেই তোমার নিতে হবে ।’

‘তবে এতদিন কর নি কেন ? দাঁও নি কেন গছিয়ে ? সাবালক করে, সাবালকের স্বাধীনতা দিয়ে এখন কেন আর তর্জনগর্জন করবে ?’

‘এক শো বার করব ।’ চুলের উপর আবার হামলা চালান গায়ত্রী : ‘কিন্তু জিজ্ঞেস করি কাকে তোর নির্বাচন ?’

‘তোমরা তাকে চেনো ।’

বুকের ভিতর যেন তীর ছুঁড়ে মারল গায়ত্রী । ‘সেই জুতোকাস্ত ভেড়াকাস্ত ছেলেটা ?’

‘না ।’

‘স্বকাস্ত না ?’

‘হ্যাঁ, স্বকাস্ত ।’

‘ঐ ওয়ার্থলেস অপদার্থ অকর্মণ্য ছেলেটা ? ফাজিল ককড় বাউতুলে লোফার—’
বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছে না গায়ত্রী ।

‘মৃগাক্ষশেখর শিবকেও সকলে ঐ কথা বলত । স্বকাস্ত একটা মৃগসবল চাকরি পেয়ে গেলেই এসব বিশেষণ বিপরীত মূর্তি ধরবে ।’

‘এখনো পায় নি তো ।’ দাঁতে দাঁত লাগলো গায়ত্রীর ; ‘শুনেছিলাম কী জেল্লাদার ছেলে—ব্রিলিয়ান্ট—কই, ফাস্ট ক্লাশ তো জুটল না—’

‘না জুটুক । সেকেন্ড ক্লাশ ফাস্ট হয়েছে । রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে । পরে ডক্টরেট পাবে । পরে নির্ঘাত প্রোফেসরি । এমন কী আমার জিজ্ঞেস করি !’

‘কিন্তু যে পাত্র নরু-ঠাকুরপো এনেছে—’

‘সে ফুটো পাত্র, মা ।’ চুলের উপর অত্যাচার অসহ হবে জেনেও কিছুতেই না বলে পারল না কাকলি ।

‘চুপ কর । কিসে আর কিসে, তাম্রায় আর সিসে । চাঁদের কাছে জোনাকি !’
চুল ছেড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গায়ত্রী । শাসনের স্বরে বললে, ‘তোকে বলে রাখছি, স্বকাস্ত-ফুকাস্ত কিছুতেই চলবে না, না, চলবে না,—চলবে না—’

‘তুমি যে প্রায় বাস্তব আওয়াজ তুললে ।’ কাকলি বললে পিছন থেকে, একটু বা রুচিব্যয়ে ; ‘আমারও একটা উলটো আওয়াজ ছিল । আমার দাবি মানতে হবে । দুটো আসলে একই জিনিসের এপিঠ ওপিঠ । যা চলবে না তাই হবে, যা হবে তাই চলবে না—’ কাকলিও উঠে পড়ল ।

ভেবেছিল মা বুঝি সটান বাবার কাছে গিয়ে পড়বেন ; না, অস্ত্র দিকে গেলেন ।

বোধ হয় এখনো নিচ্ছেন না মোটা করে। কিংবা কে জানে, হয়তো শনিবারের অপেক্ষা করছেন।

শনিবারের সকালে বেরুচ্ছে, নিচে, পথ আটকাল গায়ত্রী।

‘সাত সকালে চলেছিস কোথায়?’

‘নরুকাকার বাড়ি।’ কাকলি এক পা দাঁড়াল।

‘সেখানে কী?’

‘নরুকাকাকে বলতে আজকের ছপুয়ের ফাংশনটা যেন বাতিল করে দেয়।’ বলতে-বলতেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

‘কাকলি!’ রাস্তায় আর্তনাদ ছুঁড়ে মারল গায়ত্রী, একটা কণিকাও কাকলিকে স্পর্শ করল না।

তখন গায়ত্রী দ্রুত পায়ে চলে এল বনবিহীন ক্ষেত্রে কাছে। বললে ইতিবৃত্ত। নদীতে বান ছিল, এবার তুফান উঠল।

চুপিচুপি পায়ে পরদা সরিয়ে নরনাথের ঘরে এসে ঢুকল কাকলি। বাবার মামাতো ভাই এই নরুকাকা। সাহেবি কার্মের বড়বাবু। সবচেয়ে বড় পরিচয়, মেজাজ সাহেবি নয়, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে মেশেন সমান হয়ে, সকলের ভালো দেখেন, ভালো করে বেড়ান।

‘কি রে, ফাংশনের গন্ধে একেবারে ভোরে উঠেছিস, ‘ভোরে ছুটেছিস?’ আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল নরনাথ; দাঁড়া, সকলকে, তোর কাকিমাকে ডাকি—’

‘কাউকে ডাকতে হবে না।’ স্বর স্তিমিত করল কাকলি : ‘তোমার সঙ্গে গোপনে জরুরি কথা আছে আমার।’

‘কি রে, কী কথা?’ নরনাথও স্বর নিয়ে এল ধূসরে; ‘বোস। এই কাছের চেয়ারটায় বোস।’

‘আজকের ছপুয়ের ফাংশনটা বন্ধ করে দিতে হবে।’

‘কেন বল তো? শরীর খারাপ? নয় তো অস্ত্র কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট?’

‘না, ওসব কিছু না।’

‘তবে?’

‘ওখানে আমার বিয়ে হবে না।’ চোখ নামাল কাকলি।

‘তবে কোথায় হবে?’

‘আমার জায়গা ঠিক করা আছে।’

‘ঠিক করা আছে! ভালোবাসার জায়গা?’

‘ই্যা—’হুক-হুক ভয়ে মুহু-মুহু তাকাল কাকলি ।

‘তবে আর কথা কী ! ভালোবাসার কাছে কিসের ফাংশন কিসের স্তাংশন ! কিসের কভেনেন্টেড অফিসর ! চুক্তি নেই যুক্তি নেই, হিসেবের অঙ্ক কথা নেই । এ তো খুব ভালো কথা রে, স্বথের কথা । কজনের ভাগ্যে জোটে এই আশীর্বাদ ! ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে বৈকি, এক ফুঁয়ে বাতিল হয়ে যাবে ।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ ; ‘সকলকে ভাকি । স্বথের সংবাদটা চাউর করে দি—’

‘না, না, এখন নয় ।’ ভিতরের দরজা বন্ধ করল কাকলি ; ‘আগে বিয়েটা ষটিয়ে দাও, তারপর—’

কাকলি বাড়ি ফিরল প্রায় দুপুরের গা ঘেঁষে । সে বাড়ি এসেছে শুনতে পেয়েই বনবিহারী তুমুল হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন । ডাকো তাকে ।

নীরবে কাকলি বনবিহারীর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল ।

‘তুই কোন ছোঁড়াটাকে বিয়ে করতে চাস ?’

কাকলি চূপ করে রইল ।

‘সেই যে ইভিয়েটটা কদম ফুল দেখে নি, তাকে ?’

কাকলি কথা কইল না ।

‘কদম ফুল মানে কে ডাম ফুল—সেই নিনকোমপুপটাকে ?’

কাকলি চলে গেল আস্তে আস্তে ।

... ১৪

এতক্ষণ গর্জন গেছে, এখন বর্ষণ শুরু হল । রাগের পরে দুঃখের স্বর ধরলেন বনবিহারী ।

‘ভেবেছিলাম তোমাকে দিয়ে আমার মুখ উজ্জ্বল হবে—’

কাছেই একটা চেয়ারে চূপচাপ বসে আছে কাকলি । ভাগ্যিস চেয়ারে হাতল ছিল তাই তার উপরে রাখতে পেরেছে কহুই, আর সেই স্বত্রে করতলে রাখতে পেরেছে চিবুক । সমস্ত ভক্তিতে আনতে পেরেছে বাধাতা ও নম্রতার লাভণ্য ।

‘বড় ছেলে দেবনাথ, তোমার দাদা, অমাহুষ হয়ে গেল ।’ কতকটা বা আত্মগত হলেন বনবিহারী : ‘ছেলেবেলায় কী যে এক অস্ব্থ করল, ত্রেন নষ্ট হয়ে গেল ।

কিছুতেই কিছু করতে পারলাম না। সামান্য ম্যাট্রিকটাই পারলাম না পাশ করাতে। মাস্টারে-ডাক্তারে কম চাললাম না, সব ভয়ে ঘি হল।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু থামলেন বনবিহারী। যেমনি বসে ছিল তেমনি বিরলে-বিরলে বসে রইল কাকলি।

‘বোকা হয়েছিল তো বোকা হয়ে থাক। মাথাথারাপ তো থাক ঘরের কোণে বন্দী হয়ে। কিন্তু তুই বদ হতে যাস কোন স্বেচ্ছা?’ আবার হতাশার স্রব ধরলেন বনবিহারী; ‘মিশল গিয়ে কিনা গুণ্ডার দলে। কত কিছু ধরবে-করবে বলে কত-কত টাকা নিয়েছে আগে-আগে—পরে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমার নাম করে নিয়েছে ধার, আমার দুর্নাম করে ভিক্ষে—শেষে, শেষকালে শুরু করল বান্ধ ভাঙতে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হল, দেবনাথ যদিও আমার ছেলে, ওকে যেন কেউ ধার না দেয়, ভিক্ষে না দেয়, এমন-কি বাড়িতে ঢুকতে না দেয়—’ আবার থামলেন, সশব্দে নিশ্বাস ফেললেন বনবিহারী। বললেন, ‘যখন বিজ্ঞাপনটা দেখলাম কাগজে, মনে হল কালো কালির কাগজে ঐ বিজ্ঞাপনটাই শুধু লাল কালিতে ছাপা হয়েছে। লজ্জার লাল কালি।’

‘দাদার সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে।’ মুখ তুলল কাকলি।

‘আগাগোড়াই ভুল। শুধু দেবনাথের সম্পর্কে নয়, তোমার সম্পর্কেও।’

‘দাদার কথা উঠেছে, দাদার কথাই হোক। কী হয়েছে ওর বেলায়?’ বনবিহারীর মুখের দিকে ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি : ‘তুমি বারে-বারে তাকে সদর দরজা দিয়ে বার করে দিয়েছ আর মা তাকে বারে-বারে খিড়িকির দরজা দিয়ে ঢুকিয়েছে। তুমি ওকে জেলে পাঠাতে চেয়েছ আর মা ওর হয়ে দিয়ে দিয়েছে জরিমানা।’

‘তেমনিধারা তোমাকে যখন এ বাড়ির বার করে দেব তখন,’ চোখ বুজলেন বনবিহারী : ‘কে জানে, তোমার মা-ই হয়তো আবার তোমাকে টেনে নেবেন কোলের মধ্যে।’

‘ককখনো না।’ পাশের বারান্দায় কাকে চিঠি লিখছিল গায়ত্রী, চোখ আর হাত কাগজে কিন্তু মন আর কান ঘরের মধ্যে, সহসা ঝংকার করে উঠল : ‘ককখনো না, যদি স্বকান্তকে ও বিয়ে করে। তখন একবার যে ও যাবে চিরদিনের মত যাবে।’

কথাটা গায়ে মাখল না কাকলি। আগের থেই ধরে বললে, ‘দাদার সম্পর্কে আমাদের কোনো স্নহ চিন্তা ছিল না। একটা সং সন্নেহ পরিবেশে ওকে কিছু একটা আমরা গড়ে তোলবার স্বযোগ দিই নি। কেবল এক দিকে তাড়ন আর পীড়ন, আরেক

দিকে প্রসন্ন আর ক্ষমা। অমাহুকের অ-টা আর ঘোচাতে পারল না। আমরাই দিলাম না ঘোচাতে।’

‘তাই তো তোমার উপরে নির্ভর। দেবনাথের পরেই তুমি, তুমিই বাড়ির দ্বিতীয়। তোমাকে তাই উচ্চ শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি বড় হবে, সংসারকে শ্রীমন্ত করবে। ফেরাবে দেবনাথকে। তোমার ছোট ভাইবোনগুলির কাছে আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকবে। আমি জাঁক করে বেড়াব। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থাকব না। ছাদের উপর দাঁড়িয়ে তাকাব চারদিকে।’

কষ্টে হাসল কাকলি। চোখ নামিয়ে বললে, ‘আমি মেয়ে। আমার কী সাধা!’

‘তোমার সাধ্য নয়? মেয়ে—মেয়েরা আজকাল কী না করছে! সমুদ্রে পেরোচ্ছে, পাহাড় ডিঙাচ্ছে, মরুভূমি পার হয়ে যাচ্ছে পায়ে হেঁটে—’ বনবিহারী পিঠ খাড়া করলেন।

‘সবাই-ই কি সব কিছু করতে পারে? হতে পারে? সকলে কি হতে পারে কীসির রানী? মীরাবাঈ?’

‘তোমার জীবনে কোনো উচ্চাশা ছিল না?’

‘উচ্চাশা!’ কষ্টে আবার হাসল কাকলি: ‘তোমাদেরই বা কী ছিল আমাকে দিয়ে! মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য এম-এ পাশ মেয়ে—কী তার ক্ষমতা! বড় জোর একটা টিচারি নয়তো মুকুন্দির জোর থাকলে কোনো আফিসে ক্লার্ক, বা শুদ্ধ করে বলতে গেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট। একটা সাধারণ মেয়ের পক্ষে এর বেশি আর কি। এর বেশি ভাবতে গেলেই উপভাস, আকাশকুসুম।’ একটু সাহস নেবার জন্তে বাইরের গাছ, আকাশ, বাড়িঘর, লোকজনের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, ‘তা ছাড়া মেয়েরা রয়েছে পরের ঘরে চলে যাবার জন্তে, তাদের ভায়ের ঘরকে শ্রীমন্ত করবার জন্তে নয়।’

‘তাই, সেই পরের ঘরেই তোকে আমি পাঠাতুম নিজের হাতে।’ বনবিহারী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: ‘তুই সাধারণ হয়েই থাকতিস। সব দেশ ঘুরে তোর জন্তে আমি অসাধারণ বর নিয়ে আসতুম। রাজরাজেশ্বর বর। সবাই চোখ উচু করে তাকাত। আমার ছাদ ভরে প্যাণ্ডেল উঠত। আলোয় আলোময় হয়ে যেত বাড়িঘর, নবত বসত, থেকে-থেকে সানাই বাজত দিন-রাত। পাড়ার লোকেরা জিজ্ঞেস করত, কী হচ্ছে এ বাড়িতে? রিটার্ড ডিগ্রিট ম্যাজিস্ট্রেটের এম-এ পাশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বর কে? সে কোন এক কৃতকৃত্য—দেখবি চল। চারদিকে পড়ে যাবে ঠেলাঠেলি। দেখতে যেমন স্পৃহ, তেমন স্বাস্থ্য-শীলে বিস্তে-বিভার অগ্রগণ্য। যেসব আত্মীয় দেবনাথের বেলায় স্থণায় নাক কুঁচকে ছিল এবার তারা হিংসেয় নাক ফোলাবে। তুই

তোমার বাপকে তো উপভোগ করতে দিবি নে ? এবারও তারা নাক সন্ধ করে চলে যাবে ? ছেলে মানুষ হয়েছে, মেয়েকে সংপাঞ্জস্থ করেছি এইটুকু ছাড়া আর আমাদের কী মান আছে ? আমার এই মধ্যবিস্ত মানটুকু তুই রাখবি নে ? আমার মুখ উজ্জল করবি নে ?’

কতক্ষণ কথা কইতে পারল না কাকলি । তার হু চোখ ছলছল করে উঠল । শান্ত সিন্ত স্বরে বললে, ‘আমার মুখ উজ্জল হলেই কি তোমার মুখ উজ্জল হবে না বাবা ?’ বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল, বারান্দা এড়িয়ে চলল আরেক দিকে ।

‘শোন—’ হাঁকার ছাড়লেন বনবিহারী : ‘শুনে যা—’

অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কাকলি ।

‘শোন । তবু যদি তুই ঐ অপদার্থ টাকে বিয়ে করিস তবে জানবি আমাদের সঙ্গে তোমার আর সম্পর্ক থাকবে না, আর, কোনো দিন পথ ভুলেও আসবি না এ বাড়িতে । কি, মনে থাকবে ?’

কাকলিকে দেখা গেল না । শোনা গেল না হাঁ-না কোনো শব্দ ।

‘ঠাকুরপোকে ডাকো ।’ ঘরের মধ্যে চলে এল গায়ত্রী ।

কলিং বেল আর কোথায়, ইজিচেয়ারের হাতলে হাতের চড় মারলেন বনবিহারী । সংক্ষেপে ব্যোরা বলে আর ডাকতে পারেন না এ যন্ত্রণা চোখে মুখে ফুটে উঠল, সঙ্গে চাকরের নামটা মনে না আনতে পারার যন্ত্রণা । বললেন, ‘কি, কী না জানি নাম তোমার চাকরের ।’

‘ওকে নয়, বিজনকে পাঠাচ্ছি ।’

তড়িঘড়ি চলে এল নরনাথ । ব্যাপার কী ?

‘আমার একতলাটার জন্তে ভাড়াটে দেখ ।’ মুখের উপর প্রায় ছুঁড়ে মারলেন বনবিহারী ।

‘সে কি ?’ নরনাথ থমকে দাঁড়াল ।

‘হ্যাঁ, একতলাটা ভাড়া দেব । আরো একজন সরেছে । এত জায়গা দিয়ে আমাদের কী হবে ? উপরে যা আছে তাতেই কুলিয়ে যাব আমরা ।’

‘নিচোটা ভাড়া দেবেন বলে তো এ বাড়ি তৈরি হয় নি—’ কী-একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ল নরনাথ, এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ।

‘তখন হয় নি, এখন হবে । একজন কনট্রাক্টার ডাকো । তার আগেই ভাড়াটে দরকার । ভাড়াটে এসে গেলেই এ বাড়িতে হান্ধাম-ছল্লত হতে পারবে না । তারা নির্ঘাত ঠেকাবে । বলবে, নতুন ঢুকেছি, ছাড়তে পারব না ঘর ।’

‘কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।’ নরনাথ মুখ-চোখ হতাশ করল : ‘কে? সরল? কেনই বা ছাফায়া-হুজুতের ভয়?’

‘কাকলির কথা শুনেছ?’

‘শুনেছি। বিয়ে করতে চায়। সে তো খুব ভালো কথা।’ হুস্থ হয়ে এতক্ষণে বলল নরনাথ।

‘ভালো কথা! কাকে চায় তা শুনেছ?’

‘শুনিছি।’

‘ও কি একটা পাত্র?’

হাসল নরনাথ। বললে, ‘এ সম্বন্ধে আমাদের মতামত ইরব্রেলেন্ট, অবাস্তব। হয়তো বা আমাদের একতিয়ার, জুরিসডিকশানই নেই।’

‘নেই? না, আছে।’ ইজিচেয়ারের হাতলটা মুঠি করে ধরলেন বনবিহারী : ‘পায়ের জোরের কাছে আবার আইন কী! তুমি যে করে পারো এ বিয়ে ঠেকাও। কিছুতেই হতে দিও না।’

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল নরনাথ। পরে বললে, ‘কেন, হতে দেব না কেন? হতে দিলে দোষ কী। কোথায় বাধছে? কোথাও না। না ধর্মে, না সমাজে, না কোনো আচারে-বিচারে।’

‘সেস্টিমেন্টে।’ মুঠো করা ডান হাতটা কাঁপতে লাগল বনবিহারীর।

‘আইনের কাছে সেস্টিমেন্টের দাম কী!’ পায়ের উপর পা তুলে ভঙ্গিটা শিথিল করল নরনাথ : ‘আপনি মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, সাবালক হবার সুযোগ দিয়েছেন, আর আইন তাকে তার গণ্ডির মধ্যে যাকে খুশি বিয়ে করার অধিকার দিয়েছে। যা বেআইনী নয় তাকে আপনি বাধা দেবেন কী করে? আর বাধা দেওয়ার মধ্যে নীতিই বা কোথায়? ওরা ইচ্ছে করলে আইনমত রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে এসে বলতে পারত, অনুপায়, এক নিশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করে এসেছি, তখন কী করতে পারতেন? আর এখনও যত বাধাই দিই ওদের রেজেষ্ট্রি আটকাতে পারি এমন আমাদের কেস নেই। হুতরাং যার বোঝা সে বুঝবে। যার নির্বাচন সে জানবে কেমন মজী এনে বসিয়েছে গদিতে। আমাদের কথা এখানে বিকোবে না। পাঠার কথায় ঝোল রান্না হয় না কোনো দিন।’

‘কিন্তু পাত্র—লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, পাত্র কে, বলতে পারবে, একটা কে ড্যাম ফুল, সমবয়সী এক কলেজের ছাত্র, বেকার—ছি, ছি, ছি।’

‘বা, পাত্র এমন খাস্ত কী! নিদেন একটা লেকচারার তো হবেই—’

‘তা হওয়ার পর করলেই হত। এত হস্তদস্ত হবার কী হয়েছিল?’

এখানে নরনাথের একটা ব্রেন-ওয়েভ—মস্তিষ্ক-তরঙ্গ—এল। সব সংক্ষেপ করে দেওয়া দরকার। অনিবার্হ করে দেওয়া দরকার। এত কলহ-কোলাহলের দরকার কী! বিয়েই তো করতে চাইছে—আর কিছু তো নয়। সবচেয়ে যা সভ্য, সবচেয়ে যা শাস্ত্রীয়। আর বিয়েই তো সব রাখে, সব চাকে, সব সংশোধন করে; তবে আর কী ভাবনা!

‘হ্যাঁ, এই তাড়াতাড়িটাই জানি কি রকম!’ গাল চুলকোল নরনাথ : ‘মনে হচ্ছে কোথায় ডিফিকালটি আছে—’

‘ডিফিকালটি আছে!’ ইঙ্গিতটা যেন আনায়াসেই বুঝতে পারলেন বনবিহারী। খাড়া পিঠ এলিয়ে দিলেন ইজিচেয়ারে। শাদা শূণ্ণ দৃষ্টি মেলে বললেন, ‘তাই!’

‘হ্যাঁ, আর গতাস্তর নেই।’ তোলা পা মেঝের উপর নামিয়ে আনল নরনাথ : ‘তা, পাঠা যখন রান্নাই হচ্ছে তখন তাকে ঘাড়ের দিকেই কাটুক বা লেজের দিকেই কাটুক কিছু এসে যায় না।’ কৌচায় ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল নরনাথ : ‘এখন শুভস্তু—’

‘শুভস্তু?’

‘যদি বলতে চান, অন্তঃ, তবে অন্তঃশস্ত্র।’ নরনাথ হাসল : ‘কিন্তু শীঘ্রই সর্বাবস্থায়। তাই অন্তঃশস্ত্র শীঘ্রই।’

‘তুমি যা করে পারো, নমো-নমো করে উদ্ধার করে দাও।’ এক পাশে দেয়ালের দিকে ঘাড় কাত করলেন বনবিহারী : ‘বিয়ে যদি হয়, আর এখন না হয়ে উপায় কি, তোমার ওখানেই বন্দোবস্ত করে। টিমটিম করে, নেহাত যেটুকু না হলে নয়, ততটুকুতে দায় সারো। যা লাগে আমি দিয়ে দেব।’

‘তার জন্তে ভাববেন না। কিন্তু আপনার প্রথম মেয়ে, আপনার প্রথম কাজ—আপনার নিজের বাড়িতে হলেই তো ভালো ছিল। লোকে ভিতরের কথা আর কী জানবে, তারা দেখবে আপনাকে—’

‘না, আমার বাড়িতে নয়, আমার সামনেতে নয়। আমার সামনেতে হলে আমার প্রেসার বাড়বে, আমি টলে পড়ে যাব মাটিতে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে ভাড়াটে বলবে, ছাদ এজমালি হবে, তারা বরদাস্ত করবে না এসব হট্টগোল। না, আমিও করব না।’ নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় থরথর করতে লাগলেন বনবিহারী : ‘এ বিয়ে, এমন বিয়ে আমি মানি না। কাকলিকে বলে দিয়েছি এ বাড়িতে তার স্থান নেই। তুমিও আরেকবার তাকে মনে করিয়ে দিও।’ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় ভেঙে পড়ে চেয়ারে ছড়িয়ে পড়লেন বনবিহারী।

‘বউদিকে ডেকে দিচ্ছি, আপনি বসুন।’ জরত পায়ে বেরিয়ে গেল নরনাথ, আর কাকলির ছোট বোন পত্রালির কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে গুদিককার ছোট ঘরে ধরলে কাকলিকে।

‘এ কি, বেরুচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করল নরনাথ।

‘হ্যাঁ, এই একটু—’ জান্না রেখায় হাসল কাকলি।

‘বুঝেছি—’ জান্নার মত দুই চোখে জ্যোতি আনল নরনাথ। বললে, ‘এদিকে অনেকটা বাগিয়েছি।’

‘সত্যি?’ এ যেন প্রায় আশাতীতকে শুনেছে কাকলি।

‘হ্যাঁ, বিয়েটা আমার বাড়িতেই হবে আর কিছু খরচও উনি দেবেন।’

‘তা হলে আলো জ্বলবে, সানাই বাজবে?’ ঝক পড়া ছোট্ট খুকির মত ঝলমল করে উঠল কাকলি : ‘সেজেগুজে আসবে সব লোকজন?’

‘দেখি কতদূর কী করতে পারি।’ যেন অনেক দূরই করতে পারে এমনি ভাব করল নরনাথ।

‘এখন তোমাকে আরেক কাজ করতে হয়।’ কাকলি দরজার কাছে এগিয়ে আসতে-আসতে বললে, ‘ও পক্ষে গিয়ে যথাবিধি কথাটা পাড়তে হয়। মানে কথাটা ক্লাজ করতে হয়।’

‘হ্যাঁ, আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি।’ নরনাথ তার ভুরুতে কুঞ্নের খেলা খেলল। বললে, ‘আর, সব সংক্ষেপ করে দিয়ে আসছি। এমন এক পাঁচ কষব যে গাছাধনরা ট্যাফো করতে পারবেন না, হুড়হুড় করে বিয়ের আসরে এসে হাজির হবেন।’

কিছুই বুঝল না কাকলি, তবু সরল প্রাণে হাসল। বাধাবিপদ সব বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। পথঘাট সুগম, এই যেন তার শীতের দিনে আরামের বোধ।

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল বনবিহারীর কাছে। স্নানের তোড়জোড় করতে হয় এখন।

বনবিহারী বললেন, ‘নরু কাকলি সম্বন্ধে কী একটা ইঙ্গিত করে গেল—’

সর্বশরীরে শিউরে উঠল গায়ত্রী : ‘কী ইঙ্গিত?’

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করলেন বনবিহারী।

‘ছি ছি ছি’, শতকণ্ঠে না-না-না করে উঠল গায়ত্রী : ‘ও কী কথা! আমি মা, আমার লক্ষ্য নেই?’

‘আমিও তাই ভাবছিলাম।’ বনবিহারী আশ্বস্ত হলেন : ‘কাকলি কি এত বোকা এত হালকা এত লক্ষ্মীছাড়া হতে পারে? তবে নরু গুরুত্ব করে বললে কেন?’

‘ও বললেই তো হবে না।’ বিরক্ত-আরক্ত মুখ গায়ত্রীর : ‘যে বেশি কথা বলে সে অমনি বানিয়ে-বাড়িয়েই বলে। ও ভেবেছে অমনি করে বললেই হয়তো তোমাকে সহজেই রাজি করাতে পারবে। কিন্তু ও জানে না আমি আছি।’

‘তুমি আছ।’ মাথার চুলে গায়ত্রীর তৈলাক্ত হাতটা নড়াচাড়া করছিল, সেটা সবল স্নেহে আঁকড়ে ধরলেন বনবিহারী। চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, ‘তুমি কার দলে?’

‘তোমার।’ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চুলে আবার বিলি কাটতে লাগল গায়ত্রী। বললে, ‘কাকলি ভেবেছে ওর জেদই জয়ী হবে। কিন্তু ও জানে না ওর ঐ জেদ উত্তরাধিকার-সূত্রে আমার কাছ থেকেই পাওয়া।’

বনবিহারী বললেন, ‘কিন্তু তুমি বলতে পারো ও ঐ দুঃস্থ ছন্নছাড়া ছেলেটাকে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্ত খেপেছে কেন?’

‘স্পৃহা। শ্রেফ অহংকার। ও বলতে চায় প্রেমের মূল্য সম্পদে নয় কৃতিত্বে নয়, প্রেমের মূল্য প্রেমে। আর যে দুঃস্থ তাকে যদি ভালোবাসাই যায়, তবে তার সঙ্গে ঘর করতে দুঃখ নেই। যদি অবস্থা সচ্ছল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, তবে সেটা সচ্ছলতাকেই ভালোবাসা হল, ব্যক্তিটাকে নয়।’

‘চাইলিস!’

‘ও বলে, যদি ধরো, অপেক্ষা করা সত্ত্বেও লোকটার অবস্থা ফিরল না, তা হলে কি আমি ফিরে যাব, আমার ভালোবাসাও ফিরে যাবে? গরিব কত কিছু থেকেই তো বঞ্চিত, শেষ পর্যন্ত ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হবে? গরিব বলে অকৃতী বলে কেউ তার সঙ্গে ঘর করবে না?’

দুঃস্থ অপরিচিতের জন্তে তার এত দয়া, দুঃস্থ বাপের প্রতি তার দয়া হবে না? মেয়ের জন্তে মন আবার হঠাৎ নরম হয়ে গেল বনবিহারীর। তিনি গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন কাকলিকে।

পত্রালি এসে বললে, ‘দিদি বাড়ি নেই।’

‘বেরিয়ে গেছে?’ স্ত্রীর দিকে নালিশের চোখে তাকালেন বনবিহারী : ‘যখন তখন বেরিয়ে গেলেই হল? এটা বেকবাব সময়? কাউকে বলে যাবে না?’

‘তুমিই তো বলেছ এ বাড়িতে তার স্থান হবে না।’ বললে গায়ত্রী।

‘সে তো ঐখানে বিয়ে হলে। তা বিয়ে তো এখনো হয় নি। যখন সতি কোনো ডিফিকালটি নেই, বাধ্যবাধকতা নেই, তখন বিয়ে তো শেষ পর্যন্ত না-হতে পারে।’ পত্রালির উপর মুখিয়ে উঠলেন বনবিহারী : ‘কোথায় গেছে এ অসময়?’

‘তা আমি কী জানি।’ পালিয়ে গেল পদ্মালি।

গেছে আর কোথায়। গেছে মার্কেটে, গোল চত্বরে।

একটা ওজন নেবার যন্ত্রের উপর দাঁড়িয়ে স্বকান্ত। হাসতে-হাসতে পাশ থেকে কাকলি এসে হাজির। বললে, ‘হঠাৎ ওজন নেবার দরকার হল কেন?’

‘দেখি বাড়ল কিনা।’

‘বাড়বে? তুমি তাই আশা করো?’ কাকলি অবাক হয়ে বললে।

‘ফাঁসিকাঠে লটকাবার আগে কারু কারু নাকি বেড়েছিল শুনেছি।’ ফোকরে মানি দিল স্বকান্ত।

‘ফাঁসিকাঠ!’ চোখ কপালস্থ করল কাকলি।

‘তা ছাড়া আবার কি। বিয়ে করে সংসারে ঢোকা মানেই ফাঁসিকাঠে লটকানো।’ কার্ডটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুলোল স্বকান্ত। বললে, ‘হ্যাঁ, যা, বলেছি, ঠিক বেড়েছে। গড়তেই হবে। এবার তুমি ওঠো।’

কুণ্ঠিত হয়ে সরে গেল কাকলি। বললে, ‘আমার দরকার নেই।’

‘দরকার আবার কার আছে!’ নেমে এল স্বকান্ত।

‘সেই একবার একপক্ষের দরকার হয়েছিল।’ হাসিমুখে বলতে লাগল কাকলি দেও এই বিয়ের ব্যাপারেই। মেয়ে দেখতে রোগা, বলছিল বরপক্ষ। রোগা বলছেন কেন, বলুন কুশ, এ সাফাই কতাপক্ষের। বেশ, ওজন করাবেন চলুন। চলুন, ঠিক স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েটের মেয়ে আমাদের। মেয়েকে নিয়ে আসা হল মার্কেটে, এইখানে। গাড়ির মধ্যে গুল্লের টিল নিয়ে মেয়ে দাঁড়াল ওজন নিতে। একেবারে স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়েট, কাঁটায়-কাঁটায়।’

‘পুরোনো গুল্ল। কিন্তু তোমার ভয় কী! তোমাকে টিল নিতেও হবে না টিল দিতেও হবে না। যেমনটি আছে তেমনি—’

‘তোমার ওজনেই আমার ওজন। তোমার ঐ কার্ডে আমাদের দু-জনের ওজনই একত্র যোগ করে লেখা হয়েছে।’ কাকলি চলতে শুরু করল: ‘এসব কথা থাক। কাজের কথা—’

‘হ্যাঁ, কাজের কথা। তারই জন্তে তো ডেকেছি তোমাকে। কই, তোমাদের বাড়ি থেকে সরকারি প্রস্তাব এস কই?’ স্বকান্তও পা মেলাল।

‘নরুকা কা আজকালের মধ্যেই যাবেন।’

‘নরুকা কা?’

‘হ্যাঁ, বাবা খজ্ঞাহস্তের চেয়েও বেশি, পিস্তলহস্ত। নরুকা কা বাড়িতেই হবে।’

‘কী হবে?’

‘আহা, যেন বলতে পারি না! বিয়ে হবে।’

‘শুধু ঐটুকু?’

‘না। মুখচন্দ্রিকা। মালাবদল। সম্প্রদান। মন্ত্র। যন্ত্র। সপ্তপদী। অগ্নি-
সাক্ষী—শিলাসাক্ষী। শঙ্খবনি, হলুরব। আমি কি সব জানি?’ হেসে ফেলল কাকলি।

‘জানো না? আমি সব জানি।’

‘কী জানো?’

‘তুমি ভয়ানক সেকেলে। আর তারই জন্তে যত গোলমাল।’

‘শোনো, সবচেয়ে গোলমালের যে ভয় করছি তা হচ্ছে প্রস্তাবের পর তোমাদের
বাড়ি কোনো দাবি করে না বসে।’

‘তা করতেই তো পারে।’ স্বকাস্ত বললে নিশ্চিন্ত স্বরে, ‘নগদ টাকা না হোক,
ফার্নিচার, বাসনকোসন, রেডিও, সেলায়ের কল, সাইকেল—’

‘থামো।’

‘অন্তত সোনার বোতাম না হোক, একটা ঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন তো দেবে
আমাকে।’

‘কাঁচকলা দেবে।’

‘কিন্তু মার নমস্কারী শাড়ি খান তিরিশ—এ ঠেকানো অসম্ভব।’ মুখ গম্ভীর
করল স্বকাস্ত।

‘এ তুমি, মার ছেলে, তুমিই ম্যানেজ করো।’

‘দেখি কদর কী পারি। তুমি তোমার নরকাকাকে শুধু নেমস্তন্নপত্রটা ছাপতে
বোলো। তারপর একটা শুধু শামিয়ানা খাটানো আর একটু রোশনাই। কি গো,
সানাই একটু বাজবে, করতব করবে?’

‘করবে। কিন্তু তার আগে তোমার কেরামতিটাও দেখিও। তোমাদের
দিকের সব শাস্ত স্তম্ভ সংযত রাখার কেরামতি।’ করুণ চোখে তাকাল
কাকলি।

কিন্তু আসল কেরামতি নরনাথের। মূলকথা বলার পর যখন অবাস্তব কথা প্রায়
ওঠে-ওঠে, তখন নরনাথ ভূপেনবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললে, ‘এ বিয়ে না হতে
দিয়ো আর উপায় নেই।’

ভূপেন হাঁ হয়ে রইল।

‘হ্যাঁ, ডিক্‌কালটি হয়েছে। এখন দেয়ার ইজ নো গেটিং এণ্ডয়ে। একটা কুমারী

মেয়ের মান। আর আপনার ছেলে,’ নরনাথ সাহস করে চাইল স্বকাস্তের দিকে :
‘পারফেক্ট জেস্টলম্যান—খাঁটি ভদ্রছেলে। হি হাজ অউনড ইট আপ।’

কেউ একটা শব্দ করতে পারল না। হাসবে না কাঁদবে বুঝতে না পেয়ে স্বকাস্ত
মাথা হেঁট করে চলে গেল ঘর থেকে।

‘তবেই বুঝতে পারছেন, যেমন তেমন করে নমো নমো করে এ বিয়ে এক্ষুনি সেরে
ফেলা দরকার।’ উঠে দাঁড়াল নরনাথ : ‘এ বিয়েতে দাবি-দাওয়াই কি, লোক-
লৌকিকতাই বা কি।’

‘নিশ্চয়, নিশ্চয়, কোনো রকমে মান রাখা, প্রাণ রাখা।’ যথারীতি আবার
লেখালেখির মধ্যে ডুবে গেল ভূপেন : ‘তাড়াতাড়ি দিন ঠিক করে শুভকাজটা সম্পন্ন
করান।’

‘আমরা আছি।’ হেমন বললে।

এবার নরনাথকে গায়ত্রী ডেকে পাঠাল।

তুমি আমার মেয়ের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাচ্ছ কেন? কোথায় রাগবে, কেঁদে
ফেলল গায়ত্রী।

হু হাত জোড় করে নমস্কার করল নরনাথ। বললে, ‘এ কলঙ্ক নয় বউদি, এ
কৌশল। এ কৌশলের উদ্দেশ্য বিয়েটাকে অনিবার্য করা, নির্বিল্ল করা, নিরুপদ্রব
করা। এ কৌশলে কাকলির লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। যে কৌশলে ঈপ্সিত ধন
পাওয়া যায় তাকে কি কলঙ্ক বলে? তাকে অলংকার বলে।’

১৫.

‘কাগজ-কলম নিয়ে এসো।’ বনবিহারী গম্ভীর গলায় হুকুম করলেন কাকলিকে
কাকলি থমকে গেল। কিছু লিখে দিতে হবে নিশ্চয়ই। কী না জানি লিখে দিতে
| হবে। কোনো দাসখত? ইস্তফানামা? কোনো সম্মতিপত্র?

কী না জানি কী। ভয়ে বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেল কাকলির।

যদি লিখে দিতে হয় এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল, লিখে
দেবে স্বচ্ছন্দে। মনে মনে হাসল কাকলি। যা স্বয়ংসিদ্ধ তাকে শুধু কলমের আঁচড়ে
নাকচ করা যায়? কলমের কালিতে কালো করা যায় গায়ের রক্ত, বংশের রক্ত?

যাই না, কাগজ-কলম নিয়ে বসি না গিয়ে। দেখি না কী লেখান। তেমন কিছু হয়, লিখব না। সব ছুঁড়ে ফেলে সোজা ছুট দেব। ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যেতে পারো, কিন্তু তাকে জল খাওয়াতে পারো না।

কলমে কালি ভরে নিল। একটা একসারসাইজ খাতার পেটের কাগজটা ছিঁড়ে নিল একটানে। ধীর পায়ে কাছে এসে বসল মেঝের উপর।

ঝিমুচ্ছেন বনবিহারী। তাঁর দিকে চেয়ে কাকলির মন মায়ায় ভরে গেল ভালো ঘুমুতে পাচ্ছেন না, মুখের কচি চলে গিয়ে হজমে গোলমাল শুরু হয়েছে, গায়ে হাত দিলেই বোধ হয় জ্বর-জ্বর বলে মনে হবে। যেন শেষ ট্রেন মিস করে শূচ প্লাটফর্মে একা এক যাত্রী নৈরাশ্রকে শিয়র করে শুয়ে আছে ক্লান্তির ধূলিতে।

রিটায়ার করে, ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্তে, আর কোথাও চুকতে পেলেন না। কত লোক গাছের শাখা থেকে নেমে গেলেও কেমন ঝুরি ধরে এখনো ঝুলছে—বাবা সামান্য একটা এক্সটেনশানও পেলেন না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই বাড়িখানা শুধু তুলেছেন, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের বাড়ি এর চেয়েও বড় ছিল। দাদার তো ঐ অবস্থা, আর আমি তো পথে ভেসেছি। ছোট ভাইবোনগুলি কত দিনে কী হবে, কেমন চেহারা নেবে, কে জানে। না, বাবা যা বলেন, তাই করব। যা চান, তাই লিখে দেব স্বচ্ছন্দে। যদি তাঁর একটু শাস্তি হয়।

‘কিছু লিখতে হবে?’ উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল কাকলি।

‘হ্যাঁ। এনেছ কাগজ-কলম?’ বনবিহারী ইজিচেয়ারে নড়ে-চড়ে উঠলেন : ‘হ্যাঁ, লেখো।’ ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলেন জামার পকেট : ‘এই যে, পেয়েছি।’ একটা কাগজের টুকরো বের করে তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণ চোখে : ‘হ্যাঁ, এই—এই নম্বরগুলো—’

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল কাকলি।

‘কই, লিখছ না যে?’ ধমক দিয়ে উঠলেন বনবিহারী : ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, একের পর এক দশটা নম্বর, দশ নম্বরের দশখানা। তারিখ আলাদা। আফিসও বোধ হয় সমান নয়। কী, লিখছ?’ হাত গুটিয়ে বসে আছ কী করতে?’

‘বিষয়টা কী, তা তো বলবে।’ কাকলি তাকাল করুণ চোখে।

‘লেখো, আই ডু হিয়ারবাই ডিক্লেয়ার—’

এটুকুন লিখতে আপত্তি কি, কাকলি লিখল। কিন্তু সত্যি সত্যি ঘোষণাটা কী তা ঠিক-ঠিক না জানা পর্যন্ত আর কলম চালানো অসুচিত। অসম্ভব।

‘কী লিখলি?’ আবার দাবড়ি মারলেন বনবিহারী।

‘লিখেছি। কিন্তু লেখবার আগে ব্যাপারটা মোটামুটি আমাকে একটু বুঝতে দেবে না?’ দু’চোখে বিষন্ন কুণ্ঠা নিয়ে তাকাল কাকলি।

‘এর আর বোঝাবুঝি কী!’ বনবিহারী উঠি-উঠি করেও শুয়েই থাকলেন চেয়ারে: ‘তোমার জন্তে, তোমার বিয়ের বাবদ, দশ হাজার টাকার সেভিংস সার্টিফিকেট কিনেছিলাম। সেই টাকাটা তুমি আবার আমাকে লিখে দেবে। বলবে, ঐ ঐ নম্বর সার্টিফিকেটে তোমার কোনো অধিকার নেই; যেহেতু ওগুলো আমার টাকায় কেনা হয়েছিল, সেহেতু ওগুলো আমার।’

‘এই কথা? তা আমি এখন লিখে দিচ্ছি।’ কাকলি লেখার উপরে উপুড় হয়ে পড়ল। বললে, ‘বলো, কিরকম হবে বয়ানটা—’

বনবিহারীর মুখে কথা নেই। নিচের চোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছেন নাকি? সোজা হয়ে উঠে বসল কাকলি। বললে, ‘শুধু একটা ডিক্লেরেশন করলেই হবে, না, একটা ক্লিয়ার এসাইনমেন্ট দরকার? ঠিক কী ফর্মটা হওয়া উচিত, আমি বলি দি, নরুকাকাকে পাঠিয়ে জেনে নেওয়া ভালো।’

বনবিহারী তবু নিঃশব্দ।

‘লেখালেখিতেই বা কাজ কি।’ কাকলি মুক্তকণ্ঠে বললে, ‘সোজাহুজি সার্টিফিকেটগুলো কাশ করে টাকাটা তোমার অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে দিলেই তো চুক যায়—’

‘কাশ করব মানে?’ চমকে উঠলেন বনবিহারী: ‘কে কাশ করবে? কাশ করবে তো তুমি—তোমার নামে যখন সার্টিফিকেট। তার মানে, সার্টিফিকেটগুলো ভাঙিয়ে টাকাটা দ্বিবি হাতিয়ে তুমি ভেগে পড়ো, চম্পট দাও, তাই না?’

কাকলির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ধরিদ্রী ছি-ছি করে উঠল।

‘চলবে না ওসব মতলব।’ বনবিহারী বসলেন খাড়া হয়ে: ‘যা বলছি তাই লেখো। আইনের চোখে কী দাঁড়ায় না দাঁড়ায় তার জন্তে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি শুধু আমাকে একটা স্বস্তের দলিল লিখে দাও—একটা মুক্তিপত্র। লিখে দাও, ঐ টাকা তুমি ছোঁবে না, ঐ টাকায় তোমার স্বত্ত্ব নেই, দাবি নেই এক তত্ত্ব।’

যা বললেন, মনের বিস্তীর্ণ আনন্দে তাই লিখে দিল কাকলি।

নরনাথ এলে বললে, ‘যাই বলুন, এ আপনার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে।’

‘বাড়াবাড়ি?’ চেয়ারের হাতল চেপে ধরলেন বনবিহারী: ‘কোন আইনে? খুব তো তুমি আইন দেখাও, এবার বলো কোন অ্যাক্ট, কোন সেকশন, কোন প্রোভাইসো?’

শীর্ণ রেখায় হাসল নরনাথ। বললে, ‘যা একবার দিয়েছেন, তা আবার কেবত নেবেন কেন?’

‘এবার আইন ছেড়ে যে ধর্মকথা ধরলে। দিয়েছি মানে?’ বনবিহারী ভক্তি আরো উদ্ধত করলেন : ‘সার্টিফিকেটগুলো সমস্ত আমার কার্টডিতে। এ দান হল? এ শুধু একটা বেনামী কাণ্ড। এর বেশি নয় কিছুতেই। আইনমত টাকা যখন আমার, তখন আমার খুশিমত ব্যয় করবার অধিকারও আমার।’

‘কিন্তু এত কী অপরাধ কাকলির?’

‘অপরাধ নয়? এক শো বার অপরাধ। ও ডিসিপ্লিন ভেঙেছে।’

‘সব জিনিসেরই সীমা আছে। তেমনি, যাকে ডিসিপ্লিন বলছেন, হয়তো তারও।’

‘না, নেই।’ হুঙ্কার ছাড়লেন বনবিহারী : ‘আমার ঈদওয়া টাকা শেষ পর্যন্ত ঐ লোকটার হাতে গিয়ে পড়বে, তা দিয়ে ওর সংসারের হুসার হবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।’

‘তবেই দেখুন কেমন ভালো বর বেছেছে কাকলি।’ শব্দ করে হেসে উঠল নরনাথ : ‘কেমন আপনার দশ হাজার টাকা বাঁচিয়ে দিল অনায়াসে।’

‘আমার কি টাকা খরচ করতে অসাধ, নরনাথ?’ বনবিহারী চেয়ারে ভেঙে পড়লেন। বললেন, ‘আমার কত দিনের স্বপ্ন, একটি অখণ্ড মুক্তোর মালার মত করে মাকে সাজাই। কিন্তু, দু হাতে চোখ ঢাকলেন বনবিহারী : ‘কিন্তু সে মালা আজ কার গলায় গিয়ে উঠছে?’

‘তুমি কী ছেলেমানুষ, মালা নিয়ে এসেছা কেন?’ আধ-আধ সোহাগের ভক্তিতে বললে কাকলি।

‘তোমার এই ছেলেমানুষ ভাবটি দেখব বলে।’ বললে স্বকাস্ত।

‘কী হবে আমার মুক্তোর মালায়, আমার ফুলের মালাই ভালো।’

‘তোমার মুখে এই নতুন কথাটি শুনব বলে।’

সন্দের দিকে ভিক্টোরিয়া স্কোয়ারে দেখা হয়েছে দু-জনের। এদিকটায় তত ভিড় নেই। উকিঝুঁকি নেই। শান্তিতে একটা কোণ পেয়েছে নিরিবিচি।

‘জানো আমরা এখনো জানি না আমাদের মধ্যে কত রহস্য, কত চন্দ্র-সূর্য, কত গুণ্ডা আর অন্ত যাওয়া।’ বলতে লাগল স্বকাস্ত, ‘কত ভাব রস দীপ্তি কাস্তি, কত অন্ধকার। কিছুই জানি না। জানতেও পারি না যদি প্রেম না জাগে। একমাত্র প্রেমই নানা কোণে আলো ফেলে আমাদের মধ্যে নতুনকে দেখতে চায়। বিচিত্রকে

দেখতে চায়। আশা করে আমরাও চিরন্তন নতুন থাকি। তাই তো প্রবৃত্তি পুরানী হলেও বাসনার কারুকলার আর শেষ নেই। যদি আর নতুনকে খুঁজে না পায়, তা হলেই প্রেম বিষন্ন। তাই, দেখছ না, ফুলের মালাটা স্বকাস্ত নিজেই কাকলির খোঁপায় পরিয়ে দিল : ‘ফুলের মালায় তোমাকে একটু নতুন করলাম। দেখলাম নতুন করে। দেখি।’ কাকলির চিবুক ধরে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল স্বকাস্ত।

‘আর তোমাকে নতুন দেখলাম কথার মালায়।’ টলটলে চোখে বললে কাকলি।

‘এবার বিষয়জালায় আসি।’ হাসল স্বকাস্ত : ‘তোমার নরকাকা দিনরূপ ঠিক করেছেন?’

‘সব ঠিক। এমন-কি নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত ছাপা হয়ে গেছে। আর জানো, নিমন্ত্রণপত্র বাবার নামে।’

‘আয়োজন সব সংক্ষেপ তো?’

‘অতিশয়। বাবার সেক্টিমেন্টের মান রাখছেন নরকাকা। যে কটি নিকটতম আত্মীয়-বন্ধুদের না বললে নয়, শুধু তাদেরকেই চিঠি দিচ্ছেন। বলছেন, বাবার প্রেসার ভীষণ বেড়ে গিয়েছে, হৈ-চৈ, গোলমাল সহিতে পারবেন না বলেই কাণ্ডটা ওবাড়িতে না হয়ে এ-বাড়িতে হচ্ছে—’

‘আসল কথা কারুরই বুঝতে আর বাকি থাকবে না।’

‘বুঝুকগে।’

‘তারপর বিয়েটাকে অনিবার্য করবার জন্তে মানে অনিবার্যরূপে নগ্ন-নিঃস্ব করবার জন্তে নরকাকা যা একখানা গুল ছেড়েছেন তা এখন ইতি-গজ বা ইতি-গাঁজা বলে চালালেও লোকে চাচ্ছে না নিতে। কেমন কুটিল-কুটিল চোখে দেখছে আমাকে।’

‘তোমাকে দেখছে?’ খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : ‘তোমাকে দেখে কী হবে?’

এই হাসিটি নতুন। কটাক্ষটি নতুন। মধুরের এই টানটি আর কোনো দিন দেখে নি চিবুকে।

‘তোমাকে এখন পাচ্ছে কোথায়? যখন পাবে—’

‘মুক্ত দেখবে।’ আঁচলে একটা ঘূর্ণি দিল কাকলি। বললে, ‘এদিকে কী হয়েছে জানো? একটা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে এসেছি।’

‘সে আবার কী!’

ব্যাপারটা বিশদ করল কাকলি।

খুব একটা গৌরবের কাজ করেছে স্বকাস্তর মুখের দিকে তাকিয়ে তা মনে হল না।
বরং প্রায় বেদনার স্বর বার করল স্বকাস্ত, বললে, ‘ঈস! তুমি কী বোকা!’

‘বোকা!’ ঘাড় ফেরাল কাকলি।

‘তা ছাড়া আবার কী! নইলে অতগুলো টাকা কেউ ছেড়ে দেয় এক কথায়?’

‘বা, ঐ টাকা কি আমার?’

‘তোমার নয় তো কার! যখন তোমার নামে সার্টিফিকেটগুলো কেনা হয়েছে, তুমি অ্যান্ডার্ট হয়েছ, টাকা তোমার ছাড়া আর কার নয়। তুমিই তার একমাত্র মালিক— যাকে বলে নিব্বাঢ় স্বত্ব স্বত্ববান। এখন যদি তুমি তা সাধ করে বিলিয়ে দাও, নোপোকে দাও দই মারতে, তা হলে আর কী করা যাবে।’

কি রকম বিস্তী লাগছে কাকলির। কিন্তু প্রসঙ্গের সঙ্গে চলতে গিয়ে তাকেও এখন একটু গম্ভীর না হলেই নয়। মুখও মেঘলা হয়ে এল সহজেই। বললে, ‘কিন্তু আসল জিনিসে চোখ ঠারলে তো চলবে না। যে যাই বলুক, আসলে টাকাটা তো বাবার— তিনি যদি—’

‘না, নয়, আর নয়, কখনোই নয়।’ প্রায় চৈচিয়ে উঠল স্বকাস্ত: ‘তঁার হাত থেকে দান পড়ে গিয়েছে। ছিলা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছে তীর। দি ট্রানজ্যাকশান হাজ বিন ক্লোজড, কনক্লুডেড। আর চারা নেই, ফিরে যাওয়া নেই, আউট হবার পর আর ব্যাট করা নেই। কিন্তু তুমি যদি অম্বার ভেকে আনো, মাঠ সাজাও, হাতে ব্যাট তুলে দাও, লোফা লোফা বল দাও দুন্দাড় পেটাতে— ছি-ছি-ছি—’

হাসির কথার মত করে বলছে বটে, কিন্তু মোটেই হাসির কথা নয়। কাজে কাজেই কাকলির স্বরেও নম্রতার রেখা ফুটল না। বললে, ‘কিন্তু করতাম কী শুনি? বাবা যদি সার্টিফিকেটগুলো হাতছাড়া না করতেন, যদি বন্ধ করে রেখে দিতেন তাঁর কাছে! কী করতে পারতাম!’

‘কী করতে পারতাম মানে? মামলা করতাম।’

কি রকম অভূত দেখাচ্ছে স্বকাস্তকে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল কাকলি। কিন্তু কথাটা আগে শেষ করা দরকার।

‘মামলা! আমি বাবার বিরুদ্ধে মামলা করব?’

‘কেন করবে না? এখানে মামলা বাবার বিরুদ্ধে নয়, অগ্নায়কারীর বিরুদ্ধে, যে পরের সম্পত্তি জোর করে ভোগ করতে চাইছে, বলতে পারো, পরস্বাপহারীর বিরুদ্ধে। এরই জগ্গে তো আদালত। ব্যক্তিকে তার শ্রায়া, তার প্রাণা উপশম দেবার জগ্গে।’

নইলে, বলো তো, দশ হাজার টাকা কি কম ! টু স্টার্ট উইথ, আমাদের জীবনে কত বড় একটা স্বযোগ !’

‘আমাদের জীবনে মানে ?’

কি রকম লাগল স্বকান্তর কানে । বললে, ‘কেন, মানেটা কঠিন কি ! আমাদের জীবনে মানে আমাদের সংযুক্ত ভবিষ্যৎ জীবনে—’

‘তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমাদের মানে কী ?’ কি রকম কঠিন শোনাল কাকলিকে ।

‘আমাদের মানে আমার আর তোমার ।’ স্বকান্ত মিনমিনে গলায় বললে ।

‘শুধু আমার বলা, তোমার নয় । টাকাটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, আমাদের দু-জনকে নয় ।’ পাথুরে গলা বের করল কাকলি : ‘সুতরাং টাকাটা যখন আমার একলার, যখন ওটার উপর আমার একার কর্তৃত্ব, তখন আমি স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দিয়ে দিয়েছি আমার বাবাকে ।’ এবার গ্রীবায যে রেখা ফুটল, তা প্রায় কর্কশের কাছাকাছি ।

‘তা বেশ করেছ ।’ নিমেষে লঘু হয়ে গেল স্বকান্ত, একটু বা ঘন হয়ে বলতে চাইল বেঞ্চিতে । বললে, ‘কিন্তু তুমি-আমি কি আলাদা ? যদি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য হতে পারে, সতীর অর্থে কেন পতির অর্থ হবে না ? আর শাস্ত্রে তো বলেইছে, স্বীভাগ্যে ধন—’

‘আমার স্বামীভাগ্যে ?’ অলসে-বিলাসে তাকাল কাকলি ।

‘ইতি-গজঃ ।’ হেসে উঠল স্বকান্ত ।

‘গজ না হাতি !’

‘গজ আর হাতি একই কথা ।’

‘হোকগে । আমার কথা শোনো । স্বামীভাগ্যে এই ফুলের মালা ।’ ঘাড় নিচু করে খোঁপার উপরে মালাটা ছুঁল কাকলি । ছুঁতে দিল স্বকান্তকে । বললে, ‘এই মালার দাম দশ হাজার টাকারও বেশি । যা দিয়ে আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব ?’

পরস্পর বাঁচিয়ে দিয়েছে পরস্পরকে । একটা ঝড়ের মুখে পড়েছিল এসে নৌকো, হালী আর দাঁড়ী দুয়ে মিলেই সামলেছে । নিয়ে এসেছে শান্ত জলে, নিরাপদের ঘাটে । তারা ক্লান্ত তাই পরস্পর । দু-জনের চোখে সেই তৃপ্তি, সেই প্রার্থনা ।

‘তোমার সাধের সানাই বাজবে তো সেদিন ?’

‘নিশ্চয়ই । নরকাকা বলেছে জোগাড় করবে ।’ মুচকে হাসল কাকলি : ‘কানাই ছাড়া গান নেই, তেমনি সানাই ছাড়া বিয়ে নেই ।’

‘সানাইটা যেন কেমন !’ বললে স্বকান্ত, ‘আনন্দের স্বর, কিন্তু কেমন কান্না-কান্না কথা ।’

‘তাই তো অত সুন্দর । প্রেমের মধ্যে যদি ভয় না থাকে, যদি সুখের মধ্যে না থাকে একটু সন্দেহ, জীবনের মধ্যে না থাকে সংগ্রামের অবকাশ, তা হলে স্বাদে কম পড়ে । কি বলা, পড়ে না ?’

‘পড়ে হয়তো ।’ পাশ কাটাল স্বকান্ত । বললে ‘তোমার বন্ধুদের কাকে বলবে ?’

‘বিনতাকে তো বলবই ।’ আপনমনে হাসল কাকলি : ‘জানো, একেক সময় সুখটাকে নেহাত গ্রাম্য বলে মনে হয় । ঐ যে গাঁ থেকে শহর দেখতে আসে রঙ-বেরঙের জামা-কাপড় পরে, তেমনি । দেখতে আসা মানে কতকটা বা দেখাতে আসা । যদি ফলাও করে দেখানো না যায়, কেউ ঈর্ষান্বিত হচ্ছে এই আরামটা যদি না থাকে, তবে, এমন পোড়াকপাল, সুখেরও সুখ হয় না । তাই সকলের আগে বিনতাকে মনে পড়ছে ।’

‘কিন্তু এমন লোকও হয়তো আছে যে সুখকে অহুকম্পা করে । মনে-মনে বলে, আহা, কী মোহেই আছে এরা, এক স্বাসের তাসের প্রাসাদে । গোকুলে যে কে বাড়ছে, তার খেয়াল নেই ।’

‘তুমি বলবে কাকে ?’

‘দীপঙ্করকে তো নিশ্চয়ই—’

‘এখুনি তবে বেরুতে হয় বলতে । আর কটা দিন !’ লজ্জার জোলে লাস্তের তুলি বুলোল কাকলি ।

‘না, চলো আজই বেরুই । ধরি গিয়ে দীপঙ্করকে । ও তো তোমারও চেনা ।’

দু-জনে উঠে পড়ল । চলল উত্তরে ।

‘হাঁটবে ?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি ।

‘উপায় কি । রাস্তার নাম যদিও উড, কিন্তু অরণ্যের নামগন্ধও নেই ।’

‘উড মানে এখানে কাঠ । যানবাহনের লতাপাতা পাবে না কোথাও । শুধু একটানা পায়ে হাঁটার কাঠ ।’

‘ঐ একটা কাঠ যাচ্ছে ঠুনঠুনিয়ে । ডাকি রিকশাটাকে ।’ হাত তুলল স্বকান্ত ।

‘না, না, রিকশা নয় ।’

‘কেন, মানুষে মানুষ চানে ? স্বকান্তের গলায় অজানতেই বুঝি একটু ঝাঁজ এসে গেল : ‘মানুষটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না, এই মুহূর্তে ও সোয়ারি চায়, না ! খালি

হাতে চলে যেতে চায় ষষ্ঠা বাজিয়ে? আরো জিজ্ঞেস করো, যদি ওর বরান্দা ভাঙার পর ওকে কিছু বকশিশ দিই, ওর কেমন লাগে?

‘মোটোও ওর জন্তে নয়।’ শাসন-ভরা চোখে তাকাল কাকলি: ‘আমাদের নিজেদের সোয়াস্তির জন্তে।’

‘ও! ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের তো এখন অসিধারাব্রত।’

‘হ্যাঁ, আমরা এখন অশেষের দেশের দিকে চলেছি। ঐযি তো আমাদেরই মানায়।’

‘মন্দ বলো নি, অশেষের দেশ।’

‘হ্যাঁ, মন্দের শেষ আছে, ভালোর শেষ নেই।’ চলতে চলতে বললে কাকলি, ‘দুঃখের শেষ আছে, আনন্দের শেষ নেই। স্বর্ণা দ্বৈত-কলহ-বিরোধের শেষ আছে, ভালোবাসার শেষ নেই।’

মনের অঙ্গনে গভীরের ছায়া পড়ল। অনেকটা পথ কাটল চূপচাপ।

‘আর কতদূর ইটাবে? এ যে প্রায় পার্ক স্ট্রিট।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বকান্ত: ‘যন্ত্রের শেষ আছে, যন্ত্রণার শেষ নেই।’

ট্র্যামে-বাসেই আসতে পারল দীপঙ্করের আস্তানায়।

কিন্তু এ যে একটা অকৃত্রিম বস্তু। খোলার চালে একসার ঘিঞ্জি জাঁতিকল। ছত্রিশ জাতের সদাব্রত। ধোপা আছে, ভুজাওয়াদা আছে, ঝি আছে, শিশিবাতল-ওয়াদা আছে। ওদিকে বুঝি এক হিন্দুস্থানি গয়লানির এলাকা। চালের উপরে ফুটবলের ব্লাডার আর সাইকেলের টিউব দেখে সহজেই বোকা যায়, মদ চোলাইয়ের কারবার চলেছে ওখানে। গরুর গোয়ালও কি ওরই মধ্যে নাকি? না। গরুর বসবাস রাজপথে। সে কি? পুলিশে দেখে না? দেখে বৈকি। দেখে, শোকে, শোনে। মাতালদের সে কী হজা! কখনো বা কী মারামারি! পুলিশ এসে রাস্তায় লাঠি ঠোকে। কি হে? তোমরাও স্বখে থাকো, আমরাও স্বখে থাকি। তোমরাও যদি সিন্ত হয়েছ, আমাদেরও আত্ম করো। কুধিরাক্ত হয়েছ তো তৈলাক্ত করো। আর গয়লানির সঙ্গে তো পরিপাটি ব্যবস্থা। ভাটিও জলবে, গরুও ইটবে।

সেই অকৃত্রিম বস্তির রাস্তাবেঁধা থোপের মধ্যে দীপঙ্কর চাক বেঁধেছে। তার মা বাবা দিদি আর কতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে। ভিড়ের চাপে ঘর ছেড়ে বাইরে উপচে এসেছে দীপঙ্কর, তার খাটিয়া ফুটপাতে।

‘দীপঙ্কর আছে?’ বাইরে থেকে হাক দিল স্বকান্ত।

‘না, এখনো ফেরে নি।’ বাইরে বেরিয়ে এলেন দুর্গাবালা, দীপঙ্করের মা।

‘ফিরতে দেবি হয়। আপনি কে? কী বলব ও ফিরে এলে?’ লক্ষ্য করলেন স্বকাস্তকে।

‘আমি ওর বন্ধু। বলবেন, স্বকাস্ত এসেছিল।’

‘আহা, বন্ধু। এ নিষ্ঠুর শহরে এমন কথা আর কে বলে? বলে, বন্ধু। বোসো বাবা, বোসো।’ ভিতর থেকে একটা ময়লা স্বজন নিয়ে এসে খাটিয়ার উপর পাতল দুর্গাবালা। তারপর নজরে আনল কাকলিকে : ‘আর তুমি?’

দুর্গাবালা ভাবছিল, স্বকাস্তেরই কেউ হবে হয়তো। আর স্বকাস্তেরও সেই আশা, তার মধ্য দিয়েই কাকলি পরিচিত হবে!

‘আমরা দু-জনেই ওর বন্ধু।’ বললে কাকলি।

‘বোসো মা, বোসো। এই রাস্তাই আমাদের উঠোন, আমাদের বারবাড়ি। কোনোরকমে কষ্টেস্থে বোসো ছুটিতে পাশাপাশি। বন্ধুর প্রাণে আবার কষ্ট কী! আহা, আমি দেখি, আমি শুনি, আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হোক।’

‘না, আজ আর বসব না। আরেকদিন আসব।’ স্বকাস্ত বললে।

চলে যাচ্ছিল, দু-তিনটি ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল কাকলিকে : ‘তুমিই সেদিন গিয়েছিলে চিড়িয়াখানায়। চীনেবাদাম খাচ্ছিলে। তাই না?’

‘হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। তোমরাও গিয়েছিলে। কিন্তু ও—ঐ ছেলেটি কে?’ ঘরের মধ্যে চোখ পাঠাল কাকলি : ‘ও যায় নি?’

‘না, ও কি করে যাবে?’ ছোটদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, ‘ওর একটা পা নেই। জরে খসে গিয়েছে। যে পা-টা আছে, সেটাও নরড়ে।’

‘আর ও কে?’ আরো ভিতরে কোতুলকে সজাগ করল কাকলি।

‘ও বিষ্টুরই ঠিক আগে। বিষ্টু নয়, আভা এগারো।’ এবার দুর্গাবালাই এগলেন।

‘কী করছে?’

‘রাঁধছে। ফেন গালছে।’

বিষ্টু জলজলে চোখে মুখভরা হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে, যেন কিছুই তার হয় নি, আর ফেন গেলে আভা যখন উঠে দাঁড়াল, গায়ের উপর ছেঁড়া আঁচলটি মেলা, মনে হল একেও খোঁড়া করবার জন্তে আরেক দুর্মর জর আসন্ন। আর, তখন যেন তারও কিছুই হবে না।

গলির থেকে বাইরে আসতে আসতে কাকলি বললে, ‘এরা কি করে ঝাঁচবে? কি করে দাঁড়াবে?’

‘তোমার এ জিজ্ঞাসা মহাশূন্যের শোকে মহাশূন্যের বিলাপ।’ স্বকান্ত কথটা প্রায় হাসির মত শোনাল : ‘ফাকা কথা আর কতদূর হতে পারে?’

‘যা বলেছ।’ কাকলিও হাসল স্বচ্ছন্দে : ‘সত্যি, কোথায় নিয়ে এসেছিলে তুমি?’ বাবাঃ, বুকে হাঁপ ধরে। তুমি দিবিয় বললে কিনা আরেকদিন আসবে।’

‘পাগল! আর কে এমুখো হয়? দীপঙ্করকে আমি তার আফিসে গিয়ে ধরব।’

১৬

দীপঙ্করকে আফিসে গিয়েই ধরল স্বকান্ত।

‘কাল তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম।’ স্বকান্ত বললে, ‘বাবাঃ, কোথায় এসে বাসা নিয়েছ।’

মুখের দিকে তাকাল দীপঙ্কর। না, ঘৃণা নয়, অলুকাপ্পা নয়, প্রচ্ছন্ন আছে বা একটু বন্ধুতার স্বর। বললে, ‘রেলস্টেশন দেখেছ? টিনের কোটো আর কাঁচের শিশি দিয়ে এলাকা ভাগ করে শুয়েছে। কখনো কখনো আবার এই শিশিকোটোকেই অস্ত্র করে রাজ্যো-রাজ্যে বেধেছে যুদ্ধ। তার চেয়ে ভালো আছি।’

‘না, না, মোটেই ভালো নয়।’ স্বকান্ত প্রতিবাদ করল। বললে, ‘যখন সবাইকে আনলেই দেশ থেকে—’

‘না এনে উপায় ছিল না। প্রতিটি মুহূর্তই তখন বাঘের চোখ। দেখেছ তো বোনটাকে?’

‘তবু এর চেয়ে একটা ভালো আস্তানা জোগাড় করা যেত।’ বলতে আর কী, বললে স্বকান্ত।

‘চট করে হাতের কাছে আর পেলাম কই? জানো এরই জন্তে সেলামি দিতে হয়েছে গয়লানিকে।’

‘অসম্ভব। না, না, তুমি একটা ভদ্র বাসা দেখ। এখানে বাঘের চোখ না থাকলেও হায়েনার চোখ আছে।’

‘দেখছি তো, দেয় কে।’ হাসল দীপঙ্কর : ‘মাইনেটা যদি বেশি হত!’

‘কত মাইনে?’

‘শ দেড়েক।’

চারদিকে তাকাল স্বকান্ত। বললে, ‘আফিসটা তো ছোট। আমি ভেবেছিলাম—’

দোতলায় একটা হল-মতন ঘর কার্ঠের পার্টিশন দিয়ে তিন টুকরো করা। আর ও-পাশে একটা ফালতু। চার কামরার আফিসে কী বা জেল্লাজমক হবে। কী বা দেবে খোবে অন্তকে। লোকজনও তো বিশেষ দেখছি না। স্বকান্তের মুখে হতাশার ছায়া পড়ল।

‘আফিসের আয়তন দিয়ে ব্যবসার আয়তন বোঝা যাবে না। মারোয়াড়ির গদি এর চেয়েও ছোট হয়।’ দীপঙ্কর স্বর বদলাল : ‘অবশি আমাকে যা দিচ্ছে তা একনজরে খুব খারাপ বলা যায় না। আজকালকার বাজারে সাধারণ বি-এ পাশের দাম কী ! আমার চলে না বলেই মাইনে বাড়াতে হবে এটা যুক্তি নয়, কিন্তু চুক্তির বাইরে যদি আমার কাজ বাড়ানো সেই সঙ্গে চুক্তির বাইরে মাইনেও বাড়াবে না এটা অযুক্তি।’

‘কেন, বেড়েছে নাকি কাজ ?’

‘প্রথমে যখন ঢুকি তখন কথা ছিল খাতা লেখার, এটা-ওটা স্টেটমেন্ট তৈরি করার কাজ। ছ-চারটে চিঠি লিখতে দাঁও তাও না হয় করলাম। এখন বলছে গোডাউন ইনস্পেকশনে যাও। আর সেসব গুদোম কোথায় ! পৃথিবী ছাড়িয়ে। পাতিপুকুর, ঠাকুরপুকুর, ঢাকুরে। আগে আগে সঙ্গে ঘেঁষেই বাসায় ফিরতাম, এখন কত রাত যে হয়ে যায় ফিরতে !’

‘আলাদা ইনস্পেক্টর নেই ?’

‘বরেনই আগে ঘোরাঘুরি করত। গাড়ি আছে, গায়ে-পায়ে লাগত না। এখন প্রায়ই তাকে টুরে যেতে হয় বাইরে, পার্টির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। তাই আমার উপর ভার পড়ে। বলে, একজন হোলটাইম সুপারভাইজার রাখবে। কী দরকার ! আমার মাইনেটা ভদ্র ও স্বস্থ করে দিক, আমিই খেটে দিচ্ছি একট্টা। শুধু একটা গালভরা নাম দিয়ে কী হবে। তা ছাড়া, সেই বাড়তি খাটনিটা তো খাটছি—’

‘এদের কিসের এত ব্যবসা ?’ স্বকান্ত তাকাল জিজ্ঞাসু চোখে।

‘ওরে বাবা, বিরাট ইমপোর্টের কারবার।’ দীপঙ্কর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : ‘বিদেশ থেকে নানারকম র-মেটিরিয়েলস নিয়ে এসে বিক্রি করে এখানকার ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মের কাছে। দিশি ফার্মের প্রোডাকশান বন্ধ যদি ওসব মেটিরিয়েলস না পায়। আর বিদেশেই জন্মায় ওসব উপাদান। আর এরা, এ কোম্পানি, ঐ বিদেশী

কোম্পানিদের সোল এজেন্ট। সুতরাং, বুঝতে পারছ, ঢালাও ব্যবসা। এই তো কতটা সেদিন ঘুরে এল টোকিও থেকে। শিগগির আবার যাবে নাকি হংকং—’

‘কে কতটা? বরেনের বাবা?’

‘হ্যাঁ, ঐ তো রয়েছে ঐ ঘরে।’ ফালতু ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল দীপকর, আর, সঙ্গে-সঙ্গেই নিজেরও অজানতে কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বর সরল করে নিয়ে বললে, ‘বেশ আছে আনন্দে। এই মালয়, ঐ কানাডা। হাওয়ায় পাখা মেলে দিলেই হল। নিচে রূপোর চাকা আর উপরে স্বপ্নের পাখা।’

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত, ‘বরেন আছে?’

‘আছে। ঐ ঘরে।’ প্রান্তের সুইং-ডোরটা ইঙ্গিত করল দীপকর: ‘যাবে? দেখা করবে ওর সঙ্গে!’ শুধু মামুলি জিজ্ঞাসা নয়, যেন বা আশায় ভরা উৎসাহের স্পর্শ।

‘মন্দ কি। যাই না। কিন্তু, কী আশ্চর্য’, পকেটে হাত ঢোকাল স্বকান্ত, ‘আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি এতক্ষণ। আমার বিয়ে। সেই যে মেয়েটিকে দেখেছিলে জু-তে, তার সঙ্গে। কী সব বাজে কথায় কাজের কথাটাই চাপা পড়ে গিয়েছিল।’ একটা চিঠি বার করে বাড়িয়ে ধরল দীপকরের দিকে। বললে, ‘ঘেয়ো কিন্তু। দেখে রাখো তারিখ। আর শোনো, দু দিনই যাওয়া চাই—’

কাষ্ঠহাসি হাসল দীপকর। চিঠিটা প্রায় অজ্ঞানেই রেখে দিল পকেটে, তাকিয়েও দেখল না। বললে, ‘বরেনকেও বলো না।’ এগুচ্ছিল স্বকান্ত, জামা ধরে টানল পিছন থেকে: ‘আর সেই সঙ্গে আমার কথাটা কিন্তু মনে রেখো।’

‘তোমার আবার কোন কথা!’

‘বা, এতক্ষণ বলছিলাম কী তোমাকে!’ পীড়িত মুখ করল দীপকর: ‘বিয়ে তো লোকে আকছার করছে, তাই বলে দরকারি কথা কে ভুলে থাকে?’

‘মানে, তুমি বলছ, তোমার ঐ গোড়াউন ইনস্পেক্ট করার কথা?’ স্বকান্ত মাথা চুলকোল: ‘গোড়াউনগুলো কার?’

‘ব্যাকের। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়।’

‘ব্যাকের গোড়াউন? কেন, এদের নিজেদের নেই?’

‘কী দরকার করে? করলেই তো ঝামেলা, খরচাস্ত। এ দিবি ব্যাকের গুদোমে এসে জমছে, সময় মত খালাস করে নিচ্ছে পার্টি। তারপর সরকার একজন আছে, ঘুরে-ঘুরে লেন-দেন দেখছে, মালের হিসেব রাখছে, কিন্তু বাড়তি এক পয়সা তার শাসন নেই—’

‘ও! তুমি তোমার মাইনে বাড়িয়ে দেবার কথা বলতে বলছ? তাই না?’

এবার আর কাষ্ঠ নয়, পুস্পহাসি হাসল দীপকর। বললে, ‘বুঝেছ এতক্ষণে?’

‘বা, এ তো তুমি নিজেও বলতে পারো।’

‘আমি বললে হবে না।’ মুখ নিচু করল দীপকর।

‘আমি বললে হবে?’

‘হবে। তুমি ওর বন্ধু। তোমার কথা ও পারবে না ঠেলতে।’

‘বা, ওর বন্ধু তো তুমিও। আমি তো জানি সেই স্ববাদেই তোমার চাকরি হয়েছে এখানে।’

‘কার সঙ্গে কার তুলনা!’ শ্রান একটু হাসল দীপকর। বললে, ‘আমি ওর মুখ-চেনা, আর তুমি ওর হৃদয়-চেনা। স্কুল পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম তিনজন। পাশ করে তুমি ওকে টেনে নিয়ে গেলে স্কটিশে, আমি ছিলাম বঙ্গবাসী। সেই থেকে তোমার সঙ্গে না হলেও ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আর, বলো, ওর ঘনিষ্ঠই বা আমি ছিলাম কবে! স্কুলে কোনো দিন বসিও নি পাশাপাশি।’

‘স্কটিশেই বা কদিন ছিল আমার সঙ্গে!’

‘নাই বা থাকল। তুমি এগিয়ে গেলে আর ও দু-দুবার আই-এতে ফেল করে কেটে পড়ল। কেটে পড়ল তো নয়, ফেটে পড়ল। নিজে ব্যবসাতে নামল, বাপের কিছু হচ্ছিল না এদিক-সেদিক, তাকেও নামাল। দেখতে-দেখতে দশদিক পয়মস্ত করে তুলল। ছোকরা বয়সের মাথায় রক্ত এসে উঠলেও মনে মনে এখনো কিছু সবুজ আছে। অন্তত কারু কারু কাছে আছে। আর তাদের মধ্যে তুমি যে একজন তাতে সন্দেহ কি। তোমাদের কত একদিন ভালোবাসা ছিল!’

‘ছিল!’ স্বকান্ত হাসল।

‘যতই এখন উপেক্ষার ধুলো পড়ুক, ধৈর্য ধরে কিছুটা বালি খুঁড়লেই পাওয়া যাবে ভালোবাসার জল।’ দীপকর বললে, ‘আমরা যখন ফার্স্ট ক্লাশে উঠে ওকে ধরি, ও তার আগে দু-দুবার এলাউড হয় নি টেস্টে। মনে আছে, তুমিই ওকে নিজের কাছে বসিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে তরিয়ে দিলে। আর মনে নেই সেই খেলার মাঠের কথা?’

‘সে আবার কবে?’ অবাক হবার ভাব করল স্বকান্ত।

‘সেই খেলার মধ্যে কালবোশেখীর প্রচণ্ড ঝড় উঠল, দশদিক আধার করে নামল অঘোর বর্ষণ, আমরা যে যার দিকে ছুটলাম আশ্রয়ের খোঁজে। কেউ লক্ষ্যও করি নি কখন একটা গাছের ভাঙা ডাল এসে বরেনের উপর পড়েছিল। তুমি কাছে ছিলে,

হুমি দেখলে। দেখলে, বরেন মাটিতে মুখ খুবড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। সাহায্যের দ্বন্দ্ব কত নাম ধরে ডাকলে আমাদের, ঝড়বৃষ্টির ঠাঁওবের মধ্যে কে তা শোনে। মনেও কে তার জবাব দেয়! তখন তুমি কী করলে? তুমিও ছুটলে।’

‘বলো কি, আমিও ছুটলাম!’

‘হ্যাঁ, কিন্তু তুমি ছুটলে নিজেকে বাঁচাতে নয়, বন্ধুকে বাঁচাতে। ঝড়জলের মধ্যেই লোকজন নিয়ে এলে, গাড়ি নিয়ে এলে, খবর পাঠালে বাড়িতে। ধরাধরি করে ওকে তুলে নিয়ে এলে এক ডাক্তারখানায়। বাঁচিয়ে দিলে ওকে, ভালো করে তুললে। কি, মনে নেই?’

‘আমার মনে থাকায় লাভ কী! বরেনের মনে আছে কিনা সেইটেই বিজ্ঞাস্ত।’

‘নিশ্চয়ই আছে। সে কথা কি কেউ ভুলতে পারে? ঝড়জল মাথায় করে অন্ধকার মাঠ দিয়ে তোমার সেদিনের ছোট্টাটা জলন্ত রেথায় এখনো আঁকা আছে গোথের সামনে।’

‘কিন্তু কে জানে সেদিনের সেই অন্ধকার আর কার মনে হয়তো অন্ধকারই হয়ে আছে।’ বললে সুকান্ত, ‘জলের বাপটায় একটি রেখাও হয়তো আর জেগে নাই।’

‘আছে, আছে।’ জোর দিল দীপঙ্কর: ‘একটা পশুরও স্মরণশক্তি থাকে। আর এ তো বন্ধু—এক ইস্কুলের ছাত্র।’

‘এক সার্কাসের জানোয়ার।’ হাসল সুকান্ত।

‘তাই তুমি বললেই হবে। তুমি যদি বলো আমার হয়ে—’

‘বলব, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু আমি ভাবছি, বাড়তি কাজের জন্য বাড়তি মাইনের দাবি এ তো বিধিমত তোমারই করা চলে। এ তো ছাচাবেল জাঙ্গিসের কথা। তা ছাড়া, তুমি স্কুল-ফ্রেণ্ড, পুরোনো পরিচিত, তোমার কথামত অন্তত মুখ-চেনা তো নিশ্চয়ই—’

‘মুখ-চেনা!’ অধররেখাটা বন্ধিম করল দীপঙ্কর: ‘ভাবে ভাবিতে সেই পুরোনো দিনের গন্ধ এতটুকুও ভেসে আসে না কোনো দিন। আমি তো ওর এমপ্লয়ী, ওর চাকুরে। আগের স্মরে আমাকে আর ভুলেও তুমি বলে না—আপনি বলে।’

‘বা, তাই তো বলবে। তাই তো আজকালকার কোড অফ কনডাক্ট, ব্যবহার-নীতি। নিয়পদস্বকেও আপনি বলতে হবে। বাস-ট্রাম কণ্ডাক্টর তো দূরের কথা, আফিসের চাপরাশি, পোস্টম্যান, এমন-কি হোটেল-রেস্তোরাঁর বয়কেও তুমি বলা চলবে না। চাকরদের দ্বন্দ্ব যে বিল আসছে তাতেও একটা ক্লজ থাকবে, তাদের

আপনি বলা চাই। রেল-স্টেশনের কুলিদেরও সেই আওয়াজ।’ স্বকান্ত প্রায় বক্তৃত্য দিয়ে উঠল।

‘তুলুক আওয়াজ, আপত্তি নেই। কিন্তু কাজকর্মের বাইরে, আফিসের বাইরে, একেবারে আলাদা পরিবেশে যখন দেখা হয়, তখনো সেই ‘আপনি’। কিছুতেই পুরোনো চোখে চায় না চিনতে। প্রভুত্বের চেয়ারটা সব সময়েই পিছনে লাগিয়ে চলেছে।’

‘আর যেই তোমার সামনে বসছে গ্যাট হয়ে, তুমিও বাধ্য ছেলের মত দাঁড়াচ্ছ হেঁট হয়ে।’ স্বকান্ত ঝাঁজ আনল গলায়।

‘উপায় কী তা ছাড়া। প্রভুর কাছে ভৃত্য সব সময়েই ভৃত্য। নিত্যভৃত্য।’

‘তবে দেখা করে কাজ নেই।’ স্বকান্ত পিছু হটল : ‘হয়তো আমাকেও চিনবে না, আপনি করে বলবে।’

‘না, না, তুমি তো ওর এমপ্লয়ী নও—’

‘রক্ষে করো।’

‘তোমাকে তাই ঠিক চিনবে। কথা কইবে আগের স্তরে।’

‘তা হলে যেতে বলছ ? যাব ?’

‘অন্তত আমার জগ্গে যাও। আমার বিশ্বাস তুমি বললেই আমার স্বরাহা হবে। তুমি বললেই জাস্টিসটা স্পষ্ট হবে ওর কাছে। নইলে, মাস্তবের জাস্টিস আর কী ! যার যেখানে স্বার্থ তার সেখানে জাস্টিস ! সেই জজই খুব জার্স্ট যে আমার মামলাতে ডিক্রি দেয়। আমি ডিসমিস খেলেও বিচারকে বিস্ময়ক বলব, প্রশংসা করব জজকে, এ কথা শাস্ত্রে পুরাণে ইতিহাসে কোথাও লেখা নেই।’ কণ্ঠে হাসল দীপঙ্কর : ‘সব জানি। কিন্তু আমার অবস্থাটা তো স্বচক্ষে দেখে এসেছ। কিংবা দেখ নি হয়তো পুরোপুরি। আমার বাবাকে দেখ নি।’

‘তোমার বাবা !’

‘হ্যাঁ, লোকে কাঁদে ভাতের জগ্গে, ছাদের জগ্গে, আর আমার বাবার কান্না ! আফিঙের জগ্গে। আমি এক দিকে কমাই উনি আরেক দিকে বাড়ান। কিছুতেই পারা দিয়ে উঠতে পারি না তাঁর সঙ্গে।’

‘কী কমাও-বাড়াও ?’ স্বকান্ত কোঁতুহলী হল।

‘আমি ভার কমাই, উনি ধার বাড়ান। আর ধার অত বেশি হলে তাতে সব কিছুই কাটা পড়ে। পেটের ভাত পরনের কাপড় ইস্ত্রলের বই তো বটেই, ঝি-চাকর, মাস্টার-ডাক্তার, এমন-কি মান-সম্মান, শ্রদ্ধা-ভক্তি—সমস্ত।’ বারান্দা দিয়ে স্বকান্তকে

এক পা এগিয়ে দিল দীপঙ্কর। গলা নামিয়ে বললে, ‘বলের আগে কৌশল ভালো। যদি ধরাধরি করেই হয় তবে আর লড়ালড়ির দরকার কি। মীমাংসা একান্ত না হলেই তবে বংশ সিংকে ডাকা যাবে।’ একটু থামল দীপঙ্কর : ‘তবে তুমি যখন আছ তখন বংশীতেই কাজ হবে হয়তো।’

‘চুকব যে কার্ড লাগবে না তো?’ পারে এসেও স্বকাস্তর দ্বিধা নাকি?

‘তোমার আবার কার্ড!’

সুইং-ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল স্বকাস্ত।

ব্র্যাকেটে কোট ঝুলছে হাঙ্গারে, শাটে-টাইয়ে-ট্রাউজার্সে দক্ষতাযোগ্যতার প্রতিচ্ছবি, বরেন বসে আছে নিখুঁত মনোযোগে। বিরক্ত-সন্দ্বিষ্ট চোখে আগন্তকের দিকে তাকাল সূচ্যগ্র স্তব্ধতায়। ঋণপরেই উঠল উত্তাল হয়ে : ‘আরে, হুকু, হুকু যে। কী মনে করে? আয় আয়, বোস।’ ভঙ্গির সমস্ত তীক্ষ্ণতা মুহূর্তে ভোঁতা করে দিল। শৈথিল্যে ডুবে গিয়ে বললে, ‘কতদিন পরে দেখা বল তো।’

নিশ্চিন্ত হয়ে বসল স্বকাস্ত। মুখময় মিষ্টি হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘কেমন আছিস?’

‘তুই কেমন আছিস? চেহারাটা তো বেশ ব্রাইট দেখাচ্ছে।’

‘তোমার চেয়েও?’

‘আমার সব পোশাক। মলাট।’

‘ললাট বল।’ সম্মুখে তাকাল স্বকাস্ত।

‘ললাট মানে কপাল, তাই না?’ যজ্ঞচালিতের মত কপালে একবার হাত বুলাল বরেন। বললে, ‘কিছু নেই, খা-খা করছে। বিজ্ঞার জাহাজ তোরা, এক কথায় তোরাই তো বিজ্ঞাপতি। আমরা তো কুলিমজুর। নে, লিগারেট খা।’ স্বকাস্তকে একটা দিয়ে নিজে ধরাল আরেকটা : ‘তারপর কী করছিস? এম-এ হয়ে গিয়েছে? বাঃ, কোথাও ঠেকাল না একটুও। তারপর? এখন?’

‘রিসার্চ করছি।’

স্বকাস্তর দিকে কল্পনার চোখে তাকাল বরেন। বললে, ‘তোমার ছাত্রজ্ঞ আর ঘুচল না।’

‘কিন্তু পাত্রজ্ঞ ঘুচছে।’

‘তার মানে?’ টেবিলের উপর হু কহুই রেখে ভক্তিটা ধারালো করল বরেন।

‘তার মানে আর পাত্র থাকছি না। ফুটোপাত্র হয়ে যাচ্ছি। বুঝলি না?’

‘না।’ বোকা-বোকা মুখ করল বরেন।

‘তার মানে বিয়ে করছি। এ জীবনে আর বিয়ের পাখ বলে চিহ্নিত হব না তারই
দুঃখে হাহাকার করছি।’ চোখে মুখে আনন্দ নিয়ে জলে উঠল স্নকান্ত।

বরেন গলা ছেড়ে হেসে উঠল হো হো করে। বললে, ‘তাই। তাই তোয়
চেহারাটা এত চেকনাই মারছে।’

‘সত্যি?’

‘কিন্তু এখনি? এরি মধ্যে বিয়ে?’ অল্পকম্পার স্বর আনল বরেন : ‘শেষ
পরীক্ষা হয়ে গেল, সম্বন্ধ করে বাবা-মা পাত্রী বেছে দিলেন আর অমনি রাজি হয়ে
গেলি? এই উঠতি বয়সেই ক্লাস্তি এসে গেল? এখন রাত কত?’

‘রাত জন্মায় নি এখনো।’

‘বাবা-মা ভাল-ভাত মেখে গরম পাকিয়ে দিলেন আর তাই নির্বিবাদে গালে
পুরলি? বিয়েটা একটা হাতের মোয়া? ক্রিকেটের ডলি ক্যাচ? কি রে, মুখ
টিপে হাসছিস কী!’ শাসনবিলাসী বিজ্ঞের মত মুখ করল বরেন : ‘একটু দুর্গমের
পথে যাবি না? একটু কঠিন করে জটিল করে নিবি না? হাত বাড়িয়েই যে ফল
পাড়া যায় তার চেয়ে গাছে চড়ে তার মগডাল থেকে ছিনিয়ে আনা ফল কি বেশি
মিষ্টি নয়? কঠিন না হলে কি দামি হয়? জটিল না হলে কি আনন্দ আছে?
রোমাঞ্চ আছে? তার মানে? মাথা নাড়ছিস কেন? খুব দাঁও মেরেছিস বুঝি?’

‘একটা কলাই যথেষ্ট, এখানে একেবারে আটটা। অষ্টরস্তু।’

‘তবে আকর্ষণটা কিসে?’ চোখ দুটো একটু সরু করতে চাইল বরেন : ‘মানে,
জিনিস খুব ভালো?’

শব্দ করে হেসে উঠল স্নকান্ত। বললে, ‘তা এখনি কী করে বলি! ফিনিশ না
হলে কি জিনিস বোঝা যায়?’

‘তা হলে রহস্যটা কোথায়?’

‘তুই এত বুঝিস আর এটুকু বুঝলি না? ভালোবাসার নাম শুনেছিস?’

‘স্কাল্লেট কিভারের নাম শুনেছি।’

‘ঐ, হ্যাঁ, ঐ লাল জর। যাকে বলে, কন্ঠিরে যজ্ঞণ। সেই ভালোবাসা হয়েছে।’

‘ভালোবাসা হয়েছে!’ ঠাট্টা করে উঠল বরেন : ‘তুই একটা মেয়েকে ভালোবাসিস
এ সহজেই আন্দাজ করতে পারি। এককালে যাকে দেখতিস তাকেই ভালোবাসতিস
—সে কথা নয়। কিন্তু তোকে কোনো মেয়ে গায়ে পড়ে ভালোবাসবে এ অবিশ্বাস্ত।
বলি, কে, মেয়েটা কে?’

‘আমার সঙ্গে পড়ত। আমার সঙ্গেই পাশ করেছে এম-এ।’

‘বলিস কি ! একটা এম-এ পাশ মেয়ে তোর প্রেমে পড়েছে !’

‘সেইটেই তো আশ্চর্যের দেশে মহাশ্রী । তুই তো আমাদের সব জানিস—কত ক্রটি কত দৈন্ত নিয়ে বড় হয়েছি । চাল নেই, চুলো নেই, বিস্ত্র নেই, বেসাত নেই—অধম-অধনদের একজন, তবু ছাথ কী অদ্ভুত, তাকেই কিনা একজন ভালোবাসে, আর শুধু ঠুনকো এক রাজ্রির জন্তে নয়, জীবনভোর দিনরাজ্রির জন্তে তাকে পেতে চায় ! পৃথিবীর ধুলোতে আশ্চর্যের ঋতু এখনো শেষ হয় নি । সূর্য উঠুক আর অস্ত যাক, আশ্চর্যের উদয়াস্ত নেই ।

বরেনের মনে হল আবার সে হারল, মার খেল স্বকান্তের কাছে । চেয়ারের আলস্তে ঢলে পড়ল ।

পাড়ায় তাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই যেদিন স্বকান্তরা ভাড়াটে আসে সেদিন স্পষ্ট মনে আছে বরেনের । দূর মফস্বল থেকে এসেছে, বাঙাল-বাঙাল দেখতে, মোটেই তার উপর সদয় ছিল না বরেন । আর কী স্পর্ধা, তাদের ইচ্ছলে এসে ভর্তি হল, শুধু ইচ্ছলে নয়, ঠিক তার ক্লাশে, তারই সেকশনে, আর বলিহারি, উকিল-বাপের ছোট-খয়ে-আসা আলপাকার কোট গায়ে দিয়ে বসল তার পাশটিতে । প্রথম-প্রথম মনে হত বরেনের, যেন কে-এক অস্পৃশ্য ঢুকে সমস্ত মন্দিরকে অশুচি করে দিচ্ছে । কথা কইতেও চাইত না, নাক সিঁটকে থাকত । কিন্তু একটা লোক যদি সর্বক্ষণ কারণে-অকারণে স্তবস্তুতি করে, উপকার করবার জন্তে উদ্গ্রীব হয়ে থাকে তবে তার প্রতি ক্রমে-ক্রমে নরম না হয়ে উপায় কি । ও কেন উড়ে এসে মোড়লি করবে, শুধু লেখায়-পড়ায় নয়, এমন-কি খেলার মাঠে, বাঙাল হয়েও কেন চিরকালের কাঙাল হয়ে থাকবে না, বরং আশেপাশে সবাইকে কাঙাল করে রাখবে, এ বরেনের অসহ ছিল । তবে যে লোক নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অন্ধকার ঝড়ের থেকে অজ্ঞানকে বাঁচায়, নিজের শত-শত অসুবিধে ঘটিয়েও পড়িয়ে পাশ করায়, তার প্রতি স্রুগ্ৰসন্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক । কিন্তু মুখে ঘাই বলুক, সর্বক্ষেত্রেই স্বকান্তের হার হোক, তার গ্রাম্য উদ্ধত স্পর্ধা লুপ্তিত হোক ধুলোতে, এ বরেনের প্রচ্ছন্ন অভিলাষ । তাই বিছায় না পারলেও যখন তাকে ব্যবসায় মারল, বরেনের গর্বের অবধি ছিল না । সাধ্য নেই টাকায় স্বকান্ত তার নাগাল পায় । ঝকঝকে কপা ডিগ্রি পেতে পারে, কিছুটা হয়তো নাম, কিন্তু টাকার কাছে ওসব সোনার কাছে বাঁতা । টাকা দিয়েই নাম-কাম রাম-শ্রাম কিনতে পারে সমস্ত । এমন-কি, যদি স্বকান্ত হাত পাতে, কিছু তাকে দিয়েই দিতে পারে অকাতরে ।

খুব স্বস্তিতে ছিল বরেন, গৌরবের স্বস্তিতে । কিন্তু এ আজ সে কী শুনল ? একটা

মেয়ে ভালোবেসেছে স্বকাস্তকে, তাকে তার হৃদয় দিয়েছে। আর এ মেয়ে শ্রোতের শ্রাওলা নয়, স্থির জলের পদ্ম। শুধু রূপসী নয়, বিহবী। আর, একটা হৃদয় পাওয়া মানে একটা সাম্রাজ্যের চেয়েও বেশি পাওয়া। তার চেয়ে ঢের ঢের বড় ধনী আজ স্বকাস্ত।

কতদিন ধরে একটা ভালোবাসার জন্তে বসে আছে বরেন। টাকার শব্দ দিয়ে তার নৃপরের ধ্বনি তৈরি হয় না। বসে আছি তো থাকব, আরো থাকব। কিন্তু এরই মধ্যে এক ফাঁকে স্বকাস্ত জয় করে নেবে অভাবনীয়কে—এ ধারণার অতীত।

‘তোকে একটু দেখি ভালো করে।’ বরেন তেরছা করে নিল চেয়ারটাকে। ‘যে দৈব তোকে রূপা করল দেখি সেই দৈবকে।’

‘স্বগলে দেখিস। তা হলেই ঠিক দেখা হবে, করুণাটা সমান-সমান না বেশি-কম।’ উঠে পড়ল স্বকাস্ত। বললে, ‘তোকে চিঠি দিচ্ছি। যাস কিন্তু। দু জায়গায়ই যাস দু দিন।’

‘বা, যাব না? নিশ্চয়ই যাব।’ বরেনও উঠে পড়ল: ‘তোর সেই শাস্ত্রের প্রার্থনাকে দেখে আসব।’

‘তোর বাড়ি গিয়ে নেমস্তন্ন করলাম না বলে যেন কিছু মনে করিস নে।’

‘ছি ছি, তোর সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?’ আবার একটা সিগারেট ধরাল বরেন। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল স্বকাস্ত।

ওত পেতে ছিল, দীপঙ্কর তাকে ঠিক ধরেছে। বললে, ‘বরেন কী বললে আমার কথা?’

‘বললে, ই্যা, দেবে, দেবে তোমাকে একটা এলাউয়েন্স—’

‘দেবে?’ সিঁড়ির মুখে দীপঙ্কর আটকাল স্বকাস্তকে: ‘বলো তো কী আরাম! তুমি তদবির করলে বলেই তো এটুকু হল। বরেন যখন একবার কথা দিয়েছে তখন আর তার খেলাপ হবে না। তারপর তুমি আছ।’

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেল স্বকাস্ত।

আর, এদিকে, কাকলি এসেছে বিনতাদের হস্টেলে।

কতগুলি মেয়ে একটা চুটকি সিনেমা-কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সম্পর্কে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আহরণ করে নিচ্ছে। কে কোন ব্লেন্ড দিয়ে দাড়ি কামায়, টেলিফোনের রিসিভর তুলে ধরে কোন কানে আগে পাতো, কোন কাত হয়ে শুতে ভালোবাসে, রাতে কেউ ঘুমের মধ্যে হাঁটে কিনা এবং হাঁটতে-হাঁটতে গেট পেরিয়ে চলে আসে কিনা রাস্তায়—

‘এই, কাকলিদি।’ ইউনিভার্সিটিতে যারা চিনত, ফিফ্‌থ ইয়ারের মেয়েরা, সমীহ করতে চাইল।

কিন্তু অজ্ঞাতদের সেই মেজাজ নয়। তাদের বয়ে গেছে যাকে চেনে না তাকে মান দিতে।

‘খোল না বইটা। ছাখ না পরেরটা কী মজার প্রবন্ধ! এঁরা কোথেকে সাবান-তোয়ালে কেনেন এবং সাবান-তোয়ালে কোন কোম্পানির?’

‘বিনতা আছে?’

‘তার ওপাশে ঘর। আছে কিনা দেখুন।’

দেখল, আছে। তার হাতে চিঠি দিল কাকলি। বললে, ‘বিশেষ কাউকে বলছি না। তুই কিন্তু যাস। কেউ একদম না থাকলে ভালো লাগবে না।’

‘যাব।’ তৃষিত চোখে কাকলিকে সবাক্কে লেহন করল বিনতা। বললে, ‘কিন্তু এক কথা। বিয়ের পরেই শিগগির তুই আমার কাছে একদিন আসবি।’

‘বা, তাতে কি, আসব।’

‘আর আমাকে সব বলবি—কী হল-টল।’

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘সে কি বলা যায়, না বোঝানো যায়? তুই ঘি দিয়ে ভাত খেয়ে এলে বলতে পারবি এ কেমন ঘি?’

.. ১৭

ভূপেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেল, বাড়িতে দিল না প্রেসার। যা অখণ্ডনীয়, তার সঙ্গে লড়তে যাওয়া বৃথা। কালস্রোতের সামনে সামান্য খড়কুটো হয়ে লাভ নেই। দূরে থাকা, সরে থাকাই স্বন্দর।

কিন্তু মৃণালিনী হৈ-চৈ করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। অথচ কার উপরে যে রাগবে পাচ্ছে না প্রতিপক্ষ, প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষ। শুধু ধোঁয়াচ্ছে আর থেকে থেকে দমকা রাগে ফেটে ফেটে পড়ছে।

‘এ কি রকম হল! এ কেমন বউ এল স্বকাস্তর!’

ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছিল প্রশান্ত, কথার সুরটা ভালো লাগল না। মার কাছে স্বকাস্ত যেন কী, ওড়া-ঝোড়া-চড়া রাজপুত্র, আর তার বউ ডানাকাটা পরী না হলে

সমস্ত রূপকথার রাজ্যটাই যেন ভিত্তিহীন। মার ছেলে স্বকাস্ত, যখন-তখন অঘটন কিছু ঘটবে, সাপের মাথার মানিক আসবে হাতের মুঠোয়। তুলনায় স্বকাস্তের চেয়ে প্রশান্তকে মা কম মনোযোগ দিয়েছে, এই অভিমান থেকে মুক্ত ছিল না প্রশান্ত। সকলের দিনই একবার অন্তত কিরে আসে। তেমনি বুঝি এসেছে আজ পাঞ্জির পৃষ্ঠায়। মা বুঝুন, শুধু বয়সেই নয়, আরো অগাধ ব্যাপারেও স্বকাস্তের চেয়ে প্রশান্ত বড় ছিল। বিছায় না হোক, বুদ্ধিতে। অন্তত চরিত্রে তো বটেই।

অঘটন না ঘটুক, অ-রটন তো রটেছে।

চোয়ালের নিচে মোটা-করা গলার ভাঁজে জোরে ব্রেড ঘষতে ঘষতে প্রশান্ত বললে, ‘এখনো তো কই আসে নি। আগে মাঠে নামুক, তারপরেই তো আসল খেলা শুরু হবে।’

দিন শুধু প্রশান্তের নয়, বন্দনারও ফিরে এসেছে। সে ঠোঁট উলটিয়ে বললে, ‘বা, এম-এ পাশ!’

‘প্রেমে পাশ।’

‘শুধু পাশ নয়, ডবল প্রমোশন।’ স্বামীর দিকে চেয়ে কুটিল হাসি হেসে বন্দনা চাপা গলায় বললে।

কম খোঁটা সহিতে হয় নি বন্দনাকে। লেখাপড়ায় সেই মামুলি ম্যাট্রিক পর্যন্ত, রূপেও তেমন কিছু আশা-মরি নয়। বাইরে যে সবাইকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে সম্ভাব পাবে, তার উপায় নেই মৃণালিনীর। বাইরের জগ্গে যাই হোক, ঘরের জগ্গেই বা কী আনল? নগদ দু হাজার টাকা, তাতে তো বিয়ের খরচাই কুলোল না। উলটে ধার। আর ফার্নিচারের কী রোগা-ভোগা চেহারা! লরি থেকে নামাতে গিয়ে খাটের ছতরি ভেঙে গেল, আর আলনাটা আগে থেকেই দু হয়ে রয়েছে। বাঁচবার মধ্যে বেঁচেছে ডেসিং-টেবলটা, আর তাতে যা একখানা আয়না ফিট করা, তাকালেই মনে হবে যেন মুখছায়া নয়, চিরন্তন একটি পক্ষীকে দেখছি, যে পক্ষী লক্ষ্মীর বাহন। আর কানে এক তিল, গলায় এক স্নতো, হাতে এক চিলতে, আর আঙুলে এক ফোঁটা যা দিয়ে সব দিয়েছে সাজিয়ে, তাকে গয়না বলে না, বলে গয়নার উপহাস। ক্ষুদ্র মনের দস্তবিকাশও বলা যায়।

দেখ, তোমার মা এত খোঁটা দেন, এক সময় কিন্তু পালটা জবাব দিয়ে ফেলব। বন্দনা আগে একবার বলেছিল প্রশান্তকে।

কী জবাব দেবে? সরল কোঁতুহলে তাকিয়েছিল প্রশান্ত।

বলব, কী আপনার আই-এ পাশ ছেলে—

বি-এ ফেলটা বলবে না বুঝি ?

যদি অস্বস্তি করো তো তাই বলব। কী আপনার বি-এ ফেল ছেলে, মার্চেন্ট
আফিসের লো-গ্রেড ক্লার্ক, তার জন্তে আর যাই জুটুক, অর্ধেক রাজস্বওলা রাজকন্তা
জোটে না। যেমন হাঁড়ি, তেমনি তো সরা বসবে মুখ মিলিয়ে।

আমার উপর দিয়ে বলবে তো ? তা তুমি যত খুশি বলো। যত খুশি চালাও।
শুধু মা-বাবার উপর সরাসরি কটাক্ষ করো না।

না, না, তা করব কেন ?

শুধু আমার উপর দিয়েই যখন বলবে, প্রশান্ত তাকিয়েছিল সম্মুখে, তখন তোমাকে
আরো একটা জিনিস শিখিয়ে দি। শুধু বি-এ ফেল আর কম মাইনে বলেই ক্ষান্ত হবে
না, বলবে, আপনার ছেলের তো অস্বস্তি, পেটে ঘা, পুতুপুতু করে থাকে, তার আবার
দর কী বাজারে ! তা ছাড়া বিয়ের আগে থেকেই অস্বস্তি, এ কথা বলেছিলেন
আমাদের ? তা হলে কল্লু গলা বাড়াত ! বিয়েই হত না। যেখানে বিয়েই নেই,
সেখানে আবার লেনদেন। ঘোড়াই নেই, তার আবার চাবুকের ধুম !

কি বকম মায়াভরা চোখে তাকিয়েছিল বন্দনা। পালটা জবাব আর দেয় নি
শান্তিডিকে। কোনো দিনই দেয় নি। মুখ বুজে সহ্য করে এসেছে। প্রতিশোধের
দিন প্রতীক্ষা করেছে একমনে।

আর মুণালিনী প্রতীক্ষা করেছে প্রশান্তের বিয়ের ক্ষতিটা পুথিয়ে নেবে স্বকান্তকে
দিয়ে। শুধু পাত্রীতে নয়, জিনিসপত্রে। কিন্তু এ কী গ্রহসন !

ঘরের মধ্যে ছেলে-বউয়ের কথা, ঝাপসায় হলেও, স্তনতে পেয়েছে মুণালিনী।
বারান্দায় এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে-করতে এগিয়ে এল দরজার দিকে। বললে,
'যাই হোক, বিয়েই তো হচ্ছে, সামাজিক বিয়ে। বাপ একেবারেই দেবে না, খোবে
না, এমন কী কথা ! শত হলেও তো মেয়ে।'

'মেয়েকে তো বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।' আয়নায় চোখ রেখেই
বললে প্রশান্ত।

'তাই তো কাকার বাড়িতে আয়োজন।' দিন পড়েছে বন্দনার, অনায়াসে সে-ও
টিপ্পনী ঝাড়ল।

'যত সব বাজে কথা।' মুণালিনী ঝাঁজিয়ে উঠল : 'বাপের বাড়িতে জায়গা কম,
তাই কাকার বাড়িতে হচ্ছে। মাহুষ তো বিয়ের ব্যাপারে ইহুল বাড়িও ভাড়া নেয়।
তাই বলে সেটা কি মেয়েকে তাড়িয়ে দেওয়া হল ? না কি তাই বলে মেয়েকে
সালংকারা করে দান করে না বাপ-মা ?'

জিভের ঠেলায় নিচের ঠোঁটের নিচে টিপলি পাকিয়ে তাতে সযত্নে ব্রেড ঘষতে লাগল প্রশান্ত । বললে, ‘তা উনি তো সাংস্কার হয়েই আসছেন ।’

‘মিথো কথা ।’ ইঙ্গিতটা কোথায় মুহূর্তে বুঝে নিয়ে জলে উঠল মৃণালিনী । বললে, ‘যাতে কিছু দিতে-খুঁতে না হয়, তারই জন্তে বাপ-খুঁড়োর এই কারসাজি । এখন শুনতে পাচ্ছি, উচ্চ আদালতের জজ নয়, নিচু আদালতের । মফস্বলি হাকিম, খড়িবাজ, সংক্ষেপে কাজ বাগাবার মতলব । নবিজি না দিয়েই পুজো হাসিল ।’

‘জজ নয় মা, ম্যাজিস্ট্রটর ।’

‘বটে ? তা হলে তো শুধু-ঘুঘু নয়, রাম-ঘুঘু । নইলে আমি মা, আমি জানি না স্বকুকে ?’

এবার গরম লাগল বন্দনার গায়ে । ফোঙ্কার মত ফুলে উঠে বললে, ‘বেশ তো ঠাকুরপো গিয়ে তার গ্রায়া পাওনা-গুণা দাবি করুক না, আর শাসিয়ে আসুক, যদি তা না দেয়, এ বিয়ে ভেঙে দেবে ।’

‘ভেঙে দেবে !’ এবার নাকের নিচে কসরৎ দেখাচ্ছে প্রশান্ত : ‘তা হলে কোমরে দড়ি পড়বে । বিয়ে করলে নাকে দড়ি হত, না করলে কোমরে দড়ি ।’

‘এমনিতে বিয়ে না করলে পুলিশ জোর করে বিয়ে দেওয়াতে পারে ?’ স্বামীর থেকে এসব ব্যাপারে আইনকানুন জানা না-জানি তার কত দরকার, এমনি একথানা ছাত্রী-ছাত্রী মুখ করলে বন্দনা ।

‘পুলিসে কী না পারে !’ গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে প্রশান্ত দেখতে লাগল কাঁটা-খোঁচা কোথাও আছে কিনা লুকিয়ে । বললে, ‘বিয়ে হোক বা না হোক, খোরপোষের দায় থেকে আর রেহাই নেই ।’

বন্দনা খুশি-খুশি চোখে তাকাল স্বামীর দিকে । বললে, ‘ডবল খোরপোষ !’

‘আহা কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে ।’ মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল । বললে, ‘মুখ ফুটে দাবি-দাওয়া নাই বা করল, তাই বলে নিজের থেকে বাপ মেয়েকে কিছু দেয় না ? দেবে না ?’

‘অমন মেয়েকে কোনো বাপেরই দিতে ইচ্ছে করে না ।’ বন্দনা সংসারের হালে এতদিনে পানি পেয়েছে ।

‘অমন মেয়েকে মানে ?’ ক্রুদ্ধ না শুনিয়ে আর্ত শ্বেনাল মৃণালিনী ।

‘আর বর্ণনা করে বলতে হবে না । দু দিন পরেই দেখতে পাব সকলে । বুকের কথা ফলই কইবে ভালো ।’

এমন সময়ে বিজয়া এসে সেখানে দাঁড়াল । বললে, ‘ওরা কিছু দিক বা না দিক,

আমাদের ছেলের বিয়ে, আমরাই সব দেব বর-কনেকে। ওদের তোয়াক্কা করব না। ওরা না করুক, আমরা উৎসব করব।’

মুহূর্তে কী হল কে বলবে, ষ্ণালিনী ঘি-পড়া আগুনের মত দাউ-দাউ করে উঠল। বললে, ‘অমন ঘর জুড়ে থাকলে উৎসব হবে কি করে? উৎসব! বউ নিয়ে এসে স্বকু ঐ কোণের ছোট্ট ঘরটাতে থাকবে আর উনি নিচের বড় ঘরটাতে বহাল তবিয়েতে আমিরি করবেন, এই বুঝি উৎসবের চেহারা?’

‘কী কথা বললাম আর তার কী উত্তর হল!’ বিজয়া মূঢ়ের মত তাকাল বন্দনার দিকে। সংসার-রণাঙ্গনে কে যে কখন কার পক্ষ নেয় বলা কঠিন। কিন্তু বিজয়া স্পষ্ট অসুভব করল, বন্দনা আজ তার দলে। তার বহুদিনের ক্ষতের স্তব্ধতা থেকে সরে গিয়েছে ব্যাণ্ডেজ।

‘এই উত্তর হবে না তো হবে কী!’ চড়া স্বর নরম করল না ষ্ণালিনী : ‘তোমাদের ক্ষমতা আছে, তোমরা কেন আলাদা বাড়ি দেখে উঠে যাবে না? কেন এখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকবে? তোমাদের ছেলেপুলে নেই, ঝাড়া হাত-পা, তোমাদের কেন রূপণ-স্বভাব? এদিকে আমার ছেলেপিলের ঘর, ক্রমশই বাড়বে, বড় হবে—নাতি-নাতনি—’

খুঁকখুঁক করে হেসে উঠল বন্দনা।

কান যখন পক্ষে, তখন মাথাও পক্ষে। তাই বলে উঠল প্রশান্ত, ‘কেন, যে ঘর পাচ্ছে তা জেলখানার আন্দাজে মন্দ কি। তা ছাড়া কাকিমা যখন বলছে আরো এমিনিটিস, আরাম-উপশম জোগাড় করে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাচ্ছে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ—’

‘সেটা আবার কী?’ উথলে উঠল বন্দনা।

‘আজকাল জেলে চোরদের খুব আদর। তাদের জেলে বিড়ি, বড়-তামাক, দাড়ি কামানো, চুলছাঁট, খেলাধুলো, জলসা, চোরদের মনোমত প্রোগ্রাম, মনোমত সব অ্যাক্টিব-অ্যাকট্রিস। সে-এক আনন্দের লহরী। সর্বক্ষণ তাদের বলা হচ্ছে, ভাই সব, আবার কিরে এসো জেলে। এমন সোহাগ আর পাবে না। যার আবার গুড কণাক্ট, তাকে দেওয়া হচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ।’ স্ত্রীর দিকে তাকাল প্রশান্ত : ‘তার মানে একা ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখাশোনা। ধারে-কাছে কোনো ওয়াচার থাকবে না, একেবারে নিজের বাড়ির মত ব্যবস্থা।’

‘স্ত্রী যে, সব সময়ে সনাক্ত করবে কে?’ দিন পড়েছে বন্দনার, হেসে নিল মুখ টিপে।

‘আহা-হা, স্ত্রীলোক হলেই হল। স্ত্রীও তো স্ত্রীলোক ছাড়া আর কিছু নয়।’

কৌশাস্তিক পরিকল্পনা রোজ প্রশান্ত নিজেই করে, আজ স্নেহ-ব্রাশ-বাটি সব বন্দনার দিকে চোখের ইশারায় ঠেলে দিল আর বন্দনাও প্রশমদৃষ্টির ইঙ্গিতে সায় দিল সেই সব ধুয়ে-মুছে তুলে রাখবে।

বিজয়া মৃণালিনীকে লক্ষ্য করে বললে, ‘আপনার কি তবে তাই ইচ্ছে যে, স্কুর বিয়ে হবার আগেই আমরা চলে যাই?’

‘বিয়ে না ইয়ে!’ মৃণালিনীও পরাভূতের চেহারা করল : ‘এ শুধু একটা বউ নিয়ে আসা। সঙ্গে না এক টুকরো আসবাব, না এক টুকরো গয়না। নগদ টাকা তো দিনের বেলায় স্বপ্ন। স্ববীরের কতদিনের সাধ, ছোড়দার বিয়েতে রেডিও পাবে। বাড়ি ভাতে ছাই পড়ল সকলের। এ অবস্থায় যদি একখানা ঘর পাওয়া যেত, ফাঁকা ঘর, তা হলেও কিছুটা আসান হত। ভরাডুবিতে অন্তত মুঠো লাভ হত।’

এই ফ্রণ্টে মৃণালিনী-বন্দনা একদিকে। আর যেদিকে কান, সেদিকেই আপাতত মাথা।

সত্যি কাকা-কাকিমা যেন কী! মোটা মাইনে পায় কাকা, কাকিমাও বাপের বাড়ি থেকে এনেছে ব্যাক বোঝাই করে, অথচ কী কঙ্কসের মত থাকে দেখ না। বিবরের মধ্যে ছোটো ইঁহরের মত খুঁটে-খুঁটে জীবনধারণ করে। আর, কত রাজ্যের জিনিস একটা ঘরের মধ্যে এনে ঢুকিয়েছে। নিজেদের দম বন্ধ হয়ে যায় না? আমার তো মনে হয়, ঘরটাই বুঝি মারা গেল। আচ্ছা, তাদের ভাবনাটা কী, টাকা জমাচ্ছিস কার জন্তে? পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাবার সঙ্গেসঙ্গেই তো পাঁচ ভূতে লুটে থাকে। তার চেয়ে নিজেরা খেয়ে যা না, খাইয়ে যা না! উড়িয়ে-পুড়িয়ে যা না। একটু ভালো ভাবে থাকতে ইচ্ছা করে না, একটু মেলে-ঢেলে, ছড়িয়ে-গড়িয়ে? চাউন একটা বাড়ি না করিস, ছিমছাম একটা ফ্ল্যাট নে না। এজমাল সংসারে নিত্য বাথরুম নিয়ে ঠেলাঠেলি ভালো লাগে? খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি? ভিজে কাপড় শুকোবার জন্তে রেলিও নিয়ে ভাগাভাগি? আর গল্পের বই আর ম্যাগাজিন—যা কিনা কাকিমার খাণ্ড—তা জায়গারটা কোনোদিন পাওয়া গিয়েছে জায়গায়? আর জনে-জনে জিজ্ঞেস করো, সবাই ঘুরে-ঘুরে বলবে একবাক্যে, আমি কী জানি? ভালো লাগে এসব লোয়াজিমা? কত জন্মের তপস্রায় ঠিক সময়ে একটা ট্যান্সি পাওয়া স্বপ্ন রাস্তায়। ইচ্ছে করে না একটা গাড়ি কিনতে, অ্যাশট্রে-ওয়ালা গাড়ি? আর সিগারেট খেয়ে তার ছাই জানলা দিয়ে বাইরে না ফেলে ভিতরে ঝেঁতে ফেলতে? টাকা কি অব্যয়, না শুধু বিশ্বয়ের চিহ্ন! টাকা হচ্ছে শুধু ক্রিয়া অসমাপিকা। এবং বলতে লজ্জা কি, আত্মনেপদী। নইলে শুধু কোনো রকমে থাকা, যেমন-তেমন করে

খাকা, মাখা শুঁজে খাকা, টাকাতে লোকের কলঙ্ক। ইচ্ছে করে না গ্যাসের রান্না খেতে ? খাবার টেবিলে ফর্সা চাদরের উপর প্লেট রাখতে ? সোফায় বসে কার্পেটে জুতো ঘসতে ? রেডিওতে খেলা শুনতে ? রেফ্রিজারেটারে আইসক্রিম বানাতে ? কলিং বেলে আগন্তুক পেতে ? ভিতানে শুয়ে নিওন লাইটে বই পড়তে ? কি রকম যেন কাকা-কাকিমারা ! এত ঠেকেও শেখে না। ছি-ছি, দিবি মানিয়ে-বাঁচিয়ে থাকে। টাকা যার আছে, তার কিসের অত কিস্ক-কিস্ক ?

এবার যদি যায় !

ঝটপট ঝটপট করতে করতে বিজয়া নিচে তার ঘরে নেমে এল। হেমনেকে বললে, ‘দিদি বলেছে স্বকুর বিয়ের আগেই ঘর ছেড়ে চলে যেতে।’

দরজার বাইরে ডেকরেটারের সঙ্গে কথা বলছিল হেমন। বিজয়ার কথা কানে নিল না। বললে, ‘হ্যাঁ, একটা মাইক দেবেন। যে যাই বলুক, মাইক না থাকলে গমগম করে না, উৎসব-উৎসব লাগে না। আর, বলছেন, ফুটপাথ ঘেরবার জন্তে খানায় লিখতে হবে। তা লিখে দিচ্ছি। বিয়ের রাত্রে বেকার যুবক আর ঘুঁটে-গোবরের ফুটপাথ রাজোত্থান।’

ডেকরেটারকে বিদায় দিয়ে ঘরের মধ্যে পুরো স্ফুটিত হতেই বিজয়া আবার তেরিয়া হয়ে উঠল : ‘অপমানের একটা সীমা আছে। দু দিন বাদে ছেলের বিয়ে, বলছে কিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যা, তোর ঘরে থাকবে ছেলে-বউ। আর কিছু না পাই ঘর পেয়ে বুক ভরবে—’

‘মাথা খারাপ হলে ওরকম অনেক কথাই বলে থাকে অনেকে। গায়ে মাখতে হয় না। এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিতে হয়।’ চেয়ারে বসে মউজ করে এক টিপ নশ্তি নিল হেমন : ‘অপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলেই মহাশাস্তি।’

‘তোমার তত্ত্বকথা শুনতে চাই না।’ মুখচোখ আগুন হয়ে আছে বিজয়ার। বললে, ‘আজকেই যে করে পারো একটা ক্ল্যাট জোগাড় করো। যত ভাড়া চায়, যত সেলামি। নয়তো সেই যে কে মেমসাহেব পেয়িং গেস্ট রাখে সেখানে গিয়ে উঠব। যাও, খোঁজ করো। নিদেন একটা হোটেলে ঘর নাও। দিশি-বিদেশী যেখানে হোক, যত টাকা লাগুক—’

‘দাঁড়াও, হালুইকরের ফর্দটা দেখি।’ কী একটা কাগজের টুকরো গভীর মনোযোগে দেখতে লাগল হেমন। বললে, ‘আমি এখন সরি কি করে ? আমার হাতে এখন কত বড় কাজ !’

‘কাজ— তোমার কাজ ?’ মুখ ভেঙে উঠল বিজয়া : ‘তোমাকে সকলে কত পোছে !’

‘পুঁছুক না পুঁছুক, কাজটা তো নির্বাহ করতে হবে। দাদার কাছে গেলুম, দাদা বললেন, তিনি কিছু জানেন না, যে এ কাজ করেছে সে এর ব্যবস্থা করুক।’

‘ঠিকই তো বলেছেন।’ খাটের উপরে গাঁট হয়ে বসল বিজয়া।

‘মোটাই ঠিক বলেন নি। গুটা ক্ষোভের কথা, অভিমানের কথা। নইলে শূকু ছেলেমানুষ, ও এর কী ব্যবস্থা করবে ?’

‘তাই তোমাকে মাতব্বরির করতে হবে ! গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ! এতে তোমার কী ?’

‘আমার কী মানে ? দাদার মান, পরিবারের প্রতিষ্ঠা— এ আমি দেখব না ? আমি থাকতে সব হেঁটমুখ হয়ে দাঁড়াবে ? বাড়ির ছেলের বিয়ে হবে, বউ আসবে ঘরে, আর সমস্ত বাড়ি শোকের চেহারা করে থাকবে ?’

‘তাই তো উচিত। কী কীর্তি করেছেন ছেলে তা তো আর জানো না।’

‘রাখো।’ ধমকে উঠল হেমেন। ‘বিয়ের মন্ত্রটা চলতি বাঙলায় না কি মৃত সংস্কৃতে, কদিন আগে না পরে, এ নিয়ে বুদ্ধিমানের মাথা ঘামায় না। আমার পাঠা আমি যেকোনো কাটি তাতে লোকের কী বলবার ? বই লিখছি আমি, তাতে আমি যদি শেষ পরিচ্ছেদ আগে লিখে প্রথম-দ্বিতীয় পরে লিখি, তা হলে বই কি অন্তর্দ্বন্দ্ব হবে ? বাজারে চলবে না ?’

‘বাজারেই চলবে।’ দাঁতে দাঁত রাখল বুঝি বিজয়া।

‘না, সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক করতে হবে, সম্ভাস্ত করতে হবে। এমনিতে যেমন জাঁকজমক হওয়া উচিত কোনো অংশে তার ক্রটি করা চলবে না। ম্যারাপ বাঁধা হবে, আলোয় আলোকময় হয়ে উঠবে বাড়িঘর। তুমি নেমস্তনের লিষ্টিটা দেখ নি বুঝি ?’

‘তুমি আজ আফিসে যাবে না ?’

‘না, ছুটি নিয়েছি কদিন। ছুটি না নিয়ে চলবে কি করে ? হাত বাড়িয়ে শার্টটা দাও তো, প্রেসে গিয়ে নেমস্তনের চিঠিগুলি ডেলিভারি নিতে হবে। তারপর লিষ্টি ধরে বেরোতে হবে বিলোতে। দাদা বলেন, যার বিয়ে সে সব ব্যবস্থা করুক। শূকু সেদিনের ছেলে—ও সব পারবে ? কাকে বলতে কাকে বাদ দেবে তার কিছু ঠিক আছে ? আমরা যখন মাথার উপর আছি তখন ঝুঁকি আমাদের—’

‘কত তোমাকে মাথায় করে রেখেছে ! এত বড় কাকা, বলে কিনা ঘর ছেড়ে দ্বিগে চলে যাও বাইরে !’

‘কথাটা খুব খারাপ বলে না।’ হাসল হেমন। বললে, ‘আমাদের এ ঘরটা পেলে ওদের বেশ ভালো হত, তাতে আর সন্দেহ কি।’

‘তবে চলো না, এখুনি চলো না ঘর ছেড়ে।’ খাট থেকে উৎসাহে নেমে পড়ল বিজয়া : ‘ফেরবার সময় সব ঠিক করে একেবারে একটা লরি নিয়ে এসো।’

‘আন্তে। অত উতলা হোয়ো না। যাব, কদিন পরে যাব। গোলমালটা চুকুক, আর একটা বাড়ি-টাড়িও দেখে ফেলি এর মধ্যে। কদিন ওদের কষ্ট।’ শাটটা নিজেই টেনে নিয়ে পরল হেমন : ‘সত্যি উপরের ঐ ছোট ঘরটায় বেক্সিমাক্সিক দুটো চিলতে তক্তাপোশ সরিয়ে দিলেও বড়সড় একটা খাট পড়ে না। তা কি আর করা, যেমন পড়ে তেমনি মাপেরই অর্ডার দিয়ে দিলাম।’

‘আর বিছানা?’

‘উপায় কি, ও-বাড়ি থেকে যখন কিছুই দেবে না তখন আমাদেরই দিতে হবে। কিন্তু, সত্যি, দোকান থেকে কেনা নতুন ওয়াড-দেওয়া লেপ বালিশ বিছানা মশারির কী অপূর্ব গন্ধ বলো তো! তার কাছে ফুলের গন্ধ লাগে না।’ চৌকাঠের বাইরে গিয়েছিল, আবার ফিরল হেমন। বললে, ‘আচ্ছা, তোমার জন্তে কী আনব বলো? তুমি কী দেবে বউকে?’

‘এই কলা দেবে।’ এবার একটা মাগাজিন নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ল

‘ছি, তুমি কেন নিষ্ঠুর হবে? নতুন বউ—ভাবো তো সে কেমন এক পবিত্র মূর্তি—তাকে তুমি একটু অভ্যর্থনা করবে না? সেই তুমি যে প্রথম এসেছিলে নতুন বউ সেজে, তুমি চাও নি সকলে তোমাকে আদর করুক, কেউ কেউ দিক কিছু সোনাদানা, আর বাকি সব শাড়ি আর শাড়ি, বই আর বই—’

চোখের কোণ থেকে কি রকম করে তাকাল বিজয়া।

‘আমি বলি কি, তোমার নামে একটা নেকলেস কিনে আনি। আর সেটা তুমি—আহা, কী জানি নাম, তুমি ওকে পরিয়ে দাও নিজের হাতে।’

‘জানি না। তোমার যা খুশি তাই করো।’ খাটের উপর পা টান করে দিল বিজয়া।

‘তোমার যা খুশি তাই করো।’ এ কথা বনবিহারীও বললেন নরনাথকে, যখন নরনাথ বললে, কাকলিকে দু দিন আগেই আমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

কাকলি এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। প্রশ্নাম করল।

নরনাথ বললে, ‘ওকে আপনি আশীর্বাদ করুন।’

চুপ করে রইলেন বনবিহারী।

‘আপনি এমন একটা কাণ্ড করছেন, যে শুনবে সেই টটকিরি দেবে। কী সাংঘাতিক সেকলে আপনি! কাকলির অপরাধ সে নিজের পাত্র বেছেছে, সেটা অপরাধই নয়, আর সে পাত্র সম্প্রতি বিস্তহীন, সেটা তার নিজের রুচি, নিজের নির্বাচন।’

‘এসব কথা অনেক হয়ে গিয়েছে।’ বিরক্তমুখে বনবিহারী বললেন, ‘আমি সেজন্তে চুপ করে থাকি নি। আমি ভাবছিলাম আশীর্বাদ করবার আমার অধিকার আছে কিনা—’

‘সে কী কথা? আপনি বাপ—’

‘ভাবছিলাম মান্নবেরই আছে কিনা। নেই। মানুষ আবার কী আশীর্বাদ করবে! শুধু ভগবান করবেন।’

‘বেশ তো তাই বলুন না, ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন।’

নরনাথের কথার পুনরুক্তি করলেন বনবিহারী।

ইন্দিরাও এসেছে। নরনাথের সঙ্গে সেও পিড়াপিড়ি করতে লাগল গায়ত্রীকে।

গায়ত্রী বললে, ‘মেয়ের বিয়ে মা দেখে না।’

‘সম্প্রদান হয়ে যাবার পর দেখে।’

‘কোনো সময়েই দেখে না। চোখ বুজে থাকে।’ প্রাণপণে চোখ বুজল গায়ত্রী। কাকলি মাকে প্রণাম করল।

নরনাথ বললে, ‘আশীর্বাদ করুন।’

‘মুখ ফুটে পারব না বলতে।’ চোখ খুলল না গায়ত্রী: ‘তবে অন্তর্যায়ী মনের কথা কিভাবে বুঝে নেবেন তা তিনিই জানেন।’

কাকলিকে নিয়ে সজীক চলে যাচ্ছে নরনাথ, বনবিহারী চোঁচিয়ে উঠলেন: ‘সম্প্রদান করবে কে?’

‘দেবু, দেবনাথ। তাকে অনেক করে পটিয়েছি।’

বিনতা সাজাচ্ছে কাকলিকে। পুষ্পপুষ্প করে।

‘একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?’ মুহূর্তে আপত্তি করল কাকলি।

‘এর আর বেশি নেই।’ বললে বিনতা, ‘যতই চড়াছি ততই কম পড়ছে মনে হচ্ছে।’

‘বউ-বউ লাগছে তো?’ হাসল কাকলি: ‘না কি অ্যাকট্রেস-অ্যাকট্রেস?’

‘লক্ষী-লক্ষী লাগছে।’ কাকলির চিবুকের নিচে হাত রেখে মুখখানি উচু করে ভুলে ধরল বিনতা।

‘সে কি? খুব গাঢ়-গাঢ় দেখাচ্ছে বোধ হয়? না, তা হবে না। বেশ একটা তেজী-তেজী কালী-কালী ভাব এনে দে।’

‘কালীর ভাব ধরতে কতক্ষণ?’ হাসল বিনতা: ‘ঠোটে রঙ বা রক্ত তো আছেই। গায়ের আভাটি শুদ্ধ করে বলতে গেলে শ্যামাই। এখন উপর-পাটি দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেই একেবারে চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।’

‘নিচের ঠোঁট কেন, জিভ বের করে জিভ কামড়ে ধরব।’ সংশোধন করতে চাইল কাকলি।

‘না, না, সে একটা ঘোরতর লজ্জার অবস্থা।’ দুই চোখে বিদ্রূপাংগভ ইঙ্গিত পুরে বিনতা বললে, ‘তা হলে স্বকাস্তকে এসে তোর পায়ের তলায় স্ততে হয়। আর, তোর গায়ে এসব সাজসজ্জাও এক তন্তু রাখা চলে না।’

বিনতার হাতে মিষ্টি করে চিমটি কাটল কাকলি। বললে, ‘দরকার নেই কালী সেজে। কালীকে যে কি করে আবার ভক্তকালী বলে বোঝা কঠিন। দরকার নেই, কৃতার্থ-কৃতার্থ মুখ করেই বসে থাকি।’

‘আয়নায় দেখবি একবার?’ উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল বিনতা। বললে, ‘তুই নিজেও জানতিস না তোর মুখে কত শ্রী ছিল কত আনন্দ—’

‘সত্যি?’

‘এমনি একটা দিনের ছোঁয়াচ না লাগলে সে প্রচ্ছন্ন বিকশিত হয় না।’ ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস চাপা দিল বিনতা। বললে, ‘যাই, একটা আয়না নিয়ে আসি।’

‘না, না, যেতে হবে না, আয়না এখানেই আছে।’ বাধা দিল কাকলি।

‘বা, কই, এখানে আয়না কোথায়?’

নিবিষ্ট চোখে বিনতার দিকে তাকাল কাকলি। বললে, ‘তোর মুখই আমার আয়না। তোর মুখই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি নিজেকে।’

স্থির হল বিনতা। তার মুখে কি তৃপ্তির লাবণ্য আঁকা, প্রাপ্তির সৌভাগ্য? তার মুখ কি বিজয়িনীর? আনন্দিনীর? কাকলি কি তাই দেখল? না কি বুঝে-সুঝে ও ইচ্ছে করেই বিভ্রম করল তাকে?

বিষাদের মেঘ উড়ে এসে প্রায় ঢেকে দিচ্ছিল বিনতাকে। এমন সময় নিচে রব উঠল, বর এসেছে, বর এসেছে। সাধা কি কেউ স্তিমিত থাকে, শিথিল থাকে, উচ্চকিত না হয়! ক্ষিপ্ত হাতে একটা শঙ্খ কুড়িয়ে নিয়ে বিনতা ফুঁ দিল।

আওয়াজটা বেরুল না নিটোল হয়ে। কেমন বিকৃত হয়ে গেল। কে একটি আগন্তুক মেয়ে বিনতার হাত থেকে শঙ্খটা কেড়ে নিয়ে তুলল নির্মল ধ্বনি। ফুঁ দিতে-দিতে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। যেন ধিক্কার দিয়ে গেল বিনতাকে।

খান তিন ট্যাক্সি করে এসেছে বর আর জন দশ বরযাত্রী। নরনাথ যে অহরোধ করেছিল সংক্ষেপে সারতে, তা, ওরা লোক ভালো, অগ্রাহ্য করে নি। নিজেও অশ্রু রেখেছে বনবিহারীর অভিশাপ। কোনোরকমে দায় সারা।

‘হ্যাঁ, ডিস খাইয়ে দেবে।’ বলেছিল বনবিহারী: ‘যা না বিয়ে তার আবার খাওয়া।’

‘তবু বরযাত্রী যারা আসবে তাদের ভরপেট না খেতে দিলে কি রকম দেখায়!’ নরনাথ আপত্তি করলে।

‘কিছুমাত্র খারাপ দেখায় না।’ বনবিহারী বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠলেন: ‘তবে তোমার শখ হয় ভাঙারা বসাও। গায়ে পড়ে নিজের উপর বাকি নিয়েছ, নিজেই নেমস্তন্ন করে ডেকে আনছ লোকজন, নিজেই ঠেলাটা সামলাও এবার। নিজের থলের মুখ খুলে দাও। জন পঞ্চাশ লোকের ডিসের খরচ যা পড়তে পারে আমি তাই দেব।’

‘কিস্তি, মাথা নিচু করে কানের পিঠটা চুলকোতে চুলকোতে নরনাথ বললে, ‘বিয়ের কনের গায়ে দু একখানা নতুন গয়না না উঠলে কেমন দেখায়! সোনা অল্প হোক, তবু কগাছ চুড়ি, এক ছড়া হার আর এক জোড়া বালা—আর কানে—’

গর্জে উঠলেন বনবিহারী: ‘মাথায় মুকুট দেবে না, পায়ে পঞ্চম? তোমার যা খুশি তাই করো। আমাকে কিছু বলতে এসো না। গয়না-কয়না হবে না।’

‘সে কি ? খালি হাতে-গায়ে বিয়ে হবে ? কখনো হয় ?’

‘যেমন খালি হাত ছেলে তেমন খালি হাত বউ ।’ চেয়ারের পিঠে চলে পড়লেন বনবিহারী : ‘তোমার দরদ হয় তুমি কিনে দাও ।’

‘আমার কথা আমার কাছে থাক । আপনি বলেছিলেন, নমো নমো করে বাপারটা সেবে দিতে, আর সে বাবদ সামান্য যা খরচ লাগে তা দিয়ে দেবেন ।’

‘নমো নমো করে সারা মানে কি গয়না, না ভোজ, না ছাদজোড়া প্যাণ্ডেল, না আলো-বাজনার ধুমধাড়া?’ হমকে উঠলেন বনবিহারী : ‘নমো নমো করে সারা মানে বিয়ে ও সেই সংক্রান্ত অল্পটানগুলি বিধিমত সম্পন্ন করা । কী বলেছি আমি ? বলেছি যৎসামান্য যা খরচ লাগে তা পিতৃপুরুষদের খাতিরে দিয়ে দেব ।’

‘তাই তো দেবেন ।’ দ্বিধাহীন সায় দিল নরনাথ । বললে, ‘তবে কী যে কার সামান্য তার কোনো স্থির মাপ নেই ।’

‘না, না, আছে । আমি সবস্বল্প শো দুই টাকা তোমাকে দেব । এর এক আধলাও বেশি নয় । তাই দিয়েই তুমি ম্যানেজ করবে ।’

‘করব ।’

‘তবে তুমি যদি এখন বাজি পোড়াও, জলসা বসাও, ম্যাজিক লাগাও, বাইজি নাচাও, সে খরচা তোমার ।’

‘তা তো বটেই ।’

‘মোট কথা, দু শোর চেয়ে বাড়তি যদি খরচ হয় সে দায়িত্ব আমার নয় ।’

‘বলছি তো, নয়, দায়িত্ব আমার ।’

‘তবে আর দাঁড়িয়ে আছ কেন ? কি, একুনি—একুনি টাকা চাই ? দাঁড়াও, দিয়ে দিচ্ছি ।’ হাতের কাছেই টেবিল, টানার থেকে চেক বই বার করলেন বনবিহারী ।

‘না, টাকার জন্তে তাড়া কিসের ?’ নরনাথ কণ্ঠস্বর আর্জ করল : ‘আমি বলছিলাম কি, গায়ে যদি ছিটেফোটা গয়না না থাকে তবে কেমন অন্তত-অন্তত দেখায় ।’

‘অন্ততই তো, অন্ততই তো দেখাবে । কিন্তু’, ধীরে-ধীরে আবার পিঠ তুললেন বনবিহারী, বললেন, ‘কিন্তু, কেন, ওর আগে যেসব গয়না ছিল তার কী হল ? তাইতেই একটু পালিশ দিয়ে দিতে বলা না স্তাকরাকে ।’

‘ওসব গয়না নেই ।’

‘নেই ? কী হল ? গেল কোথায় ? ঐ ছোড়াটা পাচার করেছে বুঝি ?’

‘না । কাকলি যখন যায় আমাদের বাড়ি, তখন বউদি বললেন, গায়ের গয়নাগুলি খুলে দিয়ে যেতে । এক-এক করে তাই খুলে দিয়ে গেল কাকলি ।’

‘খুলে দিয়ে গেল ? তা ভালোই করল।’ সোনাদানা থাকা মানেই ছোড়াটার পকেটখরচার স্ববিধে করে দেওয়া। তুমি বয়স কাঁচ বা প্রাস্টিক বা সেলুলয়েডের কিছু কিনে দিও।’

‘তা না হয় দিলাম। কিন্তু অন্তত একখানা বেনারসি শাড়ি চাই তো।’

‘কী শাড়ি ?’

‘বেনারসি। যা পরে বিয়ে হবে।’

‘রাখো। বেনারসি না হরিষ্মারি ! অত ঠাটে কাজ নেই। চলতি যা শাড়ি আছে তাই, কাচাবার সময় না থাকে, ইস্ত্রি করে নিতে বলা।’

‘সেই সব সাবেকি আটপৌরে শাড়িই বা কোথায় ? একবস্ত্রে তো বেরিয়ে গেল কাকলি।’

‘বেশ বলেছ। রাস্তায় বেরবার সময় কয় বস্ত্র আবার পরে নেয় লোকে ?’

‘ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলাম ওর পুরোনো কাপড়জামাগুলো নিয়ে যেতে। বউদি দিলেন না কিছুতেই।’

‘ঠিকই করলেন। বিয়ের পরে পুরানো বস্ত্র আবার কে পরে ? তারপর আবার জুতো চাই না ?’

‘চাই-ই তো ! স্ট্র্যাপ-আলগা সামান্য স্ফাণ্ডেল পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জুতোর দাম তো বেশি নয়। কিন্তু শাড়ি—’ টোক গিললেন নরনাথ : ‘তা ছাড়া একটা বাক্সও তো দরকার।’

‘বাক্স ?’

‘ট্রাক নয়, স্ট্রাকেস। না হলে জিনিসপত্র রাখবে কোথায় ?’

‘যে বাঁদরটাকে বিয়ে করছে তার মাথায়।’ বনবিহারী কলম কুড়িয়ে নিলেন। বললেন, ‘দেখ, বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। দু শো টাকা দেব বলেছি তাই দেব এরই মধ্যে যা পারো কিনে-কেটে দাও। না পারো, হবে না, দেবে না। মেয়ের আমার শখ কত ! গায়ে গয়না দিয়ে বেনারসি পরে বিয়ে করতে বসবেন।’

লিখে সই করে চেকটা দিয়ে দিলেন নরনাথকে।

কাঁপা-কাঁপা হাত, চোখও ঝাপসা, কোথাও আবার ভুলত্রুটি থাকল কিনা খুঁটিয়ে দেখবার জগ্রে চেকটা নরনাথ মেলে ধরল চোখের সামনে।

যা ভেবেছিল, তাই। মারাত্মক ভুল করেছেন বনবিহারী। নামে তারিখে দস্তখতে ভুল নয়, মূল্যেই ভুল, মানে অঙ্কেই ভুল। দু শো লিখতে দু হাজার লিখে ফেলেছেন।

এ করছেন কী, এমনিতর একটা বিশ্বয়ের আওয়াজ বার হতে যাচ্ছিল মুখ দিয়ে, নরনাথ তাকাল বনবিহারীর দিকে। দেখল যুক্ত ঠোঁটের উপর বনবিহারী তাঁর জান হাতের তর্জনীটি রেখেছেন খাড়া করে। কথা বোলো না। চেপে যাও। পাশের ঘর যেন না পায় শুনতে।

‘আর’, নরনাথের কানে-কানে বলার মত করে বললেন, ‘কাকলি যেন বোঝে যা কিছু হচ্ছে সব তোমার খরচে। তোমার বদান্ধতায়।’

কিন্তু দু হাজার টাকায়ই বা কতদূর কী হবে! তিন পদ গয়না আর শাড়ি ইত্যাদিতেই তার নাতিশ্রাস। সানাই এসেছে বটে কিন্তু নবত হয় নি, রোয়াকের এক কোণে বসেছে কোনোমতে। ম্যারাপ উঠেছে বটে কিন্তু দোতলার খোলা ছাদটুকু ঘিরে। আলো জ্বলেছে বটে, কিন্তু তার রঙ-চঙ নেই, জেল্লা-জমক নেই। খেতে দিতে কলাপাতা নয়, মাটির খালা। ঝাল-ঝোল নয়, শুকনো। নমো-নমো।

এরই মধ্যে নরনাথের ইচ্ছে ছিল একটু চড়া স্বর বাঁধে। না হয় কিছু খরচই হল তার পকেট থেকে। কিন্তু, চিরন্তন কণ্টক, তারও আছে পাশের ঘর। তোমার নিজের মেয়ের বেলায় এমন খরচ-ভাগাভাগির বদান্ধ লোক যদি না পাও? তখন যদি তোমাকেই সমস্ত টানতে হয়? তা ছাড়া, ভাস্করঠাকুরের মান রাখতে এই উৎসব স্তিমিত রাখা দরকার তা তুমি ভোলো কি করে? ইন্দিরাও কম যায় না।

তাই বলে চেয়ারে-টেবিলে কি বাসর হয়? প্রশস্ত একটা শয্যা দরকার। বরাদ্দ বাজেটে না কুলোলেও নরনাথ নিজের পয়সায় কিনে এনেছে বিছানা। বিছানা ছাড়া আবার বিয়ে কি! পেইন্ট ছাড়া টুথব্রাশ কি!

এ নিয়ে কম তড়পায় নি ইন্দিরা: ‘কার্পেটের উপর একটা ফর্সা চাদর পেতে দিলেই হত! নয়তো অত দামি শাড়ি কেনবার কী হয়েছিল? গয়নার মধ্যেও তো এদিক-সেদিক করা যেত অনায়াসে। তোমার কী মাথাব্যথা? তুমি কেন জরিমানা দিয়ে মরো?’

নরনাথ বললে, ‘কাল সকালে যখন বরের বাড়ির লোক আসবে তার থেকে শয্যাভুলুনি বাবদ মোটা টাকা আদায় করে নিও। বিছানার দাম উত্তল হয়ে যাবে।’

‘এ তো খোলা শয্যা, এর আবার ভুলুনি কী!’ ইন্দিরাও দলের বুলি ধরল: ‘কেউ আসবেও না, টাকাও দেবে না। স্বতরাং এ বিছানাটা থাকবে বাড়িতে, সংসারে, যাবে না ওদের সঙ্গে।’

‘ভালোই তো। তুমি তোমার সাঙ্ঘনা পেলেই হল।’

নবনাথও পাছে তার সাধনা। আহা, ওরা মিলুক। ওদের কটি দিন-রাত্রি
স্বপ্নের হোক।

সকলের সঙ্গে বিনতাও দেখতে গেল বর। এমনি ভদ্রলোক শুনে, অমুকবার
শুনলে কি যেত? বর শুনেই সকল নারীর মন কিশোরী হয়ে যায়। তুমি খাড়া
ধিকি, বুড়ি, তুমি কেন দেখতে এসেছ, এ কেউই প্রশ্ন করে না, আর সকলেই চোখে
বেশ একটু আবেশ নিয়ে দেখে। বিনতাও দেখল।

ফিরে এসে কাকলির পাশ ঘেঁষে বসল বিনতা। বললে, ‘কে আরেকজন নতুন
লোক দেখলাম।’

‘নতুন লোকই তো দেখবি।’ স্তম্ভর করে হাসল কাকলি।

‘মনে হচ্ছে স্বকাস্তই নয়।’

‘ওকে তুই কখনো দেখেছিস?’

‘বা, দেখেছি বৈকি।’

‘কবে দেখলি?’

‘ওর পাড়ায় ঘুরে ওর বাড়ির সামনে রাস্তায় ওকে দেখে নিয়েছি একদিন।
যাকে তুই ভালোবাসলি, সম্রাট করলি, তাকে একবার দেখব না চর্মচোখে?’

‘তবে এখন যাকে দেখলি তাকে সেই সম্রাট-সম্রাট লাগছে না?’

‘মোটোও না। সম্রাটের চেয়েও সুপুরুষ লাগছে।’

চিন্তিত হবার মত মুখ করল কাকলি। বললে, ‘তবে, কে জানে, কে-না-কে
এসেছে। বর, না, চোর?’

‘যেই আসুক, স্বকাস্ত নয়। আরেক পুরুষ।’

‘তবে ভাকাত? ভয় পাইয়ে দিচ্ছিস যে।’

‘সত্যি বলছি। আরেক রকম চেহারা।’

‘শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে দেখব ভালো করে। যদি স্বকাস্ত না হয় মালা
দেব না। নেমে যাব পিঁড়ি থেকে।’

শুভদৃষ্টির সময় চোখ বড় করে চেয়ে দেখল কাকলি। বর দাঁড়িয়ে, আর
কাকলি পিঁড়িতে বসা, তাকে হু-জন জোয়ান ছেলে—এমন সময় জুটে যায় নওজোয়ান
—পিঁড়ি স্বদ্ধ ঠেলে তুলেছে বরের মুখোমুখি। বর-কনের মাথার উপর নিভৃতির
আচ্ছাদন। বিনতা ঠিকই বলেছে, এ আরেক স্বকাস্ত। স্বকাস্তের আরেক উচ্চারণ,
আরেক উদ্ঘাটন। আরেক উপস্থিতি। স্বকাস্তের চেয়েও স্তম্ভরতর স্বকাস্ত।

রেজেক্সি করে বিয়ে করলে এ স্বকাস্তকে সে কোথায় পেত, দেখত কবে? তখন

তার পোশাকই বা কি এমনি হত কোনো দিন ? তখন নিশ্চয়ই তার পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে হাফ-হাতা বুশ-শার্ট, পায়ে কাবলি। সে এক নচ্ছার চেহারা। এখন তার পরনে কৌচানো লম্বা ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, কপালে চন্দনের বিন্দু—আহা, কে না জানি তাকে সাজিয়ে দিয়েছে—দেখাচ্ছে জীবনের সে এক বরদ ও শিবদ মূর্তি, আনন্দের অনন্ত নিলয় ! উল্লাস-বিলাসের উদ্বেল সমুদ্র !

মুহু রেখায় হাসল কাকলি। সেই যে প্রথম প্রসন্ন করেছিল চিঠিতে এ যেন সেই হাসি। তারপর ?

সত্যি কী হৃন্দর সেজেছে কাকলি, কী হৃন্দর বসেছে কোল পেতে ! এমন গহন গভীর হাসিটি সে হাসতে পারত এ কে ভেবেছিল ? রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করলে কে পেত এই অগাধের স্বাদ, এই প্রশান্তির স্বেচ্ছা ? সমস্ত দিন কাকলি উপোস করে আছে নিশ্চয়। তাই শরীরে এই ক্লান্তির পবিত্রতা। কী হৃন্দর লজ্জা ফুটেছে চোখে ! কোন রূপসাগরে ডুব দিয়ে এই অরূপরতন সে কুড়িয়ে পেত ! একটি কণাও যেখানে হারায় না সেই আনন্দের অব্যয় ধাম হয়ে বসে আছে। এই বসে থাকাকি আর দেখত কে !

তারপর ? তারপর কী জানতে চাও ?

তারপর রহস্যসিদ্ধপারে বসে উপলখণ্ড কুড়োনো। উপলখণ্ড, পাথরের টুকরো ? না, না, মুক্তো কুড়োনো। স্বাতী নক্ষত্রের বারিবিন্দুপাতে যে মুক্তোর জন্ম, সেই মুক্তো। স্নিগ্ধকান্ত অমল মুক্তো !

সত্যি, আজ রাত্রিও ঘন হবে ? স্তব্ধ হবে ? নিবিড় হবে রুদ্ধশ্বাস নিভৃতি ? আর পরমের সীমানায় যে ভাষা শোনা যায় না সেই ভাষাতেই কথা কইবে অন্ধকার ?

সম্প্রদান হয়ে গিয়েছে, বিয়ের আসরে দীপঙ্কর এসে উপস্থিত।

‘কখন এলে ?’ জিজ্ঞেস করল স্নকান্ত।

‘এই তো—’

‘সোজা এখানে !’

‘তা ছাড়া আবার কি !’

‘তা হলে তুমি বরপক্ষের নও, তুমি কন্যাপক্ষের।’

কাকলি তাকাল দীপঙ্করের দিকে।

দীপঙ্কর বললে, ‘যে পক্ষেরই হই আমরা ইতরজন, আমাদের মিষ্টান্নে সম্ভোগ।’

‘বরেন এসেছে ?’

‘কই, দেখি নি তো।’

‘এখানে আসবে না। বউভাতে আসবে।’ নিজেই জল্পনা করল স্বকান্ত।

‘তাই সম্ভব। কিন্তু জানো এখনো বাড়তি আলাউয়েন্স কিছু দিল না।’ দীপঙ্কর বিষাদের স্বর আনল : ‘তুমি এত করে বললে তবু কান পাতল না।’

‘তবেই তো বুঝছ আমার কত বড় বন্ধু!’

‘না, তুমি জানো না, যদি হয়, তোমার কথাতেই হবে। বউভাতে যখন সে আসবে তোমাদের বাড়ি তখন তাকে একবার রিমাইণ্ড করে দিও।’

এসব কথা বলার সময় ও স্থান বেশ বেছে নিয়েছে তোমরা। এমনি তিরস্কার পূরে কাকলি তাকাতেই দীপঙ্কর চুপ করল।

কিন্তু বউভাতের দিন স্বকান্তদের বাড়িতেও বরেন অল্পপস্থিত।

স্বকান্ত জিজ্ঞেস করল দীপঙ্করকে, ‘বরেন আছে তো কলকাতায়? না কি বাইরে যাবার কথা আছে?’

‘না, না, এখানেই আছে, আফিস করেছে। বাইরে যেতে হলে আমাকেই তো সব টিকিট-কিকিট বন্দোবস্ত করতে হত। যায় নি কোথাও।’

‘বাড়ি বয়ে নেমস্তন্ন করি নি বলেই হয়তো আসে নি।’

‘তাই হবে।’

‘তবেই দেখছ কত বড় বন্ধু! কত বড় মুকুর্বি ধরেছ আমাকে।’ কষ্টে হাসল স্বকান্ত।

‘আমি যা ধরেছি ঠিকই ধরেছি।’ দীপঙ্কর বিজ্ঞের মত মুখ করল : ‘নিশ্চয়ই না-আসার গ্রহণযোগ্য কারণ আছে।’

‘থাকলে আছে না থাকলে নেই।’ স্বকান্ত বিরক্ত হয়ে বললে।

‘তাই আবার যখন দেখা হবে ওর সঙ্গে, কথা হবে, আমাকে ভুলে যেও না। ভুলো না আমার বস্তির চেহারা!’

বউভাতের তিন দিন পর নিচে, রান্নাঘরে, সকালে, বন্দনার সঙ্গে রান্না করতে গেছে কাকলি, হঠাৎ গুনতে পেল উপরে কে কাকে মারছে।

ভয় পেল কাকলি। জিজ্ঞেস করলে, ‘কী হচ্ছে দিদি?’

এক নিখাসে বুঝতে পেরেছে বন্দনা। বললে, ‘ঠাকুরপো স্ববীরকে মারছে।’

কেন মারছে কাকে জিজ্ঞেস করবে! হুকহুক বুকে উন্ননা হয়ে রইল কাকলি।

ভাবল নিজেই একবার উপরে যাবে নাকি, সব জেনে-বুঝে দেবে নাকি মিটিয়ে! নতুন বউয়ের পক্ষে সেটা সূত্রে হবে কিনা কে বলবে! এ নিয়ে সংসারে আর কোথাও চাঞ্চল্য নেই। এমন ঘটনা যেন মোটেই আকস্মিক নয়।

নিতিকার পড়ার ঘর থেকে বঞ্চিত হয়েছে স্ববীর। স্বকাস্ত বলে দিয়েছে, খবরদার, তোর বইখাতার জঞ্জাল নিয়ে আর ঢুকতে পাবি না এ ঘরে। ঢুকবি তো ঠ্যাং ভেঙে দেব।

সেই আদেশ পালন করে নি স্ববীর। স্বকাস্তের চেয়ারটেবিলে বসে বইখাতার ভুর নিয়ে দিবি পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

‘এখানে এসেছিল যে ? বারণ করি নি ?’

কথা কানেও তুলছে না স্ববীর। একটা খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কী লিখছে তো লিখছেই। তার মাথা ধরে নেড়ে দিয়ে স্বকাস্ত বললে, ‘এ তোর টেবিলচেয়ার ?’

‘আমার টেবিলচেয়ারও তো এই ঘরে ছিল। কে এক নতুন লোক এসে সব ওলটপালট করে দিল।’

‘মুখ সামলে কথা বল বলছি।’ স্ববীরের মাথায় গাঁট্টা মারল স্বকাস্ত : ‘যা এ ঘর থেকে।’

মুখ তুলে স্ববীর বললে, ‘আমাকে কোথাও পড়তে হবে তো ?’

‘যে ঘরে তোর শোবার জায়গা হয়েছে, সেই মার ঘরে পড়বি। ওঠ, ওঠ বলছি শিগগির—’

‘মার ঘরে টেবিলচেয়ার কেলবার জায়গা নেই।’ আবার লেখায় মন দিল স্ববীর।

‘জায়গা নেই তো মাটিতে বসে পড়বি।’

‘তুমি পড়ো গে।’

আর কথা নেই, স্বকাস্ত স্ববীরের মাথায় প্রচণ্ড চাপ মেরে বসল। এক হাত ধরে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল বাইরে। শেষ পর্যন্ত আরেক হাতে স্ববীর তার বইখাতাগুলো গুটিয়ে নিতে যাচ্ছিল, হেঁচকা টানে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে।

‘মুখের উপর কথা ! পাজি, অবাধ্য ছেলে !’

‘মার ঘরে পড়তে গেলে ছোড়দি চোঁচিয়ে ওঠে।’ কান্নাভরা গলায় ফুলে-ফুলে উঠল স্ববীর : ‘বলে চোঁচিয়ে পড়লে তার ডিস্টার্ব হয়।’

‘আহা, কী না মেয়ের পড়া, তার আবার ডিস্টার্ব !’

‘কেন, মেয়ের পড়া বুঝি পড়া নয় ?’ যে প্রতিপক্ষ সেই ছোড়দির হয়েই কথা বললে স্ববীর : ‘কেন, ছোড়দির বুঝি আর বি-এ এম-এ হতে নেই ? যত পাশ তুমি ঐ একজনকেই দেখেছ ?’

আরেক পশলা চড় মারল স্ববীরের উপর। স্বকাস্ত বললে, ‘যা, দাদার ঘরে যা না।’

‘দাদার ঘরের বিছানাই এখনো তোলা হয় নি। মশারির নিচে ঝণ্টু-সেন্টু ঘুচ্ছে—’

‘তবে নিচে যা, গোপ্পায় যা—’

‘তুমি যেমন গিয়েছ।’

এমন সময় মুণালিনী এল। বললে, ‘নিচে কাকার ঘরে পড়বি। সেখানে অনেক জায়গা। কোণের দিকে দিবা তোর টেবিল পড়বে।’

মা যে তার দিকে, অর্থাৎ স্বকাস্তের ঘরেই যে স্ববীরকে পাঠাচ্ছেন না আশঙ্ক হল স্বকাস্ত। দীপ্ত স্বরে বললে, ‘হ্যাঁ, সেই ভালো। সকলকেই একটু-আধটু ত্যাগ না করলে চলবে কেন?’

অতএব বইখাতা কুড়িয়ে নিয়ে স্ববীর নিচেই নেমে চললে। আর সে নির্বিবাদ প্রবেশ পায় তা দেখবার জন্তে পিছু নিল স্বকাস্ত। অদূরে মুণালিনী।

সিঁড়ির উপর থেকে মুণালিনী বললে, ‘হ্যাঁ, ঐ ঘরটাই সবচেয়ে ফাঁকা। ছেলেলির ঝামেলা নেই, নেই পড়াশোনার গোলমাল। তা একজনের পড়া তো শুধু নভেল পড়া, মাগাজিন পড়া। তার ক্লাশ তো আসলে ছপুর্য়ে গড়ানোর আগে। এখন কি! মর্নিং ক্লাশের জন্তে ঘর তাই খালি পেতে পারে স্ববীর।’

বাহিনী নিচে এসে পৌছুবার আগেই মুখের উপর ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দিল বিজয়া।

১৯

স্বকাস্ত যে স্ববীরকে মারল নিচে থেকে দৃশ্টা দেখে নি কাকলি। তবু বেশ ভেবে নিতে পারছে তার মুখের চেহারা কিরকম আরেকরকম হয়ে গিয়েছিল। যে-রকমটি কোনোদিন সে দেখে নি, হয়তো বা কল্পনাও করে নি। হয়তো চোয়ালের হাড় বেকে গিয়েছিল শক্ত হয়ে, দাঁতের উপর বসেছিল এসে দাঁত আর চোখের তারা দুটোও স্বস্থানে স্থির ছিল না। ভাগ্যিস দেখে নি লে মুখ। যেন না হয় দেখতে।

আহা! নিজেকেই নিজে আবার শাসন করল কাকলি। একটা আস্ত, জ্যাস্ত পুরুষমানুষ সময়বিশেষে ক্রুদ্ধ হবে না? সব সময়ই প্রশান্ত-প্রসন্ন হয়ে থাকবে? মাঝে-মাঝে থেপে উঠবে না, জ্বলে উঠবে না? না, না, রাগ চাই বৈকি। যে পুরুষে রাগ নেই সে পুরুষে স্বাদও নেই। কামার্ত মুখ যদি সুন্দর, ক্রুদ্ধ মুখও সুন্দর।

কিন্তু, তাই বলে, ছেলোটাকে মারলে কেন নির্মমের মত ? ও পড়বে কোথায় ? এতদিন ঐ ঘরেই তো পড়ে এসেছে, পরিচিত পরিবেশে। আজ যদি ওকে উৎখাত করে দিয়ে থাকো, ওকে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবে তো ! তা নয়, উলটে অর্ধচন্দ্র। কেন, বাপু-বাছা লক্ষ্মী-সোনা বলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পাঠানো যেত না অগ্রত ? স্বার্থের কাছে হৃদয় নেই, তাই বলে সত্যের কাছেও কি বিচার নেই ?

তা ছাড়া, উৎখাত তো রাত্রে। দিনের বেলায়, সকালবেলায়, পড়তে দিতে আপত্তি কী ! টেবিলচেয়ারে এখুনি কী দরকার স্বকাস্তর ! কতক্ষণ পরেই তো বেরিয়ে যাবে টিউশানিতে। ও, হ্যাঁ, সম্ভাহে তিন দিন সকাল, আজকে বুঝি অফ—ছুটি। তা, বেশ তো, আজ সকালে স্বকাস্ত থাকলই না হয় বাড়ি, স্ববীরেরও বা কতক্ষণের জন্তে পড়া ! এক ঘণ্টা ? দু ঘণ্টা ? এই দু ঘণ্টা ঘর ফাঁকা না রাখতে পেলো কী এমন চণ্ডী অন্তর্দ্বন্দ্ব হত ! ছি ছি, কিরকম বলছিল মায়ের কাছে : ‘নতুন বিয়ে হয়েছে, বউয়ের একটা প্রাইভেসি থাকবে না ?’ ছি ছি, কী প্রসঙ্গে কেমন কথা ! ঘরের দরজায় মোটা করে পর্দা ঝুলিয়েছে স্বকাস্ত, তা বেশ করেছে, কিন্তু সকালে-বিকালে কখনো সে পর্দা গুটোনো যাবে না, অর্ধায়িত শীর্ণায়িত করা যাবে না, এ কী অত্যাচার ! ঘুম থেকে উঠে বেলা না বাড়তে এখুনিই আবার প্রাইভেসি কী ! স্বকাস্ত বোধ হয় ভেবেছে রান্নাঘরে খানিকক্ষণ থেকেই ঘরে আসবে কাকলি, অনভাস্ত শরীরকে আরাম দেবার জন্তে, আর সেই শৈথিল্যের স্রোগে স্বকাস্তও একটু অসাবধান হবে। পারে তো বারে-বারেই হবে। স্বকাস্ত যেন কী ! মুখে গম্ভীর থাকলেও মনে-মনে না হেসে পারল না কাকলি। অবোলা শিশুর যেমন হয়, ওরও যেন তেমনি। ও-ও যেন একটা রঙিন ঝুমঝুমি পেয়েছে। কখনো দেখবে, কখনো ধরবে, কখনো বাজাবে। কিন্তু ঝুমঝুমিও চালাক হতে জানে হাতের থেকে আলগোছে দূরে সরে থেকে। ও দু ঘণ্টা কাকলি ককখনো যেত না উপরে, থাকত নিশ্চয়ই সংসারের কাছে-কাছে। এটা পাচ্ছি না, ওটা কোথায় গেল, স্বকাস্তের শত হাঁকাহাঁকিতেও কান পাতত না।

‘কাকিমা, দরজা খুলে দাও, আমি পড়ব।’ স্ববীর ঘন-ঘন ধাক্কা দিতে লাগল দুয়ারে।

যদিও কথাটা মায়ের, মৃণালিনীর শেখানো, তবু স্ববীরের দিক থেকে তার ব্যবহারের যা হোক একটা সমর্থন ছিল। সে তার কাকিমার কাছে করতে পারে, তাই অনুন্নয়ন করছে, আবদার করছে, আত্মখুঁটেপনা করছে। তার কাকিমা বুঝবে তার মিনতি রাখবে কিনা, খুলবে কিনা দরজা। কিন্তু তুমি স্বকাস্ত, তুমি কোন

ভিত্তিতে হুম-দাম কিল মারো। কী যুক্তিতে বলো চোঁচিয়ে, 'ভালো চান তো খুলুন দরজা, বেরিয়ে আসুন, নইলে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যান—'

ছি ছি ছি! রাগাঘরের দরজা দিয়ে সব দেখা যাচ্ছে। বসে ভালো উপভোগ হচ্ছে না বলে উঠে দাঁড়াল বন্দনা। ভয়ে-ভয়ে তার গা ঘেঁষে কাকলি।

পিছনে শক্তি দিচ্ছে যুগালিনী। তা হোক, কিন্তু যদি একবার এখন এদিকে চোখ ফেলত সুকান্ত, তাকে শতকটাক্ষে কণ্টকিত করে নিবেদন করত, নির্বিঘ্ননির্জীব করে দিত। এত বড় কাকা, তার সম্পর্কে কিনা এই মনোভাব! আর যে কিনা তোমার জন্তে এত করল, এত হট্টগোল, এত স্বস্ত্যয়ন। একবার ইচ্ছে হল হাত ধরে জোরে টেনে নিয়ে আসে সুকান্তকে। কিন্তু শাস্ত্রির সামনে এই হঠকারিতা নতুন বউকে মানাবে না, শাস্ত্রির প্ররোচনার বিরুদ্ধে এই আচরণ স্পষ্ট নিরস্বীকরণের মত দেখাবে, তাই ভেবে নিরস্ত থাকল। রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রইল নিম্পলক।

'কী গোঁয়ার! কী গোঁয়ার!' বলে উঠল বন্দনা। 'এখুনি তার দেখেছ কী?'

বন্ধ দরজা যে খুলছে না, ঈশ্বর করুন, এখন অন্তত এইটুকু তো দেখি। চোখ বুজল কাকলি।

'বাড়ির একটা ছেলে পড়ার জন্তে জায়গা পাচ্ছে না, আর এঁরা, এঁদের একটাও বাচ্চাকাচ্চা নেই, দিবা একটা আস্ত ঘর দখল করে বসে আছেন!' আশ্চর্য, বলতে পারল সুকান্ত। এতেই খামল না, আরো একটু যোগ করল: 'বলি নিজেদের একটা থাকলে কী করতেন? ঘরের কোণে পড়ার জায়গা করে দিতেন না?' বলেই আরো কটা করাঘাত।

হেমেনের মতে ঘুমুনো একটা পরিশ্রমের ব্যাপার, এবং ঘুম ভাঙার পর এই যে আরো খানিকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা, এটা হচ্ছে ঘুমোনোর ক্লাস্তি দূর করার জন্তে বিশ্রাম। সেই বিশ্রামে বুঝি ছেদ পড়ল। জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিজয়ার দিকে।

'কি, এখনো উঠবে না?' উড়ন তুবড়ির মত হলকা ছোটাল বিজয়া: 'পড়ে-পড়ে অপমান সহাবে?'

'তোমাকে বলেছি না অপমান ভাবলে যন্ত্রণা, পাগলামি ভাবলে মহাশাস্তি।' পাশ ফিরল হেমেন: 'দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। স্তব্ধতাই প্রচণ্ড উত্তর। আর বন্ধ দরজার উত্তর প্রচণ্ডতর।'

'যে অকর্মণ্য কাপুরুষ সে তো এ কথা বলবেই।' দরজা বন্ধ করলে কি হয় জিভ বন্ধ করতে পারছে না বিজয়া: 'তোমাকে এত সব কঠিন কথা বলছে আর তুমি বাইরে মুখোমুখি একটাও প্রতিবাদ করবে না?'

‘প্রতিবাদ ? বাইরে বেরিয়ে অবাচীনটার মুখে সটান এক চড় বসিয়ে দিতে পারি।’

‘পারো ?’ উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

‘গায়ের জোরে পারি। সম্পর্কের জোরে পারি।’ স্বস্তিতে হাই তুলল হেমন :
‘কিন্তু স্বকূকে মারতে গেলেই, আর তো কিছু নয়, বউটার অপমান।’

‘আহাহা, কী আমার দরদের দোকানদার !’

‘আচ্ছা, তুমিই বলো না, নতুন বউ এসেছে সংসারে, এরই মধ্যে তার সামনে একটা
শুভ-নিশুভ ঘটে গেলে কী ভাববে বলো তো ! কারু প্রতি তার আর শ্রদ্ধা-ভক্তি
থাকবে ?’

‘ত’র শ্রদ্ধাভক্তির জন্তেই দেখছি বেশি ভাবনা। নিজের স্ত্রীর শ্রদ্ধাভক্তি—’

‘সে তো কবেই খুঁয়েছি। তার জন্তে আর ভাবি না। নতুন একজন যে এসেছে
সংসারে, স্বন্দরকে দেখতে ভদ্রকে দেখতে, তারই কাছে এক নিমেষে সবাই দেউলে
হয়ে যাই কেন ?’ মাথার বালিশটাকে বুকের নিচে টেনে এনে হেমন বিশ্রামে আয়ো
প্রসারিত হল : ‘কথায় বলে, বলীর ঘাম, নির্বলীর ঘুম। ভুল বলে। আমি বলি
নির্বলীর ঘাম, বলবানের ঘুম।’

‘শুভ হয়ে বসে রইল বিজয়া।

‘কে, কে পড়বে ? কার পড়ার জায়গা হয় না ?’ বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে
এল ভূপেনবাবু। স্ববীরকে লক্ষ্য করে বললে, ‘নিয়ে আয় তোর বই, ইংরিজি
আর বাঙলা, দেখি কেমন পড়েছিস, কেমন তোর পড়ার জায়গা দরকার।’

স্ববীর শুকনো মুখে মার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল আর স্বকাস্ত নিশ্চুপের মত উপরে
উঠতে-উঠতে দাঁড়াল সিঁড়ির উপর।

‘আহা, কী চমৎকার ওকালতি !’ মুণালিনী টটকিরি দিয়ে উঠল : ‘পড়ার ঘর
নিশা কথা হচ্ছে আর উনি এলেন পড়ার বই নিয়ে কথা কইতে ! জায়গা নেই তো
পড়া তৈরির কথা ওঠে কী করে ? এমনিধারা উকিল হওয়ার জন্তেই তো এই দশা।’

‘অ্যান্ডিন পড়ছিল কোথায় ?’ শূন্ত চোখে তাকাল ভূপেন।

‘জ্বাকা ! জানে না কিছু। কেন, উপরের কোণে ছোট ঘরটাতে—দু ভাই
যেটাতে ছিল একসঙ্গে।’

‘বা, সেইখানে পড়লেই তো হয়।’

‘সেইখানে পড়লেই তো হয় ? গা জলে যায় কথা শুনে।’ মুণালিনীর মুখে
মমতার রেখামাত্র নেই : ‘বাড়িতে নতুন বউ এসেছে না ?’

‘এলেই বা। তাই বলে ঘর তো আর উড়ে যায় নি।’

‘কী বুদ্ধি! কী বিস্তে! এই না হলে আণ্ড’মেন্ট!’ বাঁকা মুখ আর সিধে হচ্ছে না মৃণালিনীর : ‘বলি নতুন বউ সংসারে একটা আলাদা ঘর পাবে না?’

‘আলাদা ঘর!’ এতেও যেন বিশ্বয় ভূপেনের।

‘সাধে কী আর মক্কেল ছেড়েছে! বাহান্তর না হতেই ধরেছে ভীমরতি। বিবাহিত ছেলে-বউয়ের যে একত্রে একটা আলাদা ঘর দরকার সেটুকুও খেলে না বুদ্ধিতে?’

‘খেলে। সেটুকু খেলে।’ মাথায় একবার হাত বুলাল ভূপেন। বললে, ‘কিন্তু আমি ভাবছি শাস্ত্রে যে স্ত্রীকে দারা বলেছে ঠিকই বলেছে। ভায়ে-ভায়ে দীর্ঘ না করে তার শাস্তি নেই।’

‘আর সোয়ামীকে কী বলেছে?’

কিছু বলেছে নাকি? অতটা শাস্ত্রজ্ঞান হয় নি এমনি নির্লিপ্ত মুখ করল ভূপেন।

‘মেড়া বলেছে। মাকালের ঢিপি। অকর্মণ্য।’

তা বলেছে হয়তো। নীরবে সায় দিল ভূপেন।

‘বড়-সড় দেখে একটা বাড়ি করতে পারে না, ছেলে-মেয়েকে পড়বার জন্তে ঘর দিতে পারে না, তার আবার বড়কট্টাই! আগন্তুক নতুন বউ, তার দোষ ধরতে এসেছে! লজ্জা নেই একটুও?’ মাঝবের নয়, কেউটের জিত মুখে ধরেছে মৃণালিনী।

হাত বাড়িয়ে ভূপেন ধরল স্ববীরকে। বললে, ‘আমার বৈঠকখানায় বসে পড়বি।’

ভয়-ভয় লাগছে তবু নাকে কেঁদে উঠল স্ববীর। বললে, ‘ও ঘরে সব লোকজন আসবে, সারাক্ষণ আজ-বাজে কথা কইবে, একটুও মন বসবে না পড়তে।’

ভূপেনের ইচ্ছে হল বাগিয়ে একটা চড় কষায় স্ববীরের উপর। কিন্তু না, প্রেসার বাড়তে দিয়ে লাভ নেই। তা ছাড়া, মৃণালিনী বুঝতে পারবে সহজেই, এ চড়ের লক্ষ্য স্ববীর নয়, আর কেউ। তুমুল গুরু হয়ে যাবে। স্ততরাং চেপে যাওয়াই সমীচীন। হাত ছেড়ে দিল ভূপেন। বললে, ‘না, একটুও গোলমাল নেই বৈঠকখানায়। তোর মা বলে, আমার ধড়ে আক্কেল নেই, ঘরে মক্কেল নেই। তাই বেশ পড়তে পারবি নিরিবিলিতে। যা, বই নিয়ে আয়।’

তবু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না স্ববীর। বললে, ‘কখন কে কী পরামর্শ নিতে আসবে, গুরু হবে ক্যাচকেঁচি—’

‘যা, নিয়ে আয় বই।’ গর্জে উঠল মৃণালিনী : ‘বৈঠকখানাতেই পড়বি এখন থেকে। আর, শোন, খবরদার, ছোড়দার ঘরে কথখনো গোলমাল করতে ঢুকতে পাবি না। মনে থাকে যেন।’

নাকে কাঁদতে-কাঁদতে স্ববীর বৈঠকখানায় প্রবেশ করল।

স্বকাস্ত-কাকলির ঘর মাঝে-মাঝে মৃণালিনী নিজেই গুছিয়ে দিয়ে আসে। কীভাবে কোন জিনিস রাখলে না-রাখলে এই ঘরের মধ্যেও একটু বেশি অবকাশ আসবে তারই হিসেব করে। এ ঘরটাতে আলো যদিও বা আসে হাওয়া যে ঢোকে না, এ সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান হতে ছটফট করে বেড়ায়। জানলার ওপারে ঐ যে একটা নিমগাছ ভালপালা মেলে রয়েছে—হলই বা না শুভ গাছ—কাটিয়ে-ছাঁটিয়ে দিয়েছে। এইবার দেখ কেমন আরো শাদা হয়েছে ঘর। কেমন আরো ফাঁকা হয়েছে আকাশ। আলোর পথ ধরে হাওয়া বা কোন-না একটু আসবে এখন অলক্ষ্যে। রেন-পাইপ ধরে এখন এই মালতীর লতাটা তুলে দিই না জানলার দিকে। বেশ হবে। বেশ মানাবে।

সংসারের হাওয়া এখন উস্তাল কাকলির দিকে। কাকলি প্রমাণ করে দিয়েছে, যে অকথা রটেছিল তার সম্পর্কে তা নিতান্ত নিরর্থক। সে বয়ে-হাওয়া ঢিলে-আলগা মেয়ে নয়। আর স্বকাস্তও নয় কিছু অপরিচ্ছন্ন। না বা অসহিষ্ণু।

মূল্যমানের পারা খুব উচুতে উঠে গিয়েছে দু-জনের।

মৃণালিনীর যত রাগ বন্দনার উপর। ‘বলেছিলে কেমন বৃক্ষ ফলই তা ভালো কইবে। কই, কওয়াও এবার। বৃক্ষ থেকে পেড়ে আনো ফল!’ দাঁতে-দাঁতে কিড়মিড় করে উঠল মৃণালিনী।

‘ওমা, আমি আবার কখন ওসব বললাম?’ বন্দনা ফৌস করে উঠল।

‘কখন বললে! তখন সকলের কত গুজগাজ, কত ফিসফাস। আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে কত লুকিয়ে-লুকিয়ে হাসা। টেরিয়ে-টেরিয়ে তাকানো! যত ছোট মনের ছোট কথা। উনিও কম যান না।’ বিজয়ার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করল মৃণালিনী : ‘কেমন বৃক্ষের ফল তোমরা তা আর বলে কাজ নেই।’

‘বা, আমি তো বরাবর উলটো কথা বলেছি।’ বিজয়া বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

‘উলটো কথা বলেছ? এখন সাধু সাজছ সকলে। বলো নি, আপনার কীর্তমান ছেলে, কত বড় কীর্তি রাখল ভারতে—বলো নি?’

‘সে তো ভালো অর্থে বলেছি।’

‘ভালো অর্থে বলেছ! এখন কালো অর্থ হয় নি কিনা তাই ভালো অর্থ।’

‘মোটোও তা নয়। আমরা বয়ঃ বলেছি, স্বকু এক বেকার ছেলে—’

‘বেকার ছেলে!’ ঝলসে উঠল মৃণালিনী।

‘না, ভুল হয়েছে। টিউশানি-করা ছেলে। হরে-দরে সে একই কথা।

সেই স্বকু কেমন দিবি এক বড়লোকের এম-এ পাশ মেয়ে সজ্জানে বিয়ে করে আনল।’

‘হ্যা, এম-এ পাশ।’ লকলক করে উঠল মৃণালিনী : ‘তোমাদের মত কোনো-রকমে মুখস্থ-করে-ইস্কুল-সারা মেয়ে নয়।’

‘তবেই বুঝুন কত প্রশংসা করেছে। বরং বলেছি, আমার পিল, আমার যেমন করে খুশি তেমনি করে খাব। গুলে খাই কি গিলে খাই, চুষে না চিবিয়ে—তাতে কার কী মাথাব্যথা!’

বিজয়া-বন্দনা এখন এক দিকে, তাই তাক বুঝে বন্দনা টিপ্পনী ঝাড়ল : ‘আর ঢোক গিলতে গলায় যদি আটকায় তো আমার আটকাবে!’

‘তবে যে বলছিলে জেলে যাবার কথা, কোমরে দড়ি পরাবার কথা’—মৃণালিনী আবার বন্দনার উপর উত্তত হল।

‘সেসব প্রশান্ত বলেছে।’ গস্তীরমুখে বিজয়া বললে।

‘প্রশান্ত বলেছে!’ তবু সমস্ত দোষ বন্দনার এমনিভাবে বন্দনার দিকেই আক্রোশে তাকিয়ে রইল মৃণালিনী। বললে, ‘ভাই হয়ে ভাইকে জেলে পাঠাতে পারলেই খুশি।’

‘তবেই বুঝুন’, যেন একটা তুরুপের তাস তক্ষুনি হাতে পেল বন্দনা, ঝলসে উঠল : ‘তবেই বুঝুন, কেমন বুকের কেমন ফল।’

এ একেবারে মৃণালিনীকেই ছুঁড়ে মারা। প্রশান্ত ক্ষুদ্রাত্মা কেন? যেহেতু মৃণালিনী ক্ষুদ্রাত্মা।

‘মুখ সামলে কথা বলতে শেখো বড় বউ।’ মৃণালিনী চোঁচিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা আর বেশি গড়াতে দিল না বিজয়া। বন্দনা আর সে এখন এক দল, এক পাটি, তাই বন্দনাকে অনায়াসে নিয়ে এল নিজের ঘরে। আর, সমস্ত কলহের মীমাংসা, দরজাটা বন্ধ করে দিল।

মৃণালিনীর ইচ্ছে হল ঘর দুটো এখুনি বদলাবদলি করে দেয়। প্রশান্তদের বড় ঘরটা স্বকান্তদের দিয়ে স্বকান্তদের ছোট ঘরটাতে প্রশান্তদের পুরে রাখে। মাথা নিশ্চয়ই ঠিক নেই, মৃণালিনী সেই মতলবেই উঠল উপরে। ঠাট করে বন্দনা এখন বিজয়ার শামিল হয়েছে, এই স্বযোগেই নয়-ছয় করে ফেলবে। দুপুরবেলা, ধারে-পারে কেউ নেই, অস্তত বন্দনা এখন ঠাইনাড়া—এই তো সোনার স্বযোগ।

বন্দনার ঘরে ঢুকতেই মৃণালিনীর বুকের ভিতরটা ছ্যাং করে উঠল। কী আশ্চর্য, ক্রোধের ক্ষণকালের চূড়ায় উঠে ঝণ্টু-সেণ্টুকে সে আর দেখতেই পায় নি। একেবারে মুছে দিয়েছিল মন থেকে।

। দেখল, আজ বুঝি ঝণ্টুর স্থলের ছুটি, ঝণ্টু পড়ে-পড়ে ঘুমুচ্ছে মেঝের উপর। যা গরম, বিছানা ছেড়ে মেঝেকে সম্বল করেছে। কিন্তু সেন্টু, সেন্টু কোথায়?

পাশের ঘরে, কাকলির ঘরে, দু' আঙুল পর্দা সরিয়ে উঁকি মারল ঝণালিনী। স্বকাস্ত কলেজে নয় লাইব্রেরিতে গেছে। খাটে পাতা বেডকভারের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি, নিরীহ ছোট্টটি হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার বাহর কাছে তালগোল পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে সেন্টু। কদিনেই কেমন আপন হয়ে গেছে ছেলেটা। কিছুতেই ছাড়বে না বুকের আঁচল। মার জন্তে অপেক্ষা না করে কাকিমার গায়ের গরমেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোমরের কাছে ছোট্ট এক টুকরো জাডিয়া ছাড়া আগাগোড়া উলঙ্গ সেন্টু, কিন্তু অব্যাহত আবৃত কাকলি। এত গরমেও, দুপূরের নিভৃত সন্ধ্যাও, বেশেবাসে একটুকু লগ্নতা নেই। ঘামে ভিজ্ঞে গেছে তবু কেমন ঘুমুচ্ছে দেখ না। হাত-পাখা করছিল, সেটা হাতের মুঠি থেকে শিথিল হয়ে থসে রয়েছে এক পাশে। কেমন দুঃখী-দুঃখী দেখাচ্ছে মেয়েটাকে। কিন্তু, যাই দেখাক, অস্তরে তৃপ্তি না থাকলে বাইরের এত সব ক্লেশ-কষ্ট উপেক্ষা করে পারে কেউ ঘুমুতে? তবু, বাবা-মা বর্জন করল, একবার ডাকল না, নিয়ে গেল না বাড়ি, ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন কেউ একবার দেখা করতে এল না—এতে মন বুঝি কারু ভালো থাকে? একটা কান্না-কান্না ভাব সব সময়েই বুঝি চোখে-মুখে লেগে থাকে না? তবু সব সময়ে হাসছে মেয়েটা, কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে বালতি-ঝাঁটা নিয়ে রান্নাঘর খোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজে হাত দিচ্ছে অম্মানে। তার অপরাধের মধ্যে তো এই যে, সে এমন পাত্র বেছেছে যে ওদের বাপের বাড়ির মতে হরিজন। কেন, স্বহু এমন কী অপাণ্ড্যন্ত্য? পাকাপাকি না হোক, দু' শো টাকার একটা স্কলারশিপ তো পাচ্ছে। তারপর রিসার্চের খাতিরে তার টিউশানির বাজারও না কোন তেজী হবে আজকাল। শাঁসালো তো একটা জুটিয়েওছে এরই মধ্যে। একটা গাড়ি-বাড়ি হাঁকড়ানো বিলিতি কেতার অফিসার না হতে পারলে বুঝি আর মানুষ বলে গণ্য হবে না? ওদের সমাজ না পাকক, কাকলি যে তার ছেলের মর্যাদা বুকেছে, তাকে দিয়েছে সবচেয়ে উঁচু দাম—তার জন্তে মায়াম ভরে গেল ঝণালিনী।

আন্তে-আন্তে ঘরে ঢুক পাখাখানা কুড়িয়ে নিল আলগোছে। পাশে দাঁড়িয়ে মুহু-মুহ একটু পাখা করলে দু-জনকে। আহা, বড় ভালো মেয়ে, আরো একটু ঘুমুক। কিন্তু, কে জানে, হাওয়া পেয়ে ঘুম না ভেঙে যায় অকালে। পাখা আবার নামিয়ে রেখে আন্তে-আন্তে চলে গেল ঝণালিনী।

না, ঝণ্টু-সেন্টুকে এ ঘরে ঠেলা যাবে না, তবে যেমন বোঝা যাচ্ছে, বিজয়ারাই

চলে যাবে বাড়ি ছেড়ে। এ ক্ল্যাট না ও ক্ল্যাট, বাছাবাছি করতে প্রায়ই ওরা বেরুচ্ছে এক সঙ্গে। একেবারে বেরিয়ে যায়, আর না ফেরে, শাস্তি হয় সংসারে। আহা, বড় ঘরে কাকলি-স্বকান্ত একটু থাকতে পারে হেসে-খেলে, ফেলাছড়া করে। পাশের বাড়ির দেয়াল পড়ে না বলে কেমন আপনা থেকেই হাওয়া আসে জানলা দিয়ে। আহা, দম্ভ-ভঙ্গ মেয়েটার একটু গা জুড়োবে, দু দণ্ড বসে একটু বা করতে পারবে পড়াশুনো। কী এমন অসুবিধে হবে যদি হেমনের টাকাটা মাস-মাস না আসে? স্বকান্তই তা পূরণ করে দিতে পারবে। আর, স্বকান্ত কি একা? তার সহায়-সঙ্গী নেই? কাকলি নেই?

কিরে এসে ঘরে ঢুকেই গায়ের জামাটা খুলে ফেলল স্বকান্ত। ‘আমার আর ভয় কী!’ বলে গেক্টিটাও উৎখাত করল সবলে।

‘বোসো। হাওয়া করি।’ হাত-পাখাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললে কাকলি।

‘পাখা তো আমি করব। এবং তোমাকে।’ পাখাটা কেড়ে নিল স্বকান্ত। বললে, ‘তুমি আমার মত এমন বিদ্রোহী হতে পারো না?’

‘বিদ্রোহী?’

‘হ্যাঁ, আমার মত এমনি আদিম-অকৃত্রিম।’ কাকলিকে লক্ষ্য করে জোরে হাওয়া করতে লাগল স্বকান্ত : ‘এমনি নির্ভার-নিশ্চিত।’

‘পাগল না মাথাখারাপ!’ হাওয়ার ঢেউয়ের বাইরে চলে গেল কাকলি।

‘এমন লোহাগলানো গরম, অথচ সাধা নেই নিরঙ্কুশ হও। একটা পার্শ্বচুম্বক হ্যাণ্ডিক্যাপ থেকে ভুগছ। তোমরা আবার পুরুষের সমান হবে।’ কক্ণায় উদ্বেল শোনাল স্বকান্তকে : ‘এমন যে বিধাতার হাওয়া তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত রইলে চিরদিন। গা ভরে স্নান-পান কিছুই করতে পারলে না। একটা ছাত্রজীবন শাসন-বসনের নাগপাশে আটপেট্টে বাঁধা রইলে। উঃ, কী ভয়ানক! এখন তো আর সেই ছাত্রজীবন নেই, এখন তো পণ্ডিতজীবন—এখন আর তবে ভয় কী!’

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে কাকলি বললে, ‘বোধ হয় বৃষ্টি আসবে।’

‘ছাই আসবে! তুমি যে এই মাঠফাটা গরমেও ধোপার পিঠের আস্ত একটা বস্তা হয়ে থাকবে এ আর আমার সছ হয় না। তোমার কাপড়ের গরম আমাকে ইঁপিয়ে মারে। কেন, হালকা হতে পারো না?’

‘চলো, আজ সন্ধ্যায় একটু কোথায় ঘুরে আসি।’

‘তা চলো। কিন্তু বাইরেটা তো ভীষণ সত্য, ভীষণ সাধু। কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আমি আর তুমি, স্বামী-স্ত্রী, ধারে-কাছে কেউ নেই—’

‘আমরাই বা পরস্পরের কাছে কম সভ্য আর সাধু নাকি ?’

‘রাখো। আমরা পরস্পরের কাছে নিঃস্ব, অনাবৃত। তবে কিসের তোমার কুসংস্কার ?’ স্বকাস্ত উঠে কাকলিকে ধরতে গেল।

কাকলি হট করে সরে এল দরজার কাছে। বললে, ‘সব কিছুই একটা প্রস্তাব আছে, প্রসঙ্গ আছে। ক্ষেত্র-পাত্র আছে।’

‘আছেই তো।’

‘যদি এই গ্রীষ্ম সম্পর্কে কিছু থেকে থাকে, তা হলে আর কিছু নয়, একটা শুধু ইলেকট্রিক ফ্যান কিনে আনো।’ কাকলি ঘর থেকে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বললে, ‘দাঁড়াও, আমি গা-টা ধুয়ে আসি। পরে দু-জনে বেকব একসঙ্গে। সেই আমাদের ময়দান, নয়তো সেই ভিক্টোরিয়া স্কোয়ার। সেই রুঁনরুঁন রিক্শা। এখন আর রিক্শাতে চড়তে ভয় নেই।’

কাকলি চলে গেল বাথরুমে। অটেল জলে স্নান করতে লাগল।

বাথরুমটা এত বড় নয় যে, সেইখানে বসেই পরিপাটি সাজগোজ করবে। তাই স্নানান্তে শাড়ি-সেমিজের একটা এলোমেলো হিজিবিজি হয়ে নিজের ঘরের দিকেই ছুট দিল কাকলি।

ঘরে গিয়ে দেখল স্বকাস্ত বসে আছে চুপ করে। পাথা নাড়ছে।

‘দয়া করে একটু বাইরে যাও’, মিনতির স্বরে বললে কাকলি, ‘আমি ঠিকঠাক হয়ে নিই।’

‘আমি কোথায় যাব !’

‘বা, তা কী জানি ! বারান্দায় যাও, নয়তো ছাদে যাও। নয়তো বাথরুমে গিয়েই ঢোকো।’

নড়ল না স্বকাস্ত। বললে, ‘আমার যাবার জায়গা নেই।’

‘সে কী কথা ! ড্রেস করবার যখন আলোদা ঘর নেই, আমাকে এখন একটু একলা থাকতে দেবে তো ?’

‘আমার কাছে তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।’

‘এ সংকোচের কথা নয়, এ জ্বলিতার কথা।’ ঝলসে উঠল কাকলি : ‘ওঠো, সরো, এ কী অগ্নায়, আমাকে থানিকক্ষণ একলা থাকতে দাও।’

যেমন-কে-তেমন বসে রইল স্বকাস্ত। চোখ বুজে হাওয়া খেতে লাগল।

সেই একদৃশ্য বিশৃঙ্খল মধ্য থেকে কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘ছোটলোক !’

মাসিক কিস্তিতে একটা সিলিঙ ফ্যান কিনেছে স্বকাস্ত। শাদা পাখা মেলা একটা উড়ন্ত রাজহাঁস।

‘টাকা? টাকা কোথেকে দিলে?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘এবারের মতো মানেজ করেছি।’ এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে বললে স্বকাস্ত।

‘কী ভাবে করলে?’ কাকলির ইচ্ছে, কিছু না গোপন থাকে তার কাছে।
আয়ের বা আনন্দের কোথায় কী উৎস থাকতে পারে পুরুষের, সেটি তার রমণীর কাছে, রমণীয়ার কাছে, স্পষ্ট থাক, মুক্ত থাক। তার হিসেবের খাতার শাদা-কালো দুই পৃষ্ঠাই খেলা থাক তার চোখের সামনে।

কাকলির মনের ইচ্ছেটা বুঝে নিয়ে স্বকাস্ত বললে, ‘ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি।’

‘কেন, মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিলেই তো পারতে।’ হয়তো চায় নি, কিন্তু অজানতেই কাকলির গলায় ঝাঁজ এসে গেল।

কল্পণ করে তাকাল স্বকাস্ত। বললে, ‘হাতখরচের দুটো-চারটে টাকা হয়, সহজেই চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু যেখানে এক থোকে বেশ মোটা একটা টাকা, তখন কেমন বাধো-বাধো ঠেকে।’

‘বা, তোমার নিজের টাকাই তো চেয়ে নিচ্ছ।’ যদিও টাকার কথা, টাকা নিয়ে কথা, বলতে গেলেই কেমন একটু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শোনায, তবু না বলে পারল না কাকলি।
গলা না খাঁকরেই বললে, ‘বাহাদুরি করে রোজগারের সমস্ত টাকাটাই মার হাতে তুলে দেবার কী হয়েছিল!’

স্বকাস্ত হাসল। বললে, ‘সংসারের কাছে পপুলারিটি কেনবার ঐটেই প্রথম স্টান্ট।’

প্রত্যুত্তরে হাসল না কাকলি। বললে, ‘সংসার বলতে শুধু মা, বেচারী স্ত্রী নয়? স্ত্রীর কাছে আর পপুলার হবার দরকার নেই?’

মানে, একটু কি থমকাল স্বকাস্ত, কাকলিরও নিজের এক্সিক্লারে এক থোকে একটা টাকা চাই? স্বকাস্তের উপার্জনের এক অংশ, অধিকাংশ যদি সংসার বা মৃণালিনী গ্রাস

করে নেয়, আরেক অংশ, অস্ত্রত একটা ক্ষীণ অংশ, কাকলি রাখবে তার নিজের আয়ত্তে। সমস্ত টাকা সংসারের কাছে গচ্ছিত রেখে তার থেকে কালেভদ্রে ভিক্ষে চেয়ে নেওয়ার কোনো মানে নেই। শ্রী নেই সেই দীনতায়। বরং সে টাকা থাকবে কাকলির চাবির অধীনে, তার ক্ষয়-ব্যয়ের মধ্যে থাকবে একটা স্বাধীনতার সম্পদ। আর, স্বাধীনতার মত স্বাদ কী! মার কাছে ফিরতি টাকা চাইতে গেলেই যেন ব্যাখ্যার একটা বাধ্যতা থাকবে, কিন্তু কাকলির টাকায় নেই কোনো জবাবদিহির যন্ত্রণা। চলো আজ সিনেমায় যাই, সার্কাসে যাই, গঙ্গায় যাই হাওয়া খেতে, এ কি মার টাকায় বলা চলবে? কিংবা লাঞ্চ খেয়ে আসি হোটলে? বড় জোর বলা চলবে, চুল ছাঁটাই, জুতো সেলাই, ভাইং-ক্লিনিং, শালকর, ট্রাম-বাস, নব্বো তো স্ট্যাম্প-পোস্টকার্ড। যন্ত্রপাতি দূরের কথা, সামান্য গুরু-বিষয়ের কথাও বলা যাবে না। মার কাছের টাকায় স্থখ কই। স্বীর কাছের টাকায়ই স্থখ।

বুকেও গভীরে গেল না স্বকান্ত। তরলকণ্ঠে বললে, ‘তোমার কাছে আমি পপুলার— পপুলার কথাটা তো চলবে না, কেননা, অনেকগুলি তো শ্রী নেই—তোমার কাছে আমি প্রীজিং, প্রেমে।’

‘আর আমরা প্রেমে নেই। অনেক নেমে এসেছি।’

‘অনেক নেমে এসেছি? বলো কি?’ অবাক হবার মুখ করল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, আমরা এখন চলে এসেছি উদরে। স্থূল করে বলতে পারো, পেটে। আর শুকনো পেটে যদি ভগবান নেই, তা হলে প্রেমও নেই। স্থতরাং—’

‘স্থতরাং-এ দরকার নেই।’ আদর করবার জন্তে হাত বাড়াল স্বকান্ত। বললে, ‘বলো তোমার কী চাই? স্নো-পাউডার, তেল-সাবান— গ্র্যাপকিন?’

সরে গেল কাকলি। বললে, ‘নিজের হাতখরচের টাকার মধ্যে আমার এসব খচরা প্রয়োজন না-হয় ম্যানেজ করলে, কিন্তু আমার যদি হঠাৎ কোনো সময় এক থেকে একটা মোটা টাকার দরকার হয়—’

‘যথা, আচ্ছাদন? শাড়ি?’

‘শুধু শাড়ি কেন, কত কিছুই তো দরকার হতে পারে। শখ হতে পারে।’

‘যথা, আভরণ? কঙ্কণ-কিঙ্কিণী?’

‘নয়ই বা কেন? লজ্জা কিসের? অপরাধ কোথায়? তখন পাবে কোথায়? তখন কী বলবে?’

অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল স্বকান্ত। বললে, ‘বলব, ফিজিশিয়ান, ছিল দাইসেল্ফ।’

‘তার মানে?’ কর্কশ রেখায় ভুরু কুঁচকোল কাকলি।

‘তার মানে, বাঙলা করে বলব, হে সবলা, হে সক্ষমা, তুমিই তোমার মেধা-মজ্জা খাটিয়ে নিজের ব্যবস্থাটা নিজেই করে নাও।’

‘মানে, আমাকে চাকরি করতে বলবে?’ চোখ প্রায় গোল করল কাকলি : ‘মানে নিজে খেটে নিজের আচ্ছাদন-আভরণ সংগ্রহ করতে হবে? মশাইকে তবে বিয়ে করলুম কেন?’

‘ও, হ্যাঁ, বিয়ে করেছি।’ চিন্তাশ্রিতের মত চিবুকে হাত বুলোল স্বকান্ত : ‘মাঝে-মাঝে কিরকম জ্বল হয়ে যায়। মনে হয় যেন তেমনিই আছি দু-জনে।’

‘তেমনিই আছি! তেমনিই বেখেছ! আমার কপালে-মাথায় এ অকীর্তি কিসের? কার? সিঁদুর কি অহংকারের, না কি কলঙ্কের চিহ্ন?’

‘আহা, কলঙ্কই তো অহংকার।’

‘কাব্য করতে তো পয়সা লাগে না।’ মুখ বেকাল কাকলি : ‘কিন্তু এ কলঙ্কের শর্ত ছিল কী? কী শর্তে বিয়ে করেছি শ্রীমানকে? মনে নেই?’

‘আছে।’

‘কী?’

‘আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটব, চাকরি করব, আর তুমি পড়ে-পড়ে ঘুমোবে।’

‘হ্যাঁ, ঘুমব।’

‘আর, ঘুম যাতে ভালো হয়, যাতে গায়ে মাথায় ঘামতে না হয় তারই জন্তে ফ্যান কিনে এনেছি।’

‘আরো অনেক কিছুই হতে পারে কিনতে।’ শাদাসিঁধে গম্ভীর ভাবায় কাকলি বললে, ‘স্বতরাং সব টাকাই সংসারে গুঁজো না। রিসার্চের টাকাটা মাকে দাও, আর টিউশানির টাকাটা আমার হাতে রাখো।’

‘তাও তো মোটে এক শো। খরচ করতে চাইলে এক টিপ নশ্চি।’

‘আহা, তাই বা মন্দ কী! নেই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো।’

‘কিন্তু, তুমি তো চটবে, নইলে সবিনয়ে বলতাম, কানা-মামাকে কি স্বস্থ করা যায় না, দু-চোখো করা যায় না?’ ইজ্জিতটা কাকলি এখনো স্পষ্ট করে বুঝতে পারে নি বুঝে স্বকান্তর সাহস হল। বললে, ‘আমার এক হাতে চাল আরেক হাতে তলোয়ার, আমি লড়ি কিসে? তাই তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও, তুমিও যদি লড়ো—’

‘দেখ, আমাকে খেপিও না।’ আবার সেই পুরোনো কথা, বুঝতে পেরেছে

কাকলি। তাই আবার সে জলে উঠল। বললে, ‘আমাকে শাস্ত থাকতে দাও। বিবাহিত মেয়েদের সনাতন যে অধিকার, সংসারের খাটা-খাটনির পরে দুপুরবেলায় লম্বা ঘুমুনো, যা এ বাড়ির আর সবাই উপভোগ করছে, তাতে আমাকেও মশগুল হতে দাও। নইলে জ্বর চাকরিতে স্বামী সচ্ছল হবে এর মধ্যে স্বামীর আর যাই থাক, তেজ-বীর্ষ নেই। দয়া-মায়্যা তো নেই-ই।’

শুকনো রেথায় হাসল সুকান্ত। বললে, ‘এরকম করে দেখা আজকের দিনে আছে নাকি?’

‘সব সময়েই আছে।’ ধমকে উঠল কাকলি। ‘স্বামী আনবে, আর জ্বর বুনবে। উপার্জন করে টাকা আনবে স্বামী আর তাই দিয়ে সংসারে জ্বর আলপনা আঁকবে জ্বর। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার যা কথা—’ কাকলি বুঝি আবার ফণা তোলে!

‘আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। তুমি ফ্যানের হাওয়া খাও, আর অটেল ঘুমোও। আর আমি সারাদিন টো-টো করে ঘুরি।’

‘তাই তো ঘুরবে।’

‘আর জ্বর?’

‘সেও ঘুরবে বোঁ-বোঁ করে সংসারের ঘানিতে।’ হাসিমুখে সুকান্তের এক পা কাছে এল কাকলি। বললে, ‘শোনো। একটা সন্ত এম-এ পাশ ছেলে তিন শো টাকা কামাচ্ছে, এ দেখতে-শুনতে কিছু খারাপ নয়। সে যদি সংসারে দু শো টাকা দিয়ে এক শো টাকা নিজের জন্তে—’

‘নিজের জন্তে মানে?’

‘নিজের জন্তে মানে, তোমার আর আমার জন্তে।’ পুরোনো দিনের একটা কথার স্বর বুঝি বেথান্না হয়ে কানে লাগল। হাসির ঝাপটায় স্বচ্ছন্দে সেটা উড়িয়ে দিল কাকলি। বললে, ‘যদি এক শো টাকা নিজের জন্তে রাখা যায়—যুক্তিযুক্তই দেখাবে।’

‘তাই রাখব এবার থেকে।’ হেসে সায় দিল সুকান্ত।

কলেজ যাচ্ছে, মনিব্যাগ প্রায় খালি, হস্তদস্ত হয়ে যুগালিনীর কাছে হাত পাতল সুকান্ত। বললে, ‘মা, একটা টাকা দাও।’ তখুনি-তখুনি দিতে হল কৈফিয়ত : ‘বাস ভাড়া নেই।’

যুগালিনী বললে, ‘আমার হাত জোড়া, তোর কাকিমার কাছ থেকে চেয়ে নে গে।’

চকিতে কাকলির সঙ্গে চোখাচোখি হল স্বকাস্তর। কাকলির চোখ বললে, ‘বেশ হয়েছে। স্বপুত্রের মত সব টাকা মার জিন্মায় রাখো! আহা, স্বকাস্ত আমার কেমন হীরের টুকরো ছেলে। রোজগারের সমস্ত টাকা মার হাতে তুলে দেয়। বউয়ের আঁচলে গোঁজে না। বেশ, এখন ঠেলা সামলাও। কিছু টাকা স্বাধীনমত নিজের হাতে, মানে স্ত্রীর হাতে থাকলে, ঠেকতে হত না, দাঁড়াতে হত না কাকিমার কাছে। হলই বা না ধার, ক্ষণকালের ধার, তাই বা কে চায়। যে মানী, সে আপনজনের কাছেও হাত পাতে না।’

কাকলি নিচেই ছিল, স্বকাস্ত তাকে বললে মিনতির স্বরে, ‘তুমি গিয়ে চেয়ে আনো।’

‘আমি পারব না।’ স্বচ্ছন্দে বললে কাকলি। প্রায় ধর্ম-দেখার ভঙ্গিতে।

অস্ববিধেটা বুঝল মৃণালিনী। তাই নিজেই সে অন্তরঙ্গ স্বর খেলিয়ে ডাকল বিজয়াকে। বললে, ‘বিজয়া, স্বকুকে একটা টাকা দে তো।’ আমি মাছ ভাগ করছি, আমার হাত জোড়া, পরে গিয়ে তোকে দিয়ে দেব।’

বিজয়া, ডিমওয়ালার টাকাটা দিয়ে দে তো। সবাই খেতে বসেছে, পাঁচ খুরি দই আনা তো চাকরকে দিয়ে। জয়ন্তীর কী পেইন্টিং বন্ধ কিনতে হবে দিয়ে দে তো এখনকার মত। আর স্ববীরের কী গেম ফি না ম্যাগাজিন ফি। জমাদার কী বকশিশ চায় ছাথ তো। ওমা, রিক্শা ভাড়া কবে আবার বাকি ছিল? আচ্ছা, তুই দে তো এখন মিটিয়ে।

এমনি থেকে-থেকেই খুচরো খরচের টাকা বিজয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেয় মৃণালিনী। সব সময়ই ফেরত দেবার কথাটা মনে রাখে না। বিজয়া অবশিষ্ট ফেরত চায় না মুখ ফুটে কিন্তু কবে ও কোথায় কত টাকা বাকি পড়েছে, দিবিা মনে করে রাখে।

দিদির ভালোবাসায় আবার বান ডাকল বুঝি। ভালোবাসার বান ডাকলে দিদি অমনি তুই বলে, ডাকে নাম ধরে।

বিজয়া ঘরের বাইরে এসে বললে, ‘আমার কাছে দশ টাকার নোট আছে। ভাঙানি নেই।’

ঠকে না হোক, ঠেকে শিখেছে বিজয়া। মৃণালিনীর যেমন ‘হাত জোড়া’, বিজয়ারও তেমনি ‘নোটের ভাঙানি নেই।’

আবার স্বকাস্তর দিকে কৌতুকগর্ভ চাউনি ছুঁড়ল কাকলি। কেমন, হল? পূর্ণ হল আকাজ্জা?

অগত্যা হাত ধুয়ে উপরে উঠতে হল মৃণালিনীকে । স্বকাস্তকে একটা টাকা দিতে হল আলমারি খুলে ।

একটা টাকার জন্তে দশ মিনিট দেয়ি । কাকলির নীরব দৃষ্টির কাঁটা পিঠে যেন বিঁধল স্বকাস্তর ।

আলমারি খুলে টাকা গুনছে মৃণালিনী, স্বকাস্ত বললে, ‘কিছু টাকা নিজের হাতে রেখে দেব ভাবছি ।’

শুনেও শুনল না মৃণালিনী ।

এক টাকার নোটটা ভাঁজ করে ব্যাগে পুরতে-পুরতে স্বকাস্ত বললে, ‘তোমাকে, সংসারকে, দু শো টাকা দেব আর এক শো টাকা রাখব নিজের কাছে ।’

‘নিজের কাছে মানে বউয়ের কাছে ।’

এই নাও ! এই আবার আরেক প্যাঁচ !

যেতে-যেতে ধামল স্বকাস্ত । বললে, ‘কেন, দাদাও তো তাই করছে । খানিক দিচ্ছে, খানিক রাখছে ।’

‘তার কতই বা মাইনে !’ যুক্তি ধরে কথা বলার তো দায় নেই, কট করে বলে বসল মৃণালিনী । আর তা বন্দনাকে শুনিয়ে ।

‘কত মাইনে তা নিয়ে কথা হচ্ছে না ।’ বললে স্বকাস্ত, ‘কথা হচ্ছে যতই মাইনে হোক, কিছু টাকা রাখতে হচ্ছে হাতখরচের জন্তে ।’

‘তার ছেলেমেয়ে আছে ।’ আবার এক যুক্তি-ছুট কথা বলল মৃণালিনী ।

‘ছেলেমেয়ে না থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত খরচের জন্তে আলাদা একটা টাকা দরকার ।’ সিঁড়ির মুখে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে স্বকাস্ত ।

কথা বলার কী দরকার ! কাকলি উপস্থিত না থাকলেও তার অহুযোগভরা কাতর চোখ যেন দেয়ালে ফুটে রয়েছে । যেন বলছে, কথাই বিষ, কথাই শত্রু । কথা না বলে পরের মাসে আলগোছে এক শো টাকা কম দিলেই চলে যেত । যা কিছুই বলতে আসতেন না ।

কিন্তু এখন জলে চেউ দেওয়া হয়ে গিয়েছে । মৃণালিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, ‘তা যখন-তখন এটা-সেটা বলে আকছারই তো নিচ্ছিস—’

‘হ্যাঁ, বারে-বারে তোমাকে শুধু বিরক্ত করা । নিজেরও সময় নষ্ট । সেদিন টাকার দরকার, শুনলুম তুমি বাড়ি নেই । কালীঘাট গিয়েছ ।’

‘কবে আবার কেওড়াতলা যাব ! তার চেয়ে এবার থেকে সব টাকা বউয়ের হাতেই তুলে দিস ।’

‘কী কথায় কী কথা ! শুধু-শুধু সময় নষ্ট ।’

‘সময় নষ্ট করতে গেলি কেন ? বউয়ের কাছ থেকে টাকা একটা চেয়ে নিলেই হত !’

‘বউ ? বউ টাকা পাবে কোথায় ?’

‘এমনই বাউগুলো বউ, একটাও তার টাকা নেই ? বাপের বাড়ি থেকে কিছুই এদিক-সেদিক আনতে পারে নি, এ কখনো হতে পারে ?’

‘ঐ একটা মাত্র স্কাটকেন্স নিয়ে তো এসেছে । আর তোমরা কার্টমসের পুলিশের মত তা তরতর করে দেখেছ, একটা ফুটো আধলাও পাও নি ।’

‘কিন্তু অদৃশ্য হয়ে তো থাকতে পারে ।’

‘অদৃশ্য হয়ে ?’ এক সিঁড়ি খামল স্বকাস্ত ।

‘হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক-পোস্টঅফিসে । বাবা কি মেয়ের জন্তে কোনো প্রভিশনই করে নি বলতে চান ?’

ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বকাস্ত । কাকলির দূরত্বটা অস্বাভাবিক করে কণ্ঠস্বর স্তিমিত করল । বললে, ‘সে ছুঁতের কথা শুনো আরেক দিন ।’

‘কিন্তু তার হাতে একেবারে টাকা নেই, এ আমাকে তুই বিশ্বাস করতে বলিস ? টাকা নেই তো ফ্যান কিনল কী দিয়ে ?’

হাসবে না কাঁদবে ভেবে পেল না স্বকাস্ত । নামতে-নামতে বললে, ‘ফ্যান কেনবার টাকা ছাত্রের কাছ থেকে আগাম নিয়েছি ।’ তারপর কাকলি যাতে শুনতে পায়, তেমনি বুঝে গলা উত্তেজিত করল : ‘আর বউয়ের যদি নিজস্ব টাকাও থাকে, আমি তা নিতে যাব কেন ? আমি নিজে রোজগার করি না ? আমার দুই হাত আর মাথা নেই ?’

পাখা শুধু কেনাই হয়েছে, এখনো টাঙানো হয় নি । মিস্ত্রি এসেছে টাঙাতে ।

‘কোন ঘরে ফিট হবে ?’ জিজ্ঞেস করল মিস্ত্রি ।

কাকলি এগিয়ে এল । স্বস্তর-শাস্ত্রির ঘর দেখিয়ে দিল ।

মৃণালিনী অস্থির হয়ে বললে, ‘সে কী কথা ? আমাদের ঘরে কী !’

‘হ্যাঁ, আপনাদের ঘরের জন্তেই তো—’ সরল জোরের সঙ্গে কাকলি বললে ।

‘বলো কী ! স্বকু জানে ?’

‘বা, জানে বৈকি । ওই তো বলে গেল ।’

তবু যেন বিশ্বাস করা যায় না । মৃণালিনী ভয়ে-বিস্ময়ে, দ্বিধায়-আনন্দে তালগোল পাকিয়ে গেল । বললে, ‘না, স্বকু আগে আসুক । আগে বলুক । পরে দেখা যাবে ।’

‘কতক্ষণে ফিরবে তার ঠিক নেই। ততক্ষণ থাকবে না মিস্ত্রি।’ কাকলি হাসল : ‘ফান থাকতে এক রাত্রির কষ্টই বা সওয়া কেন?’

ভূপেন-মৃণালিনীর ঘরেই খাটানো হল পাখা। রেগুলেটর বসল। বন্দী, অথচ উড়তে লাগল রাজহাঁস। চুল আর আঁচল একসঙ্গে সামলাতে না পেয়ে মৃণালিনী বিহ্বল হয়ে শিশুর মত হাসতে লাগল।

সবচেয়ে বেশি খুশি জয়ন্তী আর সুরবীর। কমাও, বাড়াও, ফুল ফোর্স দাও, ইচ্ছে করে তো বন্ধ করে রাখো। দেখ দেখ একেবারে নট-কিছু।

‘কি, সুরবীরকে এবার পড়তে দেবে তো এ ঘরে?’ জয়ন্তীর চিবুক ধরে সম্মুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘বা, আমি কখন বারণ করেছি? তবে জানো ছোট বউদি, ও ভারি চোঁচায়। তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে—’ জয়ন্তী পাখার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে রইল।

‘তবে এখন যখন ফ্যান হয়েছে চোঁচাবার দরকার হবে না।’ সুরবীর বললে, ‘আর ঐ চোঁচানো কি পড়া নাকি? ওটা হচ্ছে প্রতিবাদ। গরমের বিরুদ্ধে, ছোট ঘরের বিরুদ্ধে, কিছু মনে রাখতে না পারার বিরুদ্ধে। তাই না?’ কাকলির দিকে সমর্থনের আশায় তাকাল সানন্দে।

‘কিন্তু যাই বলিস সুরবীর, কাগজচাপা লাগবে।’ বললে জয়ন্তী, ‘নইলে শান্তিতে খাতা-বই মেলে বসতে পারবি নে।’

‘তুই তো কাকিমার মেয়ে। তবে কাকিমার থেকে কিছু নিয়ে আয় না চেয়ে। কাঁচের নয় পেতলের আনিস। কাকাকে বললেই নিয়ে আসবে ঠিক আকিস থেকে।’ সবজাস্তার মত ভক্তি করল সুরবীর।

জয়ন্তী ভার-ভার গলায় বললে, ‘কাকিমারা চলে যাচ্ছে বাড়ি ছেড়ে—’

তাতে সুরবীরের কিছু যায় আসে না। কিন্তু অল্প দিক থেকে ভয় আছে ভেবে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

‘তখন ছোড়া দারা নিচে যাবে, আর তুই তোর মাথের ঘরে, একা ঘরে, পড়বি চোঁচিয়ে।’ হাসল জয়ন্তী : ‘মানে ফের তোর প্রতিবাদের ঝড় তুলবি।’

‘আমি আর নড়ছি না।’

‘দেখি তখন কে নড়ে।’ নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে বললে জয়ন্তী।

‘তখনকার কথা তখন। আজ তো আচ্ছা করে খেয়ে নিই হাওয়া।’ কাঁটা পুরো ঘুরিয়ে দিল সুরবীর। পরে বললে, ‘তবে কাকিমাদের যাওয়া যদি না হয়। তুই তো পরীক্ষা ছাড়াও ভগবানকে ডাকিস। একবার ডেকে বল না তাঁকে।’

কাকিমারা যেন না যায়। স্ববীরের মাথার উপরে পাখাটা যেন বহাল থাকে।’

‘না রে, ফ্যাট ঠিক হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে লরি আসবে মালপত্র নিতে।’

জয়ন্তীর চোখ প্রায় ছলছল করে উঠল : ‘একটুও ভালো লাগে না। জানিস, আর সেই বাড়িটা এখান থেকে অনেক দূরে। হেঁটে যাওয়া যাবে না ইচ্ছেমত। পাখা হল বটে, কিন্তু ভারি মন কেমন করবে কাকিমার জন্তে। তোর করবে না?’

‘মা-মাঃ!’ শেষ গেল্লিটাও গা থেকে খুলে ফেলল স্ববীর। বললে, ‘আমার মন খারাপ হবে যদি সত্যি ঐ কোণের ঘরটাতে সরতে হয়।’

কিন্তু সেন্ট্রুর কথা অগ্র ধরনের। সে কাকিলির কোলে চড়ে বলছে, ‘পাখাটা তোমার ঘরে নিলে না কেন কান্না?’

বাপ-মা বা নিজের ঘর ভাবছে না সে, ভাবছে কান্নার ঘর।

কাকলি বলল, ‘এই তো ভালো হল। তুমি একদম ঠাকুমার কাছে যাও না। এখন ঠাকুমার ঘরে পাখা হল, তুমি ঠাকুমার কাছে শুয়ে ঘুমতে পারবে।’

‘ভালো হবে না কিন্তু—’ কাকিলির একগুচ্ছ চুল মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সেন্ট্রু।

‘কে বললে ভালো হবে না?’ শাসনের মাজাটা আরো বেশি হোক এমনি সরস আশা করতে-করতে কাকলি বললে, ‘ভালোই তো হল। দুপুরে ছটফট করতে আমার কাছে, পাখার বাড়ি থেতে, এখন ফ্যানের হাওয়ায় এ ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমবে।’

‘না, না, আমি ককখনো থাকব না এ ঘরে।’ শাসন-গীড়ন না করে ছ হাতে সেন্ট্রু কাকিলির গলা জড়িয়ে ধরল। বললে, ‘তুমি আমাকে এ ঘর থেকে নিয়ে যাও। হোক গরম, দুপুরে আমি তোমার কাছে ঘুমব। জানো কান্না, তোমার পাখার বাড়ি আমার একটুও লাগে না।’

বিকলে কোর্ট থেকে ফিরলে ভূপেনের আগে ঘরে ঢুকল মৃণালিনী। সগর্বে বললে, ‘নিজে যা কোনোদিন পারো নি, পারতে না, তাই দেখ একবার চোখ তুলে।’

ভূপেন দেখল। বললে, ‘কে দিল?’

‘স্বহু।’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল ভূপেন।

‘তোমার গুণঘর যে তাই সেও দেয় নি তার দাদাকে। উদার হতে পারে নি। নিজে যখন ফ্যান কিনে আনল নিজের ঘরেই শামিল করল। দাদার কথা আর ভেবে দেখল না। স্বহু সেরকম নয়। স্বার্থপর নয়।’

‘না, না, নিজের ঘরে না টাঙিয়ে এখানে, এ ঘরে, দিয়েছে কেন?’ তড়পাতে

লাগল ভূপেন : ‘আমার ফ্যানের দরকার নেই। ওর ফ্যান ওকে ফিরিয়ে নিতে বলে।’

‘ভীমরতি আর কাকে বলে।’ মুণালিনী বসে গেল কাপড় কাচতে : ‘ঘরের একটা ছেলে সংসারের উন্নতি করবে তা পর্যন্ত সঙ্কল্প করতে পারবে না। এ ঘরে তুমি একলা থাকো না। আমি থাকি, আমার ছেলে-মেয়ে থাকে। আমাদের ফ্যান চাই। আর মেজরিটি মার্গট বি গ্র্যাণ্টেড। কাজেই দস্তখ্বুট কোরো না। চূপ করে হাওয়া খেয়ে যাও। নয়তো কবল জড়াও। স্বকুর ঘরে যে ফ্যান দরকার, তা তুমি কুয়োর ব্যাঙ, তুমি বুঝবে কী! সেই ফ্যান আমি বন্দোবস্ত করে দেব।’ পরে নিচের তলাকে শোনার জন্তে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল : ‘ভাই যে কিছুই করল না সংসারের জন্তে তার জন্তে নালিশ নেই আর ছেলে সমর্থ হয়ে আরাম দিচ্ছে সেবা দিচ্ছে, তাতেই যত অকথা!’

অন্ধকারে ঘরে ঢুকে পরিচিত স্নাইচ টিপে আলো জ্বালাল স্বকাস্ত। এ কি, পাখা কই? হঠাৎ টেচিয়ে উঠল সরোষে : ‘ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসে নি?’

জয়ন্তীদের ঘরে ছিল কাকলি, গন্ধে-গোলমালে শুনে পায় নি স্বকাস্তর পায়ের শব্দ। এখন হাঁক শুনে বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে স্বকাস্তও বারান্দায় এসে দেখতে পেল কাণ্ডটা। বললে, ‘এ কি, মিস্ত্রি ঘর ভুল করল নাকি?’

মুণালিনী নিচে, পূজার ঘরে। তাকে শুনিয়ে, জগজ্জনকে শুনিয়ে কাকলি বললে, ‘না। ভুল করবে কেন? তুমি যেমন বলে দিয়েছিলে মা-বাবার ঘরে হবে তেমন হয়েছে।’ বলে স্বকাস্তর প্রায় হাত ধরে টানতে টানতে নিজের ঘরে নিয়ে এল কাকলি। গন্তীর স্বরে বললে, ‘মা-বাবার ঘর খালি রেখে নিজেদের ঘরে ফ্যান টাঙানো অত্যন্ত অত্যাচার, অত্যন্ত দোষের। তুমিও সেটা বুঝবে। তাই প্রথমটা ওঁদের ওখানে চালান দিয়েছি। পরে যদি আবার আসে তখন দেখা যাবে।’

‘কিন্তু কী দুঃসহ গরম এই ঘরে! স্বকাস্ত আপত্তি তুলল : ‘ওদের ঘরের দক্ষিণ খোলা, হাওয়া থাকলে কার্পণ্য করে না।’

ওসব কথা কানেও তুলল না কাকলি। সারা শরীরে লাস্ত্রের হাসি ঢেলে বললে, ‘পাখা নয়, তোমার জন্তে নতুন একটা জিনিস করেছে।’

‘কী?’ সমুদ্রের পারে পথহারা শিশু, এমনি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল স্বকাস্ত।

‘আলোটা নেবোও।’ খাটে উঠতে-উঠতে শুতে-শুতে বললে কাকলি।’

কী যেন অন্ধ আকস্মিকতায় সমস্ত অজিহ্বা ঝংকৃত হয়ে উঠবে তারই উদগ্র আশায় স্বকাস্ত আলো নিবিয়ে দিল।

আর তখনই বেডসুইচ টিপে ঘরে একটি নীলাভ যুহু আলোর নীরব মোহ-সৃষ্টি করল কাকলি। বললে, ‘তোমার জন্তে এই বেডসুইচটা করেছি। কি, পছন্দ?’

লালসে-বিলাসে অপূর্ব দেখাচ্ছে কাকলিকে। কাকলিকে মানে কাকলির শরীরময়তাকে। যেন ও আগুনে-ভরা শমীলতা। ডালে ফল কাঠে আগুন। উমা আর অমা একসঙ্গে। গুরু আর কৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তার করে যেন ঢাকবে স্বকান্তকে। দুই শক্তিতে বাঁধবে নিটুট করে। এক শক্তি আবরণ, আরেক শক্তি উন্মোচন। ব্যস্ত আর অব্যস্ত। সত্য আর রহস্য, কুণ্ঠা আর কৃতার্থতা।

সেই বন্ধনে-আচ্ছাদনেই স্বকান্ত শাস্তি পাবে, আরোগ্য পাবে, পাবে তার আত্মার উপশম। তার সমস্ত দৈন্তের মোচন হবে এখানে, সমস্ত নানতার পরিপূর্তি। এইখানেই স্বকান্তের সমস্ত জিজ্ঞাসার সমস্ত আকৃতির উত্তর। সমস্ত জীবনের জয়ধ্বনি।

পরদিন সকালে তৃপ্তমুখে স্বকান্ত বললে, ‘তোমার বেডসুইচ ভালো দিনের সূচনা করেছে। কাকারা আজ চলে যাচ্ছে। এসে গেছে লরি। আমরা এবার বিস্তৃত স্থান পাব।’ জানলায় দাঁড়াল স্বকান্ত। কাকলি নেমে গেল নিচে।

ছোটো কুলি মাল তুলছে লরিতে। সব খবরই ভূপেন দেরিতে পায়, এও জানতে পারল যখন লরি প্রায় অর্ধেক বোঝাই হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোখ চড়কগাছ করে তাকাল হেমেনের দিকে। বললে, ‘এ কী হচ্ছে?’

‘একটা ক্ল্যাট পেয়েছি। সেখানে উঠে যাচ্ছি।’

‘কেন, সেখানে কেন?’

‘এখানে স্বহু আর তার বউয়ের অসুবিধে হচ্ছে, খোলামেলা ঘর পাচ্ছে না—’

‘যাদের অসুবিধে হচ্ছে তারা চলে যাক। তুই কেন?’ ভূপেন গর্জন করে উঠল।

দাদার মুখের দিকে এক পলক তাকাল হেমেন। পরে একটু আড়াল করে নিয়ে বললে, ‘আরো একটু কথা আছে। ছোট বউ ক্ল্যাট-ক্ল্যাট করে। ওকে একটু দেখিয়ে নিয়ে আসি কাকে বলে ক্ল্যাট হওয়া। শূন্য বাড়িতে একলা থাকার আনন্দ!’

‘না, কাউকে দেব না আমাদের একান্তবর্তী পরিবার ভাঙতে। কাউকে না। লরি থেকে শিগগির জিনিস নামা বলছি। কে আসতে বলেছিল লরি? কুলিরা গেল কোথায়?’ নিজেই মাল নামাতে লাগল ভূপেন।

‘সেলামি দেওয়া হয়ে গিয়েছিল—’ হেমেন নিরস্ত্রের মত বললে।

‘যাক সেলামি। তার চেয়ে মান বড়, আদর্শ বড়।’ ভূপেন ফিরে এল ঘরের দিকে : ‘সেলামিই বা যাবে কেন ? আর কাউকে বন্দোবস্ত করে দেয়া যাবে। আর যেই ডুবুক, আমরা নয়, আমাদের ছু ভায়ের কেউ নয়। কেউ নয়। কি রে, নামালি ?’

‘নামাচ্ছি।’ বললে হেমন।

২১

‘বাবা কী বললেন, শুনলে ?’ জিজ্ঞেস করলে স্বকান্ত।

‘কী বললেন ?’ কাপড় ঝুঁচোচ্ছিল কাকলি, চোখ তুলে তাকাল।

‘শোনো নি ?’

‘না।’ যতদূর সাধ্য চোখমুখ সরল করল কাকলি।

‘নিচে এত গোলমাল টেচামেচি কানে ঢুকল না তোমার ?’

‘গোলমালের জন্তেই হয়তো ঢোকে নি। বলো না কী বললেন ?’ কাকলি দাঁড়াল স্থির হয়ে।

‘বললেন যাদের এ বাড়িতে অস্ববিধে হচ্ছে তারাই চলে যাক বাড়ি ছেড়ে—’

‘মানে ?’

‘মানে আমাদেরই চলে যেতে বললেন।’ টেবিলের সামনে চেয়ারটায় বসল স্বকান্ত।

‘তোমার মুখের উপর বললেন ? স্পষ্ট হুকুম করলেন ?’ কাকলি খাটটা ধরল।

‘না, তেমন করে নয়। বাপ হয়ে তেমন করে পারেন নাকি বলতে ?’

‘পারেন নি। কেউ-কেউ পারেন। মনে করলেই পারেন।’ কাকলি চোখ নামাল।

কথার স্বরটা ঘুরিয়ে দিল স্বকান্ত। বললে, ‘ঠিক তেমন করে না বললেও পরোক্ষ এখানে প্রত্যক্ষের মতই কাজ করছে।’

‘তা হলে কী করবে ?’ হাতের কাজ ফেলে খাটের উপর বসল কাকলি।

‘চলে যাব।’

মুহুরেখায় হাসল কাকলি। ‘তা হলে কাকা যে ক্যাটটা ছেড়ে দিলেন, নিলেন না, সেটা গিয়ে ধরো।’

‘ওরে বাবাঃ! সেটা ধরব কী! সেটার ভাড়া দু শো টাকা!’ স্বকান্ত প্রায় হতাশের মত মুখ করল।

‘তোমার রোজগারের আঙ্কেকেরও বেশি বেরিয়ে যাবে শুধু বাড়ি-ভাড়াতেই। তারপরে খাবে কী? খাওয়াবে কী?’

‘হ্যাঁ, সমস্তা কি একটা?’ চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল স্বকান্ত। ‘এখন আর শুধু খাওয়া নয়, খাওয়ানো। আর কে জানে, হয়তো বা একাধিক।’

শব্দ করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘দয়া করে যে মনে রেখেছ কর্তব্যটা!’

চুপ করে ধোঁয়া ওড়াতে লাগল স্বকান্ত।

ছুট্ট-ছুট্ট মুখে কাকলি বললে, ‘তা হলে কী হবে?’

‘এক শো টাকার মতন একটা ছোটখাট ক্ল্যাট দেখে চলে যাব। আজ থেকেই বেকব খুঁজতে। সকলকে বলব। দরকার হলে দালাল লাগাব।’

‘ছোটখাট ক্ল্যাটে কী আর অমন সুসার হবে? এখন যেমন এখানে আছি তার চেয়ে আর কী উন্নতি হল?’ কাকলি দু হাত টান করে সোজা হয়ে বসল। ‘ছোট-ছোট দুখানা ঘর, এক চিলতে বারান্দা, আলাদা একটু রান্না আর স্নানের জায়গা—সহজেই অসুস্থমান করতে পারি এক শো টাকায় এর চেয়ে আর কতদূর কী হবে! তা হলে আর কী জিতলাম! এখন থাকবার ঘরটা ছোট হলেও সমস্ত উপর-নিচ, ছাদ-বারান্দা, এ-ঘর ও-ঘর সব ঘরেই আমাদের আনাগোনা—’

‘তবু ওখানে গিয়ে আমরা স্বাধীন হব।’

‘একা-একা থাকাই বুদ্ধি স্বাধীন হওয়া?’ বাঁকা করে তাকাল কাকলি।

‘নিশ্চয়ই। এক শো বার। কাপড় বুকে নিজের কোট কাটা। নিজের কাঁচিতে নিজের কাটছাঁট।’ আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল স্বকান্ত : ‘তোমার জেলখানার সমস্ত উপর-নিচ ছাদ-বারান্দার চেয়ে ছোট ঘরের স্বাধীনতা ঢের ঢের লোভনীয়।’

‘কিন্তু, লঘু করতে চাইল কাকলি : ‘পরে যদি কিছু একটা আমাদের হয়-টয়?’

‘হবে না।’ চেয়ার থেকে ছিটকে উঠে দাঁড়াল স্বকান্ত।

‘ভীষ বুদ্ধিমান ছিল।’ হাসতে হাসতে কাকলি বললে, ‘সে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ের আগে করেছিল, বিয়ের পরে নয়। বিয়ের পরে হলে আর তার সাহস হত না।’

‘যদি হয় তো হবে।’ হেরে গিয়ে স্বকান্ত ফের চেয়ারে বসল। বললে, ‘যারা একা-একা থাকে তাদের শিষ্ট কি আর মানুষ হয় না?’

‘হয়। ঝি-এর হাতে হয়।’ ব্যঙ্গের স্বর আনল কাকলি।

‘তা হলে সেখানেও তাই হবে।’ বলে ফেলল স্বকান্ত।

‘কোন দুঃখে ? এ শিশুর ঠাকুমা থাকবে না ? এরই জন্তেই তো সংসারে ঠাকুমার দ্বন্দ্বকার।’ মুখ হাসি-হাসি করেই রাখছে কাকলি : ‘ঠাকুমা থাকতে শিশুকে আমরা একটা ঝি-এর হাতে সঁপে দেব না। আর ঠাকুরদা থাকতে যে শিশু তার নাতির আদর পেল না তার মত হতভাগ্য আর কে আছে !’

‘মুখের মত কথা বোলো না।’ সিগারেটের শেষ টুকরোটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল স্বকান্ত : ‘তোমার সেই শিশু কোথায় ?’

‘শরীরে এখনো না আসুক কিন্তু আকাঙ্ক্ষায় তো আছে। আর বলতে এখন বাধা নী, তার জন্তেই তো বিয়ে। যেমন প্রণামের জন্তেই পুজো।’ কাকলি ধরতে চাইল স্বকান্তর চোখ। বললে, ‘স্বতরাং ভাবনা থেকে তাকে বাদ দিলে চলবে না। বরং সকলের আগে তার কথাটাই—’

‘ইভিয়ট !’ ঘুণায় ঝাঁজিয়ে উঠল স্বকান্ত।

‘ইভিয়ট আমি না তুমি ?’ কাকলিও পালটা ঝাপটা হানল।

‘তুমি।’ স্বকান্ত ফের চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, ‘নইলে আজকের দিনে কোনো শিক্ষিত লোক পচা পুরোনো দিনের স্বত্ত্বশাস্ত্রিওলা সংসারকে আদর্শ ভাবে ?’

‘দিন পুরোনো হলেই পচা এ তোমার কুসংস্কার।’ কাকলি নামল খাট থেকে : ‘নচেং তুমি যে ভাবছ তুমি শিক্ষিত সেটা তোমার ভুল।’

‘ভুল ?’ স্বকান্তর ইচ্ছে হল কাকলির গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

‘এ তো কম করে বলেছি। রোজগেরে উপযুক্ত ছেলে বাপ-মাকে ফেলে বউ নিয়ে আলাদা সংসার করছে এ খুব একটা আদর্শের কথা ?’

‘কিন্তু বাপ-মা যদি তাড়িয়ে দেয় ?’ মুখিয়ে উঠল স্বকান্ত।

‘দেয় নি তাড়িয়ে।’

‘দিয়েছে। যে ভাবে বলেছে তাতে তাড়িয়ে দিয়েছেই একমাত্র মানে।’

‘না, ককখনো না।’ কাকলিও জোর আনতে জানে : ‘তা ছাড়া কাক একটা রাগের কথাই তার সমগ্র কথা নয়। শেষকালে বাবা কী বললেন শোনো নি ? চোকে নি কানে ? বললেন, পারতপক্ষে আমাদের এই একারবর্তী পরিবার আমরা ভাঙতে দেব না।’

‘একটা ফসিলের মত কথা।’

‘ফসিল আবার কথা কইল কবে ?’ গান্ধীঘের মধ্যে চাপলোর স্বর আনল কাকলি।

‘না, কথা নেই। উত্তাল কালস্রোতের কাছে দাঁড়াতে না কাক কান্না বা কোলাহল, চাক বা প্রতিবাদের স্পর্ধা। সমস্ত মধ্যবিত্ত ইমারত ধ্বংস ভেসে গলে যাবে।’

‘বেশি বাহাদুরি কোরো না।’ কাকলি জানলার দিকে এগিয়ে গেল : ‘স্রোত যা নেয় তাই আবার ফিরিয়ে দেয়। ভাঙন নদীতে আবার চর জাগে। একটা জিনিস ভেঙে যাচ্ছে বলেই সেটা মন্দ?’

‘নিশ্চয়ই। মন্দ বলেই তো ভেঙে যাচ্ছে, দাঁড়াতে পারছে না, থাকছে না টিকে।’

‘কী যুক্তি! জীবন যেহেতু টিকেছে না, গোটা জীবনটাই খারাপ।’ কাকলি ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘আর যা দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত স্বার্থপরতার মত ঘোলাটে অহং-বুদ্ধির মত তাই একেবারে ভালোর অবতার!’

এত তিক্তও কাকলি হতে পারে নাকি? স্বকাস্তর মনে হল যেন এক তাল কাদা তার মুখের উপর পড়ল ছিটিয়ে। অবতার কথাটার মধ্যে পরিহাস নয়, তীক্ষ্ণমুখ স্থগার দংশন।

যে দৃঢ় সে তপ্ত হবে কেন? স্বকাস্ত তাই গম্ভীর গলায় বললে, ‘নীতির কথা হচ্ছে না, পরিস্থিতির কথা হচ্ছে।’

‘পরিস্থিতি এমন কিছু খারাপ হয় নি।’ পিঠ-পিঠ জবাব দিল কাকলি।

‘যথেষ্ট খারাপ হয়েছে। কাকা উঠে যাবে ঠিক করেছে, দস্তুরমত ক্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে, ট্রাক এসেছে মাল নিতে, এমন সময় বাড়ির কর্তা বাবা গদগদ হয়ে বললেন, তুই আমার ভাই, তুই যাস নে। ঐ ছোড়া যে নতুন বউ নিয়ে এসেছে, হলই বা সে পুত্র, সে ব্যাটা বেরিয়ে যাক—’

‘যদি তার অসুবিধে হয়!’ সঙ্কে-সঙ্কে জুড়ে দিল কাকলি।

‘অসুবিধে হয়!’ স্বকাস্ত ভেঙে উঠল : ‘অসুবিধে হচ্ছে না বলতে চাও?’

‘হচ্ছে।’ চোখমুখ স্নিগ্ধ করল কাকলি : ‘কিন্তু মোটামোট অসুবিধের চেয়ে সুবিধেই বেশি হচ্ছে। ঢের ঢের বেশি।’

‘বেশি?’ সাধ্য কি তুমি তপ্ত না হয়ে পারো? স্বকাস্ত তাই থিঁচিয়ে উঠল : ‘নিজের রোজগারের টাকায় নিজের কর্তৃত্ব ফলানো চলবে না, সর্বকর্তা মার হাতে তুলে দিয়ে ভালো মানুষ সাজতে হবে, মার স্বপুত্র সাজতে হবে—এ কী স্বকামারি! তার উপরে একটা এজমালি বাড়ির খাওয়া আর পরিবেশন একজনের মর্জির উপরে নির্ভর। তিনি যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন বাটিচচ্চড়ি, যেদিন ইচ্ছে করবেন সেদিন ঘাঁটা। বাড়ির আর কারু কচি চলবে? আর কারু ফরমায়েশ?’

‘তুমি—তুমি মার সম্পর্কে এ কথা বলছ?’ মুখ ঘুরিয়ে গালে হাত রাখল কাকলি : ‘তুমি মার লাট ছেলে, তোমার জন্তে সব লাটা বাটি। স্পেশাল ডিশ, আলাদা মেট।’

কোনোদিন স্টু, কোনোদিন মোগলাই। তোমার জন্তে তো এলাহি ব্যবস্থা। সংসারে আর কেউ নয়, তুমি— তুমি বলছ এ কথা ?’

‘হ্যা, আমি বলছি। আমি তো বলব।’ সুকান্ত অসহায়ের মত আরেকটা সিগারেট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল : ‘একজনকে বেশি আরেকজনকে কম, একজনকে স্পেশাল আরেকজনকে অর্ডিনারি— এইটাই তো একান্নবর্তী পরিবারের দোষ। কড়া থেকে দু হাতা দুধ তুলে নিজের ছেলেদের খাইয়ে দেওয়ার ছেলেদের জন্তে দু হাতা জল ঢেলে রাখা। আমার স্পেশালের সামনে বসে আরেকজন অর্ডিনারি থাকে এটা আমার পক্ষে কম অস্বস্তিকর ? আমার নিজের সংসার হলে এসব তারতম্যের কোনো ভয়ও নেই, অশাস্তিও নেই। স্পেশাল হলে স্পেশাল, অর্ডিনারি হলে অর্ডিনারি।’

‘উঃ, তুমি কী সাংঘাতিক লোক।’ উলটো গালে হাত রাখল কাকলি : ‘বেশি খেয়েও তোমার অস্থবিধে !’

‘হ্যা, বেশিতেও অস্থবিধে, যদি আরেকটা লোক মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে কালফাল করে। আর, বেশি হলেই বা কী ! খুশি মতন আছে কিছু ? যেদিন ইচ্ছে হবে সেদিন ফাউল খেতে পারো ? খেতে পারো চিংড়ি মাছ ?’

ও-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘চিংড়ি আবার মাছ নাকি ? ও তো পোকা, ইনসেক্ট। যার মধ্যে রক্ত নেই সে মাছ হয় কী করে ? তবে তো টিকটিকিও খেতে পারো। আর যা সব পুরুটু টিকটিকি ঘোরে তোমার দেয়ালে ! নয়তো ফড়িং ধরে। উচ্চিংড়ে। চীনাাদের মত আরম্ভলা।’

‘বোকা নিয়ে যাদের ঘর করতে হয় তাদের পোকা না খেয়ে উপায় কি।’ কথার মধ্যে যে হাসি না ফুটে জ্বালা ফুটে সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি স্বর পালটাল সুকান্ত। বললে, ‘চিংড়ি মাছ খেলে দাদার এলাজি হয় বলে বাজার থেকে আসতেই পারবে না এ কী জুলুম ! একেই বলে একান্নবর্তিতার অত্যাচার। তুমি হাঁচবে বলে আমরা হাঁচব না ! তুমি— তুমি এত চিংড়ি মাছ ভালোবাসো।’

‘আহা, কী ভালোবাসা ! থাক, আমার জন্তে তোমার সোনাদিদি হতে হবে না।’ অনেক গভীরে, চিবুকে টোল ফেলে হাসল কাকলি : ‘সোনাদিদির আদরে সর্ব শরীর বিদরে।’

‘তা একটু বিদীর্ণ হলে ক্ষতি কী ! তবু, যাই বলো, আপকুচি খানা, আপকুচি গানার মত স্বথ নেই।’

‘আপকুচি গানা মানে ?’

‘নিজের ইচ্ছেমত গান গেয়ে ওঠা। সাধ্য আছে এ বাড়িতে তুমি বাবা-কাকার সামনে গলা ছেড়ে গান গাও, কালোয়াতি স্বর ভাঁজো ? বেয়াদবি, জেঙ্ক বেয়াদবি ! দেখ দেখি ব্যক্তিস্বাধীনতার উপরে কত বড় হস্তক্ষেপ !’

কথার স্বরটা লঘুতার দিকে যাচ্ছে দেখে আশ্বস্ত হল কাকলি। বললে, ‘তার মানে নিজের সংসারে ভীষ্মলোচন শর্মা হয়ে দিল্লি থেকে বর্মা পর্যন্ত আওয়াজ ছুঁড়বে !’

‘ছুঁড়বে। যাকে বলে স্বাধীনতার জয়োল্লাস। যখন খুশি গান যেমন খুশি বাজনা। আনন্দের আর এর চেয়ে বড় প্রকাশ কী আছে ?’ কাকলিকে দলে পেয়েছে ভেবে স্বকান্ত ও হালকা হল : ‘যেদিন ইচ্ছে চিংড়ি, যেদিন ইচ্ছে ভেটকি। যেদিন ইচ্ছে ইলিশ। খুশি হলে টাটকা, খুশি হলে বাসি।’

‘সঙ্গে-সঙ্গেই কলেরা। মাপ করো,’ অজানতে একটু গভীর হল কাকলি : ‘যদি ধরো, ঈশ্বর না করুন, তোমার কোনো অস্ব্থ হয় ?’

‘হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে।’

‘আমার অস্ব্থ হলে ?’

‘মেটারনিটি হোম।’

‘ইয়ার্কির কথা নয়।’ কাকলিই লঘুতার স্বর কেটে কেলল : ‘যদি কারু অস্ব্থ হয়। আর তা বাড়াবাড়ি হয়, তখন নিদারুণ বিপদের মুখে গিয়ে পড়তে হবে। উপায় নেই তোমার বাবা-মাকে গিয়ে না খবর দিই। যদি আসতে না চান হাতে-পায়ে ধরে ন রাজি করি। যদি বলেন, বাড়ি ফিরে চলো, তাই না কোন গিয়ে হাজির হই। সেই যদি লোকই হাসাব তবে মিছিমিছি মল খসাই কেন ?’

‘তবু তুমি এ সংসারে ছোট মনের নিত্যিকার ঝগড়াঝাটির মধ্যেই থাকবে ?’ কথের দাঁড়াল স্বকান্ত।

‘এ ইাড়িকুঁড়ির ঠোকাঠুকি, নড়ে চড়ে সরে বসে এরাই আবার এদের সামা ও স্থিতি বজায় রাখে। এ দু-জনের ঝগড়া ও দু-জনে মেটায়। ও দু-জনের ঝগড়া এ দু-জন। আর কাল যারা ঝগড়া করেছিল, আজ তারা একত্র বসে হাসে, আর আত্ম যারা ঝগড়া করছে দেখছে, কাল তারা পাশাপাশি বসে মিনেমা দেখবে। কিন্তু তোমার ঐ একলার সংসারে যখন ঝগড়া হবে ?’

‘ঝগড়া হবে মানে, আমাতে-তোমাতে ঝগড়া হবে ?’ অবাক হবার ভাব করল স্বকান্ত।

‘তা তো হতেই পারে। ও আর এমন অসম্ভব কী !’

‘তুমি যে এমন ঝগড়াটে তা তো জানতাম না।’

‘আর তুমি যে অমন গৌয়ার, তাই বা কি আমি জানতাম?’ তবু কষ্ট করে মুখে হাসি আনল কাকলি। বলল, ‘শোনো। কথাটা তা নয়। স্বামী-স্ত্রী থাকলেই ঝগড়া হবে, আর সে ঝগড়ার ক্রিয়া কী, তাও শাস্ত্রে বলা আছে। ক্রিয়াটা লঘু হওয়া তখনই সম্ভব, যদি সংসারটা এজমালি হয়। মা, কাকিমা, দিদি থাকতে তুমি কত আর হামলা করবে আমার উপর? আর শব্দ-ভাস্কর থাকতে আমিই বা কত অশালীন হতে পারব? তখন এজমালি সংসারই মিটিয়ে দেবে, মিলিয়ে দেবে আমাদের। তখন আবার ঘরের শাদা আলোটা নিবে গিয়ে বেডরুমের নীল আলোটা জলে উঠবে দেখো।’

শেষ দিকে হাসিটা প্রাঞ্জল হয়ে উঠলেও স্বকান্তকে পারল না স্পর্শ করতে। স্বকান্ত কাঠখোটার মত বললে, ‘আর ঐ একক সংসার হলে?’

‘ওরে বাবাঃ, তখন তো খোলা মাঠে খোলা অস্ত্রে যুদ্ধ।’ কাকলি হাসির জের টেনে এনে, ‘তখন তো তুমি ভি এম-এ পাশ হাম ভি এম-এ পাশ!’

‘তুমি আমাকে এমনি অবিশ্বাস করো?’ থমথমে মুখ করল স্বকান্ত।

‘এ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কী! এ একটা সম্ভাবনার কথা। যদি-র কথা। যদিও,’ আবার হাসল কাকলি : ‘যদিও যদি-র কথা নদীর পার।’

‘তার মানে, তোমার আর আমাদের ভালোবাসায় আস্থা নেই।’ স্বকান্ত মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘তুমি আর বিশ্বাস করো না যে, ভালোবাসাই সমস্ত বিরোধের থেকে আমাদের রাখতে পারে বাঁচিয়ে। তার মানে তুমি বলতে চাও, একা হতে গেলেই আমাদের ঝগড়া আমাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় হয়ে উঠবে।’

‘কি জানি কী হবে! এখনো তো হই নি একা-একা, শুধু তুমি আর আমি!’

‘সেই পরীক্ষার জগ্গেই একা হওয়া দরকার!’ স্বকান্ত একটা বাই মারল : ‘আমি আজ থেকেই বাড়ি খোঁজা শুরু করে দেব।’

‘গরু খোঁজা করে বাড়ি খোঁজা!’ কাকলিও মুখ এবার থমথমে করল : ‘কিন্তু আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এখুনি-এখুনি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? তুমি ভাবছ, একা বাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করার লোকের তোমার অভাব হবে? পাবে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী, হয়তো বা বাড়িওলা স্বয়ং। চলন-বলন পাড়ার ছেলেদের পছন্দ না হলে তারাই পিছনে লাগতে পারবে সন্দেহ। একা ক্লাটে দেখতে পাবে বা চাকরের দুকাণ্ড। একদিন হয়তো বা ক্লাটে ফিরে এসে দেখবে, চাকর উধাও, আমি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় খুন হয়ে পড়ে আছি—’

‘তুমি বাড়ি থাকবে কেন? তুমিও বেরুবে।’

‘কী বুদ্ধি ! আমিও বেকুব ? তোমার সঙ্গে, না ? আর ফিরবও একজ ? বেশ, তাই । তা হলে একজ ফিরে এসে দেখব ঘরের তালা ভাঙা, সমস্ত লোপাট ।’

‘ডোন্ট বি সিলি ! আর কি কেউ স্বামী-স্ত্রী থাকে না ক্ল্যাটে ?’ স্বকাস্ত দাঁতে দাঁত ঠেকাল ।

‘ধাক । কিন্তু এ কে না বলবে যে এজমালি পরিবারে সিকিউরিটি, নিরাপত্তা, বেশি । বাইরে বেকুবের ফ্রিডমও বেশি । তুমি যখন খুশি বেরোতে পারো এ বাড়ি থেকে, তুমি জানো, কেউ-না-কেউ দেখবে তোমার ঘর-দোর । তোমার জিনিসপত্র । ক্ল্যাট বাড়িতে এ নিশ্চিন্ততা হবে কখনো ? একার সংসারে ? তারপর ধরো একদিন রাতে তোমার ফিরতে অনেক দেরি হচ্ছে, আমি কোথায় যাই, কাকে বলি, কাকে পাঠাই খোঁজ করতে । এজমালি সংসারে আমার চিন্তা হলেও আমার চিন্তার ভাগীদার আছে জেনে আমি অনেক আরামে থাকব । যেখানে মনের আরাম নেই, সিকিউরিটি নেই, যেখানে সব সময়ে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, সেখানে যায় কে, থাকে কে !’

‘তুমি থাকো তোমার সিকিউরিটি নিয়ে, আরাম নিয়ে, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব ।’ স্বকাস্ত দরজার দিকে এগোতে চাইল ।

কাকলি দরজা আগলান । বলল, ‘না, তোমার এখুনি চলে যাবার কোনো কারণ হয় নি ।’

‘বেশ তো, তুমি থাকো এজমালি সংসার আলো করে, আমি যাই ।’

‘ডোন্ট বি সিলি !’ এবার পালটা হানবার স্বযোগ পেল কাকলি । বললে, ‘তুমি জানো তুমি যেখানে যাবে, আমাকেও সেখানে যেতে হবে । আমাকে এখানে রেখে তোমার একা সরে পড়বার কোনো মানে হয় না, কোনো শাস্ত্রে লেখে না । কিন্তু শোনো, একটা কথা তবু বলি । আমার এক গৃহ গেছে,’ কাকলির গলা ছলছল হয়ে উঠল : ‘আরেক গৃহ আমি সহজে খোঁজাতে প্রস্তুত নই ।’

‘সহজে প্রস্তুত কি আমিই ছিলাম ?’ স্বকাস্ত সরল না দরজা থেকে . ‘কিন্তু যে চলে যাবার জন্তে ইচ্ছুক, তাকে আটকে রেখে যারা অনিচ্ছুক-আগন্তুক, তাদের চলে যেতে বলাটা অসম্ভব ।’

‘মোটাই অসম্ভব নয় । মোটেই সেভাবে বলা হয় নি । কিন্তু,’ ভান হাত মেলে দরজা ধরে প্রত্যক্ষ বাধা বিস্তার করল কাকলি । বললে, ‘এত যে আফালন করছ, বলি তোমার টিউশানির টাকার জোর কত ?’

যেন বিষ ঢেলে বলল কথাটা । তোমার আয় বা উপার্জন কত, তা নয়, তোমার টিউশানির টাকা !

‘কেন, তুমি জানো না ?’

‘জানি বলেই তো বলছি এত উল্লেখ আসে কিসে ? বেশ তো, এক শো ঢাকাতেই না-হয় ক্ল্যাট নিলে, তারপর ? চাকরে-মেথরে-ইলেকট্রিকে-ধোপায় আরো দরো পঞ্চাশ । কি, বাকি টাকার থেকে কিছুই তো দেবে না বাবা-মাকে—নইলে আর পুত্ররত্ন বলবে কেন—সবই চালাবে নিজের উদরে । কিন্তু বাকি দেড় শো টাকাতে চলবে তোমার সংসার ?’

‘কেন, তুমি রোজগার করতে পারবে না ?’ প্রায় মুখের উপর তেড়ে এল স্বকান্ত ।

‘আবার, আবার আমাকে টানছ ?’

‘কেন টানব না ? উদরে যে চালাব, সে উদর কি শুধু আমার একার ? সংসার মনেতে কি শুধু একা আমি ? তারপর যদি একটা হয়-টয়, তার দায়িত্বও কি একা আমি এইব ? সব সমান-সমান । এক হাতে তালি বাজে না, বাজে নি । স্তরাং তোমাকেও লাগতে হবে । আনতে হবে । হাত মেলাতে হবে ।’

‘আমার বয়ে গেছে !’ দরজার থেকে হাত নামিয়ে এনে কলা দেখাল কাকলি ।

‘তবে এম-এ পাশ করেছিলে কেন ?’

‘এম-এ পাশ করেছিলাম্ কি চাকরি করব বলে ?’ কাকলি ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল ।

‘তবে চিৎপাত হয়ে ঘুমুবে বলে ? একটা আধুনিক মেয়ে—লজ্জা করে না বলতে ?’ স্বকান্তও মুখটাকে শীর্ণ করল : ‘একটা ডিগ্রি পেয়েছ, সেটা কাজে লাগাবে না ? নিজে ইউজফুল হবে না ? মরচে পড়ে পড়ে ক্ষয় হয়ে যাবে ?’

‘ইউজফুল হবার অর্থ বুঝি চাকরি করে তোমার পেট ভরানো ?’

‘আমার নয়, তোমার নিজের পেট ভরানো ।’

‘এমন কোনো কথা ছিল না ।’

‘কী আবার কথা থাকবে ! এ কি কন্ট্রাস্ট সই করে বিয়ে হয়েছে যে, শর্তগুলি স্বচ্ছ ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে ? এ তো কমনসেন্সের কথা । যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, সে ততটুকু প্রয়োগ করে আয় করে । সব বিত্তকে মুক্তো হয় না, কিন্তু বিত্তকেরও তো কিছু দাম আছে, চাকচিক্য আছে । “এম-এ পাশ যখন, তখন একটা মেয়ে-ইন্সুলে ষাট-সত্তর টাকা না কোন আয় করা যায় । বাড়তি ঐ টাকাটা পেলে বাবা-মাকে দেওয়া যায় কিছু-কিছু ।’

‘কী আমার আহ্লাদের চাঁদ !’ কথার গরমে কাকলির চোখমুখ ঝলসে উঠেছে, আঁচল দিয়ে ঘাম মুছে বললে, ‘ষাট-সত্তর টাকার জন্তে আমি এখন গিয়ে ইন্সুল করি । নিজে টিউটর কিনা, তায় মাস্টারনীর বেশি ভাবতে পাচ্ছে না । আর কী বিবেচক

ছেলে! সংসারে থেকে খোদ দু শো টাকা যেখানে দিতে পারত, সাধ করে বার হয়ে গিয়ে বাট-সস্তর পাঠাচ্ছে! হাউ মিন!

‘ছাড়ো, ছাড়ো বলছি দরজা।’ কাছে এসে ছুঁয়ার ছাড়ল স্বকান্ত।

একচুল নড়ল না কাকলি। লকলক করে উঠল: ‘সব বিষয়কে মূক্তো হয় না, এ সকলেই জানে, কিন্তু সব ছুড়িই যে শালগ্রাম হয় না, এটাও জানা দরকার।’

প্রায় ধাক্কা দিয়েই চলে যাচ্ছিল স্বকান্ত, হঠাৎ ছুটতে ছুটতে সুবীর এসে খবর দিল, ছোড়দা, নিচে তোমাকে কে ডাকছে।

দরজা থেকে আস্তে সরে গেল কাকলি, আর স্বকান্ত ভদ্রভাবে নিজস্ব হল।

আরে, বরেন যে। স্বকান্ত উথলে উঠল উচ্ছ্বাসে।

বাইরের ঘরে বসাল সসম্মে। বরেন বললে, ‘ভাই, মাপ কর। সত্যি-সত্যি বলছি, তোর দুটো তারিখই শ্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম। তারপরেও কি সময় পাই যে, প্রায়শ্চিত্ত করি। শোন, তোর স্বীকে ডাক। আসছে রবিবার গ্রেট ইন্টার্নে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবি দু-জনে। নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। ঠিক সময়ে গাড়ি আসবে এখানে, তোদের নিয়ে যাবে। কই, খবর দে ভিতরে। তাঁকেও বলে যাই।’

স্বকান্ত নিজেই গেল। খাটে যথারীতি গা ঢেলে শুয়ে ছিল কাকলি, তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ আরেক রকম স্বরে স্বকান্ত বললে, ‘ওঠো, নিচে চলো, বরেন এসেছে আমাদের দু-জনকে নিমন্ত্রণ করতে।’

তড়াক করে উঠে পড়ল কাকলি। নেমে পড়ে উজ্জ্বল মুখে বললে, ‘এমনি যাব, না একটু সাজগোজ করব?’

‘এই একটু ফিটফাট হয়ে এসো।’ দুই চোখে আরেক রকম আলো নিয়ে তাকাল স্বকান্ত: ‘এই চুলটা মুখটা একটু ঠিক করো—আর জামাটা না-হয় বদলাও। সাজা পান আছে নাকি বাড়িতে? থাকলে একটা খেয়ে নাও।’

বিহ্বল চোখে তাকাল কাকলি। চোখে বুঝি বা সেই বেডসুইচের নীল-নীল আলো জ্বলে।

স্বকান্ত আগে নামল আর বেশ খানিকটা পরে কাকলি।

‘এই যে নমস্কার। মার্জনা ভিক্ষা করতে এসেছি।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বরেন। প্রার্থনাটার পুনরাবৃত্তি করল। ‘যাবেন কিন্তু দয়া করে। আমার গাড়ি এসে নিয়ে যাবে আপনাদের। স্বকু আমার কতদিনের বন্ধু। স্ব আর কু একসঙ্গে।’

‘আমি তো জ্ঞানতাম উত্তমরূপে, উৎকটরূপে কু।’ সপ্রতিভের মত বললে কাকলি। সকলে হেসে উঠল।

এখানে আসতে আসতে বরেন ভাবছিল শুধু নিমন্ত্রণ খাওয়ানো নয়, একটা উপহারও দেওয়া উচিত নববধূকে। ফুল, বই, প্রসাধনের বাস্ক, একটা টি-সেট বা অমনি কিছু। এখন ফিরে যেতে-যেতে ভাবল সোনার স্পর্শ ছাড়া আর কিছু কি মানাবে কাকলিকে?

... ২২

একথানা বাঙলা, একথানা ইংরিজি—দুখানা খবরের কাগজ আসে। সকালবেলা বাইরের ঘরে চায়ের আগে, পরে, মাঝখানে সবাই টানাটানি, কাড়াকাড়ি, ভাগাভাগি করে পড়ে নেয়। সবাই মানে বাড়ির ছেলেরা—পুরুষেরা। তারপর তারা যে-যার কাজে বেরিয়ে গেলে বন্দনা কাগজগুলি কুড়িয়ে ভাঁজ করে উপরে শাঙড়ির ঘরে নিয়ে আসে। ইংরিজি বাঙলার সের-করা দাম আলাদা বলে তাকের উপর দু'ভাগ করে সাজিয়ে রাখে। শেষ সাজিয়ে রাখবার আগে বাঙলা কাগজটা উলটে-পালটে একটু চোখ বুলিয়ে নেয়, তেমন কোনো পাশবিক বা উত্তেজক সংবাদ আছে কিনা। যদি থাকে রুদ্ধশ্বাসে পড়ে ফেলে। যদি না থাকে—বেশির দিনই থাকে না—বাসি খবরের কাগজের মত মুখ করে রেখে দেয় এক পাশে।

ভোজনান্তে মৃণালিনী বাঙলাটা নিয়ে বসে বিস্তৃত হয়ে। বসে, মানে, বসতে না বসতেই শুয়ে পড়ে। বুদ্ধির আয়ত্তে আনুক না-আনুক, যতক্ষণ ঘুম না আসে, খেলার পৃষ্ঠাটা ছাড়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে আগাগোড়া। অবশ্য পাত্র-পাত্রী, নিরুদ্দেশ, জমি-বিক্রি, বাড়ি-ভাড়া, শোক-সংবাদ, শ্রদ্ধাশ্রুতান—এগুলিই তাকে বেশি টানে, বেশি আটকায়, নয়তো সিনেমার বিজ্ঞাপন, নয়তো কাছাকাছি আজ কোথায় পাঠকীর্তনের বৈঠক। কেলেঙ্কারি কিছু থাকলে সে তো সোনায়ে সোহাগা—ঘোলর উপর আরো দুই।

পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ে মৃণালিনী, খবরের কাগজ তখন বিছানার চাদর হয়ে যায়। এখন ক্যান হবার পর পতাকা হয়ে উড়ছে এখানে-ওখানে।

ইস্কুল থেকে জয়ন্তী আনুক, সে এসে আরেক প্রস্থ শুছিয়ে তুলবে।

ঘুম পাড়াবার জন্তে বিজ্ঞার খবরের কাগজের দরকার হয় না, তার গল্প-উপন্যাসের সচিত্র-বিত্ত্র পত্রিকা আছে। নামের দরকার নেই, লেখকের দরকার নেই, কী

ভাবে লিখছে তার দরকার নেই, একটা কিছু ঘটনা আর খানিকটা কথা-কাটাকাটি থাকলেই যথেষ্ট। কী গল্প কী বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করতে এসো না। ঘুমতে পারা দিয়ে কথা। গল্পের ভালো-মন্দ নেই, ভালো হলেও ঘুম, না হলেও ঘুম, কোনোটা ঘুম পাড়িয়ে দেবে কোনোটা বা ঘুম পাইয়ে দেবে।

‘খবরের কাগজ কি তুমিও পড়ো না নাকি?’ মুণালিনী জিজ্ঞেস করল কাকলিকে।

কাকলি প্রথমটা হকচকিয়ে গেল।

‘কি, পড়ো?’

‘পড়ি বৈকি।’

‘কই, একদিনও তো দেখি না নাড়তে চাড়তে।’ মুণালিনী প্রায় তিরস্কারের স্বর আনল: ‘এতদিন ধরে এসেছ, মুখে নিয়ে ছু দণ্ড বসা দূরের কথা, একদিনও তো একনজর উকিরু’কি মারতেও দেখলাম না।’

‘হাতাহাতি হতে হতে কাগজ যে শেষ পর্যন্ত কোথায় চলে যায়—’ দুর্বল স্বরে কাকলি বললে।

‘যাক না চলে। তোমার যদি সত্যিকার পিপাসা থাকে কাগজ তুমি নিজেই খুঁজে বার করবে। কাগজ ছাড়া তোমার ঘুম হবে না, মুখে খাওয়া কচবে না, সর্বক্ষণ কেমন খালি-খালি মনে হবে।’

‘তারপর আবার কাগজের জন্তে পিপাসা!’ বলে ফেলল কাকলি।

‘ই্যা, খবরের জন্তে, জ্ঞানের জন্তে।’ মুণালিনী জোর দিয়ে বললে, ‘তুমি শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, তোমার এ আগ্রহ তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক না হোক উচিত তো এক শো বার। পৃথিবীতে কোথায় কী ঘটছে না ঘটছে তা তুমি জানবে না? বাড়ির আর-আররা উদাসীন, বুঝি, ওরা অশিক্ষিত, অসমর্থ। কিন্তু তুমি তো ওদের দলের নও। তুমি বিদ্যালয়, শুধু বিদ্যালয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয় পার হয়ে এসেছ। তুমি তো হেঁজিগেজি নও, তোমার কেন অকচিৎ হবে? তা হলে কী লাভ হল লেখাপড়া শিখে?’

নাও, এখন আবার দেখিয়ে-দেখিয়ে নিতি খবরের কাগজ পড়ো। এ আবার আরেক ফ্যাচাং। কী হয় খবরের কাগজ না পড়লে? এ বাড়িতে এসে এতদিন যে পড়ে নি, জানে নি খবরাখবর, তাতে জগৎসংসারে কার কী অশ্রুবিধে হয়েছে? নিজেই বা সে ঠকেছে কতটুকু? ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হয়েছে এ খবরের কাগজ পড়ে না জানলে কী এমন ক্ষতি হত?

পরদিন খুঁজে পেতে বাঙলাখানা সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগে পড়তে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী দেখুক এ নিশ্চয়ই তার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে কাঁপিয়ে পড়ে হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নেবে এ কল্পনাও করতে পারত না।

‘এ কী পড়ছ?’ মুখিয়ে উঠল মৃণালিনী।

‘কেন, খবরের কাগজ—’

‘খবরের কাগজ। বাঙলাটা তোমাকে কে পড়তে বলছে? তুমি এম-এ পাশ না? তুমি ইংরিজি পড়বে।’ মৃণালিনী নিজেই বাঙলার বদলে ইংরিজিটা এনে দিল কাকলিকে।

কোনটা আনতে কোনটা এনেছে। যুহু হেসে কাকলি বললে, ‘এটা কালকের মা।’

ইংরিজি জানে বলেই তো ভুলটা ধরতে পেরেছে কাকলি। তাই মৃণালিনী খুশিই হল। বললে, ‘খুঁজে পেতে তুমিই দেখ না আজকের তারিখের ইংরিজিটা কোথায়! তুমি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কারু দাঁত ফোটাবার কেরামতি নেই। আর সকলে তো অবাচণ্ডি। তুমি তো আর ওদের খাতায় নাম লেখাও নি। তুমি ডিগ্রিধারী। তুমি কত পড়বে, জানবে, বলবে, বোঝাবে আমাদের, বক্তৃতা দেবে, দাবড়ে বেড়াবে সবাইকে—’

ইংরিজি কাগজের আড়ালে সলজ্জ মুখে হাসতে লাগল কাকলি।

মৃণালিনী সেদিন জিজ্ঞেস করল স্বকাস্তকে, ‘সত্যি বলছিস ছোট বউমা এম-এ পাশ করেছে?’

‘তাই তো শুনেছি।’ বোকা-বোকা মুখ করল স্বকাস্ত।

‘তোমার সঙ্গে ইউনিভার্সিটিতে পড়ত না বলেছিলি?’

‘সেইরকমই তো দেখতাম ছায়া-ছায়া।’

‘আমার মনে হয় নিশ্চয়ই কোথাও ধোঁকা আছে।’

‘কেন বলো তো?’ চমকে ওঠবার ভাব করল স্বকাস্ত।

‘নইলে এম-এ পাশ করেছে মেয়ে, কথায়-বার্তায় একটাও ইংরিজি বলবে না? একটুও তাঁর দাব নেই, দাবাট নেই এ কখনো হতে পারে?’ মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল : ‘লোকে বউ দেখতে আসে, কেউ এম-এ পাশ বলে বিশ্বাস করে না। নিরীহ, নিস্তেজ, এতটুকু জেলাজমক নেই, উচু-নিচু কথা নেই একটাও। ঘরে ঢুকে এমন একটাও মোটাসোটা ইংরিজি নভেল-টভেল খুঁজে পাই না যে বলতে পারি ছোট

বউমা পড়ছিল! লোকে যে বিশ্বাস করতে চায় না দোষ কী। আমি প্রমাণ করি কী করে? ছোট বউমাই বা কী করে প্রমাণ করে? এই যদি দশা তবে বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী?’

‘সব সমান।’ নিশ্চুহের মত মুখ করল স্নকাস্ত : ‘হরে দরে হাঁটুজল।’

‘কার সাধ্য তফাত করে।’ অল্পতপ্ত মৃণালিনীর কণ্ঠ : ‘এমন জানলে বড় বউয়ের বেলায় বলে দিতাম বি-এ পাশ।’

তবু যা হোক একটু কম করে বলত। মনে মনে হাসল স্নকাস্ত।

‘তুমি যদি সেই বড় বউয়ের মতই হৈশেল ঠেলো, কালিঝুলি মেখে থাকো আর ছত্রাকার হয়ে ঘুমোও, কী দরকার ছিল বিত্তের জাহাজ হয়ে?’

এই কথাটাই সেদিন সাড়স্বরে বলছিল আবার স্নকাস্ত।

‘মা বলছিলেন, তুমি যে এম-এ পাশ করেছ তার কোনো প্রমাণ নেই।’

‘কেন?’ তরলস্বরেই প্রশ্ন করল কাকলি।

‘তুমি কথায়-কথায় ইংরিজি বুকনি দাও না—’

‘ইংরিজি বুকনি দিলে এম-এ বোঝা যেত কী করে? আই-এ বি-এও তো হতে পারত।’

‘তবু কিছু একটা অকুমান করা যেত সহজে।’

‘আর?’

‘মোটামোটো দেখে ইংরিজি নভেল-টভেল পড়ে না।’

‘সে তো অনেকে পাশ-টাশ না করেও পড়ে। তাতে আর কী প্রমাণ হত?’

‘তবু কিছুটা মান বাড়ত সংসারের। কেমন দেখ এম-এ পাশ বউ সব সময়ে বই, আউট-বই নিয়ে মশগুল। কেমন স্নন্দর সংসারকর্মে উদাসীন!’

‘স্নন্দর?’ কাকলি হাসবে না গম্ভীর হবে ভেবে পেল না।

‘নইলে, মা বলছিলেন, বড় বউ আর ছোট বউয়ে তফাত কী! ছোট বউ যদি সেই হাঁড়িই ঠেলে, বাসনই মাজে, কাপড়ই কাচে, ঝাঁটপাটই দেয়, তা হলে এম-এ পাশে আর কী এগুল?’

‘তুমি কী বললে?’

‘আমি আর কী বলব! আমি বললাম, সব স্ববোধের এক গোয়াল।’

‘তার মানে যে মেয়ে এম-এ পাশ করেছে সে সংসারের কাজকর্ম করবে না?’ কাকলি প্রায় কোমর বাঁধল এবার।

‘করবে কিন্তু অমন করে দু হাতে নয়। অষ্টাঙ্গে নয়।’

‘তার মানে, এম-এ পাশ বলে হাঁ করে খাব না?’

‘খাবে কিন্তু হাঁ-টা একটু ছোট করবে।’

‘কোন ছুঁতে? আমার খিদে কি কম রান্ধুসে? আমার কি পাখির ঠোট?’
কাকলি ঘুরে দাঁড়াল: ‘বেশ, আমি খাব না, রান্ধব না, চুল বাঁধব না—’

‘চুল বাঁধবার দরকারই হবে না।’

‘কেন?’

‘চুল বাড়কাটা করে ফেলবে। মানে বব করবে। শ্যাম্পু করে ফাঁপিয়ে রাখবে। ঝাঝঝাঝির মধ্যে যাবে না।’ স্ন্যাস্ত কাকলির চুলে হাত রাখতে গেল, কাকলি সবগে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিল মাথা। হাসতে লাগল স্ন্যাস্ত। ‘এমনি করে বারে-বারে মাথা ঝাঁকাবে, চেউ খেলাবে ঝাঁকড়া চুলে। বারে বারে কানের পিঠে তুলে দেবে আঙুলে করে।’

‘তা হলেই প্রমাণ হবে আমি এম-এ পাশ?’

‘জানি না। তবে এটুকু বুঝছি, প্রমাণ একটা দেওয়া দরকার। সংসার চাইছে, মা চাইছেন। আত্মীয়-প্রতিবেশী যারা দেখতে আসছেন তাঁরা চাইছেন।’

‘তবে ডিপ্লোমাটা তাঁদের দেখাও গে।’

‘তা হলে তো কনস্টিটিউশন দেখিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রমাণ করতে হয়।’

‘তা নইলে কী করে হবে?’

‘কাজ দিয়ে হবে। নইলে যদি জল শুকিয়ে যায়, গাছে ফুল-ফল না ধরে, হাওয়া বিধিয়ে ওঠে ব্যাধিতে, শস্তের জমি বন্ধা হয়, তা হলে আর দেশকে স্বাধীন বলি কি করে, বা, বলেই বা প্রবোধ কোথায়?’ অল্প দিকে মুখ করল স্ন্যাস্ত।

‘তার মানে?’ কথাটা আবার কোন দিকে যাচ্ছে, যেন আঁচ করতে পেরেছে কাকলি।

‘তার মানে ডিপ্লোমার কাকলি কোন কাকলি তার সাব্যস্ত হবে কিসে?’

‘কিসে?’

‘এমন একটা কাজে যা একমাত্র এম-এ পাশ মেয়েই করতে পারে। যা বউদি পারে না, কাকিয়া পারে না, মা পারে না।’

‘মানে এমন একটা চাকরি যা শুধু এম-এ ডিপ্লোমাধারীর পক্ষেই করা সম্ভব।’

‘এই তো, এই তো প্রমাণ তুমি এম-এ পাশ।’ উল্লসিত হয়ে ওঠবার ভাব করল স্ন্যাস্ত: ‘অনেক বিজ্ঞা না হলে কি এতটুকু বুঝি হয়?’

ঘণার চোখে তাকাল কাকলি। অনবরত খোঁচাচ্ছে, নানাভাবে কোণঠাসা করছে,

ঠেলে দিতে চাইছে টাকা রোজগারের রাস্তায়। দু দণ্ড ঠাণ্ডায় থাকতে দিচ্ছে না। একটা শুধু যন্ত্র বানাতে চাইছে, এখন উপার্জনের যন্ত্র।

‘তা হলেই খালে-বিলে জল আসবে, ফল ধরবে গাছে, হাওয়া রোগমুক্ত হবে আর জমিতে ফলবে কসলের স্বপ্ন?’ কাকলি ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়াল।

‘তখন তোমাকে অল্প এক মূর্তিতে দেখব।’ হাত বাড়িয়ে আদর করতে চাইল স্বকান্ত, নাগালে পেল না, তবু বললে গাঢ়স্বরে, ‘নিশ্চয়ই। তুমিই তো আমার কসলের স্বপ্ন।’

‘আর এই যে সংসারের কাজকর্ম করছি, রাঁধছি-বাড়ছি, বাটনা বাটছি, কুটনো কুটছি এ আমার অল্প এক মূর্তি নয়? বাপের বাড়িতে কোনোদিন রেঁধেছি আমি, না বসেছি বঁটি পেতে? না কি উন্ন ধরিয়েছি?’

‘নিশ্চয়ই এ অল্প মূর্তি। কিন্তু নতুন-নতুন অল্প মূর্তি চাই।

‘নতুন-নতুন?’

‘হ্যাঁ, তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে। এম-এ পাশ মেয়ে সংসারের হাঁড়ি ঠেলেছে, নিশ্চয়ই এ নতুন মূর্তি, মধুর মূর্তি। কিন্তু এখানেই ঠেকে থাকলে চলবে না। আবার আরেক মূর্তি ধরো। এবার রান্নাঘর ছেড়ে ধরো অফিস-ঘর। হাতা-খুস্তি ছেড়ে খাতা কলম। আরেকরকম সাজসজ্জা। বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে হিল-উচ্চ জুতোয় খুট খুট করে হেঁটে চলো ফুটপাতে।’

এত সহজে হাসে কাকলি, এখন এক ফোঁটা হাসল না। বললে, ‘সেখান থেকে আবার আরেক মূর্তি ধরতে হবে না?’

‘যদি পারো তো জগৎসংসার অভিনন্দন দেবে। হয়তো সেই আফিসের কর্মীসংসদের তুমি অধিনেত্রী হলে, ব্যক্তিস্বৈ আনলে একটু রাজনীতির স্বাঁজ, সেখান থেকে আবার আরেক শাখায় হাত বাড়ালে। বিস্তৃত হলে দেশসেবার কাজে। জননায়িকা হলে। ভোট দাঁড়ালে। মন্ত্রী হলে।’

‘কেন, সিনেমা স্টার হলাম না?’

‘হায়, তত স্মৃতি কি আছে সিনেমা স্টারের স্বামী হব! তার মোটরগাড়ীর ড্রাইভার হব!’ স্বকান্ত কলেজে বেরুচ্ছিল, পাঞ্জাবির উপর কাঁধে একটা ভাঁজ-করা চাদর জড়িয়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, ‘শোনো। আমাদের সন্তার পদ্মের অনেকগুলি পাপড়ি। একটা-একটা করে যতই তার পাপড়ি খুলবে ততই তার গন্ধ বাড়বে, বর্ণ বাড়বে, শোভা বাড়বে। বাড়তে-বাড়াতে কে না চায়! দেহের স্বাদ যেমন ভক্তির নতুনস্ব, জীবনের স্বাদ তেমনি ব্যক্তিস্বের নতুনস্ব। বলো তাই



নয়? এক্ষেত্রে হয়েছে কি পোকায় ধরেছে। সেই বেঁচে থাকে যে নতুন হয়ে থাকে। নতুনই ফুরায় না, হারায় না—’

‘খুব তো বক্তৃতা মারছ কিন্তু তোমার নিজের কই নতুন হওয়া?’ খেকিয়ে উঠল কাকলি।

‘আগে শুধু পাঞ্জাবি পরতাম, এখন একটু পৃথক, সম্ভ্রান্ত হয়েছি বলে কাঁধে চাদর নিয়েছি।’ স্নানমুখে হাসল স্কাস্ত।

‘কেন, স্মাট নয় কেন, ফুল-স্মাট?’ প্রায় মুখের উপর ছুঁড়ে মারল কাকলি : ‘পাঞ্জাবি-চাদরেই কেন ঠেকে থাকবে? সম্ভ্রান্ত আর একটা পাপড়ি খোলো। প্রাইভেট টিউটর থেকে মার্কেটাইল কার্মের অফিসর হয়ে যাও। স্কাপোকা থেকে প্রজাপতি। একটু দেখি তোমার ব্যক্তিত্বের ঝিলিক, চক্ষু সার্থক করি। আমাকে তো বব করিয়ে হিল-উচ্চ জুতোয় খুট খুট করে হাঁটাচ্ছ ফুটপাতে, তুমিও ফুল-স্মাটে ট্রিমড্ হয়ে গ্যাট-ম্যাট করে হাঁটো না আমার পাশে-পাশে। নিজের বেলায় আড়িঙটি। আমাকে তো মজী বানাচ্ছ, তুমি নিজে কেন রাজা হও না? এক রাখাল তো হয়েছিল রাজা—’

মানে তুমি রাখালেরও অধম। তুমি এক সামান্য প্রাইভেট টিউটর। এমন করেই স্তনল যেন স্কাস্ত। যেতে-যেতে ধামল। বললে, ‘এ স্বপ্নের কথা হচ্ছে না, সাধ্যের কথা হচ্ছে। যদি কারু সাধ্য থাকে, প্রসন্ন হচ্ছে, সে থাকবে কিনা নিষ্ক্রিয় হয়ে। যদি গুণ থাকে সে থাকবে কেন মুখ বুজে?’

কাকলি বললে, ‘কখনো-কখনো মুখ বুজে থাকাটাই গুণ। নিষ্ক্রিয়তাই প্রকাণ্ড শক্তি।’

আশ্চর্য, ছেলের সঙ্গে মা মিলেছে।

সকালবেলা বন্দনার সাহায্যে রান্নাঘরে এসেছে কাকলি, দেখল, ঠাকুর রাখা হয়েছে।

‘বা, ভেবেছিলাম আমি আজ রাঁধব—’ কাকলি করুণ মুখ করে বললে।

‘না, না, তোমাকে রাঁধতে হবে না। ধোঁয়ার গরমে কষ্ট করতে হবে না।’ ঠেস দিয়ে নয়, অশেষ সান্ত্বনার স্বরে বলল মৃণালিনী, ‘তুমি যোগ্য মেয়ে, বিদ্বৎ মেয়ে, তোমার ফিল্ড্ রান্নাঘরে নয়—’

‘দিদির কাছ থেকে দু একটা করে বেশ রান্না শিখছিলাম—’ কাকলি অক্ষুট আপত্তি করতে চাইল।

‘অনেক শিখেছ, কত বই পড়েই না পরীক্ষার ঐ শেষ চূড়োটা পার হতে হয়েছে—

এ খোড়-বড়ি-খাড়া না শিখলেও চলবে।' সন্দেহ কি, সন্ধ্যার সুরেই কথা বলছে মৃণালিনী : 'এম-এ পাশ মেয়ে হাঁড়ি ঠেলবে কী ! তার অন্তরকম কাজ, বড়রকম কাজ। ফেন গালতে হাত-পা পোড়ানো তাকে সাজে না। তাই ঠাকুর রাখলাম।'

সহ হচ্ছিল না বন্দনার। বললে, 'তবু যা হোক এম-এ পাশ বউ এসেছিল বলে তার খাত্তিরে ঠাকুর হল।'

'এম-এ পাশ বউ একটা কথার কথা?' ধমকে উঠল মৃণালিনী : 'তুমি একটা ম্যাট্রিক পাশই হয়ে দেখাও না। সে আর তুমি, আর, যারা সব আছে, সব এক ক্লাশ, এক নমুনা ? যদি ঠাকুর আসে, যে কারণেই আসুক, তোমারও তো উপকার হল। তবে হিংসেয় বুক অত চম্চড় করছে কেন ? এরই জন্তে লেখা-পড়ার দরকার।'।

ভূপেনের আপত্তি অগ্র কারণে। সে বললে, 'দিবি এক-আধটু ভালোমন্দ খাচ্ছিলাম, কোথেকে এক ভূত চালান করে আনলে। এত হঠাৎ বড়লোকি দেখাবার শখ হল কেন ?'

'না, তোমার মত চিরকাল গরিবি চালেই চলতে হবে।' হাত থেকে মেঝেতে একটা কাঁসার বাসন পড়ার মত করে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী : 'সংসারের অবস্থা কেবাবার চেষ্টা করতে হবে না ? এ বড়লোকি তোমার টাকায় নয়, ছেলের টাকায়, স্কুর টাকায়। তোমার সাধ্য ছিল হৈশেলের খিটকেল থেকে তোমার স্ত্রীকে মুক্তি দাও ? স্কু যখন টাকা দিচ্ছে, বেশ মোটা টাকা—আগে পুরোপুরি তিন শোই দিত—আমিই বলে-কয়ে পঞ্চাশ টাকা কম নিচ্ছি, বলেছি, ওটা ছোট বউমাকে দে, ওরও তো নিজের খরচ বলে কিছু আছে—সেই মোটা টাকা থেকে সামান্য একটা ঠাকুর হবে না সংসারে ? যার এতখানি দান তার স্ত্রীকে রিলিফ দেব না, তাকে ঝলসাপোড়া করে মারব ? তাইতো আরেকজনের লেগেছে। প্রশান্ত তো মোটে বাট টাকা দেয়। তার কবে কী মাইনে বাড়ল জানতেও পারি না, বাটের উপর একষট্টি হল না কোনোদিন। বড় বউ যে বড় চিমটি কেটে কথা কইল, প্রশান্ত একটু দিয়ে রাখত একটা ঠাকুর, কবেই তবে তার বউকে রান্নাঘর থেকে উইখড় করে দিতাম। নিজের মুরোদ নেই, পরের দেখে দোহাই পাড়া।'।

ভূপেন দেখল, ক্রমে-ক্রমেই ঘরদোরের ভোল ফিরছে। ঘরে শুধু পাখা হয় নি, দরজা-জানলায় পর্দা হয়েছে, দরজার বাইরে ওয়েলকাম লেখা পাপোশ হয়েছে টেবলক্লথ হয়েছে, বসেছে ফুলদানি। কেউ বেড়াতে এলে মেঝের উপর মাছুরের উপরে পাতা যাচ্ছে কার্পেট। নতুন বাসন-কোসন হচ্ছে, পিরিচ-পেয়লা। মেঝেতে

আসন পেতে না বসে টেবিলে চেয়ারে বসে খাওয়া যায় কিনা তাই এখন ভাবছে মৃণালিনী ।

ভূপেন বিরক্ত হয়ে বললে, ‘তুমি স্বকুর টাকাটা সব এমনি নয়-ছয় করছ নাকি ?’

‘নয়-ছয় মানে ?’ দপ করে জলে ঊঠল মৃণালিনী : ‘সংসারের একটু শ্রী ফেরানো মানে টাকা নয়-ছয় করা ? নিজের আমলে হল না, যদি ছেলের আমলে হয়, লোকে খুশি হয় ! এর আবার বিপরীত, সব তাতেই বাদ সাধা ।’

‘সে কথা হচ্ছে না ।’ ভূপেন বললে, ‘স্বকুর এটা এমন কোনো থাকিয়ে রোজগার নয় । তাই সমস্তই সাজনে-ভোজনে বার করে না দিয়ে কিছু-কিছু জমানো উচিত । কখন কোন উৎপাত এসে চিংপাত করে দেয় তার ঠিক নেই ।’

‘তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না । তার জমার ঘরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ।’

‘সে আবার কী !’ চোখ কপালে তুলল ভূপেন ।

‘তার বউ । ইচ্ছে করলে সেই কত পারবে আনতে-থুতে । এ তোমার পছন্দ করে আনা নয় । তোমার পছন্দে চললে লক্ষ্মীর বদলে পক্ষী আসত ।’

শূন্য চোখে তাকিয়ে রইল ভূপেন । মুখে থড়কে নিয়ে উঠে গেল উপরে ।

লক্ষ্মীকে ফ্যান কিনে দিয়েছে মৃণালিনী ।,

‘দেখলে সংসার তোমার উপর কত প্রসন্ন ।’ গর্বের মুখে বললে স্বকান্ত ।
‘তোমাকে কত প্রশ্রয় দিচ্ছে, কত আশ্বকুলা । কত সম্মান ।’

‘আহা’, উড়িয়ে দিতে চাইল কাকলি : ‘এ গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো । আমাদেরই টাকায় আমাদেরই জিনিস কেনা ।’

‘একান্নবর্তী সংসারে এটুকু ঘটানোতেই কত বিয় ।’ স্বস্থ সহজ নিখাস ফেলল স্বকান্ত : ‘দেখ দেখি কেমন মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ঘুরছে এখন পাখাটা । এখন এই হাওয়া কত আরামের, কত শান্তির ।’

নতুন আরেকটা পাখা ঘুরছে বাড়িতে, জয়ন্তী স্ববীর দেখতে এসেছে উদ্দীপ্ত হয়ে । সেণ্টুও এসেছে ।

স্ববীর সেণ্টুকে বললে, ‘ছাথ সব ঘরে পাখা, শুধু তোদের ঘরই ফাঁকা ।’

সেণ্টুর মুখখানি ন্নান । করুণ স্বরে বললে, ‘কী করে হবে ? মা বলেছে আমার বাবা খুব গরিব ।’

‘দেখ এ খুব অত্যাশ হল ।’ ঘর ফাঁকা হতে স্বকান্তকে বললে কাকলি, ‘এ পাখা দিদিদের ঘরে যাওয়া উচিত ।’

কথাটা স্বকান্ত কানেও তুলল না ।

‘তুমিই বলো না, তাই ঠিক ছিল না? ওঁদের ছেলেপুলের ঘর—সেন্টু এত ফ্যান ভালোবাসে—’

‘তা মাকে গিয়ে বলো না।’ ধমকে উঠল স্বকান্ত।

‘আমার কাছে যদি টাকা থাকত আমি ওঁদের একটা কিনে দিতাম।’

‘বেশ তো, টাকা থাকলেই হয়। নিজে করলেই হয় রোজগার। আটকাচ্ছে কে?’ স্বকান্ত দাঁড়াল মুখোমুখি।

‘আচ্ছা, তুমি কী! মোটে পঞ্চাশ টাকা রাখছ!’

‘পঞ্চাশ টাকা কম কী হাতখরচ!’

‘হাতখরচ? বারে-বারেই তো নিজে এসে আবার হাত পাতছ! মাকে কাছ না পেলেই আমার আঁচল চেপে ধরছ। তুমি কী!’

‘এক হিসেবে ওও তো আমারই টাকা। এ-কাউন্টার থেকে না নিয়ে ও-কাউন্টার থেকে নেওয়া।’

‘তবে আমার হাতখরচ বলছ কেন? বললাম এক শো টাকা রাখো। একটু সচ্ছল বলে অহুভব করি।’

‘একটু দান-খয়রাত করি দু পাঁচজনকে!’ ব্যঙ্গের স্বর আনল স্বকান্ত।

‘মন্দ কি যদি পারা যায়।’

‘বেশ তো করো না, রাখো না। নিজে একটা কাজ-টাজ নিয়ে শক্ত থাবায় মোটা রোজগার করো না। কে বারণ করছে? তারপর নিজের টাকা বিলোও স্বচ্ছন্দে! পঞ্চাশ-এক শো কেন, ঢের ঢের অনেক—’

‘রোজগার করা যেন কত সোজা—’ চোখ নামাল কাকলি।

‘চেঁটা করে দেখতে দোষ কী! যদি রাজি থাকো তো আমিও খুঁজতে পারি। বলতে পারি এদিক সেদিক—’

না—তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে পারল না কাকলি। সে কি হেরে যাচ্ছে? মরে যাচ্ছে কোণের দিকে? চাপে পড়ে দুর্বল, নির্বাক হয়ে যাচ্ছে? দুপুরের ঘুম ছেড়ে নিভৃতি ছেড়ে সে কি চলে আসছে রাস্তায়, ধুলোমাখা রোদ্দুরে, মাস্তবের ধুলোমাখা কোঁতুলের সামনে? না, সে ঘুমুচ্ছে তার ঘরে, ঘুরন্ত পাখার নিচে, সেন্টুকে বুকে নিয়ে। এখনো ঘুমুচ্ছে।

পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে বন্দনা।

সেও মেনে নেয় নি অপমান, শ্রুততার অপমান। প্রশান্তকে দিয়ে পাখা করিয়েছে। কেনাতে পারে নি, ভাড়া করিয়েছে। আর তাই এখন ঘুরিয়েছে সতেজে!

সেটুও কম যায় না। যে কদিন মার ঘরে পাখা হয় নি কাকলির কাছে আসে নি শুভে। তানানানা করে ফিরিয়ে দিয়েছে। মার ঘরে পাখা হতেই আবার জাকড়েছে কাকলিকে। তার মা ঠিক থাকলেই কাকিমার কাছে তার ঠিক থাকা।

দরজা ঠেলে মৃণালিনী ঘুমন্ত হুই ঘর একবার দেখে নিল। তারপর আস্তে আস্তে ঢুকে বন্দনার ঘরের স্নইচটা অফ করে দিল। অফ করে দিয়ে আবার সরে গেল ধীরে ধীরে।

কতক্ষণ পরেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল বন্দনা। এ কি, পাখা বন্ধ কেন? কে বন্ধ করল?

উঠে পাশের ঘরটা দেখে নিল উকি মেয়ে। সে ঘরে দিবি পাখা ঘুরছে। সে ঘরের পাখা কেউ বন্ধ করে নি।

‘এ আমার নিজের পাখা, এ আমি যত ইচ্ছে ঘোরাব।’ জলন্ত গলায় চৈচিয়ে উঠল বন্দনা। স্নইচটা ফের অন করে দিয়ে বললে, ‘অন্তের ঘরে ঘুরতে পেলে আমার ঘরেই বা পারবে না কেন?’

‘এ শুধু পাখা ঘোরানো নয়, এ কারেন্ট খরচ হওয়া।’ রাগে গরগর করতে করতে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল মৃণালিনী। বললে, ‘এ পয়সা ওড়ানো। যাদের বাট কখনো একষট্টি হবে না তাদের আবার কিসের ফুটনি!’

... ২৩ ...

আবার কী স্নন্দর মেঘ করেছে দেখ। আবার বৃষ্টি নামবে কামকাম করে। পথঘাট ভেসে যাবে। অশ্রুটে থরথর করে কাঁপবে বৃষ্টি কদমগাছটা। সারা গায়ে কুঁড়ি ধরি-ধরি করবে।

মেঘ দেখলেই মন কেমন উড়ু-উড়ু করতে থাকে। ইচ্ছে করে কোথাও চলে যাই। দূরে, নিরালস্য, নাম-না-জানা নির্জনে। কিংবা অন্তত বিয়ের আগের পুরোনো বাড়িটা একবার একটু ঘুরে আসি।

কাকলি টের পেল তার চোখের পাতা অজানতে ভিজে উঠেছে।

লুকিয়ে লাভ কি, সত্যি ভারি মন কেমন করে বাবা-মার জন্তে। কত দিন দেখি না। কত দিন শুনি না। কী স্বপ্নে না জানি ডাকতেন নাম ধরে। কী না জানি

কাই-করমাশ করতেন। কিংবা কে জানে করতেনই না বোধ হয়। আহা, পড়ছে পড়ুক, ঘুমুচ্ছে ঘুমুক একটু শান্তিতে। মা কী করে বুঝতেন, থেকে থেকে এসে মুখে খাবার পুরে দিতেন, খাব না বললেও শুনতেন না। বলতেন, না খেলে গায়ে জোর থাকবে কি করে, গায়ে জোর না থাকলে পড়াগুলিকে স্বতঃস্ফূর্তি দিচ্ছে কি করে য়েঁথে রাখবি? আশ্চর্য, মার একবারও এখন জানতে ইচ্ছে করে না তার গায়ের জোরের খবর কী, এখনো সে তেমনি ঘুমকাতুরে কিনা, অকারণে খিদে পায় কিনা আগের মত। মা না খোঁজ নিন, পত্রালিও তো একটা চিঠি লিখতে পারে। নরুকাকা তো বলেই দিয়েছেন, আমি শুধু বিপদের দিনেই স্বরণীয়, আর, ঈশ্বর কখন, তাদের সম্পদের সব কটা পা-ই যেন বজায় থাকে। নরুকাকা না আসুন, কিন্তু তাইয়েরা? তারা তো কত রাজ্য টহল দিয়ে বেড়ায়, পথ ভুলেও একবার আসতে পারে না এদিকে?

একদিন বাইরে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার আগে স্বকান্ত বলেছিল, ‘চলো না তোমার বাপের বাড়িতে।’

মুহূর্তে একটা সমুদ্র বুঝি ঢলে উঠেছিল বুকের মধ্যে। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিল কাকলি। পরে বললে, ‘না।’

‘তুমি একা গেলে বরং কথা ছিল।’ প্রবোধের স্বরে স্বকান্ত বললে, ‘দু-জনে একত্রে গিয়ে সবিনয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালে ভোজবাজি হয়ে যেতে পারে। অনেকের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে বলে শুনেছি। এখন আর অস্বীকার করবার মানে হবে না। ঘটানোকে কি করে আর খণ্ডানো যাবে? ইট ইজ নো ইউজ ক্রাইড ওভার—চলো।’

‘না।’ কাকলি আবার বলল সংক্ষেপে।

বাবা-মাকে সে পরাভূত করে এসেছে। এখন যদি সে যায় তাকে নিশ্চয়ই তাঁরা ক্ষমার চোখা চোখ দেখবেন না। হয়তো দেখবেন কাকলি নিজেই কেমন স্তিমিত, নীরস, বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। হয়তো প্রচ্ছন্ন শুনবেন তার একটি নিকট দীর্ঘশ্বাস। হয়তো বা অস্বস্তি করবেন খাবার পরেও তার খিদে থাকে, ঘুমবার পরেও তার ক্লান্তি যায় না। হয়তো বা আবিষ্কার করবেন তার সাজগোজ গরিব, চলাবলা নিরীহ। মুখচোখ কাঁড়াল-কাঁড়াল।

দরকার নেই। ধরা পড়ে যাবে। সবাই বুঝবে, যে পরাভব করেছিল সেই আসলে পরাভূত।

যখন দিন হবে তাদের, মোটর গাড়ি হবে, অত না হোক, যখন স্বকান্তর একটা

সুখী চাকরি হবে তখন নিজের থেকেই একদিন যুগলে উপস্থিত হবে না-হয়। কাকলির তখনই হবে ঠিক উজ্জয়িনীর চেহারা, তখনই মানাবে তার উদার অবতরণ।

মুখে বললে সে অল্প কথা। বললে, ‘যারা অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে সেধে তাদের সোহাগ কুড়োতে যাবে না। দরকার হয় তারা ডাকুক। তারা নিমন্ত্রণ করুক।’

হ্যাঁ, আমরাও নিষ্ঠুর হতে জানি। প্রিয়তাতে যেমন ছিলাম তেমন শত্রুতাতেও আছি। কাকলির দৃষ্ট ভঙ্গিটা যেন তাই আরো বলল সুকান্তকে।

সুকান্ত বললে, ‘তা হলে নরকাকার বাড়িতে চলো। তাঁরা তো আর লাঠিমাঝা নন।’

কাকলি হাসল। বললে, ‘কিন্তু আমরা তো এখনো সম্পদেই আছি।’

‘সম্পদে আছি মানে?’

‘নরকাকা বলে দিয়েছিলেন শুধু বিপদেই তিনি স্মরণীয়। ‘আমাদের এখন যখন কোনো বিপদ নেই তখন তাঁকে বিরক্ত করাটা ঠিক হবে না।’

‘আমাদের বিপদ নেই কে বললে?’

ভয়ে-ভয়ে সুকান্তর মুখের দিকে তাকাল কাকলি। বললে, ‘আমাদের আবার কী বিপদ?’

কেমন করে কথাটা বলবে বুঝতে পারছিল না প্রথমে। খানিকটা আমতা-আমতা করে বললে, ‘এই আমাদের অসচ্ছল অবস্থা—’

‘অসচ্ছল অবস্থা মানে?’

‘একেবারে নির্বাত গ্রীষ্ম হয়তো নয় কিন্তু দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্যই বা কোথায়?’

‘তা নরকাকা কী করবে?’

‘নিজে কিছুই করবে না। শুধু তোমার বাবাকে ধরবে। ধরে একটু নাড়াচাড়া করবে। তা হলেই—’

‘তা হলেই—’

‘হঠাৎ গুমোট ভেঙে হাওয়া ছুটবে হ-হ করে।’ হ-হ করেই সুকান্ত বলে ফেলল কথাটা : ‘উড়িয়ে নিয়ে আসবে তোমার দশ হাজার টাকার সার্টিফিকেট কথানা। এক গাছি পারিজাতের মালা।’

কাকলির কানের মধ্যে যেন কে গলানো সিসে ঢেলে দিল। সুকান্তের মুখের থেকে ফিরিয়ে নিল চোখ। দৃঢ়স্বরে বললে, ‘বাড়ি ফিরে চলো।’

‘তা যাচ্ছি। কিন্তু আত্মীয়স্বন্ধে ঝগড়া জ্বিইয়ে রাখার কোনো মানে হয় না।

বিশেষত সে আত্মীয় যখন দমে ভারি।’ কিরকম করে হাসল স্বকান্ত : ‘একটু জপতপ করলেই হয়তো মিলে যায় যোগসিদ্ধি। একটু পূজন-ভজন, একটু স্তবস্ততি।’

মুখের দিকে তাকাবে না ভেবেও তাকাল কাকলি। কেমন বেনে-বেনে দেখাচ্ছে স্বকান্তকে। আর তার হাসিটা ঠিক প্রতারকের হাসি।

কিন্তু আকাশে আজ নতুন মেঘ দেখেও স্বকান্ত সেই টাকার কথাই ভাববে, বলবে, ভাবতে পারত না কাকলি।

উপরে আসতেই কাকলি বললে, ‘কী সুন্দর মেঘ করেছে দেখ !’

জানলায় কোথায় একটু কাকলির পাশ ঘেঁষে দাঁড়াবে, তাকাবে বাইরে—স্বকান্ত গ্রাহ্যও করল না। আকাশে মেঘ করেছে, তা আবার দেখবার কী ! হয় ঝরবে নয় উড়ে চলে যাবে নভাস্তরে।

‘তোমার আর কি।’ বললে দিবি স্বকান্ত, ‘তোমাকে তো আর বেরুতে হয় না, ঘুরতে হয় না টাকা রাজগারের ফিকিরে। বৃষ্টি হলে দিবি গোল হয়ে ঘুমবে দুপুরবেলায়। আর আমি ? আমার না আছে ছাতা না আছে ওয়াটার প্রফ। আমার খাড়া ধারাস্নান।’

‘বেশ তো, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো না, আমিও ভিজব।’ ছোট মেয়ের মত প্রায় নেচে উঠল কাকলি।

এ কিরকম স্বর, সন্দেহের চোখে তাকাল স্বকান্ত। এ তো তার সঙ্গে রাজগারের রুক্ম রাজপথে বেরনো নয়, এ প্রায় শূন্যে ওড়া !

‘তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব ?’ ধমকে দাঁড়াল স্বকান্ত।

‘চলো না হু-জনে কদিন বাইরে থেকে ঘুরে আসি। সমুদ্রের পারে নয়তো কোনো পাহাড়ের দেশে।’ চুলে-আঁচলে যেন সেই দূরের চাঞ্চল্য নিয়ে এল কাকলি : ‘নয়তো কাছাকাছি এমন কোনো একটা সুন্দর জায়গায় যেখানে অখ্যাত বলে সভা স্বাহুধেরা কেউ যায় না। তোমার আর কী ভাবনা, তুমি ছুটি করলেই তোমার ছুটি। সত্যি, চলো না লক্ষ্মীটি—’

চলো—মুখে এটুকু বলতে কী হয়েছিল ! ঋণকালের জন্মে হলেও ভদ্রর একটি কল্পনার মান রাখা যেত না ? লোকে কি সব সময় টেনেই যায়, মনে-মনে যায় না ?

গভীর হল স্বকান্ত। বললে, ‘টাকা নেই।’ পরে হঠাৎ হাত পাতল কাকলির কাছে : ‘দেবে কিছু টাকা ?’

‘কোন দুঃখে ?’

‘একবার তা হলে বিলেত যেতাম। দুঃখ ফেরাতাম।’

‘টাকা থাকলে আমি তো নিজেই যেতে পারি, একটা অপদার্থকে দিতে যাই কেন?’

‘আমি অপদার্থ?’

‘যে টাকার জন্তে স্ত্রীর কাছে হাত পাতে তাকে আর কী বলে!’ কাকলি নিজেকে আর সংবরণ করল না।

হঠাৎ স্বকান্ত হরিপদকে তারস্বরে ডাকতে লাগল কিন্তু হরিপদর সাড়াশব্দ নেই। কী কাজে ওকে বাইরে পাঠিয়েছে, তাই বলতে এল মৃণালিনী। এমন গাঁক গাঁক করে চিংকার করছিল কেন? ঘরে ডাকাত পড়েছে, না কি এ-সি কারেন্টে আটকে গেছিল কেউ? কী ব্যাপার?

‘আমার জুতোতে কালি দেয় নি কেন?’ খেকিয়ে উঠল স্বকান্ত।

‘দেয় নি তো নিজে দিয়ে নে।’ মৃণালিনী পালটা বললে, ‘সংসারে একটা মাত্র চাকর কত দিক সামলাবে। নিজেদের হাত-পা নেই?’

‘সেই হাতে কলম পিষব, না জুতো ঘষব? বলি, আমার সময় কই?’

‘বা, আমাকে বলো নি কেন?’ কাকলি উঠে পড়ল। জুতো কালি বুরুশ নিয়ে দিবি বসল মেঝের উপর। বললে, ‘যা বৃষ্টি আসছে তাতে জুতোতে কালি লাগানো রুখ।’ এমনিতেও ঢোল এমনিতেও ঢোল।’

‘বটেই তো।’ স্বকান্ত ব্যঙ্গের টান দিল। ‘শিক্ষার প্রসাধনে আর দরকার কী! এমনিতেও মেয়ে এমনিতেও মেয়ে।’

‘ই্যা, তাই। কিন্তু জুতোয় কালি দেবার জন্তে বাড়িতে কেউ এমনি হামলাদার হয় না। আজকাল রাস্তার মোড়ে মোড়ে জুতোবুরুশ পাওয়া যায়—’

‘পয়সা লাগে, পয়সা।’

‘কটা বা পয়সা!’ তাক্কিল্যে ঠোট ওলটাল কাকলি।

‘রোজগার তো করতে হয় না, তাই লাগে না বলতে। কটা পয়সাই বা আমাকে দেয় কে।’

‘শোনো।’ গম্ভীর হল কাকলি: ‘পয়সার কথা যখন উঠেছে তখন এখনই বলি—’

‘কি?’ মুখচোখ সন্দিগ্ধ করল স্বকান্ত।

‘আমাকে পাঁচটা টাকা দাও।’ কাকলি চোখ নামাল।

‘কী হবে?’

‘কিছু কেনাকাটা আছে।’

‘কী কেনাকাটা ?’

ভেবেছিল, বলে, হকার্স কর্নার থেকে দুটো ব্লাউজ কিনবে। কিন্তু স্বকাস্ত্র জিজ্ঞাসার খোঁচাটা কোথায় যেন গিয়ে বিঁধল। বললে, ‘অত শত বলতে পারি না। টাকার স্ফায়া দরকার হয়েছে, বলেছি, তুমি এখন তার ব্যবস্থা করবে।’

‘করব। কিন্তু তোমার হাতে যে পঞ্চাশটা টাকা দিয়েছিলাম গোড়াতে—’

‘ঐ দেখ তার হিসেব।’ টেবিলের উপর বাঁধানো একটা নোটবইয়ের দিকে ইঙ্গিত করল কাকলি : ‘কড়ায়-ক্রান্তিতে বিত্ত দেওয়া আছে। একটা আধলাও নেই আর তবিলে।’

‘সব গেছে ?’

‘যাবে না তো কী ! ঐ টাকার থেকেই তো নিজে আবার নিচ্ছ নানা কায়দা করে ! বিশ্বাস না হয় দেখ না খাতা খুলে।’

সতিহি খাতাটা খুলল স্বকাস্ত্র। বললে, ‘আহা, হাতের লেখাটি কী সমস্ত !’

‘তোমার কীর্তিই তো লিখেছি, যত্ন না করে উপায় কী !’ সংস্কৃত জুতো পায়ের কাছে পাশাপাশি রেখে উঠে পড়ল কাকলি। এগুল টেবিলের কাছে। বললে, ‘দেখ, একবার দিয়ে পরে আবার নিয়ে যাবার মতলবে তোমার খাবাগুলো দেখ। একটা টাকা শাস্তিতে খরচ করার মত সামান্য যে একটু স্বাধীনতা তাতেও তোমার হিংসে।’

‘তাই তো দেখছি।’ পায়ে জুতো গলিয়ে চলে যাবার উদাসীন ভঙ্গি করল স্বকাস্ত্র।

‘সে কি, টাকাটা দিয়ে যাও।’

‘মার থেকে চেয়ে নিও।’

‘বা, মার থেকে চাইব কেন ? আমি—আমি তোমার থেকে চাইব।’

‘আমার হাত তোমার ঐ ললাটের মতই শূণ্য।’ যেতে যেতে থামল স্বকাস্ত্র : ‘শাখাপ্রশাখা যখন নিঃশেষ হয়ে যায় তখন মূল কাণ্ড—মূল কাণ্ডের কাছেই প্রার্থনা জানাতে হবে। স্বতরাং মার কাছে হাত না পেতে উপায় নেই।’

‘আমি তা জানি না। আমি স্ত্রী, আমি শুধু তোমার কাছে হাত পাতব। তখন তুমি জানো তুমি কোথেকে এনে দেবে। চেয়ে-চিন্তে ভিক্ষে করে, না সমুদ্র সৈঁচে ?’

‘তুমি শুধু স্ত্রী ? তুমি আবার কণ্ঠা না ? তবে বাপ-মার কাছে চাইতেই বা তোমার লজ্জা কিসের ?’

মনের মধ্যে কোন ঘা নিয়ে এই কথাটা বলছে অনায়াসে বুঝতে পেরেছে কাকলি।

তবু সে হাসল। বললে, ‘বাবা-মা কী দেবে, কত দেবে? যে যা দেবে তাই পরিমিত। একমাত্র স্বামীই অপরিমিত দিতে পারে স্বীকৃত। তোমার কাছে তাই আমার আকাঙ্ক্ষাও নির্লজ্জ, তোমার দানও অক্ষুণ্ণ।’

‘দাঁড়াও, মাকে বলে যাচ্ছি। কত বললে? পাঁচ? আচ্ছা—’দিবি পাশ কাটিয়ে পিছলে চলে গেল স্বকান্ত।

নিচে মৃণালিনী তাকে ধরল। বললে, ‘তুই একটা কী বল তো!’

‘কেন?’ ইঁ হয়ে গেল স্বকান্ত।

‘তুই বউকে দিয়ে জুতো-বুরুশ করাচ্ছিস?’

‘কেন, তাতে দোষের কী! বউ যদি জামায় বোতাম লাগাতে পারে, ছেঁড়া জায়গাটা টেকে দিতে পারে, জুতোয় একটু কালি বুলোলে এমন অধর্ম কিসের?’

‘নিশ্চয়ই অধর্ম।’ মৃণালিনী কণ্ঠস্বর তপ্ত করল: ‘একটা এম-এ পাশ মেয়ে—’

কথাটা শেষ হবার আগেই হেসে উঠল স্বকান্ত। বললে, ‘দেখ না এম-এ পাশ মেয়ে—কেমন নিখুঁত হিসেব রেখেছে, আর কেমন পরিপাটি হস্তাক্ষর। চুলের ফিতে চৌদ্দ পয়সা। তেলেভাজা দু’ আনা। শীতলার থালা পাঁচ পয়সা—’

মৃণালিনী ধমক দিয়ে উঠল: ‘না। নিজের জুতো নিজে বুরুশ করবি। আগে করতিস কী?’

ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বকান্ত। বললে, ‘আগে স্বাধীন ছিলাম, জুতোও তাই স্বাধীন ছিল, মানে স্ত্রাওল ছিল। তার স্নো-পমেটমের দরকার হত না। এখন বন্ধন মেনেছি, জুতোও তাই ইঁ করে গিলে ধরেছ। সম্ভ্রান্ত হবার যন্ত্রণাই ঐ। এখন পায়ে-মাথায় দু’ জায়গায় অ্যালবার্ট—’

‘তুই সম্ভ্রান্ত—তোর বউ সম্ভ্রান্ত না?’ মৃণালিনী আবার ধমকাল।

‘ই্যা, এম-এ পাশ। মাঝে-মাঝে কেমন ভুলে যাই। তুমি যদি মনে করিয়ে না দিতে, কে বলত তার ঐ নবনীত চেহার। দেখে! মেঝের উপর কেমন লেপটে বসে তালে-তালে বুরুশ ঠুকছে। বুরুশ ঠুকছে তো নয়, গীটার বাজাচ্ছে।’ সদরের দিকে ছুটল স্বকান্ত।

মৃণালিনী পিছু ডাকল। বললে, ‘ভীষণ মেঘ করেছে। একটু দাঁড়িয়ে যা।’

‘ও মেঘ ছলনা, মা। যত দর্শায় তত বর্ষায় না।’ সদর পেরিয়ে আবার ফিরল স্বকান্ত। বললে, ‘কাকলিকে পাঁচটা টাকা দিও তো, মা। ও চাইছিল। ওর কী যেন দরকার—’ ক্ষত বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কতক্ষণ পরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল বৃষ্টি। উপরে জানলায় দাঁড়িয়ে সর্বাক্কে খুশি

হয়ে উঠল কাকলি। নিশ্চয়ই পৌঁছয় নি বাস-স্টপে। নিশ্চয়ই ভিজেছে। নয়তো কোথাও আটকা পড়েছে। হয় কোনো মুদি-দোকানে, নয় সেই খড়-বিচালির আড়তটায়, নয়তো বা গাড়ি-বারান্দার নিচে। গাড়ি-বারান্দার নিচে হলে কটা দড়িছুট গরুও নিশ্চয়ই দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে। কিংবা তনভনে মাছিওড়ানো কটা আচাকা খাবারের ফিরিওলা। আগে-আগে, মনে আছে, স্বকান্ত রুটিতে পড়লে কত দুর্ভাবনায় পুড়েছে কাকলি, ওর যেন অস্থখ না করে, ওর যেন অস্থবিধে না হয়। নিজে ইচ্ছে করে ভিজে রাস্তাতে শিয়রের জানলা খুলে রেখেছে গোপনে, যেন ওর গায়ের ঠাণ্ডা নিজের গায়ে এসে জড়ো হয়। কিন্তু আজ, এখন, কেন কে জানে, মন সর্বক্ষণ উলটো চাওয়া চাইছে। ও জন্ম হোক, ও অস্থবিধেয় পড়ুক, ই্যা, মন্দ কি, বিপদেই পড়ুক। ওর কষ্ট হোক, জ্বর হোক, ওর সম্ভ্রান্ততার জুতোর কালি ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।

কাকলিকে টাকা দেবার কথা মৃণালিনী অবশ্য ভুলে গিয়েছে, কিন্তু কদিন পরে চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটা বাঙালি চাকর সে স্বকান্তর ঘরে ঢুকিয়ে দিল। নে, ঐ তোর ঘর। ঐ তোর সাম্রাজ্য।

‘কে তুই?’ জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত।

ঝাঁটা হাতে কালো ছেলেটা ঝকঝকে দাঁতে হেসে উঠল। বললে, ‘আমি এ ঘরের চাকর।’ বলেই মেঝেতে ঝাঁটা বুলাতে লাগল।

‘এ ঘরের চাকর মানে? এ বাড়ির চাকর নয়?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘বাড়ির চাকর তো হরিপদই আছে। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।’

‘শুধু এ ঘরের?’ কথাটা যেন তখনো কাকলির কানে অবিস্মৃত লাগছে।

‘উপায় কী তা ছাড়া। মাইনে যে মোটে দশ টাকা।’

‘তোর নাম কী?’ খুশি মনে জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত।

‘ভগলু। আদর করে ভগু বলে ডাকতে পারেন—’

‘আর রাগ হলে ভগা—’

আকর্ণ বিস্তার করে হাসল ভগলু। বললে, ‘আমার কাছে এমন কাজ পাবেন, রাগ কাকে বলে মনেও থাকবে না।’

‘বটে? কিন্তু তোর কাজটা কী?’

‘যা করতে বলবেন তাই। বুড়ি-মা তাই হুকুম দিলেন ঢালাও।’

‘যদি কিছু করতে না বলি?’ প্রশ্ন করল কাকলি।

‘তা হলেও কিছু কাজ আমার থাকবেই। ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঝাড়পোছা, বিছানা

পাতা, জুতো বুরুশ করা, কাপড়চোপড় কাচা—আর’, স্বকান্তর চোখের দিকে চেয়ে হাসির ঝিলিক দিল ভগলু: ‘আর এমন গা-হাত পা মাথা টিপতে পারি—গঙ্গার ঘাটের নাপিতও দেখবেন হার মানবে।’

‘বলিস কী!’ উৎফুল্ল দুই পা প্রসারিত করে দিল স্বকান্ত: ‘ঝাঁটা গাছটা তা হলে রাখ হাত থেকে। গঙ্গার ঘাটের নাপিতদের একবার হারিয়ে দে দেখি।’

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে স্বকান্তর পা টিপতে লাগল ভগলু।

‘লাভলি!’ আরামে চোখ বুজল স্বকান্ত। বললে, ‘তোরা নাম যে ভগলু এই এখন আমার ভয়।’

‘কেন বাবু?’ ভগলুর হাত স্তব্ধ হল কণকাল।

‘ভগলু মানেই তো তুই কেবল ভাগিস, পালিয়ে যাস। তুই যদি পালিয়ে যাস তা হলে বাঁচব কেমন করে?’

‘না, না, পালাব না, ছাড়ব না আপনাদের। আপনি আর ঐ বউদিদি। আর মাথার উপরে খোদ বড়বাবু। বড়বাবুর ভাত আর আপনাদের মাইনে। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি।’ আবার টিপতে লাগল ভগলু: ‘এ তো কিছু নয়, তার উপর যখন আবার কোমর টিপব—’

‘সত্যি?’ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল স্বকান্ত।

‘কী কুংসিত!’ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

‘শোনো!’ চেঁচিয়ে ডেকে উঠল স্বকান্ত। বললে, ‘কোথায় যাচ্ছ আর ঘরের বাইরে? এ সংসারে তোমার আর কাজ নেই। রান্নাঘরে ঠাকুর, শোবার ঘরে চাকর, নিজস্ব চাকর। কুটোটিও আর দুখানা করতে হবে না। যদি এখন কাজ থাকে তো ঘরের বাইরে নয়, বাড়ির বাইরে।’

ফিরল না কাকলি। দরজার বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

‘এত আরাম এত আলস্য নিয়ে করবে কী! সামান্য বিছানাটা পর্যন্ত তোমাকে আর পাততে হবে না।’ দলাই-মলাই খেতে-খেতে বলতে লাগল স্বকান্ত, ‘আরাম কুংসিত সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু পুরুষের বেলায় নয়, স্ত্রীলোকেরও।’

স্বকান্তর ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে এদিক-ওদিক উকিঝুঁকি মারছিল ভগলু। ভূপেন জিজ্ঞেস করল, ‘কে ও?’

মৃণালিনী বললে, ‘স্বকুর জন্তে চাকর রেখে দিলাম।’

‘শুধু স্বকুর জন্তে?’

‘না, না, আপনারও আমি সেবা করব।’ ছুটে এসে ভগলু ভূপেনের পায়ের কাছে বসে পড়ল। শুরু করল পা টিপতে।

চমকে উঠে পা সরিয়ে নিল ভূপেন। সশব্দে ধমকে উঠল : ‘ভাগ, আমার সেবা করতে হবে না।’

‘তুমি না নাও আমার নিতে হবে। কত সময়ে কত রকমের ঠেকা, হাতের লক্ষ্য একটা লোক নেই।’ বললে যুগালিনী, ‘কাছেপিঠে কোথাও যেতে হলে চলনদার খুঁজে পাই না। সেদিন জর্দা ফুরিয়ে গেছে, উঃ সে কী যন্ত্রণা, একটা কেউ নেই আপনার লোক ছুটে চলে যায় দোকানে, উদ্ধার করে আমাকে।’

‘তুমি সংসারে এ কী বিলাসের বস্ত্র আনছ বলো তো—’

‘চূপ করো। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। বিলাসের স্রোত!’ লকলক করে উঠল যুগালিনী : ‘ঠাকুর-চাকর রাখা বিলাস। বলিহারি আঙু’মেণ্ট। মাহুয তার অবস্থার উন্নতি করবে না, এম-এ পাশ বউকে দিয়ে হাঁড়ি ঠেলাবে, জুতো বুরুশ করাবে? এই না হলে আপিলের গ্রাউণ্ড! তা তোমার লাগে কেন? এ তোমার টাকা নয়, আমার ছেলের টাকা। স্বকু কী আন্দাজ সংসারে দিচ্ছে তার খেয়াল আছে? বিনিময়ে সে একটু আরাম নেবে না, দেবে না তার স্ত্রীকে, তার মাকে? মানে, তোমার কথা হচ্ছে একবার যখন গামছা পরেছ চিরকালই গামছা পরো। মাঝে যদি টাকা কিছু রোজগার হয়ও তা হলে সেটা উদরস্থ না করে কবরস্থ করো। মানে, হাড়কিননের মত শুধু জমাও, জমিয়ে যাও। যক দাঁও। এই না হলে এই দশা!’

বৈঠকখানায় গিয়ে চূপচাপ বসে আছে ভূপেন, একটা হাত-পাখা নিয়ে ভগলু এসে উপস্থিত। বড়বাবুকে সেবা সে করবেই। টেপা না নিন হাওয়া নিন একটু।

‘আমার হাওয়া লাগবে না।’ বললে ভূপেন।

তবু ভগলু কথা শোনে না।

তেড়ে গেল ভূপেন। বললে, ‘যদি হাওয়া করবি তো পাখাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁ যা বসিয়ে দেব।’

কিন্তু প্রশান্ত লম্বা হাতে সটান ছুটে চড় বসিয়ে দিল।

বারান্দায় বসে স্বকাস্তের জুতো বুরুশ করছিল ভগলু, বন্দনা প্রশান্তের শূ-জোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, ‘এ জোড়াও করে রেখো।’

‘পারব না।’ ভগলু কাঠখোটার মতন বললে।

‘পারবে না?’ থ হয়ে রইল বন্দনা।

‘না। আমি শুধু এ ঘরের চাকর।’ স্বকাস্তের ঘর দেখিয়ে দিল ভগলু : ‘আমার দশ টাকা মাইনে। দশ বাড়িয়ে পনেরো করুন, উপর-নিচ সব ঘরেরই আমি চাকর বনে যাচ্ছি।’

‘অতশত আমি জানি না।’ বন্দনার অগ্ন্যবকম যুক্তি : ‘তুমি যদি ও ঘরের জুতো মাক করতে পারো এ ঘরেরও পারবে।’

‘তেমন কোনো কথা নেই।’ প্রায় কলা দেখাল ভগলু।

বন্দনা গিয়ে প্রশান্তর কাছে নালিশ করল।

কোমর বেঁধে মুখিয়ে এল প্রশান্ত। হুকুম করল ভগলুকে। ভগলু কানেও তুলল না। তুমি মুনিব নও, তুমি বলবার কে? হুকুম প্রত্যাখ্যান করলে।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই মার।

ছি ছি, স্বকাস্ত এল ঝগড়া করতে। লড়তে চাকরের হয়ে।

‘ওকে মারছ কেন? ওর দোষ কী? মা ওকে শুধু আমার ঘরের জন্তে রেখেছেন।’

‘তোমার ঘরের জন্তে রেখেছেন তো বারান্দায় বসে কাজ করছে কেন?’ রাগের মাধ্যম মুখে যা এল বলে ফেলল প্রশান্ত।

‘বারান্দা কার একলার জায়গা নয়। জায়গা যদি তোমার হয় তো আমারও।’ স্বকাস্ত বললে, ‘আমল কথাটা হচ্ছে ওর মাইনে কে দিচ্ছে—ওর মাইনে আমি দিচ্ছি। স্তরার ভুল নেই, ও আমার একলার চাকর।’ ওকে আরো দাও না পাঁচটা টাকা। তারপরে নাও না কাজ আদায় করে।’

‘বয়ে গেছে।’

ঘরে এসে ঢুকলে স্বকাস্তকে নগ্নকণ্ঠে ধিক্কার দিয়ে উঠল কাকলি : ‘ছি ছি, তুমি ওসব কথা বললে? বললে তোমার দাদাকে?’

‘কেন, অগ্নায় কী বলেছি!’

‘জঘন্ততম অগ্নায়। ভগলুকে তোমার বলা উচিত ছিল, দাদার জুতো আমারই জুতো।’

‘যা সত্য নয় তা আমি বলি না।’

‘কেন, তোমার দু জোড়া জুতো থাকতে পারত না? থাকলে দু জোড়াতাই কালি দিত না চাকর?’ প্রায় মরীয়ার মত কাকলি বললে, তুমি—তুমি কেন দাদার থেকে নিজেকে আলাদা করলে?’

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বকাস্ত বললে, ‘বেশ তো, দাদা ওর পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলেই পারেন।’

‘আমি বাড়িয়ে দেব মাইনে । তুমি দাও আমাকে পাঁচ টাকা ।’ দাবির ভঙ্গিতে হাত পাতল কাকলি ।

‘আমি পাব কোথায় ?’

‘সেদিন যে চেয়েছিলাম, তুমি তোমার মাকে বলবে বলেছিলে, অন্তত দাও সেই টাকাটা ।’

‘কেন, মা তোমাকে দেন নি ?’

‘না ।’

‘তা আমি কী জানি । তুমি তবে মার কাছে থেকে চাও গে ।’

কাকলি গুম হয়ে রইল ।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে স্বকাস্ত দেখল ভগলু প্রশান্তের জুতোতে নির্বিঘ্নে কালি দিচ্ছে : ঝণ্টু-সেণ্টুরগুলোও বসেছে সারি সারি । আর ওটা কি বউদির ?

‘এ কী রে !’ প্রায় আকাশ থেকে পড়ল স্বকাস্ত : ‘এত মারধোরের পর ?’

ঝকঝকে দাঁতে আকর্ষণ হাসল ভগলু । বললে, ‘ছোট বউদিদিমণি পাঁচটি টাকা দিয়েছেন ।’

‘দিয়েছেন ?’

‘অন্তত এক মাসের মতন তো হল । এক মাস তো খেটে দিই ।’

‘ছোট বউদিদিমণি গেল কোথায় ?’

‘তা আমি কী করে বলব ?’

মৃণালিনীর কাছে গেল স্বকাস্ত ।

‘মা, তুমি কাকলিকে পাঁচ টাকা দিয়েছ ?’ একাস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল গোপনে ।

‘না তো ।’

‘ও চেয়েছিল তোমার কাছে ?’

‘কই ? কখন ?’

‘তবে ও যে ভগলুকে পাঁচ টাকা বাড়তি দিলে, ভগলু বলছে দিয়েছে, ও সে টাকা পেল কোথায় ?’

মুহূর্তে মায়ে-ছেলেয় তীক্ষ্ণ চোখাচোখি হল : পেল কোথায় ?

মৃণালিনীর ত্রুত সাজ হয়েছে, কজন ব্রাহ্মণভোজন করাবে। একটু বিস্তৃত বাজার দরকার। সেইজন্টেই দরকার একজন কর্ণধারের।

রবিবারটাই বাছা হয়েছে। বাড়িভর্তি থাকবে সবাই উপস্থিত। স্বামী-সন্তান নিয়ে বাসন্তীও আসবে নিমন্ত্রণে।

‘তুই বাজারে যা না।’ প্রশান্তকে বললে মৃণালিনী।

ছুটির দিন হলে কী হবে, খবরের কাগজের আন্তরিকতা শেষ করে যেমন-কে-তেমন দাড়ি কামাতে বসেছে প্রশান্ত। আয়নার থেকে চোখ তুলে মার দিকে তাকাল সন্ধ্যায়। বললে, ‘আমি আবার বাজার করলাম কবে?’

‘সে তো আফিস থাকে বলে। আজ যখন তোর ছুটি—’

যে কথাটা কর্কখোলা ওয়ুধের ঝাঁজের মত প্রথমেই বেরিয়ে আসতে চাইছিল, সেটা চাপা দিল প্রশান্ত। আয়নার শাস্তিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললে, ‘তোমার সংসারে এখন ছ-ভুটো চাকর, তাদের পাঠাও না।’

‘ওরে বাবা, ওদের একটা খর আরেকটা দূষণ। ওরা দামে-ওজনে তো থাকেই, জিনিসও খারাপ আনবে।’ মৃণালিনী ঘরের মধ্যে আরো একটু ঘনিজে এল : ‘আফিস-ডের বাজার করে, সে প্রায় বাঁধাধরা বরাদ্দ বাজার। আজ যখন বিশেষ উৎসব, তখন কারু একটু দেখাশোনা করা দরকার। তোর আর কাজ কী—’

উদগত কথাটা আর চাপা দিতে পারল না প্রশান্ত। আয়নাতে দৃষ্টি স্থির রেখে বললে, ‘তোমার স্বকূকে বলো না।’

স্বরও শাস্ত রাখবে ভেবেছিল, কিন্তু অলক্ষ্যে ঝাঁজ এসে গেল। যেন শোনাল মাকেই সে উলটো হুকুম করছে।

‘কেন, তোকে বলতে পারি না?’ ঝামটে উঠল মৃণালিনী।

‘আমাকে বলে লাভ কী! আমি কি স্বরগীয় অতীতে বাজার করেছি কোনো দিন? বরং তোমার স্বকূই কিছুদিন আগে পর্যন্ত করেছে। ছুটি তো আজ ওরও।’

‘ও কোথায় যেন বেকছে—’ বললে বটে কিন্তু বলেই মৃণালিনী বুঝল কথার স্তরে যেন সত্যের টান লাগল না।

‘আমিও বেকুব একুনি।’ সজোরে ব্লেন্ড ঘষতে লাগল প্রশান্ত।

‘তোমার কতক্ষণই বা লাগবে।’ ঝুণালিনী প্রায় একটু অস্থানয় মেশাল।

‘স্বকুর তো আরো কম। ও অনেক ওয়াকিবহাল। ওই দরদাম ফিকিরকদি ভালো জানে। ওই পারবে জিতে আসতে। আমার অদৃষ্টে তো শুধু ঠকা।’ বন্দনা ঘষেই ছিল—ঠাকুর রাখার পর সে আর নিচে তত মোতায়ন নয়—মুখ তুলে প্রশান্ত তার দিকে তাকাল করুণ চোখে।

‘বলছি জরুরি কাজে স্বকু বাইরে বেরুচ্ছে—’সত্যের টান আনবার জন্তে কথায় মিথ্যে জোর দিল ঝুণালিনী।

‘আচ্ছা আমি দেখছি কেমন ওর জরুরি কাজ। দাঁড়াও, আমিই বলছি ওকে।’ নড়ে-চড়ে উঠল প্রশান্ত।

‘ধাক, তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না।’ ঘরের ওপাশ থেকে চাপা নিশ্বাস ছেড়ে ফৌস করে উঠল বন্দনা : ‘এম-এ পাশ করা বউয়ের স্বামী, কি কথা বলতে কী কথা বলে অপমান করে বলবে তার ঠিক নেই।’

‘মায়ে-পোয়ে কথা হচ্ছে, তুমি বউ, তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে আসো কেন?’ দপ করে জলে উঠল ঝুণালিনী। মুখে-চোখে আগুন নিয়ে বললে, ‘ই্যা, এম-এ পাশ করা বউয়ের স্বামী, তার পক্ষে র্যাশন-ব্যাগ হাতে নিয়ে মাছতরকারির বাজার করা চলে না।’

‘সে চলে আমাদের পক্ষে।’ আবার নতুন করে গালে বুরুশ ঘষতে লাগল প্রশান্ত : ‘যাদের বউয়েরা নন-ম্যাট্রিক আর যারা নিজেরা আগুণের গ্র্যান্ডমাস্টার।’

ছেলে কী বলছে তার দিকে নজর না দিয়ে বউ কী বলেছে তাতেই জ্বলছে ঝুণালিনী, ‘ই্যা, এম-এ পাশ স্বপ্নেও কোনো দিন হতে পারে না।’

‘বাস্তবেই বা এ কী হয়েছে!’ বন্দনা পারল না চুপ করে থাকতে : ‘শিংও হেরোয় নি, লাজও গজায় নি। হাত-পাও চারখানা করে নয়।’

‘খামো। মুখের উপর কথা বলতে এসো না। তোমার মধ্যে কী আছে? ঐ তো কাঠামোর ছিঁড়ি।’ ঝুণালিনী মুখ বেঁকাল। তারপর ধমধমে গলায় বললে, ‘তবু ছোট বউয়ের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে, ফিউচার আছে। তোমার? তোমার তো আর নেই, শুধু ব্যয়ের বাহার।’

ঝুণালিনী স্বকুর ঘরের দিকেই গেল না, নিচে নামতে লাগল অবোধে।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে বন্দনা কাঁদতে লাগল।

সেন্টু প্রশান্তর কাছে এসে ভীতু-ভীতু চোখে জিজ্ঞেস করলে, ‘বাবা, মা কাঁদছে কেন?’

‘তোমার মায়ের নাকটা কাটা গেছে।’

‘না, না, নাক কাটবে কেন?’ সেন্টু তো ঘরের মধ্যেই ছিল। কই দেখে নি তো তেমন আক্রমণ। সেন্টু প্রথমটা চাইল না বিশ্বাস করতে।

‘নাক কাটা না গেলে কি অমনি নাকি স্নরে কাঁদে কেউ?’ প্রশান্ত উঠে পড়তে চাইল : ‘দেখছ না মা কেমন আঁচল দিয়ে নাক-মুখ চেপে ধরে আছে।’

এবার যেন প্রায় বিশ্বাস হল ব্যাপারটা। সেন্টু প্রশান্তর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, ‘কে কাটল, বাবা? ঠাকুমা?’

‘না। একটা টুনটুনি।’

‘টুনটুনি? পাখি?’ চোখ দুটো বড়-বড় করে তাকাল সেন্টু।

‘হ্যা, শোনো নি সেই টুনটুনির গল্প?’ প্রশান্ত ছেলেকে কোলে তুলে নিল : ‘সেই যে ‘এক টুনিতে টুনটুনাল, সাত-ও রানীর নাক কাটাল’—সেই টুনি পাখি। মনে নেই সেই গল্পটা?’

কত জনের কত গল্প শুনেছে সেন্টু, বয়ে গেছে তার সব মনে করে রাখতে। তার শৈশব কৌতুহলে যেটা সমূহ অস্বস্তি তারই থেকে সে প্রথম প্রশ্ন করল : ‘সেই পাখিটা কোথায়, বাবা?’

‘তার তো উড়ে যাবার কথা। কিন্তু যায় নি এখনো। আনাচে-কানাচে ঘুরছে। সকলের নাক কাটিয়ে দিয়ে তবে যাবে।’ প্রশান্ত ছেলেকে দু বাহর মধ্যে জড়িয়ে ধরল।

‘বা, সবাই মিলে আমরা সেই পাখিটাকে তাড়িয়ে দিতে পারি না?’ বাহর মধ্যে ছটফট করে উঠল সেন্টু : ‘ছেড়ে দাও, নিচে থেকে দাড়র লাঠিটা নিয়ে আসি। আর তুমি—তুমি নাও তোমার ছাতাটা।’ জোর করে নেমে পড়ল কোল থেকে : ‘তারপরে দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।’

প্রশান্ত বললে, ‘এ টুনিকে তাড়ানো খুব শক্ত। জানিস, এ শিক্ষিত টুনি। এর প্রকাণ্ড লাজ। এর জন্ত বাড়িতে ফ্যান আসে, লাল-নীল আলো আসে, পর্দা আসে, কার্পেট আসে। ঠাকুর আসে, চাকর আসে, ভিনারের টেবিল-চেয়ার আসে—ক্রমে ক্রমে আরো কত আসবে তার ঠিক কী! একে তাড়ানো কি আমাদের শাখি?’

বাবার এ যুক্তি মানতে রাজি নয় সেন্টু, কিন্তু সে কথায় কান দেবার আগে তার গিয়ে পড়ল মায়ের উপর। নাক-মুখের থেকে কাপড় সরিয়ে নিয়েছে বন্দনা।

‘দেখ, দেখ,’ উৎফুল্ল হয়ে উঠল সেন্টু : ‘আছে, আছে, মার নাক আছে ।’

‘ও, আছে নাকি ?’ প্রশান্ত নির্লিপ্ত মুখ করল : ‘কিন্তু ফিউচার নেই ।’

সে আবার কী জিনিস জানতে ব্যস্ত নয় সেন্টু । মার নাক যে রক্ষা পেয়েছে, তাতেই সে আপাতত খুশি । টুনি তো রানীদের নাক কাটিয়েছিল । আমরা তো গরিব । আমার মা তো আর রানী নয় ।

মার দিকেই এগুচ্ছিল, প্রশান্ত তাকে টেনে ধরল । বললে, ‘না, ফিউচার নেই এ ঠিক নয় । তুমি যাও, মাকে গিয়ে বলো, মা, আমিই তোমার ফিউচার ।’

অনাবস্তক একটা ছুঁবোঁধোর সামনে এসে পড়েছে—সলজ্জ করণ মুখে হাসল সেন্টু । বাবার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে কথাটার অর্থ প্রার্থনা করল । অর্থ না বুঝলে যোগা মাঝনা মাকে সে দেয় কী করে ?

প্রশান্ত বুঝল সেন্টুর যন্ত্রণা । বললে, ‘মাকে গিয়ে বলো, আমাকে দিয়ে যখন তুমি বউ আনবে, শাওড়ি হবে, তখন এর প্রতিশোধ নেবে ।’

সেন্টু গিয়ে পৌঁছবার আগেই বন্দনা ঝংকার দিয়ে উঠল, ‘আমি ততদিন অপেক্ষা করতে রাজি নই, আমি একুনি-একুনি এর বিহিত চাই ।’

‘আমিও । কিন্তু কী বিহিত বলো ?’

‘আমাকে কয়েক মাস বাপের বাড়িতে রেখে এসো ।’

‘তাতে লাভ কী ? সেখানেও নো ফিউচার ।’ বললে প্রশান্ত, ‘সেই যদি ফের ফিরেই আসতে হয়, তা হলে ঐ যাওয়ায় তেজ কী ?’

‘তা ছাড়া তুমি প্রায় নিত্যকণী,’ আশ্চর্য সায় দিল আবার বন্দনা : ‘তোমাকে একলা ফেলে বেশিদিন দূরে থাকাও চলবে না ।’

‘আর তোমারই যেন খুব স্বাস্থ্য ।’ চোখে মমতা আনল প্রশান্ত : ‘সেই তো সেদিন বলছিলে তোমার পেটে চিনচিনে একটা ব্যথা ।’

‘সে তোমার প্রতি সহানুভূতিতে ।’ একটু হাসল বুঝি বন্দনা । তারপর সব মেয়ে যেমন বলে তেমনি বিন্দাদ মুখে বললে, ‘কিন্তু আমার এমন অদৃষ্ট কী হবে ?’
‘যে ঐ ব্যথাতেই—এই অপমানের ব্যথাতে নয়—শিগগির-শিগগির মরে যাব । আর তোমার সামনে, তোমার কোলে মাথা রেখে ।’

জোরে হেসে উঠল প্রশান্ত । বললে, ‘সে আশা বুখা । তোমার চেয়ে আমার বয়েস যেহেতু বেশি, আমারই আগে যাবার সম্ভাবনা । কিন্তু মরা-টরা কোনো কাজের কথা নয় । কাজের কথা হচ্ছে লড়া । বেঁচে থাকা । বেঁচে থাকাই সমস্ত যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মহৎ প্রতিবাদ ।’

‘তা হলে তুমি কী ভাবছ?’ উৎসাহে দু’পা এগিয়ে এল বন্দনা।

‘ভাবছি না, ভেবে ঠিক করে ফেলেছি!’

‘কী?’

‘এই বাড়ি, এই সংসার ছেড়ে দেব। অন্তত ঘর ভাড়া নেব।’

ঠিক মনের মত কথা। বন্দনার মুখ চোখ ঠোট সমস্ত শরীর উজ্জল হয়ে উঠল। বললে, ‘যারা গরিব তাদের গরিবের মত থাকতে অমর্যাদা কী!’

‘কিছুমাত্র না। হুথের ভাত হুথের করে খাব।’

‘আমাদের চেয়েও কম মাইনের লোক কত থাকে দেখেছি আলাদা বাড়ি করে।’ বললে বন্দনা, ‘আমরাও থাকব। দড়ির দু’প্রান্ত একত্র করতে যদি ক্লান্ত হয়েও পড়ি, তগবান কৃপা করবেন।’

‘তগবান-টগবান বুঝি না।’ উঠে দাঁড়াল প্রশান্ত : ‘এই যে সসম্মানে বাঁচবার পণ নিয়েছি এইটাই সমস্ত। মাকে বলেছিলাম আমিও একুনি বেকুব, ঠিকই বলেছিলাম। এখনি বেকুব বাড়ি খুঁজতে। একুনি।’

‘কিন্তু বেকুনোমাত্রই যদি বাড়ি না পাও—’ কী যেন আরো বলবে তার আভাস দিয়ে এগিয়ে এল বন্দনা।

‘ঐ যে কার নাম বললে— টগবান না কী— সে যদি জুটিয়ে দেয়—’

‘রসিকতাও তো করতে পারে।’ হাসল বন্দনা : ‘একুনি-একুনি না দিয়ে যদি কদিন পরে জোটায়? তা হলে কী হবে?’

‘তাও আমি ঠিক করে ফেলেছি।’ প্রশান্ত জামার জন্তে হাত বাড়াল। ‘তোমার বাবা মফস্বলে— সেটা খরচের রাস্তা। ওখানে গিয়ে থাকবার কোনো মানে হয় না। সেটা মামুলি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকবার মত দেখায়। কলকাতায় তোমার বাপের বাড়ির দিকের যেসব আত্মীয় আছে—তোমার দিদি, মাসি, খুড়তুতো কাকা— তাদের বাড়িতে, দফায় দফায়, ধর্মশালার মত, তোমাদের রেখে আসব, যতদিন না ঘর পাই স্ববিধেমত। সে থাকাকাটাই বরং খানিক বিজ্রোহের মত দেখাবে।’

‘আমিও তাই ভাবছিলাম।’ জামাটা এগিয়ে দিল বন্দনা : ‘কিন্তু তুমি?’

‘সম্প্রতি এখানেই থাকব। মাসকাবারি দরামাহা তো দেওয়াই আছে। এখানে থেকেই খবরাখবর করব তোমাদের। তুমিও নিত্য দেখাতে পাবে চোখের উপর।’

‘খুব ভালো হবে। খুব ভালো হবে।’ প্রশান্তর পরা জামায় বুকের বোতামগুলি একে একে পরিয়ে দিল বন্দনা।

খবর নিয়ে সেন্ট্ৰু আগেই ছুটেছে, প্রশান্ত এবার বাইরে বেরুল।

‘তোমার কিন্তু বাজারে যাওয়া উচিত ।’ কাকলি বললে স্বকাস্তকে ।

‘তোমার কথায় ?’ খাটে শুয়ে বই পড়ছিল স্বকাস্ত, চট করে চটে উঠল ।

‘আমার কথায় হবে কেন ? তোমার মার কথায় ।’

‘কই, মা বলল আমাকে ? এল এ ঘরে ? বলল, যা বাজার করে নিয়ে আয় ?’

‘বলা উচিত ছিল ।’ গম্ভীর হল কাকলি ।

‘কী বলা উচিত না-উচিত তুমি মোড়লি করতে এসো না ।’ পাশ ফিরল স্বকাস্ত :
‘নিজের চরকায় তেল দিচ্ছ তাই দাও গে ।’

কোথায় বি’ধছে স্বকাস্তকে তা যেন বুঝতে পেরেছে কাকলি । কিন্তু কথাটা সরলারি না-ওঠা পর্যন্ত সেদিকে যাচ্ছে না কিছুতেই । সরলতা থাকে তো তোলো কথাটা । খোলাখুলি জিজ্ঞেস করো ।

‘তোমার মায়ের এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থন করা যায় না ।’ বললে কাকলি, ‘তোমারই উচিত ছিল নিজে থেকে এগিয়ে আসা । কেমন শোভন হত বলো তো !’

‘ছাই হত ।’

‘মা না বলুন, দাদা তো চেয়েছিলেন বলতে—’

উত্তেজিত কথাবার্তা । সব শোনা গেছে এ ঘর থেকে । তাই মুখের উপর বলতে পারল স্বকাস্ত : ‘কই, বলল কই ? বউদিই তো মুখ চেপে ধরল । দাদাই বা শুনল কেন বউদির কথা ? ছোট তাইকে হুকুম করলেই পারত ।’

‘কী আমার ছোট তাই । এক পায়ে খাড়া । একেবারে ধরো-লক্ষণ !’

‘তুমি অত তড়পাচ্ছ কেন ! দাদাকে তো আর যেতে হল না !’

‘না । তোমাকেও না । এই অবস্থায় কাকে এখন যেতে হবে বুঝতে পাচ্ছ ?’

‘খুব পাচ্ছি । বাবাকে ।’ নিশ্চিন্তে আবার পাশ ফিরল স্বকাস্ত : ‘তাই তো মা সটান বলতে গেল নিচে ।’

‘আর তারই জন্তে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছি । কী উপযুক্ত পুত্র ! তাকে কি কিছু আদেশ করা যায় ? তার চেয়ে স্বামীকে, গৃহস্বামীকে বিরক্ত করা সোজা । ছি ছি ।’ জিভের ভগাটা ছুঁচলো করল কাকলি ।

স্বকাস্ত চোখ বুজে রইল । কথা কইল না ।

মা অবধারিত, নিচে গিয়ে ভূপেনকে ধরল স্বগালিনী : ‘ওঠো, রাখো এলব জঞ্জাল ।’

প্রফ দেখছিল ভূপেন, চমকে উঠল । তবু অক্ষুট প্রতিবাদ না করে পারল না, ‘জঞ্জাল !’

‘আদালতের প্রক তো নেই, ছাপাখানার প্রক । জম্বাল ছাড়া আর কি । ওঠো, বাজারে যাও । ছেলেদের একজন নবাব আরেকজন বাদশা । তারা পাদমেকং ভূমিও নড়বে না—’

‘অগত্যা আমিই নড়ছি । কিন্তু একটা কথা—’ ভূপেন জড়তা কাটিয়ে উঠতে চাইল : ‘আমি ভাবছিলাম কী—’

‘কী ?’

‘সমাজ-সংসার কত এগিয়ে গিয়েছে । ঘরে-ঘরে শিক্ষিত শান্তিড়ি, শিক্ষিত বউ । কোথাও কোথাও বউয়েরা আবার এম-এ পাশ । বাসে-ট্রামে ভিড়েভাড়ে হাটেমাঠে কত তাদের অগ্রগতি । তা ছাড়া ঠাকুর-চাকর হওয়াতে তারা তো এখন প্রায় রাজছুট—বিছানা পাতা দূরের কথা, মশারিটা পর্যন্ত তাদের খাটাতে হয় না—’

‘মোক্ষা কথাটা কী ?’ হুমকে উঠল মৃণালিনী : ‘মোক্ষা কথাটা তো বলবে ।’

‘এলছি । বলছি, তোমরা মেয়েরাই তো পারো এখন দৈনিক বাজার করতে । তোমাদের হাতে আর এখন কাজ কই । সেদিন দেখলাম উঠোনের তুলসীমঞ্চের পটীপটাও চাকর জালিয়ে দিয়ে গেল । একটা কিছু তোমরা করবে তো ! কোনো তারি কাজ শক্ত কাজ আর না থাকে, অন্তত বাজারটা করো । কি, পারো না করতে ?’

‘খুব পারি ।’ মৃণালিনী বজ্রনির্ঘোষে বললে ।

‘আমার মা কিন্তু পারবে না ।’ কখন অগোচরে বৈঠকখানায় চলে এসেছিল সেন্টু, গম্ভীর স্বরে বললে ।

‘না, তোমার মা পারবে না ।’ সেন্টুকে হাত বাড়িয়ে ধরল ভূপেন । মৃণালিনীর দিকে তাকিয়ে বললে, ‘কিন্তু, ছোট বউমা তো পারেন । প্রথমে শান্তিড়ি-বউয়ে দু-জনে একসঙ্গে গেলে, শেষে রপ্ত হয়ে গেলে এক দিন বউ আরেক দিন শান্তিড়ি । সঙ্গে চাকর নিলে তো নিলে, নয়তো রিকশা ।’

‘আমি এক শো বার রাজি । কিন্তু তোমার ছোট বউ একটি আলস্তের স্তূপ, কোনো কিছুতে উৎসাহ নেই, কী বলে না জানি কথাটা—অ্যাডভেঞ্চার নেই ।’ মৃণালিনী যেমন-কে-তেমন বলতে লাগল অনর্গল, ‘কে বলবে এম-এ পাশ । এম-এ পাশ না ঘেমে পাশ ! আমি যে সেকেলে মাহুৰ, রেস্তলার ইন্ডুল-কলেজে পড়ি নি, আমি বরং কথায়-কথায় ইংরিজি বলতে পারি, শুনে শুনে শিখেছি, আর আমার এম-এ-ওয়ার্ল্ডার মুখে একটাও ইংরিজি ওয়ার্ড নেই গা ! একেবারে শাদামাটা । হাবাগোবা ।’

‘তোমার মা কেন পারবে না রে দাছ ?’ সেন্টুর চিবুকে হাত রেখে জিজ্ঞেস করল ভূপেন ।

সেন্টু বললে, ‘আমি আর দিদি আর মা আর বাবা, আমরা অল্প বাড়িতে উঠে যাব।’

ভূপেন শুনল, অল্প বাড়িতে বেড়াতে যাব। মৃণালিনীকে বললে, ‘দেখলে তো, বড় বউমার হাতে কাজ নেই, তাই আত্মীয়বাড়িতে বেড়াতে চলেছে।’

‘কাজ নেই কী? আমি কত বলি ছেলেটাকে সকালবেলাকার কোনো ইঙ্কলে-টিঙ্কলে—ঐ যে কী কে-জি না হেজি বলে—অমনি একটা কোনো হিজিবিজিতে ভর্তি করে দাও। তারপর রোজ ছেলেকে ইঙ্কলে দিয়ে এসো আর ছুটি হলে ইঙ্কল থেকে বাড়িতে নিয়ে এসো। আজকাল তো ছেলেকে ইঙ্কলে নিয়ে যাওয়া আর বাড়িতে ফিরিয়ে আনাই আধুনিক মায়েদের কাজ হয়েছে। তা এ বাড়িকে কি আধুনিক করবার জো আছে? সেই আত্মিকালের বস্তিবুড়ো হয়েই থাকা চিরকাল—’

‘সেই বাবাই গেলেন শেষ পর্যন্ত।’ উপরে নিজের ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেল কাকলি : ‘আর তাঁর উপযুক্ত পুত্র নিজীবের মত শুয়ে রইল।’

‘শুধু পুত্র উপযুক্ত নয়, পুত্রবধূও উপযুক্ত।’ বললে স্বকান্ত, ‘আর স্বক্স দাঁড়িয়ে থাকাতাই জীবনের লক্ষণ নয় পুরোপুরি।’

‘হ্যাঁ, চলা, এগিয়ে যাওয়াই জীবনের লক্ষণ। চরণযুগলের আকৃতিও সেই প্রতীকে তৈরি। কিন্তু, ঘুরে দাঁড়াল কাকলি : ‘দেবে, দেবে আমাকে বাজারে যেতে?’

‘বাজারে যেতে নয়, বাজার করতে।’ স্বকান্ত সংশোধন করতে চাইল।

‘ও একই কথা। বাজারে না গেলে যায় না বাজার করা। কিন্তু দেবে অহুমতি?’

‘যেন তোমার সব যাওয়া সব করাই আমার অহুমতির অপেক্ষা রাখে।’ কোন দূরে স্বক্স-তীক্ষ্ণ একটা ইঙ্গিতের বাণ ছুঁড়ল স্বকান্ত।

‘রাখা উচিতও নয়। স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিতে চেয়ে এ তুমি আশাও করতে পারো না।’ আজকাল কথা বলতে গেলেই কেমন একটা ঝগড়া-ঝগড়া স্বর এসে যায়, সেই স্বরটাকে শাসন করল কাকলি। বললে, ‘কিন্তু কতগুলি নিশ্চয়ই ব্যাপার আছে, সেখানে স্বামীর মানে সংসারের মত নেওয়া দরকার। বিশেষত যেগুলির সঙ্গে সংসারের, পরিবারের সম্মান জড়ানো। যেগুলি বিশেষরূপে ব্যক্তিগত নয়—’

‘তার অর্থ?’ ভুরু কুঞ্জে সেই একটা ঝগড়ার টান ঝাঁকল স্বকান্ত।

‘অর্থ সোজা।’ মনে মনে হাসল কাকলি : ‘অর্থ, আমি যদি সংসারের দৈনিক সপ্তা করতে বাজারে যাই, তুমি, তোমার বাবা-মা তাতে মত দেবে?’

‘কেন দেবে না? বেকার বসে আছি, নড়ে-চড়ে সংসারের যদি একটা উপকার করলে তো মন্দ কি।’

‘উপকার?’

‘তা ছাড়া আবার কী! চাকরের চুরি বন্ধ হবে সেইটেই মস্ত লাভ।’

‘আর এদিকে আমি যে কত ঠকব, তার খেয়াল আছে?’

‘ঠকতে-ঠকতে শিখবে।’ প্রায় বাণী দেওয়ার মত করে বলল স্বকান্ত।

‘আমার ঠকাটা সংসার মানবে কেন? ক্ষতিটা কেন ক্ষমা করবে? বলবে, এক টাকা সেরের জিনিস তুমি পাচ সিকে হারে আনবে কেন?’ তবল হবার আশায় হাসল কাকলি: ‘তখন ঐ চার আনা পয়সা আমাকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। বারে-বারেই হয়তো নানা জায়গায় ভরতে-পূরতে হবে। উলটা বুঝিলি রাম করে ছাড়বে।’

‘ছাড়লেই বা। দেবে ক্ষতিপূরণ।’ চিৎ হয়ে শুয়ে বইয়ে হঠাৎ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে স্বকান্ত। গায়ে লাগল না এমনভাবে বললে।

‘দেব? কোথেকে দেব?’ নিরীহ মুখ করে হাসতে চাইল কাকলি।

‘তোমার হাতে তো টাকা আছে। বাড়তি টাকা।’

‘বাড়তি টাকা?’

‘ই্যা, গোপন উপার্জনের উৎস।’

‘কথাটাকে প্রাঞ্জল করতে গিয়ে বুঝি অমনি করে বললে!’ ঝগড়া করবে না তখনও কাকলির প্রতিজ্ঞা।

‘তা ছাড়া আবার কী!’ খাটের উপর উঠে বসল স্বকান্ত: ‘ভেবেছিলাম শশুর মশায়ের দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে এসেছ, তুমি শুল্ল ছাড়া কিছু নও। এখন দেখছি ও ছাড়াও তোমার আরো অনেক লুকোনো তবিল আছে।’

‘লুকোনো তবিল?’ ঘাড় কান মুখ গলা একসঙ্গে গরম হয়ে উঠল কাকলির।

‘নইলে ভগ্নুর বাড়তি মাইনের টাকাটা তুমি দিলে কোথেকে?’ বইটা ফেলে রেখে খাট থেকে নেমে পড়ল স্বকান্ত: ‘মা সেদিন আমার জন্তে একটা ওভালটিন কিনে আনল, তুমি সর্দারি করে আরেক কোঁটো কিনে আনলে দাদার জন্তে।’

‘ভীষণ বিক্রী দেখাচ্ছিল। চায়ের টেবিলে মা তোমার দুধের পেয়ালায় দু-দু ভর্তি চামচ ওভালটিন মিশিয়ে দিলেন আর দাদার বেলায় কণিকামাত্র না—অথচ তিনি সামনে বসে—এ আমার কিছুতে সহ্য হচ্ছিল না।’

‘ওভালটিন যে দাদার পছন্দ নয় তা জানো?’

‘কী করে জানব। যখন কিনে এনে দিলাম তখন তো দিবি নিলেন হাত পেতে। পরদিন থেকে দিবি খেতে লাগলেন দুধের সঙ্গে।’

‘তা লাগুন। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর কই? বাড়তি টাকাটা পেনে কোথায়?’

‘বরেনবাবু যে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলেন তার সোনার ব্যাণ্ডটা বেচে দিয়েছি।’
স্পষ্ট, সরল মুখে কাকলি বললে।

‘আমাকে বলো নি কেন?’ জবাবদিহি চাইবার মত করে জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত।

‘কখন বলব? বেচবার আগে, না বেচবার পরে?’

‘বেচবার আগে।’

‘এ এমন একটা কিছু ব্যাপার নয় যে, তোমার অত্মমতি নিয়ে করতে হবে।’

‘নয়?’

‘না। এ আমার একলার জিনিস, আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন ঘটেছে, আমি বেচে দিয়েছি।’

কীরকম জালা করে উঠল স্বকান্তর। বললে, ‘বেচবার পরেও তো বলো নি।’

‘কথা ওঠে নি বলি নি। আজ কথা উঠল বললাম। নইলে ঐ তো ঘড়িটা পড়ে আছে টেবিলে। গায়ে সেই সোনার ব্যাণ্ডটা নেই, একটা সাধারণ লেডিস ব্যাণ্ড লাগানো, দেখলেই বোঝা যায়।’

‘দেখলেই বোঝা যায় ওটা বিক্রি হয়ে গেছে? ওটা থেকে মোটা হাতে মুনাফা কুড়িয়েছ?’

তবুও চটবে না, চটল না কাকলি। বললে, ‘জ্যাড়া ঘড়িতে প্রায়টা সব সময়েই প্রকট হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ব্যাণ্ডটা গেল কোথায়? ব্যাণ্ডটা হারিয়েও ফেলতে পারতাম, কাউকে পারতামও বা দিয়ে দিতে। আজ ঠিক-ঠিক প্রশ্ন তুললে, ঠিক-ঠিক উত্তর দিলাম, নিজের প্রয়োজনে বিক্রি করে দিয়েছি। ই্যা, ভগ্নর মাইনে, ওভালটিনের কোটো—নিশ্চয়ই নিজের প্রয়োজন।’

একটা কিছু ঘা মারতে খুব ইচ্ছে করছে স্বকান্তর। বললে, ‘অঙ্কে তো দু-এক খণ্ড আভরণ আছে, দয়া করে তা বেচলে না কেন?’

আমার খুশি—এভাবে গেল না কাকলি। বললে, ‘যেটা অবাস্তব, অনাবশ্যক—বোতামের চেন বা হাতের আংটির মতই ঘড়ির ব্যাণ্ডটাও অশালীন—সেটাই আগে বিদায় করলাম।’

‘তুধু সেই কারণে? না কি ওটার মধ্যে একটা জালা মাখানো ছিল?’

‘জালা? জালা কিসের!’

‘একজনের করস্পর্শের জালা।’

আপাদমস্তক পাখর হয়ে গেল কাকলি। নিরেট স্তম্ভতার পাখর।

লাঞ্ছের টেবিলে পকেট থেকে ঘড়ির কেসটা বের করল বরেন। খুলে দেখাল, ঘড়িটা কত সুন্দর—কত কুলীন কত দামী, আর তার বন্ধনীটা নিটোল নিখুঁত দোনার।

কাকলি হাত বাড়িয়েই নিতে চেয়েছিল কেসটা।

‘না, না, তা কি হয়? আমি নিজের হাতে পরিয়ে দেব।’ বরেন বললে দৃঢ়ভাবে।

কাকলি তবু আড়ষ্ট হয়েছিল। স্বামীর দিকে তাকাল আশ্রয়ের জন্তে।

স্বকান্ত উদার ভঙ্গিতে বললে, ‘তাতে কি? ঘড়ি তো পরিয়েই দিতে হয়। দেবেই তো পরিয়ে।’ তারপর আরো একটু টিপ্তন্বী জুড়লে : ‘গলায় মালা দিতে এলে কি হাতে করে নেয়? যার মালা সে গলায়ই ছুঁয়ে দেয়।’

বরেন হাসিতে ফেটে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতের মধ্যে কাকলির ঐ হাত টেনে নিল।

কালীঘাটের শাঁথারিরাও এত সময় নেয় না বা পরিশ্রম করে না শাঁথা পরাতে।

‘নিন, ছাড়ুন, আমিই পরছি নিজে-নিজে।’ বাস্তব হয়ে উঠল কাকলি।

‘ধৈর্য ধরতে শিখুন—’ যাক এতক্ষণে পেরেছে বরেন। বললে, ‘ঘড়ির জন্তে হাত নগ্ন, সন্দেহ কি, হাতের জন্তেই ঘড়ি। দেখবেন ব্যবহার করবেন। বাস্তবে তুলে রাখবেন না।’

‘কী যে বলেন! ঘড়ির কত দরকার।’ মামুলি শোনাতেও কথার পিঠে বলতে হল কাকলিকে।

‘হ্যাঁ, যেখানকার জিনিস সেখানে রাখবেন।’

‘কিন্তু ঘড়ি দেখবার কত যে সময় হবে বলতে পারি না।’ কাকলি স্থিতচিন্তা চোখে তাকাল স্বকান্তর দিকে : ‘কেমনা সময় এখন ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটে চলেছে। সাধ্য কি ঘড়ি তার সঙ্গে পাল্লা দেয়।’

দার্শনিক বরেনও কিঞ্চিৎ হতে জানে। বললে, ‘ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াই শেষে একদিন ছাফাড়া গাড়ির ঘোড়া হয়ে যাবে। তখন ঘড়ি দেখবার সময় পাবেন।’

‘তখন সময় বুঝি আর কাটতে চাইবে না।’ কাকলিকেই বেশি কথা কইবার আশকারা দিচ্ছে স্বকান্ত, তাই কাকলিই বললে।

হোটেলের যাবার সময় কাকলির ইচ্ছে ছিল না পশ্চাপত্তি কিছু সাজ করে। কিন্তু উপায় কী স্বকান্তকে তুমি সম্পূর্ণ হতাশ করো। ধনী-মানী বন্ধুর কাছে একটু উজ্জল হয়ে দেখা দাও এ কোন স্বামী না চায়। আর যদি বন্ধুর একটু স্নানজরে পড়ে, আর

তার ফলে স্বামীর যদি একটা স্বরাহা হয়, তা হলে তা তো পরম পাতিব্রত। স্ত্রী হচ্ছে স্বামীর বিজ্ঞাপনের সাইনবোর্ড। তার বইয়ের প্রচ্ছদপট। ইংরেজ আমলে দিল্লির দরবারে হুন্দরী স্ত্রী দেখিয়ে অনেকেই আগে-আগে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন আমল বদল হলেও দিল্লির দরবার উঠে যায় নি। এখনো অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীর রূপই স্বামীর রূপের নির্ণায়ক। স্ত্রী যদি পাতে দেবার মত, তা হলে স্বামীও জাতে গুঠবার।

কিন্তু কী তোমার আছে যে সাজবে! অনেকখানি বাহু দেখানো ও একচিলতে পেট-পিঠ দেখানো আটসাঁট জামা নেই, নেই বা দেখা-না-দেখায় যেশা ফিনফিনে একটা নাইলন। তবে কি দিয়ে কী হবে। দরকার নেই, যা আছে তাই এদিক-ওদিক উড়িয়ে-ঘুরিয়ে পরে নাও। অস্তুত চোখের কোলে কোণ বরাবর রেক মেয়ে সুরমাটা তো আঁকো আর লিপস্টিক তো একটু বুলোও আলগোছে। ব্যক্তিত্বের আসল জাহু চোখে, চোখের কটাক্ষে, আর সেই জু-র কথা মনে আছে? তোমার নাম রেখেছিলাম মুগশাবকলোচনা।

কাকলি হেসে বললে, ‘সাজগোজে ক্রটি থাকা ভালো। বিজ্ঞাপনের বানান ভুল থাকলেই বেশি আকর্ষণীয় হয়।’

‘হ্যাঁ, আকৃষ্ট করা নয়, আকর্ষণীয় থাকাই বড় কথা।’

এত সব হিতকথা সেদিন যে বলেছিল, সেই স্বকাস্তরই এখন কিনা এই ভাস্ত। চোরকে ভাঙা বেড়া দেখিয়ে এখন আবার চোরের উপরেই রাগ।

যে কথাটা চলছিল তার ফের খেই ধরল স্বকাস্ত। বললে, ‘তা হলে ঘড়ির ব্যাণ্ডটা যখন বেচেছ তখন একে একে গায়ের ছ-একখানা গয়না যা আছে, তাও বেচে দিতে পারো।’

‘অনায়াসে। দরকার পড়লেই।’ কাকলি বললে দৃঢ়স্বরে।

‘কাকুর অল্পমতির অপেক্ষাও করবে না?’

‘কেন করব? আমার নিজের জিনিস বেচব তাতে কার কী মাথাব্যথা?’

‘স্ত্রী তার গায়ের গয়না বেচবে স্বামী জানবে না?’

‘তুমি বুঝি ভেবেছ স্ত্রীর গয়না চিরকাল শুধু স্বামীর প্রয়োজনই যাবে, স্ত্রীর নিজের প্রয়োজনে যাবে না? যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় দই মারবে।’

‘তা হলে তো দেখছি তোমার নিজের টাকা আছে।’

‘আছেই তো।’

‘তা হলে আর আমার কাছে হাত পাতবার তোমার দরকার নেই।’

‘এক বিলু নেই।’

‘তুমি নিজেই তা হলে নিজেরটা চালাতে পারবে।’

‘এক শো বার।’

স্ববীর গিয়েছিল বাসন্তীকে আনতে। বাসন্তী আসে নি। মাকে একটা চিঠিও দেয় নি, কেন গেল না। মৃণালিনী জিজ্ঞেস করল স্ববীরকে, ‘কেন এল না?’

স্ববীর বললে, ‘জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমুল ঝগড়া।’

২৫

সেপ্টেম্বর এবার এসেছে ছোড়দাহুর ঘরে খবর দিতে।

‘জানো বিজু, আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি।’ বিজুকে বিজু বলে সেপ্টেম্বর।

‘কোথায় যাচ্ছিস রে? আমার বাড়ি?’ হাত বাড়িয়ে কোলের কাছে টেনে নিল বিজু : ‘ঝিকঝিক ট্রেনে করে?’

‘না, না, তুমি কিছু বোঝো না।’ খুব গম্ভীর মুখ করল সেপ্টেম্বর : ‘আমার বাবা যে খুব গরিব। অত রেলভাড়া দেবার পরমা কোথায়? দুটো ফুল আবার দুটো হাফ! ওরে বাবা:!’ ঘাড়টা ছোট করে মুখ ভেঙচিয়ে অসম্ভবের ভঙ্গি করলে সেপ্টেম্বর।

‘তবে কোথায়? গ্রামবাজার? মাসির বাড়ি?’

‘তোমার মাথায় কিছু নেই।’ সরাসরি রায় দিল সেপ্টেম্বর : ‘মাসির বাড়িতে তো মোটে দুখানা ঘর। সেখানে গুটি-গাটি নিয়ে থাকব কি করে? আর মাসির ছেলেটা যা বিজু না, দাদা বলে একটুও মানতে চায় না আমাকে। তা মারামারি করতে চাল তো কর, দেখি তোর কত জোর। তা বুঝলে, ওকে কিছু বলা যাবে না—মাসি উলটে তেড়ে আসবে আমাকে। ছেলেটা আহ্লাদের নাডুগোপাল।’

‘আর তুই? তুই কী?’ ছুরি দিয়ে নখ কাটছিল হেমন, জিজ্ঞেস করল।

‘আমি শুধু গোপাল। আমার হাতে নাডু কই? আমার বাবা যে গরিব।’

‘আমি তোকে নাডু দেব। কীরকদম দেব।’

‘আগে দাও।’

এনামেলের কৌটোয় মিষ্টি মজুত করে রাখে বিজু। কেউ আদর করে ভেকে খাওয়াবার নেই, তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হয়। মন প্রসন্ন থাকলে,

যখন যে তার পক্ষ নেয়, তাকে বিতরণও করে। নচেৎ নিজে খায় বা স্বামীকে খাওয়ায়।

সেন্টুকে দিল একটা মিষ্টি। বললে, ‘এখন বল কোথায় যাচ্ছিল ?’

‘যেখানে যাচ্ছি সেখানে এমন মিষ্টি পাব না।’ লুকু জিতে আঙুল চাটতে লাগল সেন্টু : ‘তা হলে আরেকটা দাও।’

কৌটো থেকে বিজয়া আরেকটা মিষ্টি দিল। বললে, ‘এবার বল।’

আর পাবার নিশ্চয়ই সম্ভাবনা নেই। তবু কৌটোর দিকে তাকিয়ে হতাশ মুখে সেন্টু বললে, ‘আমার বাবা আলাদা বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে—এখানে আর আমরা থাকব না।’

‘কেন রে, কেন ?’ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল বিজয়া।

‘ঠাকুমা কেবল মাকে বকে।’

‘কে বকে ?’ সূক্ষ্ম চোখে নথ কাটতে ব্যস্ত, যেন শুনতে পায় নি হেমন।

‘ঐ যে ঝগড়াটে বুড়ি আছে একটা, ডাকাত-গিন্নি—’

‘কী বললি ?’ হো-হো করে হেসে সেন্টুকে বুকে নিয়ে খাটের উপর গড়িয়ে পড়ল বিজয়া। সেন্টু বুকের মধ্যে খলবলিয়ে উঠল।

‘দেখছ না কিরকম থপথপ মোটা হচ্ছে দিন-দিন—’

‘কী হচ্ছে ?’ বিজয়ার আবার প্রমত্ত হাসি। হাসতে-হাসতে চোখে প্রায় জল আসার জোগাড়।

‘হাসছ মানে ?’ ছুরির ধারটা কণ্ঠে আনল হেমন।

‘বা, মজার কথায় হাসব না ?’ বিজয়া উঠে বসল, সেন্টুকে নামিয়ে দিল খাট থেকে।

‘মজার কথা ! এসব কথা ঐটুকু ছেলে শিখল কোথায় ?’

‘বলো আমি শিখিয়েছি।’ বিজয়া ফৌস করে উঠল।

‘কেউ কি আর শেখাব বলে শেখায় ! ওরে শেখ, ঠাকুমাকে ডাকাত-গিন্নি বলবি, ঝগড়াটে বুড়ি বলবি। কখন কে রাগের মাথায় বেফাঁস স্বগতোক্তি করে তাই ছেলেটার কানে যায়। সেই থেকেই শিখে নেয়, কুড়িয়ে নেয়—’

‘আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? ওর মাও তো বলতে পারে।’

‘পারে। কিন্তু তোমার অমনি হেসে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয় নি। একটু শাসন করা উচিত ছিল—’

‘তোমাদের ঝগড়ার ছেলে, তুমি করো না।’ বিজয়া নেমে পড়ল খাট থেকে : ‘খাম্বা কথা কিছু নয়, একটা মজার কথা বলেছে তাই একেবারে শাসনের হুমকি।’

‘হাঁ, তাই, এসব কারণেই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা হচ্ছে না ছেলেদের—’

‘ঠিক বলেছ ছোড়াছ, ঠাকুরমাটার শ্রদ্ধা হচ্ছে না—’ বললে সেন্টু, ‘কেন যে দেরি হচ্ছে?’

আবার হেসে উঠল বিজয়া। আবার ছেলেটাকে বুকে নিয়ে খলবল করে উঠল। আবার গড়িয়ে পড়ল খাটে। বললে, ‘ছেলেটা কী সুন্দর! যাই বলুক, কিন্তু কী সুন্দর করে বলে!’

‘আর তুমি কী সুন্দর করে হাসো!’ নখ কাটতে-কাটতে বললে হেমন।

‘হাসব না?’ মারমুখে ভক্তি করে উঠে বসল বিজয়া: ‘হাসবার কথা হলেই হাসব।’

‘প্রশান্ত আলাদা বাড়িভাড়া করে চলে যাবে এটা খুব সুখের কথা?’ ছুরির দিকেই চোখ রাখল হেমন।

‘নিশ্চয়ই সুখের কথা। এ বাড়ির একটা ছেলের যে তবু আত্মসম্মানের বোধ আছে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার সংকল্প করার যে সংসাহস আছে—তার জন্তে সে অভিনন্দনের যোগ্য।’ বিজয়া নেমে দাঁড়াল: ‘সে ছেলেকে নিয়ে গৌরব করতে হয়, আনন্দ করতে হয়।’

এখন ডান হাতের নখ ধরতে হবে। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটাটা অপারেশানের মত কঠিন। পাঁচ-পাঁচটা নখ পাঁচ-পাঁচটা অপারেশান। সেই দুর্কহ কাজেই মন দিল হেমন। সুতরাং প্রস্তুতও একটু দুর্কহ শোনাল। বললে, ‘সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বুঝি খুব সম্মানের কাজ?’

‘নিশ্চয়ই। এক শো বার। যে সংসারে নিত্য ঠোকাঠুকি, মারামারি, প্রতি পদে ছোট মনের পরিচয় সেখানে থাকাকাটা ঘোর—ঘোর অসম্মান। সবাই তো আর তোমার মত হুঁচুটে জগন্নাথ নয়—’

‘তার মানে তুমি বলতে চাও বিজয়া-দশমীর পর প্রশান্ত আর বড় বউমা এ বাড়িতে আমাদের প্রণাম করতে আসবে?’

‘এ আবার কী প্রশ্ন! তবু, কথার পিঠে উত্তর, সরাসরি বললে বিজয়া: ‘নিশ্চয়ই আসবে।’

‘আর কোনো কারণে যদি আসতে দু দিন দেরী হয় আমরা ওদের ক্রটি ধরব!’

‘ধরলামই বা!’

‘আর ওরাও আশা করবে যেহেতু জয়ন্তী-স্ববীর ছোট, তারা ওদের বাড়ি যাবে প্রণাম করতে?’

‘আশা তো করতেই পারে

‘আর যদি কোনো কারণে স্তবীর-জয়ন্তীর যেতে ছু দিন দেরি হয় ওরা ক্রটি ধরবে?’

‘ধরুক। ধরলে কী হয়?’

‘কী হয় মানে?’ এবার ছুরির থেকে চোখ তুলে বিজয়ার চোখের দিকে তাকাল হেমন : ‘তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের আত্মীয়স্বজন যারা বিজয়াদশমীর পর এসে এক থালা মিষ্টি খেত তারা দু’বাড়ি গিয়ে দু’থালা মিষ্টি খাবে?’

হাসি পেলেও হাসল না বিজয়া। বললে, ‘খেলেই বা! তাতে তোমার কী! আমাদের কী?’

‘আমাদের কী মানে! আর সেই মিষ্টি ঝণ্টু-সেণ্টু কিনে আনবে ঠোঙা করে? বাড়ির থেকে কত দূরে ময়রার দোকান হয় তা কে বলবে।’

‘বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে এমনিধারা ছোটখাট বাজার করেই থাকে।’

‘ওরা ঠোঙায় পুরে যা আনবে তা ওরা নিজেরা খেতে পাবে না, কোন রাক্ষস এসে খেয়ে নেবে। রাক্ষসটা থাকবে আর ওরা দুই ভাই-বোন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ক্যালক্যাল করে চেয়ে থাকবে।’

‘চেয়ে থাকবে কেন? ওরাও খাবে।’

সেণ্টুর মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল, এবার হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

‘হ্যাঁ, খাবে? জোটাতে পারবে প্রশান্ত? অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে নিজের সম্ভানদের একেবারে অনশনে না হোক, রাখবে ক্ষীণাশনে। তাতে খুব সুখ, খুব হাসি?’

‘অমন অতিথি-আপ্যায়নে দরকার নেই।’ সজোরে মাথা ঝাঁকাল বিজয়া : ‘অতিথিকে দেবে না মিষ্টির থালা।’

‘দেবে না?’ আবার ছুরিতে মনোনিবেশ করল হেমন : ‘ঐ যে, কী না জানি বললে কথাটা? সম্মান। মধ্যবিত্ত সম্মান। পথে কুড়োনো শালপাতা, সেই শালপাতার ঠোঙায় করে আনা দেখন-মিষ্টি। মানে, বাইরে থেকে দেখতেই মিষ্টি, কিন্তু ভিতরে—’ একটা ভয়াবহ দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেমন।

‘কী ভিতরে?’

‘ভিতরে সম্ভানের উপবাস, স্ত্রীর হাহাকার।’

‘রাখো। আর কেউ অল্পবিত্ত স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সংসার করে না? যার যেমন অবস্থা তার তেমনি ব্যবস্থা করতে হবে। ছেলের দুধ অতিথির চায়ে যাবে এ অসম্ভব।’

‘বললে তো অসম্ভব, কিন্তু তাই যাচ্ছে, যাবে। ঝন্টু-সেন্টুর দুধ জুটবে না। কীরকদম দুবের কথা, খুরিতে পড়ে থাকা রসগোল্লায় সিরেটুহুও পারবে না ধরতে। ওদের মা তাই উল্লুনের উপরে তরকারির কড়াতে ঢেলে দিয়েছে। ব্যবস্থা?’ একটা নখ সেয়ে দ্বিতীয় নখে যাবার আগে চোখ তুলল হেমন : ‘ধান বাঁচাবার জন্তে অনেক ব্যবস্থা করেছিল চাষা, কিন্তু বলবুলির ঝাঁককে কথতে পারে নি। তবুও সেই চাষার আশা ছিল, ভবিষ্যৎ ছিল, মাঠে তার রতন বোনা ছিল। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রশান্ত-বন্দনার কিছু নেই। শুধু একটা ফাঁকা স্বপ্ন।’

‘স্বপ্ন দেখতে সাহস লাগে।’

‘হুঃস্বপ্ন দেখতেও।’ জুড়ে দিল হেমন।

‘এ জাগ্রত হুঃস্বপ্নের চেয়ে সে কল্পিত হুঃস্বপ্ন অনেক সহনীয়।’

‘বটে? তবে তুমি দয়া করে একটা স্বপ্ন দেখ না।’ অহুরোধে হুরটা সিন্ত করল হেমন।

‘আমি স্বপ্ন দেখব?’

‘ক্ষতি কী! দেখ না। তুমিই বা কম সাহসী কী! স্বপ্ন দেখ এ বাড়িতে এ ছেলেটা, সেন্টুটা নেই। আর তার কথা শোনা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না তার হাসির খিলখিল। তার দৌড়ঝাঁপ, হৈ-চৈ, উপরে-নিচে দাপাদাপি। কথায় কথায় তার নালিশ করে ওঠা। রান্নাঘর থেকে পড়ার ঘর—সকলের কাজেকর্মে ব্যাঘাত হওয়া। এখানে-ওখানে লুকিয়ে থেকে সমস্ত সংসারকে সমস্ত করা। তারপর নিজের থেকেই বার হয়ে ধরা পড়ে বিজুর ঘর থেকে কীরকদম খাওয়া। দেখ, দেখ, ছুটুর শিরোমণিটা কেমন হাসছে দেখ—’

তার শেষ দিকের বর্ণনাটায় সেন্টু বিশেষ খুশি হয়েছে, তাই যুহু যুহু হাসছে, যুহু যুহু হাসিতে মুখখানি উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

প্রশ্রয়ভরা চোখে তাকে দেখছে হেমন; কিন্তু বিজয়া চোখ তুলে যে তাকাবে, তার সামর্থ্য নেই। ইতিমধ্যে একটি বই তুলে নিয়েছে, তারই পৃষ্ঠায় দৃষ্টিকে সে আশ্রয় দিল।

‘কই দেখ, দেখ স্বপ্নটা। যে ছেলেটা সমস্ত ঘর-দোর ছাদ-বারান্দা সদর-খিড়কি ওতপ্রোত করে জড়িয়ে ছিল, স্বপ্ন দেখ, তার আর বিন্দুমাত্র সাড়াশব্দ নেই। সকালে নেই, দুপুরে নেই, রাত্রে নেই। কী, দেখছ? আজ নেই। কাল নেই। তাকে ছুটো ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেছে।’

সেন্টুর হাসি-হাসি মুখটা চকিতে উড়ে গেল। ফ্যাকাশে হুরে বললে, ‘ছেলেধরা ধরে নিয়ে গেল কী বলছ?’

হ্যাঁ। একটা নয়, দু' দুটো ছেলেধরা। একটা তার বাবা আরেকটা তার মা।’

আশস্ত হল সেটু। আবার স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ বিজ্ঞ-বিজ্ঞ মুখ করল। বিজুর কষ্ট হচ্ছে বলেই যে বিজু চুপ করে আছে, এটুকু বুঝতে পেয়ে নিঃশব্দ সহানুভূতিতে তার পাশ ঘেঁষে গেল।

বিজয়া ঘেঁষল না, বুঁকল না এতটুকু। নির্লিপ্ত স্বরে বললে, ‘তা কী করা যাবে। যাদের ছেলে তারা যদি নিয়ে যায় তুমি কী করতে পারো?’

‘যাদের ছেলে মানে?’

বিশ্বয়ও কম নয় বিজয়ার : ‘ওদের ছেলে নয় তো কাদের ছেলে?’

‘সমস্ত সংসারের ছেলে।’ তৃতীয় নখ ধরল হেমন : ‘বউ যখন একটা ঘরে আসে তখন সে কার বউ?’

‘আহা, কী প্রশ্ন! যে বিয়ে করে এনেছে তার।’

‘না। সে ব্যক্তিবিশেষের স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সমস্ত সংসারের বউ।’ নখটা একটু বেশি কেটে গেল কিনা তাই পর্যবেক্ষণ করতে লাগল হেমন। বললে, ‘তাকে একটা ব্যক্তি বিয়ে করে নি, একটা প্রতিষ্ঠান বিয়ে করেছে। সে প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবার।’

‘কী সর্বনাশের কথা! দ্রৌপদীর বেলায় শুধু পাঁচ ভাই ছিল, আর তুমি একেবারে পঞ্চজন বানিয়ে ফেললে।’ হাসতে লাগল বিজয়া।

আর নির্মল ছেলেটা শুধু বিজুর মুখের হাসি বুঝল; তার অতিরিক্ত কোনো ইঙ্গিত নয়, কোনো ব্যঙ্গনা নয়, আর তাই হাসল নিরর্গল। হাসল নিরর্থক।

‘স্বপ্ন দেখ, তুমি এই হাসিটা আর ভুলতে পাচ্ছ না।’ হেমন আবার মনে করিয়ে দিল।

‘তুমি কী বলছ ছোড়দাছ!’ বিজয়ার গায়ে ভর দিয়ে উঁচু হল সেটু। বললে, ‘আমি তো প্রায়ই আসব এ বাড়ি। আর তোমরা, তুমি আর বিজু, তোমরাও তো যাবে আমাদের ওখানে।’

‘হ্যাঁ, জানি। আর তোমার দুধটুকু দিয়ে দু-জনে দু' বাটি চা খেয়ে আসব।’

এটার মধ্যেও বা হাসবার কী ছিল, শিশুটা দুর্বীর আনন্দে নির্ধারিত হল।

‘সংসারে এই একটা শুধু কলকঠ ছিল তাও নিয়ে যাবে প্রশান্ত?’ যেন নখ কাটার চেয়েও সহজ তেমনি নিটোল গলায় হেমন বললে, ‘কই, এতদিনে ছোট একটা ভাই আসবে সেটু— তা নয়—’

সহসা মুখ-চোখ কাঁদো-কাঁদো গভীর করে তুলল সেণ্টু। বললে, ‘ভালো হচ্ছে
৥ কিন্তু ছোড়াহু—’

ভাইয়েতে সেণ্টুর ঘোরতর আপত্তি। ভাই এলে তার আদর কমে যাবে এই তার
চয়। তাই হেমেনের প্রতি তার এই জুঁক জুঁকটি।

‘তোমার আদর কে কাড়ে।’ তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল হেমেন : ‘তবু একটা
ছোট ভাই হলে দেখবে তোমার নিজেরই কত ইচ্ছে করবে আদর করতে। এখন
সামান্যলো ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে পরতে চাপ না, তখন কত ভালোবেসে দিয়ে দেবে
ছোট ভাইকে। বলবে, তোর আর মুরোদ কী। তুই তো তোর দাদার জামা
রেছিস।’

‘ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।’ স্ফীত নাক-ঠোঁট প্রকৃতিস্থ করল না সেণ্টু।
লে, ‘আবার কিন্তু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিওটা ভেঙে দেব।’

‘তুমি যদি চলে যাও তবে শুধু এই ভূতের রেডিও নয় সমস্ত অদ্ভুতের রেডিওই বন্ধ
হয়ে যাবে।’

‘হঠাৎ তোমার আবার আরেকটা শিশুর জন্তে বাসনা কেন?’ চোখ চোয়াল
কথা— সব একসঙ্গে ঝাঁক করল বিজয়া।

তর্জনীর নখটা বুঝি কিছুতেই বাগানো যাবে না। এদিক-ওদিক ছুরি ঘুরিয়ে
বলবে কায়দা করতে পেরেছে ভেবে হেমেন বললে, ‘আমার নিজের জন্তে নয়,
সবার জন্তেই আমার বাসনা। আরেকটা নতুন শিশু এলে বেশ হত, নতুন শ্রী
যত ঘরদোরের। চিং হয়ে কোকল। দাঁতে হাসত আর রঙিন বল খুলতে দেখে
ত-পা ছুঁড়ে খেলা করত—’

‘দাড়াও, ছুরি দিয়ে তোমার আঙুল কেটে দিচ্ছি এখুনি—’ কিন্তু ভক্তিতে খাট
কে নেমে পড়ল সেণ্টু।

‘কেটে দেবে কী— কেটে গিয়েছে।’

‘কই, দেখি। দাড়াও, আইডিন দিয়ে দি।’ টেবিলের কোন কোণে আইডিনের
শিশি আছে, সর্দার ছেলে তাই নিয়ে এল কুড়িয়ে।

শিশির ছিপিটা আইডিনে ডুবিয়ে হেমেন সেণ্টুর হাতে দিল। ছুঁই-কি-না-ছুঁই
যে কাটা জায়গাটায় ছিপিটা লাগাল সেণ্টু। আর যত না সত্যি জল তার চেয়ে
শিশি তড়পাল হেমেন। আর সেই তড়পানি দেখে সেণ্টুর মহা আনন্দ।

‘আর বলব না, বলব না তোর ছোট ভাইয়ের কথা।’ সেণ্টুকে আরো খুশি
। জন্তে তড়পানির মধ্যেই অভিনয়ের ভক্তিতে বললে হেমেন।

‘নিজের আর কি। গায়ে তো লাগে না। ঝামেলা তো পোয়াতে হবে এক কড়া। উনি শুধু আদর করবেন।’ আরো যেন অনেক দূর কেটেছে বিজয়ার গলার যেন আরো বেশি আইডিন : ‘উনি আদর করবেন বলে পেটে ধরতে হবে!’

‘পেটে বাচ্চা এসেছে সুনলে প্রথমটা খুব বিরক্ত লাগে, কিন্তু বাচ্চাটা সত্যি জন্মায়, তখন সেটা কী অপরূপ বস্তু বলে তো!’ বললে হেমন।

‘তা ওর নিজের ভাই না চেয়ে ওর একটা খুড়তুতো ভাই চাইলেই তো পারে। বিজয়া হেমনের দিকে না তাকিয়ে তাকাল সেন্টুর দিকে।

‘ভালো হবে না বলছি, বিজু। তোমাকেও তা হলে আইডিন লাগাব।’ ভাইয়েতেও সেন্টুর আপত্তি।

‘তা তোমরা তো বিয়ের আগে থেকেই তার জন্তে বরণভালা নিয়ে বসে আচ, এবার পায়ের দিকে নজর দিল হেমন : ‘তোমাদের ভয়েই সে আসে নি তড়িৎতড়ি যখন আসে নি তখন আদৌ আসে কিনা তার ঠিক কি।’

‘আহা, কথার কী নমুনা!’

‘এমনি স্বখে-শান্তিতে থাকতে দিলে হয়তো আসত। কিন্তু স্বহু আর তার যেসব কাণ্ড করে ছোট বউমাকে চাকরি করতে পাঠাচ্ছে তাতে আর সে অসাব্য হতে চাইবে না।’

‘তুমি তো কত বোঝো!’

‘তা ঠিক। এ শাস্ত্র বুঝেছি এ কথা দেবতারও বলতে পারে না। তবু সম্ভাবনা একটা চেহারা আঁচ করছি মাত্র। ছোট বউমা চান বা না চান, তার আঙ্গি চাইবে না।’

‘আকিস কী চাইবে না?’

‘বারে-বারে মেটারনিটি লিভ গ্র্যান্ট করতে।’

বইয়ে মন দিল বিজয়া।

পদচর্চায় নিবিষ্ট অবস্থায় হেমন বললে, ‘আর তোমার তো ইটারনিটি লিভ বলেই চট করে অল্প কথায় লাফ দিল : ‘কাজে কাজেই আরেকটা ছোট্ট শিশুর সম্ভাবনা নেই—’

আবার শিশুর কথা উঠেছে এবং নিশ্চয়ই তা হলে সেটা সেন্টুর প্রতিকূলে তাই সে ফের আইডিনের শিশি কুড়িয়ে এনে হেমনকে তাড়া করল। নতুন না কাটুক, ঐ পুরোনো কাটার জায়গায়ই লাগাব আবার।

‘আরে কী মুশকিল, আমি তো তোঁর পক্ষেই বলছি।’ হেমন সেন্টুকে নিরস্ত করতে চাইল। বললে, ‘তুই তো পুরুষমানুষ, সমস্ত কথাটা তো আগে শুনবি। নাকি পক্ষে শুনেই, কথা শেষ না হতেই, মেয়েদের মত তেড়েফুঁড়ে আসবি ঝগড়া করতে ?’ পাটা কী বলছি আমি ? বলছি সেন্টুই আমাদের সর্বস্ব। সেন্টু ছাড়া আমাদের মন আর কেউ নেই, আর কেউ আসবেও না, আসতেও পারবে না, তখন সেন্টুকে ধরা ছাড়তে পারব না কিছুতেই। কী, কথাটা কি ভালো, না মন্দ ?’

মলজ মুখে হাসতে হাসতে সেন্টু হেমনের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

‘সারা বাড়িতে একটা শিশু থাকবে না, তার কলকর্ষ শোনা যাবে না।’ বললে হেমন, ‘তাকে সংসার বলে না, মকতুমি বলে।’

তকুনি, সহসা, উপরে একটা চোঁচামেচি শোনা গেল।

নাকিয়ে উঠল বিজয়া : ‘শোনো, শোনো তোমার সংসারের কলকর্ষ।’

দবজার সামনে পর্দা ধরে দাঁড়াল। একসঙ্গে, কখনো বা একের পরে আরেক, মনেতে পাচ্ছে চারজনকে। প্রশান্ত আর বন্দনা, সুকান্ত আর কাকলি।

আর কাঁদছে কে ?

কাঁদছে ভগলু। নেমে আসতে আসতে কাঁদছে।

ভয় পেয়ে হেমনের আরো নিবিড়ে এসেছে সেন্টু। আর হেমন ভাবছে, মনে কেন নথ কাটার ব্যবস্থা নেই ? থাকলে, সকালের দিকেও থাকতে পারত রে—এ প্রভাতী আরত্ৰিক স্তনতে হত না।

ভগলু কাঁদতে কাঁদতে নামছে সিঁড়ি দিয়ে : ‘আগে কাজ করলাম না বলে মার খলাম। এখন কাজ করলাম বলে মার খেলায়। আমাকে রামেও মারে রাবণেও মারে। এখন আমি যাই কোথায় ?’

‘কী হয়েছে ?’ ভগলুকে কাছে ডাকল বিজয়া।

‘তুমি ব্যাপারটা শেষকালে চাকরের কাছ থেকে শুনবে ?’

‘কেন, ও তো উৎপীড়িত। ওর নিজস্ব একটা ভার্গন আছে। আর কে না মনে এ ক্ষেত্রে ও-ই নিরপেক্ষ।’

ভগলু বললে ঘটনাটা। সকালে উঠেই, মানে বাবুবা বিছানা ছাড়লে, বউমারা ত্রা আগেই ছেড়েছেন, প্রশান্ত সুকান্ত দু ভায়েরই ঘরে ঢুকে ঝাঁটপাট দিয়েছে নির্বিবাদে। ঝণ্টু-সেন্টু উঠে গেলে বিছানাও তুলেছে পরিপাটি। প্রশান্ত তখন মিচে চায়ে-খবরের কাগজে মগন, তাই জানে না কিছু। এখন বেলা হয়েছে, পানতিতে জল আর জ্বাকড়া নিয়ে ঘর মুছতে গিয়েছে ভগলু, আর দেখুন, পা ছুঁয়ে

বলছি, প্রথমেই ঢুকেছি বড় দাদাবাবুর ঘরে। তা তিনি আমাকে দেখেই খেপে উঠলেন। বললেন, এ ঘরে ঢুকবি তো ঠ্যাঙ ভেঙে দেব।

‘তুই কী বললি?’ জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

‘আমি বললাম, আমি তো চোর নই, কেন আমার ঠ্যাঙ ভাঙবেন? আমি সংসারের চাকর।’

‘সংসারের চাকর?’ শূন্যে হোঁড়া বর্শার ফলার মত লাফিয়ে উঠল প্রশান্ত : ‘তোমার মাইনে কে দেয়?’

ভগলু বললে, ‘এস্টেট দেয়।’

‘এস্টেট দেয়! মিথোবাদী। সব টাকা তুই মার কাছ থেকে পেয়েছিস হতচ্ছাড়া?’

‘যেখান থেকে পাই আমার হিসেব মিটলেই হল।’ ভগলু অবাক হবার ভাষা করল।

‘দশ টাকা মার কাছ থেকে আর পাঁচ টাকা ও ঘর থেকে পাস নি?’ প্রশান্ত গর্জন।

‘ও ঘর বলে অস্পষ্ট রেখে লাভ কী?’ এটা বন্দনার টাকা : ‘পাঁচ টাকা এম-এ ওয়ালীর নিজের রোজগারের থেকে দেওয়া।’

‘সুতরাং তুই পুরোপুরি এজমালি চাকর নস। ওঠ, বেরো ঘর থেকে—’ প্রশান্ত লাগি গুঁচাল।

বন্দনাকে ঘরের বাইরে আসতে দেখে কাকলিও বেরিয়ে এল। বললে, ‘টাকা মধ্যে কাক নাম লেখা থাকে না। বাড়তি পাঁচটা টাকা আমি দিয়েছি, মা দেয়নি। এর মধ্যে মহাভারতটা অন্তত কোথায়? টাকাটা মার হাত দিয়ে এলেই সংসারে টাকা, আমার হাত দিয়ে এলে সেটা সংসারের টাকা নয় এ তারতম্য কোনো উচ্চ মস্তিষ্কে ঢুকবে না সহজে।’

বন্দনা তখন অস্ত্র পথে গেল। ভাস্কর গুরুজন, সে চাকরকে শাসাচ্ছে, তা মধ্যে তুমি, ভাস্কর, তুমি ফোড়ন দাও কেন? একটু হাস্য নেই গা? তার উপর গুরুজনকে বোকা বলে ঠেস মারা।

এবার স্ফূর্তি এল। যা কোনোদিন করে নি, দাদার পক্ষ নিল! কাকলিও অস্ত্র বলল। বলল, ‘নিশ্চয়ই ও এজমালি চাকর নয়। দাদা ঠিকই বলেছে ভগলুকে এজমালি করতে হলে তোমার উচিত ছিল ঐ পাঁচ টাকা মার হাতে দেওয়া মার হাতে দিয়েই ওটাকে সংসারের টাকা করে তোলা। তারপরে মা দিতে

ভগলুকে, সংসারের দেওয়া হত। ভক্ততার ধার ধারলে না তুমি। তারপর এসেছ দাদা-বউদির সঙ্গে ঝগড়া করতে—’

‘কি রে, উঠলি? ছাড়লি ঘর?’ ভগলুর দিকে মুখিয়ে এল প্রশান্ত।

‘কী আশ্চর্য, কাজটা আগে সারতে দিন না। কাজটা শেষ না হলে ঘর ছাড়ি কী করে? কেউ ছাড়ে?’

বলা-কওয়া নেই দমাদম মার শুরু করল প্রশান্ত।

এতটা আবার সহ্য হল না প্রকান্তর। সে প্রশান্তকে ছাড়িয়ে নিল। বললে, ‘এখন যদি চাকরটা তোমাকে মারে? আর যার দিক থেকেই হোক, ওর দিক থেকে তো কোনো ক্রটি হয় নি, কোনো অত্যাচার নয়। তবে ও মার খাবে কেন? কেনই বা এখন ও প্রতিশোধ নেবে না?’

‘তার মানে তুই চাকরের সঙ্গে একজোট হয়ে আমাকে এখন মারবি, আমার উপরে প্রতিশোধ নিবি?’ প্রশান্ত উত্তেজনার কাপতে লাগল।

এই নিয়েই তারপরে বিতণ্ডা।

হ-হ্ব শ্বাসে নিচে নেমে এল প্রশান্ত আর হনহনিয়ে এগোল সদরের দিকে।

ক্ষিপ্ৰ ভঙ্গিতে উঠে হেমন তাকে নিরস্ত করল। বলল, ‘কোথায় যাচ্ছিল?’

‘বাড়ি খুঁজতে।’

‘দাঁড়া, আমিও যাব তোর সঙ্গে।’ সেন্টুকে বিজয়ার জিন্মায় দিয়ে দু মিনিটে তৈরি হয়ে নিল হেমন: ‘দেখি, আমিও খুঁজব।’ ভগলুকে বললে, ‘তুই থাক। যেতে পারবি নে। তোর সমস্ত মাইনে আমি দেব।’

স্বামীর পিছু-পিছু ব্যস্ত পায়ে নেমে এসেছিল বন্দনা, এখন এ কথা শুনে মনে-মনে বললে, ‘তা হলে কাকিমাই তো সমস্তটা গ্রাস করবে। চাকরের টিকিটাও জুটবে না আমাদের।’ কিন্তু মুখ ফুটে পারল না উচ্চারণ করতে।

‘কদ্দুর যাবি?’ বাড়ির বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল হেমন।

প্রশান্ত আমতা-আমতা করতে লাগল : ‘এই এদিক-সেদিক।’

‘এদিক না সেদিক একটা ঠিক করবি তো? ডাইনে না বাঁয়ে? উত্তরে না দক্ষিণে?’ বাধা দিল হেমন : ‘তুই তো আর লাট্টু নস, উত্তর-দক্ষিণ তো আর একসঙ্গে ঘুরতে পারবি নে।’

অগ্ন্যমন্ডলের মত ডাইনের দিকে পা বাড়াল প্রশান্ত। হেমন পিছু নিল। কয়েক পা গিয়েই প্রশান্ত থেমে পড়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘তুমি চলেছ কোথায়?’

‘কেন, কোনো অগ্নায় জায়গায় যাচ্ছি যে আমি সঙ্গে গেলে সংকোচের কারণ হবে?’ আচমকা হেমনও থেমে পড়ল।

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সত্যি কোনো অগ্নায় জায়গাতেই চলেছে বোধ হয়। পায়ে নইলে কেন জোর পাচ্ছে না, গায়েই বা লাগছে না কেন ক্ষুণ্ণের বাতাস? অপরাধীর মত ভক্তি করে বললে, ‘গাবতলার ঐ বস্তিটার দিকে যাচ্ছি।’

‘মানে গাবতলার দিকে না গিয়ে গাবতলার দিকে যাচ্ছি।’ প্রশান্তর চোখের উপর চোখ রেখে হেমন বললে।

‘তার মানে?’

‘ভাব গাবের চেয়ে বড় তো? আর উপকারীও? তার মানে, বড় ছেড়ে ছোটয় যাচ্ছি, উচু ছেড়ে নিচুতে।’ হেমন আরো স্পষ্ট হল : ‘কোঠাবাড়ি ছেড়ে বস্তি।’

‘তার কী করা যাবে।’ প্রশান্ত ঝংকার দিয়ে উঠল : ‘ভাবও অনেকের সম্ব হয় না। কী উপকারী তা কে জানে! তাই লোকে হাত বাড়িয়ে প্রথমে উপাদেয়কেই গ্রহণ করে।’

‘কী উপাদেয় শুনি?’ কোমরে হাত রেখে প্রায় কণ্ঠে দাঁড়াবার ভক্তি করল হেমন।

‘উপাদেয় সম্মান। উপাদেয় স্বাধীনতা।’

‘সেই সম্মান আর স্বাধীনতা শুধু ঐ গাবতলার বস্তিতেই গ্যারাণ্টি দেওয়া? বলি কদিনের ক-বেলার গ্যারাণ্টি?’ মুখোমুখি দু পা এগিয়ে এল হেমন : ‘আইনের জোর

দেখিয়ে জী-পুত্র নিয়ে বেরিয়ে যাওয়াটাই স্বাধীনতা, আর সংসারটাকে টেনে নোংরা বস্তিতে নামিয়ে নিয়ে আসাই সম্মান ? কেন, কেন, ছোট নজর কেন ? বস্তি আর ভাগাড় আর আঁস্তাফুড় ? কেন, বাড়িটাকে বড় করতে পারিস নে ? প্রাণটাকে বড় করতে পারিস নে ?

প্রশান্ত এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল।

‘একজনের প্রাণ একটু বড় হলেই আর সকলের মনও একটু একটু করে বড় হতে থাকে।’

‘কিন্তু কি করি, আয়ই যে অল্প।’ হেঁট মাথা চুলকোতে লাগল প্রশান্ত।

‘সেটা লজ্জা নয় ? আয় যেহেতু কম সেহেতু থাকব গিয়ে নর্দমায়, সেটা খুব বাহাদুরি। খুব বুক-ফোলানো। আর আয় বাড়াবার চেষ্টা দেখাটাই লজ্জা, লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়া—’

‘আয়ের আর পথ কোথায় ?’ প্রায় যেন দিগন্তের দিকে তাকাল প্রশান্ত : ‘কোথায় আর আয় বাড়ানো ?’

‘কোথায় ?’ প্রশান্তের হাত কঠিন মূঠোয় চেপে ধরল হেমেন। বললে, ‘এই একসঙ্গে একত্রে হাত মেলানোয়। এজমালি সংসারে থেকে কত তোর আয় বেড়েছে তার হিসেব রাখিস ? শুধু তোর নয়, তোর জ্বর, তোর ছেলেমেয়ের। আর আয় কি শুধু টাকা ? আয় মানে কি আরাম নয় ? সহমর্মিতা নয় ?’

‘কিন্তু এজমালি সংসারে জায়গা কই ?’ পাশ কাটাতে চাইল প্রশান্ত।

‘যত জায়গা তোমার বস্তিতে, কলকাতার ভূস্বর্গে !’ হেমেন ধিক্কার দিয়ে উঠল : ‘শোন, যদি তোর বুকের মধ্যে জায়গা না থাকে, রাজপ্রাসাদেও জায়গা নেই। আর যদি থাকে, তবে বড় বাড়ির ছোট ঘরই রাজপ্রাসাদ। ঘর ছোট কি নয়, এটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যে বাড়ির সেটা ঘর সে বাড়িটা বড় কিনা।’

‘কিন্তু বড় বাক্যযন্ত্রণা।’ প্রশান্ত প্রায় নাক সিঁটকাল।

‘আর তুই যেখানে যাচ্ছিস সেখানে নিরন্তর কাব্য ঝরে পড়ছে। আর সেই কাব্যযন্ত্রণা যে কী ভয়ানক, দু দিন পরেই বুঝবি যখন ঝটু-সেণ্টু গালাগাল শিখবে। কান ভরে যাবে, প্রাণ গলে যাবে। সংসারে থেকে অন্তত যে গালিগালাজটা শিখছে না—সেটাও তো তোর একটা আয়—’

‘তা আর কী করা !’

‘কী করা মানে ?’ লাকিয়ে উঠল হেমেন : ‘তুই ভেবেছিস ও ছেলেমেয়ে তোর নাকি ?’

প্রশ্ন শুনে প্রশান্ত তো অবাক ।

‘বউ তোর একার হতে পারে, কিন্তু ঝণ্টু-সেণ্টু তোর একার নয় । ঝণ্টু-সেণ্টু সংসারের । সাধি কি তুই ওদেরকে সংসারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাস ? সাধি কি তুই ওদেরকে নষ্ট করিস ? নিজেরা তোরা দু-জনে যত খুশি বয়ে যা, কিন্তু ওদেরকে কিছুতেই বয়ে যেতে দেব না । না, দেব না । কি করবি, কী করতে পারিস তুই ? খানায় যাবি ? কোর্টে ? তোর যেখানে খুশি সেখানে যা । আমরা ছাড়ব না ছেলেমেয়ে । তোর মনের শান্তি উকিলে-পুলিসে কুরে-কুরে থাকে ।’ বাড়ির দিকে পা চালান হেমন ।

দেখল প্রশান্তও গুটিগুটি আসছে পিছু-পিছু ।

বেকনো মাত্রই বাড়ি পাওয়া যাবে এ অবস্থা আশাতীত কিন্তু প্রশান্ত যে তার দুঃখ বুঝেছে এবং তার প্রতিবিধানে যে লেগেছে কোমর বেঁধে তাইতেই বন্দনা খুশি । আশাতীত খুশি । বললে, ‘তুমি একনাগাড়ে বেশি হেঁটো না, অস্থস্থ হয়ে পড়বে—’

‘না, আমি হাঁটব না । আমি দালাল লাগাব ।’

‘তাই ভালো ।’ আশস্ত হল বন্দনা ।

‘আফিসে বন্ধুবান্ধব আছে তারা কোন না সাহায্য করবে—’

‘নিশ্চয়ই করবে । তারাও আমাদের মত গরিব । গরিবের দুঃখ গরিবের অপমান গরিব ছাড়া কেউ বুঝবে না । আমরা গরিবেরা থাকব একসঙ্গে । একে-অন্তেরটা দেখব একে-অন্তে । একজোট হব ।’

প্রশান্তর কানে কিরকম অদ্ভুত শোনাল কথাগুলো । বললে, ‘তেমনটি পেতে হয়তো একটু দেরি হবে ।’

‘তা হোক । তবু মন যা চায় তা পায় ।’ বন্দনা প্রেরণা দেবার মত করে দীপ্তকণ্ঠে বললে, ‘তুমি যখন অপমানের প্রতিকার চেয়েছ তখন আসবেই প্রতিকার । ধৈর্য ধরেছি, আরো না হয় ধরব ।’

‘হ্যাঁ, ঝণ্টু-সেণ্টু বড় হোক ।’ অশ্রুট কণ্ঠে, প্রায় নিজের মনে-মনে প্রশান্ত বললে । হেমন খুঁজছে ঝণালিনীকে ।

‘তোমার বড় ছেলের কাণ্ড শোনো, বউদি ।’ হাঁক পাড়ল হেমন ।

‘কি ?’ ভয় পেয়ে ঝণালিনী চোখ প্রায় কপালে তুলল ।

‘বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে ।’

‘তা যাবে বৈকি ! বাঁদরের আর কী কাজ !’

ছেলেকে মা বাঁদর বলবে এতে আর আপত্তি কী ! তবু তার কাজটা কী জানতে দোষ নেই। হেমন তাই কান বাড়াল : ‘কী কাস্ত ?’

‘বাঁদরের কাজ হচ্ছে ফলা ক্ষেত তছরুপ করা। আর বউদের কাজ হচ্ছে ভরা ঘর ছারেখারে দেওয়া।’

তা হলে বাঁদরের এখানে অস্ত্র ব্যাকরণ। হেমন চাইল নৈব্যক্তিক হতে, বললে, ‘সেই তো যন্ত্রণা। বউ ছাড়া ঘর ভরে না আবার বউ ছাড়া ঘর ভাঙে না। ভরতেও বউ, ভাঙতেও বউ।’

আরো দূরে-দূরে দৃষ্টি ফেলল মৃণালিনী : ‘যারা ঢেউনাচানি ঘরভাঙানি তারা যাক বেরিয়ে, কেউ তাদের না করবে না, কানি পরে পথে-পথে কাঁদলেও না। চুনোপুটির ফরফরানি সার। ঘরে ঘটিবাটি নেই, কোমরে চাবিকাঠি ঝুলিয়েছে !’

‘কিন্তু দোষ তো প্রশান্তর। ও ওর সংসারকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বস্তিতে, খাটালে, কাঁচা নর্দমায়। তোমার দৃষ্টান্ত চোখের উপর দেখেও শিথল না কিছু—’

‘আমার দৃষ্টান্ত ?’ তলিয়ে বোঝবার দরকার নেই, নিজের প্রসঙ্গ উঠতেই খারাপ ভেবে নিয়ে তেয়িয়া হয়ে উঠল মৃণালিনী।

‘ভালো কথা বলছি—’

‘আমার কথা তোমাদের কাছে আবার ভালো হল কবে ?’ তবু কথাটা না শুনে স্বস্তি পাচ্ছে না মৃণালিনী। মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘কিন্তু কথাটা কী শুনি ?’

‘তুমি কেমন সংসারকে তোলবার চেষ্টা করছ, আর ছেলেরা উলটো, তাকে নামাবার চেষ্টা করছে—’ হেমন মিটিমিট করে তাকাল।

‘তোলবার চেষ্টা করছি মানে ?’ ক্রিয়াপদের মানেটা যেন পুরোপুরি স্পষ্ট হয় নি, মৃণালিনী ভঙ্গিটা তাই নিস্তেজ করল না।

‘মানে, উন্নত করবার চেষ্টা করছ। চাইছ আধুনিক করতে। জঙ্গল থেকে নিয়ে আসতে শহরে, রাজধানীতে।’ কণ্ঠস্বর প্রায় গদগদ করে তুলল হেমন : ‘কার্পেট, পর্দা, ফ্যান, ক্লকসেন্ট, ড্রয়িং রুম, ডাইনিং টেবল, এম-এ পাশ বউ—তুমি চাচ্ছ ভোল ফেরাতে, বঙচঙে করতে—আর ছেলেরা—’

‘দিচ্ছে না হতে।’ মৃণালিনী বুঝল তাকে প্রশংসাই করা হচ্ছে। তাই গর্বিত আনন্দে বললে, ‘আমার সাধনার দুই কণ্টক। দুই শত্রু।’

‘হ্যাঁ, দুই মূর্তিমান। প্রশান্ত আর স্বকান্ত।’

‘মোটাই ছেলেরা নয়। দুই মূর্তিমান মানে তুমি আর তোমার দাদা।’ মুখিয়ে এল মৃণালিনী।

‘আমি আর দাদা!’ হেমন প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসল।

‘হ্যাঁ, দুই শত্রু। একজন অর্থ, আরেকজন কল্প।’ বললে মুণালিনী, ‘তোমরা দু-জনেই বাদ সাধছ। তোমরাই কিছু হতে দিচ্ছ না। বড় হতে দিচ্ছ না বাড়ি-ঘর, আলো জ্বলতে দিচ্ছ না সব ঘরে। মধ্যবিস্তার মধ্য ধরেই কোনোরকমে ঝাঁকড়ে থাকতে চাইছ। মাথায় উঠে আসবার চেষ্টা নেই। ছেলেরা তো তোমাদের থেকেই শিখবে। তারা পায়ের দিকে নেমে আসতে চাইবে তার বিচিত্র কী!’

‘শেষকালে আমাদের দোষ ধরলে!’ যেন চড় খেয়েছে এমনভাবে গালে হাত ঝুলুতে লাগল হেমন।

‘নিশ্চয়ই তোমাদের। একজন অক্ষম, আরেকজন কপণ।’ মুণালিনী আবার চড় ছুঁড়ল।

তাড়াতাড়ি লেজ গুটিয়ে হেমন ফিরে এল নিজের ঘরে।

বিজয়া জিজ্ঞেস করল, ‘কী কথা হচ্ছিল দিদির সঙ্গে?’

‘ওরে বাবা:, সে কথা বলি আর আবার একটা প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে যাক। যদি আমার দিকে হও তা হলে দিদিকে ধুববে আর যদি দিদির দিকে হও তা হলে আমাকে ধোলাই। তার চেয়ে পালাই, স্নান করি, মাথায় জল ঢালি—’ হেমন বাথরুমের দিকে ছুটল।

কিন্তু সেদিন দুপুরবেলা এ কী শুরু হল প্রলয়কাণ্ড!

মুণালিনী আতঙ্কিত কান্নার রোল তুলল: ‘চলল, বউ বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলল, চলল একা-একা—’

ঘুমুচ্ছিল বিজয়া, চোখ খুলে কান খাড়া করে রইল।

‘ওরে সকলকে ডাক, আমার লক্ষ্মীপ্রতিমা বুঝি বিসর্জনে ঝেঁতে বসেছে!’

এপাশে ওপাশে খান তিন-চার বই-পত্রিকা চেপে দুমড়ে উঠে পড়ল বিজয়া। উপরে প্রশান্তের ঘরে এসে তার চন্দ্র চড়কগাছ হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে খোলা চুলে কাতরাচ্ছে বন্দনা—কাটা পাখির মত ঝটপট করছে, যন্ত্রণা এত ভীষণ, কথা কইতে পারছে না। জ্ঞানও ঠিক আছে কি না বোঝা কঠিন।

শীত-শীত বলে ক্যানটা চলছে না, কিন্তু মায়ের জন্তে কিছু একটা করা উচিত এই ভেবে বন্দনার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছোট ক্লশ হাতে একটা হাতপাখা নাড়ছে ঝন্টু, আর পাশে মেঝের উপর দু হাতে মাথা ধরে একটা ‘কী হল’ ‘কী হল’ মুখ করে বসে আছে মুণালিনী।

‘কী খেয়েছে?’ অভিজ্ঞ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

‘কিছু খায় নি।’ কান্নায় ছুটে-পড়া মুখে ঝন্টু বললে, ‘থেয়ে-দেয়ে শুয়েছিল মা। ঘুমিয়েও ছিল। তারই মধ্যে পেটে ব্যথা উঠেছে।’

‘বমি করেছে?’

‘তা একবার করেছে বাথরুমে গিয়ে।’ বললে ঝন্টু, ‘বাথরুম থেকে ফিরেই এই অবস্থা।’

‘ওরে আমার কী হল’, মৃণালিনী আবার চেটে তুলল : ‘আমার সোনার প্রতিমা কালী হয়ে গেল। ওরে তোরা সব কোথায়? বাড়ি আস—’

‘চোঁচাচ্ছেন কী! খামুন।’ বিজয়া ধমক দিয়ে উঠল : ‘হয়তো বিষ খেয়েছে। চোঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে আর এখন কেলেঙ্কারি বাড়াবেন না।’

গাঢ় একটা গোঙানি বের করে মৃণালিনী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বিজয়ার চোখের উপর চোখ রেখে নিম্নতম স্বরে বললে, ‘বিষ? তাই হবে। বিষই খেয়েছে। বড় বাড়ি বদল করবার শখ ছিল, অভিমানে মা আমার নতুন বাড়িতে চলেছে—একা একা চলেছে—’

‘কাকলি কোথায়?’

‘তার তো এখন পৌষ মাস, সে ঘুমুচ্ছে আরামে।’ মৃণালিনী বললে।

‘বাড়িতে এত বড় বিপদ, আর সে ঘুমুচ্ছে?’ বিজয়া হটকট করে উঠল।

‘সেই তো সমস্ত বিবাদের মূল। কালনাগিনী হয়ে সেই তো ছুবলেছে আমার মাকে।’ দিবি বলতে পারল মৃণালিনী : ‘সেই তো অশান্তির ঝড় নিয়ে এসেছে বাড়িতে। আগে যখন আমরা ছিলাম, স্নহু ধরে নিয়ে আসে নি এই বনবেড়াল, সংসারে কোথাও একটা ঝাঁচড় পড়ে নি। তারপরে কী যে হল, কে যে এল—’

পাশের খাটে শুয়ে সেন্টু ঘুমুচ্ছে, এ বেশ বোকা যায়, দূরের ঘরে জয়ন্তী ঘুমুচ্ছে, এও বেশ ধারণায় আসে, কিন্তু তুমি, কাকলি, সমর্থ আর শিক্ষিত, তোমার কর্তব্যজ্ঞান না থাক, সাধারণ একটু দয়ামায়া নেই? বন্দনার উপর তোমার যত রাগ বা বিরাগ থাক, শত হলেও সে তো সেন্টুর মা, যে সেন্টু তোমাকে এত ভালোবাসে। বন্দনা মরে গেলে সেন্টু কাঁদবে, অন্তত এটুকু কল্পনা করেও কি তোমার একটুও দুঃখ হয় না? লেখাপড়া কি মানুষকে এমনি উদ্ধত করে, স্বার্থপর করে?

কাকলির ঘরের দিকে এগুচ্ছিল বিজয়া, ঝন্টু বললে, ‘কান্না নিচে গেছে উছন ঘরিয়ে জল গরম করে আনতে।’

খামল বিজয়া। মুখ-চোখ গম্ভীর করে বললে, ‘এ জল-গরমের কেস নয়। এ পাশ্চিৎ-এর কেস। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পাশ্প করাতে পারলে হয়তো—’

‘কী সর্বনাশ হবে! মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! আবার সেখান থেকে না-জানি কোথায়! আবার সেখান থেকে—’ আরেকটা চাপা কান্নার ভুরভুরি তুলল মৃণালিনী।

‘চুপ করুন।’ সময় পড়েছে, বিজয়া মনের স্বেচ্ছাধীন মৃণালিনীকে : ‘বেশি টেচাবেন তো পুলিশ এসে পড়বে। তখন কেঁচো খুঁড়তে কোন গর্ত থেকে সাপ বেরবে বলা যায় না।’

কিন্তু তেমন পুলিশ-পুলিস বলেও তো মনে হচ্ছে না। তাই যদি হবে, তবে চরম যা খেয়েছে, তার শিশি কই? অবশিষ্ট একটু রেখে যাবে না প্রমাণস্বরূপ? একটা চিঠি লিখে রেখে যাবে না? আর কাউকে না হোক, অন্তত স্বামীর উদ্দেশ্যে? পুলিশের উদ্দেশ্যে?

‘হ্যাঁ রে, তোর মা কোনো চিঠি লিখে গেছে?’ ঝট্টুকে জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

‘কই দেখি নি তো।’

তবু, বালিশের তলা, তক্তাপোশের তলা, ঘরের আগা-পাশ-তলা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে বিজয়া। খুঁজেছে, এমন-কি, বাথরুম-পায়খানা। না পেয়েছে একটা টাটকা ভাঙা শিশি, না বা ছেঁড়া একটা চিঠির টুকরো।

পুরোনো ব্যাগি বলে প্রশান্তের নিজেই ছিল একটা হট-ওয়াটার ব্যাগ, সেটাতে গরম জল ভর্তি করে নিয়ে এল কাকলি। বন্দনার পেটের উপর রাখতে যাচ্ছে, মৃণালিনী তার হাত থেকে ছোঁ মেরে ব্যাগটা কেড়ে নিল। বললে, ‘ধাক, তোমাকে আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।’ বলে নিজে বিছানার পাশে বসে পেটের উপরে আঁচলের ভূর রেখে ব্যাগ চেপে ধরল। বললে, ‘যা জানো না, তা এলো না করতে।’

গরমের ছোঁয়া পেয়ে মুচড়ে-মুচড়ে উঠল বন্দনা।

ব্যাগটা তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিয়ে মৃণালিনী বললে, ‘কে জানে গরম জলে উলটে অপকার হবে কিনা। যদি কিছু খেয়ে-টেয়ে থাকে—’

কথাটা গ্রাহ্য করল না কাকলি। বন্দনার পায়ে হাত দিয়ে দেখল পা এখনো ঠাণ্ডা। হাত দিয়েই বসল শুকনো মালিশ করতে।

‘জয়ন্তী! জয়ন্তী!’ তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী।

কতক্ষণ পরে ধড়মড় করে উঠে আসতেই তার উপরে শতধা হয়ে পড়ল : ‘ধাড়ি মেয়ে, এখনো তুই যুমুচ্ছিস কী করে? এদিকে তোর বউদির ঘে ঠাণ্ডা হতে চলেছে। বোস, হাত দিয়ে ঘষে বউদির পা দুটো গরম করে দে।’

কাকলি জয়ন্তীকে ছেড়ে দিল জায়গা। শিয়রের দিকে গিয়ে ঝট্টুর কাছ থেকে

পাখাটা চাইল। যদিও বুঝেছে, পায়ের বা মাথার হাওয়ায় কিছু উপশম নেই, তবু কুগীর জন্তে কিছু একটা করা দরকার, তারই জন্তে মাথার দিকে এগুলি কাকলি। কিন্তু বিজয়া হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিল ঝন্টুর দিকে, বললে, ‘দে পাখাটা আমাকে। তুই ছেলেমানুষ, তুই কতক্ষণ হাওয়া করবি?’

আর যদিও কাকলি আগে এসে পৌঁছেছিল, ঝন্টু পাখাটা বিজয়াকেই দিল। সেও যেন বুঝেছে, কাকলিই এই বাড়িতে বিদেশী, প্রক্ষিপ্ত, তার মায়ের এই বিকৃতির মূলেও সেই।

কুগীর যন্ত্রণার এমন নিষ্ক্রিয় সাক্ষী হয়ে বসে থাকবার কোনো মানে হয় না, তাই কাকলি বললে, ‘কোথাও একজন ডাক্তার পাই কিনা দেখব?’

‘তুমি কোথেকে দেখবে?’ মৃণালিনী ধমকে উঠল।

‘এই রাস্তায় বেরিয়ে।’

‘চেনা নেই, অচেনা নেই, তুমি ডাক্তারের কী বোঝো!’ মৃণালিনী বললে, ‘শেষকালে হিতে বিপরীত হোক। যা-ও আশা ছিল, তোমার ডাক্তার এসে ফাঁসিয়ে দিক।’

‘তা ছাড়া কী হয়েছে—থেকেছে একটা কিছু, স্পষ্ট আন্দাজ না করে ডাক্তার ডাকাও মুশকিল।’ বিজয়া টিপ্পনী ছুঁড়ল: ‘তেমন কিছু হলে ফ্রেণ্ডলি ডাক্তার দরকার। যে রেপেঁ-ঢেকে, সব গুছিয়ে-বাঁচিয়ে চলতে পারবে। তুমি সর্দারি করে কোথেকে এক উড়ো ডাক্তার ধরে নিয়ে এলে, সে এক হলস্থল বাধিয়ে নিয়ে গেল হাসপাতাল, থানায় খবর দিলে—সে এক মহাকেলঙ্কার!’

‘না, না, বাড়ির কর্তারা আগে আসুক।’ বললে মৃণালিনী।

‘তাদের আসাটা যাতে দ্রুত করা যায়, অন্তত তার চেষ্টা করি।’ অস্থির মিনতি নিয়ে তাকাল কাকলি: ‘দাদার আফিসের ফোন নম্বর জানেন?’

‘যা না আফিস, তার ফোন নম্বর!’ বন্দনা তখন ব্যথায় মুহমান, তাই অনায়াসে বলতে পারল বিজয়া।

‘কাকার আফিসে নিশ্চয়ই আছে—’ কাকলি বিজয়াকে উদ্দেশ্য করল।

‘আছে মানে? একেবারে তার নিজের টেবলের উপর আছে।’

‘দিন না নম্বরটা।’

‘আমার এ প্রাস্তে কি ফোন আছে যে, তার নম্বরটা মনে রাখব?’

‘বেশ, তাঁর আফিসটার নাম বলুন, আর যদি শুনে থাকেন, তবে ঠিকানাটা।’

ঠেকে-ঠেকে ভাড়া-ভাড়া ঝাপসা কী কতগুলো বললে বিজয়া। তাই নই।

দেখি, ধরতে পারি কিনা। একটা নিপতিত মাহুঘের যন্ত্রণার লাঘব স্বরাশ্রিত করতে পারি কিনা।

নেমে যাচ্ছিল, মৃণালিনী বললে, ‘বার-লাইব্রেরিতেও তো ফোন করতে পারো। সেই বরং সোজা।’

‘না, না, বাবাকে ব্যস্ত করতে চাই না।’

‘তার আবার ব্যস্ত ! লাইব্রেরিতে বসে এখন তাস পিটছে নয়তো পাশা চালছে। আমি বলি কি, যদি জানাতে হয়, উনি যখন বাড়ির কর্তা, তখন ঠুকেই সর্বপ্রথম জানানো উচিত।’

আবার এই নিয়ে মানসন্মান ! তালিকায় অল্পক্রম।

ক্ষত পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি। কোথায়, কোন বাড়িতে টেলিফোন, কোন বাড়িতে বা এই ছপুরে তার পক্ষে ঢোকা সহজ হবে, শালীন হবে, ভাবতে-ভাবতে, দেখতে-দেখতে এগুতে লাগল। একটা রিকশা ডেকে নিল। সটান বড় রাস্তায় এসে একটা গুয়ুধের দোকানে এসে ঢুকল। ফোন করতে পারি ? পরশা লাগবে। তা জানি। তা দিচ্ছি। কত ?

বিজয়ার ভুল কেটে-কেটে তিন-তিনবার ডায়ালিং করে হেমনকে ধরতে পেল কাকলি।

‘হ্যালো। কে ?’

‘আমি ছোট বউমা। কাকলি।’

‘কী ব্যাপার ?’ হেমন তো বিমূঢ়।

‘দিদি, বন্দনা, হঠাৎ পেটে একটা তীব্র ব্যথা হয়ে প্রায় কোল্যাপস করেছে। আপনারা শিগগির বাড়ি আসুন। দাদার আফিসে খবর দিন। যদি সম্ভব হয় একজন ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন। দেরি করাটা ঠিক হবে না বোধ হয়।’

‘যাচ্ছি। এখুনি।’ আর কথা বাড়াল না হেমন। উঠে পড়ল।

ব্যথার তাড়সে আর্তনাদ করে উঠল বন্দনা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাল চারদিকে। জানলার বাইরে রোদের দিকে, আকাশের দিকে। আগাগোড়া বিরাট এক অর্থহীনতার দিকে।

তাকে জাগতে দেখে হতাশ হল বিজয়া।

মুখের কাছে মুখ এনে অক্ষুট অন্তরঙ্গতায় বললে, ‘কিছু খেয়েছিলে ?’

শুভ্র, ‘অসার চোখে তাকিয়ে রইল বন্দনা।

‘বলি, কিছু বিষ-টিব ?’ আরো একান্ত হল বিজয়া।

‘আছে? আছে তোমাদের কাছে? থাকলে তাই একটু দাও না। আর পাচ্ছি না সম্ব করতে।’ বন্দনা কাতরাতে লাগল।

বিদ্যুৎগতিতে চলে এল হেমেন। চলে এল ট্যাক্সিতে। সঙ্গে প্রশান্ত। উন্নত-দর্শন এক ডাক্তার।

একটু দেখে কি না দেখে ডাক্তার বললে, ‘এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। অ্যাম্বুলেন্সে খবর পাঠান।’

হাসপাতাল শুনেই মুণালিনী ঘাবড়ে গেল। পাংশু মুখে প্রশান্তকে চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলে, ‘কি, পুলিশ-টুলিস আসবে নাকি?’

‘কী যে মাথামুণ্ড বলো তার ঠিক নেই।’ প্রশান্ত থিঁচিয়ে উঠল: ‘একটা লোকের অস্থখ করেছে, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে, এখানে পুলিশ আসবে কী ভাবে?’

‘না, আসতে পারত, যদি আপনারা ডাক্তার ডাকতে বা রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে আরো দেরি করতেন।’ প্রশান্ত মুখে বললে ডাক্তার, ‘তখন সেটা ক্রিমিনাল হয়ে পড়ত। ঠিক-ঠিক সময়ে ব্যবস্থা হচ্ছে বলে খুব আশা হচ্ছে বেঁচে যাবে রুগী।’

‘এর সমস্ত ক্রেডিট আমাদের ছোট বউমার।’ প্রশান্ত মুখে বললে হেমেন, ‘উনি ঠিক সময়ে আমাকে ফোন করেছিলেন বলেই সব হল। নইলে, উঃ, আরো দেরি হলে কী সর্বনাশ যে হত, ভাবা যায় না। কই গো ছোট বউমা?’

বাড়ি ফিরেই জাগন্ত সেন্টুকে দু হাতে জাপটে ধরেছে কাকলি। মা কোষায় যাচ্ছে ও কেন, বোঝাচ্ছে হালকা করে। তোমার ভাবনা কী, তুমি আমার কাছে, কাম্মার কাছে থাকবে। আমরা মাকে দেখতে যাব। তারপর মা ভালো হয়ে, স্বন্দর হয়ে, মোটাসোটা হয়ে বাড়ি ফিরবে। যেই ডাকবে সেন্টু, টু শোনবার আগেই কাম্মার কোল ফেলে পড়ি-মরি মায়ের কোলের দিকে ছুট দেবে।

হেমেনের ডাকে ডাক্তারের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি। বললে, ‘ওপেন না করলেই নয়?’

‘নয়। আর যদি বা তা যায়,’ ডাক্তার বললে, ‘তা, যা শুনলাম, আপনার উপস্থিতি বুঝির জন্তে।’

অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। মোটা হাতে ডাক্তারকে টাকা দিল হেমেন। ই্যা, ক্যাবিন চাই। আর নার্স চক্ৰিশ ঘণ্টা। দিনে-রাত্রে ফালতু অ্যাটেণ্ডেন্ট। যত দিন লাগে। যত টাকার দরকার। সেন্টুর মাকে ভালো করে আনতে হবে। সেন্টুকে যেন কাঁদতে না হয়।

বন্দনার চুলে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত বললে, ‘কোথায় আমি যাব, না, তুমি চললে !
শ্রাক্ষার ঠুকঠুক কামারের এক ঘা । কে জানে হয়তো আমার অস্থখই চলে গেছে,
তুমি টেনে নিয়েছ তোমার মধ্যে । আর তুমি যখন ভালো হবে তখন আমরা
ছ’জনেই ভালো হব ।’

‘আর তখনই নতুন উত্তমে ছুটব বাড়ি দেখতে ।’ হেমেন টিটকারি দিয়ে উঠল : ‘দেখ
না কেমন স্থন্দর বাড়ি বদল ! বস্তির চেয়ে অনেক স্থন্দর হাসপাতালের ক্যাবিন ।’

দুর্বল হাত বাড়িয়ে বিজ্ঞার হাত ধরল বন্দনা । আজকে, এই মুহূর্তে, বিজ্ঞাকেই
তার সবচেয়ে আপনায় মনে হচ্ছে । কামাগলা স্বরে বললে, ‘আমি আর বাঁচব না ।’

‘আহা, সে কী কথা ! আমরা তো পেট কেটেছে, আর দেখছ, এখনো
কেমন বেঁচে আছি, দুর্গায় বেঁচে আছি । আর জানো তো,’ কানের কাছে মুখ নামাল
বিজ্ঞা : ‘সেইজগ্গেই কিছু হল না, এল না পেটে ।’

শুনতে পেয়েছে হেমেন । স্বর করে বলে উঠল, ‘এ পেট সে পেট নয় ।’

ভূপেন বন্দনার মাথায় হাত রেখে নীরবে জপ করল । ছেড়ে দিল আত্মলেন্স ।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল স্বকান্ত । বললে, ‘শুনলাম তুমি নাকি আজ খুব
এফিসিয়েন্সির পরিচয় দিয়েছ ?’

‘যে যা সে তো তাই পরিচয় দেবে ।’ প্রথম থেকেই বাঁকা ধরল কাকলি । বাঁকা
ধরবে না তো কী । কী এমন কাণ্ডটা কাকলি করেছে যে অমন চিপটেন ঝাড়ে ।

‘কাকিমার ভুল সবেও ঠিক আফিসটা বের করলে গাইড থেকে । দোকানে
দাঁড়িয়ে ফোন করলে । এক্সটেনশন জানো না, তাও খুঁজে নিলে । আর খুঁজে নিতে
পারলে বলেই একটা প্রাণ বেঁচে গেল ।’ মুখে-চোখে আভা ফোটারবার চেষ্টা করল
স্বকান্ত : ‘তবে বলো, তোমাকে এফিসিয়েন্ট বলব না ? শুধু আমার বেলাতেই তুমি
কি না—’

‘না । তোমার বেলাতেও এফিসিয়েন্সি দেখাব ।’ বললে কাকলি ।

‘দেখাবে ? কী ভাবে ?’

‘তোমার মনোবাহা শূর্ণ করে ।’

‘আমার মনোবাহা ?’

‘আর তোমার মায় । তোমার সংসারের ।’

‘কী করবে ?’

‘একটা চাকরি নেব ।’

‘নেবে ? পাবে ? সত্যি ?’ যেন শতকণ্ঠে ইউরেকা করে উঠল স্বকান্ত ।

‘সত্যি। কিন্তু একটা কথা শোনো—’ কাকলি তাকাল মাটির দিকে।

‘বলো।’

‘আমি কদিন চাকরির বাজারে ঘুরে দেখছি—’

‘দুরছ নাকি?’

‘না ঘুরলে মিলবে কোথায়?’ এবার চোখ তুলল কাকলি : ‘এ কি ইউনিভার্সিটির লিফট যে যেটা এসে পড়বে ছমড়ি খেয়ে সেইটেকেই তুলে নিতে হবে? মাঝে মাঝে তাই ঘুরছি ছপূরবেলা।’

‘কী দেখছ?’

‘দেখছি চাকরির বাজারে বিবাহিত স্ত্রীর চান্স খুব কম, অবিবাহিত কুমারীর চান্সই বেশি। স্ততরাং—’

‘স্ততরাং?’

‘আমি দরখাস্তের কর্মে নিজের নাম, কুমারী নাম, কাকলি মিত্র লিখেছি। ‘ডটার অফ’ লিখেছি, ‘ওয়াইফ অফ’ লিখি নি।

‘বেশ করেছে।’ শতকণ্ঠে মায় দিল স্বকান্ত।

‘নাম কাকলি বহু, ওয়াইফ অফ স্বকান্ত বহু লিখতে গেলেই ভরাডুবি হত।’

‘হত!’ মুখ-চোখ অসহায় করল স্বকান্ত।

‘নিশ্চয়ই। ওয়াইফ অফ তো চাকরি করে কেন? স্বামী থাকতে কেন এই অকমারি? স্বামীটা কি তা হলে গাধা, না গরিব?’ কাকলি প্রায় ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘বাপ গরিব এ ইঙ্গিত না হয় সহ্য হয়, কিন্তু স্বামী গরিব এ ইঙ্গিত সহ্য হয় না।’

‘তা খুব ভালো করেছে।’

‘কুমারী-কুমারী গন্ধ থাকলে অফিস-বসেরা চঞ্চল হয়।’ হাসল কাকলি, ‘আর স্ত্রী-স্ত্রী গন্ধ থাকলে নিচু হয়ে ফাইল দেখে। স্ততরাং—’

‘স্ততরাং—’

‘আমার যদি ইন্টারভিউর চিঠি আসে আমি কিন্তু কুমারী সাজব।’

‘খুব সুন্দর হবে।’ দৃষ্টি মন্দির করল স্বকান্ত : ‘তারপর আমার সঙ্গে যখন তোমার ইন্টারভিউ হবে তখনো তুমি কুমারী। সেই দেখেছিলাম তোমাদের বাড়ির ছাদে, মাথা কপাল শূন্য, হাত দুখানি খালি, সারা গায়ে আভরণহীনতার আভা—’

‘সিলি! সাধ্য কি তুমি আর চাকুরে কুমারীর কাছে এগোও।’ প্রায় ঝিকারের মত করে বললে কাকলি, ‘তার কেরিয়ার নষ্ট করে। তার স্বাস্থ্য, শান্তি ও অব্যাহতিতে হাত দাও। যাও, হটো, সরে দাঁড়াও শত হস্ত।’

এ কী এক নতুন যন্ত্রণার মধ্যে এসে পড়ল কাকলি। এমনটি সে চায় নি, দুপুবের রোদে এমনি টই-টই করে ঘোরা পথে-পথে, আফিসে-আফিসে। পাঁকের মধ্যে থেকে গায়ে পাঁক না লাগানো। ভিড়ের মধ্যে থেকে গা-বাঁচানো সরে-সরে। যন্ত্রণা কি শুধু ঐটুকু? শুধু রোদ আর ভিড় আর ক্লান্তি? শুধু খিদে-ভেঁটা? যন্ত্রণা আবার মনোভঙ্গ। যন্ত্রণা আবার এক বুড়ি মিথ্যে কথার পসরা নিয়ে ফিরি করা।

তবু তুমি শিক্ষিত, তুমি উপযুক্ত, তোমাকে কি আলস্য করা শোভা পায়? নাকি সেই শোভাটাই সভ্যতা? লোকে কি এম-এ পাশ করে ঘুমবার জগে? স্নেহী হয় ভালো খাবে-দাবে বলে? যুদ্ধে যায় খবরের কাগজ পড়তে? সমাজ তোমাকে এতদিন যা দিয়েছে, উপযুক্ত হয়ে এখন তার কিছু অংশ ফিরিয়ে দাও। তোমাকে শিক্ষিত করেছে, অন্তত তুমি এখন কজনকে শিক্ষিত করো। বেশ, মাস্টারি না পোষায়, অল্প কোনো কাজ নাও। কাজ যত শাসালো ততই তো ভালো সমাজের। মোটা আয় করে মোটা ইনকাম ট্যাক্স দাও। সমাজের খরচের টাকা তুমি কুড়োও ঘুরে-ঘুরে।

প্রথম-প্রথম, যে-যে আফিসে চেনাশোনা মেয়ে আছে, তাদের গোয়ালেই চুঁ মারতে লাগল কাকলি। যে শেয়ালের ল্যাজ কাটা গিয়েছে সেই শেয়ালের মনের কথা, ও-ও নিস্পৃহ হোক। যার নষ্ট বলে নাম হয়েছে তার প্রার্থনা হয় ওরও গায়ে একটু কাদার ছিটে লাগুক। পিছলে পড়েই লোকে কর্মমাক্ত হয় না, পাশ দিয়ে চলা অন্তের গাড়ির চাকায় ছিটোনো আকস্মিক কাদাও নিরীহ পথিকের গায়ে লাগে।

‘তা বেরিয়েছিস বেশ করেছিস।’ বললে চিত্রা!

‘এখনো বেকুলাম কোথায়?’ মুখ টিপে হাসল কাকলি।

‘তার মানেই তাই। ঘুর-ঘুর করতে শিখেছিস যখন, তখন বেকুনোর আর দেরি নাই।’

‘যেন ছুরছুর করতে শিখলেই ওড়া যায়!’ আবার হাসল কাকলি।

‘পসিবিলিটি হয়।’ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিল চিত্রা: ‘যে ক্রক পরেছে যতই কেননা সে দেরি করুক, একদিন শাড়ি তাকে ধরতেই হবে। তাই যখন একবার

দরখাস্ত লিখতে শুরু করেছিল, তখন দাসত্ব লিখে দিতে পারবিই। একটা কিছু না কোন জুটে যাবে শেষ পর্যন্ত।

কাজ কি এতই সোজা? পথ কি এতই ঘাসে-ফুলে মনোরম?

হতাশায় নিখাস ফেলল কাকলি। বললে, ‘তুলো শুনতে নয়ম, কিন্তু ধুনতে কঠিন!’

শকুন্তলা বললে, ‘দিবি বিয়ে করে গেরস্থ বনেছিলি, তোকে আবার এই ঘোরা-রোগ ধরল কেন? ভুল শুনিস নি আশা করি। ঘোড়া-রোগ নয়, ঘোরা-রোগ।’

‘আহা, স্বামী যদি দুর্বল হয়, কম-রোজগেরে হয়, তা হলে স্ত্রী কি তাকে সান্নিধ্যে করবে না?’ পাশের চেয়ার থেকে বলে উঠল মীনাক্ষী।

কিরকম অস্বস্তি করে উঠল কাকলির। ঠিক স্বকান্তর জগ্রে নয়, স্বামী—এই কথাটার জগ্রে। ক্ষতকণ্ঠে বললে, ‘না, না, তার জগ্রে নয়। স্বামী যদি প্রবলও হয়, তবু সক্ষম স্ত্রী কেন নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবে? টাকা কি কখনো কাক বেশি হয়? আরামের কি সম্ভাব আছে?’

টিফিন-টাইমে আফিস-পাড়ায় ক্যান্টিনে না ক্যাফেটেরিয়ায় মিলেছে মেয়েরা, মেয়ে-কেরানিরা। সকলে এক গাছের নাই বা হল, পাশাপাশি গাছের থেকেই নেমে এসেছে মাঠে। শালিক-চড়ুই, যাতে যার খুশি, একত্র হয়ে বসেছে কোণে-অ-কোণে। ক্যাফেটেরিয়ায় না হয় তো অলি-গলির রেশমরাঁয়। পর্দার ঘেরাটোপে।

‘আচ্ছা, আমাদের কি আর কেরানি বলা উচিত?’ জিজ্ঞেস করল শকুন্তলা।

‘কে বলেছে? সরকারি পরিভাষায় আমরা এখন করণিকা।’ মীনাক্ষী বললে।

‘মালবিকা-মদনিকার ছোট বোন।’ চিত্রা টিটকিরি দিয়ে উঠল।

কাকলি বললে, ‘কেরানি তো পুরুষ। তাই ওর স্ত্রীলিঙ্গে হওয়া উচিত কে-রাজা। মেয়ে-কেরানিটা শুনতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত নয়।’

‘অনেকটা শী-গোট শী-ক্যাট-এর মত।’ শকুন্তলা ফোড়ন দিল।

‘কে-রাজাটাই সব দিক থেকে শুদ্ধ!’ মীনাক্ষী বললে, ‘আমরা যারা কুমারীরা আফিসে চাকরি করছি, আসলে কে-রাজা কে-রাজাই করছি।’

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

‘তুই হাসছিল কেন?’ শকুন্তলা ঠেলা মারল কাকলিকে: ‘তোরা রাজা তো জুটেই গিয়েছে।’

‘কিন্তু রাজা-জোটানোর আত্মদটা সিঁথিতে-কপালে অমন ডগডগে করে রাখলে চাকরি জুটবে না।’ চিত্রা মুখ-চোখ ভার-ভার করল: ‘বিবাহিত মেয়ের আবার চাকরি কী। তার স্বামীই তো চাকরি।’

‘বা, তাই বলে তার জীবনে আর প্রসপেক্ট থাকবে না? কাকলি প্রতিবাদ করতে চাইল।

‘কিন্তু তাকে চাকরি দিয়ে বস-এর প্রসপেক্ট কী?’ পেয়ালার মুখ লুকিয়ে হাসল মীমাক্ষী।

‘তবে যদি ত্যাগ-করা স্ত্রী সাজতে পারিস, ডিসকার্ডেড ওয়াইফ, তা হলে কিছুটা আশা আছে।’ শকুন্তলা ভাঙ জুড়ল।

‘আর ত্যাগ-করা স্ত্রীরও কুমারী-কুমারী চেহারা।’ মীমাক্ষী তাকাল কাকলির দিকে : ‘কিন্তু তুই যেমন পরিপাটি দেখতে, নতুন ফোটা ফুলের মত, কিছুতেই তোকে পরিত্যক্ত বলে বিশ্বাস করতে চাইবে না। তাই সোজাসুজি কুমারী সাজাই ভালো।’

‘তোমার ভাবনা কী?’ বললে শকুন্তলা, ‘দিন তো শাদাই থাকে, সকাল-সন্ধ্যেটাই লাল হয়। তুই তোমার সকালের সিঁদুর স্নানের সময় তুলে ফেলবি। শাদা থেকে চাকরি করে যাবি সারা দিন। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে গিয়ে সিঁদুর পরবি টকটকে করে। কিন্তু গোড়াগুড়ি এমনি লাল হয়েই যদি আসতে চান দেখবি চাকরির বাজারে চারদিকে লালবাতি জ্বলছে।’

‘মতি, তোমার ভাবনা কী!’ চিত্রা বললে, ‘চাকরিতে বাহাল হবার পর, সুবিধে বুঝে বলবি বিয়ে হয়েছে। কে তোকে ঠেকায়, নিশান তুলবি সিঁথিতে। বিয়ে হবার জন্তে প্রসিডিং হতে পারবে না—আইন নেই।’

‘ইয়ে হবার জন্তেও নয়।’ জুড়ল মীমাক্ষী।

‘তবে কুমারী সাজবার একটা ঝামেলা।’ চিত্রা বললে।

‘কী?’ কাকলির প্রশ্ন।

‘কতগুলি উৎসাহী নির্লজ্জ পিছু নেয়, ফলো করে। সেদিন কী হয়েছিল জানিস না বুঝি?’ রাগবে না হাসবে ঠিক করতে পারছে না চিত্রা : ‘আফিস থেকে বেরিয়েছি কোথেকে একটা ছেলে—হ্যাঁ, লোক নয়, ছেলে—পিছু নিয়েছে।’

‘তোমার নিজের আফিসের কেউ?’ আনাড়ির মত জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘নিজের আফিসের লোকের অতটা সাহস হবে না। যদি হেড-অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দিই। শত হলেও চক্ষুলাতো আছে। এ নিশ্চয়ই কোনো এক প্রতিবেশী আফিসের রত্ন! যেখানেই যাই, যে পথেই এগুই, পিছনে ঠিক সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা বুঝলাম আমার সিঁথিটা শাদা দেখেই বেচারার এমন লেগেছে আদাজল খেয়ে। তখন কী করলাম জানিস? একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগের থেকে লিপষ্টিকটা বের করলাম। ব্যাগের আয়নার মুখ দেখে লিপষ্টিকটা ঠোটে না বুলিয়ে ঘষলাম সিঁথিতে—

আগুন করে তুললাম। পরে নিজেই একটু চেষ্টা করে ঘেঁষলাম ওর দিকে, স্পষ্ট হলো। ও বুঝল, আমি বিবাহিত, আমার সিঁথিতে সিঁদুর—অমনি চম্পট দিল।’ বিজয়িনীর মত হাসতে লাগল চিত্রা : ‘লোকে ঠিক দিয়ে তাড়ায়, আমি লিপটিক দিয়ে তাড়ালো।’

হাসির ঝড় উঠল। কাকলি বললে, ‘কিন্তু সাজ-সজ্জাটা তো পরের কথা। প্রথম কথা হচ্ছে ভেকেঙ্গি।’

‘তুই এখনো অনেক পিছিয়ে আছিস।’ শকুন্তলা চোখ নাচাল : ‘সব সময়েই ভেকেঙ্গি ঘটে না, কখনো-কখনো ভেকেঙ্গির সৃষ্টি হয়।’

‘মানে বায়ুকে যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে—’

চিত্রাকে থামিয়ে ভাঙা জুড়ে দিল মীনাঙ্গী : ‘বায়ুকে মানে বায়ু-দেবতাকে।’

‘হ্যাঁ, যথেষ্ট উত্তপ্ত করতে পারলে,’ কথাটা শেষ করল চিত্রা : ‘মাঝে মাঝে অন্তরীক্ষে শূন্যতা জন্মায়। বিজ্ঞানে ভ্যাকাম বলে, চাকরিতে বলে ভেকেঙ্গি। আর জানিস তো, নেচার আবহবাহক এ ভ্যাকাম।’

‘এখানে নেচার মানে বল, দি পার্সন ইন অথরিটি।’ টিগননীতে শকুন্তলাও ওস্তাদ।

‘সোজা কথা, তার চোখে যদি একটা ভেকেঙ্গি স্টেমার আনতে পারিস, কখনো-কখনো তা হলেও ভেকেঙ্গি।’ হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল চিত্রা।

‘তা হলে বলতে চাস দরখাস্ত করা লাগবে না, ফর্ম ফিল-আপ করা?’ কাকলি করুণ মুখে বললে।

‘লাগবে। লেফাফা রাখতে হবে।’ পুঁচকে রুমালে টোঁট মুছল শকুন্তলা। তারপর জানীর মত মুখ করে বললে, ‘কিন্তু লেফাফাটাই মায়া।’

‘প্রপঞ্চ!’ ভাঙা জুড়ল মীনাঙ্গী।

‘তোরা কি অমনি লেফাফা কাপিয়েই চাকরি জুটিয়েছিস নাকি?’ কাকলির প্রশ্নে হঠাৎ বাঁজ এসে গেল।

‘আমরা তো সদর দিয়ে ঢুকেছি, কত কাঠখড় কুড়িয়ে-পুড়িয়ে, লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সাধনাকে অঙ্গীকার করে। আর আমাদের কী সব মাইনে।’ বললে চিত্রা, ‘কী বা গুণপনা। শকুন্তলাটাই যা আমাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েট। আর আমরা, বাকিরা, সংসারের ঠেলায় কবে থেকেই কলেজ-ছাড়া। তুই বিস্তার মগডালের পাকা ফল, শুধু স্বাদে সুন্দর নয়, রঙে-গন্ধেও সুন্দর। তুই আমাদের মত ঝুড়িতে করে চালান হবি কেন, তুই টুপ করে খসে পড়বি কোলের উপর—’

সকলে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

‘মোট কথা, তুই যখন ক্ষত সিঁদ্বির জন্তে ব্যস্ত, তখন তুই সদর দিয়ে ঢুকতে যাবি কেন,’ আরো ব্যস্ত হল মীনাক্ষী, ‘তুই ঢুকবি থিড়কি দিয়ে। তোর সেই ধারও আছে, জেল্লাও আছে।’

‘আর আমরা সব মসী আর ভুবি।’ সর্বহারার মত মুখ করল শকুন্তলা।

তবু, ওরা যাই বলুক, প্রথম প্রথম ওদের মানতে চায় নি কাকলি। শরীরেসাজে করে নি কোনো ঝাড়া-পোছা। কপালটা চুনকাম করলেও সিঁথিতে দিতে পারে নি পোঁচড়া। ছু পাশে চুল ঝুলিয়ে রাখলেও সিঁথির বস্ত্রিমাটা লক্ষণীয়।

‘সেন্টু আমার ঘরে ঘুমুচ্ছে। ওদিকে একটু নজর রাখবেন।’ মুণালিনীর ঘরের দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি : ‘আমি একটু বেরুচ্ছি।’

কখনো-সখনো যা বেরোয়, শান্তিডিকে বলে যায় কবে? শান্তিডির মনঃপূত হবে না বলেই বুঝি বলে না। আজ ঘটা করে জানাবার দরকার কী! শুয়ে থবরের কাগজ পড়ছিল, মুখের থেকে কাগজ সরিয়ে নিয়ে চশমা হু-ভাগ কাঁচের এক-ভাগের সঙ্গে চোখ মিলিয়ে তাকাল মুণালিনী। কিরকম যেন নতুন-নতুন লাগল কাকলিকে, ঝরঝরে সাজগোজ, হাতের ব্যাগটাও যেন নতুন।

‘কোথায় বেরুচ্ছ?’

‘চাকরির খোঁজে।’

‘বা ভালো কথা।’ শোয়া ছেড়ে উঠি-উঠি করে উঠল মুণালিনী।

‘মানে এই একটু আফিস-পাড়ায় ঘোরাঘুরি করতে।’ প্রথম কথাটা বোধ হয় একটু রাগ-রাগ শুনিয়েছিল, এবার একটু নরম করল কাকলি। বললে, ‘কিন্তু ঘোরাঘুরি করলেই কি আর জোটে?’ একটু বুঝি বা হাসল ঠোঁটের কোণে।

‘ঘোরাঘুরি করলেই জোটে।’ মুণালিনী জোর দিয়ে বললে, ‘শুয়ে বসে ঘুমিয়ে থাকলে জোটে না। তুমি যাও। আমি দেখব সেন্টুকে।’

সিঁড়ির দিকে কাকলি এগিয়ে যেতেই নিজের মনে বলে উঠল মুণালিনী : ‘অযোগ্য হলে বরং কথা ছিল। যে যোগ্য তার চেষ্টার অসাধ্য কী! জুটুক, না-জুটুক, তবু চেষ্টা করাটা, ঘোরাঘুরি করাটা ভালো। নইলে উচ্চশিক্ষিত মেয়ে দুপুরবেলায় পড়ে পড়ে ঘুমবে, নাক ডাকাবে, এ অসহ্য। শোনো।’ কাকলির উদ্দেশ্যে মুণালিনী নিচে কঠিন পাঠাল : ‘বিজয়াকে বলে যাও। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ও যেন সেন্টুকে নিয়ে যায় নামিয়ে।’

সংবাদটা বহন করবার দরকার নেই, শুনতে পেয়েছে বিজয়া।

তবু পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়াল কাকলি। ডাকল : ‘কাকিমা।’

কোনটা পড়ে বা না পড়ে মেথের বসে বই বাছছিল বিজয়া। বললে, ‘ভনেছি।
বেকুচ্ছ বুঝি? চাকরির খোঁজে?’ -

‘হ্যাঁ, খুঁজতে আর দোষ কী।’

‘না, দোষ কী! লোকে ভগবানও খোঁজে—’

‘আপনি সদরটা বন্ধ করে দিন। চাকররা কেউ নেই।’ সদর খুলে বাইরে
বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনার অপারেশন হয়েছে হাসপাতালে। এখনো ছাড়া পায় নি। বাড়িতে
থাকলে এখন এ নিয়ে দু-জনে একটু গুজগুজ করতে পারত, একটু বা গা-টেপাটেপি।
এখন অন্তরকম দল পাকানো হত। শাস্তি আর ছোট বউ এক দিকে, বিজয়া আর
বন্দনা আরেক দিকে। আহা, ভালো বউটা কত কষ্ট পেল থামোকা। কিছু দোষ
করে নি, শাদামাঠা ঠাণ্ডা বউটা, অথচ তার কত শাস্তি। মরেই যাবে ভয় পেয়েছিল,
কী আকুল কান্না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে! ব্যাধির চেয়েও বড় যন্ত্রণা, আর বুঝি চোখ
মেলবে না গৃথিবীতে। অপারেশনে ভালো হল, তারপরেও কত টানাহেঁচড়া।
উপসর্গগুলির উপশম হল, কথা বলতে না দিক, কিন্তু কত দিন ছেলেমেয়ে ছোটোকে
চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে দিল না। সে আবার আরেক কষ্ট। যে নিরীহ নম্র সে
কষ্ট পায়, আর যে উদ্ধত অহংকারী সে ট্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক করে ঘোরে।

শুধু তাই! আগে জানতাম, কেউ বেকুলে বউই দরজা দেয়; এখন বউ বেকুলে
শাস্তিডিকে উঠে দরজা দিতে হবে।

দিন কতক ঘুরল কাকলি। সমস্ত সংস্পর্শই কার্যকর, তাই স্নিপ পাঠিয়ে সুইং-
ভোর ঠেলে-ঠেলে আফিসের কর্ণধারদের সঙ্গে দেখা করল। যে দেখে, সত্যিই
বলেছে, প্রথমে মাথার দিকে দেখে, আর যেন একটা সাপের জিভ দেখেছে, এমনভাবে
মুখড়ে যায়। কেউ-কেউ বা একটু-আধটু আশার কথা বলে, ইশারা-হৃদিসের পথ
বাতলায়, কোন ডিপার্টমেন্টে কখন কী হতে পারে ফর্ম-টার্ম সই করিয়ে নেয়। কেউ-
কেউ বা নিশ্চিন্ত বসির হয়ে থাকে। আর কেউ-কেউ বা অনেক মিথ্যে
কথায় অভ্যস্ত, মন্থণ মধুর কণ্ঠস্বরে বলে, আরেক দিন আসবেন। দেখি কী
করতে পারি।

কেউ উচ্ছোখে উত্তপ্ত হয় না।

সেদিন টিফিন-টাইমে ক্যান্টিনে ধরল শকুন্তলাকে।

বললে, ‘কিছু সুবিধে হচ্ছে না ভাই।’

‘ঐ মেক-আপে হবে না। সিঁথিটা শাদা করতে হবে। মফস্বল শহরের লাল

হুয়কির রাস্তা নয়, একেবারে গাঁয়ের হালট।’ শকুন্তলা হাসল : ‘সব জানবি ঘরপোড়া গরু, সিঁচুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।’

কাকলি চিন্তিত মুখে প্লেট থেকে তুলে-তুলে বাদাম খেতে লাগল।

‘কেন, তোর স্বামী কি কনজারভেটিভ? বেশ তো, তাকে বলবি, সঙ্গে থেকে যখন তোমার রাজত্বের শুরু তখন ফের সতী সাজব—’

প্লেট থেকে একটা বাদাম তুলে শকুন্তলার দিকে ছুঁড়ে মারল কাকলি। বললে, ‘আমার স্বামী খুব উদার।’

‘তা হলে আর ভাবনা কী। শান্তাডী?’

‘না। ঐ আমরীও আমার দিকে।’

‘তবে তো কেলা ফতে!’ উল্লসিত হয়ে উঠল শকুন্তলা।

‘কেলার দেখা নেই তুই একেবারে নিশান নিয়ে দাঁড়ালি।’ কাকলি ক্রান্ত স্বরে বললে, ‘প্রতিমা একমেটে করা দূরের কথা কোথাও স্থল মাটি পেলাম না। বিশেষ কোনো একটা অফিসে বিশেষ কোনো একটা লোকের সন্ধান হল না আজো। তুই আমাকে দে না একটা লিষ্ট।’

‘দেব, দিচ্ছি।’ ব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম তুলে নিল শকুন্তলা : ‘কিন্তু তার আগে তোকে আরেকটা কথা বলি। দুপুরের দিকে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পান চিবিয়ে-চিবিয়ে খোঁজাখুঁজি করলে হবে না।’

‘ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে মানে?’

‘ঐ আর কিস—আলস্তের ঢেউ তুলে। খুব একটা ত্রস্ত-ব্যস্ত ভাব থাকা চাই। প্রাণ যায়-যায় ভাব। তুই যদি এখন অফিসারদের লাঞ্চ-টাইমে আসিস, তারা স্বভাবতই বুঝবে, তাড়া নেই। আর যেখানে তাড়া নেই, সেখানে সাড়া কোথায়?’

‘তুই তা হলে কী করতে বলিস?’

‘একেবারে ফার্স্ট-আওয়ারে আসবি। খুনচাপা পাগলের মত আসবি।’ কাগজের টুকরোয় নাম লিখতে লাগল শকুন্তলা।

ভয় পেলেও যুহু-যুহু হাসল কাকলি। ওরও হাতে ঘড়ি আছে, তাকাল তার দিকে। বললে, ‘ভরা অফিস-টাইমে আসতে বলিস?’

‘নিশ্চয়ই। পড়ি-মরি ভাব না করলে হবে না। এমন জরুরি যে ভরাকোটাল পার হয়ে এসেছি সীতরে। পরিপাটি পোশাকে ছিন্নছিন্ন থাকলে চলবে না। একটা ছন্নছাড়া ছন্নছাড়া ভাব রাখতে হবে। হস্তে হলেই মিলবে ঠিক মাংসের টুকরো।’

ফদাটা শকুন্তলা পৌছে দিল কাকলিকে : ‘তাখ চেষ্টা করে, হলেও হতে পারে। না হোক, অভিজ্ঞতা তো হবে।’

তবু ঠিক তুঙ্গ আফিস-টাইমে বেরতে পারে না কাকলি। পুরুষদের, অন্তত ভূপেন-হেমেনের হয়ে যাবার পরেই বাথরুম নেয়। খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে রাখতে পারে বটে, কিন্তু ভোর থেকেই শূণ্য সীমস্তে থাকাটা প্রশস্ত মনে হয় না। তাড়াছড়ো করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছি এমনি একটা ভাব আনা যায় না তা হলে। আধ ঘণ্টা পরেই না হয় বেরবে। আধ ঘণ্টায় ভরাকোটাল মরাকোটাল হয়ে যাবে না।

‘মা, আমি এখন থেকে একটু সকাল-সকাল বেরব।’ মৃণালিনীকে বললে কাকলি।

‘বেশ তো, ভালো কথা। রান্নাঘরে বসে তা হলে খেয়ে নাও।’ আদর ঢেলে কথা কইল মৃণালিনী। তারপর প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : ‘কিছু সবিধে-টুবিধে হল?’

একেবারে বিরক্ত বা হতাশের মত মুখ করল না কাকলি। বললে, ‘হবে হয়তো।’

‘হয়তো কেন, নিশ্চয়ই হবে। লেগে থেকে এতগুলি পাশ করতে পেরেছ, আর লেগে থেকে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারবে না?’ আশীর্বাদে ঝরে পড়ল মৃণালিনী।

ছন্নছাড়া চেহারা করতে হলেও অবহিত হয়ে অনেক ছন্দ-বন্ধ মানতে হয়। দ্রুত-বাস্ত দেখাতে হলেও দরকার অনেক মন্থরতার, সতর্কতার।

পরনে আটপোরে শাড়ি, গায়ে হাতে-কাচা সাধারণ ব্লাউজ, পায়ে রঙ-চটা স্নাঙেল, হাতে-গলায় গয়নার ছিটেফোটা নেই, সিঁথিটা একটা দীর্ঘ হাংকাবের মত শাদা, কাকলি বেকুবের মুখে দরজার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সামনে বাধার মত স্বকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

‘সরো।’ গম্ভীর স্বরে বললে কাকলি।

‘চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু সত্যি। অনাব্রাতার মত।’ লোলুপ শিশুর মত প্রায় ধরি-ধরি করে উঠল স্বকান্ত।

ক্ষিপ্ৰ পায়ে পিছু হটল কাকলি। বললে, ‘যেতে দাও।’

‘তারপর কিরে এসে যখন রঙ চড়াবে, তখন চলে যাবে এই শুচিতা। রক্তিম হওয়াই বুদ্ধি কলুষিত হওয়া।’ স্বকান্ত চোরের মত হাত বাড়াল।

‘আমি এখন কাজে বেরুচ্ছি।’ প্রায় একটা বেত তুলল কাকলি : ‘এগারোটায় সময় আমার আজ এক জায়গায় দেখা করবার কথা।’

সংবৃত্ত হল স্বকাস্ত। টেবিলের কাছে সরে গিয়ে বললে, ‘দাঁড়াও। তোমাকে কটা টাকা দিই।’

‘কী বললে?’ যেন শুনতে পায় নি, উদ্ভত পদক্ষেপ স্থগিত করল কাকলি।

‘কটা টাকা—’

‘খবরদার।’ কাকলি স্পষ্ট ধমকে উঠল : ‘ও কথা মুখেও এনো না।’

‘বেশ, মুখে নাই আনলাম। হাতখানি বাড়িয়ে দাও, গুঁজে দিই।’

‘তোমার টাকা আমি ছুঁই না।’

‘নাই বা ছুঁলে। ব্যাগটা দাও, ফেলে দিই ভিতরে।’ সহানুভূতির স্বরে স্বকাস্ত বললে, ‘কতদিন ধরে ইঁটাইটি করছ, কত না জানি খরচ হচ্ছে রোজরোজ। জানিও না, জানতে দিচ্ছও না। নিশ্চয়ই তোমার টাকার টানাটানি হচ্ছে। হওয়াই সম্ভব। বাইরে ঘোরাঘুরি করলে খিদে পায়, এক-আধটু টিফিনই বা খাচ্ছ কিনা তা কে জানে! এই যে এগারোটায় দেখা করবার কথা, একটা ট্যান্ডি করে যেতে পারলে কত ভালো হয়। দৈবক্রমে যদি পাও-ও, তবু হয়তো, কে জানে, নেবার মত তোমার সংগতি নেই। না, রাগ কোরো না, নাও, নাও কটা টাকা—’

‘কত?’ মাথা তুলে তবু একবার জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘সামান্যই। সম্প্রতি হুড়িটা টাকা দিচ্ছি। তোমার অল্পকুসিত হাত খরচ—’ বলে স্বকাস্ত এক-মুহূর্ত অসতর্ক কাকলির শিথিল হাতের মধ্যে দুখানি নোট গুঁজে দিল।

‘তুমি এর চেয়ে বেশি আর কী দেবে।’ কাকলি নোট দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝের উপর : ‘তোমার আর মুরোদ কত? শত হলেও তুমি তো একটা ছাত্র বৈ কিছু নও। যে টাকাটা পাচ্ছ সেটা কোনো স্থায়ী চাকরির বেতন নয়, ছাত্র হিসেবে একটা সাময়িক বৃত্তি। তাই তোমাকে স্পর্ধা না দেখালেও চলবে। কিছুকাল অপেক্ষা করো আমি এর চেয়ে ঢের বেশি আনতে পারব আশা করি। তখন হাত পেতো, দিয়ে দেব দশ-বিশ।’ ঘরের দরজা কখন আলগা হয়ে গিয়েছিল, তরতর করে চলে গেল কাকলি।

এমনিই তো চেয়েছিল স্বকাস্ত। উপযুক্ত স্ত্রী রোজগার করবে আর তাকে দেবে-ধোবে, সম্বন্ধ করবে। কিন্তু এ যেন সেই চাওয়ার চেহারা নয়। কেমন যেন খালি-খালি লাগল ঘরদোর!

না, তবু যে করে হোক, ও নিজের পায়ে দাঁড়াক। শিক্ষিত হবার মান রাখুক। স্বতন্ত্র হবার স্থান খুঁজে পাক জীবনে।

স্বকাস্তর সঙ্গে চটাচটি কিছু হয় নি বোঝাবার জন্তে প্রশ্নর স্বরে সেন্টুকে কাছে ডাকল কাকলি। বললে, ‘আমি এখন কাজে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হবে। তুমি আজ তোমার বিজুর কাছে ঘুমিয়ে।’

‘আমি আজ আর ঘুমব না।’ ভারিকি গলায় সেন্টু বললে।

‘কেন?’

‘বা, জানো না বুঝি? হাসপাতাল থেকে আজ আমার মা আসবে। বাবা আফিস ছুটি হবার আগেই নিয়ে আসবে মাকে। কী মজা!’ সেন্টু নাচতে লাগল।

‘কী মজা!’ নাচুনে পায়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বন্দনা বাড়ি ফিরলেও বিছানায় শোয়া। আর তার তদারকি করতে বিজয়া উঠে এসেছে উপরে। এতদিন গুমোট হয়ে ছিল, এবার কথার চালাচালিতে হাওয়া খেলবে।

‘বাবুদের সঙ্গেই বসেছেন শ্রীমতী।’ বন্দনার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললে বিজয়া।

‘বসেছেন—কী করতে?’

‘থেতে। ভাত থেতে।’

‘এক লাইনে?’

‘না। বাবুরা তাদের খাবার জায়গায়, আর উনি রান্নাঘরে।’

‘আফিসের ভাত খাচ্ছে কেন? চাকরি পেয়েছে?’ পেটের যন্ত্রণা গেছে, বুকের যন্ত্রণা নিয়ে জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

‘না গো।’ হেসে কুটপাট বিজয়া : ‘একটা চাকরির ইনটারভিউর চিঠি এসেছে। আজ বেলা সাড়ে দশটায় দেখা করতে হবে। ইনটারভিউর চিঠিতেই এই—কর্জী নিজের হাতে মাছ ভেজে খাওয়াচ্ছেন—সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে না জানি কী করবেন!’

‘সত্যিকার চাকরির চিঠি এলে ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।’ এখন আর হাসতে-কাশতে বারণ নেই, হাসল-কাশল বন্দনা।

‘যা বলেছ। ব্যাঙ ভেজে খাওয়াবেন।’ সায় দিল বিজয়া।

‘এবং খাওয়াবেন ছেলেকে।’

এবার দু-জনের সম্মিলিত হাসি।

কিন্তু সেদিন আকিস-টাইমে প্রত্যক্ষ সংসারে সকলের সামনেই স্বকাস্তে-কাকলিতে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল।

‘না, ককখনো না।’ গলা তুলে স্পষ্ট বললে কাকলি, ‘আমি কিছুতেই নেব না এ চাকরি।’

‘নেবে না—এ তোমার ক্ষুদ্র মনের প্রেজুডিস।’ বললে স্বকাস্ত, ‘হীনতম অস্ত্রায়।’

‘তুমি যেটা বলবে সেইটেই ঠিক হবে? আর আমি যেটা অতুভব করব সেটা ঠিক হবে না?’ কাকলির চোখে আগুন জ্বলল।

‘অতুভব!’ ব্যঙ্গ করে উঠল স্বকাস্ত।

‘হ্যাঁ, এখানে আমার অতুভবই প্রধান হবে। তোমার বিচার নয়।’ কাকলিও ব্যঙ্গ করতে জানে আর সে ব্যঙ্গের ধারও কম নয়: ‘আর তোমার বিচার তো শুধু টাকার বিচার। তোমার কাছে যে কোনো দামেই হোক, টাকাই শেষ কথা।’

‘কার কাছে নয়? কিন্তু তাই বলে একজনকে তুমি অকারণে মন্দ বলতে পারো না।’

‘চরম ভালো-মন্দ কে বিচার করে? কিন্তু আমার পছন্দ নয় এইটেই আসল কথা। আর যাই হোক, মন্দ-মন্দ গন্ধ লোকটাতে।’

‘আর তুমি একেবারে স্বর্গের কুসুম।’

‘নিশ্চয়ই, এক শো বার। সে কুসুমে তুমি একটা কীট ঢুকেছ, আর কীট আমদানি কোরো না।’

ব্যাপার কী, মৃণালিনী চাইল মাথা গলাতে।

একটা চাকরি পেয়েছে কাকলি, কেরানির চাকরি। দেড় শো টাকা মাইনে, সব মিলিয়ে প্রায় দু শোর কাছাকাছি। কিন্তু কাকলি বলছে সে চাকরি নেবে না, যেহেতু তার মতে চাকরি যে দিচ্ছে, যার অধীনে ও কাজ করবে, মানে যে বস, তার চাউনিটা ভালো নয়।

‘চাউনিটা ভালো নয়!’ চাউনি প্রায় কপালে তুলল মৃণালিনী: ‘সে আবার কী কথা?’

‘যার মনের মধ্যে পাপ সেই চাউনি খারাপ দেখে।’ স্বকাস্ত বললে।

‘যার মনের মধ্যে শুধু টাকা সে সমস্ত পাপকেও বুঝি প্রভ্রম দেয়।’ পালটা বললে কাকলি।

‘চাউনি খারাপ, কিন্তু লোকটা করেছে কী!’ মৃণালিনীর চাউনি তখনো প্রকৃতিস্থ হয় নি।

‘কিছু করে নি।’ বললে স্বকাস্ত, ‘শুধু বলেছে, দুপুরবেলা আমার সঙ্গে থাকেন চলুন হোটেল। আর আফিসের পর যখন বাড়ি ফিরবেন, আমার গাড়িতে আসবেন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেব—’

‘আহা, এতে আবার অজ্ঞায় কী!’ নাবালিকা খুকির সারল্যে উথলে উঠল মৃণালিনী।

‘তা তুমি একবার খেয়ে দেখ, চড়ে দেখ, আর কতদূর যায়, কী করে। তা নয়, শুধু শুধু একটা ভক্তিতে একটা চাউনিতে, একটা শুধু মৌখিক নিমন্ত্রণেই তুমি থড়গ তুলবে?’

‘তুলব।’ কাকলি দৃঢ় স্বরে বললে, ‘যেখানে আমি সম্মান পাব না, স্বাচ্ছন্দ্য পাব না, প্রতি পদে নিজেকে আমার অপদস্থ বলে বোধ হবে, সে চাকরি আমি করব না, করতে পারব না কিছুতেই।’

‘যে নাচতে নেমেছে তার আর ঘোমটা দেওয়া কেন?’ স্বকাস্ত গর্জে উঠল।

‘ঘোমটাই সে ফেলতে পারে, কিন্তু তার বেশি আর কোনো আবরণ নয়।’ কাকলি দৃঢ়তর হল : ‘তা ছাড়া এ আমার ব্যাপার, আমার চাকরি। আমার খুশি হত নিতাম, খুশি হয় নি নেব না। এর উপরে আর কথা কী!’

‘না, আছে কথা—’ কী বলতে যাচ্ছিল মৃণালিনী, ওপার থেকে ভূপেন তাকে ডাকতে লাগল চৈতন্যে : ‘ওগো শুনছ, কোথায় তুমি, কোথায় গেলে?’

মৃণালিনী ছুটে এল। ‘কী, তোমার আবার কী হল?’

‘কিছু হয় নি। আমি বলছি কী, ওরা স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করছে, তুমি তার মধ্যে নাক ঢোকাচ্ছ কেন? ওরা ঝগড়া করছে ওরাই আবার মিটিয়ে নেবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি ঢুকলেই গোলমাল, আরো গোলমাল—শোনো—’

শোনবার পাঞ্জী নয় মৃণালিনী। ‘তাই স্বামীর উপদেশে কর্ণপাত না করে আবার গেল অকুস্থলে। কাকলির উপরে সব কটা দাঁতে মুখিয়ে উঠল : ‘তুমি স্বহস্ত আর কত ক্ষতি করবে শুনি?’

‘ক্ষতি!’ কাকলি ধমকে দাঁড়াল।

‘তোমার বাবা বিয়ের যৌতুক বাবদ দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল স্বহৃদে, তুমি তা কায়দা করে ফিরিয়ে দিলে বাবাকে, স্বামীকে বঞ্চিত করলে। এখন আবার এই দেড় শো দু শো টাকার চাকরিটা ফিরিয়ে দিচ্ছ! যাতে স্বহস্ত একটু স্বরাহা হয়, অবিধে হয়—তুমি চাও না কিছুতেই। এ তুমি কেমনধারা স্ত্রী জিজ্ঞেস করি?’

প্রথমটা স্তম্ভিতের মত হয়ে গেল কাকলি। সেই দশ হাজার টাকার গল্পটা এখানেও ফলাও করে বলা হয়েছে! টাকা জুড়েছে নিজের ইচ্ছেমত। ছোটলোক কোথাকার!

‘হ্যাঁ দেব, সব কিরিয়ে দেব। কিছু রাখব না। শোধ করে দেব সমস্ত।’
টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা হুড়িয়ে নিয়ে ক্ষত, দীপ্ত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

২৮

কাগজের টুকরোতে প্রথমে নাম লিখল : কাকলি মিত্র। পরে ভাবল, চিনতে তো পারবেই, তবে আর ছলনা কেন? মিত্র কেটে বস্তু করল। না, ছলনা কোথায়? কুমারী নামে চাকরি করতে নেমেছে এ তো ঘরে-বাইরে সকলের জানা। এ পর্যন্ত যত দরখাস্ত ছেড়েছে সব ঐ কুমারী নামে। যে চাকরিটা পেয়েও ছেড়ে দিয়ে এসেছে তাদের খাতায়ও ঐ নাম। এখান থেকেও যদি কিছু স্তবধি নিতে হয় মিত্র হয়েছে নিতে হবে। তাই আবার বস্তু কেটে মিত্র করল।

কিরকম কাটাকুটি হয়ে গেল কাজগটা। নতুন আরেকটা স্লিপ নিয়ে পরিস্কার অক্ষরে লিখল : কাকলি মিত্র।

পরিচ্ছন্ন দেখানোটা ই সুন্দর, সুস্থ।

দারোয়ান দিয়ে স্লিপ পাঠাল ভিতরে।

স্লিপ দেখে বরেন প্রথমটা স্তব্ধ হয়ে গেল। মহিলা-মহিলা শোনাচ্ছে। তবে, যেমন অদৃষ্ট, ঘরে ঢোকালে হয়তো দেখবে মধ্যপদলোপী পুরুষ—নাম আসলে কাকলিকুজন বা কাকলিভূষণ মিত্র। ডাঁট দেখাবার জন্তু নামে ছাঁটকাট করে এসেছে।

তবু একবার অতুলে জিজ্ঞেস করলে দারোয়ানকে, ‘কে!’

‘একজন ভদ্রমহিলা।’

নিজের মনে নিজেই অবাক হল বরেন। এ আবার কে কবে শুনেছে।

শুনতেই বা দোষ কী! বরেন কি কোনো অর্থেই আরাধনীয় নয়, তার কি বয়স নেই বা সামর্থ্য নেই? সে কি কুরূপ বা বিকলাঙ্গ? তার কি নির্ধনের অবস্থা। না কি নিশ্চিন্তাপের? না কি সে কাক উপকারেই আসতে পারে না?

না, তবু, অহংকার করা ভালো নয়। ধীর-স্থির থাকা ভালো। নম্র হয়ে প্রতীক্ষা করে থাকা ভালো।

উদ্বেগে-উদ্বেগে থেকে না। যা আপনা থেকে আসে আসতে দাও !

দারোয়ানকে বললে, ‘ভাকো।’

তরল-টলটল চোখে হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ঘরে ঢুকল কাকলি। কোনো কথা না বলে ছুটি স্থধীর হাতে নমস্কার করলে।

কী আশ্চর্য ! আমি কি নাম-ধাম গোত্র-পদবী মুখস্থ করে রেখেছি ? আমি ভাবলাম, কে না কে। কোথাকার কে অজানা-অচেনা !

‘কী আশ্চর্য ! আপনি ?’ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল বরেন : ‘আপনি কোথেকে ?’

বলেই বুঝল এ একেবারে অবাস্তব প্রশ্ন। কিছুটা উৎসাহ টের পাওয়া যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। যেখান থেকেই আসুক, কিছু আসে যায় না। এসেছে যে, এটাই বড় কথা। একমাত্র কথা।

নিজেকে সহসা গুটিয়ে নিল বরেন। বললে, ‘বসুন।’

কাকলি বসল।

বরেন দাঁড়িয়েই থাকল। বললে, ‘আপনার নামটা আমার মনে ছিল না—’

‘বিচ্ছিন্ন নাম। মনে থাকবার কথা নয়। কাক দিয়ে আরম্ভ—’

কিন্তু কলি দিয়ে শেষ—কথাটা পিঠ-পিঠ তখুনি মনে এল না বরেনের। পরে এল—তখন অল্পতাপের একশেষ। এই প্রথম নয়, আরো অনেকবার হয়েছে। লাগসই কথা ছিল, জানা ছিল, কিন্তু তর্কের তপ্ত মুহূর্তে মনে পড়ে নি, তাই পারে নি বলতে। স্বেয়োগ ফসকে গিয়েছে।

কিন্তু কথাই সব নয়। স্তব্ধতাও কিছু।

দাঁড়িয়ে থেকেই দরজার দিকে গলা বাড়াল বরেন। বললে, ‘সঙ্গে আর কেউ আছে ? না, একা ?’

এ আবার কী প্রশ্ন ! একা না দোকা দেখতেই তো পাছ চোখের উপর। যা এখনো দেখা যাচ্ছে না বা যা নেপথ্যে আছে, তার জন্তে চাঞ্চল্য কেন ?

‘একা।’ গম্ভীর হয়ে কাকলি বললে।

সত্যি, কি রকম অদ্ভুত তাকে দেখাচ্ছে ! বা হাতে সেই ঘড়িটা ছাড়া আর কোনো তার অলংকরণ নেই। কপাল তো নুগুই, সিঁথিটাও শাদা। রক্তিম আভঙ্কর ক্ষীণ একটু আভাসও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন, যতদূর বরেন মনে করতে

পারছে, মাথায় গোল খোঁপা ছিল, আর আজ পিঠে লম্বা বেণী। সেদিনের তুলনায় আজকের শাড়িটা অনেক বেশি এলোমেলো। চলাবলা অনেক বেশি স্বাধীন।

কী ব্যাপার? বুক ঠেলে প্রশ্ন এল বরেনের: ‘স্বকান্ত কেমন আছে?’

আহা, কী প্রশ্ন জুড়ানো প্রশ্ন! স্বকান্ত তোমার কত বড় বন্ধু, তার মজল সংবাদ না পেলে তোমার ঘুম আসে না, কচি হয় না আহারে।’ সে বেঁচে থাকলে তোমার কত লাভ, মরে গেলে তোমারই যত ক্ষতি! এখন উত্তরটা শোনো কান পেতে। উনি ভালো আছেন। আমরা দু-জনই খুব ভালো আছি। শোনো।

‘জানি না।’ চোখ নামাল কাকলি।

হ্যাঁ, তেমন কিছু শোকাবহ নয়। শোকাবহ হলে প্রথমে ঢুকেই হাসত না। রসিকতা কল্পবার ভাব করত না। দেখাবার জন্তে হলেও চোখে জল আনত। আপনি তার কত বড় বন্ধু ছিলেন—এমনিধারা বলত দুচারটে শব্দস্বত্বির কথা।

‘তবে?’ কৌতূহলের তবু কি শেষ আছে বরেনের?

‘আমি কুমারী সেজেছি।’ অগাধ শান্তিতে কাকলি হাসল।

বাস, আর প্রশ্ন কারো না। নিজেই শাসন করল বরেন, কেন কুমারী সেজেচে চেয়ে না জানতে। শুধু দেখে। দেখে যাও।

আমি অসম্পূর্ণ হয়ে গেছি। ছিঁড়ে, ছুঁড়ে কেলে দিয়েছি অতীতকে। দুর্বহকে। তার মানেই স্বকান্তকে।

এ তো আশার কথা। তৃপ্তির কথা।

এতে তোমার আবার আশা কী! তৃপ্তি কিসের!

পৃথিবীর সমস্ত কুমারীই আমার আশা—বরেন মনকে প্রবোধ দিল। কথাটা অল্প দিক থেকেও মোলায়েম। কুমারী হয়েছি মানেই স্বকান্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে, বিচ্ছেদ না হুলেও সংঘর্ষ হয়েছে। অর্থাৎ গোড়ায় যে মূল্য স্বকান্তকে দিয়েছিল সে মূল্য থেকে সে নেমে এসেছে। তার মানেই স্বকান্ত খেলো হয়ে গিয়েছে, চড় খেয়েছে গালের উপর। মনের কথা বাইরের লোক আর কী করে জানবে, কিন্তু এক স্পর্ধিত বন্ধুর, প্রতিযোগী বন্ধুর হার হয়েছে জীবনে এ নিশ্চয়ই একটা উপভোগের জিনিস। তৃপ্তি তো শুধু লুকোনে ভিত্তে মনের বিষকে মধুর মত চটে-চটে খাওয়া।

তবু চোখে-কানে কৌতূহল জাগিয়ে রাখে বরেন। কুমারী সেজেছে মানে স্বামীর বিচ্ছেদে বিবাহচ্ছেদের মামলা রুজু করেছে? না কি আপোসে ছাড়াছাড়ি? একত্র বসবাস নেই আর তা হলে? এখন তা হলে কোথায় আছে? ঠিকানা?

পাগল! যে সত্য যে ভদ্র সে উত্তেজিত হয় না। সে তো শিল্পীও। মনের

ভাব সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে মুখে অজ্ঞান প্রশান্তি আনে। বিষয়ের বাইরে যায় না, সর্বাবস্থায় সায় দেয়, সহানুভূতি জানায়। যে মার খেয়েছে তাকেও, যে মেরেছে তাকেও। হস্তক্ষেপ করা দূরের কথা, প্রতিবাদও করে না। বরং সাহায্য করে। চোরকেও করে, গৃহস্থকেও করে। এখন চোরে-গৃহস্থে বোঝা গে। আমাকে কেউ দোষী করতে পারবে না।

তবু আরো কিছু শুনবে, নিজেরই অগোচরে ভক্তিটা ঈষৎ উৎসুক করে রইল বরেন।

কাকলি নিজেই বললে। অস্বস্তির মেঘটা উড়িয়ে দিলে : ‘কুমারী সেজেছি মানে চাকরি করতে বেরিয়েছি—’

‘বাঃ, ভালো কথা। কোথায় চাকরি করছেন?’

‘চাকরি পাই নি এখনো।’ চোখ-মুখ লজ্জিত করল কাকলি : ‘খুঁজতে বেরিয়েছি।’

‘বাঃ, ভালো কথা।’ টেবিলের উপর সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল বরেন। সমস্ত লুরু কোঁতুলের মত প্রসারিত হাতও সংযত করল।

‘মাই হোক, নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা সব সময়েই ভালো।’

‘এক শো বার। আনন্দের তো বটেই, সম্মানের। তার উপর আপনি যখন রুতী—’

‘রুতী!’ কাকলি লজ্জার ভাব করল আবার।

‘যে রুতী তার মুক্তি নেই। সংসার তাকে ছুটি দেবে না, খাটিয়ে মারবে। বললে, নইলে তোমাকে রুতী করলুম কেন?’ আবার সিগারেটের দিকে হাত বাড়াল, আবার হাত গুটোল বরেন : ‘তাই আফিসে-আদালতেও দেখি বেশির ভাগ কেরানিই ফাঁকি দেয়, পালায়, কিন্তু দু-একজন রুতী লোক থেকে যায় কোণে-কানাচে। নাকের ডগায় চশমা রেখে ভুরু পাকিয়ে যারা কাজ করে। যেহেতু তুমি রুতী হয়েছ সমস্ত বাড়তি কাজ তুমি একা সারো, আর সকলের গাফিলতির জরিমানা দাও।’ বরেন হেসে উঠল।

তাতে কাকলিরও শব্দ করে হেসে গুঁঠবার স্ববিধে হল। বললে, ‘চাকরির বাজারে বেরিয়ে দেখলাম কুমারীর সাজসজ্জাটাই ভালো কাটে।’

‘তাই বুঝি?’ যেন কিছুই জানে না এমনি আনাড়ি-আনাড়ি মুখ করল বরেন।

‘কেন, আপনারও তাই মনে হয় না?’

‘না, না, নিশ্চয়। কুমারী অনেক ক্লীন, অনেক আশাশ্রম। দেখছেন না

কুমারীকেই লোকে পূজা করে, সধবা-বিধবাকে করে না।’ এবার হো-হো করে হাসতে পারল বরেন : ‘যতদিন কুমারী আছেন ততদিনই ভবিষ্যৎ আছে, প্রমোশন আছে।’

‘বলেন কী ! যারা ওল্ড মেড, বুড়ো বয়স পর্যন্তও যাদের বিয়ে হয় নি তাদেরও ভবিষ্যৎ আছে ?’

‘তারা আর কুমারী কোথায় ! তারা মহামারী।’

দু-জন এবার যুক্ত হয়ে হাসতে পারল।

কিন্তু হাসির মধ্যেই চট করে বরেনের মনে পড়ে গেল, খুব হাসির ব্যাপার হয়তো নয়। আসলে এই কুমারীর সাজগোজটা ইচ্ছাকৃত ছদ্মবেশ। স্বকান্তরই কারসাজি। তাই এটা পণ্ডের ইশারা নয়, ভণ্ডের নমুনা। স্বার্থসিদ্ধির জন্তে কোনো-কোনো স্বামী স্ত্রীকে বিধবা সাজায়, স্বকান্ত কুমারী সাজিয়েছে।

আহা সাজুক। সাজতে দাও। ভেব যে ধরেছে তার গায়ে ভস্ম একটু লাগবেই। আর তুমি বরেন, তুমি ছাইভস্ম ছাড়া আর কী। স্বতরাং ধৈর্য হারাবার কিছু নেই। শোনো। দেখ। কথার পিঠে মেনেজুকে কথা বোলো।

আর যে সাহায্য চায়, যদি চায়, সাহায্য করো।

‘কুমারী সেজে ঘুরে কোথাও পারলেন সুরাহা করতে ?’ বরেন জিজ্ঞেস করল।

‘এক জায়গায় পেরেছিলাম। দুনীচাঁদ-গুলজারিলাল ফার্মে পেয়েছিলাম চাকরি বেশ ভালো চাকরি। স্টার্টিং দেড় শো—’

‘করলেন না ?’

‘না, ম্যানেজারটা স্থূল, অভদ্র। চাউনিটা ভালো নয়, কেমন মাংস-মাংস গন্ধ—’

কে ম্যানেজার, কী করেছে, কী বলেছে, কিছুই জানতে চাইল না বরেন। চূপ করে রইল। জানে চূপ করে থাকলে বাকি কথাটুকু কাকলিই বলবে নিজের থেকে। উত্তরটা সম্পূর্ণ না হলে কখনো-কখনো সেটা শ্রোতার চেয়ে বক্তাকেই বেশি বিরক্ত করে।

‘জয়েন করার দিনই বলে কিনা চলুন আমার সঙ্গে লাঞ্চে’, কোথায় একটা ভয়ের ভাব করবে মুখে-চোখে, না মুচকে হাসছে কাকলি : ‘আর বলে কিনা, ছুটির পর ট্রাম-বাসের দিকে যাবেন না, আমি তো ওদিকেই থাকি, আমার গাড়িতেই আপনাকে পৌঁছে দিতে পারব।’ হঠাৎ মুখ-চোখ গভীর করল : ‘দেখুন দেখি কী কদাকার !’

‘ক্যাড। ভালগার।’ মুখে তাই বললে বরেন কিন্তু অন্তরে বললে, শিল্পী। কিন্তু তুই যে ওকে খেতে ডাকছিস ওর খিদে পেয়েছে কিনা খবর না করেই। আগে ওর একটা খিদে-খিদে ভাব করে তোল, তারপরে খেতে ডাকুক। আগে থেকেই তুই ওকে

লিফ্ট দিতে চাচ্ছিল কোন সাহসে? গাড়ি কি তোর একারই আছে, না তোর গাড়িই শুধু ওদিকে যায়? তুই গায়ে পড়ে বলতে যাস কেন? ওকে দিয়ে বলা, স্থার, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্ট দেবেন, আপনি তো ওদিকেই যাচ্ছেন। যাতে বলে, তেমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি কর। যদি তাও না পারিস, ধৈর্য ধরে বসে থাক। কখন একটা মিছিল বের হয় ও অঞ্চলে। শুরু হয় হামলা-হামলি। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়।

‘বলুন ঠিক করি নি?’ চোখ তুলল কাকলি।

‘এক শো বার ঠিক।’

‘তাই, এখন, আপনার কাছে এসেছি—’ আঙুল দিয়ে টেবিলের প্রান্তে রেখা টানতে লাগল কাকলি।

হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ—আপনার জন্তে কী করতে পারি, এরকম জোলা বিরস প্রশ্ন করতে মন চাইল না। সিগারেটের জন্তে আবার হাত বাড়াল, আবার নিরস্ত করল হাত। শাদামাঠা গন্তের গলাতেই বয়েন বললে, ‘বলুন, কী করব?’

‘আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন।’

‘এখানে?’ এটা বয়েনের কী স্বর, আনন্দের না বিশ্বয়ের, অবিশ্বাসের না অসম্ভবের, যেন নিজেই সে বুঝতে পারল না।

আবার গা বুকি ছমছম করে উঠল কাকলির। পাশ কাটাবার জন্তে বললে, ‘আপনাদের এখানে লেডি-এমপ্লয়ির কি স্কোপ আছে? এখানে নাই বা হল। অগ্নি কোনো সম্ভ্রান্ত আফিসে। আপনি আছেন, আপনার বাবা আছেন—আপনারা চেষ্টা করলে—’

‘আর আমার মেসোমশাইও আছেন। তাঁকে জানেন না বোধ হয়। তিনি বাটারওয়ার্থের ম্যানেজার।’

‘বিদেশী ফার্ম হলে তো আরো ভালো। যোগ্য মাইনে যা দেয় তাই নেব, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু পরিবেশটা ভালো হওয়া দরকার।’ ভালো কাকে বলে চোখের নির্মল আলোতে তাই বোঝাতে চাইল কাকলি।

‘নিশ্চয়।’ সায় দিতে এতটুকু দেরি হল না বয়েনের।

‘কটা সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে।’ ব্যাগের মধ্যে হাত ঢোকাল কাকলি : ‘গুটি কয় প্রোফেসরের দেওয়া আর এম-এর ডিপ্লোমাটা—’

‘লাগবে না কিছু। আপনি যে চাকরি চাচ্ছেন এইটেই যথেষ্ট সার্টিফিকেট।’ সিগারেটের দিকে হাত বাড়াই-বাড়াই করেও বাড়াল না বয়েন। বললে, ‘বলব মেসোমশাইকে। বাটারওয়ার্থ মন্ত আফিস।’

চোখের কালো ফোঁটা দুটো জলজল করে উঠল কাকলির। বললে, ‘একটা দরখাস্ত রেখে যাব?’

‘কোনো দরকার নেই।’

‘তা হলে ফলাফল জানব কী করে?’

‘এর আবার ফলাফল কী! চাকরি চেয়েছেন, পাবেন। আপনার বাড়িতে চিঠি যাবে।’

‘না, না, চিঠি নয়, বাড়িতে নয়।’ আপত্তিতে প্রথর হয়ে উঠল কাকলি : ‘আমি এখান থেকে আপনার কাছ থেকে খবর নেব। বলুন কবে আসব, কত দিন পরে—’

অনেক নিশ্চিন্ত হল বয়েন। স্বকাস্তের ভাবনাটা অনবরতই বিঁধছিল পাজরে, এখন অনেক খোলসা হল। তোর বউকে তো আমি এখানে, আমার আফিসেই চাকরি দিচ্ছি না যে তোকে জানাতে হবে। বা, কী ব্যাপার, কেন চাকরি করতে আসে, তোর সতি মত আছে কিনা জানতে হবে তোর থেকে। আমার কী মাথাবাথা! আমার কাছে চাকরির ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছে আমি সম্ভাবে একটা রেফারেন্স দিয়ে দিয়েছি। যদি সেখানে না হয়, আরো না হয় দেব অন্তর। যদি কোনোখানে হয়, হয়ে যায়, তবে যারা চাকরি দেবে তারা, আর যে চাকরি করবে সে, মানে তোর বউ, এ দু পক্ষ বুঝবে। এর মধ্যে আমি কোথাও আসি না, আমার কিছু জানবারও নেই, জানাবারও নেই। আমি শুধু একটা পোস্টাফিস। যদি আমার এখানে চাকরি দিতাম, তোকে না জানিয়ে, তা হলে বলতে পারতিস বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তা যখন নয় তখন আর কথা নেই।

তা ছাড়া ভাবনারও কিছু নেই হয়তো। বাড়ির ঠিকানায় চিঠি দিতে যখন বারণ করছে তখন স্বকাস্তের সঙ্গে নিশ্চয়ই ঘোর অবনিবনা হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তার আমি কী করব! আমি কেন মোচাকে টিল ছুঁড়ি? কাকলি যদি নিজের থেকেই আসে আমি তাকে কী করে আটকাই? যে আটকাবার সে কী করছে?

তবু আরো একটু গভীরে পরীক্ষা করতে চাইল বয়েন। দেখতে চাইল অবনিবনাটা কত দূর গিয়েছে। পরীক্ষার মুখে দিবা এক ভাঁওতা মারলে। বললে, ‘বাটারওয়ার্থ শুনেছি তার লেডি-এমপ্লয়িদের জন্তে থাকবার বাড়ি তুলছে—এখানে লেডি-এমপ্লয়ি মানে যারা আনম্যারেড, অবিবাহিত। প্রত্যেকের জন্তে একটা করে কামরা। আপনি যখন কুমারী সেজেছেন তখন আপনাকে ঐ একঘরী কোয়ার্টারে থাকতে বাধ্য করতে পারে—’

‘বা, এর আবার বাখাতা কী ! সানস্কেয়াব সেই কোয়ার্টারে ।’ কাকলি চঞ্চল হয়ে উঠল : ‘কবে শুক হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ?’

‘আগে চাকরিটা হোক ।’

‘ঠিকই তো ।’ হেসে উঠল কাকলি : ‘আমি ভেবেছিলাম চাকরিটা হয়ে গিয়েছে বুঝি ।’ উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে : ‘কবে আসব খবর নিতে ?’

‘তিন চার দিন বাদ দিয়ে যেদিন আপনার খুশি ।’ সিগারেটের জন্তে অনেক দূর পর্যন্ত হাত বাড়াল বরেন !

‘আচ্ছা আসি আজ । নমস্কার ।’

‘কটা বেজেছে আপনার ঘড়িতে ?’ নিজের হাতেও ঘড়ি আছে তবু বরেন জিজ্ঞেস করে বসল ।

‘আমার ঘড়িতে ?’ স্মরণ করে হেসে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল কাকলি । বললে, ‘ছুটো ফুড়ি ।’ একটু থেমে অপাঙ্গে লম্বী-কটাক্ষ ফুটিয়ে বললে, ‘চিনতে পারছেন একে ?’

শুধু যেন ঘড়ি নয়, ঘড়ির অতিরিক্ত আর কোনো ইতিহাসের ইঙ্গিত ।

‘কী করে চিনব ? ঘড়ির ব্যাণ্ডটা কই ?’

‘ব্যাণ্ডটা, ল্যাজটা খসে গিয়েছে ।’

‘খসে গিয়েছে ?’

‘হ্যাঁ । ঘড়িও কুমারী সেজেছে ।’

বেরিয়ে গেল কাকলি । আর বরেন হাত বাড়িয়ে মূঠোর মধ্যে ধরল সিগারেটের টিন ।

দীপঙ্কর, খাতা-পত্র হাতে, উঠছে সিঁড়ি দিয়ে আর নামছে কাকলি । মাঝপথে দেখা । এ কী অভাবনীয়, দীপঙ্কর প্রায় উল্লেল হয়ে উঠল : ‘এ কী আশ্চর্য, আপনি এখানে ?’

স্মরণ গোপন করল কাকলি । বললে, ‘এই বরেনবাবুর কাছে এসেছিলাম একটা কাজে ।’

‘তা তো দেখছিই । কিন্তু কাজ, আপনার কী কাজ—’

‘আমার আবার কী কাজ ! আপনার বন্ধু স্বকান্তর কাজ ।’ আরো কয়েকটা সিঁড়ি জুত নেমে গেল কাকলি ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নামতে নামতে দীপঙ্কর বললে, ‘কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার যে একটা জরুরি কাজ ছিল ।’

সিঁড়ির নিচে এসে এক মুহূর্ত খাঞ্চিল কাকলি। কিন্তু দীপঙ্কর তার কাছে গিয়ে পৌঁছবার আগেই উপর থেকে দারওয়ান হেঁকে উঠল : ‘সাহেব আপনাকে ডাকছেন।’

এ আদেশ কাকে, বুঝতে দেয়ি হল না দীপঙ্করের। নিমেষে সে জুড়িয়ে গেল, আড়ষ্ট হয়ে গেল। শিথিল খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে ধীর পায়ে উঠতে লাগল উপরে। কাকলি আর দাঁড়াল না। যেন আবার কী এক ঘুঙ্কার মধ্যে পড়ছিল, ভাঙা বাঁচিয়ে দিল।

কিন্তু যতই পথ চলতে লাগল ততই মনে পড়তে লাগল বিষ্টুর কথা। দীপঙ্করের সেই পঙ্খ ছোট ভাইটার কথা। যে সেদিন যেতে পারে নি জু-তে, বাড়িতে বন্দী হয়ে ছিল। আর এক পায় কী করুণ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল চোখের উপর। যে পায় দাঁড়িয়েছে সেটাও যে নীর্ণ অক্ষম তা তার খেয়াল নেই। দাঁড়াতে যে পেরেছে সেই আনন্দে মুখ-চোখ উদ্ভাসিত করে রেখেছে। এই বুঝি পড়ল, পড়ে গেল, ভেঙে গেল টুকরো টুকরো। প্রতি মুহূর্তে সেই ভয়-জাগিয়ে-রাখা দাঁড়িয়ে থাকা। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরি, পড়তে না দিই, দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি জোগাই। আর সে কী হাঁপধরা নিচু চালের বস্তি। অভ্যাস-আবিল পরিবেশ।

কিন্তু আমাকে ওর কী দরকার থাকতে পারে? কাজ নয়, বলে কিনা, জরুরি কাজ, আর সেই জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল সিঁড়িতে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ায়? যদি দৈবাৎ দেখা না হত তা হলে জরুরি কাজটাও জন্মাত না। মনে মনে হাসতে চাইল কাকলি, কিন্তু পুরোপুরি পারল না হাসতে। আপনার সঙ্গে জরুরি কাজ ছিল—কথাটার মধ্যে স্ফুর্তি নয়, প্রচ্ছন্ন আকৃতির স্বর। হাস-হারানো কোন এক বিপ্লবের ডাক।

আবার তো আসছিই এদিকে। মনকে প্রবোধ দিল কাকলি। তখন দেখা করব। স্তনব। করব যা আমার সাধ্য।

‘এতক্ষণ দেয়ি করলেন কেন?’ কঠোর স্বরে বললে বরেন। খাতাপত্রের জগে হাত বাড়িয়ে দিল।

খাতাপত্রগুলো এগিয়ে দিতে দিতে দীপঙ্কর বললে, ‘আপনি এতক্ষণ কার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন।’

অলস সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বরেন বললে, ‘কিন্তু গল্প শুরু করবার অনেক আগেই তো আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তখন চটপট চলে আসেন নি কেন?’

‘খাতাপত্র শুছোতে তো সময় লাগে।’

‘হুঁ।’ প্রস্তুত গর্জন করল বরেন। নিচু চোখে খাতা দেখতে দেখতে বরেন বললে, ‘কতগুলি এনট্রি তো সম্ভ সম্ভ করেছেন দেখছি। কালি এখনো কাঁচা আছে।’

টেবিলের পাশ থেকে দীপঙ্কর বললে, ‘আপনার দেখবার আগে এনট্রিগুলো আপ-টু-ডেট পেলেই তো হল—’

‘না। আপনাকে বলা আছে না যেদিন যা ট্রানজ্যাকশান সেদিনই তা পাকা খাতায় তোলা চাই?’

‘তোলা না থাকলে কী হত? বলতেন, যাও, তুলে নিয়ে এসো। আপনার দেখার পর তোলার চেয়ে আপনার দেখার আগেই দিবি তুলে নিয়ে এসেছি।’

‘হুঁ।’ ঘুমন্ত হিংসায় আবার গর্জন করল বরেন। বললে, ‘যার সঙ্গে গল্প করছিলাম বলছেন সে আপনার চেনা নাকি?’

হঠাৎ থমকাল দীপঙ্কর। সংক্ষেপে বললে, ‘হ্যাঁ, চেনা।’

‘কী করে চিনলেন?’

এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে দীপঙ্কর বাধা নাকি? তবু যতদূর পাশ কাটানো যায়, অথচ সত্যের ধার ঘেঁষেও থাকে, দীপঙ্কর বললে, ‘ওঁর বিয়েতে নিমন্ত্রণ হয়েছিল।’

মুতমান কালসাপ। বাঁকা চোখে একবার তাকাল বরেন। মানে, দরকার হলে, লাগাবে স্বকাস্তের কাছে। বলবে তোমার স্ত্রী আমাদের ছোটবাবুর ঘরে গিয়ে আড্ডা মারেন এবং এমন একটা সাজ করে আসেন যাতে তুমি নেই, তুমি উৎখাত, তুমি উদ্বাস্ত। মানে, সরলকে গরল করে ছাড়বে। ফুটপাতের চার-গাছটাকে গরু দিয়ে খাওয়াবে।

‘কিন্তু ওর সঙ্গে আপনার আবার কী জরুরি কাজ?’

কথাটা তখন অতি উৎসাহে জোরেই বুঝি বলে ফেলেছিল দীপঙ্কর। তাই বলে তুমি তাই শুনবে, মনে করে রাখবে? শুনে যদি মনে করেও রাখো, জবাবদিহি চাইবে? গা জলতে লাগল দীপঙ্করের। বললে, ‘সে আমার প্রাইভেট কাজ, তা জেনে আপনার কাজ কী?’

‘হুম। কিন্তু এ কী? কী এটা?’ প্রায় ফেটে পড়ল বরেন: ‘বোলো তারিখের খালসী মালের হিসেবটা পাকা খাতায় তুলেছেন কই? আপনার খসড়ায় আছে, ব্যাকের অ্যাডভাইসে আছে কিন্তু আসল খাতায় চু-চু?’

নিচু হয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্কর বললে, ‘ওটা মিস হয়ে গেছে।’

‘সবাই আজকাল মিস হয়ে যাচ্ছে। কেউ মিসেস থাকছে না।’ টেবিলের উপর একটা চক্কু মারল বরেন : ‘কিন্তু এরকম মিস হয় কেন?’

‘মাহুশমাজেরই ভুল হয়।’ হাত বাড়াল দীপঙ্কর : ‘দিন, সেরে দিচ্ছি।’

‘সেরে দেবেন, না কি মেয়ে দেবেন?’ বরেন ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘আপনার কাজকর্ম আজকাল একটুও ভালো হচ্ছে না—’

‘যাকে দিয়ে ইনস্পেকশান করান তাকে দিয়েই আবার খাতা লেখান—কী খাটনিটা একবার দেখুন। আর যা মাইনে—’

‘মাইনে?’ সিগারেটের শেষ প্রান্তটা চিপে পিষে শেষ করে দিল বরেন। বললে, ‘মাইনে না পোষায় ছেড়ে দিন চাকরি।’

‘চাকরি ছেড়ে দিলে চলবে কী করে?’ খাতাপত্রগুলো গুছোতে লাগল দীপঙ্কর।

‘খুব চলবে। আপনার গ্রাইভেট কাজ করুন গে যান—’ বরেন উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

‘তুমি তোমার গ্রাইভেট টিউশানি করো গে যাও।’ কাকলি অহুকম্পার স্বরে বললে, ‘আমার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর জানতে এসো না।’

রাজে টিউশানি সেরে ঘরে ফেরবার পর, ঘরে দেখা হবার পর স্বকান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আজ কোথায়-কোথায় চেষ্টা করলে?’ তারই উত্তরে ঐ বিব ঢালল কাকলি।

‘কোথায় কোথায় গিয়েছিলে তাও জানতে পাব না?’

‘না। পথ তোমার নয়, পথ আমার। তোমার শুধু প্রাপ্তি। শুধু টাকা।’ ঘুণায় কাকলির চিবুকটাকে ধারালো দেখাল : ‘তোমাকে গুচ্ছের টাকা এনে দিলেই হল। তা যে কোনো চাকরি করে হোক, যে কোনো ব্যবসা—’

‘হ্যাঁ, শুধু ইঙ্কল মাস্টারিটা বাদ দিয়ে।’

‘কেন, ইঙ্কল মাস্টারিই বা বাদ দেব কেন? তেমন যদি পাই চলে যাব মকস্মল।’

‘বা, তা হলে আমার লাভ কী?’

‘খুব লাভ। মাস মাস পাঠাব তোমাকে টাকা।’ আবার ঝাঁজিয়ে উঠল কাকলি : ‘কিছু টাকা পেলেই তো তোমার ক্ষুদ্র মনের অভিলাষ পূর্ণ হবে।’

‘আমার অভিলাষ মোটেই অত ক্ষুদ্র নয়।’

‘নয়?’ হাতের কাছে কিছু একটা পেলে ছুঁড়ে মারে প্রায় এমন ভঙ্গি করল কাকলি।

‘না। আমার অভিলাষ, আমরা কায়ে আর আয়ে দুয়েতেই যুক্ত থাকব।’

‘মুণ্ড থাকব।’ নিচে, মেঝেতে, বিছানা করছে,—কদিন থেকেই করছে, গম্ভীর হল কাকলি : ‘অবশি মাস্টারি আমি করব না, কলকাতায় হলেও না—’

‘করবে না তো ?’ যেন আরাম পেল, টেবিলের কাছে চেয়ার টেনে বসল স্বকান্ত ।
‘না, কারণ মাস্টারনী হলে তোমার সমান-সমানই থাকব, তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারব না।’

‘তার মানে ?’

‘মানেটা বোধ হয় মাস্টার ছাড়া আর সকলের কাছেই স্পষ্ট । তার মানে, মোল্লা তবু খানিকদূর ছুটেছিল, তোমার দৌড় তো ধারে-কাছে কোনো একটা প্রাইভেট কলেজে লেকচারশিপ পর্যন্ত । লেকচারারের মাস্টারনী বউ, দুয়েরই প্রায় এক স্টেটাস । আমি তোমার উর্ধ্বে থাকব । আমি বিলিতি ফার্মে অফিসর হব । পে আর ম্যামারে তুমি তখন আমার নাগালও পাবে না । তুমি তখন তোমার ঠিক-ঠিক আসন নেবে । আসন নেবে আমার পায়ের নিচে । আর প্রার্থী-প্রার্থী ভক্ত-ভক্ত মুখ করে বলবে, রূপং দেহি, রূপেয়াং দেহি—’

‘বিলিতি ফার্মে কোনো আশা পেয়েছ নাকি ?’

‘এখনো চাকরি পাই নি কিনা, অপদস্থ আছি কিনা, তাই গায়ে কিছু বি’ধছে না । কিন্তু সত্যি সত্যি যখন পাব তখন এই কাঁচকলাং দেহি—’

‘বিলিতি গাছের হলে কাঁচকলাও দামী ।’ একটা মোটা বই খুলে পড়তে বসল স্বকান্ত ।

‘ই্যা, নিশ্চয়ই দামী । যদি ওখানে হয়, শুনেছি আলাদা কোয়ার্টার্স পাওয়া যাবে ।’ মশারির দড়ি টাঙাতে টাঙাতে কাকলি বললে ।

‘সত্যি ?’ আরামেও মাহুবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে । তেমনি এক তৃপ্তির নিটোল শব্দ করল স্বকান্ত । বললে, ‘তা হলে তো আমার সেই আদিম ইচ্ছেটাই পূর্ণ হবে । সেই আমাদের আলাদা ক্ল্যাটে গিয়ে থাকা—’

‘আমাদের থাকা মানে ? তুমি থাকবে কী ! ও তো আমার একার ক্ল্যাট ।’

‘তোমার একার ক্ল্যাট ?’

‘নিশ্চয় । যারা কুমারী মেয়ে, সিঙ্গল, আনম্যারেড, তাদের জন্তেই কোয়ার্টার্স ।’
‘হোক । তবু তুমি যদি অল্পগ্রহ করো, একদিন অল্পকূল লগ্ন বুঝে আমাকে খুলে দিলে দরজা !’ বইয়ের দিকে মুখ রেখেই বললে স্বকান্ত ।

‘নির্লজ্জ ।’

‘এ বিশেষণে আর আমার লজ্জা কী ! বরং বিবাহিতা নারীর স্বামী হওয়াটাই তো সেকেলে । আমার কতদিনের সাধ কৌমার্যের হবে—’

‘কৌমার্যের হবে ? অশ্লীলতার একটা সীমা থাকা উচিত ।’

‘বা, তুমি যদি কুমারী হও, আমার কৌমার্যের হতে দোষ কী ।’

‘যেয়ো একদিন ওদিকে, ছড়ো থাও কিনা দেখো ।’

‘কিন্তু কুমারী মেয়ে চাকরি পাবার পর তো বিয়ে করতে পারে—’

‘বিয়ে করলেই তো কোয়ার্টার্স হারাবে । একটা অকর্মণ্য স্বামীর চেয়ে একটা স্বাধীন ঘর ও সমর্থ চাকরি ঢের ঢের কামনীয় ।’

‘তেমনি তুমিও তো বিয়ে করতে পারো । আর, সত্যি করে বলতে, আমি তো ঠিক অকর্মণ্য নই । সুতরাং আমাকে বিয়ে করতে বাধা কী !’

‘তোমাকে বিয়ে ?’ কপালে হাত ঠেকাল কাকলি : ‘ভগবান আমাকে রক্ষা করুন ।’

মশারির চতুর্থ কোণটা লাগাতে গিয়ে স্বকাস্তের টেবিলের কাছে এসে পড়ল কাকলি । হঠাৎ স্বকাস্ত তার হাত ধরে ফেলল । বললে, ‘তোমাকে কুমারী অবস্থায় কী স্বন্দর যে লাগে—সত্যি—’ দুই চোখ উজ্জ্বল করল স্বকাস্ত ।

‘লজ্জা করে না বলতে ?’ কাকলি সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, ‘যার মনে অল্পস্পর্শের সূচিতার বোধ নেই, যে আফিস-বলের পাশ ঘেঁষে বসতে বলে মোটরে, কটা বাড়তি টাকার জন্তে, তার আবার স্বন্দরের জ্ঞান ? তা ছাড়া রাত্রে, বাড়িতে, আমি আর কুমারী কই ? আমি এখন সধবা, সিন্দুর-কলঙ্কিতা—’ মাথাটা ঝুঁকিয়ে দগদগে লাল ঘা-টা স্পষ্ট করে দেখাল কাকলি ।

চোখ ফিরিয়ে নিল স্বকাস্ত ।

মেঝের পাতা বিছানার মধ্যে গিয়ে কাকলি বললে, ‘শুধু বিছানা আলাদা নয়, ঘর আলাদা করতে পারলে শান্তি হত । যদি বাটারওয়ার্থের চাকরিটা পাই—’

‘আপনার সেই বাটারওয়ার্থের চাকরিটা হয়ে গিয়েছে ।’ কদিন পরে কাকলি দেখা করতে এলে তাকে বললে বরেন, ‘এই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার । শ্রীমতী কাকলি মিত্র, এম-এ । স্টার্টিঙে দু শো টাকা । আর যদি কাজে ইমগ্রেস করতে পারেন, সম্ভাবনা অক্ষুরন্ত—’

এ কী ইল্ডজাল ? দুই চোখ বিশাল করে তাকিয়ে রইল কাকলি ! চিঠিটা হাতে করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘একটা ইনটারভিউ লাগল না ?’

‘বা, ইনটারভিউ তো হয়েছে ।’

‘সে কী ? কোথায়, কার সঙ্গে ?’

‘এই যে সেদিন হল এখানে, আমার সঙ্গে ।’ হাসতে লাগল বরেন । বললে, ‘আমি স্টাটিসফাইড হয়েছি, তাই মেসোমশাইকে বলে এলাম । বাস, তাই যথেষ্ট । বললেন মেসোমশাই । স্ততরাং যত শিগগির পারেন জয়েন করুন । হোয়াই নট টু-মরো ?’ এনকোয়ারিতে গিয়ে প্রথমে সেক্রেটারির খোঁজ নিল । সেক্রেটারির কাছে রিপোর্ট করলেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে । কী নিজে-নিজে পারবেন তো গিয়ে পৌঁছতে, না সঙ্গে লোক দেব ? লোক দিতে হলে তো সেই এক—’ একটু থামল বরেন, পরে স্বরে উল্লাস এনে বললে, ‘নইলে বলেন তো কাল আমিই নিয়ে যেতে পারি আপনাকে ।’

‘না, না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না ।’ মমতাঘন চোখে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল কাকলি : ‘আমি নিজেই সব খুঁজে-পেতে বার করতে পারব ।’

‘হ্যা, নিজের কুটি নিজেই সঁেকে নেওয়া ভালো । লোক লাগা উচিত নয় । যে লোকের কথা ভাবছিলাম—আচ্ছা, আপনি দীপঙ্করকে চেনেন ?’

‘চিনি ।’

‘আপনার সঙ্গে কী জরুরি কাজ আছে সেদিন বলছিল—’

‘হ্যা, কিন্তু কী যে কাজ তা বলে নি । বলতে পারে নি । আজ জেনে নেব ।’ উৎসুক হয়ে এদিক-ওদিক দেখল কাকলি : ‘আছে আফিসে ?’

‘আছে ।’ গলা নামাল বরেন : ‘কিন্তু কী সে জরুরি কাজ, জানাবেন তো আমাকে ?’

‘নিশ্চয়ই জানাব । আপনার মত পরোপকারী বন্ধুবৎসল আর কজন আছে ? এখন তবে উঠি । দীপঙ্করবাবুকে ধরি ।’ চিঠিটা ব্যাগে পুরে কাকলি উঠি-উঠি করল ।

‘একটু চা খাবেন না ?’

‘পরে আরেকদিন খাব । আরো অনেকদিন খাব ।’ কাকলি উঠে পড়ল : ‘আগে জরুরি কাজটা জেনে নিই ।’

কাকলি আফিস থেকে বেরুতেই দীপঙ্কর তার শামিল হল । বললে, ‘চলুন একটু হাঁটি । অন্তত ট্র্যামস্টপ পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দিই ।’

‘চলুন ।’

কিরকম নতুন-নতুন লাগছে ! কিরকম দূর-দূর ! একটু দূর-দূর থাকলেই বুঝি নতুন-নতুন । একটু বিচ্ছেদ-বিরহের স্বর লাগলেই বুঝি ভালোবাসায় ধার আসে । তাই বুঝি মেয়েদের বাপের বাড়িটা এত প্রশস্ত । বাপের বাড়িতে কিছুদিনের জন্তে চকের আড় হলেই বুঝি চোখে জমে আবার মমতা, নতুন মমতা । বাহতে জাগে আবার পিপাসা, নতুন উত্তাপের পিপাসা । দূরে-দূরে চিঠি লেখালেখি হয় । তার ভাষা নতুন, বলবার বিষয় নতুন । চিঠি যদি শাদামাঠাও রাখে, তবে তার আবেগশূণ্যতার মধ্যেই নতুন এক আবেগের আশ্বাদ ।

নতুন হও, নতুন থাকো । অভ্যাসে অব্যবহিত হয়েছি কি, তোমার মৃত্যু ঘটেছে । স্বাদের বাইরে সাধের বাইরে চলে যাওয়াও মৃত্যু ।

কাকলির বাপের বাড়ি নেই । তাই সে ব্যবধান তৈরি করেছে তার মনে, তার বৈমুখ্যে । হয়তো বা স্থানেও । কেমন মেঝেতে বিছানা করে মশারি ফেলে শুয়েছে নতুন হয়ে । আশ্চর্য নতুন । দৈন্তে নতুন, দৃঢ়তায় নতুন ।

শুধু স্থানে-মনেই নয়, রূপেও । চাকরি খুঁজতে গিয়ে নতুন এক চেহারা নিয়েছে, কুমারী সেজেছে । চলায়-বলায় এনেছে অনেক দ্রুততার দীপ্তি । আবার যখন চাকরি পাবে, তখন না-জানি ধরবে আবার কোন সাজ । সম্মনের কোন কেশ্বরকিরীট ।

তবু তাই, নতুন হোক, নতুনতর হোক কাকলি । তার সম্ভাব্যতার শতশত পাপড়ি খুলতে থাকুক একে-একে ।

সে নতুন থাকলেই তো তাকে অর্চনা করতে ইচ্ছে হয় । সন্ধান করতে সাধ যায় । ভালোবাসা খুঁজে পায় তার আদিম সার্থকতা ।

কিন্তু সে নিজে ? সে নিজে কি নতুন ? স্বকান্ত একবার তাকাল তার চার-পাশে । খোলা মোটা বইটা বন্ধ করল শব্দ করে ।

কাকলি একবার বলে উঠেছিল, 'চোখের উপর আলো জ্বালা থাকলে কী করে ঘুম আসে মাহুঘের ?'

এটাও কি নতুনের স্বর ?

কোনোদিন বলে নি এরকম করে । কত রাত কাকলিকে আগে শুতে পাঠিয়ে

নিজে আলো জ্বলে লেখাপড়া করেছে। ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে বলে কোনোদিন নালিশ করে নি। মধ্যরাত্রি পার করে দিয়ে পড়াশেষে যখন স্বকান্তিতে গিয়েছে, দেখেছে তখনো কাকলি বিভোর! যে জেগে আছে, তাকে জাগানোর চেয়ে যে ঘুমিয়ে আছে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই কী অপূর্ব!

‘সকালে মুখে যদি একটা রাত-জাগা রাত-জাগা ভাব থাকে, তা হলে কিরকম হবে ইনটারভিউ?’ পাশ ফিরল কাকলি।

সত্যিই কি তবে এটা নতুনের স্বর, নতুনের ডাক? কাকলি কি তবে এই কথাই বলছে, বলতে চাইছে যে, এই সব দড়িদড়া, জ্বাতাকাতা ছিঁড়ে ফেলো, দূর করে দাও। মশারির ব্যুহ থেকে মুক্তি দাও আমাকে। আমাকে এই একাকিত্ব থেকে মুক্তিতল থেকে উদ্ধার করো। তোমার বলবান হুই বাহুতে আমাকে তুলে নিয়ে যাও তোমার খাতে। আমার ঔদ্ধত্যকে বিধ্বস্ত করো। ধূলিধূসর করে দাও।

আশ্চর্য, এতটুকুও জোর পেল না স্বকান্ত। চোরের মত চুপিচুপি হামাগুড়ি দিয়ে যেতেও লজ্জা করল। মর্মঘাতী কী কঠিন কথা বলে না-জানি প্রত্যাখ্যান করবে! আর কোথাও ভিক্ষে পেলো না, শেষকালে একটা ঘুমন্ত দেহের দুয়ারে এসে হাত পাতো? গলায় দড়ি জোটে না তোমার? ছোটলোক চাষা কোথাকার! স্বপ্নায় না-জানি কী বীভৎস নতুন হবে কাকলি! দাঁতগুলি না-জানি কী বস্ত্র দেখাবে! আর জিত তো নয়, খা-খা আগুনে পোড়া রক্তলোহার ছাঁক।

সুইচটা অফ করে দিল স্বকান্ত।

অন্ধকারে খানিকক্ষণ চুপচাপ বলে রইল চেয়ারে। খোলা জানলা দিয়ে অনেকক্ষণ ধরেই আসছিল হাওয়া, যেন টের পায়নি। এখন ঘর অন্ধকার করতেই হাওয়ার অন্তর্ভবিত মুখে-চোখে সর্বান্ধে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

কেউ একটা বাড়ি করলে তার পাশেই যদি সুবিধেযত জমি পায়, তা হলে তাতে একটা পুকুর করে। স্বকান্তও একটা পুকুর কাটতে চেয়েছিল। সে পুকুর কেটেছে সে নিজ হাতে। এখন হয়তো তাতে জল আসবে, স্বাচ্ছন্দ্য জল, স্নিগ্ধ জল। আর সেই স্বথাত পলিলে ডুববে স্বকান্ত।

তার আর উপায় কী! তাই বলে বাড়তি জমি পুকুর হবে না? অপচয়ে যাবে? না, না, পুকুর হোক। স্বকান্ত ডুবুক বা মরুক, কিছু আসে যায় না। ও পূর্ণ হোক, স্নিগ্ধ হোক, ও খুঁজে পাক ওর সম্ভাবনার গভীরতা!

সুইচটা অন করল স্বকান্ত। দেখল নিখুঁত, নিটুট শৃঙ্খলায় ঘুমুচ্ছে কাকলি।

শ্রীতে নয়, শক্তিতে। বিপদের দেশে একাকী লোক যেমন অস্ত্র নিয়ে ঘুমায়, তেমনি ও ঘুমছে কঠিনতর প্রত্যাখান নিয়ে।

নিজের খাটের দিকে তাকাল। সে সরকারি বিছানা ভগলু তো কখনই করে দিয়ে গেছে। মশারি ফেলে গুঁজে দিয়ে গেছে পরিপাটি। নিচের এই ছোট বাড়তি মশারিটা কাকলি আজ নিজে কিনে এনেছে। কিন্তু লেপ-তোশক-বিছানার চাদর? শতরঞ্জির উপর আধ-ময়লা একটা শাড়ি বিছিয়ে তার তোশক-চাদর, আর কার কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে আনা একটা আলোয়ানে তার লেপ। অনেক, অনেক জোর বেশি আজ কাকলির।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে নিজের বিছানায় ঢুকল স্বকান্ত।

সেও নতুন হতে জানে।

সঙ্কমে নতুন, গাভীরে নতুন, উপেক্ষায় নতুন।

‘আপনার অনেক জোর।’ এ কথাটা দীপঙ্করও বললে, কাকলিকে নিয়ে পথে এসে।

‘জোর? কার উপর?’ কাকলি হাসল।

‘বয়েনের উপর। আপনি বললেই আমার মাইনে ও নিশ্চয় কিছু বাড়িয়ে দেয়।’

‘আমি বললে?’

‘আমার তো তাই মনে হয়। আমি স্বকুকে বলেছিলাম বলতে—’

‘বলেছিলেন? তা উনি—’

‘আমার মনে হয় বলে নি। হয় ভুলে গিয়েছে, নয় চেপে গিয়েছে।’

‘কিংবা এমনও হতে পারে, বলেছিলেন, কোনো ফল হয় নি।’

দীপঙ্কর ঢোক গিলল। বললে, ‘মাই হোক, ওর দিকে আর যাচ্ছি না, এখন আসল ধরেছি। ওকে দিয়ে ফল না হোক, আপনাকে দিয়ে হবেই।’

‘বা, স্বকান্তই তো গুঁর বন্ধু। আমি কেউ নই।’ ভীতু-ভীতু অসহায় গুঁর করল কাকলি।

‘না, বন্ধুর চেয়ে আপনি বেশি। আপনি তার বান্ধবী।’

‘তেমন বান্ধবী তো আমি আপনারও।’ মুখ দিয়ে কেমন বেরিয়ে গেল কাকলির।

‘তাই তো এক বান্ধবের দুঃখের কথা জানাবেন আরেক বান্ধবকে। আর অধস্তনের জন্তে উর্ধ্বতনের হাত থেকে আরাম ছিনিয়ে আনবেন—’

আর যেন ফিরে যাবার পথ নেই, কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে কাকলি। বললে, ‘বেশ তো, আমার বলায় যদি হয়, নিশ্চয় বলব। কেন বলব না?’

‘বলায় যদি হয়—ওরকম নয়। হতেই হবে। আর তারই জন্তে বলবেন।’
চলতি ট্রামকে হাতের ইশারায় থামতে বললে দীপঙ্কর, ‘আমি বললাম, তবু হবে না ?
হবেই হবে। এরকম দাবির ভাব দেখিয়ে বলবেন।’

‘বেশ তো, তার আগে চলুন, বিটু-আভাকে দেখে আসি।’

‘বিটু-আভাকে দেখতে হলে আশেপাশে আরো অনেক কিছুই দেখতে হবে।
চলুন, ভ্রাণ প্রাণ সার্থক করবেন চলুন।’

যেন বাঙ্কবীকে কোন প্রমোদোদ্ভানে নিয়ে যাচ্ছে, এমনি ভঙ্গিতে কাকলিকে পাশে
নিয়ে ট্রামে উঠল দীপঙ্কর। যেন কোন রঙিন কার্নিভালে।

নেমে খাবারের দোকান থেকে এক বাস্স সন্দেশ কিনল কাকলি। খালি হাতে
শিশুগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর কোনো মানে হয় না—অন্তত আজ তো নয়ই।
আজ তার মন মিষ্টি, চোখ মিষ্টি, হাতভরা মিষ্টি আশার পসরা।

বস্তি ও তার পরিবেশের যে চেহারাটা আগে একদিন দেখে গিয়েছিল, আজ যেন
মনে হল, আরো কঠিন, আরো কদর্য। ফুটপাথের যে অংশটুকু বাড়ির শামিল করে
নিয়েছিল, তার ঠিক সামনেই একতূপ আবর্জনা।

সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে থেকেই চলে গিয়েছিল মনে আছে, আজ ভিতরে এসে
বসল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো হৈ-চৈ করে উঠল, ঘিরে ধরল কাকলিকে।
নরড়ে পায়ে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল বিটু। শীর্ণ বৃকে হেঁড়া আঁচল মেলে স্নান হাসি
হেসে সামনে এল আভা।

সেদিন যেন চোখগুলিকে তবু জলজলে দেখেছিল, গায়ে মুখে তাজা আনাজের
লাবণ্য। আজ মনে হল অনেক শুকিয়ে-শিটিয়ে গিয়েছে, গলার কাছে এসে কোনো
রকমে ধুকধুক করছে প্রাণপিণ্ড। চোখের চাউনিগুলো নৃন্ত, অর্থহীন। যা ধরে
ওরা জীবনসমুদ্রে ভাসছে, ওরাও যেন বুঝতে পেরেছে তা তুচ্ছ একখণ্ড খড় ছাড়া
কিছু নয়।

‘কী এনেছ আমাদের জন্তে ? চিনেবাদাম ?’ ছেলেমেয়েগুলো আরো ঘন
হয়ে এল।

‘না, সন্দেশ। হাত পাতো।’

একসঙ্গে অনেকগুলি হাত লকলক করে উঠল। যত হাত তত সন্দেশ যদি হয়,
কেউ কেউ দু হাত মেলে ধরল।

সবাইকে বিলোতে লাগল কাকলি। ‘এক মুহূর্তের জন্তে ওদের চোখে-মুখে এল
বুঝি-বা অভিনবের আলো। কিন্তু তা আর কতক্ষণ থাকবে ? জলটুকু খেয়ে নিলেই

চলে যাবে এই মধুরের গন্ধ। তারপরেও যদি এককণা লেগে থাকে দাঁতের ফাঁকে, ক্ষণকালের জন্তে একটা স্থিতি এসে দংশন করে যাবে। কাকলির মনে হল, এর চেয়ে ঐ ছোটটার জন্তে যদি একটা জামা এনে দিত তা হলে আন্ত একটা কাজ হত। আর, জামা কি শুধু ছোটটারই জন্তে? এখনো সন্ধে হয়নি, কিন্তু এখনি কী ঠাণ্ডা ঝাঁপানটার! সবাই কেমন কুঁকড়ে কুঁজে হয়ে রয়েছে। শোয় তো বুঝি মাটিতেই। উপরে-নিচে গায়ে না জানি কী দেয় রাস্তিরে। রাস্তিরের কথা ভেবে শিউরে উঠে কাজ নেই, এখন যদি ছেলে দুটোর গায়ে থাকত দুটো শার্ট আর মেয়ে দুটোর দুটো লম্বা বুলের ব্রক। ছেলে দুটোর দুটো হাফ-প্যান্টই বা নয় কেন? আর আভার শাড়িটাই বা এমন কী অটেল?

‘এসো, তুমি নেবে না?’ বিষ্টকে লক্ষ্য করল কাকলি।

দিব্যা দেয়াল ধরে ধরে এগুতে লাগল বিষ্ট। লোভ তাকে সামনে ঠেলেছে—লজ্জা চাইছে পিছিয়ে রাখতে। লোভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে নিশ্চয়। লোভের বস্তু যদি আরো প্রবল হত, হঠাৎ মনে হল কাকলির, বিষ্টকে আর দেয়াল ধরতে হত না। এক পায়েরই হয়তো আসতে পারত লাফিয়ে। কিন্তু হায়, সামান্য একটা ক্রান্ত পর্যন্ত তার নেই।

তার জন্তে হাত বাড়িয়ে দিল কাকলি। দেয়াল ছেড়ে দিয়ে বিষ্ট কাকলির হাত ধরল। শুধু বিষ্টের নয়, সমস্ত খোঁড়া সংসারের দাঁড়াবার লাঠিই যেন এই কাকলির হাত।

‘সেই যে সেদিন বলে গিয়েছিলে, আমি বন্ধু, সেদিন থেকে আশাপথ চেয়ে বসে আছি।’ দুর্গাবালা প্রথম থেকেই উচ্ছ্বসিত: ‘চারদিক যতই নিষ্ঠুর হোক, অনাস্থীয় হোক, এখানে এখনো আছে একজন বন্ধু। তার দেয় হতে পারে কিন্তু তার ভুল হবে না। পথ চিনে একদিন যখন সে এসেছিল আবার আসবে। আলো করে আসবে।’

‘আমার সাধ্য কী!’ কাকলি মুখ নিচু করে বলেছিল প্রথমে।

‘সাধ্যের কথা নয় মা, হৃদয়ের কথা। হাত অনেক কিছুই করতে পারে না হয়তো কিন্তু হৃদয় দিয়ে অসম্ভব করতে বাধা কোথায়? সেই অসম্ভবত্বটুকুও খুঁজে পাই না, সেও বোধ হয় পাখর হয়ে গিয়েছে।’

নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হল কাকলির।

‘আজ বাইরে থেকে ফিরে যাওয়া চলবে না। আজ ভিতরে এসে বসতে হবে।’ প্রায় হাতে ধরেই টেনে আনল দুর্গাবালা। পুরু করে একটা চট বিছিয়ে দিল মেঝের উপর। বললে, ‘ভিতরের লোক কি বাইরে দাঁড়ায়?’

স্বচ্ছন্দে আলস্তে আসনপিঁড়ি হয়ে বসল কাকলি।

সমস্ত দৃশ্যটি মুগ্ধ চোখে দেখছে দুর্গাবালা। এখনো আছে এখানে স্নেহ, অকারণ
করণ। কাকলির বাস্তবে কি সন্দেহ না ইন্দ্রজাল?

‘তুমিও এসো।’ আভাকে ডাকল কাকলি। ‘আর আপনি?’ দীপঙ্করের দিকে
দোখ তুলল।

‘আমি থাক কী!’ দীপঙ্কর সরে যেতে চাইল।

‘না, নিন। মিষ্টিমুখ করুন।’ কাকলি হাসল।

‘সেই আপনার বিয়েতেই তো মিষ্টিমুখ করেছি। আবার নতুন কারণ ঘটুক,
স্বকান্তর পর স্বতকান্ত আনুক, আবার মিষ্টিমুখ করব।’

চঠাৎ স্বভির একটা শেল দুর্গাবালাকে দ্রুত বিদ্ধ করল। নিঃস্বের কণ্ঠে হাহাকার
করে উঠল: ‘তোমার তবে এ কী চেহারা? হাত-গলা খালি, কপাল-মাথা শাদা—’

‘কিছু হয় নি মা। ও একটা ছলনা।’ খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি।
বললে, ‘একটা নাটকে প্লে করতে গিয়ে এইরকম সাজতে হয়েছে।’

হেয়ালির মত লাগছে দুর্গাবালার। ব্যাকুল হয়ে বললে, ‘তোমার সেই—সেই
বন্ধ ভালো আছে?’

‘আমার স্বামীর কথা বলছেন? দিব্যি স্বস্থ, হুটপুট আছে। কিন্তু স্বামী আবার
কিছু কবে? ও তো শত্রু।’

‘সে শত্রু আমার। ঐ দেখ—মরেও না তরেও না, পড়ে আছে চৌকাঠের
ওপর।’

একটা হাড়-পাঁজর বার করা রিক্তগাত্র বুড়ো উঠোনের ধার ঘেঁষে পড়ে আছে
খুবড়ে। ধুকছে। নথ নিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

‘ওঁর অস্থখ?’

‘কিছুমাত্র না। আফিং পায় নি তাই ককাচ্ছে-কাতরাচ্ছে। দীপু কি মাছ-
তরকারি কিনবে, না আফিং কিনবে? আর আফিং একবার পেটে পড়লেই সেই
স্বস্তির বাঁড়। ধার করতে ছুটবে। ধার যদি না জোটে তো অস্ত্র কেলেকারি।
বলে, আফিং দিয়েছিল, রাবড়ি দিবি না? তখন আবার জরিমানা দিয়ে ছাড়িয়ে
আনো। কত ছাড়াবে? দফায়-দফায় পাওনাদার। কেউ ধরে-বেঁধে জেলে নিয়ে
যেতে পারে না? কিংবা ভাগাড়ে? কেউ দু-বা জখম পর্যন্ত করে না? বলে, কী
দয়কার! দীপুর মতন যখন ছেলে আছে তখন কড়ায়-ক্রান্তিতে পাওনা-গণ্ডা সব
ওল হয়ে যাবে।’

ডুনতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছিল কাকলির, শেষ কথাটার গভীর উপশম পেল।
সন্দেশ-স্বকু হাত দীপকরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ‘নিন, ঠকবেন না, মিষ্টিমুখ
মত খবর আছে।’

হাত বাড়িয়ে দিল দীপকর। বললে, ‘আছে ? কী খবর ?’

‘আমি একটা চাকরি পেয়েছি।’

‘আপনি ?’ বাড়ানো হাত গুটোনো যায় না, বরং এটাও যে একটা অকুণ্ঠ
আনন্দের সংবাদ এটা সজোরে সাব্যস্ত করা উচিত। ‘বলেন কী ?’ কাকলি
সন্দেশ-স্বকু হাতটা ধরে ফেলল দীপকর : ‘কী করে পেলেন ? কে দিল ?’

সন্দেশটা দীপকরের হাতে চালান করে দিতে দিতে কাকলি বললে, ‘মিথো বল
কেন, বরেনবাবুই পাইয়ে দিলেন। ঠুর মেসোমশায়ের ফার্মে। বাটারগুয়ার্থে।’

না, মিথো ম্লান হবে কেন ? কাকলিকে কেন হিংসে করবে ? ওর সঙ্গে ম্লান
কোথায় ? বরং এ তো ভরসার কথা। কাকলি জানে আদায় করতে। যখন
নিজের জন্তে পেরেছে বন্ধুর জন্তেও পারবে।

গোটা সন্দেশটা মুখে পুরে দীপকর বললে, ‘আমি ঠিকই বলেছি। বরেনের উপা
আপনার অথও প্রতাপ ! আপনি যদি তেমন করে বলেন ওর সাধ্য নেই আপনার
ফেরাতে পারে—’

‘যদি তেমন করে বলি—’ চোখের কোণে হাসল কাকলি।

‘হ্যাঁ। আপনিই তো বলেছেন যে নাটকে যেমন পার্ট। যে রানী সাজতে পারে
সে কিও সাজতে পারে। মানে যে নিজের জন্তে বলতে পারে সে চাকরের জন্তে—
বলতে গেলে আমি তো বরেনের চাকরই—চাকরের জন্তেও বলতে পারে। নিজের
চোখে দেখেছেন তো আমার সংসার। আমি কেন সন্দেশী হই না ? কেন মন
কেলে-ছড়িয়ে চলে যাই না নিকদ্দেশে ? আমার কী দায় ! আমি কেন হাতি
ঠেলি ?’

‘না ঠেলে আপনার শাস্তি নেই। আপনার স্বভাবই আপনাকে পালাতে দে-
না, সংগ্রাম করিয়ে ছাড়বে।’

‘তেমন যদি আরেকটি স্বভাব পাই যে সে সংগ্রামে আমাকে সাহায্য করতে উদ্য
অল্প জোগাতে তৎপর—’

‘বলেছি তো, বলব, অজস্র বলব। চেষ্টা করব প্রাণপণে।’ কাকলি উঠে পড়ল।
চুর্গাবালার হাতে সন্দেশের বাস্কাটা—তখনো নিঃশেষ হয় নি—পৌছে দিল। বললে
‘এবার বাড়ি যাই।’

‘হ্যা, বাড়ি গিয়েই সাজ পালটাও ।’ বললে দুর্গাবালা, ‘দেয়ি কোয়ো না

‘শত্রুর শিবিরের শোভা বাড়িয়ে লাভ কী !’ হাসল কাকলি : ‘বাইরে এই জে
জালো আছি সংগ্রামীর পোশাকে । বাড়িতে ঢুকলেই তো মাথায় পরতে হবে
দামত্বের চিহ্ন, হাতে-গলায় বন্ধনের বেড়ি—’

‘কী যে বলো তার ঠিক নেই । সাজলে-গুজলে ঠিক রাজেশ্বরীর মত দেখাবে ।
জানো তো লক্ষ্মীই রাজেশ্বরী ।’ কাকলির চিবুক ধরে আদর করল দুর্গাবালা ।

কাকলি বললে, ‘ঘোরো লক্ষ্মীর চেয়ে বুনো কালীই অনেক ভালো, মা ।’

ছেলেমেয়ের দল আবার ঘিরে ধরল কাকলিকে : ‘আবার এসো । আবার এসো
কিছু । কবে আসবে ?’

সবচেয়ে ছোটটা বললে, ‘এর পর কী আনবে ?’

বড় বললে জলজলে চোখে, ‘কিছু আনতে হবে না । তুমি অমনি এসো ।’

বাইরে রাস্তায় এসে দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে, ‘সাজগোজের এই ছলনাটা চাকরি
জোগাড়ে সাহায্য করেছে নিশ্চয়ই—’

‘নিশ্চয়ই ।’

‘এতে স্বকুর সায় আছে ?’ প্রশ্নটা করেই দীপঙ্করের মনে হল অপ্রাসঙ্গিক
শোনানোছে ।

হরে ঝাঁজ এনে কাকলি বললে, ‘ওর সায় আছে কি না আছে কে তা জিজ্ঞেস
করতে গেছে ? বিশেষ সিদ্ধির জন্তে বিশেষ কৌশল বিধেয় । আর বিষয় যখন
সামার তখন আঙ্গিকও আমার রচনা ।’

‘তবেই দেখছেন, আপনি ছলনাতেও নিপুণ ।’

‘তাই তো দেখছি ।’

‘হতরাং ছল বল কৌশল যখন যেমন প্রয়োজন, আপনি বয়েনের উপর অনায়াসে
প্রয়োগ করতে পারবেন । আর আমার আকাঙ্ক্ষা কী সামান্ত তা তো জানেন ।
ভুগু মাইনে বুদ্ধি ! তাও অকারণে নয়, কাজ বাড়িয়ে দিয়েছে, তাই ।’

‘আমি চেষ্টার ক্রটি করব না ।’ পরে একটু বুঝি বা সন্নিহিত হল, বললে কাকলি,
‘সামার তুণে যত বাণ আছে ছুঁড়ব একে একে—আপনি বিশ্বাস করুন ।’

বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল দীপঙ্কর ।

সারা রাস্তা কাকলি ভাবতে-ভাবতে এল, কী দেখলাম নিজের চোখে ! দারিদ্র্য
কী মর্যদ্বন্দ্ব কুৎসিত, আর এই যে আশ্বাস দিয়ে এলাম আমি এর প্রতিকারের চেষ্টা
করব, কে জানে, এও বোধ হয় ছলনারই নামান্তর । আমার তুণে যত বাণ আছে—

কী বাণ আছে ? বাণ থাকলেই কি ছোঁড়া যায়, না তা লক্ষ্যকে বিধতে পারে ? তু
অত বড় পঙ্খতা ও নিরুপায়তার সামনে কিছু একটা আশ্বাসের কথা না বলতে
পারলেও নিশ্বাসকষ্ট হয়। আমি মেয়ে, আমি সংস্কারে সংকীর্ণ, স্বভাবে ভিত্তি,
ছনির্ধারণ হালচাল আমি কী বুঝি, আমার দ্বারা কিছু হবে না—এ বলে সরে পড়লে
কি মর্যাদা পেত মহত্ত্ব ? আমি মেয়ে বলে কি এতই অকিঞ্চিৎ ? সংসারে আচ্ছ
কী ? শুধু দুটো জিনিসই তো আছে। প্রয়াস আর প্রসাদ। নিজের জন্তে প্রয়াস,
পরের জন্তে প্রসাদ। পরকে একটু প্রসন্ন করতেও কি নিজে প্রয়াসী হব না ?

সারাক্ষণ কি একটানা এই নৈশ্ফল্য আর নৈরাশ্রের কথাই ভাববে ? যে লোকটা
চৌকাঠের বাইরে উঠানের ধারে পড়েছিল উপুড় হয়ে তার কথা ছাড়া আর কিছুই
কি তার মনে পড়বে না ? আর সেই বিটুর দেয়াল ধরে এক পায়ে উঠে দাঁড়ানো ?
আর আভার সেই গায়ের উপর খাটো আঁচল ? আর সেই মেয়েটার জিজ্ঞাসা : এ
পর কী আনবে ?

তার জীবনে কি কোথাও স্বথ নেই, উপশম নেই, অন্ধকার স্নেহে অন্তত একটা
শাদা পেনসিলের দাগ ?

না, আছে। কাকলির চাকরি হয়েছে। কজনের ঘটে এমন সৌভাগ্য ? শু
স্বাধীনতা পাওয়া নয়, স্বাধীনতার পিছনে ক্ষমতাকেও পাওয়া।

কিন্তু ওদের কাক গায়ে একটাও গরম জামা দেখলাম না। গরম দূরের কথা
সম্পূর্ণ জামাও দেখলাম না। কী ভাবে শোয়, কী না জানি খায়। আর নিশ্চয়
কোন পারিজাতের সৌরভ না জানি আশ্বাদ করে !

‘এত দেবি হল ?’ মৃদুস্বরেই জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত।

‘হয়ে গেল।’ মৃদুতর উত্তর কাকলির।

দীর্ঘ রজনী কাটল চুপচাপ।

পরদিন সকালে উঠে, সিঁড়ি দিয়ে নামছে মুণালিনী, এগিয়ে এসে কাকলি তবে
প্রণাম করে দাঁড়াল এক পাশে। বিশ্বয়ের ঘোর কাটতে না দিয়েই বললে, ‘আমার
চাকরি হয়েছে।’

‘বলো কি ? সত্যি ? কত মাইনে ?’ সব প্রশ্নের বড় প্রশ্নটাই আগে এল মুণালিনীর

‘শুরুতেই দু শো। এদিক সেদিক ফালতুও কিছু আছে হয়তো। তারপর
বছরে বছরে বাড়বেও বলেছে।’

‘ওরে তোরা শুনেছিস, বউমার চাকরি হয়েছে—’ আত্মনাগে কেটে পড়
মুণালিনী। চারদিকে আনন্দের হাট বসিয়ে দিল।

ঘরে ঘরে আশীর্বাদ কুড়োতে গেল কাকলি।

ভূপেন বললে, ‘কোম্পানিটা ভালো আর পোস্টটাও সম্ভ্রান্ত। আশীর্বাদ না করে আর উপায় কী!’

‘আর কাজকর্ম খুব বেশি হবে না বলেই মনে হয়।’ বললে হেমেন, ‘তুমি ম্যানেজারকে বলে আওয়ার্গিটা এগারোটা-চারটে করতে পারো কিনা দেখো। দশটা-পাঁচটা হলে স্টেইন খুব বেশি হবে, তারপর আফিস-টাইমের ট্রাম-বাস—’

প্রশান্ত বললে, ‘যাই আওয়ার্গি হোক, পেট ভরে টিফিন খেয়ো।’

ঘরে ফিরলে স্বকান্ত গম্ভীর মুখে বললে, ‘চাকরি হয়েছে, তা আমাকে বলো নি কেন?’

‘তোমাকে শেষে বলব।’

‘শেষে মানে?’

‘মাসের শেষে।’

‘মাসের শেষে?’

‘ই্যা, যখন মাইনে পাব। যখন হাতে টাকা আসবে।’ কাকলি জানে যাবে বলে চুল খুলতে লাগল: ‘তোমার তো চাকরির খোঁজ নয়, তোমার শুধু টাকার খোঁজ। কোথেকে টাকাটা আনলাম তা নয়, কত আনলাম তা।’

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল স্বকান্ত। জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু চাকরিটা পেল কে? কাকলি বস্তু, না কাকলি মিথ?’

‘কাকলি বস্তু ঐ তো চেহারা!’ স্বকান্তর দিকে হাত বাড়াল কাকলি: ‘চাকরি পেয়েছে কাকলি মিথ। শ্রীমতী নয়—শ্রীমতী একটা ছলনা—স্পষ্ট কুমারী কাকলি মিথ।’

তবু ষ্ণালিনীর মধ্যে যেন দুশ্চিন্তা ছিল। সদরে যদিও আত্মপল্লবে টাকা পূর্ণঘট রেখেছে এবং যদিও দোর পেরোবার আগে তা করজোড়ে প্রণাম করেছে কাকলি, তবুও কাঁটাটা যাচ্ছিল না কিছুতেই। এক পাশে সরে এসে প্রায় কানে-কানে বলার মত করে ষ্ণালিনী বললে, ‘মুখের এক কথায় এমন স্বন্দর চাকরিটা যেন ছেড়ে দিয়ে এসো না।’

‘তেমনিধারা হবে না বোধ হয়। দায়িত্বজ্ঞান আছে এমন লোক আছে পিছনে। তবে, কে জানে, কিছুই বলা যায় না।’ রাস্তায় নেমে গেল কাকলি।

হুপুরবেলা, আফিসে, বরেনের ফোন বেজে উঠল।

‘হালো!’ বরেন রিলিভার তুলল।

‘আমি। আমি কাকলি। কাকলি মিত্র।’

‘কী আশ্চর্য! অত কেন? গলার স্বরেই চিনতে পেরেছি।’

‘জয়েন করেছি আজ।’

‘করেছেন? ও-কে। কেমন লাগছে?’

‘ভালো—দেখুন, শুভুন—’

‘কোনো ডিফিকাল্টি হলেই ম্যানেজারকে বলবেন।’

‘শুভুন, আপনাকে বলছি।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।’

‘দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।’

‘বেশ তো, বলুন না কী কথা!’

‘আপনার কাছে গিয়ে বলব।’

‘সে কথা তো আরো ভালো।’

‘সাড়ে চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আপনি থাকবেন?’

‘থাকব।’

‘আমি তখন যাচ্ছি আপনার কাছে।’ রিসিভারটা রেখে দিল কাকলি।

পিঠ-পিঠ কথাটা বলতে পেল না বরেন। না পেয়ে ভালোই করেছে। হয়তো কিছু উত্তাপ কিছু আগ্রহের স্বর আসত। সেটা ঠিক নয়। সমীচীনতা থেকে সে স্থলিত হবে না, নইলে দুপুরের নির্জনে এমন টেলিফোন পেয়ে কেউ ‘অমনি কাঠ-কাঠ কথা কয়? দর্জি হয়ে কাঁচি চালিয়ে কথার মাপজোক করে?’

ঠিক সময়ে হাজির হল কাকলি। ক্লাস্ত অথচ অগ্নান।

‘কী, কোনো উৎপাত জোটে নি তো?’ নিশ্চিন্ত আলস্তে সিগারেট ধরাল বরেন।

‘না। সবাই বেশ ভদ্র, পরিচ্ছন্ন।’ কাকলি বসল চেয়ারে।

‘শুভুন, ইলশেণ্ড’ড়ি বৃষ্টি হয়তো হবে, সেটা উপেক্ষা করবেন—’

‘হ্যাঁ, গুঁড়ো-গুঁড়ো ঝুরো-ঝুরো বৃষ্টিতে কিছু অস্ববিধে হয় না, মূলধারায় হলেই মুশকিল—’

হাসল বরেন, কিন্তু শব্দ হতে দিল না। নিঃশব্দে হো-হো করে হাসবার মত মুখ করলে। বললে, ‘তখন আর ছাতাতে শানায় না।’

‘তখন ছাতা কী, তখন তার প্রতিকারও মূল্য।’

আবার একটা নিঃশব্দ উচ্চ হাসির মৌখিক ভঙ্গি করল বরেন।

সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নিবিষ্ট চোখে একটুখানি দেখল

কাকলিকে। পরে ভক্তিটাতে হঠাৎ প্রার্থ্য এনে টেবিলের কাজকর্ম নিয়ে খানিক নাড়াচাড়া করলে। আবার আলম্বে একটু শিথিল হয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘কী একটা কথা ছিল বলছিলেন—’

‘ই্যা, আজ থাক।’

‘থাক।’ দিব্যি সায় দিল বরেন।

‘আরেক দিন আসব।’

‘যেদিন আপনার খুশি। আমি কান পেতে থাকব।’

‘ই্যা, কোন করে আসব। আমার টেবিলের কাছেই কোন।’

‘আমি তো কোনের জন্তেই কান পেতে থাকব।’ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

‘আজ উঠি।’ উঠে পড়ল কাকলি।

‘আমিও।’ বলে, এমনি একবার লোভ হল বরেনের। চলুন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দিই বাড়িতে। যা এখন জগদলন ভিড়।

বলল না, স্নাকরার স্মৃতিতে মেপেই বলল না। শুধু বলতে হয়, মামুলি ভাবে বললে, ‘বাড়ি ফিরবেন?’

‘ই্যা, নইলে আর জায়গা কোথায়?’

বরেন বাইরে একবার আফিস-ভাড়া কোলাহলের দিকে তাকাল। মনেমনে অনেক ছাঁটকাট করে স্মৃতি করে বললে, ‘বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে—’

যদি কাকলি নিজের থেকে বলে! গাড়ির প্রস্তুতি যদি কাকলির হয়।

গাড়ির কথার ধার দিয়েও কাকলি গেল না। বললে, ‘ঘুরতে-ঘুরতে দেরি করে বাড়ি ফেরার আনন্দের কথা শুনেইছি শুধু, অসুস্থ্যমানও করেছি আগে-আগে। এবার প্রত্যক্ষ করব।’ মুক্তির পাথায় ঝলমল করতে-করতে আকাশের শূণ্যে উড়ে গেল বিহঙ্গ।

উলটো পথের ট্রাম ধরল কাকলি।

দূরের মোড়ে নেমে একটা অন্ধকার মতন জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়াল, যেখানে তার বাড়ি, তার মা-বাবা ভাই-বোনের বাড়ি, তার আশৈশব স্নেহনীড়টা দেখা যায়। দোতলার দক্ষিণ দিকের ঘরটায় আলো জ্বলছে। পত্রালি পড়ছে বোধ হয়। নাকি মা কিছু করছেন। নাকি অমনিই আলোটা জ্বালা। ঘরে কেউ নেই।

আর ঐ লেই কদম গাছ! অনেক পাতা ঝরে গিয়েছে বোধ হয়।

কত দিন পরে দূরে দাঁড়িয়ে একটু দেখছে। দেখতে ভালো লাগছে।

চাকরির খবরটা মা-বাবাকেই শুধু বলা হয় নি। যেন বলা যায়। যেন খবরটা নিয়ে জরীর মত দাঁড়ানো যায় তাঁদের কাছে।

না, দরকার নেই! ওঁরা কি কখনো চেয়েছিলেন মেয়ে চাকরি করুক? স্বাধীন পায়ে লিখে হয়ে দাঁড়াক?

ধীরে-ধীরে ফিরে গেল কাকলি। আবার সোজা পথের বাস ধরল।

...৩০.....

বাড়ি ফিরতে সর্বপ্রথমে সেন্টুই উল্লাস করে উঠল: ‘এই স্তো। এই স্তো কাম্মা।’ বলে ছুটতে-ছুটতে এসে কাকলির দুই বাহুতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাকলির চিবুকটা ধরে ঘুরিয়ে মুখটা তার চোখের সামনে সম্পূর্ণ করে রেখে সেন্টু বললে, ‘তুমি আসতে দেরি করছিলে বলে সবাই ভাবছিল।’

‘নানা জনে নানা কথা বলছিল।’ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঝন্টু, বললে হাসতে হাসতে।

‘কে কী বলছিল রে?’

‘কেউ বলছিল রাস্তা পার হতে গাড়ি চাপা পড়েছে। কেউ বলছিল চলতি বাস থেকে নামতে গিয়ে চিংপটাং। কেউ বলছিল, বাসে-ট্রামে উঠতে না পেরে হেঁটেই আসছে বুঝি।’ যত বলছে ততই হাসছে ঝন্টু: ‘আবার কেউ বলছিল একটা ট্যান্ডি নিয়েছ আর ড্রাইভারটা তোমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছে।’

সংসারে থেকে ঝন্টু বেশ চালাক হয়ে উঠছে, তাই কে কোন কথাটা বলেছে নাম দিচ্ছে না। নাম না থাকলে উদ্ধৃতিটা যে নির্দোষ দেখাবে এটা সে বুঝে গিয়েছে।

কিন্তু সেন্টু একতাল সারল্যা। বললে, ‘কাকাটা ভারি মন্দ। কী বলছিল জানো?’

‘কী বলছিল?’

‘বলছিল তোর কাম্মা আর ফিরে আসবে না। তোর কাম্মা অন্য দেশে চলে গিয়েছে।’

‘যেমন বুদ্ধি তেমনি তো বলবে।’

‘এই স্তো কাম্মা। এই স্তো।’ সেন্টু হুহাতে কাকলির গলা জড়িয়ে ধরল।

অনেকেই বাইরের বারান্দায় বেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল উদ্বেগের চোখ নিয়ে, হু-হু-

সমর্থ কাকলিকে কিয়তে দেখে জুড়িয়ে গেল মুহূর্তে। উদ্বেজনাটা সমীচীন উৎসাহ পেল না। সব ভাল-ভাত হয়ে গেল।

সেন্টুকে কোল থেকে নামিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল কাকলি। বারান্দা থেকে স্ক্রাস্তও ফিরল। ত্র্যাকেটে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখে কাকলি বললে, ‘আমার জন্তে এত সবার ভাববার কী হয়েছে?’

‘তোমার জন্তে কে ভাবে?’ স্ক্রাস্ত অগ্ৰ দিকে মুখ করে বললে।

‘আমার জন্তে নয়?’

‘না। সবাই ভাবছে সংসারের কথা, তার মান-সম্মানের কথা।’

‘মানে?’

‘একটা বউ চাকরি করতে বেরিয়ে আর বাড়ি ফিরছে না, রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে, তখন থানায় গিয়ে ডায়রি করতে হয় তো। আর বউ-পালানোর ডায়রি করতে গেলে মাতৃষে কী ভাবে? সংসারের মানে টান পড়ে কিনা—’

‘কেন, অনেস্ট অ্যাকসিডেন্টও তো হতে পারে।’

‘পারে। তার মানেই হাজারগুণ ঝামেলা। এ-হাসপাতাল থেকে ও হাসপাতাল খুঁজে খুঁজে বেড়াও। যে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সে বাড়িতে গিয়ে খবর দাও।’ স্বরে দার্শনিকতার টান আনল স্ক্রাস্ত : ‘হতে তো অনেক কিছুই পারে।’

‘হ্যাঁ, অনেক কিছুই পারে।’ কাকলি বললে, ‘এখন আর ফিরে যাওয়া নেই। সেই যে ফোড়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, ফোড়া, তুমি দেখতে কেন ছোট? ফোড়া বলেছিল, আমার একটুখানি খোঁটো। সেই ফোড়া এখন খুঁটে দিয়েছ। বাড়বেই তো যন্ত্রণা—’

‘বেচারি আক্সিস থেকে এসেছে ক্লাস্ত হয়ে, এখুনি আবার কী কথা?’ ছেলেকে একটু-বা তিরস্কার করতে চাইল মৃণালিনী : ‘ও আগে একটু ঠাণ্ডা হোক, চা-টা থাক। পরে কাকলিকে লক্ষ্য করল : ‘তুমি বাথরুম থেকে এসো, আমি তোমার জলখাবার নিয়ে আসছি।’

‘এই যাচ্ছি মা।’

কাপড়চোপড় ছাড়বে, ইঙ্গিত পেয়ে সরে গেল স্ক্রাস্ত।

যে প্রশ্নটা মনের মধ্যে খচখচ করছিল সেটা উৎপাতন করল মৃণালিনী : ‘এত দেবি হল কেন কিয়তে?’

‘এমনি হবে মা দেবি। উপায় নেই। কতগুলি ট্রাম-বাস ছেড়ে দিয়ে তবে একটা পাওয়া যায়। তারপরে দেখা হয়ে যায় কত লোকের সঙ্গে। কলেজের বন্ধু—’

‘হ্যা, তা তো হবেই। বাইরে বেরুলেই আরেক জগৎ।’
মৃণালিনী।

‘দেয়ি হলে ভাববেন না। স্বাধীনতা যখন নিয়েছি তখন দারিদ্র্যও নিয়েছি।’

‘তা তো ঠিকই। তবু মায়ের প্রাণ—’ মৃণালিনী নিচে নামল।

‘কি, কী নিয়ে গেল রে দিদি?’ রান্নাঘরের পাশ থেকে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে।

‘এক গ্লাস গরম দুধ আর এক প্লেট জলখাবার। জলখাবারের মধ্যে লুচি আর তরকারি আর দুটো শাঁখ সন্দেশ।’

‘কার জন্তে?’

‘আহা, এও বুঝতে পারছেন না? ছোট বউয়ের জন্তে। চাকরি করছে বউ, মাস-মাস টাকা এনে দেবে, খাওয়াবে না?’

‘ঠাকুরানী চাকুরানীকে খাওয়াচ্ছেন! এ চাকরি টিঁকলে হয়!’ বিদ্রূপে জলে উঠল বিজয়া: ‘আর এই যে বড় বউটা অস্ত্রখের থেকে উঠে এসে আবার লাগল সংসারে, তাকে কোনোদিন গ্লাসভর্তি দুধ খাইয়েছে, সন্দেশ খাইয়েছে?’

‘একটা প্যাড়া-গজাও খাওয়ানি।’ বন্দনা ফৌস করে উঠল।

‘এই একচোখোমি সহিবে না।’ বিজয়া গনগন করতে লাগল।

কিন্তু সহ না করে উপায় কী? দেশে ঠাকুরের খুড়ো মারা গেছে, এক মাসের ছুটি নিয়েছে ঠাকুর। অল্প সময়ের জন্তে বলে বদলি জোগাড় করতে পারে নি। স্বতরাং, তুমি বন্দনা, বাড়ির বড় বউ, তুমি হৈশেলে গিয়ে চোকো। অফিসের ভাত দাও। সে ভাত ছোট বউও খেয়ে যাবে।

‘তুমি রোগা মাতুষ, তুমি কেন রাঁধতে এসেছ?’ উল্লনের পাশ থেকে বন্দনাকে সরিয়ে দিল বিজয়া। বললে, ‘এক বউ উল্লনে পুড়বে আর এক বউ দিবি খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়াবে এ কে কবে শুনেছে?’

‘এটা কেমনধারা কথা হল?’ মৃণালিনী তর্জন করে উঠল: ‘তা হলে বলতে চাও অমন চাকরিটা ছোট বউ ছেড়ে দেবে? ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খাওয়াবার জন্তে হৈশেলে গিয়ে হাঁড়ি ঠেলবে?’

‘ওরে বাবা, তা কি বলতে পারি?’

‘তা যখন পারো না তখন ঠিক সময়ে ওকে দিতেই হবে আফিসের ভাত। নাও, সরো, তোমাদের কাউকে রাঁধতে হবে না। আমিই রাঁধব।’ মৃণালিনী বিজয়ার

হাত থেকে হাতাখুস্তি কেড়ে নিল সজোরে : ‘কী হিংসের কথা ! একটা গুণী মেয়ে নিজের জোরে দামী হয়ে উঠেছে তাই জলে যাচ্ছে সকলে ! ছি ছি !’

‘দামী বলে দামী !’ ফোড়ন দিল বিজয়া : ‘মাস-মাস ছ শো টাকা ।’

‘বছরে চব্বিশ শো !’ লেজুড় জুড়ল বন্দনা : ‘তারপর বছর বাদে যখন আবার দশ টাকা বাড়বে, তখন বারো ইনটু ছ শো দশ—সে আরো বেশি। তারপর পরের বছর—’

‘অঙ্ক করতে হলে নিজের ঘরে গিয়ে করো গে !’ যুগালিনী মুখিয়ে উঠল : ‘এতই যখন অঙ্কের তুমি বিদ্ববী তখন মেয়েটাকে তো একটু শেখাতে পারো। ঝন্টুটা তো অঙ্কে ফেল করেছে গুনলাম !’

‘ওমা, ঝন্টু আবার ফেল করল কবে !’ প্রায় শোকের কান্না তুলল বন্দনা ।

‘তবে সেই যে জয়ন্তী বললে !’

‘ওমা, সে তো নেচার স্টাডিতে কম পেয়েছে !’

‘বেশ তো, সেই নছার স্টাডিটাই পড়াও না গিয়ে মেয়েকে । কোথায় নিজেরা বড় হবে তা নয়, যে বড় হয়েছে তাকে নামিয়ে আনার চেষ্টা । যত সব হিংসের পুঁটলি !’ তারপর সময় হলে মধু চলে ডাকল কাকলিকে : ‘ছোট বউমা, থাকে এসো । তোমার ভাত বেড়েছি—’

দ্বিবি আগ বাড়িয়েই খেল কাকলি ।. নানারকম অভিযোগ অসুযোগ যে উঠেছে এখানে-ওখানে, সে তা গায়েই মাখছে না । মহৎ কাজ করতে গেলেই সমালোচনা জোটে । আর যারা ক্ষুদ্র তারা নিশ্চি ছাড়া আর কী করবে ?

আঁচাচ্ছে, ভূপেন জিজ্ঞেস করল, ‘পেট ভরল তো মা ?’

‘আফিস-টাইমের ষাওয়ায় আবার পেট ভরে !’ হেমেন বললে, ‘একটা কাঁটা চুষবার বা ডাঁটা চিবুবার সময় নেই । তা ক্যান্টিনে থেয়ে নিয়ো হেভি টিকিন—’

‘তোমাদের আফিসের শ্রালারি-পেমেন্ট কি উইকলি না ফোর্টনাইটলি ?’ এ জিজ্ঞাসা প্রশান্তর ।

সবাই একেবারে পঙক্তিতে টেনে নিয়েছে । নীরবে ঘুরে দাঁড়িয়ে অসুস্থতা করতে পাচ্ছে না, প্রত্যেকে দিতে হচ্ছে বা মর্যাদার ছাপ ! দলের স্বাক্ষর ।

‘সুত্তর-ভাতুরের আগেই চললেন !’ বললে বন্দনা ।

‘শান্তি পান সেজে হাতে গুঁজে দিচ্ছে ।’ বিজয়া টোট টিপে বললে ।

তধু তাই নয়, সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিল যুগালিনী । বললে, ‘সাবধানে খেও !’

‘আর যদি দেরি হয়, মিছে ভাববেন না—’ হাওয়াতে আঁচল ছুলিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি ।

সেদিনও কাকলির দেরি হল কিরতে।

‘আজও দেরি হল?’ স্বকান্ত জিজ্ঞেস করল।

প্রশ্নটাই যেন কেমন! দোষ-ধরা! কৈফিয়ত-চাওয়া! আজও কষ্ট হল কিরতে—
এমনি করে বলা যেত না? বাস-এর জন্তে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে—তুখু এটুকু
সহ্যাত্ত্বতি?

কাঁধ থেকে ব্যাগের ঝুঁপাটটা মুক্ত করতে করতে কাকলি বললে, ‘রোজ দেরি হবে।’

‘প্রত্যহ?’

‘প্রত্যহ। আমি তো হুম্মান নই যে ঝুলতে-ঝুলতে আসব? যতক্ষণ না সিট
পাব বুঝি, ততক্ষণ অপেক্ষা করি।’

‘চের মেয়ে তোমার আগে আসে।’

‘আমি অমনি ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে রড ধরে আসতে পারব না কখনো।’

‘তোমার জন্তে একেবারে ফাঁকা চাই, হাওয়া-চলাচলের রাস্তা চাই।’

‘হ্যাঁ, চাই। আর চাই এখন এ ঘর ছেড়ে চলে যাও। আমি খাটে হাত-পা
ছড়িয়ে একটু বিশ্রাম করি।’

‘আমার খাটে?’ অবাক হবার ভাব করল স্বকান্ত।

‘তুমি এ ঘর থেকে সরে গেলেই এ খাট আর তোমার খাট থাকবে না, যার-তার
খাট হয়ে যাবে।’ বেশ-বাসে হালকা হতে চাইল কাকলি। বললে, ‘এখন মেঝেতে
কিছু পাতবার আগ্রহ হচ্ছে না—’

‘তা আমি যাচ্ছি।’ স্বকান্ত ঘুরে দাঁড়াল: ‘কিন্তু এখন কি তোমার শোবার
সময়?’

‘শোবার সময় নয় মানে? আমি এখন হাত-পা টান করে বিশ্রাম করব না?’

‘কিন্তু, তুমি জানো, বাড়িতে ঠাকুর নেই।’

‘ঠাকুর নেই তো আমি কী করব?’ ঝিলকিয়ে উঠল কাকলি: ‘আমি রান্না
করতে ঢুকব?’

‘রান্না ঠিক না করলেও বউদিকে তো একটু সাহায্য করতে পারো।’

‘আমি হাল্কা হয়ে কিরে এসে এখন আবার সাহায্য করতে লাগব? লজ্জা করে
না বলতে? কেন, তোমার নিজের হস্ত-পদ নেই? তুমি যাও না, লাগো না সাহায্যে।’
স্বকান্তকে উপেক্ষা করেই খাটের দিকে এগুল কাকলি। বললে, ‘খুব মজা!
ভরোয়াল দিয়ে যুদ্ধও করবে আবার দাড়িও কামাবে।’

‘জানি, সেজন্তেই তো তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরো নি।’

‘সেজ্ঞে মানে !’

‘যাতে রান্না করতে না হয়—’

‘খুব বুঝেছ ! আর, বেশ, যদি সেই কারণই হয়ে থাকে তো দোষের কী ! ঘোড়দোড়ের ঘোড়া দিয়ে তুমি গাড়ি টানাবে ? বুদ্ধি খুব খুলছে মগজে । আরো অনেক কারণই খুঁজে পাবে ক্রমশ ।’ খাটের উপরই এলিয়ে পড়ল কাকলি । বললে, ‘তখনই বলেছিলাম বেশি ঘাঁটিও না, খেপিয়ে না আমাকে । সুখে-শান্তিতে থাকতে দাও ।’ চোখ বুজল কাকলি ।

কিন্তু শান্তি কি আছে ? শান্তি ডি আবার দুধ আর খাবার নিয়ে আসছে ।

‘আজ কী নিয়ে গেল গো ?’ নিচে রান্নাঘরে বিজয়া জিজ্ঞেস করল বন্দনাকে ।

‘আজ পরোটা আর ডিমের ডালনা ।’

‘তারপর রাত্রে আরেকবার হবে ।’

‘যে যাই কেননা রাঁধো, ডিম্বিবিউশন কর্তীর হাতে ।’ বন্দনা বললে, ‘মাছের বাটি ঠিক সাজাতে আসবে আর ল্যাজাটা ঠিক ছোট বউয়ের বাটিতে । আগে ছেলেকে খাওয়াত এখন বউকে খাওয়াচ্ছে ।’

‘ল্যাজা তো দেখছি দুখানা ।’ বিজয়া বললে ।

‘দ্বিতীয়খানা নিজে খাবে ।’

তু-জনে হাসতে লাগল একত্রে হয়ে ।

মৃণালিনীকে ঢুকতে দেখে উঠে বসল কাকলি । বললে, ‘ও এখন থাক, মা । একটু-বিশ্রাম করে নিয়ে গা ধুয়ে একেবারে নিচে গিয়ে খাব ।’

‘তাই খাবে । কিন্তু বলি শরীর খারাপ হয় নি তো ?’

‘না ।’ মুহূ হাসল কাকলি ।

‘মাথা ধরে নি তো ?’

‘না ।’

‘গা-হাত-পা ব্যথা হয় নি তো ?’

নাঃ, খাটে আর শোয়া গেল না । নেমে পড়ল কাকলি । বেশবাস বদলাতে উদ্যোগী হল । দুধ আর খাবারের প্লেট নিয়ে নিচে গেল মৃণালিনী ।

‘চাকর দিয়ে পাঠালে চলবে না, নিজে নিয়ে যাবে ।’ বললে বিজয়া ।

‘নিয়েও আসছে নিজে ।’ বন্দনা বললে, ‘এখন বসে থাকবে, যতক্ষণ না স্নান করে আসে । কাছে বসিয়ে খাওয়াবে ।’

সারাক্ষণই একটা কথা কানের কাছে বাজতে লাগল কাকলির । সাহায্য । কথাটা

যেন মন থেকে সরে গিয়েছিল, আবার ফিরে এল জীবন্ত হয়ে। কেন, বন্দনার
অস্থির সময় ও সাহায্য করে নি ? এখনও করছে না ? ওর আয়ে সাহায্য হবে
না সংসারের ? তোমার—পরমশুভ্র ?

আমাকে সাহায্য করে কে ?

চট করে মনে পড়ে গেল বরেনের কথা ।

মাহুকের জীবনে ছোটো জিনিসই তো আছে নিজের বিপদে সাহস আর পরের
বিপদে সাহায্য ।

ছপুর্বেলায়ই কোন তুলে নিল কাকলি ।

‘আমি কাকলি । কাকলি মিত্র ।’

• ‘আবার পদবী কেন ?’

‘বা, পদবীর জন্তেই তো সব ।’ কাকলি হাসি মিশিয়ে বললে, ‘সভ্যসমাজ
সম্মানের দুই পা । এক পা পদক আরেক পা পদবী ।’

‘কথা আপনি ভারি সুন্দর বলেন ।’

‘ভুখু কথা বলে লাভ কী ? চিঁড়েও ভেজে না । আসল হচ্ছে কাজ । আর
আপনি কাজ করেন সুন্দর ।’

‘কেন, কিছু করতে হবে ?’ মর্ম পর্যন্ত কর্ণ করে তুলল বরেন ।

কাকলি আর কথা বাড়াল না । বললে, ‘এখন আপনি ফ্রি আছেন ?’

‘আমি সব সময়েই ফ্রি ।’

‘এখন একবার আপনার ওখানে যেতে পারি ?’

‘আসবেন ? আসুন—’

‘সেই আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল—’

‘ই্যা, সেই কথা, নতুন কথা, যে কোনো কথা হোক—চলে আসুন ।’ নিজেরও
অজানতে উৎসাহ বোধ হয় একটু বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ল । গলায় ফের গম্ভ এনে
বরেন বললে, ‘গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?’

‘না ।’

‘কী করে আসবেন তবে ?’

‘হেঁটে । কতটুকুন বা রাস্তা । আর, কত ইটছি আজকাল ।’

হেঁটে আসা মানেই দেবি হুঙ্কার যাওয়া । যখন মন একবার বলেছে যাই, তখন যত
ক্ষমত বেরিয়ে পড়া যায় । হেঁটে আসা মানেই আরেকজনকে খাটিয়ে মারা । বসিয়ে
বলিয়ে খাটিয়ে মারা । অকারণে দারোয়ান-চাপরানিরও পায়ের শব্দে চমকিয়ে তোলা ।

হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দুপুরের বোদেই বেরিয়ে পড়ল কাকলি। দুপুরটাই ভালো। বিজিনেস-টক যখন, তখন আফিস-টাইমটাই প্রশস্ত। আফিস-টাইমের বাইরে হলে কেমন গল্প-গল্প গন্ধ এসে পড়ে। পিঠতোলা খাড়া চেয়ার না এসে কেমন ইঞ্জি-চেয়ার এসে যায়। কিছুতেই যেন কথায় প্রয়োজনীয় গাভীর্থ আনা যায় না।

সন্ধ্যার হওয়া নতুন একখানা উপস্থাসের মত এসে দাঁড়াল কাকলি।

বরেন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বললে, ‘বহন।’

বসলে নিজেও বসল। কী কথা বলে শোনবার জন্তে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাকলি একটু অস্বস্তি বোধ করছে বুঝি, কিন্তু এ অবস্থায় অস্ত্র দিকে মুখ করে থাকারও তো কোনো মানে হয় না। অস্ত্র দিকে মুখ করে থাকলে ভেবে নিতে পারে তাকে অগ্রাহ্য করছি। তার কথার কোনো মূল্য দেব না বলে আগে থেকেই আমি প্রস্তুত।

দ্বিধা কিসের, বলেই ফেলো না ঢৌক গিলে। জানি তো কী বলবে। নিজের চাকরি জোগাড় হয়েছে, এখন স্বামীর জন্তে একটি জোগাড় হয় কিনা তারই কিকির খুঁজছে। আছ বেশ। তোমার চাকরি হল, তোমার স্বামীর চাকরি হল, তোমরা দুটিতে স্নেহে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘর করলে—তার মধ্যে আমি কোথায়? আমার চাকরি কোথায়? আমার মাইনে কী!

‘যদি অপরাধ না নেন তো বলি—’ কাকলির গলার কাছটা কাঠ-কাঠ লাগল।

‘না, না, মেয়েদের আবার অপরাধ কী! পাগল, মাতাল, শিশু আর মেয়ে—পেনাল কোডে এদের কোনো অপরাধ নেই।’

‘সে কী কথা?’ কাকলি হকচকিয়ে উঠল: ‘কত মেয়ে কত অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছে—’

‘খাটুক। কিন্তু যেটা শ্রেষ্ঠতম অপরাধ, অ্যাডালটারি, সেটাতে মেয়েরা নির্দোষ, নিমুক্ত—আইনের বাইরে।’ হেসে উঠল বরেন, স্বপ্ন চোখে লক্ষ্য করল, কাকলির মুখটা অস্বাভাবিক উজ্জল হল না। তাই তাকে সাহস দেবার জন্তে বললে, ‘কথাটার জন্তে আপনিও যেন আমার অপরাধ নেনেন না। কিন্তু জিজ্ঞেস করছি, স্বপ্ন কি আর রিসার্চ করবে না? চাকরি করবে বলছে?’

‘না, না, আমি ওর কথা বলতে আসি নি।’ কাকলি উজ্জল হল।

‘তবে কার কথা বলতে এসেছেন?’ আশ্চর্য হয়েও হাতে পারছে না বরেন।

‘আপনার এখানে কাজ করে—ঐ যে দীপকর—দীপকরবাবু—তার কথা বলতে এসেছি।’

মুহূর্তে বরেন পাখর হয়ে গেল। একটা পেপারওয়াইট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। বললে, ‘কেন, তার কী হয়েছে?’

এতক্ষণ যখন লঘু ছিল, ভালো ছিল। কিন্তু এখন তার এ কী চেহারা!

তবু, হতাশ হবার এখুনি হয়েছে কী! শেষ পর্যন্ত দেখি।

‘তার ঘোর দারিদ্র্য। দেখে এসেছি নিজের চোখে।’ কাকলি বললে ঠাণ্ডা হয়ে।

‘দেখে এসেছেন? দীপঙ্কর নিয়ে গিয়েছিল বুঝি?’

‘হ্যাঁ—’নিজেই গিয়েছিল উত্তোষ করে, বলতে বাধল যেন কাকলির।

‘কী দেখলেন?’

‘দেখলাম নোংরা বস্তির মধ্যে রয়েছে। মাহুষের বসবাসের উপযুক্ত নয় এমন এক আবর্জনার কুণ্ডে। বাপ-মা, ভাই-বোন তো আছেই, তার উপরে ছেলেমেয়ে সমেত এক দিদি। বাপ অথর্ব আর দিদিটি বিধবা—’

‘তাতে আপনারই বা কী, আমারই বা কী!’ বরেন পেপারওয়াইটটা ধরল মুঠো করে।

গম্ভীর থাকবার কোনো মানে হয় না তাই হাসল কাকলি। বললে, ‘আমার কষ্ট, আপনার দয়া।’

‘কষ্ট করা সোজা, দয়া করা কঠিন।’

‘শীতে ছেলেপিলেগুলোর গায়ে জামা নেই, শোবার বিছানা নেই—’

‘তা আমাকে কী করতে হবে?’ প্রশ্নটা স্তব্ধমত হল না, বলেই বুঝতে পারল বরেন। মোলায়েম করল: ‘তা আমাকে কী করতে বলছেন?’

‘আমি বলছি না, ও বলছে।’

‘হ্যাঁ, তাই তো দেখছি—ও বলছে। কিন্তু কথাটা কী?’

‘কথাটা—চোখ নিচু করল কাকলি: ‘যদি ওর কিছু মাইনে বাড়িয়ে দেন। বাড়তি কাজ করছে নাকি, তারই জন্তে বাড়তি মাইনে।’

‘কত বাড়িয়ে দিতে হবে তা বলে দেয় নি?’

‘না।’

‘কিন্তু জিজ্ঞেস করি, দীপঙ্কর আপনার কে?’

ভয়ে ভয়ে চোখ তুলল কাকলি। ‘কেউ না।’

‘আর আমি?’

প্রশ্নের অস্বস্তিটা হাসি দিয়ে ধুয়ে দিতে চাইল কাকলি। বললে, ‘কেউ না।’

‘তা হলে না-তে না-তে কাটাকাটি হয়ে গেল।’ পেপারওয়েটটা ছেড়ে দিল
:৫ন।

‘না, না, কাটাকাটি নয়। আপনি আমার স্বামীর বন্ধু, ও-ও আমার স্বামীর বন্ধু।’

‘তা হলে বলতে চান সমান-সমান? আমি আর ও সমান আপনার কাছে?’
ভিমানীর মত মুখ করল বরেন।

হাপিয়ে উঠল কাকলি।

‘যদি সমান-সমানই হয় তা হলেও প্লাস-মাইনাস হয়ে শূন্যই হয়ে গেল।’

‘না, আপনি বেশি আমার কাছে।’ গলা এতটুকু কাঁপল না কাকলির।

‘আর ও যখন তদবির-করতে আপনাকেই পাঠিয়েছে তখন ও-ও নিশ্চয় ভেবেছে,
‘মারও কাছে আপনিই বেশি। শুধু ওর এ ভাবনাটা অগ্নায়। এ ইচ্ছিতটা
মুচি।’

মাটির টিপি হয়ে রইল কাকলি।

‘নইলে স্বকু, যে কমন ফ্রেণ্ড, তাকে না পাঠিয়ে আপনাকে পাঠায় কেন? তা
:৫ন কি বুঝব যে আপনি সত্যি করে ওরই লোক?’ পেপারওয়েটটা হাতের মুঠোয়
নয়ে ছেড়ে-ছেড়ে দিয়ে ধরতে লাগল বারে-বারে : ‘মানে, আমার মার্কেট থেকে কিছু
‘কা বেরিয়ে ওর পকেটে গিয়ে ঢুকলেই আপনি খুশি?’

‘বা, আপনি দাতা আর ও প্রার্থী।’ অনেকক্ষণ পরে কথা খুঁজে পেল কাকলি।

‘আমি লুপ্তিত আর ও দহ্য।’

আন্তে আন্তে উঠে পড়ল কাকলি। সনমস্কার বললে, ‘আচ্ছা যাই, অনেকক্ষণ
রেক্ত করলাম আপনাকে—’

‘শুধু একটা কথা বলি।’ মামুলি সরকারি কথার ধার দিয়েও গেল না বরেন।
নলে, ‘আঁকড়ে থাকুন। পরের জন্তে জায়গা ছেড়ে উঠতে গিয়েছেন কী, জায়গা
সকে গিয়েছে। পরকে সাহায্য করা অনেক সময় বিপদকে সাহায্য করা—’

‘মাচ্ছা আসি।’ সুইং-ডোরের কাছে এসে আরেকবার ফিরে তাকাল কাকলি।

‘যদি আপনার নিজের জন্তে হয়, স্বকুর জন্তে হয়, আসবেন। কে না কে এক
সাকার—’

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল কাকলি।

কলিং বেল টিপল বরেন। ‘হ্যাঁ, দীপঙ্করকে ডাকো।’

দীপঙ্কর নেই আফিসে।

সাত সাড়ে আটটা বেজে গেল, কাকলি এখনো বাড়িতে নেই।

ফিরতে-ফিরতে নটা। সেন্টু? সেন্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। তা হলে আর ভাবনা কী। এখন যে যাই বলুক, যে যাই জবাবদিহি চাক, কোথাও কাকলি ঠেকবে না, ভয় পাবে না।

‘এত দেরি হল?’ স্বকাস্ত কিনা অভিভাবকদের সর্দার, তাই সেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলে।

‘দিনেমায় গিয়েছিলাম।’ চটপট বললে কাকলি।

‘একা-একা?’

‘একা-একা কেউ যায়? কোনোদিন গিয়েছি?’

‘তবে? সঙ্গে কে ছিল?’

‘তাও শুনবে? আমার আফিস-পাড়ার কজন বন্ধু।’

‘বন্ধু?’

‘হ্যাঁ, মিত্র।’

‘কোন লিঙ্গ?’

‘ক্লাব লিঙ্গ।’

‘মানে?’ স্বকাস্ত প্রায় গর্জ্জ উঠল।

‘মিত্র শব্দ ক্লাবলিঙ্গ।’

নিশ্বাস ফেলে স্বকাস্ত বললে, ‘বাড়িতে একটা খবর পাঠাতে তো পারতে।’

‘কী করে পাঠাব? বাড়িতে টেলিফোন আছে?’

ছেলের বউয়ের খবর নিতে আসছে যুগালিনী—এখন আর জলখাবারে না গিঃ একেবারে ভাতে যাক—শুনতে পেয়েছে কথাটা। উৎফুল্ল হয়ে বললে, ‘হ্যাঁ, আফিসে এবার টেলিফোন বসবে—কী সুন্দর টেলিফোনের বাজনা! বেজে চলেছে হে বেজেই চলছে।’

‘বাড়ি হয়েও তো যেতে পারতে।’

‘কোন চুংথে? তুমিও মাঝখানে না এসে এমনি একেবারে সিনেমা দেখে ফেরে নি?’

‘আমি তো কতদিন রাত বারোটার সময়ও ফিরেছি।’

‘দরকার হলে আমিও ফিরব।’

‘যদি আমি একদিন রাতে একেবারেই না ফিরি?’

‘বেশি কথা কী, দরকার হলে আমিও সারা রাত বাইরে কাটাব।’

‘তা কাটাও না, আজ থেকেই শুরু করো না কাটাতে। নটা তো কখনই বেজেই

রাত পোয়াবার তা হলে আর বাকি কী। তবে আর ফিরলে কেন? একেবারে ভোর করে এলেই পারতে।’

‘ভোর হলেই বা ফিরব কেন? বাইরেতেই বিভোর হয়ে থাকব।’

‘তাই থাকো। ঘর খোঁজো।’ ঘর ছেড়ে চলে গেল স্বকান্ত।

সেদিন আফিস-ফেরত কাকলি চলে এল বিনতাদের হাট্টেলে।

‘বিনতা আছিল?’ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতেই হাঁকল কাকলি।

‘কে, কাকলি? আয় আয় আয়—’ চেউয়ের মত কাকলির উপর কাঁপিয়ে পড়ল বিনতা। সমস্ত গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে আলিঙ্গন করল। বললে, ‘তোকে ধরলে তোকে ছুঁলেও ব্রহ্মস্বাদের অহুভূতি হয়।’

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘ব্রহ্ম এখন নিরাকার হয়ে গিয়েছে।’

‘কাজলামো করিস নে।’ ভুরু বাঁকাল বিনতা।

‘সত্যি। সত্যি আমি ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি। তোর এখানে পাওয়া যাবে ঘর?’

‘কদিন বাদে আমার পাশের ঘরটাই খালি হবে। তখন তোকে গুটা পাইয়ে দেব। তারপর একদিন তোর গতিভর্তা প্রভুশাক্ষীকে নিয়ে আসবি ধরে। দরকার হলে মেয়ে শাক্ষিয়ে। আর আমি আমার বন্ধ-ঘরের দরজায় একটা ছেঁদা করে রাখব। সেই গর্ত দিয়ে উপোসী চোখে-দেখব তোদের খাসলীলা। খবরদার, আলো নেবাতে পারিনি নে।’

‘যদি ধরা পড়ি?’

‘হাত জোড় করে বলবি, আর করব না, স্ত্রার। ফাস্ট অফেন্স, স্ত্রার। টেকনিক্যাল অফেন্স, স্ত্রার। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দেবে।’

তুই বন্ধুনী হাসতে লাগল।

৩১

দীপঙ্করকে অফিস-ঘরেই ডেকে পাঠাল বরেন।

কোনো ভূমিকা না করেই মূখের উপর ছুঁড়ে মারল প্রশ্ন: ‘আপনি এটা কী ভেবেছেন?’

কাঠের গুড়ুলের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

‘আপনি মিসেস বোসকে দিয়ে ক্যানভাসিং করাচ্ছেন?’

‘কে মিসেস বোস ?’ যেন সাত হাত জলের তলা থেকে দীপঙ্কর বললে ।

‘স্বকাস্ত বোসের স্ত্রী । চেনেন না স্বকাস্তকে ?’

‘ও, হ্যাঁ, বুঝেছি—’ দীপঙ্কর চোঁক গিলল ।

‘বুঝেছেন ? তাকে দিয়ে তদবির করাবার মানে ?’

‘একে ঠিক তদবির বলে না—’

‘তবে কী বলে ?’

কী বলে ভাবটা ঠিক খুঁজে পাচ্ছে না দীপঙ্কর । বললে, ‘কাজ আন্দাজে আমরা মাইনেটা কম তাই সেটা কিছু বাড়িয়ে দেবার জন্তে আপনার কাছে আবেদন করেছিলাম । আজ নয় কাল বলে আপনি শুধু মূলতুবি রাখছিলেন । কিছুতে আপনার গা হচ্ছিল না । তাই, মিসেস বোসের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে দেখে তাঁকে বলেছিলাম আপনাকে অনুরোধ করতে—’

‘আমার সঙ্গে কত লোকেরই তো জানাশোনা’, প্রায় গর্জে উঠল বরেন : ‘কট, আর কাউকে তো পাঠান নি তদবিরে ।’

‘যাকে পাঠাব তার সঙ্গে আমারও তো একটু জানাশোনা থাকা দরকার । তা সেটা যতই ক্ষীণ হোক—’

‘আপনার বেলায় ক্ষীণ আর আমার বেলায় গাঢ় ? আপনি ভেবেছেন ভদ্রমহিলা বললেই আমি একেবারে গলে যাব ? উথলে পড়ব ?’ বরেন গমগম করে উঠল ।

‘কিছুই ভাবি নি স্তার—’

‘ভাবেন নি ? কিন্তু ইঙ্গিতটা স্পষ্ট । জঘন্য ।’

‘ইঙ্গিত ?’

‘শ্রীকৃষ্ণ সাজবেন না । এই বোঝাতে চেয়েছেন, আমার কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, চরিত্র নেই—একজন আগন্তুক ভদ্রমহিলা হেসে-কেশে একটা কিছু অনুরোধ করলেই আমি তেড়েফুঁড়ে তা পালন করব । আমি বুদ্ধির ঢেঁকি, অনুরোধের ঢেঁকি গিলতে আমার বাধবে না—’

‘অত তলিয়ে কিছু বুঝি নি ।’ দীপঙ্কর হাসফাঁস করে উঠল : ‘তলিয়ে যাচ্ছিলাম, হাতের কাছে একটা খড়কুটো পেয়ে ধরলাম আঁকড়ে ।’

‘আর ভাবলেন সেই খড়কুটোটা আমার কাছে কাঠ-বাঁশ হয়ে উঠবে । ভুল, আপনার ভুল হয়েছে । অত সহজে হেলে-পড়ার লোক নই আমি । হালকা-পলকা নই ।’

‘আমাকে মার্জনা করবেন ।’

‘হ্যা, যান। আপনাকে ওয়ার্মিং দিয়ে দিচ্ছি। ফার্নের সম্মুখের উপর ছায়া পড়ে এমন কোনো কাজে হাত দেবেন না, আভাসে-ইশারায়ও না।’ চলে যাচ্ছিল দীপঙ্কর, ডাকল বরেন। বললে, ‘শুভুন। আপনার মাইনে বাড়বে না।’

‘বাড়বে না?’

‘না। বাড়বার কোনো সংগত কারণ নেই।’

‘নেই?’

‘না। শত তদবিরি সম্বন্ধে না।’

যদি এখন, এই মুহূর্তে, মুখের উপর চাকরিটা ছেড়ে দিতে পারত দীপঙ্কর! নিষ্ঠুরতার মুখে ছুঁড়ে মারতে পারত একতাল বিদ্রোহের কাদা!

দুর্বলের মত চলে যাচ্ছে, দীপঙ্করকে আবার ডাকল বরেন: ‘শুভুন, যদি তদ্রূপে শুক্রভাবে কাজ করতে চান তো থাকুন, নইলে অগ্রজ পথ দেখুন! সেখানে যান যেখানে ইউনিয়ন আছে, ষ্ট্রাইক আছে, ময়দান আছে। দাবি মানাবার ঝাণ্ডা আছে। এখানে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, মজুরি উপরে আর্জি। এখানে বিশেষ স্ববিধে নেই, না তদবিরি, না জবরদস্তিতে। স্মরণ—’

বাড়ি এসে মন ভার করে বসেছে দীপঙ্কর। ওর মন আবার ভালো থাকে কবে? ওই তো ওর মুখের স্বাভাবিক রঙ। দুর্গাবালা সাহস করে বসল পাশ বেঁধে। বললে, ‘তোমার তো এইবার মাইনে বাড়বে শুনি—’

না শুনে উপায় কী। আশার কথা না শুনে মানুষ সাঁচবে কী করে, কী করে তাকাবে সামনে? আশা পূর্ণ হলেও আবার আশা করবে, কেবলই আশা করবে। আকাশে সূর্য থাকলেও চাইবে আরেক স্বপ্নের সূর্য। কিছুতেই আশার শেষ হবে না। কেবল বেড়েই চলবে। দাবি বাড়বে, মাইনেও বাড়বে। মাইনে বাড়লে আবার দাবিও চড়বে। সব সময়ে এক পৃষ্ঠায় বসে শুনে আরেক পৃষ্ঠার গুঞ্জন।

দীপঙ্কর চুপ করে থাকবে এ আর নতুন কথা কী।

‘যদি বাড়তি কিছু পাস এবার, তিনখানা শাড়ি কিনিস।’

‘তিনখানা?’ বলে ফেলল দীপঙ্কর।

‘অন্তত দুখানা তো বটেই। একখানা তোমার দিদির, আরেকখানা আভার।’

‘আর তৃতীয় ব্যক্তিটি যে তুমি তা না বললেও বুঝছি। কিন্তু মা, মাইনে বাড়বে না।’

‘বাড়বে না?’

‘না। বলে দিয়েছে মনিব।’

‘যতই বলুক, ঠিক বাড়বে দেখিস। কাকলি বলেছে চেষ্টা করবে, মূনিবের সঙ্গে ওর চেনা আছে।’ দুর্গাবালা তবুও দড়ি ছাড়বে না, ঝড়ের মধ্যেই আলো জ্বালাবে : ‘আর ও মেয়ে অসাধ্যকে সূশাধ্য করার মেয়ে—’

‘ধামো।’ ধমকে উঠল দীপঙ্কর : ‘কাকলি চেষ্টা করেছিল, আর সে চেষ্টা নিফল হয়েছে।’

হাল তবুও ধরে থাকবে দুর্গাবালা : ‘এক চেষ্টায় হয় নি, আরেক চেষ্টা করবে। চেষ্টার কি শেষ আছে? এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খুলবে। চালাক মেয়ে, ও ঠিক আদায় করে দেবে দেখিস।’

‘না, দেবে না। বাড়বে না মাইনে।’ উঠে পড়ল দীপঙ্কর। বললে, ‘হেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরতে হবে।’

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে কাকলি সকাল-সকাল বাড়ি ফিরেছে। প্রথমেই গেল মৃণালিনীর কাছে। বললে, ‘মা, মাইনে পেয়েছি।’

‘আঁ! কই, দেখি।’ মুখ ঢেকে খবরের কাগজ পড়ছিল—ধড়মড় করে উঠে বসল মৃণালিনী।

এ কী! কাকলির হাতে তিনটে চৌকো কাগজের বাস্ক!

‘মাইনের টাকায় তিনখানা শাড়ি কিনলাম মা।’ নিচু খাটে মৃণালিনীর পাশে গিয়ে বসল কাকলি। বড় বাস্কটা খুলে বলল, ‘এ কড়িয়ালখানা আপনার জন্তে, আর এ দুখানা কাজিভরম—কাকিমা আর দিদির জন্তে। কি, ভালো নয়?’ বলে প্রণাম করল হেঁট হয়ে।

আনন্দে চলচল মুখে শাড়িগুলি দেখতে লাগল মৃণালিনী। সন্দেহ কি, তার শাড়িটাই অভিজাত। তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, ‘মাইনে কত পেলে?’

‘ভাঙা মাস তো, তাই পুরো পাই নি।’ পাশ কাটাতে চাইল কাকলি।

‘তবু খোক কত এল হাতে?’ মৃণালিনী লোলুপ চোখে তাকাল।

‘তা একুশ দিনের মাইনে—’

‘কত?’

‘বলবার মতন তেমন কিছু নয়।’

‘শাড়ি তিনখানির দাম কত হল?’

‘গায়ে টিকিট আঁটা নেই?’ স্পষ্ট হিসেবের মধ্যে আসতে চাইল না কাকলি : ‘দাম তো ভারি হাতেই নিয়েছে। কি, ঠকেছি বলে মনে হয়? বেশ দামী বলে মনে হচ্ছে না?’

জমিগুলি আবার পরীক্ষা করল মৃণালিনী। বললে, ‘এত দামী কেনবার কী হয়েছিল? হাতে তো তা হলে বিশেষ কিছুই রইল না।’

‘তা আছে কিছু।’

‘কত?’ মনে-মনে আরেকবার হাত বাড়াল মৃণালিনী।

‘সামান্যই। তা দিয়ে আবার অন্য কেনাকাটা আছে।’ কাক্সিভরম দুখানা নিয়ে বেরিয়ে গেল কাকলি।

বিজয়ার ঘরে ঢুকে বিজয়াকে প্রণাম করলে।

‘আমার প্রথম মাইনের প্রণামী।’ হাসি-মুখে বললে কাকলি, ‘কোনটা আপনার পছন্দ?’

‘আমাকে দেবার কী হয়েছিল!’ চোখটা অন্য দিকে করল বিজয়া।

‘সে আমি বুঝব। এখন দেখুন কোনটা দেব?’

‘দুটোই তো রঙিন। রঙিন পরবার কি ব্যেস আছে?’ দৃষ্টিটা তবু সরল করল বিজয়া।

‘রঙ কি ব্যেসে? রঙ মনে। তবু দুটোর মধ্যে এটাই বেশ ‘সোবার’ মনে হচ্ছে। এটা দিই।’ কোলের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালাল কাকলি।

‘আর, দিদিভাই, এটা তোমার।’

‘এই ঝলমলে শাড়ি দিয়ে আমি কী করব?’

‘পরবে।’

‘পরে, যখন ঠাকুর থাকবে না, তখন রান্নাঘরে বসে হাঁড়ি ঠেলবে। বলা, শেষ করে যাও কথাটা—’

কাকলি পালাল নিজের ঘরে। স্বকাস্ত মজুত নেই, এ এক এখন শাস্তি। ফাঁকা পাওয়া কখনো-কখনো ঢাকা পাবার মতই মোলায়েম।

প্রথমে শামিল হল বন্দনা-বিজয়া।

‘বড় গাছেই কাছি বেঁধেছে।’ বিজয়া টিপ্তনীর কাটল : ‘মহারানীকে খোল-বিচালি দিয়ে আমাদের বেলায় শুধু ঘাস-জল। দিবি তো সমান করে দে। সাম্যবাদের যুগ এখন—’

‘আপনি এক কাজ করবেন। নেমস্তন্ন-বাড়িতে পরে যাবে বলে সেদিন আপনার সেই মূর্খিদাবাদীটা নিয়ে যেমন আর ফেরত দিল না, আলমারিতে পুরল, আপনিও তেমন এক বেলা পরবেন বলে নিয়ে বেমালুম বাস্তে ভরবেন।’ শান্তিপুর পক্ষপাতীকে অসন্তোষে ছিল, তাই সহজেই বলতে পারল বন্দনা : ‘তা হলেই জব্ব হবে।’

‘আমাদের লাগবে না।’ বললে বিজয়া, ‘যে গরলডাকিনী বউ এসেছে সেট পারবে জন্ম করতে।’

পরে শামিল হল মৃণালিনী-বন্দনা।

‘তোমাকে বুঝি ঝলমলেটা দিয়েছে?’ মৃণালিনী যাচাই করতে এল।

‘কী করি! কাকিমা একেবারে খাবা বসিয়ে কেড়ে নিলেন ভালোখানা।’ বললে বন্দনা।

‘তুমি নিলে কেন? বললেই পারতে, আমি ছেলেপুলের মা, গম্ভীর রঙের থানাই আমাকে দাও। আর উনি হাত-পা-ঝাড়া একলা মাহুধ, বুড়ি হয়েও ছুঁড়ি-ছুঁড়ি করছেন, উনিই নিন ঝলমলেটা—’

‘আমি ওটা পরব না। পদা তৈরি করব।’

‘দিবি তো আপনজনদের দে, ডিরেক্ট লাইনদের।’ বললে মৃণালিনী, ‘কাকিমাকে দেওয়া কেন?’

শেষে শামিল হল মৃণালিনী-বিজয়া।

‘কী কটা টাকা পেয়েছে, আদেখলার মত তছনছ শুরু করে দিয়েছে।’ মৃণালিনী নিভৃত হল বিজয়াকে নিয়ে : ‘প্রথমেই একেবারে তিনখানা শাড়ি কেন? সেরা দুই গুরুজন, দুই শাশুড়িকেই প্রথমে দিলে হত। বড় বউমাকে গোড়াতেই দেওয়া কেন?’

‘ঠিক কথা।’ দিবিয়া মায় দিল বিজয়া : ‘বড় বউমাকে দিতে হলে বাসস্তীকেও দিতে হয়। ওরা এক পর্যায়।’

‘আর আমার বাসস্তীর কী কষ্ট!’

‘পোশাকি একটাও শাড়ি নেই হয়তো।’

‘পোশাকি! আস্ত একখানা আছে কিনা তাই বা ঠিক কী! যদি সত্যিকার কাক দুঃখ দূর করা যায় তা হলে টাকা রোজগারের মানে হয়, নইলে উপর-উপর শু শু বাবুয়ানার জন্তে চাকরি—ছি ছি!’

স্বকান্ত যখন বাড়ি ঢুকছে, প্রথমেই, নিচে বিজয়ার সঙ্গে দেখা।

• ‘ছোট বউমা তোমার জন্তে কী আনল?’ জিজ্ঞেস করল বিজয়া।

‘তার মানে?’ দাঁড়িয়ে পড়ল স্বকান্ত।

‘প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে সে যে মোজ্জব বসিয়েছে। আমাদের তিন অচাকরানীর জন্তে শাড়ি এনেছে তিনখানা। তোমার জন্তে—’

‘আমার জন্তে হয়তো দিল্লীর সিংহাসন।’

ঘরস্থ হবার আগেই ডাকল ষ্ণালিনী । বারান্দার নিরালায় নিয়ে গিয়ে নালিশ জানাতে বসল ।

‘ছোট বউমা কত মাইনে পেল জানতেই পেলাম না ।’ বললে ষ্ণালিনী, ‘জিজ্ঞেস করলাম, উত্তরও দিল না ।’

‘উত্তরও দিল না ?’

‘না । তিন-তিনটে ফ্যাশনের শাড়ি কিনে এনেছে—কত দাম তাও বললে না ।’

‘কী বললে ?’

‘বলবেই না কিছু, তা, কী বললে !’ ভেঙে উঠল ষ্ণালিনী : ‘তারপর নগদ কত টাকা হাতে আছে সে সম্বন্ধেও একেবারে চুপ । টাকা নিয়ে যদি ইচ্ছেমত চিনিমিনি খেলে, কেউ শাসন করবার না থাকে, তা হলে চাকরি তো নয়, অনর্থ । মাসারেরই যদি সুরাহা না হয় তা হলে আর লাভ কী । কত সাধ ছিল বউয়ের প্রথম মাসের মাইনে থেকে আমার ঘরে একটা রেডিও বসবে । তা নয়, যত সব আজোবাজে জিনিস । শুধু শাড়ি পরালেই তো হল না, ধোয়াবার খরচ দেবে কে ? তখন—যখন শাড়ি ময়লা হবে ? যখন নেমস্তন্ন-বাড়ির মাংসের ঝোলের দাগ লাগবে ? আসলের সঙ্গে দেখা নেই, স্বদের পরিপাটি !’

বিজয়ার ঘরের রেডিওতে কাঁটা ঘোরাবার স্বাধীনতা নেই ষ্ণালিনীর । তার কত দিনের সাধ, সে ঘরে-বারান্দায় কাজে-অকাজে ঘুবে বেড়াবে আর রেডিও বাজবে অবিশ্রান্ত । ঢালাও একটা গোলমাল চলবে একটানা । কখনো বা দুই ঘরে সমস্বরে । ঘরে-ঘরে ফ্যানের মত রেডিও থাকবে এটাই তো বড়লোকির লক্ষণ । একজনের কাঁটায় আরেকজন কণ্টক হবে না । তোমার কাঁটা যদি সিনেমার গানে, আমারটা কিস্তনে ।

তা অধিকারই দিল না, আয়ত্তি তো দূরের কথা । কবলের মধ্যে না আনলে খাবল মারি কী করে ? সমস্ত টাকাটাই যদি বউ নিজের আঁচলে বাঁধে তবে ষ্ণালিনী তো ফক্কা । মুখ ঘোলা করে বসে রইল ষ্ণালিনী । শুধু অক্ষুটে একবার বললে, ‘অত বাড় ভালো নয় ।’

ঘরে গিয়ে আলো জালতেই খাটের উপর কিলবিল করে উঠল কাকলি । এক দণ্ড নিরিবিলি থাকবার জো নেই, চাঞ্চল্যের বুঝি এই বস্তুবা ।

‘খুব নাকি দানখয়রাত শুরু করে দিয়েছ ?’ জিজ্ঞেস করল স্ফাস্ত ।

‘আপত্তি কী ! অত্রাঙ্কণে তো দিই নি ।’ উঠে বসল কাকলি, অহুকম্পার স্বরে বললে, ‘তোমার জন্তে কিছু আনি নি বলে বলছ ? বেশ তো, বলো না কী লাগবে ?’

ব্লেন্ড এক প্যাকেট ? শেভিং ষ্টিক ? শ্রাম্পু ? না কি'—চোখে এবার মরণকামড় হানল : 'না কি বেডহুইচটা অকেজো হয়ে গেছে সেটা সানিয়ে দিতে বলব ?'

'খুব টাকা হয়েছে তোমার ?'

'টাকা হলেই দানখয়রাত করা যায় না, কিঞ্চিং হৃদয়ও হওয়া দরকার।'

'আর কিঞ্চিং অহংকার।'

'নিশ্চয়ই। কিছু ব্যক্তিবোধ। সেই অর্থে অহংকারই তো অলংকার। টাকা শুধু রোজগার করা নয়, টাকা ব্যয় করার অধিকার। আর অধিকারের মানেই স্বাধীনতা। অহংকারের আর দোষ কী !'

আমতা-আমতা করে স্বকাস্ত বললে, 'টাকাটা মার হাতেই দিলে পারতে।'

'কোন আইনে ?' বললে উঠল কাকলি।

'সব আইনই লেখা থাকে না। মার হাতে দিলেই শোভন হত।'

'তুমি ছেলে, তুমি দাও গে। তুমি শোভন ছেড়ে স্বশোভন হও। আমি দিতে যাব কেন ?'

'তা হলে তুমি চাও না তোমার টাকায় সংসারের কিছু স্বরাহা হোক ?'

'চাইলেও, সেটা একান্তই আমার ডিসক্রিশান। স্বরাহাটা কী এবং কতটুকু তা আমি বুঝব, তোমরা নয়। পাঠাটা যখন আমার তখন আমি বুঝব কোন দিকে কাটব বা আদৌ কাটব কিনা। তোমরা সাজেশান দিতে পারো কিন্তু আমি তা মানতে বাধ্য নই।' ঘুরে দাঁড়াল কাকলি : 'এই যে তিনখানা শাড়ি কিনে দিলাম এটা সংসারের সাশ্রয় নয় ? তারপর তোমাকে যদি সাবান ব্লেন্ড তেল-শ্রাম্পু কিনে দিই, এক দিক থেকে সেটাও তো উপশম সংসারের—'

'মার কত দিনের শখ নিজস্ব একটা রেডিও হয়।' পরিত্যক্ত খাটে শুতে গেল স্বকাস্ত।

'রেডিও ? সেটা ঐ বড় ঘরে বসবে যে ঘরে জয়ন্তী আর স্ববীর পড়ে ? তাদের কত যে পড়ার সময় গ্রাস করে নেবে রেডিও তার হিসেব করো ? ছেলেমেয়েদের যে লেখাপড়া হচ্ছে না তার মূলে বাপ-মায়ের অসাবধানতা বা ঐ বিলাসপ্রিয়তা। আজকাল বাপ-মারা কী পরিমাণ সিনেমা দেখছে আর তার আলোচনায় প্রভাব জোগাচ্ছে, একবার নেবে তার স্ট্যাটিষ্টিকস ? ঘরের বাইরে যে পাপ চিত্ররূপে আছে সে পাপ আর শব্দরূপে ঘরে এনো না।'

'থাক। তোমাকে আর বক্তৃতা মারতে হবে না।'

‘এক শো বার হবে। শেয়ালকে কাঁকুড়ের খেত দেখিয়েছ, এখন লাঠি ঝুটালে চলবে কেন?’

‘না চলুক। শোনো।’ একটু বা আপোসের ভঙ্গি করল স্বকান্ত : বললে, ‘বাকি কত টাকা আছে তোমার হাতে?’

‘মাই থাক, হিসেব দিতে পারব না।’

‘হিসেব কে চাইছে? সংসারে যখন আছ, তখন মার হাতে বাকি টাকাটা দিয়ে দাও।’

এক মুহূর্ত থামল কাকলি। বললে, ‘সংসারে আছি মানে, পেয়িং গেস্ট হয়ে নেই, তোমার স্ত্রী হয়ে আছি। তাই সে টাকা, তুমি সক্ষম স্বামী, তুমি দেবে। আমার টাকা আমার। বাকি টাকাটা মার হাতে দিলেই আমার আর স্বাধীনতা থাকবে না। আমার কত এখনো দানখয়রাত বাকি।’

‘তোমার অত দানখয়রাত করবার কী হয়েছে?’ ধমকে উঠল স্বকান্ত।

‘বলেছি না, ও বুঝতে হলে হৃদয় দরকার। তোমার ও বস্তু কোথায়? তোমার তো গলার পরেই পেট। গেলা আর ভরার মধ্যে সামান্য ব্যবধানও তুমি রাখতে চাও না। তোমার খালি টাকা আর মায়ের ব্যাঙ্কে রাখা। শোনো, তোমার মাকে বোলো’, ঘর ছেড়ে যাবার উজোগ করল কাকলি : ‘পরে যখন আমার আরো মাইনে হবে, তখন তাঁকে না হয় দেব কিছু সেলামি।’

‘আরো মাইনে হবে মানে?’

‘বা, আমার আর মাইনে বাড়বে না? চাকরিতে উন্নতি হবে না আমার?’ এক পা ফিরল কাকলি।

‘এর পর আবার উন্নতিও আছে নাকি?’

‘এক শো বার আছে। শেয়াল শুধু কাঁকুড় খেতেই থাকবে? আখ খেতে চুকবে না? নিশ্চয়ই চুকবে যদি সে সত্যি শেয়াল হয়। উন্নতি করবার যতরকম কারণ-প্রকরণ আছে সব সে অবলম্বন করবে। চাকরি মানেই উন্নতি।’

‘কিন্তু করণ-প্রকরণটা কী?’ শুই-শুই করেও থেমে গেল স্বকান্ত।

‘ক্ষেত্র বুঝে বিধান। এ তো এক প্রবন্ধ লিখে সারা জীবনের জন্তে ডক্টর হওয়া নয়। এখানে অনেক প্রবন্ধ, অনেক কার্কেয়ার।’

‘এত শিগগিরই কার্কেয়ার দেখাবে!’ একটু যেন বা হল ফোটাল স্বকান্ত।

‘সেইটেই তো এফিসিয়েন্সির প্রমাণ। যে নাচতে জানে তার পাক দিতেও জানা উচিত। এ তো তোমারই কথা। স্তবরাং—’ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাকলি।

শুয়ে পড়ল হৃকাস্ত ।

কদিন পরে কতগুলি জামা নিয়ে কাকলি চলে এল দীপঙ্করের বস্তিতে ।

‘বয়েস ধরে আন্দাজে কিনে এনেছি মা । কার কোনটা লাগে কে জানে ।’ একটা মোড়া এসেছে, তাতে বসল কাকলি ।

ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল । একে আস্ত জামা, তায় নতুন, তায় আবার রঙদার ।

দুর্গাবালা সামলাবার চেষ্টা করল । ঠেলেঠেলে শিশুগুলোকে সরিয়ে দিয়ে বললে, ‘চুপচাপ দাঁড়াও সকলে ঠিক হয়ে । উনি যাকে যেটা দেন সেটা সে নেবে । ঝগড়া করতে পারবে না ।’

‘জামা এনেছে ! এবার জামা এনেছে !’ ছেলেমেয়েগুলো বলতে লাগল শোল্লাসে ।

‘এত সব আনবার কী দরকার ছিল ?’ ওপার থেকে কে বলে উঠল করুণ-কণ্ঠে ।

‘এ কি ? আপনি ?’ কাকলি ব্যস্ত হয়ে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর শুয়ে আছে তক্তাপোশে : ‘কী হয়েছে আপনার ?’

‘কিছু নয় । সামান্য একটু জ্বর আর মাথাধরা ।’ বললে দীপঙ্কর, ‘মাথার আর কাজ নেই, আমার জন্তে মাথাব্যথা !’

‘আফিস গিয়েছিলেন ?’

‘না গিয়ে উপায় আছে ? সকাল-সকাল যে আসতে পেরেছি এই ভাগ্যি ।’

‘কালও যাবেন জ্বর নিয়ে ?’

‘কাল জ্বর থাকবে না আশা করি । আর যদি থাকেও—’

‘না, না, কদিন ছুটি নিন । আপনাকে সতাই খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে ।’

‘ও কিছু নয় । তা ছাড়া, বরেন ছুটি দেবে না । সেদিনের পর থেকে ও আমার উপর ভীষণ চটে আছে । পারলে হাতে মাথা কাটে ।’

‘কোন দিনের পর থেকে ?’

‘যেদিন আমার হয়ে ওকে বলেছিলেন আপনি । সেই আমার মাইনে বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ।’

‘বা, সে তো আমি বলেছিলাম । চটলে আমার উপর চটবে ।’

‘না, ও ঠিক বুঝেছে আমিই পাঠিয়েছিলাম আপনাকে । আমার সেটা ঠিক হয় নি, অন্তায় হয়েছিল । ও ভেবেছে আমি ক্যানভাসিং করছি, আপনাকে পাঠিয়ে ইনস্পেকশন করতে চেয়েছি ওকে । মাইনে যে বাড়ল না সেটা লাগছে না, কিন্তু আমার জন্তে আপনাকে অপমানিত হতে হল সেইটেই অসহ্য ।’

‘না, না, অপমান কী!’ বলমল করে উঠল কাকলি : ‘একবার চেষ্টা করেছিলাম, হয় নি। আবার চেষ্টা করে দেখব হয় কিনা। চেষ্টায় বিফল হওয়াকেই অপমানিত হওয়া বলে না। যার যত লড়াই তারই তত বড়াই। কি, ঠিক নয়?’

খুলিতে ছাপিয়ে পড়ল দুর্গাবালা। বললে, ‘আমি ঠিক জানি কাকলি বুদ্ধিমতী মেয়ে, পরের দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে, ও ঠিক আদায় করতে পারবে। এক দরজা বন্ধ হয় তো আরেক দরজা খোলা পাবে। ওকে আটকায় এমন কার সাধ্য?’

‘না, না, আর চেষ্টা করতে হবে না।’ তপ্তকণ্ঠে নিষেধ করে উঠল দীপঙ্কর : ‘আর দরজা খুলিয়ে কাজ নেই। যে চাকরিটুকু আছে সেটুকুই থাকুক টায়েটুয়ে। আর যেন না বিপন্ন হই।’

‘তা হলে আমিই দেখছি আপনার বিপদের কারণ।’ নত না হয়ে দৃঢ় হল কাকলি : ‘তা হলে বিপদ আমাকেই কাটিয়ে দিতে হবে। আর বিপদ যদি নাও কাটে, আমরা সংগ্রামী মানুষ, আমরা কেন ভয় পাব?’

মুচের মত না মুন্সের মত তাকিয়ে রইল দীপঙ্কর।

শিশুগুলির মধ্যে জামা বণ্টন করে, আবার অজ্ঞতর জিনিস আনবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

‘হ্যালো—’ রিসিভারটা তুলে নিল বরেন।

‘আমি কা—’

‘বলতে হবে না। আপনি ‘কা তব কাঙ্ক্ষা’র কা। তার মানে, আপনি কেউ নন, কারুরই কেউ নন।’

একটু কি বেশি বলে ফেলল বরেন? তা কী করা যাবে! কথার পিঠে কথা পেলে সেই স্লোগানই বা ছাড়ে কে! কিন্তু ওদিক বুঝি পিঠ দেখাল।

না, বলেছে কথা।

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আদিম পরিচয়ই আসল পরিচয়।’

‘তাই তো বিজ্ঞাপনে বলে আদিম ও অকৃত্রিম।’

বিজ্ঞাপনে কী বলে শুনবেন না, আমাকে শুনুন।’

‘শুধু শুনব? দেখব না?’

‘হ্যাঁ, দেখবেন। আফিসের পর যাচ্ছি আপনার কাছে। একটা কাজ আছে।’

‘আজ আর শুধু কথা নয়। আজ কাজ। চলে আসুন।’

সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এল কাকলি। উদ্ভাসিত, উচ্চারিত চেহারা। চোখে

গাঢ় করে স্বর্ষা, ঠোঁটে পাতলা করে রঙ। পরনের শাড়ির ফিকে নীল পাড়ের সঙ্গে।
গায়ের ব্লাউজের সংগতি করা, হয়তো বা জুতোর স্ট্র্যাপের সঙ্গে।

‘আপনার উন্নতি কে আটকাই।’ বরেন অভিবাধন করল।

লজ্জিত-লজ্জিত মুখ করল কাকলি। বললে, ‘সাজসজ্জার উন্নতি দেখে বলছেন?’

‘নিশ্চয়ই। ঐ তো উন্নতির প্রথম সিঁড়ি।’ বরেন উঠে দাঁড়াল : ‘এ তো সরকারি চাকরি নয় যে ব্লাউজের প্যাটার্ন ঠিক করে দেবে, বা হুকুম জারি করবে যে এক চিলতেও পেট দেখানো চলবে না। এ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফার্ম। এখানে যত উড়বেন তত উঠবেন।’

‘কী আর করি! যেমন কলি তেমনি চলি। যেমন দেশ তেমনি বেশ।’

‘এক শো বার ঠিক।’

‘আর চাকরি করতে আসাই মানে উন্নতি করতে আসা। কী বলেন, ঠিক নয়?’

‘হাজার বার ঠিক।’ একটু নড়ল-চড়ল বরেন : ‘তারপর কাজটা কী?’

‘বিশেষ কিছুই নয়। আপনার যদি অস্ববিধে না হয়, আপনার গাড়িতে একটা লিফ্ট দিন আমাকে--’

‘বেশ তো, চলুন। আমিও বেরোচ্ছি।’ কদরূর যাবেন?’

‘কদরূর আবার! বাড়ি পর্যন্ত।’

ড্রাইভার স্টার্ট দিল। পিছনের সিটে পাশাপাশি কাকলি আর বরেন।

বিশেষ কিছুই নয়? ভীষণ বিশেষ। অভাবনীয়েরও বেশি। নিজের থেকেই এসেছে। সেজেগুজে এসেছে। মোটরে বসেছে। বসেছে পাশ ঘেঁষে।

আশ্চর্যের দেশে আছে কত আলাদিনের লণ্ঠন!

চুপচাপ কাটছে রাস্তাটা।

বাড়ির কিছুটা আগেই থামতে বলল কাকলি।

‘সে কি, একেবারে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই।’ একটু বুঝি চঞ্চল হল বরেন।

‘দরকার নেই। কে কী দেখে ফেলে তার ঠিক কী!’

‘কে মানে, স্বকান্ত?’

‘তা ছাড়া আর কে। বচনে উদার, প্রত্যক্ষে হয়তো বিপরীত।’ নিখুঁত নেনে পড়ল কাকলি : ‘নমস্কার। এমন কিন্তু মাঝে মাঝে বিরক্ত করব আপনাকে।’

সত্যিই বিরক্ত করা। আড়ষ্ট অসাড় করে রাখা। এক পাত দৃঢ় ইচ্ছাত ছাড়া আর কিছু নয় কাকলি। রেখা নেই, স্পন্দন নেই, ক্ষুরণ নেই।
ঠালা এক তুপ গুদালীজ্ঞ।

সেদিন আবার গাড়ি ধামিয়ে রেষ্টরায় কফি খেয়ে নিল কাকলি।

একেই বুঝি বলে বোকা বানিয়ে কাজ বাগাবার কন্দি। দিব্যি বিনা পয়সায়
বিনা ঝামেলায় বাড়ি ফেরার বন্দোবস্ত।

তা কেন হবে? অক্লেশে বাড়ি ফেরাই যদি উদ্দেশ্য হত তা হলে আফিসেরই
কোনো এক শাঁশালো বাবুর গাড়িতেই সোয়ারি হতে পারতাম। মনে-মনে হাসে
কাকলি। এ একরকমের তদবির। কথা কয়ে অহুরোধ করেছিলাম বলে চটেছিল,
এখন দেখি কথা না কয়ে অহুরোধ করা যায় কিনা। বাড়ে কিনা দীপঙ্করের
মাইনে।

‘কি, আমার এখন পরিচয় কী?’ গাড়ি থেকে নেমে কাকলি বললে, ‘আপনার
বন্ধুর স্ত্রী, না আপনার শুধু-বন্ধু?’

‘শুধু-বন্ধু।’

‘হ্যাঁ, শুধু-বন্ধু।’ হাসতে হাসতে চলে গেল কাকলি। বলে গেল, ‘শুধু-বন্ধুরই
জোর বেশি। তার অহুরোধ আপনি আর ফেলতে পারবেন না।’

দাঁড়ান, আস্তে-আস্তে। মনে মনে দীপঙ্করকে লক্ষ্য করলে। প্রায় সাজিয়েছি।
এবার কিস্তি পড়বে।

হ্যাঁ, আস্তে-আস্তে। প্রতীক্ষার মত রোমাঞ্চ নেই। প্রাপ্তির চেয়েও প্রতীক্ষা
সুন্দর। দেখি না কী ঘটে। কী রটে! কী হয়ে দাঁড়ায়!

তুমিও প্রতীক্ষা করো। অন্তত এক রাত্রি। স্বকাস্তের দিকে চেয়ে মনে-মনে
বললে কাকলি। ভাবছ, আনি নি। তোমার জন্তেও এনেছি।

পরের মাসের মাইনে পেয়ে চারখানা ধুতি কিনল কাকলি। ভূপেনকে, হেমেনকে,
প্রশান্তকে একখানা করে দিয়ে প্রণাম করল।

‘ঠাকুরপোকে দিলে না?’ জিজ্ঞাসা করল বন্দনা।

‘কী, বস্ত্র?’ সে তো কবেই একবার দিয়েছি—আর কেন?’ কাকলি হাসতে
নাগল।

সকাল বেলায় বললে, ‘ভেবেছিলাম তোমার জন্তে স্ফাটের কাপড় আনব। পরে
ভাবলাম তোমার তো ওসবে অভ্যাস নেই, তাই প্লেন ধুতি এনেছি। এই নাও।’
স্বকাস্ত হাত বাড়িয়ে নিল না বলে তার সামনের টেবিলের উপর রাখল কাকলি।

স্বগলুকে হঠাৎ চিৎকার করে ডাকতে লাগল স্বকাস্ত: ‘কি রে, ঘর মুছেছিস?
বেলা হয়ে গেল, শিগগির আয় জল নিয়ে।’

বালতি-ভর্তি জল নিয়ে চলে এল স্বগলু। বললে, ‘গ্লাকড়া নিয়ে আদি।’

‘লাগবে না ঝাকড়া। এটা দিয়ে ঘর মোছ।’ কাপড়খানা বালতির জলে চুবিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মেঝের উপর : ‘নে মোছ ভালো করে।’

কাকলির চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্রুত পায়ে। কাম্মার দেওয়া নতুন কেনা রেল-লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন চালাচ্ছিল সেন্টু, স্বকাস্ত একটা লাথি ঘের ছত্রখান করে দিল।

‘এটা কী হল?’ জিজ্ঞেস করল সেন্টু।

অপ্রস্তুত হল স্বকাস্ত। বললে, ‘দেখি নি—না দেখে হয়েছে।’

‘তা তো বুঝলাম। কিন্তু এটা হল কী?’

‘কলিশন।’

‘এটা মোটেই কলিশন নয়। এটা ভূমিকম্প।’

৩২

নীল কাগজে আঁকা একটা নকশা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল হেমন, বিজয়া জিজ্ঞেস করল, ‘কী এটা?’

‘বাড়িওলা ছাদের উপর নতুন একখানা ঘর তুলে দিতে রাজি হয়েছে।’ হেমন নকশার উপরে চোখ রেখে বললে, ‘সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথরুম।’

‘কী মজা!’ উছলে উঠল বিজয়া : ‘নতুন ঘরটায় আমরা উঠে যাব। আর নিচের এ ঘরটায় ড্রয়িং রুম হবে।’

কথাটায় বাস্তব রূপ দেবার জন্তে শামিল হল মৃণালিনী। জিজ্ঞেস করল, ‘কার খরচে উঠবে নতুন ঘর?’

‘বাড়িওলা অপশান দিয়েছে। আমরা নিজের খরচেও তুলতে পারি, সে ক্ষেত্রে এ বাড়ি ছেড়ে দেবার সময় ও ঘর তার হয়ে যাবে। কিংবা বাড়িওলা নিজেও তুলে দিতে পারে, সে ক্ষেত্রে বাড়তি ভাড়া গুনতে হবে মাস-মাস।’

‘কত ভাড়া?’

‘তা এখনো ঠিক হয় নি। প্রশ্ন হচ্ছে কোন বিকল্পটা গ্রহণীয়।’ মুখচোখ চিন্তিত করল হেমন।

‘বা, এর আর ভাবাবি কী! নিজেরাই খরচ করে তুলে ফেলা উচিত।’

ফলক করে উঠল বিজয়া : ‘মাস-মাস বাড়তি ভাড়া টানার যন্ত্রণা কেন ? কবে
টুচ্ছদ করবে, কবে বা আমরা স্বেচ্ছায় ছেড়ে যাব তা ধূসর ভবিষ্যৎ—’

ঐ ব্যবস্থা হলেই তো হয়েছে। চোখে আঁধার দেখল মৃণালিনী। নিজেদের
দুকেট থেকে খরচ দিতে হলে একমাত্র দিতে পারবে হেমন। সেই ক্ষেত্রে ঐ ঘর
হেমন, তার মানে বিজয়া দাবি করে বসবে। আমরা গাঁটের টাকা খরচ করে ঘর
চুলেছি, এ ঘর আমাদের। এমন যুক্তিকে সহজে ঠেকানো যাবে না। বাড়িওয়ার
ধবচে হওয়াই ভালো। না হয় দেওয়া যাবে কিছু বেশি ভাড়া। সেটা এজমালি
সংসারের থেকেই দেওয়া হবে। টেনান্সি যখন ভূপেনের নামে তখন ঐ নতুন ঘরেও
চলবে তার মালিকানা। এবং সে স্ত্রে সে ঘর ধরতে পারবে প্রশান্ত।

‘আমি বলি কি, নতুন ঘর যদি হয় তা হলে তা মাসিক ভাড়ার মধ্যেই নিয়ে আসা
উচিত।’ মৃণালিনী বললে, ‘পরের বাড়িতে কে যাবে গুচ্ছের খরচ করতে ?’

‘আমিও তাই বলি।’ বিজয়ার প্রতিবাদপ্রথর নীরব কটাক্ষ উপেক্ষা করে
হেমন বললে; ‘নতুন ঘরের জন্তে বাড়তি ভাড়া আর কতই বা হবে। ~~দিশ-ত্রিশ~~—
পঞ্চাশ ? যাই হোক, যতই হোক, ছোট বউমা তা দিতে পারবে অনায়াসে। স্বতরাং
ঐ নতুন ঘর স্বকাস্তর হবে—’

বোমার মত ফেটে পড়ল মৃণালিনী : ‘ককখনো না। ঐ ঘরে প্রশান্ত থাকবে।
ছেলেপিলেওলা সংসার, বউমা কণ্ঠ, ওরই একথানা বড় ঘরের দরকার। তা ছাড়া
এ বাড়ির বড় ছেলে।’

‘কিন্তু প্রশান্ত মাস-মাস দিতে পারবে ভাড়া ?’ হেমন তাকাল ভয়ে-ভয়ে।

‘প্রশান্ত দেবে কেন আলাদা করে ? সে ভাড়া এজমালি সংসার দেবে। ভাড়া
বেশি হয়, এজমালি টাকায় না কুলোয়, তোমরা তোমাদের ‘কোটা’ বাড়িয়ে দেবে।
মার ঐ চাকুরে বউকেও বাধ্য করবে চান্দা দিতে।’

‘চান্দা পাবে না অথচ চান্দা দিয়ে মরবে !’ হাসল হেমন : নিজে থাকবে তাপসা
ঘর আর টাকা দেবে অন্তকে ভালো ঘরে বাহাল করতে, এটা রীতি নয়।’

‘নয় ? তবে কোনটা রীতি ?’ প্রায় কোমর বাঁধল মৃণালিনী : ‘চাকরি করে
মাইনে আনবে অথচ তা দেবে না সংসারে ?’

‘কোন সংসার ?’ প্রায় দার্শনিক হতে চাইল হেমন।

‘কোন সংসার মানে ? যে সংসার আত্মকূল্য করে তাকে চাকরি করতে দিচ্ছে
সেই সংসার।’

‘কী বলে ছোট বউমা ?’

‘কিছুই বলে না। মুখটা আগুনের খাপরা করে রেখেছে, বলবে কী।’

‘না, না, বলে।’ বিজয়া মুণালিনীর পক্ষে এসে দাঁড়াল : ‘বলে, বলুন হে স্ত্রীবীরের জন্তে একটা মাস্টার রাখি, কিংবা ছেলেমেয়েদের মাইনেটা আমি দিই, কিন্ত ইলেকট্রিকের বিল, কিংবা সেন্টুকে ইঙ্কুলে ভর্তি করে দিয়ে তার সমস্ত খরচটাই আমি টানি। মানে খুচরো কিছু খরচের ভার সে নিতে পারে দয়া করে—’

‘চালাক মেয়ে—নাম কেনবার ফিকির!’ মুণালিনী বিজয়ার পাশ ঘেঁষে দাঁড়ান : ‘আইটেমের উপর খরচ করতে চায়। এমনি খোক টাকা দিলে এজমালিতে মিশে যাবে, তাতে তো নাম লেখা থাকবে না, তাই তাতে সায় নেই। এমনি ঘুঘু নয়, বাঘ ঘুঘু। বলে বেড়াবে, ইলেকট্রিকের বিল আমি দিচ্ছি, স্ত্রীবীর ভালো রেজাল্ট কবেছে আমি মাস্টার রেখে দিয়েছিলাম বলে, আর সেন্টু-বন্টুকে কি ইংরেজি ইঙ্কুলে পড়ানোর পরত ওর বাপ-মা? আমি ছিলাম বলে রক্ষে। বুঝলে না, চাল মারবার না কিন মারবার গোসাই। কেন, সবাই যার-মা কোটা দিচ্ছে, তুইও দিয়ে দে একমুঠ আমি কর্ত্রী, আমি যা গায়া বুঝব খরচ করব। সংসারকে মাজাব-গোছাব।’

‘তা একটা টাকা ধরে চাইলেই পারে। সরাসরি।’ সমান শব্দের বিরুদ্ধে তুই ছেলেমান পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে চোখ ভরে তাই দেখতে-দেখতে হেমন বললে।

‘কোন লজ্জায়? ওগো বউ, টাকা দাও, ইলেকট্রিকের বিল দিতে পাচ্ছি না। ওগো বউ, টাকা দাও, মাসকাবারের মুটে এসেছে। ওগো বউ, টাকা দাও, গাডি এসেছে কয়লার, গয়লা ফর্দ এনেছে দু মাসের। আমি হাত পাততে যাব কেন? ও নিজের কাণ্ডজ্ঞান নেই? ও এ বাড়িতে থাকে না? খায় না?’

‘বা, থাকে-থায় তো, সে দায়িত্ব তার স্বামীর। স্বকান্তর।’ হেমন বললে।

‘আরে তাকে যে চাকরি করবার জন্তে এত সবাই সুবিধে করে দিচ্ছি তার জন্য সংসারকে সে ট্যাঙ্ক দেবে না?’ এবার বিজয়া মুখিয়ে উঠল : ‘দিদি যে এত করে তবু আফিসের ভাত তৈরি করে দিচ্ছে, আফিস ফেরত পর্বতপ্রমাণ জলখাবার, তার কোন বিবেচনা নেই?’

‘তার মানে,’ হেমন হাসল, ‘চাকুরে বউয়েদের জন্তে ছুটো। ইনকাম ট্যাঙ্ক। এক সরকারকে, আরেকটা শান্তিডিকে!’

‘কেন নয়?’ বললে মুণালিনী : ‘যখন ঠাকুর ছিল না তখন শান্তিডি স্বামী ক’? নি? রেহাই দেয় নি বউকে? চাকর-বাকর কটা কাজ করে? খুঁটিনাটি কাজের কি অস্ত থাকে সংসারে? সেসব কাজে বউয়ের আর ডাক কই? তাকে ছুটি দেয় নি সংসার? তবে সংসারকেই বা সে ট্যাঙ্কো দেবে না কেন?’

‘এক ধোবার হিসেব মেলাতেই এক ছপুৰ।’ বললে বিজয়া : ‘ও তো ছোট
পুয়ের প্রতিষ্ঠা ছিল। তা উনি চাকরি করতে গেছেন আর বড় বউমা তা নিয়ে
হিমসিম খাচ্ছে। ওকে চাকরিতে পাঠিয়েই তো বড় বউমার এই কষ্ট—’

‘তা ছাড়া টাইমে-বেটাইমে কত অতিথি-বিতিথি সংসারে। ঝামেলা কিছু পোহাতে
হয় ছোট বউকে?’

‘সংসার থেকে যে সময় সে নিয়ে নিচ্ছে তার ক্ষতি সে পূরণ করবে না টাকা
দিয়ে?’ বিজ্ঞানের কথা বললে বিজয়া।

আর মৃণালিনী অর্থশাস্ত্র আওড়াল : ‘যে শ্রম তার করণীয় ছিল, তা আমরা,
সংসারের আর সকলে ভাগ করে নিচ্ছি। তার জন্তে সংসারকে দেবে না সে
পারিশ্রমিক?’

‘জানেন সেদিন জয়ন্তীকে কী বলছিল কাকলি?’ আরো একটু অন্তরঙ্গ হল
বিজয়া।

‘কী বলছিল?’

‘বলছিল, ঐ তো সামান্য কটা টাকা, বাতাসার মত হরির লুট দিই আর কী!
সচায় নেই, সম্বল নেই, বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, গায়ে গয়না নেই,
স্বাক্ষে-বাক্ষে টাকা নেই, আর স্বামী—স্বামীর ঐ তো মুরোদ—এখন এ অবস্থায়
একটি পয়সাও নষ্ট করতে পারব না।’

‘সংসারকে দেওয়া মানে নষ্ট করা!’

‘বলছে, যত পারি জমাব তিল-তিল করে। মেয়েছেলের কখন কী বিপদ ঘটে
ঠিক নেই আর বিপদের দিনে বন্ধু একমাত্র টাকা।’

‘কী ছোটমন স্বার্থপর মেয়ে!’ রি-রি করে উঠল মৃণালিনী।

‘ঐ রকম একটা শুমোট ছোট ঘরে থাকতে হলে মন খোলসা হয় কী করে?’
হেমন উঠে পড়ল : ‘ছাদে নতুন ঘর উঠলে এটে ওকে দাও, দেখবে সব ঠিক হয়ে
গেছে—’

‘ছাদে কেন, মাঠে থাক না। মাঠেই তো বেশি ফাঁকা, বেশি খোলসা—’ ঘরের
বাইরে এসে দাঁড়াল মৃণালিনী।

দাঁড়িয়েই ধাক্কা খেল। দেখল দরজার পাশে দেয়ালে ভূপেন কান পেতে আছে।

‘এ কী, তুমি এখানে, এ অবস্থায়?’

মুখ কাঁচুমাচু করে ভূপেন বললে, ‘আমার তো কিছু বলবার অধিকার নেই, তাই
কেবল শুনে যাচ্ছি।’

‘তোমার বলবার কী-ই বা আছে!’

‘বলতে গেলেই দাবড়ি খাচ্ছি। তাই কিছু বলছি না। শুধু শুনিছি। গোচর। অগোচরে শুনিছি। দেখছি আমার মনের কথাটি কেউ বলে কি না।’

‘ধাক। তোমার মনের কথা তো, কাউকে কিছু বলতে যেও না, যে যার খুশি চরে বেড়াক। এ জড়ভরতের মন নিয়ে সংসার করা চলে না। চোখের সামনে অন্ডায়-অনাচার হবে অথচ চোখ বুজে থাকব, এ অসম্ভব। তুমি যাও—এক্ষণে যাও—’

‘যাচ্ছি। যাচ্ছি।’ পায়ের চটিজুতো নিয়ে শশব্যস্ত হল ভূপেন।

‘বাড়িগুলার কাছে যাও। আমার মনের কথা গিয়ে সেখানে বাস্তব করো। বল। যেন তার নিজের খরচেই সে ঘর তোলে। যা জায়া ভাড়া হয় তা আমরা দেব। আমরা দেব মানে, তুমি দেবে। আর সে ঘরে প্রশান্ত থাকবে।’

হেমেনের কাছে নীরব চোখে আশ্রয় চাইল ভূপেন।

হেমেন বললে, আচ্ছা, ‘আমি দেখছি—’

দরজা খোলসা হতেই বিজয়া ডুকরে উঠল : ‘ছাদের ঘরে তুমি তুলছ ছোট বউকে আর দিদি তুলছে বড় বউকে— আর আমি, আমি এ বাড়ির বউ নই, কেউ নই আমি—’

‘তুমি হচ্ছে নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধু স্তন্দরী রূপসী—’

‘কেউ নই, আমি কেউ নই।’ দু হাতে মুখ ঢাকল বিজয়া।

‘তুমি পাগল না আর কিছু!’ খাটের দিকে এগোল হেমেন : ‘বাড়িগুলার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নিজের খরচে ভাড়াটের জন্তে ঘর তুলে দেবে। যদি অল্পমতি দেয়, আমরা, ভাড়াটেরাই তুলে নেব। সে ক্ষেত্রে, বলছি তোমাকে, আমিই আত্মভাল করব সমস্ত টাকা। তা হলে সে ঘরে তোমারই অগ্রাধিকার হবে। তখন সে ঘরে তুমি নিজে থাকো বা তোমার মনের মত লোককে থাকতে দাও সে তোমার এক্টিয়ার—’

‘মনে থাকে যেন।’ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল বিজয়া।

কিন্তু কাকলির স্বস্তির নিশ্বাসটুকু চলে গেল যখন সন্ধ্যার শেষে আফিস-ফেরত তাকে সুবীর বললে, ‘কে একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—’

আমার সঙ্গে! চমকে উঠল কাকলি। কে—কে হতে পারে? দীপঙ্কর? কী আর তার বক্তব্য থাকতে পারে? তবে সমূহ কোনো বিপদে পড়েছে? বন্ধুর বাড়িতে এসে বন্ধুকে না খুঁজে তার স্ত্রীকে খোঁজা? বন্ধুর স্ত্রীকেই যদি তার দরকার তবে খোদ

বন্ধুর বাড়িতে কেন ? কাকলির আফিস কি তার অজানা ? না হয় টেলিফোন ?

তবে কি বরেন ? তার এমন কাঁচা মাথা ? যেখানে কাকলিই যায় আগ বাড়িয়ে দেখানে তার কেন ব্যগ্র হওয়া ? তবে কি দীপকরের মাইনে বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে ? এত অল্পেই রাজি হয়েছে ? রাজি হয়েছে তো বাড়ি বয়ে এসে খবর দেবার কী দরকার ? কী নগদ লাভ তাতে বরেনের ?

না, বরেনও নয় ।

‘কেমন দেখতে লোকটাকে ?’

‘স্ববিধে নয় ।’ এক কথায় সারতে চাইল স্তবীর । কিন্তু তাতে ছোট বউদিরও অগ্রবিধে ঘটাল মনে করে একটু বিস্মৃত হল : ‘ময়লা শার্ট আর ফুল প্যান্ট পরনে, চুনগুলি উল্লুখুঙ্ক, পায়ে জুতো আছে কি নেই লক্ষ্য করি নি—’

কে এই কিস্ত ? তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল কাকলি ।

সদরের কাছে, বাইরে ঝাপসা-ঝাপসা হলেও চিনতে এক পলক দেরি হল না ।

‘এই যে কাকলি । কেমন আছিস ?’ দেবনাথ এগুল এক পা ।

প্রথম প্রশ্নটা কী করবে কাকলি ভেবে ঠিক করতে পারল না । ঠাণ্ডা কী মনে করে ? নিজে এসেছ, না কেউ পাঠিয়ে দিয়েছে ? কেমন আছ সকলে ? বাবা-মা ? শ্রীমতি-দেবল ?

একটা অকারণ কান্না গলার কাছে দলা পাকাতে লাগল ।

‘তোর সঙ্গে খুব একটা জরুরি কথা আছে ।’ কোথায় কথাটা বলা যায় চারদিকে হস্ত চোখে তাকাতে লাগল দেবনাথ ।

মন্দ কি । বাড়ির মধ্যে নিজের ঘরেই নিয়ে যাই । স্বকাস্ত এখনো ফেরে নি, আজকাল কাকলিকে অনেক সময় দিয়ে বেশ দেরি করেই ঘরে আসে । ফাঁকা খাটে পা ছড়িয়ে বসে বিশ্রাম করতে পারবে । যেন অনেক পথ হেঁটেছে, অনেক রাত্রি ঘুমোয় নি । একটা খিদে-পাওয়া শুকনো চেহারা । মন্দ কি যদি ভগলুকে দিয়ে কিছু খাবার আনানো যায় ।

‘এসো না, ভেতরে এসো—’ ঘরে নিয়ে এল কাকলি । বললে, ‘বোসো ।’

‘শোন, বলব না । যে কাজের জন্তে আসা তোর কাছে । আমাকে দু শো-টা টাকা দে ।’

‘টাকা ?’ কাকলি পাখর হয়ে গেল ।

হ্যাঁ, সর্বত্র জানাজানি হয়ে গেছে তুই চাকরি করছিল আর তা বেশ ভালো মাইনের চাকরি । দু শো টাকা তোর কাছে কিছুই নয় । যার ভবিষ্যৎ আছে, তার

আবার টাকার জন্তে ভাবনা। বেশ যদি দু শো না পারিস, অন্তত এক শো দে। আড় রাত্রের মধ্যে যদি এক শো টাকা না পাই, তা হলে কাল সকালেই হাতকড়া পরব দেখিস। খবরের কাগজে বেরুবে অপযশ। সইতে পারবি নে। বাবার সেকেন্ড স্টোক হয়ে গিয়েছে, খবর পড়ে আরেকবার পড়বেন।

সেকেন্ড স্টোক হয়ে গিয়েছে! কেমন আছেন এখন? ভালো নয়। ডান হাতটা খসে গিয়েছে। পেনসনের পেমেণ্ট অর্ডার বা ব্যাঙ্কের চেক কিছুই সই করতে পারছেন না। টাকার সমুখ খুব টানটানি যাচ্ছে। নিত্য আর কত ধার চলবে? কেউ এমন নেই যে, টাকার একটা বিলি-ব্যবস্থা করে! আমাকে তো দেখছিসই, আর তুই, তোরা তো বিভাডিত।

‘এই অনটনের সময় এক শো-টা টাকা তুমি নষ্ট করবে? বাবার বোধ হয় ভালো চিকিৎসা-পথ্যও চলছে না—’

তা হয়তো মিথো নয়। কিন্তু আমাকে টাকাটা নষ্ট করতে না দিলে শেষ পর্যন্ত বাবার প্রাণটুকুই না নষ্ট হয়। তুই বোন, তোকে বলতে পারব না, কিন্তু মৃত্যুর ভুলে যে অপরাধ করে ফেলেছি, খেমারত না দিলে তার থেকে আর ত্রাণ নেই। বেশি দেরি করিস নে। ওরা না আবার এর মধ্যে থানায় গিয়ে এতেল দেয়।

‘তোমার মাথার অস্থি এখন কেমন আছে?’

‘ভালো আছে। দেখছিস না কেমন সুস্থ ও সংলগ্নভাবে কথা কইছি।’

কিন্তু মনে হচ্ছে টাকার জন্তে যে গল্প ফেঁদেছ সেটা সত্যি নয়। গল্প যদি ফাঁদতেই পারি, তবে প্রমাণ হচ্ছে, মাথা সুস্থ আছে। যদি তাই থাকে, সুস্থ মাথায় মিথো সাজাব কেন? গল্প মিথো হলেও টাকার দরকারটা মিথো নয়। আর কোনোদিন চাইব না। খুব বিপদে না পড়লে চাইতাম না তোর কাছে। আমাকে টাকা দেওয়া মানেই হয়তো জলে ফেলা, কিন্তু ও টাকা জলে না ফেললে ডুবে মরব, ডাঙা পাব না।

‘দিচ্ছি। আরেকটু বোসো। তোমাকে চা এনে দি। তারপর মায়ের কথা শুনি।’

‘মায়ের কথা আরেকদিন শুনিস। এখন টাকাটা দে—’

একটা এটাচি কেস কিনেছে কাকলি। সেটা খুলে ভাঁজ-করা দশটা দশ টাকার নোট দিয়ে দিল দেবনাথকে।

দেবনাথ তত্বনি বেরিয়ে গেল। কি ভাবল, যেতে-যেতে, সিঁড়ির কাছে একটু থামল। ক্ষত আঙুলে শুনে নিল সত্যি টাকাটা এক শো কিনা।

বাক্স বন্ধ করে গুছিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাইরে এল কাকলি। দেবনাথকে আর ধরতে পেল না। পিছনে অনুশ্রিয়মাণ একটা ছায়া অনুভব করে সে একবার শুধু বলল, ‘আবার আসব’, তারপর মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

‘তোমার আফিসের কেউ বুঝি?’ মৃণালিনী কাছেই ছিল, তেরছা চোখে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

এ আবার কিরকম প্রশ্ন! কাকলি চূপ করে রইল।

‘আফিসের লোকের সঙ্গে তো আফিসেই দেখা হচ্ছে। তা আবার বাড়িতে কেন?’ আরো কী যেন বলতে চাচ্ছিল মৃণালিনী, প্রশ্নুট হল না।

‘ও আমার দাদা!’ বললে কাকলি।

‘আজকাল তো হাটে-বাজারে দাদার ছড়াছড়ি। বলি কোন ধরনের দাদা?’

গা জলে যাচ্ছিল কাকলির, তবু বললে সংযতস্বরে, ‘মায়ের পেটের ভাই।’

‘মায়ের পেটের ভাই!’ হাঁ করল মৃণালিনী : ‘তা এরকম চোহারা?’

চূপ করে রইল কাকলি।

‘টলছিল মনে হচ্ছিল। ঠিক করে পা ফেলতে পারছিল না সিঁড়িতে—’

চোখ তুলে তাকাল কাকলি : ‘দাদার শরীরটা ভালো নয়।’

‘কী নিয়ে গেল?’

‘টাকা।’

‘টাকা!’ যেন শক্তিশেলে টঙ্কার পড়ল : ‘কত নিল?’

এও আবার জিজ্ঞাস্য নাকি? দোনামনা করতে লাগল কাকলি।

‘বলি, দিলে কত?’

‘এক শো।’

‘অ্যাক শো! এত টাকা হঠাৎ দরকার পড়ল দাদার?’

‘বাবার খুব অসুখ।’

‘তা তোমার বাবার কি টাকার অভাব হয়েছে? ব্যাঙ্কেই তো তার কত টাকা। তুমিই তো দশ হাজার টাকা তাকে দান করে এলে। আবার সে টাকা চায় কোন মুখে?’

‘স্ট্রোক হয়ে পড়ে গিয়েছেন। ডান হাত অবশ হয়ে গিয়েছে।’ কণ্ঠস্বর ভিজে এল কাকলির : ‘চেক সই করতে পারছেন না।’

‘তা হলে যদি সই করতে না পারেন মাস-মাস এমনি পাঠাবে নাকি বাপের বাড়ি?’

‘কি করে বলি!’ কাকলি পাশ কাটাতে চাইল।

‘কি করে বলি মানে? তুমি চাকরি করছ তোমার বাপের বাড়ির জন্তে?’

কষ্টে একটু হাসবার চেষ্টা করল কাকলি। বললে, ‘ছেলেরা যে চাকরি করে কার জন্তে? তার বাপের বাড়ির জন্তেই করে। শ্বশুরবাড়ির জন্তে নয়। মেয়েদের বেলায় অল্প নিয়ম হবে কেন? স্বাধীন ভারতে তারতম্যকরণ চলবে না। মেয়েরাও তাই বাপের বাড়িরই করবে, শ্বশুরবাড়ির নয়।’

‘ছেলে আর মেয়ে এক কথা হল?’ খিঁচিয়ে উঠল মৃণালিনী: ‘ছেলে রোজগার করে তার বাপের বাড়িতে থেকে আর মেয়ে, তুমি—তুমি রোজগার করছ তোমার শ্বশুরবাড়িতে থেকে। যেখানে থেকে রোজগার, সে সংসারেরই অধিকার সে রোজগারে।’

‘থাকার কথাটা অবাস্তব। আপনার ছেলে যদি আজ আলাদা ক্ল্যাট নিয়ে থাকত তা হলেও তার টাকাটা বাপের বাড়িই দাবি করত। ছেলের টাকা যদি তার বাপ-মা নিতে পারে মেয়ের টাকাই বা তার বাপ-মা নিতে পারবে না কেন?’

‘তোমার বাপ-মা তো তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—’

গলার কাছে একটা দলা উঠেছিল, সেটা গিলে ফেলল কাকলি। বললে, ‘কিন্তু রক্তের সম্পর্ক কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়?’

‘তোমার বাপ-মায়ের যদি জেদ থাকে, তুমি তাদের মেয়ে, তোমারই বা জেদ থাকবে না কেন?’

কাকলি মুছ রেখায় হাসল। বললে, ‘কিন্তু শত হলেও, বাপ-মা যদি ছুরবস্থায় পড়ে তা হলে মেয়ে তাদের সাহায্য করবে না?’

‘তোমার বাপ-মায়ের এমন কিছু ছুরবস্থা হয় নি।’

‘তেমনি আমার শ্বশুরবাড়িরও তেমন কিছু অভাব নেই।’

‘নেই? তুমি যদি চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকো তার কী করব? ঘরেঘরে দোরে-জানলায় পর্দা নেই, খাবার জায়গায় ক্যান নেই, নিজস্ব একটা আমার রেডিও হল না। অল্পরোধের আসরটা শুনতে পাই না, উকিলের বাড়ি একটা টেলিফোন নেই, আজকাল সভায়-সমিতিতে কাউকে ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে চাল করে কোন-নম্বর বলে, আমার আর সে ভাগা হল না, ঠিকানা বলে বলে মুখ বাথা হয়ে গেল। চতুর্দিকে আত্মীয়স্বজনের কত ফোন আর আমার সেই আদ্যিকালের গ্রামোফোন! তারপর একটা রেকর্ডিংয়েরটার কেনার শখ—তারপর মোটর গাড়ি—সে তো চ্যাটায়ে-শোয়া স্বপ্ন।’

পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যেতে চাইল কাকলি।

বাড়ি কিরিয়ে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে, ‘তা হলে তুমি পরের জন্তে, বাপের বাড়ির জন্তে চাকরি করছ?’

খামল কাকলি। বললে, ‘রাগ করবেন না, আমি চাকরি করতে চাই নি, আপনারাই আমাকে উদ্ব্যস্ত করে-করে চাকরি করতে পাঠিয়েছেন। আমি আগেই বুঝেছিলাম চাকরি থেকে আনা মানে খাল কেটে কুমির থেকে আনা। আমি চাই নি খাল কাটতে। আপনারা—’

‘তাই বলে তুমি মাইনের টাকা তছনছ করবে? টাকা এ সংসারে থাকবে না, যাবে অদানে-অব্রাহ্মণে?’

‘চাকরি আমার। মাইনেটাও আমার।’ আরো দু’সিঁড়ি উঠে গিয়েছিল, আবার খামল কাকলি। বললে, ‘তাই আমি বুঝব টাকাটা কোথায় থাকবে বা কোথায় যাবে। থাকলেই বা কতটা থাকবে, গেলেই বা কতটা যাবে। উড়িয়ে পুড়িয়ে দেব, না দান থররাত করব তারও বুঝ আমার আর আমার টাকার।’

‘তাই যদি হয়, তা হলে এ চাকরি তুমি ছেড়ে দাও, বউমা। তোমাকে আর করতে হবে না চাকরি।’

‘তা আর হয় না।’ বাকি সিঁড়িগুলি পেরিয়ে গেল কাকলি।

‘আর যদি করতেই হয়, এ বাড়িতে বসে হবে না। বাড়ির বাইরে গিয়ে করো।’

এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল কাকলি। বলল, ‘তা দেখা যাবে।’

বাড়িতে পুরুষেরা ফিরলে তুমুল করল মৃণালিনী! মাইনের টাকা, ঘরের টাকা কিনা বাপের বাড়ি পাচার করে দিচ্ছে। বাপের বাড়ির জন্তেই নাকি চাকরি করা। গাপের হাত না সারা পর্যন্ত মাস-মাস নাকি অমনি পাচার করবে।

‘অসহ্য!’ হেমন বললে, ‘আমারই বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া। এ প্রিপশচারাস!’

‘আমি বলে দিয়েছি চাকরি ছেড়ে দাও। করতে হবে না চাকরি। ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসে মেশো।’

‘অ্যাবসার্ড। সেই ছাগলের পালের সঙ্গে মাল্লুষ হচ্ছিল বাঘের বাচ্চা, ঘাস খেত আর ভ্যা-ভ্যা করত—যেই একদিন মাংস খেল, রক্তের স্বাদ পেল, জলে নিজের হাড়িমুখ দেখল, আর ফিরল না ঘাসখেঁকোদের দলে, বনে চলে গেল।’

‘আমিও তাই তাকে বনে চলে যেতেই বলেছি।’ বীরদর্পে বললে মৃণালিনী, ‘বলেছি অমন চাকরি করতে হয় বাড়ির বাইরে বসে করো।’

এটা যেন চূড়ান্ত হয়েছে, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু, নতুন বন্ধুতা হয়েছে, বিজয়া এল দিদির সমর্থনে। বললে, ‘এ আর আপনাকে মুখ ফুটে বলতে হবে না, রক্তের টানে, মাংসের টানে নিজেই বেরিয়ে যাবে একদিন।’

‘হ্যাঁ, টাকাই শক্তির রক্তমাংস।’ হেমন দার্শনিক হল।

স্বকান্ত একটু বা ভয় করছিল কাকলি বুঝি মায়ের শেষ কথাটা নিয়ে তোলপাড় করবে, কিন্তু ধার-কাছ দিয়েও গেল না। যেমন আজকাল বেশির ভাগ সময়, বিশেষ এই মুখোমুখি হবার সময়, সে চুপ করে থাকে তেমনি চুপ করে রইল। মেঝেতে পাততে লাগল বিছানা।

স্বকান্তই খোঁচা মারল। বললে, ‘মা যে তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেবে বলেছেন তা শুনেছ?’

‘শুনেছি।’ কাজ করতে করতে অগ্রমনস্ক হয়ে গেল কাকলি : ‘বাপের বাড়ি তাড়িয়েছে, স্বস্তুরবাড়ি তাড়াবে এ আর বিচিত্র কী। কিন্তু মা শুধু একলা বললে চলবে কেন?’

‘তার মানে?’

‘তার মানে মায়ের বরপুত্রকেও বলতে হবে। তুমি যেদিন বলবে সেদিন চলে যাবে।’

‘কেন, বাবার বলতে লাগবে না? যিনি এ বাড়ির মালিক, যার নামে টেন্যান্সি—’

‘না। স্বস্তুরবাড়িতে রান্ধস-খোঁকস শুধু দু-জন। স্বামী আর শাশুড়ি। যারা চাকরি করতে পাঠাবে অথচ মাইনের ওপরে স্বাধীনতা দেবে না। নাচতে নামাবে অথচ দড়ি ধরে থাকবে।’

‘তাই তো করে। দেখ নি বাদরনাচ? বাদরে নাচে কিন্তু নাচওয়ালার মুঠোতে বাড়ি ধরা।’

‘দেখেছি। আর রোজগারটা যে নাচে তার নয়, যে নাচায় তার। ওর বাদব নাচিয়ে রোজগার, তোমার বউ নাচিয়ে রোজগার।’

‘বেশ, এখন তুমি না সরো, তোমার এই বান্ধটা তো সরাবে?’

‘আই অ্যাম সরি! তাড়াতাড়িতে তখন ওটা রেখে গেছি তোমার টেবলে।’ নিজের মনে কাজই করতে লাগল কাকলি : ‘জানি, ওটার ওপর তোমার ভীষণ রাগ।’

‘শুধু ওটার উপরে নয়, জগৎসংসারের উপরে। কি সরালে?’

‘সরাচ্ছি। হাতের কাজটা আগে সারি—’

‘না, আগে সরো। না সরাবে তো ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।’

‘ওরে বাবা, ওটার মধ্যে আমার টাকা, আমার ব্যাঙ্কের চেকবই, পাশবই—’ ছুটে গিয়ে বাস্কেটটা বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল কাকলি : ‘তার চেয়ে তোমার জগৎসংসারকে ছুঁড়ে ফেলো !’

‘তুমি এরই মধ্যে ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টও খুলে ফেলেছ নাকি ?’

‘স্বভুজবীয়ে উপার্জন করছি, কেন খুলব না ?’ বাস্কেটটা সরকারি জায়গা খাটের নিচে চালান করে দিলে কাকলি। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ‘তবু তো এখনো—কী জানি কথটা—তবু তো এখনো তেল মাখি নি।’

‘তার মানে ?’

‘তবু তো এখনো একখানা গয়নার অর্ডার দিই নি।’

‘তারপর ঐ কাঠামোর উপর আবার গয়না চাপাবে নাকি ?’

‘এখন তো কাঠামোই ঠেকবে। তবু দু-একখানা ঠেকিয়ে দেখই না ঝকমক করে কিনা। দিয়েছ ? দেবার মুরোদ আছে ? নিজের কিছু জোগাড় নেই, পরের জন্তে বেগার খাটো। নিজের কানে সোনা নেই, পরের কানে টেলিফোন। নিজের বলতে একখানা ঘর নেই, পরের জন্তে রেফ্রিজিরেটর। আমার ভাতে নুন না জুটুক ওরা যি খাবেন।’

‘তোমার তেজ খুব বেড়েছে।’ চেয়ারটা সশব্দে টেনে বসল স্বকান্ত।

‘তা তেজের দোষ কী ! তখনই বলেছিলাম প্রদীপের আগুনকে মশালের আগুন কোরো না। নাড়াবুনে আছি ডেকো না কীন্তুনে হতে। এখন তো কীর্তনের শুরু। চাকরির গোড়া। তারপর ভরা কীন্তুনে খোল ফাটবে, খঞ্জনী ভাঙবে, ধুলট উড়বে। ভরা চাকরিতেও কোনো দিশপাশ থাকবে না। কীন্তুনের মুখে এক বুলি হরেক্ষ, চাকুরের মুখেও এক বুলি, উন্নতি আর উন্নতি আর উন্নতি।’

‘তুমি ভাবছ স্পর্ধায় বা রুতিহে কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না কোনো দিন—’

‘যারা জীবনে এক প্রবন্ধ লিখেই বিদগ্ধ অন্তত তাদের কেউ নয়।’ নিচে টাঙানো মশারির মধ্যে প্রবেশ করল কাকলি। বললে, ‘তোমার জগৎসংসার যখন এখনো নিটুট আছে, তখন আমি উদ্বাস্তর মত কী করে আর ফুটপাতে শুই। শুই হর্যাতলে।’ সেদিন আবার নতুন রূপ ধরল কাকলি।

আফিসে বেরুবার আগেই, ঘরের মধ্যে, স্বকান্তর সামনে, কপালে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকল।

‘এ আবার কী অভিনয় !’ ব্যাঙ্কের হর আনল স্বকান্ত।

‘কাল আফিসে চাউর করে দিয়েছি ঝট করে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। চাকুরি-মেয়ে তো শাঁসালো ক্যাপিটাল। ও কি আর না-খাটানো থাকে? সবাই বলছে, নেমস্তন্ন কই? গাছতলায় বসে চাঁদ সাক্ষী করে বিয়ে, তার আবার নেমস্তন্ন। পেয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি। নেমস্তন্ন ইত্যাদি সামাজিক কাজ এড়াবার জগেই তো রেজেক্সি বিয়ে। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তাই একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ নিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হবে?’

‘তোমার কৌমার্যের মোচন হলে তোমার চাকুরির ক্ষতি হবে না?’

‘এখন তো ঘাটে পৌঁছেই গিয়েছি, নৌকো এখন থাকল আর গেল।’ কাকলি নিজের মুখ আয়নায় অনেকক্ষণ দেখল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। বললে, ‘বিবাহ দ্বারা কৌমার্যমোচন দুর্নীতি নয়। বরং উলটো, উন্নতির সহায়। কি, কেমন লাগছে কাঠামোকে? রানী-রানী লাগছে?’

‘আমার লাগলেই বা কী, না লাগলেই বা কী—’

‘হ্যাঁ, পাঁচজন লাগা নিয়ে কথা। শোনো, আমি অভিনয় করছি—’

‘চিরকালই তো করেছে।’

‘সেটা তো একটা গেয়ো বোকা মেয়ের অভিনয় করেছিলাম। এবার করছি রানীর অভিনয়। স্টেজে রানী সাজছি আমি।’

‘স্টেজে?’ সর্বশরীরে আড়ষ্ট হয়ে রইল স্কাস্ত।

‘এখনি কাঠ হয়ে যাবার কী হল! আমাদের আফিসে আমাদের ডিপার্টমেন্টে সংস্কৃতি আছে। সব আফিসে সব ডিপার্টমেন্টেই আছে, ছেয়ে আছে। আর সংস্কৃতি মানেই নাটক। আর নাটক মানেই কুশীলবদের দহরম-মহরম। রিহার্সেলের ছল্লোড়। কিন্তু উপায় নেই।’

‘উপায় নেই?’

‘দেখি না তো। উন্নতি করতে হবে চাকরিতে। উন্নতি করতে হলে রানী দাজা অত্যাবশ্যক।’

‘আর রাজা কে?’

‘আমার আফিসের এক কর্তা। তাই তাক বুঝে বিয়েটা স্থাপিত করলাম।’

‘তাকে বিমর্ষ করলে বোধ হয়।’

‘কে জানে, হয়তো বা নিশ্চিন্ত করলাম।’

‘তোমার মত আফিসের আর সব মেয়েই কি এমনি উন্নতি করছে?’

‘সব মেয়েরই কি রানী হবার চেহারা?’

‘তবে আর সব মেয়ের পাঁট কে করছে?’

‘ঐ যে আছে একদল গৃহস্থ মেয়ে, টাকা নিয়ে ঘুরে ঘুরে থিয়েটার করে বেড়ায়, তারা।’

‘গেরস্থ না হাফ-গেরস্থ।’

‘সে খোঁজে আমার কী দরকার? আমি যা বলছি—’

‘তুমি ওসব বর্ডার-লাইনের মেয়েদের সঙ্গে প্লেল করবে? মিশবে? চলাফেরা করবে?’

‘কে কোন লাইনে, বর্ডারে না সেন্টারে, তাতে আমার কী মাথাব্যথা! আমি রানী সাজতে এসেছি রানী সেজে যাব।’

‘তার মানে তুমিও তোমার আফিস-বসের হাত ধরে বর্ডার-লাইনে এসে দাঁড়াবে।’

‘দাঁড়াই তো দাঁড়াব। শোনো যা বলছি, আফিস-টাইমের পর রিহার্সেল, তাই বাড়ি ফিরতে রাত হবে! বেশি ব্যস্ত হোয়ো না’, ব্যঙ্গ চালল কাকলি: ‘থানা হাসপাতাল কোরো না।’

‘এবার তো খোঁজবার ক্ষেত্র বেড়ে যাবে। বসের রুমস, হোটেল, ময়দান—’

‘যাই বলো আমি চটছি না। যে সংস্কৃতিমান সে ঝগড়া করে না, গীন করে না—’

‘সে বেনের দোকানে মেকি চালায়।’

‘কী চালায় জানি না! কিন্তু উপায় নেই, কিছু একটা চালাতেই হবে। সংস্কৃতির উন্নতিতেই চাকরির উন্নতি—’

‘তুমি করো উন্নতি। আর উন্নতির ঠেলায় বর্ডার-লাইন ক্রস করে যাও। গণ্ডি পেরিয়ে চলে যাও লঙ্কায়। আর তা হলে, ফিরে এসো না।’

‘আসব না।’ ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে গেল কাকলি।



‘কী, ফিরে এলে?’ রাত করে বাড়ি ফিরলে, কাকলিকে ভিজ্জেশ করল স্বকান্ত।

‘এখনো তো গণ্ডি পেরোই নি।’

‘পেরিয়েছ কি না-পেরিয়েছ তার বিচার করবে কে? তুমি?’ স্বকান্ত মুখিয়ে উঠল।

‘তবে কি তুমি ?’ পালটা নিষ্কিণ্ণ হল কাকলি ।

‘বেশ, তুমি আমি কেউ নই, বিচারক সমাজ ।’ নাটুকেভাবে বললে স্বকান্ত ।

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : ‘যেমন বিচারক গায়ের পঞ্চায়েত । একজ্ঞ তার প্রতিবেশীর পাঠা কেটেছে, প্রতিবেশীর অভিযোগে গ্রাম্য পঞ্চায়েত লোকটারে ধরে ৩০২ ধারায় চার্জ করেছে, ফর মার্জারিং এ গোট । কাটা পাঠাটাকে পাঠিয়েছে হাসপাতালে, পোস্ট মর্টেম করতে । তেমনি ধারা বিচার আর কী ! জনতা বিচার ! আর একতাল অন্ধ মূর্থতার নামই জনতা ।’

‘সমাজ মূর্থ ?’ গলায় ঠিক-ঠিক স্বর ফুটছে না তবু জিজ্ঞেস করল স্বকান্ত ।

‘যে সমাজ ছেলেধরা সন্দেহ করে ভিথিরিকে পিটিয়ে মারে, দৈবাৎ রাস্তায় চাপ দিলে যে সমাজ গাড়িটাকে পুড়িয়ে দেয়, শুধু চাপা-দেওয়া গাড়িটাকে নয়, পিছনে নিরীহ গাড়িটাকেও—যে সমাজ পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন এলে চেয়ার-টেবল ওলটায় জলের কুঁজো জানলার কাঁচ ভাঙে, যারা ভীক নয় যারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে, তাদের খাতা ছেঁড়ে, গার্ডদের মাথা ফাটায়, তাদের তুমি অভিনন্দন করবে ?’

‘না । সমাজ তাদের সমর্থন করে না । তারা অপকর্মী । সমাজের বিচারে তারা নিন্দনীয় ।’

‘সে সমাজ কোথায় ? রাখো ।’ দ্বিতীয় চেয়ার হয়েছে ঘরে—কাকলিই কিনেছে—সেটা জানলার কাছে টেনে নিয়ে বসল কাকলি : ‘যে সমাজ ঘুমোয় তার আবার বিচার কী ! সে অন্ধ আর মূর্থ না হোক, সে ক্লীব । ক্লীব আরো জঘন্ট । যাদের অপকর্মী বলছ, তাদেরও মস্ত সমাজ । আর তাদের ধারণায় তাদের বিচারই ঠিক । তাব যা করছে, সেইটেই করণীয় । হুতরাং গণ্ডির রেখা টানবে কে ? কে ঠিক-ঠিক মাপ জরিপ করে দাগ দিয়ে বলবে, টেউ এই পর্যন্ত, আর নয় !’ চেয়ারটা ঘোরাল স্বকান্ত ‘তা হলে তোমার মতে চরম বিচারক কেউ নেই ?’

‘না । কেউ নেই ।’ জোর দিয়ে বললে কাকলি । পরমুহূর্তে হেলান দেবার ভঙ্গিতে ক্লান্ত শরীরে একটু নম্রতা এনে বললে, ‘বলতে পারতাম বিবেক চরম বিচারক । কিন্তু আমার বিবেক আর তোমার বিবেকে মিল হবে না । স্ট্যালিনের কাছে হিটলার পাজি, হিটলারের কাছে স্ট্যালিন । চার্চিলের বিচারে গান্ধী আধ-গাংট ফকির, আর আমাদের বিচারে, ভারতবাসীর বিচারে ? আমাদের বিচারে গান্ধী সমস্ত পৃথিবীর রাজা—রাখালরাজা । তাই দয়া করে চরম বিচারের কথা বোলো না । সব খামখেয়াল ।’

‘খামখেয়াল ?’

‘অন্তত নির্দিষ্ট করে চেয়ে না গণ্ডীর রেখা টানতে। যে প্রকাণ্ড, তার গণ্ডিও প্রকাণ্ড। তাই, দেখতে পাচ্ছ না,’ হাসল কাকলি : ‘মাহুষ ছোট বলে তার বেলায় যা গাপ, দেবতার প্রকাণ্ড বলে তাদের বেলায় তা লীলাখেলা।’

‘তুমিও বুঝি তেমনি কলির দেবতা হয়ে উঠছ ! চালিয়েছ লীলাখেলা ?’

‘যদি চালিয়ে থাকি,’ ব্যঞ্জে প্রথর হয়ে উঠল কাকলি : ‘উইথ ইয়োর পারমিশন দর, উইথ ইয়োর কনাইভেন্স। তুমি আর সমাজের হয়ে মোক্তারি করতে এসো না। তোমার সমাজ বারে-বারে মেয়েদের গণ্ডি বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমেই লিখতে পড়তে হলেন, পর্দা ঘোচালে; বাড়িয়ে দিলে বিয়ের বয়েস। বললে, ঐটুকু পড়ায় কী হবে, কলেজে এসো, কলেজে পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়। বাড়িয়ে দিল এলেকা। ভাক্তারি, ইনজিনিয়ারি, ব্যারিস্টারি—কী, দেয় নি বাড়িয়ে ? ডেকে নিয়ে আসেনি বিজ্ঞানের নাবরেটারিতে, খেলার মাঠে, সভামঞ্চে, পার্লামেন্টে—রাজ্যসনে ? কোথায় গণ্ডি ? বলে নি, পাইলট হও সমুদ্র পার হও সীতরে, প্যারাসুট নিয়ে লাক দাও অন্ধকারে ? গণ্ডি নেই, গণ্ডি মুছে গিয়েছে।’

‘না। যায় নি।’ সরোষে উঠে দাঁড়াল স্বকান্ত : ‘কোথাও না কোথাও আছে তবে শেষ রেখা ?’

‘আছে ?’

‘হ্যাঁ, আছে। দি লিমিট। উটের পিঠে শেষ খড়।’

‘কী সেটা ?’

‘বলব ?’ দৃষ্টি ধারালো করল স্বকান্ত।

‘গুনতেই তো চাচ্ছি।’

‘সেটা হচ্ছে শারীরিক গুচিটা। সমস্ত প্রগতির সেইটে অন্তত শেষ সীমা। যে সীমা অমান্য করা যায় না, ইহজীবনে যা আর লঙ্ঘন করবার নয়। কী, মানো ?’

‘হয়তো মানি। কিন্তু সেখানেও কথা থাকবে। গুচিটার রেখাটারই বা কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ সে বিচারও তর্কের ব্যাপার। আর শোনো,’ উঠে দাঁড়াল কাকলি : ‘আইন আজ মেয়েদের শুধু সম্পত্তিতেই অংশ দেয় নি, বিয়ে খণ্ডে দেবারও স্বয় দিয়েছে। শুধু রেজেষ্ট্রি করা বিয়ে নয়, মন্ত্র-পড়া আশুন-সাক্ষী-রাখা বিয়ে। আর বিয়ের বিচ্ছেদের পর দিয়েছে আবার তাকে বিয়ে করার অধিকার। স্বতরাং দেখতে পাচ্ছ যে অন্তর্গতিতা এক বিয়ের উপসংহার তাই আবার আরেক বিয়ের ভূমিকা। স্বতরাং দাঁড়াচ্ছে, আইনই গণ্ডি, দি টার্মিনাল পয়েন্ট। যতক্ষণ না আইন ভাঙছি ততক্ষণ তাই আছি গণ্ডির মধ্যে।’

‘কে থাকতে বলছে? ভাঙো আইন। ভিঙোও গতি। তারপর রসকণ্ঠওয়াল শাসালো কোনো আফিসবাবুর কণ্ঠলয় হও গে।’ স্বকাস্ত দাউ-দাউ করে উঠল।

‘কী আকাট আহাম্মকের মত কথা!’ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল কাকলি: ‘একটা অ্যাকাডেমিক ডিসকালন হচ্ছে, তার মধ্যে যত ছোট মনের নোংরাখি। ইতর, স্টুপিড কোথাকার—’

আর দাঁড়াল না কাকলি। নিচে নেমে গেল।

নিচেটা প্রায় খালি। বাড়ির সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে। যে যার ঘরে গিয়ে শামিল হয়েছে এরই মধ্যে। ঠাকুর-চাকরদের খেয়ে নিতে হুকুম দিয়ে দিয়েছিল মুণালিনী, কিন্তু কী মনে করে তারা তখনো গড়িমসি করছিল। ছোট বউমা বাড়িতে যখন পৌছে গিয়েছেন, তখন তার আগেই নিজেরা খায় কি করে?

‘আমার ভাত তো টেবলের উপর ঐ ঢাকা আছে—’

‘হ্যাঁ, মা-ই বেড়ে ঢেকে রেখেছেন।’ বললে ঠাকুর।

‘তবে তোমরা বসে পড়ো গে। আমি স্নান সেরে পরে খাব। আমার জন্তে কাক অপেক্ষা করতে হবে না।’

উপরের বাথরুমটা কে যেন অতিরিক্ত সময় আটকে রেখেছে, হয়তো বা তাকেই জন্ম করবার জন্তে। নিচেচরটা হেমেনের ভয়েই হয়তো যুগপৎ আক্রান্ত হতে পারে নি। নিচেচরটা খোলা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল কাকলি।

স্নান সেরে খেতে বসল। কেউ ধারে কাছে দাঁড়িয়ে নেই, জেগে নেই। জয়ন্ত পড়ছে দেখে এসেছে। তাকেও একবার কেউ নামতে বলল না। রাত আর এখন এমন বেশি কি! দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

ঢাকাটা তুলল কাকলি। খালাতে এলানো কটা ভাত, শিয়রে হুন, পাশে স্নাতনেতে দুখানা কুমড়ো ভাজা। একটা বাটিতে ট্যালটেলে ডাল, আরেকটাতে ফিনফিনে ঝোল তাতে এক টুকরো লিকলিকে মাছ। তৃতীয় বাটিতে এক হাতা জোলো দুধ, আঙুল ডুবিয়ে দেখল একটা সরস্র কলা পর্যন্ত নেই, জিতে ঠেকিয়ে দেখল, না বা এক ফোটা চিনি।

কোনোরকমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে খেয়ে টোপ ঢাকা দিয়ে উঠে পড়ল কাকলি।

রিহার্সেল যেদিন থাকে, সেদিনই দেয়ি হয় ফিরতে।

সেদিন ফিরে দেখল ঠাকুর-চাকরও অস্থপস্থিত। রান্নাঘরের পাট তোলা।

কাকলি আর টোপ তুলল না। সোজা উঠে গেল উপরে।

সকালবেলায় প্রথমেই আবিষ্কার করল মুণালিনী। নিচে স্বকাস্ত মুখ ধুতে এসে-

ছিল, তাকে শুনিযে বললে, ‘রাত্রে যে খাবে না তা আগে থেকে বলে গেলেই তো পারে। গৃহস্থ বাড়ির ভাতডাল শুধু শুধু নষ্ট করবার কী দরকার।’

সেই ঝগড়া উপরে নিয়ে গেল স্বকান্ত।

‘ভাতডাল নষ্ট করার দরকার কী ! খাবে না তা আগে বলে গেলেই তো পারে।’

‘তুমিও তো কতদিন বাড়িতে ফিরে বলো, খাব না। তখন তো ভাতডাল নষ্ট হতে দেখি না।’ পালটা কথা শোনা কাকলি।

‘আমি যে খাই না তা হঠাৎ শরীর খারাপ হয় বলে—’

‘তেমনি আমার শরীরও তো খারাপ হতে পারে।’

‘তোমার শরীর খারাপ ? কই, লক্ষণ তো কিছু দেখি না।’

‘মনের থেকে রুচি চলে যাওয়াও শরীর খারাপ হওয়া।’

‘তবে তো আগে থেকেই বলে যাওয়া যায় এ বাড়ির খাওয়াতে আমার রুচি নেই। তা হলে তু মূঠো আহাৰ্য বাঁচে গৃহস্থের।’

‘গৃহস্থের অনেক কিছুই বাঁচবে।’ কাকলি চোখ বেঁকাল : ‘কিন্তু এক বেলা খাই নি কি না, তা নিয়ে তুমি কথা বলতে আসো কেন ? মা নিজে বলতে পারেন না ? মুখোমুখি নিতে পারেন না কৈফিয়ত ?’

‘তোমার সামনে এগোবে এমন সাহস কী ! তুমি এখন ফার্মের একজন অফিসার।’ দাদা ঝরাল স্বকান্ত : ‘তারপর চূড়োর উপর ময়ূরপুচ্ছ, চাকরির উপর সংস্কৃতি ধরেছ।’

‘কী আশ্চর্য, তোমার কিছুই ধরতে হয় না।’ কাকলি উত্তোর দিল : ‘তুমি নিজেই পুচ্ছধর।’

সেদিন আফিস যাবার মুখে কাকলি মৃণালিনীর উদ্দেশ্যে ফেলে দিল কথাটা : ‘আজ আমার জন্তে ভাত রাখতে হবে না। খাব না বাড়িতে।’

এবং এমনি একদিন নয়, একাধিক দিন।

আবার এই নিয়ে অশান্তি।

‘তোব বউ যে রাত্রে প্রায়ই খায় না, এর মানে কী ?’ মৃণালিনী আবার স্বকান্তের এজলাসে হাজির হল।

তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে স্বকান্ত। অসহিষ্ণু গলায় বললে, ‘মানেকা কী তা তুমি নিজে বউকে জিজ্ঞেস করলেই পারে। আমাকে জ্বালাতন করো কেন ?’

মৃণালিনী স্তম্ভিত হবার ভাব করল : ‘তুই স্বামী, পুরুষ, তুই অনাচারী বউকে শায়েস্তা করবি নে ? বসে বসে শুধু লেজ নাড়বি ?’

‘আমাকে কী করতে বলো ?’

‘যার বাইরে রাত্রে খাওয়া জোটে, তার বাইরে রাত্রে শোওয়াও জুটবে। বলতে পারিস নে মুখের উপর? রাতের প্রায় আধেক যে খেয়ে বেড়িয়ে বাইরে কাটাতে পারে, তার আর বাড়িতে ফেরা কেন? পারিস না বলতে? মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিতে পারিস নে?’

‘ও-ই বা কী করবে?’ অলক্ষ্যে কাকলির পক্ষ নিয়ে বলল স্কাস্ত : ‘থিয়েটারের রিহার্সেল দিতে গিয়ে রাত হয়ে যায়। আফিসের সংস্কৃতি তো, তাই নাটক পঞ্চাঙ্গ! অনেক লোককে প্রোভাইড করতে হবে বলে অনেক চরিত্রওলা ঘটোৎকচ বই আর ওর পাট লাস্ট সিন পর্যন্ত—’

‘সেই লাস্ট সিনটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। এক্সনি-এক্সনি।’

স্কাস্ত চুপ করে রইল।

‘আমরা বউকে চাকরি করতেই পাঠিয়েছিলাম, থিয়েটার করতে নয়।’

কথা কইল না স্কাস্ত।

‘আবার থিয়েটার থেকে সার্কাসে যায়, না সিনেমায় যায় তার ঠিক কী! আঙুল ফুলে কলা গাছ বরং সহ্য হয়, এ আঙুল ফুলে অস্থখ গাছ।’

স্কাস্ত তবু নির্বিবাদ।

‘এ বউকে দিয়ে আমাদের স্বরাহাটা কী হল? না ঘরে না ঘাটে কোনো কাছে লাগল না। মাইনের টাকা বাপের বাড়ি পাঠাল।’

‘কেন, মাঝে মাঝে তো এদিকেও খরচ করে।’ না বলে পারল না স্কাস্ত : ‘খাবার টেবলটা কিনে দিল, তোমাকে নেটের মশারি—’

‘যেন বকশিশ দিল সংসারকে। কেন এক থোকে সব টাকা তুলে দেবে না? আমাকে না দিক, তোকে, স্বামীকে? তুই স্ববিধে করে দিয়েছিস বলেই তো ও’ এত স্বাধীনতা। কিন্তু তোকেই বা কী মাঝটা করে শুনি? এমন একটা ভাব দেখায় উনিই আকাশে-ওড়া পাখি আর তুই একটা কীটপতঙ্গ।’

নিশ্চল নিষ্পদ স্কাস্ত।

‘বাইরে খাওয়া-দাওয়ার পাট সেরে শোয়ার ঠাট বজায় রাখতে বাড়ি ফেরে কিসের ঠাট-বজায়? চাকরিকে সমর্থন করবি বলে কদাচারকে প্রশ্রয় দিবি? ককখনো না। যে বানের জল থেকে তুলে এনেছিস সেই বানের জলে ভাসিয়ে দে।’

চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরল মুণালিনী। বললে, ‘অল্প আঙুনে শীত হয়ে, বেশি আঙুনে পুড়িয়ে মারে। বউ এখন বেশি-আঙুন হতে চলেছে। সংসার পুড়িয়ে

কেবাবে ছাৰখাৰ কৰে দ্বে। হাতেৰ খাবড়াতে নিববে না আৰ, জল চেলৈ
নবাত হবে।’ চৌক গিলল মৃণালিনী : ‘আৰ সে জল চোখেৰ জল।’

সেদিন, ৰাত্ৰে সদৰ বন্ধ কৰতে গেল স্নকাস্ত।

‘এ কি, এখুনি বন্ধ কৰছিস ?’ জিজ্ঞেস কৰল হেমেন : ‘ছোট বউমা ফিৰেছে ?’

‘না।’

‘তবে এখুনি এত তংপৰ ?’

‘আজ ফিৰবে না।’

‘যাবে কোথায় ?’

‘কী জানি কোথায় যাবে।’ নিজেই এখন কোথায় যায় স্নকাস্ত পথ খুঁজতে

গল।

‘কেন, ঠিকানা জেনে রাখিস নি ?’

‘যে ৰাত কৰে বাড়ি ফেৰে তাৰ ফেৰা না-ফেৰা সমান।’ উপৰে পালিয়ে গেল
কাস্ত।

‘যে চোৱকে চুৰি কৰতে বলে নিজে গৃহস্থ মাজে সে চোৱেৰ চেয়েও বেশি।’
হমেন নিষ্ঠুৰেৰ মত বললে, ‘সে বাটপাড়। আৰ চোৱেৰ ধনেৰ দিকেই বাটপাড়ের
জৰ।’

খানিক পৰেই কড়া নাড়ল কাকলি।

হেমেন দৰজা খুলে দিল। বললে, ‘আৰ কন্দিৰ চলবে ৱিহাৰ্শেল ?’

‘আজ স্টেজ ৱিহাৰ্শেল হয়ে গেল। তাই’, কুণ্ঠিত মুখ কৰল কাকলি, ‘তাই দেশ
কটু দেৱি হল আজ—’

‘তা হোক। আসল প্ৰে কৰে ?’

‘এই শুক্ৰবাৰ হয়তো।’

‘যাক, ৰামেলা যাবে তা হলে। খাটনিৰ খাটনি—চেহাৰা কাহিল হয়ে গেল।’
ৰেৰ মধ্যে তাকিয়ে দেখল ৰিছানা পাওয়া মাজই বিজয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। গলা
মিয়ে বললে, ‘আৰ, থিয়েটাৰেৰ পাশ এনো না এ বাড়িৰ জন্তো। কোন দণ্ডে
ক কী দেখবে আৰ দপদপ কৰবে বলা যায় না। আরো শোনো।’ হাসিমুখে
কলি ফিৰে দাঁড়াতে বললে, ‘যদি দেখ, তোমার উপৰেৰ ঘৰেৰ দৰজা বন্ধ কৰে
য়েছে, ঘুমিয়ে পড়ার ভান কৰে দৰজা খুলে দিছে না, তা হলে যেন দৰজাৰ
ইয়ে আসন পেড়ে বসে থেকো না শব্দীয় মত, টুক কৰে এসে আমাকে একটু
বৰ দিও—’



লজ্জায় মরে গেল কাকলি। মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে বললে, ‘না, খুলে দেবে—’ বলেই ছুট দিল উপরে।’

‘তুমি তো জানতাম এ বাড়ির এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের মিনিষ্টার, তুমি ওদের ইনটার্ন্যাল ব্যাপারে নাক চোকাচ্ছ কেন?’ শোয়া বিজয়া কুণ্ডলীর ভিতরে থেকেই ফোস করে উঠল।

‘ও। তুমি ঘুমন্ত নয়? তুমি ঘুমজাগন্ত!’ হেসে উঠল হেমেন। ঘরে ঢুকে বললে, ‘যদি ভেতরে জায়গা পায়, তা হলে আর আমার জুরিশডিকশান নেই, সেখানে মারামারি-কাটাকাটি যাই হোক গে। কিন্তু যদি ঘরের বাইরে, দরজার বাইরে বসিয়ে রাখে, তা হলে ব্যাপারটা এক্সটার্ন্যাল অ্যাফেয়ার্সের। সে ক্ষেত্রে সেটা আমার ডিপার্টমেন্ট।’

‘তোমার মুণ্ড!’ পাশ ফিরল বিজয়া।

কিন্তু না, ঘর খোলা, আলো জ্বলে লেথাপড়া করছে স্বকান্ত।

চোখ না তুলেই বললে, ‘শেষ পর্যন্ত সেই ফিরেই আসতে হল।’

‘নইলে যাব আর কোন চুলোয়।’ ব্যাগটা ঝুলিয়ে রাখল কাকলি।

‘কিন্তু যাবার সময় যেমন পাখা মেলেছিলে মনে হচ্ছিল যেন অল্প কোনো গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবে। আসলে বাসন্তীও যা, তুমিও তাই।’

‘বাসন্তী—মানে, ঠাকুরঝি?’

‘হ্যাঁ, শত অত্যাচার সত্ত্বেও বাসন্তী তার স্বামীর ঘর আঁকড়ে আছে, তুমিও তেমনি শত অসুবিধে সত্ত্বেও—’

‘কথাটা অসুবিধে করছ কেন, বলো, অত্যাচার সত্ত্বেও।’ কাকলি তাকান চারদিকে : ‘আমার ওপর এসব কম অত্যাচার?’

কথা বদল করল না স্বকান্ত। বললে, ‘তেমন শত অসুবিধে সত্ত্বেও তুমিও তেমনি আঁকড়ে আছ শশুরবাড়ি।’

‘থাকব না তো যাব কোথায়?’

‘তাই বলছিলাম, তুমি আর বাসন্তী একগোত্র।’

‘মোটাই নয়। বাসন্তীর অবস্থা আমার চেয়ে ঢের ভালো। তার বাপের বাড়ি আছে। বোজগেরে বাপ-কাকা আছে। দুই গণেশ-কার্তিক তাই আছে। আমার তো ওসব কিছু নেই। আমি তো নিঃস্ব। উষাস্ত।’

‘কেন, তোমার তো থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে, হোটেল আছে, কমল আছে, রঙিন আছে। তা তুমি শশুরবাড়ি ছাড়বে কেন? যার এক চিলতে

বুদ্ধি আছে, সে কখনো ছাড়ে? খাওয়া-থাকা ফ্রি, একটা স্বামীকে শিখণ্ডীরূপে সামনে রাখা, আফিসে মোটা চাকরি, আর মাইনেতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য—অবাধ স্বাধীনতা, স্বাধীনতা না স্বৈচ্ছাচার—এমন রাজত্ব কেউ ছাড়ে? তাই যতই মুখশাপট মারো কাজের বেলায় সেই গুটিগুটি স্বস্তিরালয়েই ফিরে আসো।’

‘তবে তো বুঝেইছ আমার চালাকি। কিন্তু আসল চালাকিটার জন্তে সত্যি তোমাকে ধন্যবাদ।’ মুখের ভাবটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করল কাকলি: ‘সেটা হচ্ছে আমাকে যে চাকরি করতে খুঁটিয়েছ। উঃ, যদি আজ আমার চাকরি না থাকত, নিজের বলে এক মুঠো টাকা না থাকত, তা হলে আমি কোথায় গিয়ে পড়তাম।’ কাকলি ঝলমল করে উঠল: ‘আমি বাসন্তী হতে যাব কেন? কোন চঃখে? আমি কি ওর মত ননম্যাট্রিক অকর্মণ্য অসার? নাই বা থাক আমার বাপের বাড়ি, আমার বিত্তে আছে, বুদ্ধি আছে, চাকরি আছে, চেহারা আছে। শত্রুতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার সবচেয়ে যে বড় অস্ত্র সেই টাকা আছে। আমি কেন দুর্বলের মত স্বামীর ঘর আঁকড়ে থাকব? আমার ছাদ যায় মাটি আছে, গাছ যায় মাঠ আছে। তোমাকে শিখণ্ডী করতে হবে কেন? যে কোনো দিন আদালতে গিয়ে তোমার স্বামিত্বকে এক কলমে কেটে দিয়ে হালকা হয়ে যেতে পারি—’

‘অতি-চালাকের গলায় দড়ি পড়ে।’ গম্ভীর হয়ে বললে স্বকাস্ত।

‘পড়ুক। তবু পায়ের বেড়ির চেয়ে তা ভালো। আমাকে যেতে বলছ, কেন, তুমি চলে যাও না। কত ছেলে তো বিদেশে যায়, নিরুদ্ধেশ হয়, সন্নেসী হয়ে বনে বনে টহল মারে, তুমিও তাই করো না। উপদেশটা আমাকে না দিয়ে নিজের উপরেও তো খাটাতে পারো। নিজেই তো যেতে পারো বেরিয়ে।’

‘মরবার জগ্গেই পিঁপড়ের পাখা ওঠে। তোমারও তাই উঠেছে।’

‘ও, মরব! সে তো এক নতুন রোমাঞ্চ। কিন্তু কালু হেন গুণনিধি কাকে সেদিন দিয়ে যাব না জানি। কোন কাক সেদিন এ পাকা বেলে ঠোকর মারবে!’

কাকলি ছাদে চলে গেল আর ঘর অন্ধকার করে দিল স্বকাস্ত।

থিয়েটার হয়ে গিয়েছে। কদিন পরে কাকলি এল আবার নতুন দরখাস্ত নিয়ে।

‘নতুন আবার এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে।’

‘তা, আমি কী করব!’ স্বকাস্ত বইয়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

‘যতক্ষণ তুমি নাকচ না হচ্ছ ততক্ষণ তোমাকেই জানাতে হবে।’

স্বকাস্ত ঘাড় তুলল না।

‘শোনো, আমাদের জেনারেল ম্যানেজার একটা ককটেইল পাটি দিচ্ছেন—’

‘কী টেইল?’ মুখিয়ে উঠল স্বকান্ত।

‘ককটেইল। সেদিন তুমি আমাকে ময়ূরপুচ্ছ বলেছিলে না। এ হচ্ছে কুকুটপুচ্ছ। সে পার্টিতে আমার নেমস্তম্ভ হয়েছে। আমি যাব! যদি চাকরির উন্নতি চাই আমার যাওয়াই উচিত। উপরিওলার খুশিতেই উপরে তোলা।’

‘তা আমি কী করব?’ রীতিমত ধমকে উঠল স্বকান্ত।

‘ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো, যাবে? তোমারও নেমস্তম্ভ হয়েছে।’

‘আমার?’ চেয়ারের দুটো হাতলই একসঙ্গে ধরল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, কনসটের নেমস্তম্ভ। পুরুষ-অফিসরদের সস্ত্রীক নেমস্তম্ভ, তেমনি মেয়ে-অফিসরদেরও সপতিক। হালে আমার বিয়েটা যখন এস্টাব্লিশ্‌ড্ হয়েছে তখন আমাকে বলেছে স্বামীসহ হাজির হতে। অফিসরের স্ত্রী যদি যেতে পারে, অফিসরের স্বামীই বা যেতে পারবে না কেন? কি, যাবে?’

‘মুখ সামলে কথা বলে বলছি। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।’

‘কেন, দোষ কী! কত গণ্যমান্দেরা যাবে। চলো না। নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে জীবনে। কোনোদিন গিয়েছ অমন জায়গায়? যখন যাও নি তখন চলো।’

‘আমি নয়। তোমার একার জন্তেই গোল্লার পথ খোলা থাক।’

অল্পে অথচ তীক্ষ্ণে সজ্জিত হল কাকলি। যথাসময়ে বেরিয়ে গেল বাঁড়ি ছেড়ে। মোড় থেকে ট্যান্ডি নিলে।

তাক বুঝে স্বকান্ত পালিয়েছে।

মৃণালিনীর চোখ এড়ায় নি। বন্দনাকে লক্ষ্য করে বললে, ‘আজ আবার কোন অভিসার?’

বন্দনা বললে, ‘আজ জলাভিসার।’

পার্টিতে বরেন এসে शामिल হল। কাকলি একা-একা বসেছিল এক কোণে, তার টেবিলে মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল।

‘বাবা: বাঁচলাম, আপনি এসেছেন। নইলে কী বিপদে যে পড়তাম!’ বলল কাকলি।

‘কেন, বিপদ কিসের?’

বিপদ যে সত্যি বিশেষ নয়, হাসল কাকলি। বললে, ‘কে না কে বসত ঠিক আছে?’

‘সকলের চোখই তো আপনাকে খুঁজছে—’

‘কিন্তু আমার চোখ?’ ছোট একটি কটাক্ষ করল কাকলি: ‘যাক এতক্ষণে

আরাম হল। চারদিকের বৈষম্যের মধ্যে সমতার উপশম : খুঁজে নেওয়াই বৃদ্ধি
জীবনের সাধনা। শুধু ওসব পানীয় কিন্তু নেবেন না—’

‘সে কি, একটু স্বাদ নিয়ে দেখবেন না? অস্ত্র এক সিপ, এক চুমুক?’ বরেন
চোখমুখ উজ্জ্বল করল।

‘দরকার নেই। নামটা শুনতেই সাংঘাতিক।’

‘বাঙলা নামগুলোই অমনি কবিত্বহীন। কিন্তু স্বরা বা মদিরা বলুন, তবু সম্ব হয়।
আর যদি সোম বলতে চান তো দেবভোগ্য।’

‘দরকার নেই নামের সমারোহে। আপনি ছোটো কোকো-কোলা নিন—’

‘আসুক।’ বরেন অল্পকম্পার স্বরে বললে, ‘কিন্তু লিকার যেটুকু আছে তা
এমনিতেই খুব সফট। একটুখানি মিষ্টি ঝাঁজের বেশি নয়।’

‘জীবন এমনিতেই বেশ ঝাঁজালো আছে।’ কাকলি বললে।

‘অস্ত্র তেঁট ছুটি একটু ঠেকাবেন। স্বাদ না নিন, গন্ধ নেবেন—’

‘প্রথমে ঝাঁজ, পরে ঝাঁকার, শেষে একেবারে নেশা—মানে ঝাঁজরা হয়ে যাওয়া।
দরকার নেই আমার স্বাদে-গন্ধে। মাটিতে-আকাশে এত স্বাদ-গন্ধ আছে, জীবনে এত
রোমাঞ্চ, কোনো কৃত্রিম আয়োজনের প্রয়োজন নেই। আর যাকে প্রত্যাখ্যান করা
উচিত তাকে কাছে ঘেঁষতে দেওয়াই উচিত নয়।’

ছোটো লেমনেড চেয়ে নিল বরেন। উদার আনন্দে বললে, ‘আপনার জন্তে নিরীহ
হলাম। কোথায় তরল অনল’ হব, তা নয়, শরবত হলাম। মদিরা না হয়ে শর্করা।’

‘মধু হলেন।’

ভরসন্ধে পার করেই ঘরে ফিরল কাকলি। আর বলা নেই কওয়া নেই, ঘরে
চুকতেই, স্বকান্ত তাকে ছু বাহু দিয়ে নিপিষ্ট জড়িয়ে ধরল। মুখের কাছে আনতে
চাইল ব্যাকুল মুখ।

প্রথমটা ভীষণ হকচকাল কাকলি। এ কী আকস্মিক আদরের তোড়। কিন্তু
পরক্ষণেই বুঝল এ আদর নয়, এ আক্রমণ।

‘বলো কী খেয়েছ তুমি? তোমার মুখে এ কিসের গন্ধ?’

‘যা লোকে খায় তাই খেয়েছি। বর্বরতা কোরো না বলছি, ছেড়ে দাও—’
ঝটকা মারতে চাইল কাকলি।

‘তুমি মদ খেয়েছ?’

‘বাঙলা শব্দটা অত উচ্চস্বরে ঘোষণা না করলেও চলবে। সংসারকে শোনাতে
হবে না তোমার আবিষ্কারের কথা।’

‘এক শো বার শোনাতে হবে। তোমাকে চাকরি করতেই দেওয়া হয়েছে, যদি খেতে নয়। বেলগ্নাপনা করতে নয়।’ কাকলিকে খাটের উপর ছুঁড়ে দিল স্বকান্ত।

‘বলিহারি গন্ধ-রাজ।’ ব্যঞ্জে ঝংকার দিয়ে উঠল কাকলি : ‘লোকে ওয়াইন-টেস্টারের কাজ নেয়, তুমি হও গিয়ে ওয়াইন-সেন্টার। এমনি না হলে নাক, এমনি না হলে বুদ্ধি ! কোন বনের গন্ধগোকুল তুমি !’

‘কোন বনের—তা দেখাচ্ছি তোমাকে।’ দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল স্বকান্ত।

কী দেখাবে, কদিন যেতে পুরোদস্তুর একটা স্মার্ট পরল স্বকান্ত।

কাকলি হালকা হবার চেষ্টায় বললে, ‘না, এখন আর গন্ধগোকুল লাগছে না : এখন মনে হচ্ছে, বিলিতি মার্জার।’

কোনো উত্তর দিল না স্বকান্ত। দৃষ্ট পায়ে বেরিয়ে গেল।

উঠল গিয়ে সটান বরেনের আফিসে।

‘আরে স্বকু যে !’ উদ্ভাপে উথলে উঠল বরেন : ‘এই রাজবেশ ?’

‘রাজবেশের নিচেই ভিক্ষকের চীর।’

‘সে কী ? তুই ভিক্ষক ?’

‘হ্যাঁ, একটা চাকরি চাই।’

হো-হো-হো করে সশব্দে হেসে উঠল বরেন : ‘আমি ভাবলাম কী না জানি কী।’ পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, ‘বেশ তো, আমাদের এখানে করবি ?’

‘কেন করব না ? নিশ্চয় করব।’

‘দাঁড়া, বাবার কাছে তোকে নিয়ে যাই।’

পাশের কামরাটাই ধীরেনবাবুর।

‘আমার বন্ধু, বাবা। স্বকান্ত। এম-এ, খুব ভালো ছেলে। রিসার্চ করছিল। সম্ভ্রতি বড় অভাবগ্রস্ত। চাকরি চায়। আমি বলি কি, এইখানেই তো হতে পারে একটা।’

‘হ্যাঁ, পারে। ঐ দীপঙ্কর ছোঁড়াটাকে বরখাস্ত করে দাও।’

‘আমিও তাই বলছিলাম বাবা—’

‘পোস্টটা বড় করে দাও। কলকাতার বাইরেও তো টুর করা আছে। টুরিং ইনস্পেক্টর।’

‘আর দীপঙ্করকে একটা নোটিশ দিয়ে দিলেই তো হবে।’

‘হ্যাঁ, একেবারে ডিসচার্জ নোটিশ। ওর চাকরির তো ঐ কন্ডিশন। টার্মিনেবল অ্যাট প্লেজার। বড্ড বড় বেড়েছিল ছোঁড়াটা—’

‘তারপরে যতরকম হীন আর হীনাস্ তদবিব।’ স্বর্গের দিকে তাকাল বরেন
 ‘বিববৃক্ অঙ্কুরেই শেষ করে দেওয়া দরকার।’ নিচু হয়ে কাজ করতে লাগল
 দ্বীরেন : ‘এঁকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। ডিটেল্‌স্ ঠিক করে নিয়ে এসো।’
 স্ত্রকের মত বরেনের ঘরে ফিরে এল সুকান্ত।

... ৩৪.

কিরকম হল ? ভাবতে বসল বরেন। মোটের উপর ভালোই হল বলতে হবে।
 সন্তত আমি তো ভালোই করলাম, পরোপকার করলাম। আপাতচোখে দেখতে
 আমার আর দোষ কী ! প্রথমে স্ত্রী এল, ব্যবস্থা করে দিলাম। পরে স্বামী এল, বসিয়ে
 দিলাম উচু দাঁড়ে। সচরাচর দুর্বল এমন বদান্ততা। একজনেরই হয় না, এ একেবারে
 দুর্বল চাকরি। হুমানের কাঁধের উপর রামকে বসানো। আর আমাকে এখন এক
 গাতে স্থানিউট করা নয়, দুই হাতে, যুক্তকরে, নমস্কার করে। ক্রতজ্ঞতায় শুধু বিগলিত
 হওয়া নয়, ক্রতজ্ঞতায় বশীভূত হও।

বলতে পারো, দীপঙ্করের চাকরিটা গেল ! তা, অস্থায়ী চাকরি, একদিন না এক-
 দিন যেতই। এ অবস্থাটা ওর অজানা ছিল না। তাই খবর পেয়ে এমন কিছু পড়বে
 না আকাশ থেকে। তা ছাড়া শাস্ত্রেই বলেছে বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়। আশ্চর্য,
 সর্বজনহিতায়, সর্বজনসুখায় বলে নি। একসঙ্গে সকলের সুখ তাই সাধ্যাতীত। এক-
 জনের চাকরি পাওয়া মানেই আরেকজনের চাকরি যাওয়া, বা চাকরি না-পাওয়া।
 একজনের প্রথম হওয়া মানেই আরেকজনকে দ্বিতীয় হওয়ার দুঃখ দেওয়া। সুখ যা
 শক্তিত হয় তা শুধু অন্তকে বঞ্চিত করে। তাই তোমাদের সুখের পিছনে অস্ত্রের দুঃখ
 থাকবে। এ আর বিচিত্র কী ! দেখতে হবে অস্ত্রের দুঃখে বহুর সুখ হল কিনা। তা
 যদি হয়, তবে অস্ত্রের দুঃখ মার্জনীয়। বর্তমান ক্ষেত্রে তিন বন্ধুর মধ্যে—ই্যা, কাকলিও
 তার বন্ধু বটে, শুধু বন্ধু—দু-জনের চাকরি হল, একজনের চাকরি গেল। বহুজনসুখায়
 ঠিক বজায় থাকল। তাই বরেনকে কোনোভাবেই কেউ দোষী করতে পারো না।
 ৩৫ কল্যাণকৃত্য, সে পরার্থপর।

তা ছাড়া দীপঙ্কর কি তার বন্ধু ? তোমার সমৃদ্ধিতে যার যত্ননা তাকে কি সংসার
 বন্ধ বলবে ? কী করে তোমার পকেট হালকা করবে, তোমার বুকে বসে তোমারই

দাড়ি ওপড়াবে, সব সময়ে এই যার অভিসন্ধি, তাকে তুমি দেবে প্রশ্রয়-আশ্রয় ? কে কাঁটা হয়ে বিঁধে থেকে অনবরত খচখচ করবে তাকে তুমি তুলে ফেলবে না ? না দি বাঁচিয়ে রাখবে সেই অস্বস্তি ? আর কাঁটার কারুকার্যটা দেখ । আর কিছু কাকলিকে দিয়ে তদবির ! মানে বরেন নিতাস্তই খেলো, শক্তিশূণ্য, একটা মেয়েচেন এসে জল কাত বললেই সে ঘাড় কাত করবে । এ প্রায় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ, ব্যক্তিত্বের অসম্মান । বরেন যে অমন অসার নয়, তদবির শুভই হোক আর প্রকাশট হোক, সে যে নির্বিচল তা প্রমাণ করবার জগ্গেই এ কঠিন ভঙ্গিটা সমীচীন । অস্তুঃ আর যারা এখনো চাকরিতে আছে, তারা শিখবে, তারা সাবধান হবে । ভয় করবে বরেনকে, শ্রদ্ধা করবে ।

দীপঙ্কর একবার মাপ চেয়েছিল মনে পড়ছে । সে শুধু একটা কথার কারণে বিবাদের কায়দা । পা মাড়িয়ে দেবার পর ‘সরি’ বলা । তা ছাড়া এর মধ্যে মাপ-মাপির আছে কী ! ব্যবসায় খাতিরেই আনতে হচ্ছে স্বকাস্তকে । স্বকাস্তকে যদি পাওয়া যায় তবে দীপঙ্করকে কে পৌছে ! দীপঙ্করের চেয়ে স্বকাস্ত চের বেশি যোগ্য, চের বেশি তীক্ষ্ণ । স্বকাস্তকে দিয়ে বাণিজ্যের চের বেশি প্রসারের সম্ভাবনা । ব এটা নিছক বন্ধুতার প্রস্ন নয়, নিছক গণিতের প্রস্ন । ব্যবসা করতে বসা মানেনই অায় করতে আসা । আর কখনো-কখনো যে আমরা বায় বাড়াই সে শুধু আয়ের আয়তন আশা করে । স্ততরাং যৈদিক থেকেই দেখ, ধর্মের দিক থেকেই হোক, নীতির দিক থেকেই হোক বা অর্থের দিক থেকেই হোক, দীপঙ্করের যাওয়াটা বিধেয় । আব, স্বকাস্তকে আমরা কেউ ডেকে আনি নি । কেউ তদবির করে নি তার জন্তে । সে নিজের থেকে এসেছে, এসেছে নিজের জোরে । তার আসাটা অভাবনীয় । প্রায় চমৎকারের ধার দিয়ে । নিঃশব্দের মাঠ পেরিয়ে ।

তবু থেকে যাচ্ছে খটকা । দীপঙ্করের জন্তে তদবির করতে চেয়েছিল, সেই দীপঙ্করের চাকরি চলে যাওয়াটা প্রথমত নিশ্চয়ই মনঃপূত হবে না । কিন্তু যখন দেখবে সে ক্ষতির উচ্ছ্বসিত পূরণ হচ্ছে তার নিজেরই স্বার্থে, নিজেরই স্বামীতে, তখন সে নির্ধাত চূপ করে যাবে । যখন দেখবে তিস্ত গাছে মধুক্ষরণ হচ্ছে তখন গোপন তৃপ্তিতে তাই সে লেহন করবে মনে মনে । নিজের আয় স্বামীর আয়, সদয় আর খিড়িকি দু দরজা খুলে গেল একসঙ্গে, দু দরজা দিয়েই হাওয়ার খেলা চলবে চলবে বরেনের নির্ভীক আসা যাওয়া । হালে দাঁড়ে দু-জনকে বসিয়েছে দু দিকে নৌকো এবার তরতরিয়ে বয়ে যাবে যে নৌকোর প্রথম সোয়ারি, একমাত্র সোয়ারি বরেন । দেখি না আনন্দের বন্দর কোথাও আছে কি না । গোপনে ঠিক বিগলিত

হুদি না-ও হও, প্রকাশে বশীভূত তো হবে। নিজের বিবেচনায় না হও, অন্তত স্বামীর প্ররোচনায় তো হবে। নইলে তোমার স্বামীকে এনে বশালাম কেন? খিড়কি যদি রূপণ করেও রাখো, সদর উদার করে রাখবে স্বকাস্ত। যতই কেননা জোরালো হাতে নুড় টানো, তার হালের বাকের চালাকিটুকু ধরতে পাবে না। তোমার দাঁড়েও আমি, তার হালেও আমি।

কিন্তু বনে গিয়েও যে দুধ খাব, গাইয়ে-বাছুরে কি ভাব আছে? বোধ হয় নেই। কাকলি দীপঙ্করের হয়ে তদবির করে অথচ স্বকাস্তের, তার পরমগুরুর যে ঘোরতর অভাব, সমূহ একটা চাকরির দরকার, ঘৃণাক্ষরেও বলে না। আর স্বকাস্ত এমন হুড়মুড় করে এসে পড়ল, হাড়গোড় ভাঙা হয়ে যে এ বেলা চাকরি না পেলে ও বেলা তার হাড়ি চড়বে না, মান-ইজ্জত সব ভেসে যাবে। তার বউ যে হুটপুট মাইনে পাচ্ছে, এমন একখানা ভাব করল, তা যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। তার পকেট আর তার উয়ের ব্যাগের মধ্যে যেন কত যোজনের ছাড়াছাড়ি আর যার-যার হৃদয় এখন যার-যার পকেটে আর ব্যাগে।

তাই হবে—হালকা হয়ে সিগারেট ধরান বরেন—স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া, আইনের ভাষায়, অসংগতি। তাই চাকরির বাজারে কুমারী সেজেছে কাকলি হাত আর মাথা পেকে উড়িয়ে দিয়েছে স্বামীকে। বাড়ির দরজা পর্যন্ত মোটর নিতে দিচ্ছে না। আর এ চাকরিতে টুরিং হল বলে স্বকাস্ত একেবারে গদগদ, পায়লে এঙ্কনি, পরের ট্রেনেই সে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি ছাড়তে পাবে, ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারবে কাকলির সান্নিধ্য এই এখন তার দ্রুততম উপশম—এমনি যেন তার অস্থিরতার অর্থ। সন্দেহ নেই, গভীরে কোথাও ওদের বেস্বর লেগেছে, স্বপ্ন কাট ধরেছে। লাগুক, ধরুক, ধুঁইয়ে-ধুঁইয়ে জলুক দু-জনে। সেখানেও তবে বরেনেরই খেলা। সেতু বাঁধার খেলা। এ হাত ভূমি ধরবে, ও হাত ও। মিলিয়ে দেব। সে মিটমাটের মামলায় আমিই জানবে প্রধান মোক্তার।

আর, যদি মিটমাট না করো, সেখানেও আমি। ভূমি এ কানে লাগাবে, ও ওর কানে। দু পক্ষই অস্ত্র জোগাব। এক পক্ষকে শক্তিশেল দিয়ে আরেক পক্ষকে গন্ধমাদন। দু পক্ষের মামলায়ই তদবিরকার সাজব—দু-জনেই জানবে এমন হিতৈষী আর হতে নেই। যেমন চাও, কাটলটা প্রশস্ত করে দেব। উড়িয়ে দেব অট্টালিকার চূড়া। যদি সুরিধে হয় তো, খসিয়ে দেব কাকলির চাকরি। আরো সুরিধে হয়, স্বকাস্তকে সরিয়ে আবার বসবে দীপঙ্কর। লাগ ভেলকি লাগ। তুকেও আমি তাকেও আমি। আমাকে যেমন লাগাবে তেমনি লাগব। যেমন নাচাবে তেমনি

নাচব। বন্ধুতায়ও আমি, শত্রুতায়ও আমি। আমার উজোগ-প্রয়োগ নেই। শুধু এখন বলো, আমাকে কী করতে হবে, কী করলে তুমি সুখী হও। দেখি পারি কিনা করতে।

তাই তোমাদের ভাব না ঝগড়া, জানতে চাই না, তোমরা চাকরি চেয়েছ জোগাড় করে দিয়েছি। উপকার চেয়েছ, করেছি উপকার। আমার তবে দোষ কী, দায়িত্ব কী! তোমরা ভাবে আছ না অভাবে আছ, শশু না দুর্ভিক্ষে, তা নিয়ে আমার কী মাথাব্যথা! জানতেও চাই নি, চাইবও না কোনোদিন। আমার শুধু কান পেতে থাকা, প্রাণ পেতে থাকা। সাধ্যমত পরোপকার করা। আর, মাপ কোরো, মনে মনে ডুগডুগি বাজিয়ে লাগ ভেলকি লাগ মস্ত বলা।

দীপঙ্করের চাকরি যাবার পর তার জন্তে তদবিরে কি আরো একটু ঘন, ক্রত হোক কাকলি? না কি একেবারে সরে পড়বে, এ তল্লাটও ঘেঁষবে না? লাগ ভেলকি লাগ। দেখ না ঘটনার স্রোত কাকে কতদূর ঠেলে নেয় বা টেনে আনে? তুমি শুধু দেখ আর গুণ্য যা বলে তাই করো। আর জল চাইলেও ফল চেয়ো না। ফলেষু কদাচন।

‘এখন প্রশ্ন হচ্ছে,’ হাসিমুখে স্বকাস্তকে বললে বরেন, ইংরেজিতে বললে, ‘তোমাকে কিভাবে ডাকি, কোন সর্বনামে?’

ইংরেজিতে উত্তর দিল স্বকাস্ত : ‘যেমন তোমার খুশি।’

বাঙলা ধরল বরেন : ‘মানে, আপনি বলি, না তুমি বলি, না তুই বলি?’

‘তুমিটা ভীষণ বিচ্ছিরি।’ স্বকাস্ত ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘মনে হয় যেন মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক। উর্ধ্বতন অধস্তনকে হুকুম করছে।’

‘তা হলে আপনি?’

‘সেটা একটা দূরদিগন্তের ডাক। প্রাণ নেই, তাপ নেই, রক্ত নেই—’

‘তা হলে তুই।’ হো-হো কপ্পে হেসে উঠল বরেন।

‘সবচেয়ে ভালো। সবচেয়ে হৃদয়।’

‘উহ। বাঙলা চলবে না। ইংরেজিতে বলব। তুই বলাটা আকিসের পক্ষে অসম্ভব।’

‘কিন্তু আমাদের মধ্যে সবটাই তো আর আকিস নয়।’ মোলায়েম করে বললে স্বকাস্ত, ‘কিছুটা তো আবার বাড়িঘরও আছে।’

‘নিশ্চয়ই আছে।’ উৎসাহে উঠল বরেন : ‘তখন আমাদের তুই—চিরকলে তুই।’ সিগারেট-কেসটা মেলে ধরল। স্বকাস্ত একটা নিলে, নিজেকে আরেকটা

ধরাল। বললে, ‘এখন যেমন। আফিস-টাইমের পর এখন এ ঘর আমাদের বৈঠকখানা—’

‘আড্ডাখানা।’ কথাটা আরো উষ্ণ করল স্বকান্ত।

‘খুব ভালো বলেছিস।’ বরেন আবার অটেল হেসে উঠল : ‘এখন তোর চতুর্দিক ভালো। যা এখন তুই বলবি-চলবি সব কিছু ঝিলিক মায়বে। তোর মত ভাগ্যবান আর কজন?’

‘ভাগ্যবান?’ হাতের সিগারেটটা হাতেই ধরা রইল স্বকান্তর।

‘তোর স্ত্রীও তো চাকরি করছেন শুনেছি—’ চোখের দৃষ্টিটাকে একটু তির্যক করল বরেন।

‘ই্যা, করেন একটা।’ স্বকান্ত পাশ কাটাতে চাইল।

‘কোথায় যেন?’

‘বাটারওয়ার্থে।’

‘বলিস কী! তা হলে মাইনে তো বেশ ভালোই। বা, পেল কী করে?’

‘কী জানি কী করে!’

আসলে স্বকান্ত সমস্ত বিবরণ জানে না। কাকলিই জানায় নি, চেপে রেখেছে। তার মানেই ওদের সম্পর্কের সারল্যা ঘুচে গিয়েছে, দেখা দিয়েছে অনৈক্য। স্বন্দর আরাম পেল বরেন। বরেনকে আড়ালে রেখেছে। গোপনে রেখেছে। যাকে আপনার জন বলে বিশ্বাস তাকেই তো নিশ্চিত হয়ে রাখা যায় লুকিয়ে।

‘তা হলে তুই তো মহাভাগ্যবান।’ বরেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো : ‘চিরকাল শিল্ডের এক দিকই থাকে, তোর দুই দিকে শিল্ড। প্রতিমার এক দিকে রঙচঙ, আরেক দিকে খড়। তোর প্রতিমার এদিকেও রঙচঙ ওদিকেও রঙচঙ। মাগ্গবে নিজে একটা চাকরি পায় না,’ বরেন হাসল : ‘আর তোদের স্ত্রী-পুরুষে চাকরি। আয়ে-আয়ে কায়পরিমাণ।’

‘আমার স্ত্রী চাকরি করে তাঁতে আমার কী।’ স্বকান্ত মুখ ফিরিয়ে নিল।

‘আমার কী মানে! একসঙ্গে থাকিস না?’

‘একসঙ্গে থাকলে কী হয়!’

‘কী হয় মানে? যখন স্ত্রী মেটারনিটিতে যাবে, তখনো বলবি, এ আমার স্ত্রীর চাকরি—আমার কী!’ হাসল বরেন : ‘ভুখা-ও শুনেছি দু হাতে খায় না। কিন্তু যাই বলিস, এ তোর দু হাতে খাওয়া। গাছেরও খাবি, তলারও হুড়োবি। মজাসে আছিস যা হোক।’

‘মোটাই নয়।’ কথা যখন উঠেছে, প্রতিবাদ করতে হয় দৃঢ় হয়ে। বরেন শুধু বন্ধু নয়, মনিব। ওকে অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। তাই স্বকাস্ত বললে, ‘নিজের শক্তিসামর্থ্য আছে, গাছে উঠতে জানি, নিজেই পাড়ছি গাছেরটা।’

‘আর তলারটা? স্ত্রীর রোজগারটা?’

‘যার রোজগার সেই খাচ্ছে। তার আলাদা সব পোশাক পাল্য আছে তাদেরই খাওয়াচ্ছে।’

‘তোকে দিচ্ছে না কিছু?’

‘না।’ বলতে স্বস্তি পাচ্ছিল না স্বকাস্ত, তাই ফের যুক্ত করলে, ‘কে চায় তারটা?’

‘বা, চাইতে হবে কেন? স্ত্রী নিজের থেকেই স্বামীর ভাণ্ডার পূর্ণ করবে। এক গুণকে দ্বিগুণ করবে। তারই জন্তে তো কৃতী মেয়ে বিয়ে করা।’

‘উনি আবার একটু বেশি কৃতী। অহংকারের রঙ-মশাল। এবার যাবে অহংকার।’ সিগারেটটা টেবিলের উপর ঠুকতে লাগল স্বকাস্ত।

‘অহংকার যাওয়াই ভালো।’ বচন ঝাড়ার মত করে বললে বরেন, ‘শত হলেও স্ত্রী, একটু আয়ত্তে-অধীনে থাকবে তো! তা তাদের তো প্রেমের বিয়ে। সেই প্রেম এরই মধ্যে ফ্রেম হয়ে গেল?’

স্বকাস্ত চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল। নথ দিয়ে চিরতে লাগল সিগারেটটা।

‘কথাটা বুঝতে পেরেছিস?’

‘পেরেছি। ছবি নেই কাঁচ নেই পিজ্জবোর্ড নেই শুধু ফ্রেমটা ঝুলছে।’

হো হো করে হেসে উঠল বরেন : ‘প্রেম ফ্রেম হয়ে গেল! কী, ভালো বলি নি?’ পরক্ষণেই গম্ভীর হল : ‘কিন্তু তোর ভাগ্যে এমন হল কেন?’

‘চোখের ভুলে আমিও বুঝি ফ্রেম দেখেছিলাম। সার-শস্ত্র নেই, শুধু ঠাট, শুধু ঝিলিক—’ ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বুঝি স্বকাস্ত। সিগারেটটা দলা পাকাতে লাগল।

‘কী যে বাজে বকিস তার ঠিক নেই।’ আশ্বাস দেবার মত করে বললে বরেন, ‘এসব বিরোধ জলের দাগ—এ মিটে যাবে। তোকে সচ্ছল দেখলেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোর পদ প্রাস্তে বসবেন তোর স্ত্রী—কী জানি সেই গানটা—‘পদপ্রাস্তে রাখে সেবক’—ধরবেন সেই গান।’

‘দেখি কী হয়! ম্লান হেসে উঠে পড়ল স্বকাস্ত।

‘কিন্তু একটা কথা। এক জায়গায় একটু খটকা লাগছে।’ বরেন আবার দৃষ্টি তির্যক করল : ‘তোর এই সচ্ছলতাটা না অল্প দিক থেকে তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়।’

‘ক্লোভের কারণ হবে? কার? কাকলির?’ স্বকাস্ত খেমে পড়ল।

‘দীপঙ্করকে ডিসমিস করে সে ভেকেঙ্গিতে তো তোর চাকরি।’ একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন : ‘দীপঙ্করের ডিসমিসটা হয়তো তাঁর ভালো লাগবে না।’

‘কেন, তাতে তার কী? কোন আফিস কাকে নিচ্ছে না তাড়াচ্ছে তাতে তার কী মাথাব্যথা!’

‘না, দীপঙ্করের কেসটা আলাদা।’ বরেন তাকাল কাগজপত্রের দিকে : ‘দীপঙ্করের জন্তে উনি তদবির করেছিলেন—’

‘তদবির?’

‘হ্যাঁ, আমাকে অনেক ধরেছিলেন যাতে দীপঙ্করের মাইনেটা বাড়িয়ে দিই।’ আসনে দৃঢ়ভূত হল বরেন : ‘কিন্তু পারলাম না তাঁর অল্পবোধ রাখতে। দীপঙ্করটা কাজে-কর্মে খারাপ, অলস, তাতে আবার অসন্তুষ্ট। তার উপরে জ্বীলোক পাঠায় তদবির করতে! ইচ্ছিতটা কী অজ্ঞায়। তিনি ওর ইন্টিমেট বলে তাঁকে না হয় ও ইনফ্লুয়েন্স করল, কিন্তু আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করে কে? আমাকে টলানো কি এতই সোজা?’

স্বকাস্তই টলতে লাগল।

‘কিন্তু যাই হোক, মিসেস বোসকে পুষিয়ে দিলাম। খিড়কি দিয়ে যা বেরিয়ে গেল তাই ফিরে এল সদর দিয়ে, হয়তো বা বেশি হয়ে।’ হাসতে লাগল বরেন : ‘তাই আসলে তাঁর ক্ষুদ্র থাকবার কোনো কারণ রইল না—রাখলাম না কারণ।’

সিগারেটের দলাটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল স্বকাস্ত।

স্বকাস্তকে আর এখন পায় কে। স্যুটে-বুটে খটমট করতে লাগল। তার চাকরি হয়েছে, মার্কেটাইল ফার্মে চাকরি হয়েছে, ছল্লাড় পড়ে গেল চারদিকে। য়গালিনী তার বুকপিঠে হাত বুলুতে লাগল, মা সর্বমঙ্গলাকে বলতে লাগল, মা, আমার স্বকুকে উজ্জ্বল করো। আর জন্ম করো কালনাগিনীকে। বিজয়া বন্দনাও ওখলাতে লাগল, এমন কাণ্ড শুরু করল যেন তারা লটারিতে বিলেত যাবার টিকিট পেয়েছে। সংসারে সবদিকেই এখন জলুস, শুধু একজনের মুখটাই আশাহুরূপ চকচকে নয় এই নিয়ে আবার টিঙ্গনী। স্বামীর স্থখে স্থখ নেই এ কোন ছিরির ইস্তিরি! যাই বলো, খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে এবার। কাকলির চেয়ে স্বকুর মাইনে বেশি। আর তোর বাড়িতেও শাড়ি চাকরিতেও শাড়ি। সেও তোর দশ হাতে কাছা নেই, আর দেখ দেখি পুরুষকে, কেমন বিচিত্র সে বেশেবাসে। ষ্টি-পাঞ্জাবিতেও সুন্দর, কোটেপ্যান্টেও সুন্দর। পুচ্ছেও সুন্দর, কেশরেও সুন্দর।

তুই যাস আবার তার সঙ্গে টেকা দিতে ! এক পঙ্ক্তিতে বসে আফিসের ভাঙ
থেতে !

‘ছোড়দার ভাতটা আগে দিয়ে দাও ।’ ঠাকুরকে তাড়া দিল মুণালিনী ।

আফিস-আদালত যাবে, আর-সকলেও বসেছে খাবার টেবিলে, কিন্তু মুণালিনীর
অনন্ত নজর স্বকাস্তে । বন্দনা-বিজয়াও লেগেছে তার সাহায্যে । কেউ হুন-নেবু
এগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা জলের গ্লাস । সকলের এমন ভাব, যদি কুতিত্ব বা কৌশল
কেউ দেখিয়ে থাকে এ যুগে তবে সে স্বকাস্ত । পরীক্ষায় সে কম হতে পারে,
বিয়েতে সে ঠকতে পারে কিন্তু এখন, চাকরিতে, টাকা উপার্জনের ক্ষেত্রে, সে
করিতকর্য্য ।

‘ছোট বউমাকে দেবে না ?’ এক পাশে কুষ্ঠিতের মত, উদ্বাস্তের মত কাকলি
দাঁড়িয়ে আছে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল হেমন ।

‘হবেখন ।’ মুণালিনী ঝামটা দিয়ে উঠল : ‘একেবারে স্বামী-স্বস্তর-ভাস্করদের
সঙ্গে একত্রে বসে খাবার কী হয়েছে ?’

‘বা, তারও যে দশটায় আফিস ।’

‘যা না চাকরি তার আবার আফিস ! তার আবার দশটা-পাঁচটা ! ও খোঁয়াডে
এগারোটায় গেলেই বা কী, বারোটায় গেলেই বা কী !’ মুণালিনী গজগজ করতে
লাগল ।

‘আর না গেলেই বা কী !’ ব্যঙ্গের ভঙ্গি করল হেমন ।

‘হ্যাঁ, না গেলেই বা কী !’ মুণালিনী দাঁড়াউ করে উঠল : ‘যে চাকরিতে সংসারের
সুখই নেই তা থাকলেও যা, না থাকলেও তাই ।’

আবার কী বলতে যাচ্ছিল হেমন, কল্পণমুখে কাকলি বললে, ‘আপনি ব্যস্ত হবেন
না, আমি রান্নাঘর থেকে নিজেই নিয়ে নিচ্ছি ।’

একটা কলাইকরা বাসন কুড়িয়ে নিয়ে কাকলি ঢুকল রান্নাঘরে । ঠাকুরের পরি-
বেশনের ফাঁকে দু হাতা ভাত আর এক হাতা ডাল আর কিছু ভাজাভুজি তুলে নিয়ে
দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে থেতে লাগল ।

‘খাবার আবার এ কোন ছিри !’ হুমকে উঠল মুণালিনী ।

ক্ষিপ্ৰ ভঙ্গিতে কাকলি থালা নিয়ে মাটিতে বসে পড়ল তক্ষুনি ।

বন্দনা এল সর্দারি করতে : ‘দাঁড়াও, একটা আসন পেতে দি । ভজ্র হয়ে বসে থাও ।’

উইংস-এর ভিতর থেকে বিজয়াও উকি মারল : ‘শুধু ঝাড়া ডাল-ভাত কেন ?
এক টুকরো মাছ নাও ।’

কাকলি কথা বলল না। গ্রাসে-গ্রাসে এগোতে লাগল।

‘অমন খাবা দিয়ে জিনিস তুলে নিয়ে হতভীর মত খাবার কী হয়েছে! বাড়ির বউ বাড়ির লক্ষী তাড়াবে এ কেমন কথা!’ চুড়ান্ত কথাটা তারপরে ছাড়ল মৃণালিনী : ‘ভিন্ন বউ হয়ে চাকরি করবার কী দরকার!’

‘তারপর এখন যখন ঠাকুরপোর চাকরি হল।’ বন্দনা পাড় বুনল।

‘চাকরি না হলেই বা কী। তাই বলে মেয়েদের দুপুরবেলার ঘুম যাবে?’ পাড়ে তুলল বিজয়া : ‘মেয়েরা জন্মেইছে এই দুপুরবেলায় ঘুমবার জন্তে। ঘুমিয়ে-মিয়ে নিটোল হবার জন্তে। মেয়েদের এই সনাতন জন্মগত অধিকার যারা লুপ্ত র্তে চায়—’

তাড়াতাড়ি খেয়ে-আঁচিয়ে উপরে উঠে এল কাকলি। ঘরে স্বকান্তর শামিল হল।

‘শ্রীমানের চাকরিটা কোথায় হল?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘হুগ স্বকান্ত কানেও তুলল না।

‘তা হলে রিসার্চ ছেড়ে দিলে? ছেড়ে দিলে প্রকেশারি স্বপ্ন?’

‘চাকরি পেলে কে আর রিসার্চ করে? দাঁড়াবার পা পেলে কে তার পায়ের নিচের দ, মানে ফুটনোট দেখে? একটা কারখোনালানো বা চাদর-দোলানো মাস্টারের হয়ে কোটে-নেকটাইয়ে একটা রাজপুত্ৰ অফিসর ঢের বেশি স্বন্দর।’

‘এই। রাজপুত্ৰ চাকরিটা কোন মূলকে? রাজ্যটার নাম কী?’

গ্রাহণ করল না স্বকান্ত। সাজগোজ করতে লাগল।

‘বলি চাকরিটা জোটালে কিসে?’

‘আর যায় কোথা! সংযমের সীমা পেরিয়ে গেল স্বকান্ত। বললে ‘আর যাই হোক, মেয়েমাছুষ পাঠিয়ে তদবির করিয়ে নয়।’

‘তার মানে?’ সর্বাঙ্গে নিম্পন্দ কাঠ হয়ে রইল কাকলি।

‘কী হল তদবিরে? ফুল ফুটল, না ফল পাকল?’ আঘাতের আনন্দে মরিয়া হয়ে হুগ স্বকান্ত : ‘কিছু হল না। উলটে অপমান করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিল।’

‘তুমি কার কথা বলছ?’ চাপা আর্তনাদের মত শোণাল কাকলিকে।

‘কাক কথা বলছি না। কিন্তু যে তদবির করতে পাঠায় অপমান তার নয়, যে তদবির করতে যায় অথচ বার্থ হয়, গাল বাড়িয়ে চড় নিয়ে আসে, অপমান তার। কিন্তু এখন, এই অপমানের পর, এখন কী করবে?’

‘বা, আমার কথা তুমি কী বলছ!’ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কাকলি : ‘আমি কী করেছি, আমি কী করব!’

‘না, করবে বৈকি। এখন বন্ধুর—তোমার স্বজন মাঝির—গলা ধরে বসে কাঁদবে কথটা ছুঁড়ে দিয়েই নিচে নেমে গেল স্বকাস্ত।

প্রণামাদি সারতে কিছুটা সময় নেবে, ইতিমধ্যে ঝটপট তৈরি হয়ে নিল কাকলি তর সইছে না। মোড় পর্যন্ত একসঙ্গে পায়ে হাঁটার পথেই কথটা খোলসা করে নিতে হবে—কাকলিও ব্যাগটা হুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেঁচি পড়ল।

‘শোনো—’ক পা আগেই বা স্বকাস্ত, পিছন থেকে ডাকল কাকলি।

ভাগ্যের কী দয়া, হঠাৎ খালি একটা ট্যাক্সি এসে উপস্থিত হল, স্বকাস্ত হাত ডুঁদাড়া করাল। ভালোই হল, ভাবল কাকলি, পথে চলতে-চলতে কি আর করা চলে, গাড়িতে বসেই ঠিক পরিবেশটা হবে। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল স্বকাস্ত, দ্রুত পায়ে কাকলি প্রায় কাছে গিয়ে পৌঁছেছে, কতটুকুই বা দূরত্ব, বরষা মত বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভারের ভুল হয়তো। স্বকাস্তের নির্দেশে এখনি নিশ্চয় থামবে, তুলে নেবে কাকলিকে। আর কিছু না হোক অন্তত এক বেনা ভিড়ের যন্ত্রণা থেকে একজন সহযাত্রীকে বাঁচাবে স্বকাস্ত! কিন্তু থামল না ট্যাক্সি কাকলি বোকার মত, চাপা-পড়ার মত, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইল।

লাঞ্চ টাইমে তুলে নিল টেলিফোন।

‘হ্যালো।’ ওপার থেকে বরেন প্রতিধ্বনিত হল।

‘আমি মিসেস কাকলি বহু।’

‘নমস্কার। আজকাল আপনার নামের প্রথম অক্ষরটিও বলতে হয় ন টেলিফোনের ঘণ্টা শুনেই বুঝতে পারি। তারপর—শুনেছেন খবর?’

‘না তো। কী খবর? আছে নাকি কিছু?’

‘বা, স্বহু, খুড়ি, আপনার মিস্টার স্বকাস্ত বহু বলেন নি আপনাকে?’

‘তত্ত্বমাত্র না।’

‘সে কী?’ তারপর একটু খেমে হালকা করে তুলি টানল বরেন : ‘না বহু’ কিন্তু লক্ষ্য করেন নি কিছু?’

‘হ্যাঁ, লক্ষ্য করলাম সাজগোজে হঠাৎ খুব গর্বিত হয়ে উঠেছেন।’ হালকা টা কাকলিও আমদানি করল : ‘তেলাপোকা পাখি হলে যেমন হয়। দাঁড়কাক ঘণ্টা ময়ূরের পাখা পিঠে গোঁজে—’

‘কী আশ্চর্য, ওর যে আমাদের এখানে চাকরি হয়েছে। টার্মস—শুনবেন কাছে—যত দূর লিবারেল হতে হয়। তা ছাড়া ইচ্ছেমত মাদ্রাজ-বোম্বাই টুপি

হে। টুরিং হলেই টি-এ। তারপর টেলিফোন পাবে বাড়িতে। বুঝুন—আর
; চাই!’ তারপর একটু থেমে : ‘কী, খুশি?’

‘ভীষণ খুশি। কিন্তু দীপঙ্কর? দীপঙ্করের কী হল?’

‘আপনার এই নতুন আনন্দে-আলোকে দীপঙ্করকে অনায়াসে খারিজ করে দিতে
বরেন। তাই করাই উচিত।’ অনাবশ্যক স্পষ্ট ও শক্ত হল বরেন : ‘দীপঙ্কর
ভিসমিস হয়ে গিয়েছে।’

‘ভিসমিস হয়ে গিয়েছে!’ কেঁপে উঠল কাকলি।

‘কথাটা ঠিক মোলায়েম শোনাচ্ছে না, কিন্তু এ ছাড়া অবশ্য কোনো পথ ছিল না।’

‘একজনকে চাকরি দেবার জগ্রে আরেকজনের চাকরি খেলেন?’

কথাটা খুব বিজ্ঞী শোনালা, তবু বরেন গায়ে না মাথবার চেষ্টা করল। লঘুতা
লায় রেখে বললে, ‘কিন্তু যাকে চাকরি দেওয়া হল সে আপনার কে?’

‘যেই হোক, কিন্তু এভাবে একজনকে সর্বস্বান্ত করা, তার মুখের ভাত কেড়ে
‘গ্না—এটা কি ত্রায় না ধর্ম?’

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল বরেন। পরে বললে, ‘এসর ব্যাপারে ফার্মের কর্তা
তার বাবা, তিনিই প্রোপ্রাইটর, মালিক, ম্যান অ্যাট দি হুইচ—’

‘তার সঙ্গে তো আলাপ নেই। আপনাকে চিনি, আপনাকেই বলছি।’

‘সবচেয়ে তো আপনার বেশি আলাপ স্বকাস্ত বস্তুর সঙ্গে। স্বতরাং তাকে বললেই
সবচেয়ে ভালো হয় না?’

‘তাকে বলে যদি তাকে সরিয়েও নিয়ে আসা যায় চাকরি থেকে তা’হলে কি
পঙ্কর তার পুরোনো জায়গা ফিরে পাবে?’

‘পাবে না। এক কাস্ত সরে আরেক কাস্ত আসবে, কিন্তু যে দীপ একবার নিবেছে
আর জলবে না। কথাটা একটু ফিলসফিক্যাল হয়ে গেল। মাপ করবেন।’

‘একজনের খিদের উপরে ভরাপেটে ফিলসফি করতে বাধা কী।’

‘কিন্তু আপনার স্বামীর খিদেটাও তো দেখবেন। তাই বলে এভাবে দেখবেন,
স্বকাস্তকে চাকরি দেবার জগ্রেই দীপঙ্করকে তাড়ানো হল! বরং এভাবে দেখবেন,
পঙ্করকে তাড়ানো হল বলেই নেওয়া হল স্বকাস্তকে। তা ছাড়া, শুনছেন,’ গলাটা
কটু খাটো করল বরেন : ‘প্রিয়তমের চেয়েও প্রিয়তর কেউ থাকতে পারে ভাবতে
পারতাম না। আমি তো ভেবেছিলাম স্বকুর পেট ভরলে আপনারও বুক ভরবে।
হিসেবে মিল থাকবে। হ্যালো—শুনছেন? হ্যালো—’ ওপারে শব্দ নেই। লাগ
লকি লাগ—বরেনও ছেড়ে দিল টেলিফোন।

কিন্তু দীপঙ্করকে, দুর্গাবালাকে, ওদের সমস্ত পরিবারকে কী করে মুখ দে-
কাকলি ! তাই বলে সে পালিয়ে যাবে না ককখনো, দুই হাতে যত শক্তি আছে
রশিতে টান দেবে, প্রাণপণ চেষ্টা করবে দুর্ভাগ্যের ঘাটের থেকে বিকল চাকাটা
কিনা তুলতে। পারবে, এক শো বার পারবে। যে যুদ্ধের জন্তে প্রস্তুত সেই জ-
জন্তে প্রস্তুত।

সমস্ত দিনটা স্নান হয়ে রইল। আফিসের পর কাকলি সোজা চলে গ-
দীপঙ্করের বস্তি।

তাকে দেখেই মড়াকান্না শুরু করল দুর্গাবালা। আর দুর্গাবালাকে কাঁ-
দেখে শিশুগুলোও স্রব জুড়ল। আভা বিষ্টুও দলছাড়া রইল না।
দিদি আঁচলে চোখমুখ ঢেকে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে দাঁড়াল এসে সামনে।
দীপঙ্করের বাবা যে শুধু উঠোন আঁকড়ে ধরে ধোঁকে সেও হঠাৎ কপাল চাপড়-
লাগল মাটিতে।

‘কি, কী হয়েছে?’ চারদিকে ব্যাকুল চোখ মেলে জিজ্ঞেস করল কাকলি
কেউ মাঝা গিয়েছে এমনি মনে হচ্ছে। এমন কেউ মরেছে যাকে কাকলি
চেনে। তাই এই অঝোর কান্না। কিন্তু কে সে প্রিয়জন? তবে কি—তবে কি—
পাশবাসীকে জিজ্ঞেস করল, ‘কী হয়েছে এদের? কোনো শোক—মৃত্যু-
আত্মহত্যা?’

‘ওদের চাকরি চলে গিয়েছে।’

কাকলির মনে হল চাকরি নামে এদের এক বলিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ আত্মীয় ছিল
সমস্ত সংসারের যে স্তম্ভ। পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সে মাঝা গিয়েছে অপঘাতে
বন্দুকের গুলিতে।

দুর্গাবালার কাছে এসে বসল কাকলি।

অনেক পরে চোখ মুছে দুর্গাবালা বললে, ‘তুমি এ ছলনাটা না করলেই পারত
কোথায় তুমি দীপুর মাইনে বাড়িয়ে দেবে বললে, তা নয়, উলটে তাকে ডিসমি-
খাওয়ালে আর তার জায়গায় বসালে তোমার স্বামীকে! শুনেছি বড়লোক
ধর্ম নাকি আলাদা। কিন্তু, তুমি বলো, বড়লোক বলেই ধর্ম বরদাস্ত করবে
অবিচার!’

‘করবে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এতে আমার কোনো হাত নেই।’

‘তোমার হাত নেই?’

‘না, সব আমার শত্রুর চক্রান্ত।’

‘শত্রু!’

‘হ্যা, আমার স্বামীর।’ মাথা নোয়াল কাকলি।

‘এসব তুমি কী বলছ!’

‘বিশ্বাস করা কঠিন, কিন্তু যা বলছি তার এক বর্ণ মিথ্যে নয়। সম্প্রতি স্বামীই আমার প্রতিপক্ষ। আর আমাকে জন্ম করবার জন্মেই তার এই কারসাজি।’
মুখের দিকে মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল দুর্গাবালা।

‘স্বামী যে শত্রু হতে পারে তা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না? ঐ উঠোনে বসে যে ধুকছে, সমস্ত আয় ফুঁকে দিচ্ছে নেশাভাঙে, ও আপনার শত্রু নয়? আপনাকে বলেছি, অপরাধে আমার হাত নেই, কিন্তু তার প্রতিকারে হাত আছে। নিশ্চয় আছে, এক শো বার আছে। আমি তার প্রমাণ দেব। কিছু প্রমাণ এখনি দিচ্ছি— এখনি—’ ব্যাগ খুলে কিছু টাকা বের করল কাকলি।

টাকা দেখে প্রথমে ভয় পেল দুর্গাবালা। হাত সরিয়ে নিতে চাইল।

‘দুপিপু যেমন আপনার ছেলে আমিও তেমনি আপনার মেয়ে। বিপদের দিনে সমর্থ মেয়েকে সাহায্য করতে দেবেন না কেন?’ দুর্গাবালার হাতে নোট কথানা জোর করে গুঁজে দিল কাকলি। বললে, ‘এ যদি আমার ছলনা হত, আমি আসতাম না, হোক সামান্য, তবু এই সামান্য টাকাও দিতাম না আপনাদের, অগ্নায়ের প্রতিকারের পথ খুঁজতাম না—’

‘না, না, স্বামীর সঙ্গে বিরোধ ভালো নয়।’ দুর্গাবালা বলছে আর আঁচলের খুঁটে নোট বাঁধছে।

‘এ বিরোধ স্বামীর সঙ্গে কিনা জানি না, কিন্তু এ বিরোধ ক্ষুদ্রতার সঙ্গে, ঔদ্ধত্যের সঙ্গে, অগ্নায়ের সঙ্গে।’ উঠে পড়ল কাকলি : ‘দীপঙ্করবাবু কোথায়?’

কাছেই কোথায় আছে, ডাকতে গেল ছেলেরা।

জলন্ত হৃৎস্পন্দনের মত দাঁড়াল এসে দীপঙ্কর। দেখল কাকলিকে। যেন পরাভব মানবে না এমন আনন্দ তার চোখে। যেন নিঃশেষ হবে না এমন অভয় তার আননে।

‘আপনাকে উইদাউট নোটিশে ডিসচার্জ করেছে?’

‘হ্যা, উইদাউট নোটিশে।’ বললে দীপঙ্কর।

‘আপনি কোর্টে মামলা করুন। ডিসচার্জ ভ্যালিড নয়।’

‘মামলা করব কার বিরুদ্ধে?’

‘কারের বিরুদ্ধে। বাপ-ছেলের ফার্ম, বাপ-ছেলের বিরুদ্ধে।’

‘আর যে লোকটা বসল, বা যাকে বসাবার জগ্গেই আমাকে খসাল তাকেও হা হলে ডিফেন্ডেন্ট করতে হয়।’

‘করবেন, এক শো বার করবেন। কাউকে ছেড়ে দেবেন না।’ কাকলি প্রথরকণ্ঠে বললে, ‘ওদের সমস্ত ভূয়ো প্রেক্ষিজ গুঁড়ো করে দেবেন।’

‘কিন্তু মামলার টাকা পাব কোথায়?’

‘টাকা আমি দেব।’

‘আপনি দেবেন?’

‘ই্যা, আমার উপার্জনের ক্ষমতাকে সার্থক করব।’

• ৩৫

‘ছি ছি ছি, তুমি এইরকম?’ ঘরে নিরিবিলি হবার পর বলা নেই কওয়া নেই, কাকলি হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠল।

‘এটা তো আমারও মনের কথা।’ বললে স্বকান্ত।

‘তোমারও মনের কথা! তোমার মন যে এত ক্ষুদ্র তা কে জানত!’

‘আর তোমার মন যে এত কুটিল এত কুৎসিত তাই বা কি জানা ছিল আমার?’

‘কুৎসিত? তা তো তুমি এখন বলবেই। কিন্তু, আমার কথা থাক। তুমি—’ অলক্ষিতে এক পা কাছে এগোল কাকলি: ‘তুমি কী বলে এক গরীব মানুষের চাকরি খেলে?’

‘গরীব মানুষ!’ আকাশ-থেকে-পড়া ফ্যাকাশে মুখ স্বকান্তর: ‘সে আবার কে?’

‘সে আবার কে! ত্রাকা সাজতে চেয়ে না। সে তোমার দীপঙ্কর।’

‘আমি তার চাকরি খেলায় মানে?’ ঝাঁজিয়ে উঠল স্বকান্ত: ‘আমি কি তার এমপ্লয়ার? তার মনিব?’

‘সেটাই তো দি মোস্ট আনকাইণ্ডেস্ট কাট। তুমি তার বন্ধু।’

‘বন্ধু! সবাই সবাই বন্ধু।’

‘তাই তো দেখছি—’

‘বন্ধু— তা হয়েছে কী ! ওর চাকরি খাওয়াতে আমার হাত কোথায় ?’

‘তোমার হাত নয় তো কার হাত ?’

‘ওর মাস্টার বরেন— বরেনের হাত ।’

‘হাত বরেনের হতে পারে কিন্তু গ্রাসটা তোমার ।’ কাকলি রি-রি করে উঠল :
‘পাঠাটা কাটল বরেন কিন্তু খেলে তুমি ।’

‘তার আমি কী জানি !’ উদাসীন হবার ভঙ্গি করল স্বকান্ত : ‘ক্ষুধার্ত হয়ে
খেতে চেয়েছি খেতে দিয়েছে । মাংসই খেতে দিয়েছে । কিন্তু সেটা কার পাঠা
তা আমি বুঝব কী করে ?’ কিরকম তির্যক রেখায় তাকাল স্বকান্ত ।

‘ছি ছি ছি,’ ঝিকারে শতধা হতে চাইল কাকলি : ‘তুমি শুধু ক্ষুধ্র নও, ভয়ংকর
কুদ্র ।’

‘কেন, আমার কী অপরাধ ! তুমি তো খুব আইন মানো, আইনকেই বলে
শেষ সীমা । সেই সীমা আমি লঙ্ঘন করলাম কোথায় ? অনেস্টলি একটা চাকরি
চাইলাম, ফ্যায়ার অ্যাণ্ড স্কোয়ার পেয়ে গেলাম একটা । টার্মস ভালো মনে হল—
তোমার চেয়ে অস্তুত বেশি মাইনে— রেডিলি অ্যাকসেপ্ট করলাম । এতে আইনের
চোখে আমি দণ্ডনীয় কিসে ? এ আমি বলি নি যে ওকে কেটে আমাকে বসাও ।
ওর থেকে কেড়ে নিয়ে আমাতে ঢালো । আমি পৌছে দিতে বলেছি, আমাকে
পৌছে দিয়েছে । গাড়ি জলে এসেছে না ধোঁয়ায় এসেছে, তেলে এসেছে না ঠেলে
এসেছে এ আমার প্রশ্ন নয়—পারেই না হতে ।’

‘কিন্তু যখন তুমি দেখলে তোমার চাকরির সুবিধে করে দেবার জন্তে আরেক-
জনকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হল, আর যে বরখাস্ত হল সে আর-কেউই
নয়, তোমারই বন্ধু, শুধু বন্ধু নয়—তুমি জানো, কী হুঃস্থ আর দুর্বল—তখন কি
তোমার বলা উচিত ছিল না, এ চাকরি আমি নেব না, অস্তুত এ অবস্থায় নেব
না ?’ কাকলি হাঁপাতে লাগল : ‘বলো, ছিল না উচিত ?’

‘না । কোনো আইনে তা লেখে না ।’ আচার্যের মত ভঙ্গি করল স্বকান্ত :
‘দেওয়ানি ফৌজদারি কোনো আইনই নয় । আর ভগবান থাকুন আর নাই থাকুন,
আইনেরই জয় হোক ।’

‘তাই হোক । তাই হবে ।’ কাকলি গুম মেরে বসে রইল চেয়ারে ।

‘ধরো, তুমি এক চাকরি, আমার হাতে আসবার জন্তে তুমি নিস্পিল করছ,
আর আমি ভাবছি তোমার থেকেই আমার জীবনের সর্ব প্রোমোশন হবে, সর্ব
উন্নতি-উৎপত্তি, তখন বলো আমি তোমাকে নেব না, যদি দেখি আরো একজন, এক-

জন কেন, আরো অনেকে, তোমার জন্তে ঘৃণঘৃণ করছে, হোক-হোক করছে ?’ চেয়ার ঘুরিয়ে বসল স্বকান্ত : ‘তা হলে তো জীবনে কোনো প্রতিযোগিতায়ই নামা যায় না, ছিনিয়ে নেয়া যায় না কোনো পুরস্কার। আর, জীবন—জীবন একটা অথও প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কী !’

‘এই-ব্যাপারটা তাই হল ?’ বলসে উঠল কাকলি। ‘একটা ওপন কম্পিটিশন হয়, ঢালা মাঠে ফ্লাট রেস হয়, অনেকের মধ্যে দৌড়ে যে প্রথম হবে, তা বিচার যেমন-তরই হোক না কেন, তাকে পুরস্কৃত দেখতে কোনো অস্ববিধে হয় না। মনে জালা ধরে না। কিন্তু এখানে ? কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ! এখানে একটা প্রাইজ-পাওয়া লোকের হাত থেকে প্রাইজটা কেড়ে নিয়ে আত্মসাৎ করে চম্পট দেওয়া। এটা প্রতিযোগিতা হল ?’

‘হয়ে-দরে সে একই কথা। কিন্তু এখানে প্রাইজ-পাওয়া লোকের হাত থেকে প্রাইজটা কাড়ছে কে ? নিশ্চয়ই সে চম্পট-দেওয়া লোকটা নয়। প্রাইজ কাড়ছে হয় বিচারক। সেই সিদ্ধান্ত করছে এ পুরস্কার প্রথমের প্রাপ্য নয়, দ্বিতীয়ের প্রাপ্য। বিচারক তার ভুল সংশোধন করে প্রথমের থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয়কে, তুমি যাকে চম্পটা বলছ সেই চম্পটাকে দিয়ে দিচ্ছে। চম্পটা কী করবে ? নেবে না ?’

‘না, নেবে না। কিরিয়ে দেবে।’ মুখিয়ে উঠল কাকলি।

‘কী বুদ্ধি ! সাথে কি বিচার করতে দেয় না মেয়েদের ! যারা আজন্ম শুধু টিচার তারা বিচার করবে কী !’ চেয়ারটা আরো একটু কাছে টানল স্বকান্ত : ‘চম্পটা যদি প্রাইজ কিরিয়ে দেয় তো বিচারককে দেবে। কিন্তু তার মানেই এ নয় যে বিচারক তা আবার লম্পটীর হাতে পৌঁছে দেবেন।’

‘কার হাতে ?’

‘লম্পটীর হাতে।’

‘তার মানে ?’ রক্তের মধ্যে জ্বলতে লাগল কাকলি।

‘তার মানে, আমি চাকরিটা না নিলেই বরেন দীপঙ্করকে পুনর্বহাল করত না। আমি চাকরি নিই কি না-নিই, দীপঙ্কর বরখাস্ত হতই। আমি চাকরি না নিলে লাভ কী হত ? দীপঙ্কর তো যেতই, আমারও হত না। লাঠিও ভাঙত, সাপও মরত না।’

‘না, তুমি চাকরির জন্তে হস্তের মত অমন হুমড়ি খেয়ে না পড়লে, খসত না দীপঙ্কর। তাকে বাঁচানো যেত। বাঁচানো যেত তার ছেঁড়াখোঁড়া খুরঝুরে সংসার।’

‘বাঁচানো যেতো না।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল স্বকান্ত।

‘যদি বাঁচানো না-ও যেত তুমি মহৎ হতে। তোমার হাতে রক্ত লাগতে দিতে না। বন্ধু বলে তবু একটা কথা তো এখনো চালু আছে সংসারে—তুমি তার মান রাখতে।’

‘তুমি যেমন এখন স্বামিত্ব বলে চালু কথাটার মান রাখছ! কিন্তু কেন?’ ঘুরে দাঁড়াল স্বকান্ত : ‘তুমি স্বামীর পক্ষে না থেকে কেন এক আগন্তকের পক্ষে থাকবে?’

‘আমি গায়ের পক্ষে থাকব।’ অগ্রদিকে মুখ ফেরাল কাকলি : ‘যা একুইটি আর শুভ কনসায়েন্স, যা গ্যাচারেল জাষ্টিস, তার পক্ষে।’

‘তার মানে স্বামীটা একটা আনগ্যাচারেল জাষ্টিস?’

‘আমি তা বলি নি।’

‘তুমি বলতে চাচ্ছ স্বামীর বিরুদ্ধে কেউ যদি, কেউ কেন, তার বন্ধু যদি মামলা করে, তবে স্ত্রীর ভাবনার একটা অবকাশ থাকবে সে কোন দিকে যাবে। স্বামীর দিকে, না বন্ধুর দিকে। আহা, কোন দিকে গ্যাচারেল জাষ্টিস! যেদিকে স্বামী সেদিকে স্ত্রী এটাই যেন গ্যাচারেল নয়। নয় স্বতঃসিদ্ধ।’

‘না, নয়।’ গর্জে উঠল কাকলি। ‘গায়ের ক্ষেত্রে দুই প্রতিপক্ষ, স্বামী আর বন্ধু, স্ত্রীর কাছে সমান।’

‘সমান?’ যেন নতুন শুনেছে এমনি ভাবে আওয়াজ তুলল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, কোথায়, কেন তার পক্ষপাত হতে যাবে? দুইই তার পর, বিদেশী—সমান আগন্তুক। কাকুর সঙ্গেই তার রক্তের সম্পর্ক নেই।’

‘রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু আহা, প্রেমের সম্পর্ক?’

‘কখনো-কখনো গায় প্রেমের চেয়েও বড়।’

‘তাই বলা। বড়। তবে সমান-সমান বলছ কেন?’ ঘুণা-লেখা মুখে ঝাঁজিয়ে উঠল স্বকান্ত : ‘স্বামীর চেয়ে বড় বন্ধু। চম্পটীর চেয়ে বড় লম্পটী।’

‘ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।’ চেয়ারের হাতল ধরে রুখে উঠল কাকলি।

‘প্রেমিক ভাবে কথা বলতে শিখিয়েছিলে এককালে, দয়া করে এখন আবার ভদ্র ভাবটা শিখিয়ে না। ভদ্র ভাব যেখানে আছে সেখানেই থাক। তোমার মুখ যখন এখন ওদিকে, আমার দিকে নয়—’

‘নয়ই তো। যে নির্মম, ক্ষুদ্রাত্মা, যে প্রতারণা দস্যু, তার দিকে কেউই থাকে না—’

‘এ পার্টটা বুঝি তোমার হালের অভিনয় থেকে পাওয়া?’ কিরকম বিস্মী করে

হাসল স্ফূর্ত্ত : ‘বেশ তো, থাকতে হবে না আমার দিকে, আমার এলেকার ! তোমার সেই ভদ্রতার স্বর্ণে, বস্তিতে গিয়ে বাসা নাও । দীপস্বরী হও ।’

‘কি, কী বললে ?’

‘বললাম, সেবার তেল ঢেলে পূজার দীপকে উজ্জ্বল করো ।’

‘ইতর জঘন্ত কোথাকার ।’

‘এর চেয়ে আর তীব্রতর গালাগাল পেলো না ? পাবে । যেখানে যাচ্ছ সেখানে পাবে অনেক শব্দের ফুলঝুরি । দীপ নিবে গেলেও দেবীর বিসর্জন হবে না । গলির মুখে এসে ঠেকে থাকবে, দাঁড়িয়ে থাকবে । স্বস্তির প্রতিমা তো আর নয়, থাকবে বস্তির প্রতিমা হয়ে ।’

‘তাই থাকব ।’ দাঁড়িয়ে পড়ল কাকলি : ‘ভয় কী । নইলে, তোমাকে তো চিনি, পুরোপুরি নিজেকে তুমি আবিষ্কার করবে কী করে ?’

‘আবিষ্কার ! আরো আবিষ্কার !’

‘হ্যাঁ, আরো । আবিষ্কার করবে কোন কাঠামোর ঘরে যেতে অন্ধকারে ভুল করে এই প্রতিমার ঘরে এসে উঠেছ । আর কাকে বলতে কাকে বলছ সেইসব প্রেমের কথা, মামুলি কথা, মুখস্থ কথা—আস্তাবল না শুঁড়িখানা না ধাঙড়পটি থেকে কুড়িয়ে আনা—আহা, কেরোসিনের ডিবে জেলে চটের বিছানায় শুয়ে শুনবে না, শোনাবে না আরেকবার ?’

স্বকাস্তের ইচ্ছে হল কাকলির গাল-গলা জুড়ে এক প্রভূত চড় কষে । কিন্তু না, সংযত করল নিজেকে । দ্রুত পায়ে বেরিয়ে ছাদে চলে গেল । যার হাতে চরম অস্ত্র আছে সে কি চড়চাপড়ের ঝামেলা পোহায় ? পথের থেকে কুড়িয়ে কে ঢিল ছোঁড়ার পরিশ্রম করে যার হাতের বন্দুক গুলিভরা !

ছাদে উঠে অন্ধকার একাকিস্থে দেহ-মন অনেক ঠাণ্ডা করেছিল স্ফূর্ত্ত, এবং পরে, রাতের নির্জন বিরামে, অশব্দের মাঠে শুয়ে ; কিন্তু আফিসে আসতেই স্ফূর্ত্ত ছুঁচে খোঁচা মেয়ে বরেন তাকে তাতিয়ে তুলল ।

‘দীপস্বরের চাকরি যাওয়ার্তে মিসেস বোস খুব স্কন্ধ হয়েছেন মনে হচ্ছে—’

‘কী করে বুঝলে ?’ বলবে না ভেবেছিল তবু না বলে পারল না স্ফূর্ত্ত ।

‘বাটারওয়ার্থে ওকে ঢোকাবার জন্তে খুব চেষ্টা করছেন সুনছি ।’

‘চেষ্টা করছেন, পারবেন ঢোকাতো ?’ বিপন্নমুখে তাকাল স্ফূর্ত্ত ।

‘কী করে পারবে ? যখন জানবে আমরা ডিসচার্জ করে দিয়েছি তখন ওরা সাহস পাবে না । ওরা তো আমাদের অজানা নয় । তবে—’

‘কী তবে ?’

‘তবে মিসেস বোস এরই মধ্যে বেশ ইনফ্লুয়েন্সিয়াল হয়ে উঠেছেন, গুঁর খাতিরে কোনো ডিপার্টমেন্টাল হেড না পথ ছাড়ে, পথ ছেড়ে জায়গা দিয়ে বসে।’

‘খাতিরে?’

‘হ্যাঁ, হয়তো বলবে, কোনো প্রসিডিং করে তাড়ানো হয় নি, কোনো চার্জ নেই, কাইণ্ডিং নেই, নৈতিক বা রাজনৈতিক কোনো কিছুই নয়, তখন নতুন জায়গায় টাটকা চাকরি পেতে দোষ কী! আরো হয়তো বলবে, এভাবে চাকরি নেওয়া নৃশংস খামখেয়াল, অকপট অন্তায়—এরকম সব বলে-কয়ে কিছু মহাহুভূতি সৃষ্টি করতে পারে হয়তো—তবে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত কিছু জ্বরাহা করতে পারবে না।’

‘একটা মেয়ে-কেরানির কথায় একটা ফার্গের লোক নেবার পলিসি নির্ণীত হবে এ তো কলঙ্কের কথা।’

‘অথচ চেষ্টা করলে তোকে কিন্তু ঢোকাতে পারত। তুই স্বামী শুধু এই স্পেশ্যাল কোয়ালিফিকেশনে। সেটা তা হলে কত গৌরবের হত বল দেখি।

‘এখন গৌরবশী অস্তে চলেছে।’

‘হ্যাঁ, বাটারওয়ার্থে না হোক অন্য কোনো ওয়ার্থে—বাটারে না হোক, অস্তত গাটারে—মিসেস বোস ওকে ঢুকিয়ে দেবেনই দেবেন। যে পরিমাণ ঘুরছেন গুঁরা দু-জনে, একসঙ্গে।’

ঘোরাঘুরির কাজ তো স্বকাস্তেরও। স্বকাস্ত বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে লাগল। দেখতে লাগল ঘুরে-ঘুরে।

‘হ্যালো। চিনতে পাচ্ছেন?’

‘আপনাকে চিনব না?’ কাকলি একটু ব্যঙ্গের টান আনতে চাইল।

‘কিরকম লাগছে? শত্রু-শত্রু, না মিত্র-মিত্র?’

‘শত্রু-শত্রু।’

‘এখুনি মিত্র-মিত্র হয়ে যাচ্ছি। আপনার দীপঙ্করকে পাঠিয়ে দেবেন।’

‘আমার দীপঙ্কর মানে?’

‘সরি, আমাদের দীপঙ্কর। কিন্তু পাঠিয়ে না দিলে ওকে নতুন আরেকটা চাকরি দিই কী করে?’

‘পাঠিয়ে দেবার মালিক কি আমি?’

‘আহা, একটা খবর তো দিতে পারেন। আমি তো আর এ অবস্থায় ওকে ভেকে এনে ফের চাকরি দিতে পারি না। ওর তো একবার আসতে হয় নতুন দরখাস্ত নিয়ে। সব কিছুই তো একটা শ্রী আছে, রীতি আছে—’

‘আপনার আফিসে নতুন যে গুণধরকে রেখেছেন তাকে পাঠান না—’

‘সে যাবে না।’

‘যাবে না মানে ? সে আপনার চাকর, আপনি বললে সে না যাক তার ঘাড় যাবে।’

‘সে তো চায় না দীপঙ্কর চাকরি পাক, আপনি স্থখী হন !’

‘আর আপনি চান আমার স্থখ ?’

‘চাই বলেই তো দীপঙ্করকে আর কোথাও একটা চাকরি দেবার জন্তে উলখুম করছি।’

‘থাক, উলখুনি ভালো নয় ! দীপঙ্কর যাবে না আপনাদের কাছে।’

‘যাবে না ?’

‘না। সে অগ্রত্রে গেছে।’

‘অগ্রত্রে ? কোথায় ?’

‘আদালতে।’

এক মুহূর্ত স্তব্ধতা।

‘সুমন, শুনেছেন ?’ এবার কাকলির উছোাগ।

‘শুনছি—’

‘যদি কিছু আমার টাকার দরকার হয়, পারবেন দিতে ?’

‘টাকা !’ যেন অভাবিত এমনি বিস্ময়ের স্বর বেরিয়ে গেল অলক্ষ্যে।

‘হ্যা, ধার। আমি পরিস্কার শোধ করে দেব। জানেন তো আমার এখন অনেক ক্রেডিট, যাকে বলে লং ক্রেডিট—তাই আমার সঙ্গে ভিল করা মোটেই রিস্কি নয়—’

‘না, নয়—’

‘অবশি আমি এখানে বা অগ্রত্রেও রেইজ করতে পারি। তবে যেহেতু আপনি আমার স্থখ চান—কী, চান না ?’

‘চাই।’

‘তাই, দরকার বুঝলে, আমাকে স্থখী করবার স্যোগ দিতে চাই আপনাকে। আর সেই সঙ্গে আপনারও তো স্থখী হওয়া, কী বলেন ?’ মধুর স্বরে হেসে উঠল কাকলি : ‘ক্লক স্থখে স্থখী। কী, ঠিক নয় ?’

‘হ্যা, বলবেন, চেক পাঠিয়ে দেব।’

‘চেক কেন ? হাতে-হাতে হয় না ?’

‘হয়। দেবেন হাত পাঠিয়ে।’

হু'জনে সমস্বরে হেসে উঠল।

ঘোরবার জন্তে স্বকান্তকে গাড়ি দিল বরেন। আর স্বকান্তের অলি-গলির ঘাতে ভুল না হয় নিজেই মাঝে মাঝে লাঞ্চ টাইমে তার সঙ্গী হল। ঐ দেখ, ঐ অফিস-গেটের সামনে ঐ দীপঙ্কর না? আর উনি, উনি কে? হ্যাঁ, কাকলি। দম্বন করতে একটুকুও বেগ পেতে হল না স্বকান্তের। ওরা একসঙ্গে ঢুকল কোথায়? এটা বোধ হয় রেস্টরান্ট। আর ঐ যে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি? ওটা বোধ হয় বাস-স্ট্যান্ড। একসঙ্গে যাবে বুঝি কোথাও! আর কোথায়! নিশ্চয়ই দীপঙ্করের স্ত্রীতে। এলোমেলো নিরিবিবিলিতে।

কিন্তু সেদিন বরেন যা দেখাল তার আর ভাষ্য-ব্যাখ্যার প্রয়োজন হল না। দীপঙ্কর আদালতে নালিশ করেছে। সমন জারি করতে এসেছে অফিসে। শুধু বরেনের আর তার বাবার উপরে নয়, স্বকান্তেরও উপরে। হ্যাঁ, স্বকান্তকেও পক্ষ করেছে—মোকাবিলা বিবাদী করেছে। দীপঙ্করের নালিশ, তার বরখাস্তটা বেআইনী হয়েছে, আইনের চোখে সে এখনো চাকরিতে অধিষ্ঠিত, তার পূর্বতন সমস্ত স্বত্ব-নিষেধ সে অধিকারী—এই মর্মে চাইছে সে ঘোষণা।

‘কিন্তু, আশ্চর্য, তুই এই মামলায় আসিস কী করে?’ বরেন জিজ্ঞেস করল।

‘বুঝতে পাচ্ছিস না, এটা ওর—কাকলির কারুকার্য। যাতে আমি জন্ম হই, অপমানিত হই, চুনকালির কিছু ছিটেফোঁটা আমারও মুখে লাগে!’

‘কিন্তু যাই বল, দীপঙ্কর মামলা যখন করেছে তখন আমি ওকে স্ম্যাশ করব।’ টেবলচাপাটা বরেন ঠুকল সজোরে।

‘আর আমারও ছিল কিছু স্ম্যাশ করবার।’ আরেকটা টেবলচাপা কুড়িয়ে নিল স্বকান্ত।

‘করবি? সত্যি?’ একটু কি এখন উৎফুল্ল দেখাল বরেনকে?

‘হ্যাঁ—কোনোক্রমে ওর—কাকলির চাকরিটা খতম করে দেওয়া যায় না? নতি, হুঃসহ ওর এই অহংকার। শুধু চাকরির জোরে, আমার সঙ্গে কথা না বলে, আমার মুখের দিকে না তাকিয়ে, সর্বাস্বীণ অগ্রাহ্য করে, আমারই সঙ্গে থাকতে পারছে এক বাড়িতে, এক ঘরে। শুধু চাকরির জোরে সংসারের কোনো উপেক্ষা, কোনো লাঞ্ছনা, কোনো অপমানই গায়ে মাখছে না। অসম্ভব। যদি গুঁড়ো করে দেওয়া যেত তার ঐ স্পর্ধাটাকে—’

‘তা হলে লাভ কী হত? তা হলে তুই তো আরো বেশি জন্ম হতিস। একটা বেকার, অবাধ্য, অস্থায়ী স্ত্রীকে চানতে হত সারা জীবন। এ তো আরো চুনকালি।

তা ছাড়া,' টোক গিলল বরেন : 'একটা জীলোকের চাকরি খসানো কি সোজা কথা? দেখছিস তো, আবার সেই মামলা' সেই কৈঁচে গণ্ডু, সেই থুতু ফেলে থুতু থাওয়া। তার চেয়ে—' গহন চোখে তাকাল বরেন।

'তার চেয়ে বিয়েটা খসিয়ে দেওয়া অনেক সোজা। এক শো বার।' উঠে পড়ল স্বকাস্ত : 'সে সম্বন্ধে আর দ্বিমত কী! যে অবস্থায় আছি, তার চেয়ে ভাঙন নদীর পারে ছাড়া-বাড়িতে থাকারও নিরাপদ।'

ঘুরতে গেল স্বকাস্ত, আর বরেন তুলে নিল রিসিভার।

'হ্যালো। মিসেস বোস?'

'উঃ, কী জঘন্ত সম্বোধন! কেন, শ্রীমতী কাকলি বলতে পারেন না?'

'আর পদবী?'

'পদবী অবাস্তব। মাহুষের আবার পদবী কী! সাহিত্যিকের আবার ডিগ্রি কী!'

'ঠিক। সুন্দরীর আবার গয়না কী! শুভ্রন, হুটো অবাস্তব কথা জিজ্ঞেস করি।' 'ককন।'

'আপনার— সরি— আমাদের দীপঙ্কর সত্যি কী চায়?'

'কী চায় মানে? কোথায়? কার কাছে?'

'মানে, আদালতে।'

'কেন, আর্জির নকল পান নি?'

'পেয়েছি। কিন্তু, মানে—' টোক গিলল বরেন : 'মানে, আপনি কী চান? মানে, আপনি কি চান যে দীপঙ্করকে আবার চাকরি দিই?'

'এক শো বার চাই। শুধু চাকরিটাই দেবেন না, মাইনেটাও বাড়িয়ে দেবেন সেই সঙ্গে।'

'আর স্বকাস্ত?'

'শ্রেফ তাড়িয়ে দেবেন, ক্লিয়ার আউট করে দেবেন। নাড়াবুনে ছিল কীতু হবার সাধ হল। আগে লেখাপড়া নিয়ে থাকত তবু একটা ভদ্রতা ছিল, এখন কী একটা স্ট্রাট পরেছে বলুন দেখি— কোথাকার সে দর্জি কে জানে—মনে হচ্ছে যে সার্কাসের ক্লাউন চলেছে। আপনি আর লোক পেলেন না চাকরি দেবার? চাকরি দেবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না?'

'সেটা ভুল হয়েছে।' টেলিফোনেই যেন মাথা চুলকোল বরেন : 'কিন্তু এখন সুকুর চাকরি থাকা কি না থাকায় আপনার আর কোনো ইন্টারেস্ট থাকার কথা নয়

‘কেন বলুন তো?’

‘স্বকু আপনার বিরুদ্ধে মামলা করছে।’

‘মামলা? কিসের মামলা? রেগিটিউশন অফ কনজুগাল রাইটস?’ হাসল কাকলি।

‘না। তার উলটো। ডিভোর্স। বিবাহ-বিচ্ছেদ।’

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : ‘আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। বিচ্ছেদ নয়, উচ্ছেদ। বউ-উচ্ছেদের মামলা। উঃ, বাঁচা যাবে। সব কটা টাকা ধরে রাখতে পারব হাতের মুঠোয়। কেউ দালালি-মোড়লি করতে পারবে না। নিজের পাঠা মনের স্বখে অগ্রে-পশ্চাতে কাটতে পারব। খাই কি না-খাই, শুই কি না-শুই— একেবারে মুক্ত বর্শা, ফ্রি ল্যান্স।’

‘তা হলে দেখা যাচ্ছে আপনি ডিরেক্টলি শুধু দীপকরেই ইন্টারেস্টেড, ছাট ইজ, দীপকরের চাকরিতে।’

‘ইউ আর রাইট। আপনি একবার নিজের চোখে দেখে আসুন ওদের অবস্থা। শিশুগুলি কী মিষ্টি, অথচ কী করুণ, কী অসহায়! ওদেরকে বস্তি থেকে ফুটপাতে, ফুটপাত থেকে নর্দমায় নেমে যেতে দেব না। ওদেরকে আমরা তুলব, আন্তাহুড় থেকে অঙ্গনে, দৈন্ত থেকে স্বাচ্ছন্দ্যে, বস্তি থেকে প্রাসাদে। কী, পারবেন না? পারবেন না আমার হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে?’

‘পারব।’

*

‘তবে দেবেন হাত পাঠিয়ে।’ আগের আরেকদিনের কথা মনে করে হাসল কাকলি : ‘তবে রিক্ত হাত পাঠাবেন না।’

‘না। ডাকাতে হাত না হোক, টাকাতে হাত পাঠাব।’

‘না। টাকার চেয়েও বড় জিনিষ পাঠাবেন। হাতের সঙ্গে পাঠাবেন আপনার হৃদয়।’

বরেনের হাতে রিসিভারটা কেঁপে উঠল। মনে হল তার হাতের মুঠোতে তার হৃদয়ই কাঁপছে বুঝি।

তারপর ব্যাপারটা খুব হঠাৎ ঘটে গেল এবং খুব সংক্ষেপে।

সকালবেলায় দর্জি এসেছে, স্বকাস্তের স্যুটের বিল নিয়ে।

চোখ একবার ছানাবড়া করল স্বকাস্ত। পরে বলল, ‘এত টাকা একসঙ্গে দিতে পারব না। এ মাসে এক শো টাকা নিয়ে যান।’ বলেই হাঁক পাড়ল

: ‘মা, এক শো টাকা দাও।’

মৃণালিনী বেরিয়ে এল। বললে, ‘কেন, টাকা কেন?’

‘দর্জির বিলের বাবদ দিতে হবে।’ মাকে তবু স্থিধা করতে দেখে স্বকান্ত কান্থ হয়ে উঠল : ‘তোমার কাছে তো আমার টাকা আছে, সেই থেকে দাও না।’

‘তোমার টাকায় এখুনি হাত দিয়ে দরকার কী!’ কটাক্ষগর্ভ চাউনি ‘হানন মৃণালিনী : ‘তোমার বউকে বল না। স্বামীর পোশাকের টাকা দেয় না স্ত্রী? পায়ে না দিতে?’

‘বলতে হলে তুমি বলো।’ একটু বুঝি আড়াল হল স্বকান্ত।

কাকলিকে ডাকাল মৃণালিনী। বললে, ‘তুমি তো আইটেমের উপর খরচ করতে চাও। এবার পোশাকের আইটেমে এক শো-টা টাকা দাও।’

‘কার পোশাক?’ কাকলি থমকে দাঁড়াল।

‘স্বকুর। সেই যে স্মার্ট-টুট করেছে তার দাম। দর্জি এসেছে।’

আর কিছু হলেও না হয় হত। স্মার্ট শুনে সর্বাঙ্গ অলে গেল কাকলির। বললে উঠে বলল, ‘উনি আমাকে কথানা শাড়ি কিনে দিয়েছেন যে, ওঁর স্মার্টের দাম দেব?’

‘ওর দেওয়ার দিন কি ফুরিয়ে গেছে? কত পড়ে আছে ভবিষ্যতে। আজকে এ ঠেকা।’

‘আমার ঠেকা আরো বেশি।’

‘আহা, বাপের বাড়িতে এক মাস এক শো-টা টাকা কম দিলে কী হয়?’

‘বাপের বাড়িতে দিচ্ছি না। তারও চেয়ে দুঃস্থ পক্ষ আরেক অসহায় পরিবারকে দিচ্ছি।’

‘তারা আবার কে?’

‘তারা কেউ নয়। তারা বস্তিতে থাকে।’

‘কেউ নয় তো তাদের দেবার দায় কী।’

‘তাদের মধ্যে যে বোজগার করছিল সে আপনার ছেলের বন্ধু। আপনার ছেলে বন্ধু হয়ে বন্ধুর চাকরি খেয়েছে, বন্ধুকে তাড়িয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসেছে গদিয়ান হয়ে। তাই সে পরিবারে যে ক্ষতি করা হয়েছে তারই আমি পূরণ করছি।’

‘ক্ষতিপূরণ যখন করছ তখন,’ রাগে নীল হয়ে বেরিয়ে এল স্বকান্ত : ‘তখন সম্পূর্ণ ষোল আনাই পূরণ করো গে যাও, এখানে সতী সেজে থাকবার দরকার কী। যাও, যাও চলে এ বাড়ি থেকে। বস্তিতে গিয়ে ওঠো, বস্তিবাসিনী হও। তোমার সঙ্গে এ বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই। যাও এখুনি, এ মুহূর্তে। কী, গেলে?’ না গেলে গায়ে হাত তুলবে এমনি প্রায় ভক্তি করল স্বকান্ত।

‘হাচ্ছি। চেষ্টাও না। সীন কোরো না।’ আপাতত মিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল
লি। হাতব্যাগটা শুধু গুছিয়ে নিল। তার মানে এটাটি কেসটা খুলে টাকা
র ব্যাঙ্কের বই-টাইগুলি তুলে নিল ব্যাগে। আর কিছু করল না—চূলে চিকনি
ল না, শাড়ি বদলানো দূরস্থান, পরনেরটাও ঘুরিয়ে নিল না। আয়নায মুখ
গল না পর্যন্ত। এক বস্ত্রে বেরিয়ে গেল।

ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চোখের সামনে সমস্ত প্রত্যক্ষ করেও যেন কিছু বুঝতে পারল
মুণালিনী।

আস্তে আস্তে চালু হল কথাটা। ছোট বউমা কোথায়? কাছেই কোথাও
য়েছে বোধ হয়, কিছু কিনতে-কাটতে। কই, ফিরছে না কেন? স্নান করবে
থাবে না, আফিস যাবে না? সে কি, কে বললে আফিস আজ ছুটি? তবে?
গড়া করেছে স্বকুর সঙ্গে। শব্দে-নিঃশব্দে সৈ ঝগড়া তো রাতদিনই চলেছে, এ
বার নতুন কী! না, এবার ঝগড়ার নিবৃত্তি। এ স্বামীর ঘর সে করবে না, এ
কথা ঘোষণা করে গেছে। মোটেই তা নয়। স্বকুই তাকে বলেছে যেতে।
মুহুরে করে বলছ কেন? স্বকুই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বেশ করেছে।

সকলেই চুপ করে গেল, অকর্মণ্য অসহায় বলে মনে হতে লাগল নিজেদের।
কিছুই বলবার নেই, করবার নেই, খোজখবর নেবার নেই। প্রতিবাদ-প্রতিকারেরও
দেকাশ নেই কোথাও। এ স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ছুনিয়ার আর কাক এলেকা-
ক্কার নেই। এ কাক ছেলে নয়, ভাইপো নয় যে কাগজে ছবি ছাপাবে
নিজাপন দেবে, বাবা, ফিরে আয়, টাকা লাগে তো লেখ, তোর মা শেষ শয্যায়
য়েছেন। থানাতে প্রথম এস্তেলারও এ বিষয় নয়। কাউকে ধরবার-বলবারও
থ নেই।

মুণালিনীই শব্দ বার করতে লাগল আস্তে-আস্তে।

‘এরকম কত কথা কাটাকাটি হয় স্বামী-স্ত্রীতে, তারই জন্তে এমনি বাড়ি-ঘর ছেড়ে
লে যায় কে?’

‘আর কী তেজ দেখ!’ এক বিপদে আক্রান্ত, মুণালিনীর পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল
বৈজয়া: ‘কাউকে কিছু জানিয়ে গেল না। পরামর্শও নিল না কাকর।’

‘পরামর্শ নেবে কী! সব আগে থেকেই ঠিক।’ জুড়ল মুণালিনী।

‘চরম ঝগড়ার সময় লোকে তো চেষ্টামেচিও করে। আশেপাশের লোক জানতে
গয়, ছুটে এসে মিটমাট করে দেয়। এ মেয়ে একটা চান্সও দিল না কাউকে।’

‘চান্স দেবে কী! বলেছি না আগে থেকে সব ঠিক-করা। এ কোঠা-বাড়িতে

কচছে না তাঁর। কোন বস্তিতে গিয়ে নাকি বাসা বাধবেন। গরিবের মোছাবেন।’

‘না, না, কিরে আসবে।’ ঘর-দোর তদন্ত করছে, বলে উঠল বন্দনা : ‘দেখুন না সব জিনিসপত্র ফেলে গেছে, এমন-কি প্রাণের এটাচিটা পর্যন্ত।’

‘দেখেছি স্থলে—ধড়টাই শুধু আছে, প্রাণ নেই।’ হতাশ-হতাশ মুখ করি মৃণালিনী : ‘আসল প্রাণ ঠিক সরিয়ে নিয়েছে।’

‘কোথায় সরাবে? যতই চোটচাপট করুক, মেজাজ-দেহাক দেখাক, গ্লি ফিরে আসবে গুটিগুটি। কেমন ফেলে কে যাবে খোলা মাঠে লড়াই করতে? না না হস্তী।’ বিজয়ার বুঝি বা একটু মায়ী হল : ‘সন্ধেটা হোক না।’

‘দরকার নেই কিরে এসে। আর ফিরে এলেই বা কী!’ মৃণালিনী ক্রমে উঠে ‘স্বকান্ত কি ভেড়াকান্ত যে দরজাটা মুখের উপর বন্ধ করে দিতে পারবে না ভালোবাসার বিয়ের কি চেহারা তা চিনতে কি আর তার বাকি আছে? দেখে দেখতেই, দিন হতে না হতেই সন্ধে।’

‘আর সন্ধে হতে না হতেই রাত বারোটা।’ হাসল বিজয়া।

স্বকান্তের ঘর নতুন করে ওলট-পালট করে সাজাল মৃণালিনী। কাকলির টা আর স্টার্টকেস যা ছিল, যা চলতি কাপড়চোপড়, সব নিচে চালান দিল। ঘরটা অবিবাহিত করে দিল। কাকলি যদি কোনো ফাঁকে লুকিয়েও আসে, যেন দেখে, কোথাও নেই, নামে-গন্ধেও নেই, না স্মৃতিতে, না আশায়, না বা স্বপ্নের ধারে-কাছে

আফিসে প্রশান্ত রিসিভার তুলে ডায়াল করতে গেল। আফিসে এসেছে তে চারটে সংখ্যা ঘুরিয়ে থেমে পড়ল হঠাৎ। সত্যি, এতে তার এক্সিয়ার কী? হা বলে, এসেছি, তা হলে কি তার বলা সাজবে, ছি, রাগ কোরো না, বাড়ি ফিরে এসে না, এ ব্যাপারে তার নাক ঢোকাবার, মাথা ঘামাবার অধিকার নেই। রিসিভ নামিয়ে রাখল প্রশান্ত।

সন্ধে করে বাড়ি ফিরল ভূপেন। ইতি-উতি শুরুতে লাগল। না, ফেরা কাকলি। তার কথা কেউ উচ্চারণও করছে না।

হেয়েন ইচ্ছে করেই অনেক রাত করল। বিজয়া সদর বন্ধ করতে এসেছি হেয়েন জিজ্ঞেস করল, ‘বন্ধ করছ যে, সবাই ফিরেছে?’

নাটুকে মুখ করল বিজয়া। বললে, ‘একজন শুধু ফেরে নি।’ বললে দরজায় খিল চাপাল।

পরদিন বার লাইব্রেরি থেকে টেলিফোন তুলল ভূপেন। কী জিজ্ঞেস কর?

স্বপ্ন করবার মত কী থাকতে পারে প্রশ্ন? আর কিছু নয়, শুধোবে, কোথায় আছ, কানা কী। যদি উত্তরে বলে বস্তুতে আছি, তা হলে? তখন পিঠ-পিঠ আবার নব, মা, বস্তুতে থাকতে নেই, দালানে এসো। না, কোনো এক্সিয়ার নেই। বিয়ও রিসভিকশন। রিসিভার নামিয়ে রাখল ভূপেন।

হেমনও চেষ্টা করল। সেও অফিসে বসে তুলল রিসিভার। কিন্তু কী নব সে নতুন কথা? তুমি কোথায় আছ, ঠিকানা কী, এসব প্রশ্ন নয়। কিংবা, যি কিরে এসো, রাগ করে থেকো না, এ ধরনের অম্মরোধ নয়। যদি কনেকশন হয়, তাকে অভিনন্দন করবে। বলবে, ঠিক করেছে। নিজের মর্যাদাকে যে স্নান রা: নি, জানাই সংবর্ধনা। কিন্তু উত্তরে যদি শুধু বলে, থ্যাঙ্ক ইউ, তা হলে? যা সজ্জ ভালো তাকে বাক্যে ভালো বলে বাছল্য করে লাভ কী? না, অ্যাকটিং ট্রান্সউট জুরিসডিকশন। হেমনও নামিয়ে রাখল রিসিভার।

অকিস থেকে স্বকাস্তকে টেলিফোন দিয়েছে বাড়িতে।

মৃণালিনীর স্মৃতি আর দেখে কে। অলস্মী চলে গিয়েছে বলেই স্বকুর ঘরে বাজবে ধন সৌভাগ্যের ঘণ্টা।

‘হালো, হালো—’ দুপুরবেলায় ঘুমন্ত মায়ের সঙ্গ ছেড়ে সেন্টু এসেছে কাকার ঘরে, ফাকা ঘরে, চেয়ারটা টেবিলের কাছে টেনে এনে, ডায়াল-ফায়ালের ধার না ধরে টেলিফোনটা কানে লাগিয়েছে, চোঙের মধ্যে মুখ দিয়ে বলছে, ‘হালো—কে, কাম্মা? না, আমি সেন্টু। তুমি কী করছ? বাড়িতে আসছ না কেন? স্নান করো না, ১৫ না, আছ কোথায়? অ্যা? ই্যা, শিগগির চলে এসো। আসবে তো? ই্যা, এসো। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—’

‘ওমা, কী সর্বনাশ!’ পাশের ঘর থেকে এসেছে বন্দনা।

ছুটে এসেছে মৃণালিনী।

‘কী সাংঘাতিক দুঃস্থ!’ আতঙ্কে-আনন্দে উজ্জ্বল হল বন্দনা: ‘বানিয়ে-বানিয়ে ক রকম বলছে দেখুন!’

‘কিন্তু বলছে তো কাম্মার সঙ্গে। বাবার সঙ্গে নয়, কাকার সঙ্গে নয়, ঠাকুর-দাদার সঙ্গে নয়—কোথাকার কে এক বিদেশী মেয়ে—তার সঙ্গে!’ মৃণালিনী যকে উঠল: ‘রাখ, রাখ বলছি পাজি ছেলে।’

‘ই্যা, রাখছি, ছেড়ে দিচ্ছি। ই্যা, ঠাকমাটা এসেছে, বকছে। ই্যা, মারতেও পারে। অ্যা? আসবে? এসো। ই্যা, আমি সেন্টু।’

মৃণালিনী কেড়ে নিল রিসিভার।

‘পারলাম না।’ কান্নার মত করে বলে উঠল কাকলি।

‘কী পারলি না?’ পাশে বসে বিনতা একটা পত্রিকা ঘাঁটছিল, জিজ্ঞেস কর চোখ তুলে।

‘বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না।’

‘কী বাঁচিয়ে রাখতে?’

তরুণপোশে শুয়ে ছিল কাকলি, মুখটা অগ্নি দিকে ফেরাল। বললে, ‘আমার অহংকারকে বাঁচিয়ে রাখতে।’

‘অহংকার?’

‘হ্যাঁ, আমার প্রথম কদম ফুল।’

‘সে আবার কী!’ গল্পের গলায় বললে বিনতা।

‘গর্বের সৌরভে ভরা আমার নিটোল ভালোবাসা। কিছুতেই পারলাম না ভিঁয়ে রাখতে। সারাক্ষণ কেবল ঝগড়াই করলাম।’

‘ভালোবাসা না হাতি! ভালোবাসার ছদ্মবেশ।’

‘ছদ্মবেশই হবে।’ আবার এদিকে মুখ ফেরাল কাকলি: ‘কিন্তু কটা দিন-বারি অপূর্বের কী পোশাক পরেছিল বল দেখি। একটা হাত-পাতা ভিঁথিরি রাজা দেহ এসেছিল। কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ, আমি মনে ভেবেছিলাম এ কোন মহারাজ! পারলাম না টিকিয়ে রাখতে।’

‘ছেড়ে এসেছিল বলে তোর যে দেখছি এখন খুব অল্পতাপ হচ্ছে।’ বিনতা প্রাণ ধিকারের স্বর আনল।

‘অল্পতাপ নয়, বলতে পারিস আত্মজিজ্ঞাসা জেগেছে।’ মৃদুরেখায় হাসবার চেষ্টা করল কাকলি: ‘যে ভালোবাসা নিয়ে এত স্পর্ধা করেছিলাম, বাড়িঘর ছেড়ে দিও এসেছিলাম তাকে বাঁচিয়ে রাখতে কেন আরো কুজু করলাম না, কেন আরো ঝেঁ ধরলাম না, কেন আঘাতের বিনিময়ে আঘাতই হানলাম ক্রমাগত?’

‘সত্যিই তো। ঐতিহ্য-ভ্রষ্ট হয়েছিল।’ হাতের পত্রিকাটা সামনের টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলল বিনতা: ‘একাদিক্রমে স্বামীই শুধু হানবে, আর স্ত্রী মাটি ঝাঁকবে

পড়ে থাকবে ধৈর্য ধরে। আহা, সর্বসহা বহুমতী যে। তবে যা না, অপমান করে তড়িয়ে দিলে কী হয়, পায়ে ধরে গিয়ে ক্ষমা চা, জুতোর ফিতে বেঁধে দে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে নির্ভেজাল ভেজিটেবল হয়ে থাক—’

‘যা হবার নয়, যা অসম্ভব, তা বলিস কেন?’ উঠে বসল কাকলি। চুলে হাতপ্যাচ দিয়ে বললে, ‘কিন্তু কথা কি তবু একটু থেকে যায় না?’

‘কী কথা?’

‘কেন এমন হল? কেন পারলাম না?’

‘না পারলে কী হয়?’ ঝলসে উঠল বিনতা : ‘আমিও তো পারি নি। তুই তো তবু ভালোবাসলি, বিয়ে করলি, ব্রহ্মস্বাদ পেলি—তারপর আর পারলি নে। কী না জানি বলেছেন বরেনবাবু, প্রেম ফ্রেম হয়ে গেল। কিন্তু আমি? আমি তো গোড়া থেকেই অপারগ। ভালোবাসা দূরের কথা, একটা বৈধ জৈব ঝংকার পর্যন্ত পেলাম না শরীরে। তাই বলে আমি কি হায় হায় করছি, না দু হাতে বুক চাপড়াচ্ছি?’

‘হায় হায় আমিও করছি না। বুকও চাপড়াচ্ছি না দু হাতে।’ হাসল কাকলি : ‘তবু ভাগ্যকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে, কেন এমন হল? কেন হেরে গেলাম? কেন ঘুড়টাকে স্ততো ছেড়ে-ছেড়ে রাখতে পারলাম না উড়িয়ে?’

‘সোজা কথা, নাটাইয়ে আর স্ততো ছিল না। সম্বের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলি।’

‘ঠিক। স্ততো ছিঁড়ে গেল। ফুরিয়ে গেল।’

‘তাই, তোর হার কোথায়? তোর তো জিত। অপমানের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত করতে পারলি। ছিঁড়তে পারলি দাসত্বের বন্ধন।’ তপ্ত হতে তপ্ততর হতে লাগল বিনতা : ‘নইলে এ কী জুলুম। বিদূষী হয়েছ যখন, তখন আলগা করতে পাবে না, চাকরি করো, পরলা কামাও। আর যদিও আয় তোমার, তোমার বায়ের স্বাধীনতা নেই। ইচ্ছেমত তুমি পারবে না খরচ করতে। প্রতি পদে ইন্তক্কেপ। তুমি পারবে না তোমার বাপের বাড়িকে সাহায্য করতে। কোনো দুঃস্থ বন্ধুকে ক্ষণিক উপশম দিতে। তুমি দাসী, তোমার টাকাও দাসী। তারপর পারবে না ইচ্ছেমত চলতে-ফিরতে, অন্তত বাড়ি ফিরতে। কী অগ্নায়, বাইরে কলম পিবে এসে আবার বাড়িতে মসলা পেণো, ট্রায়াম-বাস ঠেলে এসে আবার বাড়িতে হাঁড়ি ঠেলে। এ যদি না করেছ, যদি বা চেয়েছ গায়ে-পায়ে স্বাধীনতার হাওয়া লাগাতে, তা হলেই, বেরিয়ে যাও, নাক-বরাবর সোজা পথ দেখ। বাপের বাড়ি নেই, কোথায় যে যায় মেয়েটা, তা পর্যন্ত বিবেচনা করল না—’

‘ভাগ্যিস তুই ছিলি, তোর এই ওয়ার্কিং গার্লস হস্টেলটা ছিল—’ কাকলি দেয়ালে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসল।

‘সেটা কিছু নয়, সেটা অবাস্তব। আসল হচ্ছে তুই ঐ অভদ্রতার পত্রপাঠ উদ্বল দিতে পারলি, যোগ্য উত্তর—বেরিয়ে আসতে পারলি এক বস্ত্রে। এখানেই তো তোরা জয়। তুই সমস্ত মেয়েজাতের মান রাখলি। অত্যাচারী পুরুষের ঔদ্ধত্যকে পারলি শায়েস্তা করতে। সম্মানের মালা তো তোরই গলায়।’

‘তবু আয়নায মুখটা কেন ঠিক উজ্জ্বল দেখছি না বলতে পারিস?’ কাকলি তবু যেন কক্ষ হতে পারছে না : ‘একদিন জাঁক করে মুখটা তুলে ধরেছিলাম সূর্যের দিকে, পৃথিবীর দিকে। রোদ লাগুক, বৃষ্টি লাগুক, মুখটা সব সময়েই আলো-আলো লাগত। আমার চোখেও যেন দেখতাম সেই আলো। আজ লোকে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে এই দেখ সেই ভালোবাসার মেয়ে, সব ছেড়েছুড়ে হস্তদস্ত হয়ে যাবে গিয়ে বিয়ে করেছিল সে-ই এখন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—’

‘তাড়িয়ে দিয়েছে?’ কিছুতেই যেন মনে নেবে না বিনতা।

‘না হয় ঘুরিয়েই বলবে, মেয়েটা স্বামীর অত্যাচারের জন্তে বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। যেভাবেই বলুক, আমার সেই জাঁক থাকল কই? যে ভালোবাসা পুঁতেছিলাম বুকের মধ্যে তা জলন্ত-ফলন্ত হল কই?’

‘তোর যে দেখছি এখনো স্বকান্তর জন্তে মায়া!’

‘মিথ্যে কথা।’ কাকলি এক ঝটকায় নেমে পড়ল খাট থেকে।

‘তবে কর্তৃপক্ষটাকে অমন ভিজ্জে-ভিজ্জে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা করেছিল কেন? মায়ার চোপ না লাগলে গলার স্বর অমন সঁাতসঁতে হয়?’

‘যদি মায়াই বলতে চাস, সে মায়া কোনো লোকের জন্তে নয়, পাষণ্ডের জন্তে নয়, সে মায়া আমার কুমারী হৃদয়ের প্রথম নয়তার জন্তে। আমি ভালোবাসি এই উন্মত্ত উচ্চারণেই তো হৃদয়ের প্রথম নয়তা। সেই শুচিশূন্য উজ্জ্বল স্বপ্নটিকে নিয়ে কত খেলেছি দিনে-রাত্রে, কত খুলেছি আর ঢেকেছি, কল্পনার কত ছুখ-মধু খাইয়ে লালন-পালন করেছি। আমার প্রথম স্বপ্নশিশু মরে গেল অকালে—’

‘কিন্তু তোর গর্ভিণী হবার শক্তি তো মরে যায় নি।’ ঠাট্টায় ঝাঁজিয়ে উঠল বিনতা : ‘একটা প্রেম মরে গেলে কী এসে যায়? আরো কত প্রেম আসে। প্রথমই পরম নয় সব সময়।’

‘নিশ্চয়ই নয়।’

‘কখনো-কখনো দ্বিতীয়ও অদ্বিতীয়।’

‘সন্দেহ কি !’

‘আবার কখনো-কখনো চরমই পরম।’

‘এক শো বার। শেষ বর্ষণেও অজস্র ফুল ফুটে বাধা নেই।’

‘স্বতরাং যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে থাকবার তো কোনো মানে হয় না।’

‘কে বলে হয়?’

‘হ্যাঁ, এক মাঠ ফুরোলে আরেক মাঠ আসে। এক প্রত্যয় ভাঙলে আরেক প্রত্যয়।’

‘তাই সব সময়েই আশা আছে আমাদের।’ হাসল কাকলি।

‘তোর আছে, আমার নেই।’ বিনতা মুখ ফেরাল।

‘তোর নেই? সত্যি? দেখি দেখি দেখি মুখখানা।’ বিনতাকে ছুটে ধরতে গেল কাকলি।

‘হয়তো তোরও নেই। তুইও বুঝি সেই আদিম মেয়ে—তোর ননদ বাসন্তীরই অনুরূপ। কত নির্যাতনেও বাসন্তী ভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে, তুই আছিল তেমনি স্থিতি আঁকড়ে।’ কাকলির স্পর্শটা ছাড়িয়ে নিল বিনতা: ‘অথচ বাসন্তীর তুলনায় তুই কত স্বাধীন, কত সমর্থ। সমাজ যতই বিত্তানী করুক, আইন-কানুন দিক, স্বথ-সমৃদ্ধি পাড়াক, মেয়ে আসলে বুঝি মেয়েই।’

সবলে বিনতাকে জাপটে ধরল কাকলি। বললে, ‘আর কুমারী আসলে বুঝি কুমারীই।’

উচ্চ হাসির রোল তুলল দু-জনে।

‘তুমি বাসন্তীর ব্যবস্থা করলে?’ ভূপেনের কাছে মৃণালিনী আর্জি নিয়ে হাজির হল: ‘কত আর নির্যাতন সহবে ও স্বামীর ঘরে?’

‘তুমি কী করতে বলো?’ সভয়ে মতটা জানতে চাইল ভূপেন।

‘আজকাল এত বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা হচ্ছে, আমার ইচ্ছে ওকে দিয়ে অমন একটা মামলা করাও।’

‘বিবাহ-বিচ্ছেদ!’ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ভূপেনের। বললে, ‘বউটাকে তাড়িয়ে এবার জামাইটাকেও তাড়াবে?’

‘বউটাকে আমি তাড়িয়েছি?’

‘না, না, খুড়ি, ছেলে তাড়িয়েছে।’

‘মোটোও তা নয়। বউ নিজের থেকে ভেগেছে। দড়ি লম্বা পেয়েছিল,’ অলঙ্কিতে গলা নামাল মৃণালিনী: ‘পর-গোয়ালে ঢুকেছে জাবনা খেতে।’

‘তা সে পরের মেয়ে বাইরে-বাইরে যেখানে খুশি মরুক গিয়ে, কিন্তু নিজের মেয়ের সর্বনাশ ঘটতে চাও কী বলে?’

‘সর্বনাশ মানে! স্বচক্ষে দেখে এসেছ মেয়ের চেহারা? যদি কিছু বিহিত না করো মেয়েটা অমনিতেই মরে যাবে।’ চোখে জল এনে ফেলল মৃণালিনী: ‘তখন সেই সর্বনাশের জন্তে দায়ী হবে তুমি। মেয়েটার অদৃষ্টে স্বামী নিষ্ঠুর, বাপও নিষ্ঠুর—’

‘নিষ্ঠুরতা—নিষ্ঠাতন, শুনছি তো অনেক কঠিন-কঠিন কথা, কিন্তু জামাইয়ের অপরাধটা কী?’

‘এতদিন পরে অপরাধটা কী? সমানে মেয়েটাকে মারধোর করে চলেছে। গোড়ায় ভেবেছিলাম সময়ে শোধরাবে হয়তো। কিন্তু কিছু পরিবর্তন নেই।’

ভূপেন কাগজপত্রে মন দিতে চাইল। বললে, ‘মাঝে মাঝে অমন-দু-চারটে প্রবল ঝগড়া দাম্পত্যজীবনে স্বাভাবিক।’

‘ঝগড়া? তুমি একে শুধু ঝগড়া বলতে চাও? সেদিন শুনলাম চড় মেয়ে দুটো দাঁত নড়িয়ে দিয়েছে। মাথায় যে চুল নেই, তা অমনি উঠে যাচ্ছে বলে নয়, জামাই গোছা-গোছা করে টেনে তুলে নিয়েছে বলে—’

‘কিন্তু স্বামী মারধোর করে এই কারণে তো হিন্দু বিয়ের সরাসরি ডিভোর্স হতে পারে না।’ আইনের গলায় বললে ভূপেন।

‘তোমাকে বলেছে! তারি তুমি উকিল হয়েছ।’ ভেঙে উঠল মৃণালিনী: ‘শারীরিক পীড়ন করে স্বামীস্ত্রীর জীবন বিপর্যয় করবে তাতে আইনে স্ত্রীর কোনো প্রতিকার নেই?’

‘আছে, সে হচ্ছে জুডিশিয়াল সেপারেশন। স্বামীর থেকে আলাদা হয়ে থাকবার অধিকার।’ পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করতে লাগল ভূপেন। ‘সেটা বিয়ে ঠিক ছিন্ন করে ফেলা নয়, গোড়াটাকে আলাগা করে দেওয়া। ঠিক উচ্ছেদ-বিচ্ছেদ না বলে বলতে পারো বিরহ—বিভেদ—’

‘কিন্তু তাতে খোরপোশ পাবে তো?’

‘তা হয়তো পাবে—স্বামীর আয় বুঝে। কিন্তু,’ ঘোলাটে চোখ তুলল ভূপেন: ‘কিন্তু বাসস্থান পাবে না। বাসস্থান স্ত্রীকে জোগাড় করে নিতে হবে। আর এক্ষেত্রে, বাসস্ত্রীর বেলায় তার আর জায়গা কোথায়, তাকে এসে উঠতে হবে এইখানে, এই বাপের বাড়িতে।’

‘তাই উঠবে। হতচ্ছাড়ী বউটা সরেছে, ঘর উঠছে দোতলায়, যে করে হোক ঠাই করে নেবে। শুধু নিজের জন্তে নয়, পেটে যতগুলো ধরেছে, সব কটার জন্তে তারি হাতে আদায় করবে খোরপোশ। ই্যা গো, ছেলেমেয়েগুলোর জন্তেও পাবে তো?’

‘তা পাবে। সবগুলোই যখন—কটা যেন—সবগুলোই যখন নাবালক। যদি অবশি সবগুলোকেই মা নিয়ে আসতে পারে সঙ্গে করে।’

‘সঙ্গে করে আনবে না তো কেলবে কোথায়?’

‘তা তো ঠিকই।’ আবার হতাশ মুখ করল ভূপেন : ‘কিন্তু এখানে, এ বাড়িতে, প্রকাণ্ড ভিড় হয়ে যাবে না?’

‘তার আর কী করা! আছোপাস্ত খোরপোশ দেবে তো। জিভ বেরিয়ে যাবে পাজিটার। তখন মজা বুঝবে, কী করে কী চলে!’ উৎফুল্ল হবার ভাব করল ঝগালিনী : ‘তারপরে ঠিক দেখো পায়ে তেল মাখাতে আসবে। বাপুবাছা বলে পিঠে হাত বুলুবে। বলবে আর ককখনো অমনটি করব না। কাঁদবে। ই্যা গো, জুভিশিয়াল সেপারেশান হবার পর আবার মিলতে পারে না স্বামী-স্ত্রী?’

‘তা পারে। মিট হয়ে গিয়েছে এই বলে আদালতে দরখাস্ত করলে সেপারেশানের ডিক্রি নাকচ করা যায়।’

‘ই্যা, তাই ভালো।’ ঝগালিনী প্রায় নেচে উঠল। ‘পাজিটার শিক্কা হোক। তারপরে আসুক একদিন বাসন্তীর পায়ে ধরে মীমাংসা করতে—’

‘আমি বলি কি, এই মীমাংসার জন্তে প্রতীক্ষাটা বাসন্তী এখানে না করে তার স্বস্থানে শব্দরবাড়িতে করলেই কি ভালো হয় না?’

‘ওখানে করতে গেলে ও মরে যাবে। তুমি বাপ হয়ে তাই এলাউ করবে? ও অক্ষম বলে তুমিও অক্ষম হবে?’ চেয়ারের কাছে এসে ভূপেনের মুখের উপর প্রায় নিশ্বাস ফেলল ঝগালিনী : ‘জানো সেদিন সুনলাম একটা লাঠি দিয়ে মেয়েছে মেয়েটাকে—’

‘আর তোমার মেয়ে কী দিয়ে মেয়েছে?’

‘আমার মেয়ে মেয়েছে মানে?’

‘তা জামাইকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো জানা যায়। শোনো,’ মুখ প্রায় নিশ্বাস করল ভূপেন : ‘একতরফা বিচার কোরো না। এক হাতে তালি বাজে না কখনো। যদি জামাইকে বলতে দাও, ও হয়তো লিষ্টি দেবে কী কী অস্ত্রে হুনিপুণ তোমার বাসন্তী। হয়তো সুনবে, কাঁচি দিয়ে মেয়েছে, পেপারগুটে দিয়ে, মোটা বই-খাতা ছুঁড়ে। তা ছাড়া তোমারই তো—আমাদেরই তো মেয়ে—কী দুর্বল রাগী হবার সম্ভাবনা তা তো বুঝি। তা খোঁজ করলেই হয়তো দেখবে, ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কত কী জিনিস ভেঙেছে সংসারের। চায়ের পেয়াল বা কাঁচের গ্লাস শুধু নয়, টাইমপিস ঘড়ি, ওয়ুধের শিশি, ইলেকট্রিকের বালব—’

‘তোমাকে সব বলেছে ! তোমাকে উকিল রেখেছে জামাই !’ মৃণালিনী টিকিকিরি দিয়ে উঠল।

‘বলে নি কিন্তু অস্বাভাবিক করতে পারছি। পুরুষমানুষ তো, সহজেই গেল্লি-পাঞ্জাবি খুলে পিঠটা দেখাবে না। কিন্তু যদি খুলত, সেখানেও দেখতে পেতে অনেক গ্রহাণের লাঞ্ছনা। অস্বস্ত দাঁতের দাগ।’

‘দাঁতের দাগ ?’

‘মেয়েরা আর কিছু না পাকুক কামড়াতে ওস্তাদ !’

‘তা দেবেই তো কামড়ে। পাশগুদের বিরুদ্ধে তাদের আর অস্ত্র কী ! দাঁত আর নখই তাদের অস্ত্র।’

‘স্বতরাং চিস্তিত হোয়ো না মেয়ের জগে।’

‘চিস্তিত হব না ?’ জুজ্বল মৃণালিনী।

‘না। তার উপরে যষ্টির যেমন রূপা আছে, বটীরও তেমনি রূপা আছে। স্বতরাং ভয় পাবার কিছু নেই।’ নথিপত্রের গভীরে খুঁকতে চাইল ভূপেন।

‘বা, সে আবার কী কথা। যা দৈব দুর্ঘটনা—’

‘হ্যাঁ, দৈব দুর্ঘটনাই ঘটাবে মীমাংসা। বটীর বাচাবেন যষ্টি থেকে। শোনো—’
আবার চোখ তুলল ভূপেন, নিশ্চয় চোখ : ‘কোনো ঘটনাকে জটিল কোরো না, যার যা নিজের স্রোত, তাই নিতে দাও। আহা-বিহারে যদি ওদের মীমাংসা হয়ে থাকে, গ্রহাণেও হবে।’

‘তার মানে মেয়েটাকে তুমি মরতে দেবে।’

‘হ্যাঁ, আদালতও তাই দেখবে তেমন কোনো ভয় আছে কিনা, অস্বস্ত বাসন্তীর মনে তাই আছে কিনা। তেমন ভয় আছে মনে করি না, কোনো দিন জানায়ও নি তেমন বাসন্তী। ধৈর্য ধরে আছে, থাকতে দাও। ঘাঁটিয়ে না। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, বড় হোক—’

‘তুমি যে নিষ্কর্মার অবতার, তা আমি আগেই জানতাম। দেখি আমি নিজে কী করতে পারি ! আজকাল আইনকানূনের কত সুবিধে—এ সুবিধে যে না নেয় সে গাধা।’

‘বটে ? আইন বলেছে ধৈর্য থাকবে না, ক্ষমা থাকবে না, ত্যাগ থাকবে না, সংপ্রবৃত্তি সব বনবাসে যাবে ? সূচ্যগ্র অধিকার নিয়ে পক্ষে-পক্ষে শুধু হানাহানি কামড়া-কামড়ি করবে ? এর বাইরে আর বাঁচবার জায়গা থাকবে না মানুষের ? শোনো,’
চলে যাচ্ছিল মৃণালিনী, ডাকল ভূপেন : ‘শিকড়ের ছোট একটা তক্তাও বেঁচে থাকলে

মাটির সঙ্গে লেগে থাকলে লতার আবার দৃঢ় হবার, পুষ্ট হবার আশা থাকে কিন্তু সেটা যদি একেবারে টেনে-ছিঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলো—যদি সেটা সত্যি বিষলতা না হয়—’

অতশত শোনবার সময় নেই মৃণালিনীর, সে আবার বাই মারল।

‘এ তো তোমার মেয়ের কথা হল।’ আবার ডাকল ভূপেন : ‘তোমার ছেলের খবর কী?’

‘তার আমি আবার বিয়ে দেব।’ ফিরে দাঁড়িয়ে বললে মৃণালিনী।

সচরাচর হাসে না ভূপেন। কিন্তু এখন অব্যবহৃত হেসে উঠল। বললে, ‘তার মানে মেয়েকে কয়েদ করবে বাপের বাড়িতে আর ছেলেকে কয়েদ করবে খোদ জেলখানায়।’

‘তার মানে?’ কুণ্ঠিত মৃণালিনী।

‘এক স্ত্রী থাকতে আরেক স্ত্রী গ্রহণ করা নতুন আইনে নিষিদ্ধ। সে সোনার অতীত চলে গিয়েছে। এক স্ত্রীকে ত্যাগ করে আরেক স্ত্রীকে, চাই কি একাধিক স্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করা। স্ত্রী বর্তমানে স্বকু যদি আবার বিয়ে করে, নতুন আইনে দ্বিতীয় বিয়ে তো ভুল হবেই, উপরন্তু স্বকুর জেল হয়ে যাবে, আর তুমি—তুমিও পড়বে অ্যাবেটমেন্টের চার্জে—’

‘কী বুদ্ধি!’ ধিক্কার দিয়ে উঠল মৃণালিনী : ‘এই না হলে উকিল!’ পরে প্রাঞ্জল হবার চেষ্টায় বললে, ‘স্ত্রীর বর্তমানে তো হবে না, কিন্তু স্ত্রীর অবর্তমানে?’

‘অবর্তমানে মানে?’

‘মানে যখন স্ত্রী থাকবে না—’

‘থাকবে না কী! বেঁচে থাকবে না?’

‘কী বুদ্ধি!’ দৃঢ়, স্পষ্ট হল মৃণালিনী : ‘স্ত্রীকে স্বকু ডিভোর্স করবে।’

‘ডিভোর্স করবে?’ হতবুদ্ধির মত তাকাল ভূপেন।

‘হ্যাঁ, তার জন্তে তোমার সঙ্গে তার পরামর্শ করতে হবে না। সে পুরুষ, সে স্বামী। সে একাই বুঝবে, ঠিকাই বাবস্থা করতে পারবে। এখানে তোমাদের কোনো অভিভাবকের এস্তিয়ার নেই। যেমন একা-একা জল থেকে তুলে এনেছিল তেমনি একা-একা ছুঁড়ে ফেলে দেবে জলের মধ্যে।’

ভূপেন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

‘ডিভোর্স হয়ে গেলে তখন তো আর বিয়ে করতে বাধা নেই?’ মৃণালিনীও হাসতে জানে, সে খলখল করে হেসে উঠল।

‘ছালা—’ ঘণ্টার প্রতিধ্বনি করল ওপার।

‘আপনি মিসেস বোস ?’

‘না, আমি কাকলি মিত্র ।’

‘যার যা ভেবে শাস্তি । কিন্তু’, গলার স্বরে গাঢ় হল বরেন : ‘কিন্তু আইনের চোখে সমাজের বিচারে আপনি মিসেস সুকান্ত বোস । অন্তত এখনো পর্যন্ত তাই । শুধু, একটা কথা আছে ।’

‘যদি কাজের কথা হয় তো বলুন ।’ কাঠ-কাঠ জবাব দিল কাকলি ।

‘ভীষণ কাজের কথা ।’ গলা আরো খাদে নামাল বরেন : ‘শুধু । শুধুছেন ?’

‘বলুন ।’

‘কথাটা ভালো নয় । দুঃসংবাদ ।’

এক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করল কাকলি । তবে বাবার কিছু হয়েছে ? ঐ সেদিনও তো দেবনাথ এসেছিল টাকা নিতে । বাবার অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে এমন কিছু বলে নি তো । তা ছাড়া বাবার খবরে বরেনের আগ্রহ কী । তবে দীপঙ্করের মামলা খারিজ হয়ে গিয়েছে ? দুঃসংবাদটা বিদ্রূপ ? তা ছাড়া, খারিজ হয় কী করে ? সমস্ত তদবির নিটুট করে রাখা হয়েছে কোটে । তবে কি মামলায় হেরে গিয়েছে বরেন ? বা, এত শিগগিরই বা মামলার নিষ্পত্তি হয় কী করে ? শুনানি হলে তারিখটা জানতে পেত না কাকলি !

নিশ্চয়ই এ অশুভ কোনো কারসাজি । যেন একটা বিবাদ মেটাবার জন্তে সালিশ সাজবার দরকার পড়েছে বরেনের, মধ্যস্থ হয়ে বাহাহুরি কেনবার । তাই কাকলিকে কৌশলে সুকান্তর কাছে টেনে নেওয়া যায় কি না তাই একটা গল্প ফাঁদ । দুর্ঘটনা বানানো । পড়ে-টড়ে কোথাও একটা অ্যাকসিডেন্ট করেছে, হাসপাতালে আছে, শেষ দেখা দেখতে চায় কাকলিকে, ভীষণ সে অহুতপ্ত—সুতরাং কাকলি যদি মাহুষ হয়, তার যদি হৃদয় বলে কিছু থাকে যেন পত্রপাঠ ছুট দেয়, যেন তার শিয়রে এসে দাঁড়ায় । আর সেখানে, হয়তো বা সেটা হাসপাতাল নয়, হয়তো বা হোটেল, অনেক মদ্র আওড়ে শাস্তির জল ছিটিয়ে, দু হাত একত্র করে দেবে বরেন । বলিহারি যাই, কী মামার বাড়ির আবদার । এ যেন খেলতে-খেলতে দুই বিরুদ্ধ খেলোয়াড় হঠাৎ মারামারি করে ফেলেছে আর রেফারি ঝগড়া মিটিয়ে দিলে হ্যাণ্ডশেক করছে পরস্পর । যেন এও একটা এক বেলারই খেলা আর সাময়িক চড়া মেজাজটাকে নরম করার জন্তে সামান্য একটু হাত ঝাঁকানি । ব্যাপারটা যেন এমনি হালকা, এমনি উপর-উপর । আর বরেন যেন সেই রেফারি । মোড়ল-মাতব্বর ।

‘কী বলুন । এ কি চূপ করে গেলেন কেন ?’ কাকলি উঃস্বক স্বর ছুঁড়ল ।

‘খবরটা ভালো নয়। পারবেন তো সহিতে?’
‘যখন শখ করে শোনাচ্ছেন, না সয়ে উপায় কী।’
‘খবরটা অজ্ঞায়—’
‘দুঃসংবাদের আবার জ্ঞায়-অজ্ঞায় কী।’
‘জুহুন। স্বকান্তকে চেনেন?’
‘কোন স্বকান্ত? যে আপনাদের ফার্মের এমপ্লয়?’
‘হ্যাঁ, চেনেন তা হলে।’ আশ্বস্ত হবার ভাব করল বরেন : ‘সে একটা হঠাৎ কাণ্ড করেছে।’
‘কী কাণ্ড! কিঞ্চিৎকা কাণ্ড?’
‘প্রায় তাই। আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা করেছে। ঠিক করে নি এখনো, তবে করবে বলে ঠিক করেছে।’ বরেন কণ্ঠস্বরে অন্তরঙ্গতার তুলি টানল।
‘কী মামলা?’
‘হ্যাঁ, আপনাকে তাই আগেভাগে জানিয়ে রাখছি। জানেন তো কোরওয়ার্ড ইন্ড কোরআর্মড।’
‘কিস্তি মামলাটা কী তাই তো বলবেন—’ কষ্ট শোনাৎ কাকলিকে।
‘ডিভোর্সের মামলা।’
‘বলেন কী! এ দুঃসংবাদ কোথায়? এ তো সুসংবাদ।’
‘সুসংবাদ?’
‘হ্যাঁ, লটারিতে ফাস্ট প্রাইজ পাওয়ার মত।’ কাকলি দৃঢ় অথচ বাঁকা গলায় বললে, ‘তবে আপনার এমপ্লয়িকে বলবেন সে শুধু মামলা করবে বলে ঠিক করেছে আর আমি মামলা অলরেডি ফাইল করে দিয়েছি।’
‘ফাইল করে দিয়েছেন?’
‘কেন, বাধা কী? নতুন আইনে হিন্দু-দ্বীও যে স্বামীর থেকে ডিভোর্স চাইতে পারে জানেন না?’
‘জানি।’
‘তবে চমকাচ্ছেন কেন?’
‘চমকাজি, আপনিও ডিভোর্স চান।’
‘এক শো বার চাই। রোগ হলে তার উৎখাত চাই, ভুল হলে তার সংশোধন চাই। ভালোবাসা নামে একটা রোগ হয়েছিল একদিন, চোখের ভুল নামে একটা বিকৃতি। সেই রোগের বিতাড়ন চাই, সেই বিভ্রমের অপসারণ।’

‘ভালো কথা । দু-জনেই যখন চান,’ বরেন স্বরে মধু ঢেলে বললে, ‘তখন একটা মিটমাট হতে পারে না ?’

‘মিটমাট ? আবসার্ড ।’ ক্রুদ্ধ শব্দে ফোন ছেড়ে দিল কাকলি ।

ধীরে-ধীরে বরেনও রেখে দিল রিসিভার ।

সুকান্ত সামনেই বসে ছিল, জিজ্ঞেস করল, ‘কী বললে ?’

‘ডিভোর্সে রাজি আছে ষোল আনা ।’ গম্ভীর মুখে বললে বরেন, ‘এত রাজি যে, পারলে ও-পক্ষই মামলা রুজু করে দেয় ।’

‘দিক না । যে কোনো ভাবেই হোক বাঁধনটা ছিঁড়ে গেলেই বাঁচা যায় ।’

‘তাই বলছিলাম, মিটমাট করে নিন ।’ একটু সতর্ক হাসল এখানে বরেন ! বললে, ‘মিটমাটের কথা উঠতেই থেপে গেল, জলে উঠল তেলে-বেগুনে—’

‘ভুল বুঝেছে ।’

‘ভেবেছে বুঝি আমি বিরোধটাই মিটিয়ে নিতে বলছি । আমি যে বলছি মিটমাট করে ডিভোর্সের ডিগ্রিটা হাসিল করে নিন, সেটা বোঝে নি । কী রাগ রে বাবা !’

‘অসম্ভব ।’ টিপ্পনী জুড়ল সুকান্ত ।

বরেন আবার ডায়াল করল ।

‘হ্যালো—’ প্রতিধ্বনিত হল কাকলি ।

‘আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন । মিটমাট মানে আমি আপনাদের কলহকে আপোস করে নিতে বলছি না, আমি বলছি, আপোসে আপনাদের ডিভোর্সের ডিগ্রিটা কোর্টের কাছ থেকে আদায় করে নিতে ।’

‘ও ! ধন্যবাদ । আচ্ছা, মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স হয় না ?’

‘হয়, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে হয়, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে হয় না । আপনাদের তো হিন্দু বিয়ে ?’

‘হ্যাঁ ।’

‘কেন যে হিঁদুয়ানি’ দেখাতে গেলেন ! দিবি ধর্মান্ধ মানি না বলে ডিক্লেমেশন দেবেন, স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে রেজেষ্ট্রি করে দিবি ভদ্রলোকের মত বিয়ে হবে । তেমনি রেজেষ্ট্রি-করা বিয়ে হলে আজ আর ভাবনা ছিল কী । মিউচুয়াল কনসেন্টের পিটিশন দিয়ে দিবি কেটে পড়তে পারতেন । তারপর বছর দুই ছোঁয়াছুঁয়ি বন্ধ, ব্যঙ্গ, বিয়ে ‘ফাট’ ।’

‘হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে কোনো সুবিধে বা শর্টকাট নেই ?’ কাকলি কথা খুঁজতে

ধুঁজতে বললে, মানে, হু পক্ষই যখন চায় বিয়েটা যাক, তখন সহজে কার্‌সিদ্ধির একটা পথ বাতলানো যাবে না ? আপনি যখন আমার বন্ধু—আর বুদ্ধিমান—

‘এক পক্ষের প্রভু আরেক পক্ষের—কী বললেন, বন্ধু—’ হাসল বরেন, স্বকাস্তর দিকে চেয়ে হাসল। বউকে যখন সে ছেড়েই দিচ্ছে, তখন গায়ে পড়ে একটু স্বাধীনতা নিলে তার আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তাই বললে, ‘মনে হয়, ছন্দ রাখতে গিয়ে বলা উচিত, এক পক্ষের প্রভু, আরেক পক্ষের ভৃত্য। হু পক্ষই সমান ইনটারেস্টেড। হ্যাঁ, ভেবে-চিন্তে বাতলাতে হবে পথ। দেওয়াল যখন আছে, তখন গুলঘুলিও আছে। আইন যখন আছে, তখন ফাঁকি দেবার রাস্তাও আছে।’

‘কেন, ফাঁকি কেন ? হু-জনেই যখন ডিভোর্স চাচ্ছি, তখন আর ফাঁকি কোথায় ?’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। শিগগির একদিন আসবেন। পথ-সন্ধানের পরামর্শ করব।’

‘আপনার ওখানে যাব কী ! ওখানে গেলেই তো আপনার সেই এমপ্লয়ির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—’

‘হ্যাঁ, সত্যিই তো। না, আপনি আসবেন না, আমিই যাব।’

‘টেলিফোনে স্থান-কাল ঠিক করে নেবেন।’ ফোন রেখে দিল কাকলি।

বরেন স্বকাস্তকে বললে, ‘লিভিং ইন অ্যাডালটারিটাই ডিভোর্সের গ্রাউণ্ড করতে হবে।’

‘আর কোনো কিছুই খাটে না বুঝি ?’

‘অ্যাডালটারিটাই খাটে না, তবে সেটা হয়তো ম্যানেজ করা যায়।’ হাসতে গিয়েও হাসল না বরেন : ‘অজ্ঞ যেসব কারণ আছে, তা কোর্টকে বিশ্বাস করানো চক্কর।’

‘যথা ?’

‘ধরো, ধর্মাস্তর গ্রহণ, ধরো সন্ন্যাস, কুষ্ঠ, যৌন ব্যাধি, ধরো সাত বছরের নিরুদ্দেশ। ডুমি যদি বলো, আমার স্ত্রী হিন্দুও ছেড়ে অজ্ঞ ধর্ম নিয়েছে কিংবা সন্ন্যাসিনী হয়েছে কিংবা সাত বছর তার পাক্তা পাওয়া যাচ্ছে না বা তিন বছর ধরে প্রবল কুষ্ঠে বা যৌন ব্যাধিতে ভুগছে, আদালত চট করে বিশ্বাস করবে না, অন্তত বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ চাইবে। কিন্তু যদি বলো আমার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত আছেন—’

‘তা হলেই বিশ্বাস করবে ?’

‘বিশ্বাস করা সহজ হবে। দুই কারণে সহজ হবে। প্রথমত, তোমার স্ত্রী, যিনি নিজের ডিভোর্স চাচ্ছেন, এ অভিযোগের প্রতিবাদ করবেন না। প্রতিবাদ করা তাঁর স্বার্থের বিরুদ্ধে। তিনি ঘাড় পেতে মেনে নেবেন অপবাদ।’

‘আর দ্বিতীয়ত ?’

‘দ্বিতীয়ত, যার সঙ্গে তিনি ব্যভিচারে লিপ্ত, তোমার দরখাস্তে তার নাম উল্লেখ করতে হবে। আর সেই লোক নোটিশ পেয়েও হাজির হবে না, জবাব দেবে না, করবে না প্রতিবাদ। তোমাদের খাতিরে, যাতে তোমাদের কার্যসিদ্ধি হয়, তার জন্তে এই কুৎসায় সায় দেবে। তুমি তো দীপঙ্করের কথা ভাবছ—’

‘হ্যাঁ, সেখানে ঠিক সত্যের রোদ না থাক, সন্দেহের অন্তত আবছায়া আছে। স্কাস্ত চোখ নামাল।

‘দীপঙ্করকে কো-রেশপণ্ট করলে কাজটা স্বগম হবে না।’ বরেন মুখ তুলে তাকাল পরিপূর্ণ ঔদার্যে : ‘দীপঙ্কর মেনে নেবে না এ অপযশ। সে হাজির হবে, জবাব দেবে, অস্বীকার করবে, লড়বে প্রাণপণে। লিভিং ইন অ্যাভালটারি গ্রাম হবে না। তোমার মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।’

অসহায়ের মত তাকিয়ে রইল স্কাস্ত।

‘কোনো তরফ থেকে কনটেন্ট হলোই তুমি কুপোকাত।’ বরেন আবার তাকান প্রশান্ত হয়ে : ‘তোমার চাই একজন নেম-লেগার, যে সহজেই তার নামটা ধার নেবে তোমাকে তোমার বিবাহচ্ছেদের অঙ্গরূপে, চাই এক নীলকণ্ঠ, যে সহজেই হজম করবে হলাহল, আর যে নামে তোমার স্বীরও আপত্তি হবে না। রাম-শ্রাম-চাকর-বাকর ধরে যদি তুমি নাম দাও, তোমার স্বী আবার তাতে প্রচণ্ড খেপে যেতে পারেন, কোর্টে ছুটে আসতে পারেন ডিফেন্ড করতে। সুতরাং সব দিক ভেবে-চিন্তে, স্বামী-স্বী, তৃতীয় পক্ষ, কারু না অসম্মতি থাকে, এমন এক লোক বাছতে হবে—’

‘তবে তুমি যদি রাজি হও, তুমি যদি নাম দাও—’ মিনতি-ভরা মুখে তাকান স্কাস্ত।

উদার সিদ্ধুর মত হেসে উঠল বরেন। বললে, ‘আমার আপত্তি কী ! কলঙ্কের টেট আমাকে কী করবে ! বন্ধুর যদি উপকার হয়, আমি শেষ পর্যন্ত যেতে পারি। কিস কথা হচ্ছে তোমার স্বী রাজি হবেন কিনা।’

‘একটা শুধু নাম তো। আর সেই নাম না পেলে তারও মনস্কাম—ডিভোর্স তে তারও মনস্কাম—সফল হয় কী করে ?’ আবার অনুনয়ের ভঙ্গি করল স্কাস্ত : ‘তা’ সঙ্গে তো দেখা করছ তুমি।’

‘করতেই হবে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, এ কথায়, এ কু-কথায় সে রাজি হবে কিনা।’ বরেন সিগারেট ধরাল।

আমার বাড়িতে আসতে আপনার আপত্তি আছে?’ টেলিফোনেই জিজ্ঞেস করল বরেন।

‘না, আপত্তি কিসের?’ কাকলি একটু বরং উত্তেজিত হল। বললে, ‘এসব পরামর্শ তো নিরিবিলিতেই হওয়াই ভালো।’

‘আসলে এসব পরামর্শের জায়গা উকিলের চেম্বার—যা যত সব দুট্টু নাটকের দাজঘর।’ হাসল বরেন: ‘কিন্তু আপনাদের মামলা তো উকিল সাজাবে না, আপনারাই সাজিয়ে উপহার দেবেন উকিলকে।’

‘আর তা আপনার মধ্যস্থতায়।’ কৃতজ্ঞতার স্বর আনল কাকলি।

‘হ্যাঁ, আমি সাঁকো মাত্র, আপনাদের চলাচলের সাঁকো।’ উদার ভঙ্গি করল বরেন: ‘যদি বলেন জুড়তে পারি নয়তো বলেন তুড়তে পারি—’

‘আর যুক্ত নয়, এবার মুক্ত—’

‘হ্যাঁ, সেই মুক্তির জন্তেই যুক্তির প্রয়োজন।’ বরেন চকল হয়ে উঠল: ‘আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

‘না, না, গাড়ি লাগবে না। আমি বাসে-ট্র্যামেই যাব। আমি যাচ্ছি আমার নিজের গরজে, কারু নিমন্ত্রণে নয়। এখন দয়া করে বাড়ির ডিরেকশনটা বলে দিন—’

সন্দের দিকে হস্টেলফেরত গেল কাকলি। নিজেই সজাগ চোখে অপেক্ষা করছিল বরেন, নিচের সরকারি ড্রয়িং রুমে না ঢুকিয়ে সোজা উপরে নিয়ে এল।

চারদিকে সচ্ছলতা উচ্ছল হয়ে রয়েছে। এ আর দেখবার কী! নিজের সাহসটাকে দেখতে-দেখতে একের পর এক সিঁড়ি ভাঙতে লাগল কাকলি।

‘বন্ধন।’

শোবার ঘর নয়, শোবার ঘরের পাশে একটা ছোট বসবার ঘর। অল্প আসবাব আর অনেক বই দিয়ে শ্রীমন্ত।

একটা নিচু কোচে বসল কাকলি। আফিস থেকে সটান আসে নি, হস্টেল হয়ে এসেছে, তাই কক্ষ-গুচ্ছ ভাবটা নেই। ধোয়াপাখলা করে এসেছে, একটু বা মেজে-ঘষে সারা শরীরে এনেছে মক্ষণ বিশ্রাম। পরনের শাড়িটা অনেক চিলেচালা, হাওয়া-গড়ানো। চুলের ভুরটা মাথার উপর উত্তত হয়ে না থেকে ঘাড়ের উপর ঢলে পড়া।

সমস্ত ভক্তিটা আলস্তের লাস্ত দিয়ে বিজড়িত। অনেকক্ষণ থাকতে হবে অনেকক্ষণ
বসতে হবে এমনি বিলম্বিত লয়ের বাজনা।

একটা চটি বই কাকলির দিকে বাড়িয়ে দিল বরেন। বললে, ‘এই হিন্দু ম্যাগেজিন
আস্কট্টা পড়ে দেখুন। ভিত্তোরের সেকশন—’

বইটা হাত বাড়িয়ে নিল কাকলি। নিতে-নিতে বললে, ‘আমি এর কী বুঝব।’

‘কেন বুঝবেন না? আইনের ভাষা খুব স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন। অন্তত যতক্ষণ না উকি
আসে। পড়ুন।’

নত, নিবিষ্ট চোখে পড়তে লাগল কাকলি। একবার পড়ে আরেকবার পড়ল।

ততক্ষণ নিরালস্য চোখে দেখতে লাগল বরেন। শাড়ির পাড়, ব্লাউজের কাঁজ,
জুতোর স্ট্র্যাপ, হাতের সরু চুড়িগাছটা। কী নয়? কণ্ঠার হাড়, হাতের রগ, নাকে
ডাঁট, গলার উপরকার তিলচুঁকু পর্যন্ত।

পড়া শেষ করে বিমর্ষ চোখে তাকাল কাকলি।

‘দেখলেন? কী মনে হয়? মনে হয় না ব্যভিচারটাই সোজা।’

‘সোজা?’ প্রায় আঁতকে উঠল কাকলি।

‘সোজা মানে প্রমাণ করা সোজা।’ বরেন বইটা টেনে নিল কাকলির হাত থেকে
‘নইলে ধর্মাস্তর বলুন, যৌন ব্যাধি বলুন বা কুষ্ঠ বা পাগলামি বলুন, এ ক্ষেত্রে কিছ
খাটবে না, প্রমাণ করা অসম্ভব হবে।’

‘আর ওটা—ঐ যে কী বললেন—ওটা—’ ঢোক গিলল কাকলি।

‘হ্যাঁ, ব্যভিচার। অ্যাডালটারি। শব্দটা উচ্চারণ করতে ঘাবড়াচ্ছেন কেন?
প্রশান্ত মুখে মুহূর্ত্তি হাসল বরেন : ‘একটা বৈজ্ঞানিক টার্ম। আইনের মন্ত্র।’

‘না, ঘাবড়াবার কী হয়েছে!’ দৃঢ় হবার ভাব করল কাকলি : ‘কিন্তু ব্যভিচারটা
বা সহজে প্রমাণ হবে কিসে?’

‘আমি যদি বলি আমার স্ত্রী কাকলি বহু খুঁটান হয়েছেন, বা মুসলমান হয়েছে
মিথ্যে শোনাবে—অন দি ফেস অফ ইট মিথ্যে শোনাবে—’

‘আপনার স্ত্রী?’ মুচকে হাসল কাকলি।

‘ওটা মাপ করে নেবেন। এখানে আমি মানে স্বকাস্ত। স্বকাস্ত বাদী, বাদী
কেসটা স্টেট করছি।’ গম্ভীর হল বরেন : ‘তারপর কোন চার্জ কোন মন্ত্র, কী না
ধবল ধর্ম বদলে, পাঁচ শো ঝামেলা।’

‘কিন্তু যদি বলা যায় সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সন্ন্যাসিনী হয়ে—’ দুই-
মুখ করল কাকলি।

‘সেটাও সমান মিথ্যে শোনাবে। কাকলি বহু বাটারওয়ার্থে জলজ্যাস্ত কাজ করছেন কোর্ট হাত বাড়িয়েই ধরতে পারবে। তাই সেটাতেও জোর পাচ্ছে না স্বকান্ত। আর ব্যাধি-ইত্যাদি যদি বলেন, তা হলে কোর্ট সরাসরি মেডিকেল সার্টিফিকেট চেয়ে বসবে। তা হলেই তো প্রমাণের দফা রফা!’

‘কিন্তু ব্যাভিচারের বেলায় প্রমাণ চাইবে না কোর্ট?’

‘চাইবে। কিন্তু সে প্রমাণ নলিনীদলগত জলের মতই তরল।’

‘বলেন কী? কী করে?’

‘আমি যদি বলি, আমি এখানে স্বকান্ত—যে আমার স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত, আর যদি নোটিশ পেয়েও সে তা প্রতিবাদ না করে, আর যার সঙ্গে লিপ্ত সেও যদি অতৃপ্ত মৌনাবলম্বন করে থাকে, তা হলেই আইনের চোখে অভিযোগ সপ্রমাণ হল। যা ক্ষমানে অপ্রতিবাদিত তাই আইনে প্রমাণিত বলে ধরতে হবে। হুতরাং—’

ভীতু-ভীতু মুখ করল কাকলি। বললে, ‘স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটা অস্পষ্ট অভিযোগ কবলেই শুধু চলবে না, একজন দ্বিতীয় পুরুষকে দাঁড় করাতে হবে?’

‘হ্যাঁ, জলজ্যাস্ত দ্বিতীয় পুরুষ।’ বলেন নড়ে-চড়ে বসল : ‘স্পষ্ট হোক অস্পষ্ট হোক, অভিযোগটা তো আগাগোড়াই মিথ্যে, কিন্তু দ্বিতীয় পুরুষটিকে কাল্পনিক করা চলবে না। আর্জিতে স্বকান্তকে বলতে হবে আমার স্ত্রী অমুক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত আছেন। ব্যাভিচারটা মিথ্যে, অমুকের সঙ্গেটাও মিথ্যে, কিন্তু বাস্তবে স্ত্রীটি যেমন খাটি তেমনি অমুক ব্যক্তিটিকেও খাটি হতে হবে। যাতে নোটিশটা তার উপরে হাজির-জারি হয়।’

একটা কি দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাকলি? ক্রান্তের মত বললে, ‘স্বকান্ত এমনি করে ভাবছে?’

‘এমনি করে না ভাবলে ডিভোর্স হয় কী করে? নইলে, বেশ তো,’ খাড়া হয়ে বসল বলেন : ‘আপনি লুডুন, কনটেন্ট করুন। পাষণ্ড স্বামী মিথ্যে বদনাম দেবে আপনি তা সহিবেন কেন? মামলায় ওকে হারিয়ে দিন। আপনার বিয়েটিকে টিকিয়ে রাখুন।’

‘অসম্ভব। যা গেছে তা যাক নিঃশেষ হয়ে।’ হাওয়ার্থে হাতের ঝাপটা মারল কাকলি।

‘তা হলে ও ছাড়া আর উপায় নেই, কৌশল নেই। নাত্ন: পছা বিজ্ঞতে অয়নায়।’

‘কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ বলে ও কার নাম করছে?’ জন্ত চোখে তাকাল কাকলি।

‘তা জেনে আপনার কী হবে ? রাম শ্রাম যত্ন মধু যাকে দিয়ে খুশি ও পদ-পূজা করুক, আপনার কী এসে যায় ! এতে আপনার কোনো নির্বাচন নেই। আপনি চূপ করে আছেন, চূপ করে থাকবেন। ঘোলা-ময়লা যত জল আছে বয়ে যাক গুরু দিয়ে। আপনার গায়ে জলের ছিটেটিও লাগবে না। আপনি একদিন শুভক্ষণ চোখ মেলে দেখবেন বিয়েটা খসে গিয়েছে, আপনি মুক্তবন্ধ, মুক্তবেণী—কী না জামি কথাকাটা—আপনি উবার উদয় সম অনবশুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছেন—’

‘উঃ, সে কী অদ্ভুত রোমাঞ্চ !’ খোলা আঁচলে ঝলমল করে উঠল কাকলি নতুন আরেক আরম্ভের শুভ্রতা। কিন্তু চোখের কোণে কৌতূহলের ঝিলিক মারল, ‘মেয়েদের কৌতূহলের কথা জানেন তো ? স্তবরাং দ্বিতীয় পক্ষটি কে না জেনে শাস্তি পাচ্ছি না—’

‘বা, কৌতূহল কেন, জানবার তো আপনার অধিকারই আছে। আর্জির নকল তো জারিই হবে আপনার উপর।’

‘তবু কদিন আগেই না হয় জানি। নিজেকে প্রস্তুত করি।’

‘প্রস্তুত করবেন মানে ?’

‘প্রস্তুত করি সহ্য করতে। শেষকালে আর্জির নকলে একটা যাচ্ছেতাই নাম দেওয়া না নাড়িভুঁড়ি উলটে আসে !’

‘মহৎ একটা নাম দেখলেই বা আপনার এমন কী খুশি হবার কথা !’

‘না, না, সত্যিই তো, আমার কী এসে যায় !’ কাকলি লক্ষ্য করে দেখল আগের কথাকাটা ঠিকমত বলা হয় নি, কিরকম অসাবধানে বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে। তাই সলজ্জ সংশোধনের চেষ্টায় বললে, ‘আমায় শুধু বেরিয়ে আসা নিয়ে কথা। যে কোনো একটা নাম ধরে ভাবার পার হয়ে যাওয়া।’

‘হ্যাঁ, তাই। নাম নিয়ে আপনার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। যদি প্রশ্ন কেউ তুলতে পারে সে হচ্ছে আদালত। মানে, আদালত দেখতে পারে নামটা বিগত শোনাচ্ছে, না অবিশ্বাস্ত। সন্দেহ উদ্বেক করছে, না বেশ সরল-সরল দেখাচ্ছে। শুধু এইটুকু—’ বরেন হেলান দিল পিঠ ছেড়ে।

‘আমিও তাইই বলতে চাইছিলাম।’

‘আপনার কিছু বলবার নেই। আপনি একেবারে চূপ। আপনার শুধু কোনো-রকমে বেরিয়ে আসা। খণ্ডে দেওয়া।’

কাকলি চূপ করে গেল। রইল অধোমুখে।

‘আর প্রশ্ন তুলতে পারে দ্বিতীয় পক্ষ। প্রশ্ন তুলতে পারে, সে মেনে নেবে কিনা

এই অপযশ। আপনি মেনে নিচ্ছেন আপনার স্বার্থ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্বার্থ কী?’

‘বা, অমুকুল দ্বিতীয় পক্ষ না পেলে তো মামলা ডিক্রিই হবে না।’

‘হ্যাঁ, অমুকুল। উদার, বদাত্ত, নিঃস্বার্থ। বিলেতে কো-রেসপণ্ডেন্ট মানে দ্বিতীয় পক্ষ কিনতে পাওয়া যায় শুনেছি, কিন্তু এখানে তা কোথায়?’

‘তেমন লোক পাওয়া যাচ্ছে না বুঝি?’

‘স্বকাস্ত দীপঙ্করকে বেছেছিল—’

‘দীপঙ্করকে? ছি ছি ছি—’

‘যাকে বাছবে তারই বেলায় ঐ ছি ছি উঠবে। কেননা গল্পটা যে আগাগোড়া মিথো, বানানো। তা ছাড়া দীপঙ্করকে বাছলে সে মেনে নেবে নাকি? সে অসন্তুষ্ট, সে নির্খাত প্রতিরোধ করবে। আর প্রতিরোধ করলেই মামলা হাওয়া।’

‘তা হলে?’

‘এমন চাই দ্বিতীয় পক্ষ যে বাদী-বিবাদীর বন্ধু, হিতাকাজক্ষী, যে উভয় পক্ষের দ্ব্যর্থ মেনে নেবে এ কলঙ্ক, এ অসম্মান।’

‘তেমন লোক নেই বুঝি?’

‘আছে। আমিই সেই লোক। আমিই রাজি হয়েছি দ্বিতীয় পক্ষ হতে।’

‘উঃ, আপনি কী ভালো!’ উদ্বেল, বিহ্বল চোখে তাকাল কাকলি। ফুটে উঠল বা একটু আনন্দের অকণিমা।

দৃশ্য-শ্রুত সমস্তই উপেক্ষা করল বরেন। বললে, ‘আমার দ্বারা আপনাদের যদি স্থায়ী একটা উপকার হয়, আমি তা দেখব না কেন? নইলে এ ছাড়া আর আপনাদের উপায় কী?’

‘কিন্তু মিছিমিছি তো আপনাকে দুর্নামের ভাগী হতে হল!’ মায়া-মাথানো মুখ করল কাকলি।

‘দুর্নাম? পুরুষের আবার দুর্নামের ভয়! আর এ তো মিথো, মায়া, মরীচিকা—’

‘প্রায় সব দুর্নামই তাই। অল্পের উপরে কল্পনার কারুকাজ।’

‘এখানে তো স্বপ্নও নেই। জমিই নেই তাই জমিদারি। কী জানি কথাটা! স্নাং একটু, কিন্তু ভারি লাগসই। মূলে মাগ নেই তায় ফুলশয্যে।’ উদারকণ্ঠে হেসে উঠল বরেন: ‘কিন্তু কী আশ্চর্য, এখনো চা দিয়ে গেল না?’ বরেন এগুলি দরজায় দিকে।

বরেন আবার কাছে ফিরে এলে কাকলি বললে, ‘ধাঝা মহৎ পরোপকার করেন

গীতা এমনি বেহিসেবী হন। কপোতকে বাঁচাতে গিয়ে শ্রেন পাখিকে নিজের বুকের মাংস কেটে দেন।’

চাকর চা নিয়ে এল ট্রেতে করে।

‘আপনি স্বপ্নের কথা বলেন।’ বরেন বলল মুখোমুখি : ‘কিন্তু জানেন, আরো একটু কথা আছে।’

চা করতে-করতে চোখ তুলে তাকাল কাকলি : ‘আরো?’

‘হ্যাঁ, আরো।’ গম্ভীর হল বরেন : ‘আপনাদের বিয়ের পর তিন বছর এখানে যায় নি। আর হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট বলছে বিয়ের পর তিন বছর না যেতে ডিভোর্সের মামলা করা যাবে না।’

‘যাবে না?’ প্রায় আত্ননাদ করে উঠল কাকলি, ঢালন্ত চা খানিকটা পেয়ালার বাইরে পড়ে গেল : ‘তবে উপায়? দম বন্ধ করে পুরো তিন বছর বসে থাকতে হবে?’

‘না, আইন কি অত নির্দয় হতে পারে? উপায় রেখেছে একটা।’

‘রেখেছে?’

‘হ্যাঁ, বিয়ের তিন বছর না পূরতেও মামলা করা যাবে যদি ব্যভিচারটা অসাধারণভাবে কদর্য হয়, মানে আইনের ভাষায় যদি তাতে এক্সেপশ্যনাল ডিপ্রেশিও থাকে—’

পেয়ালায় চামচ নাড়তে-নাড়তে খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : ‘মানে খালি সলেশ নয়, সলেশের উপর যদি ফের রাগতা থাকে।’

‘তাই।’ পেয়ালায় চুম্বক দিল বরেন : ‘ভাই বাধাটা অতিক্রম করবার জগ্গে ঘোরতর কিছু বলতে হবে স্বকাস্তকে।’

‘বলুক গে। যা ওর খুশি। যত দূর ওর যেতে পারে কল্পনা।’ নিচু হয়ে কাকলিও চুম্বক দিল পেয়ালায় : ‘আমরা দু-জনেই যখন স্তব্ধ, দুজনেরই যখন কানে তুলো দেওয়া আর পিঠে কুলো বাঁধা, তখন আমাদের আর ভয় কী! আমাদের টলাতেও পারবে না, গলাতেও পারবে না। তবু,’ নিজেরও অলঙ্কিতে কৌতুহল খোঁচাতে লাগল কাকলিকে : ‘তবু কী জাতীয় উক্তি সম্ভব হতে পারে? অন্তত আইনে কোন উক্তি এক্সেপশ্যনাল ডিপ্রেশিওর হিসেবের মধ্যে আসবে মনে হয়?’

‘জানি না।’ সরাসরি বলে ফেলল তক্ষুনি আবার সামলে নিল বরেন : ‘হয়তো বলবে ওর বাড়ির কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রেখেছি আপনাকে, কিংবা কে জানে, হয়তো দিনে-দুপুরেই পথে-ঘাটে আপনাকে নিয়ে বেল্লাপনা করছি, কিংবা ওর বাড়িতেই এসেছি একদিন দু-জনে অস্বস্থ হয়ে—’

তালিকার মধ্যপথেই চিংকার করে উঠল কাকলি : ‘কী মিথ্যুক, কী জঘন্ত!’

‘হ্যাঁ, অভিশ্রোক্তি করতেই হবে। নইলে ঐ তিন বছরের বাধাটা ডিঙানো যাবে না। সবই বাক্যের ফুলঝুরি।’

‘কল্পনার দাঙ্গা-হাঙ্গামা।’

‘স্বন্দর বলেছেন। নইলে পথ কেটে বেরিয়ে আসা যায় না। মুক্তির জন্তে যে মিথ্যে তা মিথ্যে নয়।’

‘কাউকে বাঁচাবার জন্তে যে মিথ্যে,’ লক্ষ্মীকটাক্ষ করল কাকলি : ‘তা পরম পুণ্য। বিশ্ব তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি—’

ভান হাত বাড়িয়ে দিতে পারত অনায়াসে, দিল না বরেন। চা খেতে-খেতে বললে, ‘অথচ হাকিমকে কাইণ্ড করতে হবে এ মামলায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কলিউশন নেই, যোগসাজস নেই, চালাকি করে আপোসে বিয়েটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে না—’

‘হাকিম বুঝবে কী করে?’

‘যদি উকিল না লাগে সাধ্য কী হাকিমের বুদ্ধি খেলে। তা ছাড়া তার বোঝবারই বা কী দায় পড়েছে! স্বামী স্পষ্ট নালিশ করছে, হলফান জবানবন্দি করছে, স্বী আসছে না, তার প্যারামুর আসছে না, কেউ কিছু বলছে না প্রতিবাদে—এমন সব ইহকাল-পরকাল-ভেদী কথা—তার মানেই মামলা সত্য—স্বীকৃত সত্য। আর তা হলেই প্রমাণিত সত্য।’

‘আঃ, তারপরেই আমার ডি-ডে।’ এক মুখ হাসি নিয়ে বললে কাকলি।

‘ডে অফ ডেলিভারেন্স।’ কথাটাকে ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল করল বরেন।

‘ডে অফ ডিভোর্স।’ উজ্জ্বলতর করল কাকলি। বললে, ‘সত্যি, আপনার মত নক্কু না থাকলে এ যাত্রায় আর ত্রাণ পাওয়া যেত না। আইন অধিকার দিলে কী হবে, আদালতে গিয়ে অধিকার সাব্যস্ত করা কি মুখের কথা? উকিল মুহুরি আমলা সাক্ষী—সপ্তরথী ভেদ করে ব্যাহে গিয়ে ঢোকা, তারপর সময় সম্মান টাকা খুইয়ে সে কী কুস্তিপাকের মধ্যে গিয়ে পড়া—সাধ্য নেই কেউ আস্ত বেরিয়ে আসে। তারপর শেষ পর্যন্ত প্রার্থিত ফল নিয়ে আসতে পারবে কিনা তারও ঠিক নেই। আপনি ছিলেন বলেই, আপনার উদারতা ছিল বলেই, কত সহজ হল, স্বন্দর হল—’

‘ও কি, মিষ্টি কিছু খান।’ সঙ্কের থালায় দিকে নির্দেশ করল বরেন।

‘না, মিষ্টিতে এমনিতেই ভরে আছি।’

‘চলুন, তা হলে আপনাকে পৌছিয়ে দিয়ে আসি।’ তাক বুঝে উঠে পড়ল বরেন।

এবার আর ‘না’ বলতে পারল না কাকলি। গাড়ির ভিতরে বসল পাশাপাশি। ভেবেছিল গাড়ি বুঝি লম্বা দৌড় দেবে, জি-টি বি-টি না নিলেও নদী বা হ্রদের ধারের

বাস্তা নেবে, কিন্তু সমীচীন এলেকায় এসে বয়েন বললে, ‘আপনার হস্টেলটা কোনদিকে বলে দিন ড্রাইভারকে !’

আশ্চর্য, কত শালীন কত সম্ভ্রান্ত । এমনটি আর হয় না, হতে নেই । এত বড় উৎসর্গ অথচ কী নির্মল উপেক্ষা । একেই বুঝি বলে অনাসক্তি । যার আরেক নাম নির্মম শাস্তি ।

গেটে গাড়ি দাঁড় করাল ড্রাইভার । কাকলির সঙ্গে-সঙ্গে বয়েনও নামল ।

কাকলির মনে হল বয়েন বুঝি তার ভান হাতটা ধরবে । কিন্তু না, বয়েন দু হাত যুক্ত করে কপালে এনে ঠেকাল ! বললে, ‘নমস্কার !’

‘নমস্কার !’ যেন ধাক্কা খেল এমনিভাবে কাকলি বললে ।

‘হ্যাঁ, নমস্কার বৈকি । আপনি এখনো পরনারী !’ হাসতে হাসতে গাড়িতে গিয়ে উঠল বয়েন । গাড়ি স্টার্ট দিতেই মুখ বাড়িয়ে বললে, ‘এখনো বরনারী নন !’

ঘরে ফিরে এসে বিনতাকে সব বললে কাকলি ।

আছোপাস্ত সব শুনে আছোপাস্ত জলে উঠল বিনতা । বললে, ‘তুই একটা গরু ! আরো বেশি করে বলতে হয় । তুই একটা গাধা । বিশ্বামিত্রের বাপ গাধা নয়, গাধার স্ত্রী গাধা !’

‘বা, আমি কী দোষ করলাম !’ কাকলি হাঁ হয়ে রইল ।

‘কী দোষ করলাম মানে ? তুই সমস্ত মেয়েজাতের লজ্জা । তুই কেন স্কাক্সর মামলায় বিবাদী হতে যাবি ? নিজের মাথায় নিতে যাবি কলঙ্কের পসরা ? তুই কেন বাদী হয়ে অভিযোক্তা হয়ে স্বাধীনভাবে মামলা করতে পারবি নে ?’ সর্বাস্থে জ্বলতে লাগল বিনতা : ‘হ্যাঁ, স্কাক্সকে অ্যাকিউজ করে ? ও তোকে কলঙ্কিনী সাজাতে পারে, তুই কেন ওকে ব্যভিচারী সাজাতে পারবি নে ? সব যখন মিথো, আপোনে নিষ্পত্তি, তখন বোঝাটা তুই না টেনে ওকে দিয়ে টানা না । গরুতে টানে, না বলছে টানে ?’

‘তার মানে তুই বলতে চাস আমিই ভিভোর্স চাইব ?’

‘চাইবি নে ? তোকে তোর স্বামী কু-কথা বলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাড়ির বার করে দেবে আর তুই চাইবি নে ভিভোর্স ? পা-পুজো করবি ?’ রি-রি করতে লাগল বিনতা ।

‘আর ভিভোর্স চাইব এই হেতুতে যে আমার স্বামী ব্যভিচারে লিপ্ত—’

‘তা আবার বলতে । ওর নিজের মুদ্রাতেই ওকে দাম দিবি । আইনে, অন্তঃ-বিরে-ভাঙার আইনে, স্বামীর যা হেতু স্ত্রীরও তাই হেতু—’

‘কিন্তু লিণ্ড, কার সঙ্গে লিণ্ড বলব?’ সন্ধিৎসু চোখে তাকাল কাকলি : ‘মেয়ে পাক কোথায়? স্পষ্ট নামোল্লেখ করতে হবে তা? আর এমন নাম-ঠিকানা হওয়া চাই যা দেখে আপাতচক্ষে আদালতের বিশ্বাস্ত্র মনে হবে। আজগুবি ঠেকবে না। সমন জারি হবে। এমন কে আছে যে আমার জন্তে নেবে এই অত্যাতির ডালি?’

‘আর কাউকে না পাস, আমি আছি।’ স্থির স্বরে বললে বিনতা, ‘আমি নাম দেব। তোর মামলায়, স্বকাস্তর বিরুদ্ধে মামলায়, আমি কো-রেসপণ্ডেন্ট হব।’

‘তুই? সত্যি?’ উচ্ছ্বসিত স্বথে বিনতাকে ছুই বাহুতে জড়িয়ে ধরল কাকলি। পরে শান্ত হয়ে বললে, ‘কিন্তু এতে তোর কোনো ক্ষতি হবে না তো?’

‘এ তো একটা মিথোর খেলা। এতে আবার ক্ষয়-ক্ষতি কিসের? পাগলে কোথায় কী বলেছে, না ছাগলে কোথায় কী খেয়েছে এ নিয়ে কে মাথা ঘামায়?’

‘হ্যাঁ,’ সায় দিল কাকলি : ‘এসব মামলার বিবরণ খবরের কাগজে ছাপা বারণ। তাই বিশাল বিশ্বে জানাজানি হবার কিছু ভয় নেই। চাই কি, খোলা কোটে নয়, এ মামলার বিচারও ক্যামেরায় হবে।’

‘সবই ক্যামেরায়।’ হাসল বিনতা : ‘কাণ্ডও ক্যামেরায়, বিচারও ক্যামেরায়।’

‘কাণ্ড কোথায়! যাকে বলে অমূল তরু, বরেনবাবুর কথা পালটে বলা যায়, মূলে বর নেই তায় বরযাত্রী!’

‘এতখানি বয়স হল, গায়ে কিছুই লাগল না,’ করুণ মুখে হাসল বিনতা : ‘একটু কলরু পর্যন্ত না। তোর জন্তে, একটা মেয়ের মর্যাদার জন্তে যদি এটুকু দাগী হলাম, তো হলাম, কী এসে যায়? তবু তোকে পারব না ছোট দেখতে, মুখাপেক্ষী দেখতে। তুই তোর নিজের দাবিতে দাঁড়াবি, নিজের বক্তব্যের দাবিতে, নীরবে এক পাশে বসে থেকে ভিক্ষকের মত প্রসাদ হুড়িয়ে নিবি এ গ্লানি থেকে তোকে রক্ষা করব।’

অবাক বিস্ময়ে বিনতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কাকলি।

‘তুই যে এত অদ্ভুত ভালো তা জানতাম না।’ একটা হাত ধরল বিনতার।

‘সুধু সৌম্যাই ভালো নয়, রোদ্দাও ভালো।’ বললে বিনতা, ‘লক্ষ্মী হয়ে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পদসেবা করে ক্ষতি নেই, কিন্তু দরকার হলে রণাঙ্গনে কালী হয়ে শিবকে পায়ের নিচে ফেলতে স্বেচ্ছা করিস নে।’

পরদিন টেলিফোন করল কাকলি।

‘হ্যাঁ, আমি। একটা জরুরি কথা আছে। ধারে কাছে কেউ আছে নাকি আপনার সাব-অর্ডিনেট?’

‘না, নেই। বলুন।’

‘সুত্ন, আপনি কাল যে অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা বলেছিলেন, তার একটা বিকল্প আছে। আর ভেবে দেখলাম সেই বিকল্পটাই ভালো।’ অন্তত আমার পক্ষে সম্ভাস্ত।’

‘কী বিকল্প?’ বরেনের গলায় যেন বা একটু উষ্মগের ঝাঁজ।

‘মামলাটা আমি আনব।’

‘আপনি আনবেন? গ্রাউণ্ড?’

‘ঐ একই গ্রাউণ্ড। লিভিং ইন অ্যাডালটারি—’

‘দ্বিতীয় পক্ষ, মানে কো-রেসপণ্ডেন্ট কে?’

‘আমাদের হস্টেলের একটি মেয়ে—’

‘মেয়ে?’

‘মানে মহিলা। ইঙ্কুলের শিক্ষিকা। স্তন্যদেয় বৈশ শোনায়ে। আপনার আদালত বিশ্বাস করতে অস্বস্তি বোধ করবে না।’

‘কুমারী?’

‘হ্যাঁ।’

‘বলেন কী? সমস্ত ইমপ্লিকেশনস জানে? বোঝে?’

‘কেন বুঝবে না?’

‘জীবনে সাধ করে এমন একটা কলঙ্ক-কালিয়া নেবে?’

‘আপনি যেমন কেয়ার করেন না, ওও তেমনি কেয়ার করে না। তারপর ব্যাপারটা যখন অকপট মিথ্যে তখন দেহ-মনে-বিরেকে ও নির্ভয় পরিচ্ছন্ন।’

‘আপনার বন্ধু বুঝি?’

‘ছেলেবেলা থেকে। আপনি যেমন স্ত্রীকান্তর।’

‘বৈশ, স্ত্রীকান্তকে বলে দেখি।’ বরেন একটু বা অনিশ্চয়ের ভাব আনল : ‘দেখি সে এতে রাজি হয় কিনা।’

‘তার মামলায় আমি রাজি হব, আর আমার মামলায় সে রাজি হতে পারবে না?’ পায়ের নখ পরস্পর জলে উঠল কাকলি।

‘হওয়া তো উচিত।’ আগুনে জ্বল ঢালতে চাইল বরেন : ‘কেননা আকারে-প্রকারে ছোটো মামলারই এক চেহারা। ওর মামলায় আপনি চূপ, আপনার মামলায় ও চূপ। একই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। তবু ও কী বলে জেনে রাখা ভালো।’

‘সুত্ন, ও যদি আমার মামলায় রাজি না হয়, আমিও ওর মামলায় রাজি হব না। ওকে বলে দেবেন।’ কাকলি দৃঢ় হল।

‘তা হলে তো এক দিক থেকে ভালোই হয়।’ আশ্চর্য নির্লিপ্ত মুখে বললে বরেন,
‘তা হলে আর বিয়েটা আপনাদের ভাঙে না। বেঁচে থাকে। লেগে থাকে।’

‘কী সর্বনাশ!’ ফাঁপরে পড়ল কাকলি।

‘এই ত্রাহি ডাক তো স্বকাস্তরও।’

‘তা আমি জানি না, আমার মামলাই বহাল হবে আদালতে। জানেন আমিই উৎপীড়িত, স্ত্রতরাং আমার মামলা করাটাই যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষত যখন সব মাল-মশলাই আমার হাতের কাছে মজুত আছে।’ বিদ্রূপে বললে উঠল কাকলি: ‘আপনার স্বকাস্তকে বলবেন, তার কোর্ট ফি খরচ করতে হবে না।’

‘বলব।’ কথাটার মোড় ঘোরাল বরেন: ‘শুভুন। আপনি বলছিলেন টাকার দরকার হলে বলবেন আমাকে।’

‘দরকার পড়ে নি তো! স্বকাস্তর মামলা হলে তো বিবাদী হিসাবে আমার এক পরশাও খরচ নেই। আর আমার মামলা হলেও অতি সামান্য খরচ। বিয়ে-বিচ্ছেদের ব্যাপারে সরকার খুব দরদ দেখিয়েছেন, কোর্ট ফি সস্তা করে দিয়েছেন, যাতে সহজেই মানুষে এ প্রতিকার অবলম্বন করতে পারে। আপনার কাছে যে টাকা চেয়েছিলাম তা দীপঙ্করের জন্তে, তার মামলার জন্তে। কিন্তু সে বলে দিয়েছে, আর যার কাছ থেকেই সাহায্য নিই, যেন আপনার কাছে না হাত পাতি। এমন-কি ছলনা করেও যেন আপনার টাকা আমার হাত ছুঁয়ে ওর তবিলে গিয়ে না পৌঁছয়।’

‘আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেড়ে দিই। আমি বলব স্বকুকে। সময়মত জানাব ওর মতামত।’

‘যদি অমত হয় তা হলে আমার অসম্মতিটাও জানিয়ে দেবেন।’

হো হো করে হেসে উঠল বরেন। বললে, ‘যদি মরতে বসেও দু-জনে ঝগড়া করেন তা হলে আর বিচ্ছেদ হল না।’

‘অসম্ভব।’ রিসিভার রেখে দিল কাকলি।

স্বকাস্তকে ডাকাল বরেন। বললে, ‘তোমার বউ মেয়েটি কম নয়।’

‘কেন, কী হয়েছে?’

তখন বললে সব বরেন।

স্বকাস্ত তেরিয়া হয়ে বললে, ‘না, তা চলবে না। আমি মেনে নেব না অপভাষ।’

‘সে কথা তো ওও বলতে পারে। ওই বা কেন তবে সহিবে অকীর্তি?’

‘বেশ, তবে দুটো মামলাই চলুক।’

‘লাভের মধ্যে হবে, কোনো মামলাই চলবে না।’ বরেন প্রশ্ন শুদার্থের ভাব করল : ‘ভালোই তো, গ্রন্থি অটুট থাকবে।’

‘অসম্ভব।’

‘শোন, এক কাজ কর—’

অস্থির হয়ে উঠতে যাচ্ছিল স্কাস্ত, ফের বসল।

‘মেয়েটাকে, মানে যে অগ্ন্যুৎসর্গী সাজতে চেয়েছে তাকে ঠেকা। তোর সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলি। যে করে পারিস ওকে নিবৃত্ত কর। নইলে তুই যদি একরোখা হোস, তোর বউও ইকোয়ালি একগুঁয়ে হতে পারে। তখন খালি জেদই হবে, জিত হবে না। দুটো মামলা চললে তা সেই কনটেন্টই হয়ে গেল, সেই মুখোমুখি যুদ্ধ—পরস্পর জখম হলি, শাস্তি হল না। দুটো মামলাই ফেসে গেল। আমি ঐ মেয়েটাকে তোর সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠাই, তুই ওকে কথো দে, ঠাণ্ডা কর।’

স্কাস্ত ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরল।

বাড়ি ফিরে এসে দেখে তুমুল গোলমাল। সেন্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মার্কেটাইল কার্মে চাকরি পাবার পর স্কাস্ত সাহেব হয়ে উঠেছে। শার্ট-ট্রাউজার্স পরে টেবিলে বসে খায় আর তা ছুরি-কাঁটায়। দুপুরে লাঞ্চ খায় আফিস-পাড়ায়। বড় চাকরি করেছে বলে মৃণালিনী আবার তার থাওয়াদাওয়া বড় করে দিয়েছে। বউকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে সংসারের হয়ে দিচ্ছে তাকে বিস্তৃততর সেবা, বিস্তৃততর অভ্যর্থনা।

সাহেব হবার প্রথম লক্ষণ হিসেবে আজকাল কম কথা বলছে স্কাস্ত এবং যখন যেটুকু নেহাত বলছে নিতান্ত আস্তে। কারু সঙ্গেই মিশছে না বাড়িতে, কেউ না বিরক্ত করে তাই যতক্ষণ বাড়িতে থাকছে খালি বই পড়ছে এবং বলাই বাহুল্য, ইংরিজি বই। বাবা-কাকা-দাদাদের ধার দিয়েও ঘেঁষছে না, এবং যদি কখনো চায়ের টেবিলে রাজনীতি বা বিশ্বনীতি নিয়ে তর্ক করে তার মধ্যে সে ঢোকে না, এমন একখানা মুখ করে উঠে যায় যেন জ্ঞানের চরম কথাটি ও-ই একমাত্র জ্ঞেনে নিয়েছে পৃথিবীতে।

সাহেব হবার দ্বিতীয় লক্ষণ, কিছুতেই উত্তেজিত হবে না। তাই সমস্ত বাড়ি যখন তোলপাড়, সামনে দূরে সমস্ত পাড়া যখন খোজাখুঁজি করছে, তখন নিশ্চিন্তকণ্ঠে বললে স্কাস্ত, ‘এ তো সোজা কথা। কাকলিই নিয়ে গেছে ছুরি করে।’

‘তবে তুমি যাও, ওকে নিয়ে এসো।’ বন্দনা আবুলি-বিকুলি করে উঠল।

‘আমি যাব কেন? চোরের কাছে পুলিশ যাবে। পুলিশ গিয়ে চোরকে আরেস্ট করবে! সেণ্ট্রকে ‘সিজ্’ করে পৌছে দেবে বাড়ি। আর যে কিডনাপ করেছে তাকে জেলে পাঠাবে।’

‘তাই, তাই একটা কিছু কর।’ মুণালিনী উৎসাহ জোগাল।

‘ই্যা, থানায় টেলিফোন করে দিচ্ছি।’

থানায় টেলিফোন করে দিল স্নকাস্ত।

৩৮

বন্দনা বললে, ‘নিশ্চয়ই, সন্দেহ নেই, কাকলিই নিয়ে গেছে। হয়তো এখান দিয়ে যাচ্ছিল কিংবা কে জানে, বাড়ির আশে-পাশে ঘুরঘুর করছিল আর কোন ফাঁকে সদর খোলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছে ছেলেটা, আর অমনি ছৌ মেরে তুলে নিয়ে পালিয়েছে—’

ছেলেহারা মায়ের কল্পনাকে তুচ্ছ করতে চাইল না হেমন। প্রশান্তকে বলল, ‘যা না ছোট বউমার হস্টেলে, দেখ না গিয়ে ওখানে আছে কিনা। যদি থাকে তো নিয়ে আয়।’

‘না, না, নিয়ে আসতে হবে না।’ বন্দনা উদ্বেল হয়ে উঠল : ‘তুমি শুধু একবার দেখে এসো যে ওখানে, ওর কাম্মার কাছে ও আছে। তা হলেই হবে।’

‘তা হলেই হবে?’ মুখিয়ে উঠল মুণালিনী : ‘ছেলেকে নিয়ে আসবে না?’

‘কদিন ভীষণ কান্নাকাটি করছে কাম্মার জন্তে। রাতে ঘুমতে পাচ্ছে না, ঘুমের মধ্যে কেঁদে-কেঁদে উঠছে।’ বন্দনার চোখ আর গলা ছলছল করে উঠল : ‘যদি ওখানে থাকে, ওর কাম্মার কাছে, তা হলে থাকুক এক রাত্তির, পাশে শুয়ে ঘুম যাক আরামে। তা ছাড়া যদি সত্যিই ও ওখানে থাকে, ওর কাম্মার কাছে—’ স্নকাস্তর দিকে তাকাল এবার বন্দনা : ‘ওকে পারবে নাকি ছিনিয়ে আনতে? প্রচণ্ড কান্না জুড়ে দেবে, তুলবে তুমুল শোরগোল। তবু যদি জোর করে কেড়ে নিয়ে আসো কান্দতে কান্দতে ও ঠিক তবে অস্থখে পড়বে।’

‘তা হলে করবে কী শুনি?’ মুণালিনী ধমকে উঠল।

‘সকাল বেলা ওর কান্ধাই ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিয়ে যাবে বাড়ি।’

‘ও কালোমুখী আর এ বাড়ি ঢুকেছে!’

‘বাড়ির মধ্যে না ঢুকলেও দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবে নিশ্চয়ই।’ বন্দনা বাইরে তাকাল জানলা দিয়ে : ‘ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে। ছেলেটার মন দিনরাত পুড়ছিল কান্ধার জন্তে, তাই সহজেই বোকা যায়, কাকলির প্রাণও কিরকম হু-হু করছিল। তাই আর থাকতে না পেরে এক ফাঁকে লুকিয়ে এসে চুরি করে নিয়ে গেছে। সকালে উঠে ছেলেটা যখন আবার বাড়ি-বাড়ি করবে, মা-মা করবে, তখন আবার নির্ধাত দিয়ে যাবে ফিরিয়ে।’

‘ফিরিয়ে দেবে, না হাতি!’ মৃণালিনী বললে, ‘চরম শত্রুতা করবার জন্তেই ও সরিয়েছে ছেলেকে। ওর দলে কত কী লোক আছে তার ঠিক কি। হয়তো ছেলের বিনিময়ে টাকা চেয়ে বসবে। এমনি তো কত আজকাল দেখতে পাই খবরের কাগজে। ফিরিয়ে দেবার জন্তে নিয়ে গেছে, না আরো কিছু। হয়তো মারধোর করবে, খেতে-পরতে দেবে না, মেরেই ফেলবে শেষ পর্যন্ত—’

‘কী যে বলো পাগলের মত!’ প্রশান্ত বিরক্ত মুখে বললে।

কাকলির কাছে সেন্টুর অনাদর কত বড় অসম্ভব ব্যাপার, বন্দনারও চোখে-মুখে তার সমর্থন ফুটে উঠল।

‘কেন, ও কি আর এ সংসারের বউ, নাকি ও আর সেন্টুর কাকিমা যে, ওর আর এ বাড়ির লোকেদের জন্তে মায়া থাকবে?’ মৃণালিনী বললে, ‘ও তো এখন ঘোর শত্রু। আমাদের বিপক্ষ।’

‘বিপক্ষ?’ চমকে উঠল প্রশান্ত।

‘হ্যাঁ, ও ডিভোর্স স্ট করেচ্ছে।’ যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে স্কাভ বললে।

‘তোর বিবাহিত স্ত্রী তোর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা এনেছে বলতে তোর লজ্জা হল না?’ হেমেন গর্জন করে উঠল : ‘কিসের ডিভোর্স? জোর করে ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে আয় বউকে। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখ তোর সবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে। তুই একটা পুরুষমানুষ না?’

নির্লিপ্ত মুখে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল স্কাভ : ‘আমি সত্য মানুষ।’

‘সত্য হওয়া মানে কাপুরুষের মত হাত গুটিয়ে বসে থাকা?’

‘না। সত্য হওয়া মানে আইন অহুসারে কাজ করা। এ ক্ষেত্রে পুলিশকে খবর দেওয়া। তা দিয়েছি খবর।’

কিন্তু পুলিশের নড়াচড়ার আগেই পাওয়া গেল সেন্টুকে ।

ঐ দেখ, ভগলুর কাঁধে চড়ে বাড়ি ফিরছে । কিন্তু কান্দছে কেন ? থেকে-থেকে মারছে কেন ভগলুকে ?

কী ব্যাপার ?

সেন্টুর বিশ্বাস, রোজ ঠিক সময়ই কান্মা ফেরে আফিস থেকে, নামে নির্ধারিত বাস-স্টপে, কিন্তু বাস-স্টপ থেকে বাড়ি আসবার যে পথ সে পথ ঠিক চিনতে পারে না । গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়ে রোজ পথ ভুল করে বসে, উলটো পথে চলে যায় । সেন্টুর বিশ্বাস, সে বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে থাকলে ঠিক ধরতে পারবে কান্মাকে, তারপরে সে-ই অলিগলি ঘুরিয়ে ঠিক তাকে নিয়ে আসতে পারবে বাড়িতে । তাকে পেলে কান্মা আর অস্ববিধেয় পড়বে না । তাই ভগলুকে অনেক করে রাজি করিয়ে লুকিয়ে চলে এসেছে বড় রাস্তায় । দাঁড়িয়েছে স্টপের কাছে । কত ট্রাম-বাস চলে গেল, কিন্তু কান্মার দেখা নেই অথচ বাড়ি ফেরারও তাগিদ নেই সেন্টুর । তখন অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ভগলু বললে, কান্মার আফিস এখনো ছুটিই হয় নি, আজ কী কাজের জন্তে তাকে রাতে থাকতে হবে আফিসে । তখন ছেলে বায়না ধরল, আমাকে তবে আফিসে নিয়ে চল । অগত্যা ভগলুকে বলতে হল আফিসের রাস্তা সে চেনে না । তবু সেন্টু নাছোড়বান্দা । তুই আমাকে নিয়ে একটা গাড়িতে ওঠ, ভদ্রলোকদের বললে তারা ঠিক আফিস দেখিয়ে দেবে । কিন্তু আমার কাছে পয়সা কই, ভাড়া কই, যাব কী করে ? ভগলু আরেক অস্ত্র প্রয়োগ করল । বেমানুম ফিরিয়ে দিল সেন্টু । বললে, আমার টিকিট তো লাগেই না আর তুই আমার চাকর স্তনলে তোকেও ছেড়ে দেবে । কিন্তু চাকর-বাকরকে যে ঢুকতে দেয় না আফিসে । বলে সেন্টুকে জোর করে কাঁধের উপর তুলে বাড়ির দিকে ছুট দিল ভগলু । আর সারা রাস্তা সেন্টুর এই বলে কান্মা, তোকে তাড়িয়ে দেয় তো দেবে, তুই আমাকে শুধু কান্মার কাছে পৌঁছে দে । যত কাঁদে, ভগলু তত ছোট । আর তাকে ছুটতে দেখে সেন্টুর এই মার তো সেই মার ।

সেন্টুকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতেই মৃণালিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে তুলে নিয়ে ঈপাতে লাগল । গায়ে-মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে, ‘ভাগ্যিস শক্রপক্ষের হাতে পড়ে নি ।’

অভিযোগে তখনো ভাঁটা পড়ে নি সেন্টুর । বলছে, ‘বললাম তুই চাকর, তোকে যদি আফিসে ঢুকতে না দেয়, তুই বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি, কান্মা এসে আমাকে কোলে করে ভেতরে নিয়ে যাবে । তারপর তুই যেখানে খুশি সেখানে যা, আমরা কিছু তোকে বলতে আসব না—’

এক পলকে বুঝে নিল বন্দনা। বললে, ‘তোমার কান্না আফিসে কোথায় ? তোমার কান্না তো হাসপাতালে।’

‘বা, এতদিন বলছ, আফিসে সেই যে গেল আর এল না, আফিসেই আছে—আর আজ বলছ হাসপাতাল ?’ মায়ের দিকে গল্পনাভরা চোখে তাকাল সেন্টু : ‘বেশ, তবে আমাকে হাসপাতালেই নিয়ে চলো।’

‘ভালোর দিকে আনুক, তারপর নিয়ে যাব।’ পাছে স্ত্রীকে মত শোনায় বন্দনা কথাটিকে বাস্তব করতে চাইল : ‘সেই যে আমি হাসপাতালে ছিলাম, তুমি প্রথম প্রথম যেতে না, কান্নার কাছে থাকতে বাড়িতে, তারপর শেষ দিকে আমি যখন প্রায় ভালো হয়ে উঠলাম, তখন গেলে তোমরা—’

‘তোমার তো পেট কাটা গিয়েছিল, আমার কান্নার কী হয়েছে ?’

‘তোমার কান্নার গলা কাটা গিয়েছে।’ মৃণালিনী বললে উঠল।

‘তোমার গলা কাটা গিয়েছে।’

‘ছি, অমন কথা বলতে নেই।’ প্রশান্ত ছেলেকে টেনে নিয়ে চলে গেল বাইরে।

‘আমার কান্নার কিছু হয় নি, কিছু হয় নি—’ বলতে বলতে কান্দতে-কান্দতে বাপের সঙ্গে চলে গেল সেন্টু।

‘দেখলেন ছেলোটার কী মায়া অথচ ও পক্ষের এতটুকু একটু টান নেই।’ বিজয়াকে লক্ষ্য করে বন্দনা অনুযোগ দিল : ‘এত দিনের মধ্যে একবার একটু খোঁজ নিল না ছেলোটার। কেমন আছে, কিরকম রয়েছে, তার কান্না ছাড়া হয়ে রাতে ঘুমতে পাচ্ছে কিনা, কার হাতে থাকছে— আশ্চর্য !’

‘শত্রু, মহাশত্রু।’ মৃণালিনীই টিপ্তনী জুড়ল।

বিজয়ার মনে হল, কাকলি যদি ছেলেধরা সেজেও নিয়ে যেত সেন্টুকে, বন্দনা যেন তৃপ্তি পেত। তৃপ্তি পেত স্নেহের মান দেখে। এক দিক এত ভালোবাসনে আরেক দিক নিস্তরঙ্গ থাকবে এ যেন প্রকৃতির নিয়মেই বেমানান।

তবু কিছু বক্তব্য কাকলিরও আছে এ স্পষ্ট অনুভব করল বিজয়া। হয়তো নিজেকে দিয়েই করল। বলল, ‘কাকলির কী হচ্ছে তা কাকলিই জানে। খোঁজ নিতে এ বাড়িতে আসবার আর তার পথ কোথায় ? দরজা কোথায় ?’ হেমনকে স্বকান্ত্য ঐভাবে কথা বলাটা ভালো লাগে নি, তাই দূরে-সরে-মাওয়া স্বকান্ত্যকে লক্ষ্য করল বিজয়া : ‘ভগলু বেড়াতে নিয়ে গেল, আর কাকলি ছেলেধরা বলে সাবাস্ত হল, থানা’ চলে গেল এস্তেলা। তারপর কোনো একদিন যদি দেখা যেত কাকলি বাড়ির মধ্যে চুকেছে, এ-ঘর ও-ঘর করছে, তখন কী চার্জে ফেলত তার ঠিক কি !’

‘চার্জে ফেলবে না তো ফেলবে কোথায়?’ ফণা তুলল মৃণালিনী : ‘উনি এই বাড়ির সম্মান কোন অতল তলে ফেলছেন সেটা দেখছ?’

এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল বিজয়া। আগের কথার জের টেনে বললে, ‘তা ছাড়া পরের ছেলের জন্তে মায়া করে লাভ কী!’

‘কেউ কি লাভ লোকসান ভেবে মায়া করে?’ করুণ চোখে তাকাল বন্দনা।

‘অকারণে হুংখ পাবার সুখের দিকে তাই না যাওয়াই ভালো। ঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তে সেই ছেলেই জানিয়ে দেবে তুমি আমার পর। তা ছাড়া’, বিজয়া কণ্ঠে একটু তারল্য আনল : ‘তা ছাড়া সময়ে বুড়োরাই শোক ভোলে, আর এ তো শিশু। স্বকু যদি আবার বিয়ে করে তখন সেই নতুন বউকেই কাম্মা বলে ধরতে পারবে সেন্টু, পুরোনোকে মনেও রাখবে না।’

‘সে পরের কথা পরে।’ বন্দনাকে লক্ষ্য করে বললে উঠল মৃণালিনী : ‘তুমি হাসপাতাল বলছ কেন? হাসপাতাল বলে কেন ছেলেটাকে ঝুলিয়ে রাখছ? স্টেইট বলে দাও মরে গেছে কাম্মা। আর আসবে না।’

‘মরে মরে না এমন শত্রুও হুল্লভ নয় সংসারে।’ হেমেন বললে, ‘স্বতরাং আমি বলি কি, ছেলেটা যখন এত কাতর তখন,’ বন্দনার দিকে লক্ষ্য করল : ‘তোমরা, তুমি আর প্রশান্ত, একদিন ওকে নিয়ে কাকলির হস্টেলে গিয়ে একটু দেখিয়ে আনলেই তো পারো।’

‘অসম্ভব।’ দূরে সরে গিয়েছিল স্বকান্ত, ফিরে এসে ভস্কার ছাড়ল।

সবাই একদৃষ্টে তাকাল স্বকান্তর দিকে।

স্বকান্ত বললে, ‘যে বিয়ে ভেঙে দিতে চাইছে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী! তাকে দেখবার বা দেখা দেবার কোনো মানে হয় না। না, কখনো না,’ বন্দনার দিকে চোখ রাখল স্বকান্ত : ‘মরে গেলেও যেতে পারবে না তোমরা। সেধে নিতে পারবে না অপমান। কাটা ঘায়ে সইবে না হুনের ছিটে।’

হেমেনের মুখের উপর আবার স্বকান্ত কথা বলেছে বলে বিজয়ার অসহ্য লাগল। রুক্ষ স্বরে বললে, ‘তোমার সঙ্গে সম্পর্ক উঠে গেছে বলে আর সকলের সঙ্গেও উঠে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কত শিশু কত নিঃসম্পর্কীয়াকেও মা-মাসি খুড়ি-পিনি বলে, আপনজনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সম্পর্ক নেই বলে চলবে না সে ডাক?’

‘না, চলবে না।’ স্বকান্ত কঠিনতর হল : ‘আমার বিরুদ্ধে কী অসম্ভব কু-কথা বলে ও বিয়ে-ভাঙার মামলা করছে তা জানো?’

সবাই একটা বাজ পড়ার আশঙ্কায় থ হয়ে রইল।

বিজয়া বললে, ‘তা জেনে আমাদের দরকার নেই। তা তোমরা বুঝবে। অভিযোগ মিথ্যে হয় তুমি লড়বে আদালতে। ওকে হারিয়ে দেবে। বিয়েটা ভাঙতে দেবে না—’

‘এ বিয়ে আবার কেউ বাঁচিয়ে রাখে!’ ঘৃণায় ঠোঁট বেঁকাল স্বকান্ত।

‘রাখো বা না রাখো, তাতে সেন্টুর কী!’ বিজয়া বললে, ‘তোমার বউ থাকলেও সে কাম্মা, না থাকলেও কাম্মা। যতক্ষণ সেন্টুর ভালোবাসা আছে ততক্ষণ তার কাম্মাও আছে। তাই যদি হয়, কাকলি বউই থাক বা ভদ্রমহিলাই হয়ে যাক, ছেলেকে নিয়ে প্রশান্ত আর বন্দনা যেতে পারবে না তার কাছে এর মধ্যে কোনো আইন নেই, যুক্তির বাষ্প পর্যন্ত নেই।’

স্বকান্ত হঠাৎ মৃণালিনীর কাছে এল। বললে, ‘মা, এ বাড়ি থেকে কেউ যদি যায়ই হুটেন্লে বা ওর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে তা হলে আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। আলাদা হয়ে যাব।’

‘তাই যাওয়াই তো উচিত।’ এবার হেমন গলায় কাঁজ আনল: ‘বউকে তাড়িয়েছিস, এবার নিজেকে তাড়া। নইলে ষোল কলা বীরত্ব প্রমাণ হবে কি করে?’

‘হ্যাঁ, সত্যি, আলাদা ক্ল্যাট দেখ। তোমার মতলব বুঝতে আর কারু বাকি নেই।’ বিজয়া চিপটেন ঝাড়ল: ‘এবার যাকে সংগ্রহ করবে তাকে আর এজমালিতে পোষাবে না, তাই তারই জন্তে আলাদা ক্ল্যাট চাই। আগাম ভাড়া নিয়ে না রাখলে সময়কালে বিপদে পড়বে।’

বিপদে তো স্বকান্ত এখুনিই পড়েছে। বিনতার সঙ্গে যে সবিস্তার কথা বলবে এমন একটা প্রশস্ত জায়গা কোথাও নেই।

আক্সিসে বরেন বললে, ‘মিসেস বোসের মামলার কো-রেসপণ্ডেন্ট—কে এক শিক্ষিকা, বিনতা সেন, তোর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।’

‘কোথায় দেখা করি?’ ফাঁপরে পড়ল স্বকান্ত।

‘তোর বাড়িতে জায়গা নেই। আমার বাড়িটাও ঠিক নয়। রিকিউজিদের তৈরায় এম্পটি হাউস পাবার আর জো নেই।’ বরেন হাসল: ‘কাজে-কাজেই হোটেলই সমীচীন। আমি তাই ফোনে বলে দিচ্ছি—’ পরে রিসিভারের চোড়টা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বললে, ‘যে করে পারিস ঠেকা শিক্ষিকাকে। কে কোথাকার প্রীমতী বিনতা সেন অজ্ঞেয় অনির্দেশ্য হয়ে থাকবে। কিন্তু ধীরেন অ্যাণ্ড সনসের স্বকান্ত বোস—লোকের ধরতে-ছুঁতে বেগ পেতে হবে না। ইয়ং ম্যান, কেরিয়রের প্রথম

মুখেই একটা মর্যাল টার্পিটিউডের কালিমা এসে লাগবে এটা ঠিক নয়, আর, মুখ-চোখ গম্ভীর করল বরেন : ‘আর সেটা আমাদের কার্মের পক্ষেও ক্ষতিকর’।

ব্যাপারটা যেন চোখ ধাঁধানো ভয়ের আলোয় দেখল স্ককাস্ত। উদ্বিগ্ন অথচ জোরালো গলায় বললে, ‘না, না, গুরুত্বভাবে হতে পারবে না। মামলা আমিই করব। আমার বাদীত্বই হবে।’

‘হ্যাঁ, সেটাই প্রপার। তবে,’ স্ককাস্ত রেখায় হাসল বরেন : ‘তবে জোরজবরদস্তি করতে গেলে মুশকিল হতে পারে। তুই জোর দেখাতে গেলে ও পক্ষও জেদ ধরবে। তুই বলবি আমি বাদী হব তুমি কলঙ্কিনী হও, ও বলবে আমি বাদী হব তুমি কপট-নিপট সাজো। সব ভেস্তে যাবে।’

‘না, না, এ নিয়ে ঠোকাঠুকি করা যাবে না, স্কদের ট্যাঙ্কে আসলই মারা পড়বে তা হলে।’ বিচক্ষণের মত মুখ করল স্ককাস্ত : ‘মানেন্স করতে হবে। তুই বলে দে হোটেলের কথা।’

নির্ধারিত দিনে দামী হোটেলের সান্ধ্য বারান্দায় বসেছে দু-জনে—বিনতা আর স্ককাস্ত—দু-জনের মাঝখানে ছোট একটা টেবিল রেখে।

একটু যেন সজ্ঞানে সেজেছে বিনতা। সজ্ঞাস্ত শুভ্র তো বটেই তার মধ্যে হঠাৎ কখনো দু-একটা বা লজ্জার অকণিমা। ভঙ্গিটি গম্ভীর, তার মধ্যে কচিংকদাচিং একটু বা লালিত্যের ঢেউ।

একেবারে আত্মবিস্মৃত হয়ে কবে কে বসতে পেরেছে মেয়ে !

‘হোটেলটা স্থবিরের নয়, বাড়িতে ডাকলেই তো পারতেন।’ কথার দিকে বিনতাই প্রথম অগ্রসর হল।

‘কেন, বেশ তো নিরিবিলা জায়গা। সবরকম কথাই বলা চলে।’ বললে স্ককাস্ত।

‘তবু জটিল একটা মামলার বিষয়ে পরামর্শ করছি চট করে এ পরিবেশটা আনে না। বরং একটা হালকা ও চটুল খোশগল্লের দেশে এসেছি এমনি মনে হয়।’

‘জীবনমরণের মত দুর্ধর্ষ সমস্যা এমনি খোশগল্লের মধ্যেই সমাধান খুঁজে পেয়েছে।’

‘আপনাদের বাড়িতে নিরিবিলা ঘর নেই বুঝি?’ পরীক্ষায় প্রশ্ন করছে এমনি নির্লিপ্ত মুখ করল বিনতা। আর যে প্রশ্নটার উত্তর তার জানা সেটাই জিজ্ঞেস করে মাস্টার।

‘আমাদের বাড়ি? সে একটা এজমালি হিজিবিজি। নিচু জায়গা দেখলে যেমন জল ঢুকে পড়ে তেমনি ফাঁকা একটা ঘর দেখলে আত্মীয়স্বজন ঢুকে পড়ে।’

‘ভয়ংকর নেই বুঝি?’

‘ড্রিল-ড্রয়িং ওসব ফালতু কিছুই নেই আমাদের বিদ্যালয়ে।’ হাসল স্বকান্ত। ‘মামুলি নোট পড়ো আর টায়েরটুয়ে পাশ-মার্ক নিয়ে বেরিয়ে যাও—মানে কোনোরকমে দিন কাটাও। তবে তেতলায় এবারে ঘর উঠছে, কাকা-কাকিমা ওটাতে উঠে যাবেন, ওরা উঠে গেলে ওদের নিচের ঘরটাকে বসবার ঘর করা যাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু ততদিন তো আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই।’

‘তবে এখন যদি হঠাৎ কেউ বিজিনেস ব্যাপারে এসে পড়ে বাড়িতে?’

‘তখন যার বিজিনেস তার ঘরে গিয়ে সে ঠাই নেবে। বিজিনেসটুকু সেরে চলে যাবে। একেবারে অন্দরমহলের ঘর, বেশিক্ষণ বসবার প্রশ্রয় পাবে না। কথা সারো, কেটে পড়ো। ড্রয়িংক্রম না থাকার এইটেই মস্ত লাভ।’ বেশ স্বচ্ছন্দ সারলো বললে স্বকান্ত।

কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আনল বিনতা। বললে, ‘আমার বিজিনেসটাও স্বল্পস্থায়ী—দু-এক কথার। তাই আমাকেও আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল এবং,’ কালো চোখে নিশ্চল তাকাল বিনতা : ‘এবং আপনার ঘরে।’

‘ওরে বাবা,’ আতকে ওঠার ভাব করল স্বকান্ত : ‘আমাদের বাড়ি আপনি চেনেন না। বিদ্যালয় থামোকা বলি নি। মহাবিদ্যালয়টাই ঠিক কথা। মহাবিদ্যা কী জানেন তো? মহা প্রাস অবিদ্যা মহাবিদ্যা। লোকে ভাবে প্রশংসা করছি কিন্তু ভিতরে যে কী সন্ধি করেছি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।’

‘বাজে কথা। কাকলি কত ভালো বলছিল স্কলকে।’

‘তাই তো সে আলগা দিয়েছে, থসে পড়েছে—’

‘সে তো শ্রেফ আপনার জগে।’

‘তাতে আর সন্দেহ কী। কিন্তু জানেন, কাকলি যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে আসে, তখন সকলে ওকে সাবানের ফিরিউলি ভেবেছিল। তেমনি আপনি যদি আমাদের বাড়ি যান আপনাকে কিসের ফিরিউলি ভাববে তার ঠিক নেই।’

‘তা ভাবলেই বা।’ ওদাস্তের স্বর আনল বিনতা : ‘আসলে সবাই আমরা ফিরিউলি ছাড়া আর কী! কেউ রূপের, কেউ বিস্তের, কেউ বৈদম্ব্যের। কেউ বা ব্যর্থতার। আশাহীনতার।’ স্নান রেখায় হাসল বিনতা : ‘ফিরিউলি না বলে বল উচিত স্টাম্পেলওয়ালি।’

‘না, না, আপনি অনেক সম্ভ্রান্ত—’

‘সে শুধু উপসর্গের গুণে। উপসর্গ বদলে গেলেই বিভ্রান্ত হজ্ঞা যেতে পারি—কে জানে হয়তো বা উদ্ভ্রান্ত।’ দিবা দাঁত দেখিয়ে হাসল বিনতা।

‘আচ্ছা, আপনাকে কি আমি ওর বিয়ের সময় দেখেছি?’

‘কার বিয়ে?’ ছুটু-ছুটু হাসল বিনতা।

‘হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে।’ বলেই আবার কেমন অপ্রস্তুত লাগল স্বকাস্তর : ‘মানে আমার আর আপনার বন্ধু কাকলির বিয়ে—’

‘মানে বর্তমান বিয়ে, যে বিয়েটা এখনো চালু আছে—’

‘হ্যাঁ, যেটা যেতে বসেছে। কী, দেখেছি আপনাকে?’

‘দেখা উচিত ছিল কিন্তু দেখেন নি। কী করে দেখবেন? আপনি তো তখন শুধু একজনকে দেখতেই বাস্তু।’

‘স্বন্দর বলেছেন—একজনকে দেখতেই বাস্তু। প্রেমে আমরা বোধ হয় তাই বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে দেখি না, সেই যে একজন তাকে দেখি। জন এক, নাম নানা। তাই দেহের ক্ষয় হয়, আকাজ্জার ক্ষয় নেই। অণুবীক্ষণ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতি রোমকূপ দেখেও বিজ্ঞান অস্ত্র পায় না রহস্যের।’

‘প্রেমে কী হয় জানি না,’ নিচু হয়ে পেয়ালায় চুমুক দিল বিনতা : ‘কোনোদিন প্রেম আসে নি জীবনে। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা বুঝি, ওটা উডু-উডু নম্র, কাব্য-কাব্য নয়।’

‘আপনি কী করে বলছেন? বিয়েও তো আপনার আসে নি।’

‘ও না এলেও বলা যায়, কেননা—’ পেয়ালায় আবার মুখ ঢাকল বিনতা।

‘কেননা—’

‘প্রেম হচ্ছে একটা অবস্থা, আর বিয়ে হচ্ছে একটা ব্যবস্থা।’ বিনতা হাসল : ‘অবস্থায় না পড়লে অবস্থার কথা বলা যায় না কিন্তু ব্যবস্থা না করলেও ব্যবস্থাটা কিরকম, বলা যায় বাইরে থেকে। ঘিয়ের আশ্বাদ কেমন ঘি না খেলে বোঝা কঠিন কিন্তু কী করে ঘি তৈরি করা উচিত তা বলা যায় বই পড়ে।’

‘তা, বই পড়ে কী জেনেছেন বিয়ের বিষয়?’

‘জেনেছি, যাকে ভালোবাসা যায় তাকে বিয়ে করা উচিত নয়।’

‘সেই তো মরণ। যাকে চাই তাকে না পাওয়াও ট্রাজেডি, যাকে চাই তাকে পাওয়াও ট্রাজেডি।’

‘স্বতরাং ঐ ভুল আর করবেন না।’

‘আর করব না মানে?’

‘মানে এর পর আবার যখন বিয়ে করবেন, ঝপ করে করবেন। ভালোবাসার জন্তে বসে থাকবেন না। প্রেম ফুল আর বিয়ে ফল এটা ঠিক নয়। বিয়ে ফুল আর প্রেম ফল এটাই ঠিক। আর—’

আরেক পাট চা দিয়ে গেল বয় ।

‘কী আর ?’

‘শুধু হৃদয়ই বড় করবেন না, ঘরখানিও বড় করবেন : মানে, স্ত্রীকে নিয়ে এজমালি ঘিজির মধ্যে থাকবেন না, আলাদা বাড়ি করে থাকবেন—’

‘দ্বিতীয় স্ত্রী হোক কি না হোক, আমি শিগগিরই সরে যাচ্ছি বাড়ি থেকে, আলাদা ফ্ল্যাট নিচ্ছি—’

‘সেই আলাদা ফ্ল্যাট যদি আগে নিতেন তা হলে প্রথম বিয়েটা নষ্ট হত না ।’ চা ঢালতে ঢালতে বিনতা বললে, ‘ঘর ছোট হলে হৃদয়ও ছোট হয়ে যায় ।’

‘কত বলেছিলাম আপনার বন্ধুকে আলাদা ফ্ল্যাট নি । কিছুতে রাজি হল না মেয়ে । এজমালি সংসারে সকলের মধ্যে থাকতে কী যে মধুচ্ছবি দেখেছিল তা ওই জানে । আগে থেকে ঘরদোর সরজমিনে সার্ভে করিয়ে নিয়েছি ওকে দিয়ে, বলতে পারবে না প্রতারণা করেছে । কত বুঝিয়েছি ঐ ঠোকাঠুকির সংসারে থাপ খাব না আমরা, চলো নিজের মাপে নীড় বাঁধি গে নির্জনে । কিন্তু মেয়ের আর কিছু না থাক, গৌ আছে । বলে বাপ-মা ছেড়েছি, স্বস্তর-শান্তি ছাড়তে পারব না, ননদ-দেওরের স্বাদ আর কোথায় পাব ? তা ছাড়া, সেন্টু—সেন্টুকে ছেড়ে থাকব কী করে ?’

‘কিন্তু দেখলেন তো পরিণাম । আলাদা হয়ে থাকতে পারলে সব টিঁকে থাকত—শান্তি, সৌহার্দ্য, আত্মীয়তা—সমস্ত । নিত্য টানাটানিতে ছিঁড়ত না দড়িগাছা । এখন কোথায় বা স্বস্তর-শান্তি, কোথায় বা সেন্টু । দিনেরাত্রে ভুলেও একবার নাম করে না । স্তবরাং—’ হাসল বিনতা : ‘পরের বারে সাবধান হবেন । গোড়া থেকেই হবেন ।’

‘আমি তো গোড়া থেকেই সাবধান ছিলাম । কিন্তু মেয়ে কী ভীষণ এক-বগ্গা—যা একবার বলেছে তা না করে ছাড়বে না ।’

‘সেটা তো মহৎ গুণ । আপনিও পারতপক্ষে তাই অনুসরণ করবেন । সংকল্পকে নিয়ে যাবেন উদ্ঘাপনে ।’ নতুন চা তৈরি করে বিনতা পেয়লা এগিয়ে দিল স্বকাস্তকে । বললে, ‘বিয়ের বিষয় যখন জানতে চেয়েছেন তখন আরো একটা কথা বলে রাখি—’

‘বলুন ।’ চোখে চোখ রাখল স্বকাস্ত ।

‘এবার যখন বিয়ে করবেন তখন নিশ্চয়ই বনেদী চাকুরে মেয়ে বেছে নেবেন । তার সঙ্গে গোড়াতেই বোঝাপড়া করে নেবেন, কোথায় কী তার কমিটমেন্টস । তা হলেই আর কোনো বিরোধ ঘটবে না ।’

‘আগে এই বিয়েটা তো ভাঙুক ।’ অসহিষ্ণু ভঙ্গি করল স্বকাস্ত ।

‘এ তো ভেঙেই রয়েছে। শুধু আদালতের একটা সই নিয়ে আস। কাকলি তার আর্জি খসড়া করেছে। দেখবেন খসড়া?’

উৎসাহ দেখাল না স্বকান্ত। অস্থতাপের স্বর ফুটিয়ে বললে, ‘কী অবস্থা মেয়ে, কিছুতেই রেজেষ্ট্রি বিয়ে মেনে নিতে চাইল না। একেবারে সেকলে। বললে যজ্ঞ চাই, যজ্ঞ চাই, শালগ্রাম চাই, সাত-পাক চাই—আর চাই মুখচন্দ্রিকা—’

‘আহা, কী মুখচন্দ্রিকাই হল।’

‘বললাম অত সব জবড়জড়ে কাজ নেই, চলো টিপ-ছাপ দিয়ে এক টোঁকে কাজটা সেরে আসি। তা নয়, বললে বিয়ে যদি বিয়ের মতই না হয় তা হলে বিয়েতে আর ইয়েতে তফাত কী। সানাই বাজবে না, লাল-নীল আলো জ্বলবে না, বেন রসী পরব না, গা ভরে গয়না গমগম করবে না, বাসর হবে না, ফুলশয্যা হবে না, তা হলে বাঙলা দেশে জন্মালাম কেন মেয়ে হয়ে?’

‘জানেন, ওর বিয়েতে আমি ওকে সাজিয়েছিলাম।’ তির্যক রেথায় হাসল বিনতা : ‘এবার ও না তার শোধ তোলে!’

‘কিন্তু কী ফল হল অত সাজগোজের?’ বললে স্বকান্ত, ‘ও ঐতিহ্যকে মানতে গেল কিন্তু ঐতিহ্য যে শুধু একটা পীড়াদায়ক ভার, অন্ধ কুসংস্কারের সমষ্টি, তা বিচার করে দেখল না। চিরদিনই মেয়েটার কাব্যার্থে মন, রঙচঙ জেল্লা-জমকের পক্ষপাতী, শাদাসিঁথে মন ওঠে না। তাই ম্যাজেস্টিতে গেল, রেজেষ্ট্রিতে গেল না। রেজেষ্ট্রিতে গেলে কত স্তবিরের ছিল, একটা সংযুক্ত দরখাস্ত করেই আজ নাকচ করা যেত বিয়ে। আড়ম্বর করতে গিয়েই যত ঝামেলা বাধিয়েছে। হিন্দু সাজতে গিয়েই ফেলেছে জলের নিচে। এখন লুকিয়ে-চুরিয়ে এক কো-রেনপণ্ডেন্ট জোগাড় করতেই ঘায়েল হয়ে যাচ্ছি।’

‘তা কো-রেনপণ্ডেন্ট তো আছেই হাতের কাছে।’ প্রায় হাত বাড়াল বিনতা : ‘দেখুন না ওর আর্জির ড্রাক্‌ট।’

বিচলিত হল না স্বকান্ত। বললে, ‘ওর আর্জি কিসের? ওর আর্জি চলবে না।’

‘তবে আপনার আর্জি চলবে?’ চট করে স্বর পালটাল বিনতা।

‘ই্যা, তাই তো উচিত।’

‘তার মানে আপনি ওকে দুর্নাম দেবেন, নিজে নিতে পারবেন না দুর্নাম?’

‘না, কী করে নেব? আমি দুর্নাম নিলে আমার চাকরি যায়। আর চাকরি গেলে, আড়চোখে তাকাল স্বকান্ত : ‘আলাদা ক্ল্যাট নেওয়া হয় না, দ্বিতীয় বিয়ে তো দূরস্থান।’

‘সে অল্প কথা।’ বসার ভক্তিটা ঋজু করল বিনতা : ‘তাই বলে একটা নির্দোষ মেয়ের গায়ে আপনি কাদা লেপবেন?’

‘কেন, সেই ব্যবস্থায় তো সে রাজি ছিল। সে যখন বিচ্ছেদ চায় তখন তার নিজের স্বার্থেই তো তার তা মেনে নেওয়া উচিত।’

‘বিচ্ছেদ তো আপনিও চান, তবে আপনার নিজের স্বার্থেই বিকল্প ব্যবস্থা আপনি মানবেন না কেন?’ ভক্তি আরো দৃঢ় করল বিনতা : ‘আপনার আর্জিতে বরেনবাবু কো-রেসপন্ডেন্ট হতে পারলে কাকলির আর্জিতে আমার হতে দোষ কী?’

‘দোষ কী!’ প্রায় মাথায় হাত দিল স্বকাস্ত : ‘আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, একটা মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষিকা, আপনি যেচে-সেধে এই কলঙ্ক নেবেন? আপনার ভয়-ভর নেই?’

‘আমি আপনাদের ঐসব প্রথামানা পুঁচকে পুঁটিমাছের প্রাণওয়ালা ক্ষুদ্র মেয়ে নই।’ জলে উঠল বিনতা : ‘মিথ্যা কুৎসাকে আমি ভয় করি না। এক সংকীর্ণ পুরুষের বিরুদ্ধে উৎপীড়িত এক মেয়ের মান রাখতে ওটুকু ঝুঁকি আমি নিতে পারব অনায়াসে।’

‘কিন্তু ঐ কুৎসায় আপনার যদি চাকরি যায়?’

‘যতদূর বিশ্বাস, যাবে না। আর যদি যায়ও, গ্রাহ্য করি না। সংসারে চাকরি বা টাকাই সব নয়। আত্মার কোনো খাতিই টাকা দিয়ে কেনা যায় না।’

‘ঐ কলঙ্ক আপনার আত্মার খাতি?’ বিস্ময়ে উঠল স্বকাস্ত।

‘না, একটা অবিবেচক পুরুষের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দমন করা যাবে সেই তৃপ্তিই আমার আত্মার ভোজ।’

‘তা হলে তো বিবাহ-বিচ্ছেদ হয় না—’ হতাসের মত হাওয়ায় হাত ছুঁড়ল স্বকাস্ত।

‘হয়ই না তো।’ দাঁড়িয়ে পড়ল বিনতা : ‘বিরোধ কি শুধু ঘরে, কোর্টে নয়? বিরোধ কোর্টেও। আপনার আর্জি ফাইল হবে, না কাকলির আর্জি, তাতে বিরোধ, কো-রেসপন্ডেন্ট বরেনবাবু হবেন, না আমি হব, তাতে বিরোধ। এত গোলমালে মামলা রুজু হয় না। আর মামলা রুজু না হলে বিচ্ছেদ কোথায়?’

‘কাকলি কি তাই চায়?’ স্বকাস্তও উঠে দাঁড়াল।

‘আমাদের সব পাওয়া কি চাওয়া দিয়েই নির্ণীত হয়? এই সংঘর্ষই কি কাকলি চেয়েছিল, না আপনি চেয়েছিলেন? আর এত যে আপনি দ্বিতীয় বিয়ের জন্তে লালায়িত, তা কি শুধু চাইলেই জুটবে? কাকলি যতই চাক, ভাগ্য যদি না দেয়, এ বিবাহ অচ্ছিন্ন হয়েই থাকবে। তাই আমি বলি কী—’

উন্মুখ হয়ে তাকাল স্বকাস্ত ।

‘আমি বলি আপনি যান, কাকলিকে দুই প্রবল হাতে তুলে নিয়ে আসুন আপনার নতুন ক্যাটে । আপনি নিষ্ঠুর হয়েছেন, এবার কোমল হোন । এ তো আর্জির মামলা নয়, এ মর্জির মামলা । যে নির্মম তারই তো দয়ালু হওয়া সাজে । যে কঠিন সেই-ই তো দ্রব হবে, আর্দ্র হবে । যান, নিয়ে আসুন গিয়ে, কোনো অপমান নেই, কোনো পরাভব নেই ।’

‘ও আসতে পারে না ?’

‘না । আপনি ওকে চলে যেতে বলেছেন আপনিই তুলে নিয়ে আসবেন ।’

‘অসম্ভব ।’

‘স্বতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব । আর প্রথম বিয়ে চালু থাকতে দ্বিতীয় বিয়ের কল্পনা করা অসম্ভব তো বটেই, অসংগত । আচ্ছা আসি, নমস্কার ।’

বেরিয়ে গেল বিনতা ।

বরেনের কাছে এসে রিপোর্ট করল স্বকাস্ত ।

বরেন সব শুনে বললে, ‘হৃদাস্ত মেয়ে ।’ পরে মুচকে হেসে বললে, ‘বিয়ে ভেঙে গেলে দ্বিতীয়া বলে ডাই করতে পারিস ।’

‘অসম্ভব । যা একথানা রসনা, আবার দ্বিতীয়বার ভাঙবে ।’

‘তা ছাড়া প্রথমটা ভাঙলে তো দ্বিতীয় ।’ বরেন টিপ্পনী কাটল ।

‘তবে উপায় ?’

‘জটিল করে ফেললে ।’ চিন্তিত স্বরে বরেন বললে, ‘দাঁড়া, কাকলিকে ফোন করি । ফোন করে আসতে বলি । ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল ।’

• ৩৯

কান্মা যাব । স্বকাস্তের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে সেন্টু ।

প্রথম প্রথম সাহেবী নির্লিপ্ততায় কান্মাটা উপেক্ষা করতে চাইছিল স্বকাস্ত কিন্তু সেন্টু একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল । বললে, ‘আমাকে কান্মার কাছে নিয়ে চলো ।’

কাঁহাতক থাকতে পারবে চুপ করে ? ক্রমে সেন্টু একেবারে কোলের কাছে চলে এসেছে ।

তাকে ঠেলে দিয়ে আলগা হবার চেষ্টায় স্বকাস্ত বললে, ‘ও কোথায় গেছে তা কি আমি জানি?’

‘বা, কান্দা তো আফিসে গেছে। মস্ত বাড়ি, অনেক লোক সেখানে কাজ করে, খাঁচা করে ওঠে-নামে— কত আমাকে গল্প বলেছে কান্দা—’

‘ওর আফিস কোথায় কেউ জানে না।’

‘না, তুমি জানো। কান্দা যে তোমার বউ।’

এত কষ্টেও হাসি পেল স্বকাস্তের। বললে, ‘ওর আফিস উঠে গেছে।’

‘কোথায় উঠে গেছে? যেখানে উঠে গেছে সেখানে সে বাড়িতে নিয়ে চলো।’

এ তো ভারি মুশকিল হল। স্বকাস্ত আবার কোলের কাছ থেকে ঠেলে দিল সেন্টুকে। বললে, ‘ও আর আফিসে যায় না।’

‘যাঃ, তা কখনো হয়?’ অবিস্বাসের হাসি হাসল সেন্টু।

‘হ্যাঁ, ও কাজ ছেড়ে দিয়েছে।’

‘ছেড়ে দিয়ে কোথায় গেছে?’ বিজ্ঞের মত মুখ করল সেন্টু।

‘কেউ জানে না।’

‘না, জানে। আফিসের লোকেরা জানে। তারা ঠিক বলতে পারবে।’

‘কী করে পারবে?’ ধমকে উঠল স্বকাস্ত : ‘তারা যে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।’

‘তাড়িয়ে দিয়েছে?’ এ আরেক অবিস্বাস কথ। ছোট্ট উকিলের মত সেন্টু বললে, ‘কোথায়?’

‘রাস্তায়।’

এও পুরো মানতে প্রস্তুত নয় সেন্টু। বললে, ‘তবে চলো কান্দার নতুন আফিসের রাস্তায়, কিছু ঘোরাঘুরি করলেই ঠিক কান্দাকে দেখতে পাব।’

‘দেখতে পেলো কী হয়, ও ফিরবে না।’

‘আমাকে দেখতে পেলোই ফিরবে।’ স্নেহ ও সারল্যে দুই চোখ বড় করল সেন্টু : ‘আমি কান্দার কোলে বাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরব— আদর করব। কান্দা আর ফিরে যেতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক চলে আসবে।’ সেন্টু আবার স্বকাস্তের কোল ঘেঁষে এল : ‘চলো আমরা গিয়ে খুঁজি। কান্দার কাছে কত গল্প শুনেছি এই রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে কত লোকে কত হারানো ছেলে-মেয়ে খুঁজে পেয়েছে— কত হারানো বাপ-মা। চলো আমরা খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যাব কান্দাকে। চলো—’ আবার কান্দা জুড়ল সেন্টু।

‘রাস্তায় রাস্তায় ঘোরবার আমার সময় নেই।’ উজ্জনের মত মুখ করল স্বকাস্ত।

তবুও নিরস্ত হয় না সেন্টু। বললে, ‘রোজ একটু-একটু করে ঘুরবে।’
 ‘হ্যা, আর কার সঙ্গে ঘোর গে যা।’ আবার ঠেলে দিল স্বকান্ত।
 ‘না, তোমার সঙ্গে ঘুরব।’
 ‘আমি পারব না ঘুরতে।’
 শাসনের স্বরে সেন্টু বললে, ‘বা, তোমার বউ, তুমিই তো ঘুরবে।’
 ‘পাকামো করবি তো, এক চড়ে গাল উড়িয়ে দেব।’ এবার সেন্টুকে জোরে, দূরে
 ছুঁড়ে দিল স্বকান্ত।

তবু ছেলেটার ভয়-ডর নেই। বললে, ‘দাঁড়াও না, যাও না আফিসে, তোমার
 সব বই-খাতা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলব।’

‘করে একবার দেখিসই না।’ স্বকান্ত নিষ্ঠুরের মত বললে, ‘তোমার কান্নাকে যেমন
 জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি তেমনি তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব বাইরে।’

‘তাই দাঁড়াও না।’ দিবি নির্ভয়ে এগুল সেন্টু : ‘তা হলে তো ভালোই হয়। ঠিক
 তা হলে কান্নার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি।’

‘না, জানলা দিয়ে দেখ তাকিয়ে।’ বললে স্বকান্ত, ‘বাইরে একেবারে
 খোলা রাস্তা। শক্ত ইট, পাথর। তোমার কান্না-টান্না কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পড়বি
 আর খেঁতলে যাবি।’

আস্তে আস্তে আবার ঘনিষ্ঠ হল সেন্টু। বললে, ‘তবে যেখানে পড়লে খেঁতলে
 যাব না সেইখানে ফেলো।’

‘সেটা আবার কোন জায়গা?’ সেন্টুর চোখের দিকে তাকাল স্বকান্ত।

‘কেন, কান্নার কোল।’ কাকাকে ঠকিয়েছে সেই আনন্দে এক গাল হাসল সেন্টু।

স্বকান্ত গম্ভীর হয়ে সামনের টেবিলের কাগজপত্রে মন দিতে চাইল।

‘চলো না কান্নার কাছে।’ আবার মুখখানি ককণ করল সেন্টু।

স্বকান্ত নড়ল না।

‘চলো। তোমার তো কিছু পয়সা খরচ হবে না। আমি হেঁটে-হেঁটেই যাব।
 চলো—’

‘না।’

‘তুমি ভেতরে নাই বা ঢুকলে। আমাকে কান্নার কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরে
 যেও—’

‘না।’ গর্জন করে উঠল স্বকান্ত।

‘আমি না হয় কদিন পরেই ফিরব। কান্নাকে ঠিক নিয়ে আসব সঙ্গে করে।’

‘বিরক্ত করিস নে বলছি।’ স্বকান্ত চোখ পাকাল : ‘তোমার মার কাছে যা।
ফের বিরক্ত করবি তো—’

‘এতে বিরক্তের কী আছে!’ হু চোখ ছলছল করে উঠল সেন্টুর : ‘কত দিন
কান্নাকে দেখি নি বলো তো ! তোমার কষ্ট হয় না বলে কি আমার হবে না ?’

‘ফের ! আবার !’ সেন্টুর গালে সটান এক চড় বসাল স্বকান্ত।

‘আর, নির্গলিত কান্না জুড়ল সেন্টু।

পাশের ঘর থেকে বন্দনা এল ছুটে। রোষ-উষ্ণ মুখে বললে, ‘মারো কেন
ছেলেটাকে ? বোঝাতে পারো না ?’

‘যা বিচ্ছু ছেলে, বুঝলে তো !’

‘কিন্তু ভুলিয়ে-ভালিয়েই তো ঠাণ্ডা করে রাখতে হবে। একে মনে-মনে পুড়ছে
তায় আবার শরীরে মার !’ বন্দনা ছেলেকে কাছে টেনে নিল।

‘বেশ করেছি মেরেছি।’

‘কিন্তু ওর অপরাধ কী ? ও ওর কান্নাকে ভালোবাসে, কান্নার কাছে যেতে চায়,
এই অপরাধ ?’

‘হ্যাঁ, এই অপরাধ।’

‘অনেক বীরত্ব দেখিয়েছ, এখন এক নিরীহ শিশুকে মেরে তার আর প্রমাণ দিতে
চেয়ো না।’ বন্দনাও কর্কশ হল।

‘চল, তোকে তোমার কান্নার কাছে দিয়ে আসি।’ ক্ষিপ্ত হাতে মায়ের কাছ থেকে
সেন্টুকে ছিনিয়ে নিয়ে পাজাকোলে করে স্বকান্ত জোর পায়ে ছুটল নিচে।

অনায়াসেই বুঝতে পেরেছে সেন্টু, এটা কখনোই কান্নার কাছে নিয়ে যাবার
রীতি নয় ! এটা রাস্তায় কতক্ষণ একলা ফেলে রেখে নিষ্ঠুর ভয় দেখাবার চেষ্টা। এ
এক প্রতিশোধের চেষ্টা।

বুকেই হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সেন্টু। আর !রোল তুলল আকাশছোঁয়া।

‘চল, তোকে এমন এক জায়গায় দিয়ে আসি যেখানে আর তোমার কান্নার কথা
মুখে না আসে। কান্না যাব, কান্না কোথায়, কান্নার কাছে নিয়ে চলো আর বলতে
না পারিস—’

তীব্র চিৎকার করতে লাগল সেন্টু।

‘নিচে নামতেই বিজয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল : ‘কী, কী হয়েছে ?’

বিজয়াকে দেখেই তার দিকে ব্যাকুল হাত বাড়াল সেন্টু। আর বিজয়া উদ্বেল
হয়ে নিজের বুকের মধ্যে হুড়িয়ে নিতেই হুঁপিয়ে উঠল : ‘কান্না যাব।’

‘ফের ! ফের কান্না ? চড়িয়ে মুখ ভেঙে দেব বলি নি ?’ সেন্টুকে লক্ষ্য করে
স্বকাস্ত প্রচণ্ড চড় গুঁচাল।

‘ওকে মেরে কী হবে ?’ সেন্টুর চুলে হাত বুলুতে লাগল বিজয়া। বললে, ‘তার
চেয়ে ওকে একদিন কাকলির কাছে নিয়ে যাও না।’

‘আমি নিয়ে যাব ?’ বুকের মধ্যখানে তর্জনী রেখে নিজেকে চিহ্নিত করল
স্বকাস্ত।

‘গেলেই বা।’ প্রায় উড়িয়ে দিতে চাইল বিজয়া।

‘এ অবস্থায় লোকে নিজের ছেলেকে পর্যন্ত আটকায়, মায়ের কাছে যেতে দেয় না।’
স্বকাস্ত আহত স্বরে বললে, ‘আর এ এক পরের ছেলে কী খানিক কান্নাকাটি করেছে
তখন গলে গিয়ে অপমান সয়ে তার বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে বিরোধ মিট করে দিয়ে
আসব ?’

‘মিট করে দিলেই বা ক্ষতি কি।’ ঘর থেকে হেমনও বাইরে এল : ‘এ অবস্থায়
বলচিস—তোর কী এমন অবস্থা ?’

‘যে স্বী স্পর্ধাভরে অপমান করে চলে যায় তাকে আমি যেচে সেধে একটা ছেলের
কান্না দেখিয়ে পটিয়ে ফিরিয়ে আনতে যাব ? অসম্ভব।’ স্বকাস্ত সদর্পে বললে,
‘আমার মেরুদণ্ড জেলি দিয়ে তৈরি নয়, হাড় দিয়ে তৈরি।’

‘তোর মেরুদণ্ড কী দিয়ে তৈরি জানি না কিন্তু তোর মাথাটা গোবর দিয়ে তৈরি।’
বললে হেমন, ‘বলি এমন কী হয়েছে তোদের মধ্যে ? সামান্য একটা ঝগড়া—কথা-
কাটাকাটি। এমন বচসা হামেশাই হয় স্বামী-স্ত্রীতে প্রায় সংসারে। তার জন্তে
বউকে কেউ বাড়ি থেকে চলে যেতে বলে না। আর রাগের মাথায় গোয়ার স্বামী
যদি তা বলেও, আর একগুঁয়ে স্বী তাইতে গোসা করে চলে যায়, তা হলেই তাদের
সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে চিরদিনের মত ? সেখানে আর কোনো দিন সেতু বাঁধা
হবে না ?’

‘তাই বলে একটা অবাস্তব শিশুর মায়াকান্না দিয়ে সেতু বাঁধতে হবে ?’ স্বকাস্ত
সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে ঘাড় ফেরাল : ‘কেন, ও পক্ষ ছেলের টানে আসতে পারে
না এগিয়ে ? সেতুটা ওদিক থেকে পড়তে পারে না ?’

‘কেন, কী হয়েছে ?’ মৃণালিনী সর্বকণ্ঠী, সে এসে নাক ঢোকাল। ব্যাপারটা
জেনে, সরাসরি সেন্টুর উপর ঝাঁজিয়ে উঠল : ‘কান্না কোথায় ! তোর কান্না তো
মরে গিয়েছে। মরা লোক আবার কী করে আসে ! কী করে যাওয়া যায় তার
কাছে ! সে তো এখন ভূত। গাছে-গাছে ঘুরে বেড়ায়। সে এলে তো ভয় পাবি।’

সতি বুঝি ভয় পেল সেন্টু। বিজয়ার গলা হু হাতে আঁকড়ে ধরল
প্রাণপণে।

‘কত শিশুর ভালোবাসার জন—মা, দিদি, মাসি-পিসি মরে যায়—কদিন শিশু
কাদে-কাটে, পরে ভুলে যায় আন্তে-আন্তে।’ বিজয়াকে লক্ষ্য করল মৃণালিনী :
‘তোমনিধারা ছেলেটাকে তোমরা ভোলাতে পারো না ? বলতে পারো না, হাসপাতালে
গিয়েছিল কান্না, সেখানে মরে গিয়েছে, চলে গিয়েছে সগ-গে—পারো না বোঝাতে ?’

উত্তরে ছরস্তু শিশু কী যেন বলতে যাচ্ছিল, মাথাটা কাঁধের উপর সজোরে চেপে
ধরে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল বিজয়া।

স্বকাস্তকে লক্ষ্য করে হেমেন বললে, ‘ওদিক থেকে সেতু না পড়লে তুই এ পারে
হাত গুটিয়ে বসে থাকবি চুপচাপ ?’

কোনো জবাব না দিয়েই উঠে যাচ্ছিল স্বকাস্ত, উপর থেকে প্রশান্ত নেমে আসতেই
মাঝপথে বাধা পেল।

প্রশান্ত বললে, ‘সেতুটা তো তুইই ফেলবি, তোর দিক থেকেই বাড়বে। সেন্টুর
জোরে যাবি কেন, তুই তোর নিজের জোরে যাবি। যাবি খালি হাতে। আর খালি
হাতে বলেই টেনে নিয়ে আসবি হিড়হিড় করে।’

‘যা জানো না, বোঝো না, যে অবস্থার মধ্যে নিজে কখনো পড়ো নি, তাই নিয়ে
কথা বলতে এসো না।’ স্বকাস্ত থমথমে মুখে বললে।

নিচে থেকে হেমেন আবার জলে উঠল। বললে, ‘আর যেহেতু তুইই তাড়িয়ে
দিয়েছিস তোরই কোনো ছুতো ধরে যাওয়া উচিত আগ বাড়িয়ে। তোরই রাগের
পিছে-পিছে, রাগকে অহুসরণ করে, মানে অহু-রাগ নিয়ে।’

‘যে স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা করছে, তার কাছে ?’ মৃণালিনী স্বকাস্তের পক্ষ নিয়ে
দাঁড়াল।

‘রাখো। ডিভোর্স অমনি মুখের কথা ?’ মৃণালিনীর দিকে তাকাল হেমেন :
‘অমনি কথায় কথায়, মুখের কথায় ডিভোর্স করতে হলে আমি-উনি তুমি-দাদা
প্রশান্ত-বন্দনা কেউই আস্ত থাকব না। তা হলে সেই যে বলেছিল অন্ধ স্ত্রী আর
কালো স্বামীর বিয়েই সার্থক বিয়ে, দুঃশ্চেষ্ট বিয়ে, সেই আদর্শ সমাজে গিয়েই আমাদের
উঠতে হয়। অন্ধ স্ত্রী দেখতে পাচ্ছে না স্বামীর দুর্দীর্ঘ্য, আর কালো স্বামী শুনতে পাচ্ছে
না স্ত্রীর গলিত অগ্নিশ্রাব—সেই আদর্শ বিয়ে পাব কোথায় ? বাস্তব সংসারে কিছু কলং
কিছু সংঘর্ষ কিছু বিতণ্ডা থাকবেই, তাই বলে সহিষ্ণুতা থাকবে না, ক্ষমা থাকবে না,
উদারতা থাকবে না, সমস্ত সঙ্কুতি নস্ত্যং হয়ে যাবে এ মহাভারতে লেখে না।’

‘এ কি শুধু এক বেলার ঝগড়া, না শুধু একটা সাময়িক মতের অমিল?’ স্বকান্ত উচু পর্দায় বললে উচু সিঁড়ি থেকে, ‘এর মূল আরো গভীরে, ঘোর পক্ষের মধ্যে।’

‘মিথ্যে কথা।’ ক্রোধে ফেটে পড়ল হেমেন।

‘তোমার সত্য আর আমাদের সত্য, স্বামী-স্ত্রীর সত্য, এক নয়—’ স্বরে বিজ্ঞপের সূক্ষ্ম একটি কাঁপন আনল স্বকান্ত: ‘ইতিহাসের সত্য, আর ভালোবাসার সত্য আলাদা। তেমনি বিজ্ঞানের সত্য আর সাহিত্যের সত্য—’

‘সত্য-সত্যই অদ্ভুত—’ হেমেন বিজ্ঞপটা ফিরিয়ে দিতে চাইল।

‘হ্যাঁ, অদ্ভুত, আর সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’ দৃঢ়, প্রায় হুঁসিঁনীত শোনাৎ স্বকান্তকে: ‘আর এ ব্যাপারে কারু কোনো অভিভাবকত্বের স্বোপ নেই।’ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে থামল স্বকান্ত, নিচে দাঁড়ানো মাকে লক্ষ্য করে বললে, ‘মা! সবাই মিলে যদি এমনি অশান্তি করতে শুরু করে, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হাত দিতে চায়, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলছি। সকলের থেকে আলাদা হয়ে যাব। কোনো সম্পর্ক রাখব না।’

মৃণালিনী আপন মনে বলতে লাগল, ‘সত্যি, হুঁ দণ্ড শাস্তি পেল না ছেলেটা। আগে বউয়ে ধরেছিল এখন ফেউয়ে ধরেছে। যে বউ ছেড়েছুড়ে চলে যায় তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কী! সেখানে আবার ছেলে নিয়ে যাবার কথা ওঠে কী করে? যে বউ বার হয়ে যায় সে তো মড়ার শামিল আর যারা সে বউয়ের পক্ষ টেনে কথা বলে—’ বিশেষণ খুঁজে পেল না মৃণালিনী।

প্রশান্ত আগেই ভেগেছে, হেমেনও তার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দেখল বিজয়া সেন্টুকে সাঙ্ঘনা দিচ্ছে। স্বীরকদম্ব খেতে দিয়েছে, আর তার লোভের মধ্যে রেখেছে আরেকটা লাল রসগোল্লা। আরো, রসগোল্লার পরে রাজভোগ, বলছে বিজয়া, ‘কারু কাছে বলবি না বল, আমি তোকে তোর কাম্মার কাছে নিয়ে যাব।’

‘আমি কাউকে বলব না।’ ব্যাপারের গঙ্কটা যেন কিছু সেন্টুও টের পেয়েছে। স্বর নামিয়ে বললে, ‘চুপিচুপি যাব, চুপিচুপি ফিরে আসব।’

‘হ্যাঁ, কাঁদতে পাবি না।’

‘না, কাঁদব কেন? আমি কি আর এখন হুঁ-এক বছরের শিশু?’

‘থাকতে চাইবি না কিন্তু।’

‘খানিকক্ষণ থাকার পর মা-ই তো আমাকে নিয়ে যায় বিছানায়। তেমনি খানিকক্ষণ পর তুমি তুলে নিয়ে আসবে।’

হেমন বললে, ‘সত্যি, কোনোক্রমে বউটাকে যদি বাড়ি নিয়ে আসা যেত তা হলে জন্ম হত ইন্ডিয়টটা।’

‘চলো না আমরা গিয়ে নিয়ে আসি।’ লাফিয়ে উঠল সেন্টু। সঙ্গে-সঙ্গে হাত বাড়াল লাল রসগোল্লায় দিকে।

‘ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে থাকত বউমা’, হেমন প্রায় সিনেমার ছবি আঁকল : ‘আর শ্রীমান ঘরে ঢুকেই দেখত, মূর্তিমতী কমা বসে আছে প্রতীক্ষা করে। তখন দেখতাম শ্রীমান কী করে ! চেনে কিনা, হাসে কিনা, ধরে কিনা—’

‘কিংবা মূর্তিমান সমর্পণ হয়ে পড়ে কিনা পদতলে।’ বিজয়া চিপটেন কাটল।

আর কী বুঝল কে জানে, খিলখিল করে হেসে উঠল সেন্টু।

‘একবার দেখি না চেষ্টা করে।’ হেমন প্রায় মনে-মনে বললে।

আফিস থেকে টেলিফোনে কাকলিকে ধরল হেমন।

‘আমি কি শ্রীমতী কাকলির সঙ্গে কথা কইছি?’

‘হ্যাঁ। বলুন।’

‘আমাকে চিনতে পাচ্ছ?’

‘না।’

‘আমি শ্রীহেমেন্দ্র— হেমন বোস— তোমার—’

‘কাকা?’ কাকলি একটি স্নিগ্ধস্মিত টান দিল কণ্ঠস্বরে : ‘কী আশ্চর্য ! ব্যাপার কী বলুন।’

‘তোমার সঙ্গে একবার দেখা হয়?’

‘বা, কেন হবে না? আমার আফিসে আসবেন?’

‘না, তোমার হস্টেলে। কোনো বাধা নেই তো?’

‘না, আপনার পক্ষে নেই।’ স্বল্প একটু বুঝি বা হাসল কাকলি।

‘আমার পক্ষে নেই মানে—’ হেমন বিষয়টা যেন একটু বিশদ করতে চাইল।

‘শুধু আপনার পক্ষেই নেই। হস্টেলে একজন লোক্যাল গার্ডিয়ানের নাম দিতে হয়। আমি আপনার নাম দিয়েছি। তাই আপনার আসতে কোনো বাধা নেই। আর সব পুরুষ ডিবার্ড।’ একটু বুঝি বা থামল কাকলি : ‘তবে আমি অবশ্তি অন্তঃ গিয়ে যে কাকুর সঙ্গে দেখা করতে পারি। তাই বলুন, আমি গিয়ে আপনার আফিসে দেখা করব?’

‘না, না, তোমার কষ্ট করতে হবে না।’

‘আপনারই বা অত দূর কষ্ট করে যাবার দরকার কী!’ কাকলি নির্লিপ্ত স্বরে বললে, ‘কী ব্যাপার, যদি সম্ভব হয়, টেলিফোনেই বলুন।’

সরাসরি সম্মুখীন হতে পারল না হেমন। ঘুরিয়ে বললে, ‘ব্যাপার আর কিছু নয়, তোমার কাকিমা একবার তোমার কাছে যাবেন।’

‘বা, বেশ তো, মেয়েদের আসতে কোনোই অস্ববিধে নেই। কবে আসবেন? সামনের রবিবার? ছুটির দিন?’

‘না, ছুটির দিন স্ববিধে হবে না।’

‘বেশ, উইক-ডেতেই আসবেন। পরশু, কেমন? বেশ, কখন, কটার সময়?’

‘দুপুরবেলা। ধরো একটা থেকে দুটো। তোমার লাঞ্চ-টাইম।’

হাসল কাকলি, ‘টিফিন-টাইম! তা আমি সকাল-সকাল কিরব হস্টেলে। টিফিন না হয় ওখানেই করব। বেশ, তাই। সব ভালো? আচ্ছা, ছাড়ি। প্রণাম।’

বাড়ি ফিরে বিজয়াকে সব বললে বিজয়া যেন খুব উৎসাহিত হল না। বললে, ‘ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে আমি যেন দূতের কাজ নিয়ে যাচ্ছি। আর সে দৌতোর কী ফল হবে তা যেন ওর কণ্ঠস্বরেই স্পষ্ট হয়ে আছে। মিষ্টিমুখে আমাকে কিরিয়ে দেবে— তাতে ওর এতটুকু অস্ববিধে হবে না। আমি কেন পরের জন্তে নিচু হতে যাব? আমার কী দায় পড়েছে? আমি কেন কুড়োতে যাব প্রত্যাখ্যান?’

‘ই্যা, তা তো ঠিকই।’ হেমন কানের পিঠি চুলকোতে লাগল: ‘যদি সত্যি তোমাকে এক কথায় কিরিয়ে দেয়। সে অপমান তুমি নাও কেন? এটা, এ অবস্থাটা তো ঠিক মাথায় আসে নি।’

স্বামীর অস্বস্তি দেখে হাসল বিজয়া। বললে, ‘তবে এক কাজ করো। ওকে টেলিফোনে জানাও যে আসলে সেন্টু ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। আর আমি যাচ্ছি তার এক্সট হয়ে। তা হলেই পড়বে অস্ববিধেয়। আমি কোনো ভিক্সের আবেদন নিয়ে যাচ্ছি না, একটা গ্লাণ্ডটা অপোগণ্ড শিশু তার আবদার নিয়ে যাচ্ছে। যদি ফেরাবে তো শিশুকে ফেরাবে, আমাকে নয়। তখন আমার তোমার, সারা সংসারে কারুরই কোনো লাগবে না অপমান।’

‘ঠিক, ঠিক বলেছ।’

পরদিন ফের রিসিভার তুলে নিল হেমন: ‘আমি কি শ্রীমতী কাকলির সঙ্গে কথা কইছি?’

‘কে, কাকা?’ খুশি খুশি উজ্জল কণ্ঠে বললে কাকলি, ‘কি, ঠিক চিনতে পেরেছি?’

‘পেয়েছ। শোনো। কাল দুপুরে তোমার কাছে যে তোমার কাকিমা যাচ্ছেন—’

‘হ্যাঁ, ঠিক মনে আছে। একটা থেকে দুটো।’

‘হ্যাঁ, সঙ্গে আরো একজন যাচ্ছেন।’

‘আরো একজন?’ কেমন কৰ্কশ শোনাল কাকলিকে : ‘কে?’

‘আসলে সেই অতিরিক্ত লোকটিই যাচ্ছেন। তোমার কাকিমা যাচ্ছেন তাব সঙ্গী হয়ে।’

‘কে সেই লোক?’ কাকলী আরো কক্ষ হল : ‘নাম বলুন।’

‘নামটাও ছোট্ট। লোকটাও ছোট্ট।’

‘কে? তার পরিচয় নেই?’

‘আছে। সে সেন্টু।’

‘সেন্টু? সেন্টু আসছে?’ প্রথম সংঘাতে উথলে উঠল কাকলি। পরমুহূর্তেই তার স্বর কাঁপতে লাগল, হাতের মুঠোয় কাঁপতে লাগল রিসিভার : ‘সেন্টু আসছে। কেন? ওর আসা কি ঠিক হবে? যদি কাঁদাকাটি করে? যদি—’ নিজেই প্রায় কেঁদে ফেলল কাকলি। ছেড়ে দিল টেলিফোন।

‘এবার বড় অস্থবিশেষ পড়েছে।’ বাড়ি এসে বিজয়াকে বললে হেমেন, ‘সেন্টু যাচ্ছে শুনে অভ্যস্তবিন্দুতে আর স্থির থাকতে পারছে না। কাঁপছে, হয়তো কাঁদছে। হঠাৎ টেলিফোন ছেড়ে দিল।’

‘এবারই ওর পরীক্ষা।’

‘ফল?’

‘ও জানে আর ওর সেন্টু জানে।’

‘একটু তুমিও জানো।’ অর্থপূর্ণভাবে তাকাল হেমেন : ‘পরীক্ষা একটু তোমারও : সেন্টু আর তার কান্নার টানাটানির মধ্যে তুমি একটু পাঁচ কষে কায়দা করে বউটাকে নিয়ে আসতে পারো কিনা বাড়ি। স্বকুর নিরেট কপালটার উপর পারো কিনা ছুঁতে দিতে।’

পরদিন ঠিক একটা বাজার দশ মিনিট আগে হেমেন আফিসের গাড়ি নিয়ে হাজির।

সমস্ত বাড়ি ঘূমে। বিজয়া পা টিপে টিপে বন্দনার ঘরে এল। বন্দনাকে জাগিয়ে বললে, ‘সেন্টুকে সাজিয়ে দাও।’

ঘুমুচ্ছিল সেন্টু, লাফ দিয়ে উঠে বসল। সাজাবে আবার কী! আমি তো আর সেই ছোটটি নেই যে কপালে টিপ আর চোখে কাজল দেবে। না, পাউডারের

দরকার নেই। সত্যিকার পুরুষমানুষ মুখে কখনো পাউডার মাখে না। শুধু চুলটা আঁচড়ে দাঁও আর চাঁও যদি, দাঁও অ্যালবার্ট কেটে। বৃশ শাট আর প্যান্ট পরিয়ে দাঁও, আর পায়ে শূ নয়, হাওয়াই শ্রাওল। শূ নিয়ে কোলে উঠলে কাম্মার শাড়ি নোংরা হয়ে যাবে কিন্তু শ্রাওল থাকলে কোলে উঠতে-উঠতেই পা থেকে খসিয়ে নিচে ফেলে দিতে পারব।

সেন্টু হেঁটেই নেমে যেতে চাচ্ছিল কিন্তু বিজয়া তাকে কোলে তুলে নিল। আন্তে-আন্তে নেমে যেতে যেতে আন্তে-আন্তে বললে, ‘কোনো শব্দ যাতে না হয়, কেউ যেন টের না পায়।’

এ কথা কয়টাও তত ফিসফিস করে বলা হয় নি সেটা মনে করিয়ে দেবার জগে সেন্টু বললে, ‘আরো আন্তে।’

হস্টেলের গেটে এসে হেমন খবর নিয়ে জানল, ই্যা, কাকলি আছে বাড়িতে। কথা দিয়ে কথা না রাখবার কৌশল করে নি। হেমন বললে, ‘তোমরা চলে যাও ভিতরে। আমি ষণ্টা থানেকের মধ্যে ফিরছি গাড়ি নিয়ে।’

টিপিটিপি পায়ে বিজয়া আর সেন্টু কাকলির দরজায় এসে পৌঁছল। আর চৌকাঠটা পেরোবার আগেই চকিতে ছ হাতের বিহ্বল বিস্তারের মধ্যে সেন্টুকে বৃকে তুলে নিল কাকলি। নিবিড় নিপীড়নে কাকলির কাঁধের মধ্যে মুখ লুকোল সেন্টু।

মুখটা কাকলির চোখের কাছে সম্পূর্ণ মেলে ধরবে না কিছুতেই। লজ্জায় মিশে যাচ্ছে মাটির সঙ্গে।

‘আমি কে বলো তো?’

সেন্টু বলতেও লজ্জায় ভেসে যাচ্ছে সেন্টু।

‘আমি কে চিনতে পেরেছ? চেয়ে দেখ না আমার দিকে।’

কথা নেই, শুধু বাহবেষ্টন।

‘এতদিন আসো নি কেন?’

‘তুমি যাচ্ছ না কেন বাড়ি?’ মুখ না ফিরিয়েই ছলছল চোখে জিজ্ঞেস করল সেন্টু।

‘কী করে যাই বলো। দেখছ না পড়ছি, পরীক্ষা দিচ্ছি, ভীষণ কঠিন পরীক্ষা—’

পরীক্ষাটা কী জিনিস আবছা-আবছা বোঝে থানিক সেন্টু। দ্বিদির পরীক্ষাটা যে কী হয়রানি, স্ববীর-জয়ন্তীও কেমন নাজেহাল ঐ উপভ্রবে, তার অজানা নয়।

‘কই, এ কথা তো আমাকে কেউ বলে নি—’ মহসা মুখ ফেরাল সেন্টু। কান্না-কান্না চোখে হাসির সরল নিশ্চিন্ততা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

‘বেশ, এবার তো জানলে !’

‘তবে বলো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে পর যাবে।’

‘বা, যাব বৈকি। নিশ্চয় যাব। তখন আর যেতে বাধা কী! তবে বলো তুমি আর কাদবে না, বাড়িতে অশান্তি করবে না। যা খেলনা দেব তাই নিয়ে খেলবে।’

কোল থেকে নেমে পড়ল সেন্টু : ‘না, তুমি যখন যাবেই তখন আর কাদব কেন? ঠাকুরমাটা বলে তুমি মরে গেছ, তাই তো কাদি। কাকাটা তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে পরে মারে তাই তো অশান্তি করি। নইলে তুমি ঠিক আছ, তুমি ঠিক যাবে, আজ না-হয় কদিন পর, তা হলেই তো আমি হৈ-চৈ করি না। কই, আমার খেলনা কই?’

টেবিলের উপর খেলনার বাক্স, তার দিকে ধাবিত হল সেন্টু।

এতক্ষণে বিজ্ঞাকে প্রণাম করবার সময় পেল কাকলি। প্রণাম করে বিনম্র স্নিগ্ধ মুখে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। কী আদেশ হয় যেন তারই প্রতীক্ষায়।

‘তুমি বললে পরীক্ষার পরে যাবে।’ অন্তরঙ্গের মত গলা নামাল বিজ্ঞা : ‘এখন থেকে-থেকে শুধু কাম্মার পরীক্ষার খোঁজ নেবে। পরীক্ষা শেষ হল কিনা, চলো কাম্মাকে নিয়ে আসি বাড়ি এই বলে নতুন কীর্তন ধরবে।’

‘এখন আপাতত তো ঠেকালাম।’

‘তোমার মতন জাদুকর আর কে আছে। কী ভালোবাসে তোমাকে, এক কথায়ই কেমন বিশ্বাস করে ফেলল।’ বেশ একটু সঙ্গ্রামভাবেই বললে বিজ্ঞা, ‘নইলে কী কাদছিল তোমার জন্তে, কদিন ধরেই কাদছিল। সবাই ভাবছিল ওর কান্না দেখে তুমি স্থির থাকতে পারবে না, ওকে শাস্ত করতেই ওকে বুকে নিয়ে ফিরে আসবে বাড়ি।’

করুণ করে একটু হাসল কাকলি। বললে, ‘একটা অপোগণ্ড শিশুর কান্নাই সমস্ত বিবাদেব নিষ্পত্তি ঘটাবে, সমস্ত সমস্তার সমাধান?’

‘তার আর দরকার হল কই? ছেলেটা তোমাকে দেখে কাদতেই ভুলে গেল। এখন দেখ,’ বিজ্ঞা আবিষ্ট চোখে দেখতে লাগল : ‘সত্যি দেখ, ছেলেটা কেমন খেলা নিয়ে মেতেছে, কেমন হাসছে আপন মনে। কিন্তু,’ বন্ধুর চোখে তাকাল বিজ্ঞা : ‘কিন্তু ছেলেটা হাসলেও বা খেলা নিয়ে ভুলে থাকলেও কি ফিরে যাওয়া যায় না? কিসের বিবাদ, কোথায় সমস্তা!’

‘বলেন কী,’ গম্ভীর হল কাকলি : ‘ব্যাপারটা এত সাংঘাতিক যে আদালতে গিয়ে উঠছে।’

‘তুনেছি। কিন্তু আমি বলি কী, তুমি সব ধুয়ে প্রক্ষালন করে নির্মল করে দিতে পারো না?’ বিজয়ার চোখে মিনতি ঝরতে লাগল: ‘যেমন এক কথায় তুমি সেন্টুকে হাসালে তেমনি আরেকজনকে হাসাতে পারো না?’

‘আরেকজনকে হাসাব?’ নিজেই হেসে উঠল কাকলি। বললে, ‘সেন্টু যেমন আমার কাছে এসেছে, ও পারে না আসতে!’

‘ও না পারুক, কিন্তু তুমি তো পারো। তুমি কাজ-জানা মেয়ে। তুমি অসাধাসাধিকা। আমার মনে হয়,’ ভয়ে-ভয়ে তাকাল বিজয়া: ‘তুমি যদি তোমার ঘরে ফিরে যাও, নিশ্চয়ই ও তোমার কাছে ধরা দেবে।’

‘কোনো গ্যারিটি নেই। বরং সেই গ্যারিটি থাকত যদি ও এখানে এসে আমার কাছে ক্ষমা চাইত। ডাকত ফিরে যেতে। বোঝাপড়া করে নিত।’

‘ও পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে তুমিও ফেল করবে কেন? তুমি সম্মানে উত্তীর্ণ হবে।’ বিজয়া একথানা হাত ধরল কাকলির, কতটা শুকিয়েছে, বালা কেমন ঢিলে হয়েছে তাই দেখল নেড়ে-চেড়ে। বললে, ‘ও যে ক্ষমা চাইতে আসছে না ওর সেই নির্লজ্জতাও তুমি ক্ষমা করবে। ক্ষমার কোনো মাপজোক নেই, দেশ-কাল নেই। ক্ষমা ক্ষমা। নইলে তুমিও জেদ ধরে থাকবে ওও জেদ ধরে থাকবে তা হলে চলে কী করে?’

‘আপনি এ কথা বলছেন?’ স্তম্ভিতের মত চেহারা করে রইল কাকলি: ‘বলছেন, আমি গুটিগুটি ফিরে যাব? এই বিচার আপনার?’

‘বিচার কাকে বলে বুঝি না। বুঝি মীমাংসা।’ আবার ভয়ে-ভয়ে তাকাল বিজয়া: ‘যদি তুমি গেলে শুধু সেন্টু নয়, সমস্ত সংসারে ফের শাস্তি ফিরে আসে’—

‘স্বস্তি বিচার না বোঝেন একটা সামান্য স্বাভাবিক বুদ্ধির পরিচয় তো দেবেন।’ ভিতরে-ভিতরে তপ্ত হয়ে উঠেছে কাকলি: ‘বলি অত্যাচারিত কে—?’

চুপ করে রইল বিজয়া।

‘বলি, কাকে অকারণে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে? জেনে শুনে মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে?’

‘তোমাকে। তুমি অত্যাচারিত।’

‘তবে আপনি আমার পক্ষ নেবেন না? যে অত্যাচারী তার পক্ষ নেবেন?’ কাকলি মুখ প্রায় কঁাদ-কঁাদ করল: ‘যে অত্যাচারী তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলবেন না, আর আমাকে বলবেন ফিরে যেতে?’

‘না। তোমাকে বলি না ফিরে যেতে।’ বিজয়া মাথা উচু করে বললে।

‘বলেন না !’

‘না। আমি এতক্ষণ দেখছিলাম তুমি তোমার প্রতিজ্ঞায় বিনিশ্চল আছ কিনা। নাকি সেক্টুকে দেখে, আমাদের দেখে, বা এতদিন কাউকে না দেখে নরম হয়ে গিয়েছ। তুমি নরম হওনি, হবে না। কোনো অহরোধে-উপরোধে নয়, কোনো কান্নাকাটিতে নয়, নয় বা কোনো বাধা-বিপদে। অত্যাচারীর অপমানের শোধ নেবে, উত্তর দেবে সমুচিত।’

‘বা, আপনি আমার পক্ষে !’ প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল কাকলি।

‘আমি কেন, সকলেই তোমার পক্ষে। কিন্তু একটা কথা। ডিভোর্সের মামলাটা তুমি আনবে কেন?’

কুণ্ঠিত মুখ করে কাকলি বললে, ‘তা এখনো পাকাপাকি ঠিক হয় নি কে বাদী হবে। হু’একদিনের মধ্যেই ঠিক করে দেবে উকিল।’

‘না, তুমি অত্যাচারিত, তুমি কোনো উত্তোগ করবে না।’ পরামর্শ দেবার মত করে বললে বিজয়া, ‘অত্যাচারী স্বামী স্ত্রীকে অকারণে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই উত্তোগ করে বিবাহ ছিন্ন করলে—সমাজ দেখুক স্বামীর স্বেচ্ছাচার। নইলে তুমি যদি মামলা আনো, লোকে বলবে, স্বামী রাগের মাথায় একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল বটে কিন্তু বউটা কী মন্দ, স্বামীকে সংশোধনের একটা পথ দিলে না, নিজেই ইচ্ছে করে বিয়েটা ভেঙে দিলে। স্বামীর সমস্ত দোষ তাহলে ঢাকা পড়ে যাবে। কিন্তু স্বামী যদি মামলা করে তা হলে বিয়ে ভাঙার জন্তে স্ত্রীর আর দুর্নাম রটে না—’

‘দেখি, ভেবে দেখি।’ পরে মুখ টিপে হাসল কাকলি : ‘সমুদ্রের আবার শিশিরে ভয়। কৃষ্ণনামের ভয় আবার দুর্নামে।’

যে ছোটো খেলনা পেয়েছে সেক্টু, ছোটোই পিস্তল। একটা লাল প্লাসটিকের, পিংপং-এর বল তার গুলি। গুলি যেখানেই লাগুক লাফ দিয়ে ফিরে আসে। আর অস্ত্রটা ঠিলের, গুলি হচ্ছে বাণের মত, মাথায় রবারের টুপি। আর এ বাণ, একাধিক বাণ, যেখানে গিয়ে লাগে সেখানে আটকে থাকে।

সেক্টু মহান্ধুর্তিতে বলছে, ‘এ লাল পিস্তলটা ছুঁড়ব কাকার মাথায়, বল মাথায় লেগে সাঁ করে বেরিয়ে যাবে, লুফে নেব। আর এটা ছুঁড়ব ঠাকুমাকে তাক করে, বাণ ঠিক লেগে থাকবে কপালে, আরেকটা ঠিক নাকের ডগায়—’

বাকি খেলনাটা আরো মজার। একটা আস্ত মস্ত জাহাজ। মালবোঝাই, লাল নীল শাদা সবুজ হলদে। এক জাহাজ লেবেনচুয।

গাড়িতে, ফিরে যেতে-যেতে হেয়েন জিজ্ঞেস করলে, ‘কেমন বুঝলে?’

‘সজিন। তার মানে হু দিকেই সজিন খাড়া। জেদ ভর্গস জেদ। আর ঝগড়া তো সূচ্যগ্র ভূমি নিয়ে।’ বিজয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলল : ‘ওও দেবে না, ওও ছাড়বে না।’

আক্ষিমে ফিরে যেতেই বরেনের ফোন পেল কাকলি।

‘কী ঠিক করলেন?’

‘আমি ছেড়ে কথা কইব না। আমিই বাদী হব।’ কাকলি বললে।

‘কিন্তু তার আরেক বিপদ আছে।’

‘আপনি থাকতে বিপদকে ভয় করি নাকি?’ লঘুস্বরে হেসে উঠল কাকলি : ‘আপনি আর কিছুই বারণ না হোন আপনি বিপদবারণ।’

‘হ্যাঁ, তবে সন্ধ্যার দিকে আসবেন আমার বাড়ি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব।’

‘আসব।’

সন্ধ্যার দিকে ঠিক গেল কাকলি।

‘এসেছেন?’ বরেন কণ্ঠস্বরে হাত বাড়িয়ে দিল।

‘এখন তো তবু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসি, যখন-তখন আসি না—’ চোখের কোণে কাকলি হাসল।

‘বসুন।’

কাকলি বসল : ‘নতুন বিপদটা কী?’ চোখে আবার ঝিলিক দিল। যেন বিপদ কিছুই হতে পারে না।

‘না, বিপদ কিছু নয়, তবে আপনি যদি মামলা করেন, যেহি ককক, তাকে গিয়ে আদালতে দাঁড়িয়ে জবানবন্দি করতে হবে।’

‘তার মানে সকলের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে হবে আমার বক্তব্য?’

‘হ্যাঁ, আত্মোপাস্ত ব্যভিচারের কাহিনী— মানে সূকান্তর সঙ্গে বিনতার ব্যাপার। পারবেন?’

‘ওরে বাবা, সেই বানানো গল্প?’

‘সবই বানানো কিন্তু পারবেন বলতে?’

‘না, গলায় বোধ হয় বেধে যাবে।’

‘তারপর আদালত হয়তো যাচাই করবার জন্তে নিজেই কিছু খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করল, পারবেন সামলাতে? কোর্ট ভর্তি লোক, উকিলের দল, সব ব্যভিচারের গন্ধ পেয়েছে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে কণ্ঠস্বরে আনতে পারবেন সারল্যা, আনতে পারবেন স্পষ্টতা?’

‘অসম্ভব।’ সোফার গায়ে পিঠটা ছেড়ে দিল কাকলি।

‘জবানবন্দির ঘোঁষলো কোর্টের মনে যদি একবার সন্দেহ হয় যে কাহিনী বানানো, তা হলেই কোর্ট এককোয়ারি চালাবে, আর যদি সাব্যস্ত হয় আপনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, ফৌজদারিতে আপনার শাস্তি হয়ে যাবে।’

‘কী সর্বনাশ!’

‘হ্যাঁ, তাই বলছি, আপনার রিস্ক নেবার দরকার কী! যা ঝড়ঝাড়া, স্কুর উপর দিয়ে বয়ে যাক। ও সামলাতে হলে সামলাক, ভেঙে পড়তে হলে ভেঙে পড়ুক।’

‘হ্যাঁ, তাই ভালো।’ চিন্তিত মুখে কাকলি বললে, ‘শুধু একটা মিথো আর্জি করা নয়, তার সপক্ষে দাঁড়িয়ে আবার মিথো কথা বলে আসা? পারব না। যাক, আমার গিয়ে দরকার নেই।’

‘সেইটেই ডিসেট, সেইটেই ডিগনিফাইড। আপনি কেন মিথো কাহিনীর স্রষ্টা বলে বক্তা বলে বিবেকের কাছে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী হবেন? আপনি কিছু জানেন না, কিছুতে আপনার স্পৃহা নেই আক্রোশ নেই, আপনি সেই উদার ও উদাসীন ভাব করে থাকুন—’

‘অন্তত, এই ক্ষেত্রে, সেইটেই সোজা।’ সোজাসুজিই হাসল কাকলি: ‘তবে তাই হোক।’ না, বিনতার সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার নেই, ভালো মন্দ সব সে স্পষ্ট দেখে নিয়েছে: ‘আমি বাতী হব না। আপনার বন্ধুই কত সেজে বিয়েটা ছিন্ন করে নিক।’

‘সেইটেই পরিচ্ছন্ন।’ উঠে দাঁড়াল বরেন।

তারপর যখন গাড়ি করে কাকলিকে তার হস্টেলে পৌঁছে দিতে যাবে, তখন সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে হাতে একটা ছোট রক্তগোলাপের দিকে তাকাতে তাকাতে বরেন বললে, ‘তবে দাঁড়াচ্ছে আমিই ব্যভিচারী।’

ঘাড় ফিরিয়ে হাসল কাকলি। বললে, ‘বদান্ত।’

‘বদান্ত, প্রেমে বদান্ত না হলেই বা ব্যভিচারী হয় কী করে?’ উচ্ছ্বসিত হেসে উঠল বরেন আর রক্তগোলাপটা কাকলির চুলের মধ্যে আটকে দিল।

এর ক মাস পরে বাড়িতে একথণ্ড কাগজ নিয়ে এসে স্বকাস্ত খুব হৈ-চৈ শুরু করল। প্রথমেই দেখাল বন্দনাকে: ‘এই দেখ, ডিক্রির নকল নিয়ে এসেছি। ভিত্তোর্গ হয়ে গিয়েছে। ভিত্তোর্গের ডিক্রি।’

বন্দনা কাঁপতে লাগল। প্রশান্তকে ডাকল।

প্রশান্ত পড়ে দেখল, তাই। কী কারণ তা ডিক্রিতে লেখা নেই কিন্তু স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে স্বকাস্ত বহু আর কাকলি মিত্রের মধ্যে যে বিবাহ হয়েছিল তা এতদ্বারা ছিন্ন ও কর্তৃত করা হল।

‘বাচলাম। মুক্ত হলাম।’ মায়ের উজ্জল মুখের দিকে তাকিয়ে স্বচ্ছন্দ হয়ে বললে
স্বকান্ত।

দেখল বিজয়া, দেখল হেমেন। দু-জনেই মাথা নিচু করে রইল।

দেখল ভূপেন। দুবার, আরো একবার পড়ল। রাগে হুংখে অপমানে থরথর করে
কাপতে লাগল।

কতক্ষণ পরে ফেটে পড়ল বোমার মত। স্বকান্তর উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল :
‘বেরো, বেরো তুই আমার বাড়ি থেকে। যা, আলাদা হয়ে যা। সকলের মধ্যে তুই
তবে ঐ পাপমুখ নিয়ে কী করে দাঁড়িয়ে আছিস?’

হেমেন এসে ধরল ভূপেনকে। বললে, ‘সে কী দাদা? ও চলে গেলে, আলাদা
হয়ে গেলে আমাদের এজমালি পরিবার ভেঙে গেল না?’

‘যখন বউমা চলে গেল তখনই তো ভাঙল আমার এজমালির স্বপ্ন।’ ভূপেনের
স্বর অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এল।

‘আহা, বউ একটা পরের বাড়ির মেয়ে।’ বললে মৃণালিনী, ‘সে চলে গেলে
এজমালি পরিবার ভাঙে কী করে? ভাইয়েরা একত্র থাকলেই তো হল।’

‘না, বউয়েরাও একত্র। বউয়েরাই বাড়ির অস্থিমজ্জা।’ ভূপেন স্থলিত পায়ে
এগুল তার চিরস্তন বৈঠকখানার দিকে। বললে, ‘আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে
গেল।’

•৪•

যতদূর সাধ্য শব্দ না করে ঢুকল কাকলি।

‘কে?’ পুরুষভাবে কে হাঁক পাড়ল। আর হাঁক পাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে
এল এক অচেনা মূর্তি : ‘কী চাই?’

‘আমি এ বাড়ির মেয়ে।’

‘কোন ঠিকানা খুঁজছেন?’

ঠিকানা বললে কাকলি।

‘এখানে বাড়ি ছুটো। উপর তলায় বাড়িওলা নিচের তলায় ভাড়াটে। আপনি
কোন তলার মেয়ে?’

‘উপর তলার।’

‘তা হলে সিঁড়িটা ওদিক দিয়ে।’ দেখিয়ে দিল ভদ্রলোক।

অনেক অদলবদল হয়েছে। ভাড়াটে বসেছে নিচে। বাড়িটার আর সেই শ্রী নেই, জলস নেই। ভাড়াটেরা অনেক রকম সব খোপ ও খাঁচা তৈরি করেছে, তুলেছে বেড়া আর পার্টিশনের দেয়াল। ঝুলিয়েছে অনেক তোশক-চাদর। বাড়িটার সম্ভ্রান্ত মুখে দিয়েছে চুনকালি। কী আর করবেন বাবা! আয় নেই, স্বাস্থ্য নেই, ক্ষুধা নেই। বড় ছেলেটা অমাতৃষ। মেয়েটা গৃহান্তরী।

ওপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সিঁড়ির মুখ পেল কাকলি। আস্তে আস্তে নিখাস গুনে-গুনে উঠতে লাগল উপরে।

হব-হব সঙ্কে। রাস্তার আলো জ্বলি-জ্বলি করছে।

সিঁড়িতে প্রথম বাক নিতেই দেখতে পেল কাকলি, ভিতরের বারান্দায় বাবা শুয়ে আছেন ইজিচেয়ারে আর মা চেয়ারে বসে আছেন পাশটিতে। কী যেন একটা পড়ছিলেন মা, দিনের আলো ঝাপসা হয়ে আসতেই থেমে গিয়েছেন। হাতের বইটা কোলের উপরে খসে পড়েছে।

ক্ষণকালের ধূসর পেয়ালায় একটি সোনালী স্তব্ধতা টলটল করছে।

ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল কাকলি।

‘কে?’ গায়ত্রী চমকে উঠল।

‘আমি।’

‘কে আমি?’ চোখে ভালো ঠাहर করতে পারছেন না, প্রায় গর্জালেন বনবিহারী।

‘আমি কাকলি।’

বিষাদের মাঠে যেন একটি প্রশ্রয়ের ছায়া পড়েছে, কাকলি মা-বাবার মাঝখানে মেঝের উপর বসে পড়ল।

যেন ভগ্ন, নত, বিজিত দেখাচ্ছে। পরিত্যক্ত, সর্বক্ষুণ্ণ।

‘কি, কিরে এলি?’ গায়ত্রী কণ্ঠস্বরে মায়ের করুণা ালল।

‘এলাম।’ শাস্ত দৃঢ় স্বরে কাকলি বললে, ‘তোমাদের মেয়ে, বাড়ির মেয়ে হয়ে চলে

এলাম

‘তাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি?’ বনবিহারীর স্বরে একটু বা ঝাঁজ ফুটল।

‘বিয়েটাই নাকচ করে দিয়ে এলাম।’

‘তার মানে?’ ডুক কুঁচকোলেন বনবিহারী : ‘তার মানে এবার ভিক্ষার ?
খোরপোশ?’

‘না, না, সমস্ত বিয়েটাই রদ হয়ে গেল।’ হাতব্যাগটা হাটকাতে লাগল কাকলি : ‘কোট থেকে ডিক্রি হয়েছে ডিভোর্সের।’

‘সত্যি ?’ আনন্দে চোঁচিয়ে উঠল গায়ত্রী : ‘তোমার বিয়েটা নেই ?’

এক মুখ আলো নিয়ে কাকলি বললে, ‘নেই। এই দেখ ডিক্রির সার্টিফিকেট কপি, জাবোদা নকল। এই দেখ কোর্টের সিল, গোলমোহর।’

‘নেই ? নেই ?’ উদ্বেল বাহুতে গায়ত্রী কাকলিকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। যেন ঘোর ক্যান্সার হয়েছিল কিংবা করাল টি-বি—তা আর নেই, কোন অব্যর্থ চিকিৎসায় তা হঠাৎ দূরীভূত হয়েছে। এ যেন কল্পনা-ভাবনার বাইরে। এ প্রায় গন্ধর্বনগর !

‘পড়, পড়ে শোনা ডিক্রি।’ বনবিহারী হুকুম করলেন।

আলো জ্বলে পড়তে লাগল কাকলি।

আর সন্দেহ কি। যে রাত কলঙ্কস্পর্শ ফেলেছিল তা অপসৃত হয়েছে। আবার চাঁদ ঢেলে দিয়েছে লাবণ্য। তার কৌমারকান্তি।

গায়ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে পরিপূর্ণ আলিঙ্গন করল মেয়েকে। বললে, ‘তুই আবার আমায় মেয়ে।’

হাসল কাকলি : ‘তাই বলে তোমার বিধবা মেয়ে নই, সধবা মেয়েও নই। আবার তোমার কুমারী মেয়ে ! আবার সেই কাকলি মিত্র। মিস কাকলি মিত্র।’

‘শরীর কেমন আছে ?’ গায়ত্রী তাকাল পষ্ঠাপষ্ঠি।

‘ভালো আছে, খুব ভালো। হাওয়ার মত ভালো, আলোর মত ভালো—’

‘কী করে রহিত হল বিয়েটা ?’ যেন কোথায় একটা অস্বস্তি বোধ করছেন এমনি তাবের থেকে বললেন বনবিহারী।

‘যে করেই হোক, পাপগ্রহ বিদায় নিয়েছে, এইটেই বড় কথা।’ বললে গায়ত্রী, ‘যেখানে মুক্তি পাওয়া নিয়ে কথা সেখানে ছল-বল-কৌশল কোনো কিছুই আপত্তিকর নয়। মুক্তির পক্ষে সমস্ত শর্তই গ্রাহ্য।’

‘না, না, শর্ত-টর্ত কিছু নেই, একেবারে আকাশের মত ফাঁকা—’ ডানা মেলে-দেওয়া পাখির স্বরে বললে কাকলি।

‘ডিক্রিটা একতরফা দেখছি।’ সন্দ্বিগ্ন স্বরে বললেন বনবিহারী, ‘আর বাদী বা অভিযোক্তা স্বয়ং হুকাস্ত।’

‘উলটোটাও হতে পারত।’ হাসির ঝিলিক দিয়ে কাকলি বললে, ‘এ দু পক্ষে একটা বোঝাপড়া করে শর্তকাট দিয়ে বেরিয়ে আস। মামলার ওই আকারটাই আপোস-মীমাংসার নিরীহতম ভদ্রতম চেহারা।’

‘বিগ্রহ ভেঙে গেলে তাকে আর মেরামত করা নয়—’ সরোবে বললে গায়ত্রী ।

‘অল্প একটু চিড় খেলে না হয় চলে মেরামতি, কিন্তু বিগ্রহ যেখানে ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে—’

‘সেখানে গন্ধায় বিসর্জন ।’ গায়ত্রী লাফিয়ে উঠল : ‘সেখানে আবার নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ।’ জগদ্বল পাথর নেমে গিয়েছে বুক থেকে এমনি স্বরিত লক্ষ্মিমায় শরীরে ঘূর্ণি দিল গায়ত্রী । বললে, ‘এবার আবার কাকলির বিয়ে দেব ।’

গম্ভীর-গম্ভীর মুখে বনবিহারী শুধোলেন, ‘তুমি না কোথায় চাকরি করতে ?’

‘তোমাকে কে বললে ?’ তৃপ্তির ঢেউ তুলল কাকলি ।

‘কেন, দেবনাথ বলেছে ।’ বললে গায়ত্রী । স্বামীকে সংশোধন করলে : ‘করত কী, এখনো করছে । মস্ত বিলিতি আফিস । কত না জানি মাইনে তোর রে খুকি ?’

বিস্মিত হয়ে পাশ ঘেঁষে বসে কাকলি সমস্ত বিশদ করল । আদর করে বাড়িতে খুকি বলছে কি, আফিসে গিয়ে দেখে এসো কী বিক্রম ! আলাদা ঘর, টেবিলের উপর টেলিফোন, কেমন সব হালী আসবাব । লাগোয়া বাথরুম, বেলিন আয়না ব্র্যাকেট—সব ফার্স্ট র‌্যেট । সবাই বলে অম্পরী ।

পত্নী এসে গিয়েছে । সোৎসাহে বললে, ‘চৈচিয়ে-চৈচিয়ে বলে ? শুনিয়ে শুনিয়ে ?’

‘না । পরোক্ষে বলে । শুনতে পাই কানাঘুষো ।’

‘খুব সেজেগুজে যাও বুঝি ?’ স্বপ্নের চোখে বললে পত্নী !

‘নাই বা সাজল-গুজল ।’ ভরাট গলায় গায়ত্রী বললে, ‘খুকি আমার এমনিতেই হৃন্দর । দেবীর মত হৃন্দর ।’

‘সেই অর্থে বলছে না মা ।’ কাকলি হেসে উঠল : ‘রাষ্ট্রভাষায় অফিসারকে বলে অফ্সর । সেই সূত্রে স্ত্রী-অফিসারকে বলে অফ্সারী, মানে অম্পরী ।’

সকলে হেসে উঠল ।

বিজনও পৌঁছে গিয়েছে এতক্ষণে ।

আনন্দের ঢেউ উঠল সর্বত্র । ঘরের মেঝেয়-দেয়ালে, কাঠে-ইটে, আলনায়-

‘দাদা কোথায় ? দাদা ফেরে নি ?’ ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল কাকলি ।

‘পার্ক দেখে এসেছি । এক ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসব ?’ বিজন চঞ্চল হয়ে উঠল । কাকলির দিকে তাকাল : ‘তুমি এসেছ শুনলে একটুও দেরি করবে না, পড়িমরি ছুটবে বাড়ির দিকে । তোমাকে খুব ভালোবাসে ।’

‘আর তুই ভালোবাসিস না?’ ছোট ভাইকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরল কাকলি। লজ্জায় হাসল বিজন।

সত্যি, দিদিকে কী অভূত মিষ্টি লাগছে। কতদিন দেখি নি, যেন ছুলে গিয়েছিলাম। যেন রূপকথার দেশে কোন অঙ্ককার পাথর-গুরীতে বন্দী ছিলেন এতদিন, নিজেই ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়-নদী ডিঙিয়ে বেরিয়ে এসেছেন লোকালয়ে— আর তাঁকে কে ধরে, সটান চলে এসেছেন কলকাতায়।

‘এখানেই তো থাকবি?’ জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

‘বাড়ির মেয়ে কোথায় আবার যাব!’ কাকলি আহুঁরে গলায় বললে, ‘আর কোথায় ফেলবে?’

‘তোমার জিনিসপত্র?’

‘একটা মেয়ে-হস্টেলে আছে যেখানে শেষ কালটায় ছিলাম। কাল ভোরে গিয়ে নিয়ে আসব।’

নিজের আগের ঘরেই জায়গা হল কাকলির। ঘরটা পত্রালি আর বিজন তাদের আলাদা পড়ার জায়গা বলে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল, এখন ছু ভাইবোন সংযুক্ত হাতে জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে দিদির জগ্গে ফাঁকা করতে লাগল। মর-মর রুগ্মী, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছে চাক্ষু হয়ে, তেমনিই তাদের দিদির ফিরে আসা। ইট-পাথর-ভাঙা ভূমিকম্পের দেশে আস্ত খুঁজে পাওয়া। তার জগ্গে কোনো ত্যাগই আজ আর তাদের দুঃসহ নয়।

মার থেকে শাড়ি-ব্লাউজ সাবান-তোয়ালে চেয়ে নিয়ে কাকলি বাথরুমে ঢুকল। টাবে-ড্রামে-বালতিতে কত জল, কী মনোরম ঠাণ্ডা! সম্পূর্ণ দেহ শীতল অবগাহনের জগ্গে আনন্দান করে উঠল। নিবিড় নিঃশেষে বিন্দু-বিন্দু জল ঢেলে-ঢেলে স্নান করবে কাকলি। হস্টেলে রূপণ মেয়েগুলির আস্তানায় না আছে জলের গৌরব, না বা স্নানের ঔদার্য। একটা কালো জলের টলটলে পুকুর পেলে গা ডুবিয়ে স্নান করত কাকলি। জলের নিচে নিজের ছায়া দেখে চলকে-চলকে চমকে-চমকে উঠত। কিংবা যদি পেত একটা নীলচে সমুদ্র। ধারে পারে কেউ কোথাও নেই, তুচ্ছ একটা তৃণশুল্কও নয়, পেত যদি অবোধ নির্জনতা। যার রঙ শাদা, স্পর্শ শান্তির।

ইজিচেয়ারের নিচে চাকা বসানো, বনবিহারীকে তাঁর ঘরে, বিছানায়, ঠেলে-ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে চাকর।

ঘরের কাছে আসতেই, বিছানায় স্থানান্তরিত হবার আগে, বনবিহারী চাকরকে থামতে বললেন। বললেন, ‘আমাকে ধর তো, দেখি আমি উঠে দাঁড়াতে পারি কিনা।’

চাকর বললে, ‘না বাবু, থাক। পারবেন না।’

‘না, পারব।’ বনবিহারী তবু জোর করতে লাগলেন : ‘তুই তোর হাতটা শুধু দে। কাঁধ দিতে হবে না। আমার পা আর এখন দেবনাখ নেই, আমার পা এখন কাকলি হয়ে গিয়েছে।’ প্রায় পাগলের মত, শিশুর মত হেসে উঠলেন বনবিহারী।

উঠি-উঠি করবার হুসহ চেষ্টা করছেন, গায়ত্রী ছুটে এসে ধরে ফেলল স্বামীকে। বললে, ‘না, উঠতে হবে না। উঠতে গেলে বুকে চোট লাগবে। দরকার নেই একজার্ট করে।’

‘তুমি জানো না, আমার কাকলি ফিরে এসেছে, তার মানে আমার শক্তি ফিরে এসেছে, আমার যৌবন ফিরে এসেছে।’ বনবিহারী বলতে লাগলেন উজ্জল চোখে : ‘আমি উঠে দাঁড়াবার সাহস খুঁজে পেয়েছি, পেয়েছি এগিয়ে যাবার উৎসাহ। তুমি বাধা দিও না। দেখি, দেখি না চেষ্টা করে।’

‘না।’ ধমক দিয়ে উঠল গায়ত্রী : ‘এখুনি কোনো দরকার নেই। কাকলি তো এখন বাড়িতেই থাকবে। বাড়িতে থেকেই আকিস করবে। ও যখন আর সঙ্গছাড়া হবে না তখন আর তোমার ভাবনা কী। ও নিশ্চয়ই তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবে। নিয়ে যাবে এগিয়ে।’

স্ববোধ শিশুর মতন চূপ করলেন বনবিহারী। বিছানাটা ইজিচেয়ারের সঙ্গে সমতল, বিছানাতে নিজস্ব কায়দায় উপনীত হলেন। শুয়ে ইঁপাতে লাগলেন, গায়ত্রী শিয়রে বসে কখনো মাথায় কখনো বুকে ধীরে হাত বুলুতে লাগল।

‘কাকলি কোথায়?’

‘জ্ঞান করছে।’

‘কত দিন পরে ওর নামটা উচ্চারণ করছি বলো তো।’ চোখ বুজলেন বনবিহারী : ‘সংসারে আমাদের ছাড়াও কি যেন কী একটা আছে। যার বলে হারানো ধনও আবার ফিরে পাওয়া যায়। আশাতীতও আপনি এসে হেসে দেখা দেয়। জ্ঞান হয়ে গেলে কাকলিকে আমার কাছে এসে বসতে বোলো।’

‘আজ আর নয়।’ গায়ত্রী আবার শাসনের ফণা তুলল : ‘আজ অনেক অনেক কথা বলেছ। আজ আর কোনো আইন-আদালত নয়। কাকলি তো আর পালাচ্ছে না। ধীরে স্বপ্নে সব জেনেগুনো নিলেই তো হবে—’

‘দেখ।’ বনবিহারী এবার নিজে জ্বরী হাতে হাত বুলুতে লাগলেন : ‘একটা কথা কেবলই বুকের মধ্যে খচখচ করছে।’

‘কী?’

‘কাকলিকে দেখেছ ?’

‘বা, দেখলুম বৈকি ।’

‘দেখেছ তার হাতে শাঁখা নেই লোহা নেই, সিঁথিতে সিঁছর-নেই ?’

হেসে উঠল গায়ত্রী । বললে, ‘হুমারী মেয়েরা ওসব পরে নাকি ? তেমন-তেমন জ্বাতের সধবা মেয়েরাও পরে না । যারা প্রগ্রেসিভ তারা তো মনে করে ওসব দাসত্বের চিহ্ন ।’

‘হ্যা, চিহ্ন তো বটেই কিন্তু শ্রী-র চিহ্ন, বলতে পারো, শ্রী-লেখা । যেমন পায়ের আলতা, ঠোঁটের পান, চোখের কাজল, তেমনিই একটি অলংকরণ ।’ যেন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বনবিহারী : ‘কাকলির এ শোভা উঠে গেল ?’

‘উঠে গেল কী !’ গায়ত্রী আবার হাসল : ‘আবার পরবে । আবার সাজবে ।’ তারপর গলায় একটু কাঁজ আনল : ‘ওসব পরা থাকলে ও ফিরে আসত কী করে ? জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল বলেই তো ওকে পারলে তুলে নিতে ।’

‘কথাটা ঠিক । কিন্তু বিয়েটা যখন করেই ছিল,’ শূন্য চোখে বাইরের দিকে তাকালেন বনবিহারী : ‘বিয়েটা ও ভাঙতে গেল কেন ?’

‘যাদের বিয়ে তারা ভেঙেছে । আর যারা ভেঙেছে তারা জানে কেন ভাঙল । এ নিয়ে তোমার-আমার মাথাব্যথা কী !’ বললে উঠল গায়ত্রী : ‘অ্যাকসিডেন্টে জখম হয়েছিল, হাসপাতাল থেকে সারিয়ে স্বস্থ-সবল করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে এতেই আমাদের যথেষ্ট । কেন অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, কোন সূত্রে-প্রচ্ছনে লেগেছিল আঘাত তা জেনে আমাদের কী দরকার ! স্বস্থ-মুক্ত কাকলিকে আমরা পেয়েছি তাইতেই আমাদের সমস্ত ।’

‘হয়তো তাই ।’ তেমনি উদাস ভঙ্গিতেই বললেন বনবিহারী, ‘তবু কেন জানি না প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে মনের মধ্যে । কাকলি হারল কেন ? বিদ্রোহই যখন করেছিল তখন কেন সে বিদ্রোহকে জয়ী করতে পারল না ?’

‘তুমি কী বলছ ? একটা অপদার্থ বিয়েকে খণ্ডে দিয়ে এল এ তার হার ? এ তার জয় । এও তার বিদ্রোহ ।’

‘না, না, ভাঙার বিদ্রোহ নয়, গড়ার বিদ্রোহের কথা বলছিলাম । একটা ভালোবাসা দিয়ে আনন্দ দিয়ে নতুন জীবন নতুন সংসার নির্মাণ করবে প্রতিজ্ঞার এই অলস শিখা নিয়ে সে বেরিয়েছিল অন্ধকারে । সে শিখা সে নিবতে দিল কেন ? কেন ধৈর্যের দেয়ালের আড়ালে প্রতীক্ষার কোর্টারের মধ্যে তাকে রাখল না বাঁচিয়ে ?’

‘সে কথা আদালতে গিয়ে জিজ্ঞেস করো হাকিমকে ।’ বিরক্ত হল গায়ত্রী ।

‘ওর বিয়েতে আমাদের সম্মতি ছিল না, আশীর্বাদ ছিল না—কে জানে, হয়তো বা তারই জন্তে বিয়েটা বেমজবুত ছিল, কিন্তু তাই বলে ও এতদূর যাবে যে বিয়েটা ভেঙে দেবে? কিরকম যেন লাগছে, কিরকম যেন মনটা পুরোপুরি সায় দিতে পারছে না। ও কেন এত অস্থির হল, এত তাড়াতাড়ি করল, কেন আরো সহ্য করল না? সহ্যশক্তিতেই দৃঢ় থেকে কেন বশীভূত করল না বিমুখকে? কেন ছেড়ে দিল? কেন পালিয়ে এল?’

সহ্যশক্তিতে গায়ত্রীও পারল না দৃঢ় থাকতে। বললে, ‘তাই কোর্টে দাঁড়িয়ে বলো না গিয়ে হাকিমকে আপনার এ বিচার অন্তায় হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি ডিক্রি দিলেন কেন? কেন আমার মেয়েকে দিলেন না সহ্যশক্তির শকুন্তলা সাজতে? বলে দেখ কনটেন্সট হয় কিনা—’

বনবিহারী চূপ করে রইলেন।

‘কোর্টে না যাও, পার্লামেন্টে যাও। সেখানে গিয়ে এ আইন বাতিল করাও। যতক্ষণ আইন আছে ততক্ষণ তার খেলা আছে। ততক্ষণ পীড়িতেরা নেবেই তার প্রতিকার। তেমনি কাকলিও বেআইনী কিছু করে নি। যা আইনে স্বসিদ্ধ তার তুমি বিরুদ্ধতা করতে পারো না।’

‘না, তা পারি না।’ তবু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বনবিহারী।

‘তা ছাড়া কার কিসে অসহ্য কার কোথায় অপমান, তুমি-আমি বুঝব কী করে? ওদের নিক্তি আর আমাদের নিক্তি কি এক হবে? সাপে যাকে না কেটেছে সে কী করে বুঝবে কেমন সে দংশন?’

‘তবু—’

‘রাখো।’ এবার স্পষ্ট ধমক দিয়ে উঠল গায়ত্রী: ‘তুমি কাকলিকে দেখছ, আর ও পক্ষ—ও পক্ষ কে দেখছে? ও পক্ষ কী দুঃসহ কালকূট তার তুমি কী জানো! সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল বলেই ও রাজি হয়েছিল বিচ্ছেদে। কী না জানি ও বলছিল, আপোস-স্বীমাংসায়। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের রিসার্চের কী দরকার? মুখোমুখি কলিশনে মোটর গাড়ি যদি পুড়ে শেষ হয়ে যায় তার আর কী করা যাবে। আরোহী যদি বেঁচে থাকে তা হলেই যথেষ্ট। কার দোষে কলিশন হল, এ পক্ষের না ও পক্ষের, এ গবেষণা বুঝা। যদি সংগতি থাকে আবার কিনে নেবে মোটর গাড়ি।’

‘কিন্তু ভুলে যাচ্ছ কেন কাকলি ভালোবেসেছিল—’

‘থাক। সব চোখের অঙ্গন। উপরের ঝকমক।’

‘তাই কি মনে হয়েছিল তখন ?’ বিহ্বল চোখে তাকালেন বনবিহারী ।

‘নাই বা মনে হল ! তার আর কী হবে ? যদি কেউ ভুল করে, তার আর সংশোধন হবে না ? লাল টুকটুকে আম দেখে কেউ যদি তা পাড়ে হাত বাড়িয়ে, দোষ দেব না । কিন্তু খেতে গিয়ে দেখে আমার মধ্যে পোকা তা হলে তাকে পোকা স্বাক্ষর খেতে বলব ? অসম্ভব । বলব গোটা আমটাই ছুঁড়ে ফেলে দে । ঢের আম আছে গাছে ।’

‘উপমা দিয়ে কথা বোলো না । উপমা ভারি বিচ্ছিরি ।’ কষ্ট মুখে বললেন বনবিহারী, ‘সোজা কথা সোজা করে বোলো ।’

‘বুঝেছি, তোমার মধ্যে রয়েছে এখনো কুসংস্কার । একটা হিন্দু বিয়ে ভেঙে গেছে, হার ফলে ছ পক্ষই এখন স্বাধীন, স্বতন্ত্র, এ তুমি মেনে নিতে পারছ না । কিন্তু আধুনিক যুগের মেয়েরা কেন মানবে এই দীনতা ? আইন যখন অধিকার দিয়েছে তখন যোগ্য ক্ষেত্রে কেন ছিন্ন করবে না সেই দাসত্ব ?’

‘কিন্তু ভালোবাসা—’

‘ভালোবাসা সব কথার ফুলঝুরি । আর ভালোবাসা হতে গেলেই তাকে চিরস্থায়ী, জীবনস্থায়ী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই । ছ দিনের ভালোবাসাই বা ভালোবাসা নয় কেন ?’ গায়ত্রী উঠে পড়ল : ‘ভালোবাসা চলে গেলে জীবনের বাকি কটা দিনও কি মুছে দিতে হবে ? নাকি বাকি কটা দিন বাঁচিয়ে রেখে জীবনকে উজ্জ্বল করতে হবে আরেক ভালোবাসায়, আরেক প্রতিশ্রুতিতে ?’

বনবিহারী ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিতে বললেন ।

গায়ত্রী বললে, ‘তুমি এখন খাবে না ?’

‘আরেকটু পরে খাব ।’

আলোটা নিবিয়ে দিল গায়ত্রী । ঘর অন্ধকার করে দিল ।

স্নান সেরে নিজের ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল কাকলি । ফাঁকা ঘরে নিচু পায়ার একটা খাট টেনে এনে ছু ভাইবোনে দিদির জন্তে দিবিয়া বিছানা করে রেখেছে । একটা লেখবার টেবিল, টিপাই আর গোটা দুই চেয়ার ছাড়া বাড়তি জিনিস আর কিছু রাখে নি । সব এ ঘর ও ঘর চালান করে দিয়েছে ।

পত্রালি বললে, ‘কেমন হল ?’

ঘরময় হাসতে হাসতে ঘুরতে লাগল কাকলি । এ জানলা থেকে ও জানলা । দেখতে লাগল কেমন দেখায় বাইরেটা । সব আগের মত, না বদলেছে ?

সব আগের মত ।

কিছু বদলায় নি। একটি কণামাত্র না। সেই আলো-আলো অন্ধকার; দূর-দূর
মাছুষের নৈকট্য, চিনি-না-চিনি পথের হাতছানি।

‘কাল সকালেই তোমার জগ্গে ফুল নিয়ে আসব দিদি।’ বিজ্ঞন বললে।

একা-একা ছাদে চলে এল কাকলি। সেই অগাধ অশ্রোত আকাশ। সেই
গোপন-গাঢ় নির্জনতা। বলিষ্ঠ উপস্থিতির মত সেই বিশ্বামভরা কদম গাছ।

গাছের কাছটিতে রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল কাকলি। একাধিক ডাল চলে
এসেছে এদিকে। কটা পাতা ছুঁল আদর করে। সমস্ত গা সিরসির করে উঠল।

একটু অগ্ন্যম্বনা হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। হঠাৎ কাকলির মনে হল কে যেন
আরো একজন ছাদে উঠে এসেছে নিঃশব্দে। ঠিক বুঝি দাঁড়িয়েছে তার গা ঘেঁষে।
ঘাড়ের উপরে নিশ্বাস ফেলেছে। কাকলি চমকে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল
এদিক ওদিক। না, কেউ না। পথ-না-পাওয়া এক বলক হাওয়া আপন খুশিতে
ঘুরপাক খাচ্ছে।

সে রাতে একা-একা অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি কাকলির। বিছানায় না থাকলেও
ঘরে কেউ নেই এমন অব্যাহতির ভাবটা আর ছিল না। গা ভরা এত পবিত্রতাও
যেন পীড়ার মত। যদি অন্তত সেন্টুটাকেও নিয়ে আসা যেত বুকের উপর। যদি
অন্তত তার নখর উপস্থিতিটাও থাকত গায়ের কাছে।

সকালেই কাকলি চলে গেল হস্টেলে— বাস্ক আর বিছানা যা ছিল আর টুকিটাকি
যা জিনিস— ট্যাঙ্কি করে বাড়ি নিয়ে এল।

আর বিকেলেই দেখা দিল বরেন।

উপরে নিয়ে আসতে আসতে সিঁড়িতেই কাকলি বললে, ‘কই, দুপুরে আঁকি’
ফোন করেন নি তো?’

‘ফোন করার আর কী দরকার!’ দূঢ়, শব্দ, অভ্রান্ত পায়ে উঠতে লাগল বরেন
বললে, ‘ভাবেন নি যে বিকেলে আসব?’

‘সারাক্ষণই ভাবছি।’ উঠতে-উঠতে কাকলি বললে, ‘তবু ফোনে কথা বলতে
বেশ ভালো লাগে। বেশ একটু অগ্ন্যরকম লাগে।’

‘সেই অগ্ন্যরকম কথা অগ্ন্যরকম করে মুখোমুখি বলা যাবে এখন।’ হাসল বরেন।
আর কাকলির ঘরের মধ্যে আসতেই বললে, ‘বাটারওয়ার্থকে বলুন আপনাকে
বাড়িতেও একটা ফোন দেবে।’

‘এই তো সবে বাড়ি পেলুম!’

‘না, বাড়িও ঠিক বলতে পারেন না। বাড়ি পশ্চাতে আছে।’

‘এটা তবে কী?’

‘এটা ধর্মশালা।’

‘তবে পশ্চাতে যেটা আছে সেটা অধর্মশালা?’ কাকলি চোখ নামাল।

দু-জনে হেসে উঠল একসঙ্গে।

‘চলুন বাবা-মার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।’

বনবিহারী আর গায়ত্রী একসঙ্গেই আছেন।

‘এই আমার মা-বাবা। আর ইনি ধীরেন অ্যাণ্ড সন্সের বরেনবাবু—’

গায়ত্রী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর চিরদিনের যা স্বভাব, সন্দ্বিগ্ন চক্ষে তাকালেন বনবিহারী।

নিজেই চেয়ার টেনে বসল বরেন। আর মুহূর্তে নিরবল হল। অনেক কথার মধ্যে তিনটি আশ্বাস সে উচু করে ধরল। বনবিহারীর চিকিৎসার আরো ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্ছেদ করতে হবে নিচের ভাড়াটেকে। আর দেবনাথকে শতর্ক শাসন-চক্ষুর নিচে দিতে হবে একটা স্থায়ী চাকরি।

‘সে কী? আপনি এখনো তৈরি হন নি?’ স্বরিত চোখে বরেন তাকাল কাকলির দিকে : ‘বাইরে বেরোবেন না?’

‘এই যে আসছি। দু মিনিট।’

‘আচ্ছা আরো দু মিনিট গ্রেস মার্ক দিচ্ছি।’ হাতঘড়ির দিকে তাকাল বরেন। হেসে বললে, ‘কাড়াকাড়ি করে তাড়াতাড়িতে দরকার নেই। ধীরে হচ্ছেই তৈরি হোন।’

ঠিক এমনটিই হবে এই যেন মুখস্থ বনবিহারীর। পারবে না, রোধ করতে পারবে না। কোনো দিনই কেউ পারে নি। শুধু এমনটিই হবে বলে তাকিয়ে রয়েছে।

দু-জনে, বরেন আর কাকলি, বেরিয়ে গেল একসঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল পাশাপাশি।

নামতে-নামতে কাকলি বললে, ‘আপনি যে বদান্ধতার হরিহরছত্র খুলে দিয়েছেন।’

কানের কাছে মুখ এনে বরেন বললে, ‘তোমাকে যদি পাই, ভাগ্যের এই বদান্ধতাকে কী বলবে?’

‘কিন্তু দীপঙ্করের মামলার কী হল?’ একটু অন্তমনস্ক করবার চেষ্টা করল বুঝি কাকলি।

‘বলছি। চলো। গুঠো গাড়িতে।’

গাড়িতে উঠে এ দরজা থেকে ও দরজার দিকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে সরে যেতে-যেতে কাকলি বললে, ‘তারপর?’

সব দেশের নিয়মেই গাড়িতে মেয়েরা আগে ওঠে। কাকলিও উঠল। উঠেই, রাস্তার ধারের, কাছের দরজা ঘেঁষে বসল। সেই ক্ষেত্রে বরেনের উচিত ছিল গাড়িটা অতিক্রম করে বিপরীত দিকের দরজা খুলে ভিতরে ঢোকা। কিন্তু বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে সে প্রস্তুত নয়। সে কাকলির দরজার পাশে এসেই দাঁড়াল আর কাকলিকে পরোক্ষ ইঙ্গিত করল ওপাশে সরে যেতে।

যেন একটা প্রোগ্রাইটরি ভাব। শুধু সান্নিধ্যের প্রবলতায় সম্মত করানো।

ওরকমভাবে দাঁড়ালে সরে যাওয়াটাই ভদ্রতা। কাকলি ও দরজার দিকে সরে যেতে লাগল।

ওরকমভাবে সরে যাওয়া কী কঠিন!

আর কী সুন্দর!

বরেন উঠতেই গাড়িতে স্টার্ট দিল।

আর আগের কথার জের টানবার স্বরে কাকলি জিজ্ঞেস করল, ‘তারপর?’

‘ও প্রশ্নটা তো আমি করব।’ কাকলির জান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বেমালুম টেনে নিল বরেন। স্পর্শের মধ্যে আলস্য ঢেলে দেবার চেষ্টায় মুহূর্তে বললে, ‘তত: কিম?’

একেই বুঝি বলে গায়ের জোর। মনে-মুখে একসঙ্গে হাসল কাকলি। বললে, ‘এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন।’

কাকলির হঠাৎ মনে পড়ে গেল আরেকজনকেও এ প্রশ্ন সে করেছিল একদিন। পারে নি উত্তর দিতে। কেউ পারে না। উত্তর হয় না এ প্রশ্নের। দিন থেকে দিনে, বছর থেকে বছরে, জীবন থেকে জীবনে মাহুঘ শুধু উত্তরই খুঁজে খুঁজে কিরেছে।

‘না, না, খুব সোজা উত্তর।’

‘সোজা?’ চাউনিতে ভয়-ভয় চমক আনল কাকলি।

একেবারে ভাল-ভাতের মত।’

‘যথা ?’

‘উত্তর—উত্তর হচ্ছে, তিন মাস।’

‘তিন মাস ?’

‘হ্যাঁ, বড় জোর তিন মাস। তিন মাসের কমও হতে পারে যদি ইচ্ছে করেন।’

‘কিছু বুঝতে পারছি না।’ ভাষাচাকা-খাওয়ার মত মুখে তাকিয়ে রইল কাকলি।

‘আপনি এত কম বোঝেন।’ কাকলির হাতটা নিজের হাতের মধ্যে বার কয়েক নুকল বরেন : ‘তিন মাস মানে আপিলের টাইম। একটা ডিক্রি যখন হয়েছে তখন তার বিরুদ্ধে আপিলের ব্যবস্থা আছে। আর সেই আপিল করতে হলে তিন মাসের মধ্যে করতে হবে।’

‘আপিল করতে হলে তো আমি করব।’ কাকলি যেন বুঝতে পারছে ব্যাপারটা।

‘হ্যাঁ, ডিক্রি যখন আপনার বিরুদ্ধে তখন আপনিই আপিলের হকদার। স্বকান্ত তো মায়ালা জিতেছে, সে আপিল করবে কেন ?’

‘আমিই বা আপিল করব কেন ? আমিও তো জিতেছি।’ হেসে উঠল কাকলি।

‘তবে দেখছেন তিন মাসও অপেক্ষা করতে হবে না।’ নড়ে-চড়ে বসল বরেন : ‘আইন বলছে আপিলের সময়টা চলে গেলেই আগের স্বামী ও স্ত্রী তাদের ইচ্ছেমত অগ্রজ বিয়ে করতে পারবে। স্বতরাং ডিক্রির তিন মাস পরেই আপনি আবার বিয়ের লায়ক হবেন। আর এ ক্ষেত্রে আপনি যখন আপিল করছেন না, আপনার আপিল করবার কথা যখন উঠছেই না, তখন তিন মাস অপেক্ষা না করলেও চণ্ডী অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।’

‘আবার বিয়ে করতে হবে !’ করুণ-করুণ মুখ করল কাকলি।

‘নইলে এই সোনার জমি পতিত পড়ে থাকবে ?’

‘কিন্তু আবাদ করবে কে ?’ হাত যেন এবার নিজের ইচ্ছেয় নিবিড় ছেড়ে দিল কাকলি।

যেন এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই। থাকতে পারে না। যেন কৃষক অবধারিত। পূর্বনির্দিষ্ট। তেমনি দৃঢ় স্পষ্ট ভক্তি করল বরেন। বললে, ‘তা তুমি জানো।’

‘আর আপনি জানেন না।’ খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি। পুরমুহুর্তেই আবার আবদেয়ে সুরে বললে, ‘এত তাড়াতাড়ি !’

‘তাড়াতাড়িই তো স্বন্দর।’ চাঞ্চল্যের শিহর তুলল বরেন : ‘আসরে নেমেই গান শুরু করে দেওয়া উচিত। নইলে রক্তমাঞ্চে উঠে বসে তবলায় হাতুড়ি ঠোকা বা সেতারের কান মলা অসহ্য, অসহ্য—’

‘কিন্তু তার আগে দীপঙ্করের একটা ব্যবস্থা হবে তো !’

‘হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি।’

‘কার কথা ? আমার কথা ?’

‘তোমার কথা বাবার সম্মতি বা অসম্মতি কোনো কিছুই আপেক্ষা রাখে না। তুমি কোম্পানির বিষয় নও, তুমি আমার একলার ব্যাপার। আমি মধ্যবিস্তৃত মাছি নই,’ কথার স্বরে প্রচ্ছন্ন ঘৃণার খোঁচা দিল বরেন : ‘যে আমার একটা পৈতৃক এজমালি চাক লাগবে—অনেক ফোকরের মধ্যে একটা ফোকর। আমি—আমি—’ একটা জুতসই কথা খুঁজতে লাগল।

‘আপনি কস্তুরী মৃগ।’ মিষ্টি করে বললে কাকলি, ‘আপনি একলা।’

‘হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।’ বরেন উৎসাহিত হয়ে উঠল : ‘কিন্তু আমি জানি কোথায় আমার স্বর্গস্বের উৎস।’

‘কোথায় ?’ দুঃসাহসীর মত জিজ্ঞেস করল কাকলি।

কাকলির আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে নিজের আঙুলগুলি চুকিয়ে দিয়ে বরেন বললে, ‘আমার নাভিকুণ্ডে।’

‘তা হলে কার কথা বলছিলেন বাবার সঙ্গে ?’ কথাটাকে সহসা নিস্তেজ করে দিতে চাইল কাকলি।

‘দীপঙ্করের কথা।’

‘কী ঠিক হল ?’

‘ঠিক হল মামলা ডিফেন্ড করে বিশেষ ফল হবে না।’

‘হবে না ?’

‘প্রথমে ভেবেছিলাম মামলাটা লং-ড্রন করতে পারলে ও হেদিয়ে পড়বে। ছেড়ে দেবে মামলা। এক ফাঁকে খারিজ করিয়ে নিতে পারব। কিন্তু ও ভীষণ ছ’শিয়ার। কচ্ছপের কামড়ের মতই ও নাছোড়।’

‘তা চালাক না মামলা।’ আঙুলগুলি আন্তে-আন্তে মুক্ত করে নিল কাকলি : ‘ডিফেন্ড করবেন না কেন ?’

‘এখন দেখতে পাচ্ছি ওকে ডিসমিস করার মধ্যে টেকনিক্যাল একটা ঝ ছিল। যা ওর টার্ম অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তাতে ও নাকি নোটিশ পেতে হকদার। ওকে বিনা নোটিশে তাড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক হয় নি। মামলা তাই লড়ব না ঠিক করেছে।’

‘লড়বেন না ?’ আনন্দটা গোপন করে রাখতে পারছে না কাকলি।

‘না। টেকনিক্যাল ঙ্ক নিয়ে এতদিন ধরে একটা মামলার মুখোমুখি হয়ে থাকারটাও ভালো নয়। ফার্মের প্রেক্ষিজে খুলো লাগবার সম্ভাবনা। কিন্তু আমি একটা কথা ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি—’

‘কী কথা?’

‘ও এতদিন ধরে টিঁকে থাকল কী করে? কী করে টিঁকিয়ে রাখতে পারল মামলা?’ বরেনের হাতের মধ্যে কাকলির বালাটা এসে ঠেকল : ‘আগে জানতাম যার লেঙ্ক্ অফ পার্স মামলায় তারই জিত। কিন্তু পার্স লম্বা করেও ওকে দাবানো গেল না। ও কোথেকে যে পেল এত রেস্ক কেক জানে।’

‘লড়বেন না তো কী হবে?’ হাতের বালাটাও আলগোছে সরিয়ে নিল কাকলি।

‘মামলা মিটিয়ে নেব।’

‘সর্বত্রই মামলা মিটানো।’ ক্ষীণকণ্ঠে একটু হাসল কাকলি।

‘তোমাদের মামলায় তোমরা দু পক্ষই জিতলে। একটা অবাস্তিত বন্ধন থেকে কামা ত্রাণ দু-জনেই পেয়ে গেলে। কিন্তু আমাদের এ মামলায় শুধু এক পক্ষই জিতবে। আর সে পক্ষ দীপঙ্কর।’

‘জিতবে?’

‘হ্যাঁ, ও আবার ওর পুরোনো চাকরি ফিরে পাবে।’

‘পাবে? সত্যি?’ উল্লাসের নিলজ্জতাটা কিছুতেই লুকোতে পাচ্ছে না কাকলি।

‘আমরা তো অকার করব, ও এখন নেবে কিনা ও জানে—’ একটু বা গম্ভীর শোনাল বরেনকে!

‘বা, নেবে না কী! মামলা করলই চাকরির জন্তে। তারপর মামলার নিষ্পত্তি হচ্ছে আপোসে। আপোসের শর্তই হচ্ছে চাকরিতে পুনর্বহাল—’ একটু বুঝি বা হেলে এল কাকলি : ‘কিন্তু ওর মাইনেটা কিছু বাড়বে তো?’

‘না, না, মাইনে বাড়বে কী!’ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল বরেন : ‘মাইনে বাড়ার দাবি তো নেই ওর আর্জিতে।’

‘বা, ওটা মামলার বিষয় হয় কী করে? ওটা মামলার বাইরের কথা। ওটা বৈধের বাইরে উদ্ভৃন্তের কথা।’ কালো চোখে বিলিক দিল কাকলি।

‘না, না, এ ক মাসের সমস্ত ব্যাক পে ও পাচ্ছে, এর উপর আবার উদ্ভৃন্ত কী!’ রাগ-রাগ মুখ করল বরেন।

‘কিন্তু দিলেনই না হয় সামান্য একটু মাইনে বাড়িয়ে—’

এবার কাকলির আবদারে যেন নতুন এক ঘনিষ্ঠতার তাপ ফুটল।

‘ওর মাইনে বাড়লে তুমি বুঝি খুশি হও ?’

‘আমরা সকলেই তো বাড়িয়ে নিলাম। ওর যেটুকু সাধ্য ওও নিক না একটু বাড়িয়ে।’ মুহু লাস্তে হাসল কাকলি।

‘বা, আমার বাড়ল কোথায় ?’

‘সত্যি বলছেন ? বাড়ে নি ? এই যে আমি আপনার পাশে, এটা কি আপনার বাড়তি নয় ?’

‘জীবিকার নয় জীবনের বাড়তি।’ হাতের খাবাটা অনেক বড় করে বরেন ধরল আবার কাকলির হাত। বললে, ‘কত দিন থেকে খুঁজছি আমার সহচরীকে। নর্মের সহচরীকে হয়তো পাওয়া যায় কিন্তু মর্মের সহচরীই দুর্লভ—’

‘তুই নর্মরই বুঝি আমি, নর্ম আর মর্ম দুটোই। কী বলেন ?’ লঘু করে দিতে চাইল কাকলি।

‘আর কেউ-কেউ এসেছে আমার জীবনে। বলে, অক্ষত, অনাজাত। বলে, পবিত্রতায় উজ্জল—’

‘সব ধর্ম-সহচরী !’

‘বিশ্বাদ, বিশ্বাদ—জোলো, ফিকে, সেকেলে। বাবা-মার মত নিয়ে লাভার-খোঁজা মেয়ে। মেয়ে কি উজ্জল পবিত্রতায় ? মেয়ে উজ্জল ব্যক্তিত্বে। তার রূপ শিষ্টতায় নয়, বিশিষ্টতায়। তুমি আমার সেই বিশেষ—’

‘তবে দেখুন কতখানি বাড়িয়ে দিয়েছি। শেষের চেয়েও বেশি—বিশেষ !’

‘হ্যাঁ, তোমার মাঝে ঐ যে খুঁত ওইটিই তো ব্যঞ্জনের মূন। সমস্ত আহাৰ্য্যকে যে স্থান্য করেছে। তারপর সাধন করে পেয়েছি তোমাকে। আর আকাজ্জ্বার মূলা কিসে ? শুধু সাধ করায় নয় সাধন করায়—’

‘সাধন করেছেন ?’ অবিশ্বাসের স্বর কোটাল কাকলি।

‘করি নি ? কী সুন্দর মামলা সাজিয়েছি ! কী নিপুণ কাক্কাৰ্য্য করেছি ! বাধা সরিয়েছি। বি-শৃঙ্খল করেছি। যাতে ছিনিয়ে নিতে পারি তোমাকে। কিংবা বলতে পারো, লুকে নিতে পারি। ক্রিকেট খেলা দেখেছ ? ফাস্ট বলে ব্যাটসম্যান কেমন অজানতে খোঁচা মেয়ে বসে আর স্লিপের লোক কেমন সাঁ করে ভীম ক্যাচ লুকে নেয়—সেই লোকাটাও একটা সাধনার জিনিস, ওয়ার্ক অফ আর্ট—’

‘নিশ্চয়ই। এক শো বার। তবেই দেখুন বল হুয়ে আপনার খাবার মধ্যে পড়ে, জমে গিয়ে, কেমন বাড়িয়ে দিলুম আপনাকে। নইলে শাদামাঠা একটা মেয়ে হুড়িয়ে নিলে আপনার জেন্সজলস কিছুই বাড়ত না।’ কটাকট একটু বিলোল করল কাকলি।

‘বাড়ত না ।’ স্বীকার করল বরেন : ‘আসল স্ত্রুত হচ্ছে কাঁজে । ইয়া, কাঁজে তুমিই আমার সেই কাঁজ । স্ত্রুতরাং, নিশ্চয়ই, বেড়েছে আমার মাইনে অনেক, অনেক বেড়েছে কিন্তু তোমার— তোমার বাড়ল কিসে ?’

‘সংখ্যায় ।’

‘সংখ্যায় ?’

‘ইয়া, সেই একই হিসেবে । আমি যেমন আপনার দুই নম্বর তেমনি আপনিও আমার দুই নম্বর ।’

ভাসা ভাসা বুঝলেও গলা ছেড়ে হেসে উঠল বরেন ।

‘আমি একে-একে দুই, মানে নর্ম-নর্ম দুই, আর আপনি একের পরে দুই ।’ স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে দিল কাকলি । শাস্তি দিল বরেনকে ।

হাত ছেড়ে দিয়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল বরেন । বললে, ‘যদি অল্পমতি দাও তো একটা সিগারেট খাই ।’

‘স্বচ্ছন্দে ।’ সানন্দে সায় দিল কাকলি । বরং মুখে একটা বাস্তব আগুন থাকাই ভালো । ঐ আগুনটাই নিশ্চিত ।

‘তুমি আমাকে শাস্তি দিলে ।’ একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন ।

‘আর আপনি আমাকে দিলেন মর্যাদা, প্রতিষ্ঠা । কেমন সব তাই মাইনে বাড়িয়ে, নিলুম আমরা । এর মধ্যে শুধু একজন—’

‘তুমি দীপঙ্করের কথা ভাবছ ?’

‘নইলে আর কার কথা ভাবব ?’

‘গোড়াতে ও আগের চাকরি ধরুক, এরিয়র-পে নিক, পরে এক ফাঁকে কিছু না হয় বাড়িয়ে দেব এলাউয়েন্স—’

‘বা, তাতেই হল । ওও ফিরে পেল ওর মর্যাদা ।’

কতক্ষণ কাটল চুপচাপ ।

‘বৃষ্টি হচ্ছে ।’ কাকলি বললে, ‘কোথায় যাচ্ছি আমরা ?’

নিজের দিকের জানালাটা তুলে দিতে-দিতে বরেন বললে, ‘লেকস্-এ ।’

‘লেক সুনলেই কেমন যেন খারাপ-খারাপ মনে হয় । মানে, এই আর কি, জল তো, তাই জোলো-জোলো মনে হয় ।’

‘কিন্তু যদি বাড়লা করে বন্ধি ? যদি সরোবর বলি ?’

‘সেটা আরো খারাপ । মানে, হে বর, তুমি সরো, এ জায়গা বর্বরের জন্তে ।’

‘আমি বর্বর ?’

‘দুই নম্বরের হলে তাকে আর কি বলে?’ খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি।
বরেনও হাসল। বললে, ‘আমাকে নিশ্চিত্ত করলে।’

আবার কার্টল একটু চূপচাপ।

‘তুমি ভিজ়ে যাচ্ছ যে। কাঁচটা তুলে দাও।’ বরেন একটু বা জোর মেশাল
অল্পরোধে।

‘বৃষ্টি দেখতে বেশ ভালো লাগছে।’

‘তাই বলে অস্থখ করবে নাকি?’

‘আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়? এই সেই লেক্স।’ কাকলি
ছেলেমানুষের মত উচ্ছল হয়ে উঠল : ‘আস্থন না, চলুন না আমরা ভিজ়ি। জলের
একেবারে কাছে গিয়ে জলের উপরে জল পড়ার শব্দ শুনি।’

‘ভিজ়বে?’

‘হ্যাঁ, দেখুন ঐ কতগুলি লোক গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। আশ্রয় নিলে কী
হবে, তবু ভিজ়ছে, কিন্তু রূপণের মত ভিজ়ছে। ঐরকম করে ভেজা নয়। একেবারে
কাঁকা ঘাসের উপর খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভেজা। চলুন, নামি, ভিজ়ি
দু-জনে—’

‘মাথা খারাপ!’ হাত ধরে বাধা দিল বরেন। আর প্রায় গায়ের জোরেই
কাকলির দিকের জানলাটা তুলে দিল। বললে, ‘বৃষ্টি কিরকম জোর এসে গেল।
রাস্তা থেকে লোক ঝেঁটিয়ে দূর করে দিল নিমেষে। বরং জনশূন্য রাস্তায় বৃষ্টিতে গাড়ি
ছুটিয়ে যাওয়াতেই তো বেশি স্থখ—’

‘হ্যাঁ, নীরঞ্জন সাহসে পিচ্ছিল পথে দুর্ধর্ষ এগিয়ে যাওয়া— স্থখ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু,’
কাকলির স্বরে একটু গুণ্ডাস্ত্রের ছোঁয়া লাগল : ‘এত রাজ্যের লোক হঠাৎ কোথায়
উঠে গেল বলুন তো?’

‘কোথায় আর যাবে? এই দেখ না সবাই সাময়িক আশ্রয়ের আশায় এখানে-
ওখানে ভিড় করেছে। ঐ গাড়ি-বারান্দার নিচে, দোকানে, সিনেমায় লবিতে—’

‘চলুন না আমরাও অমনি গিয়ে দাঁড়াই।’

‘শুধু-শুধু? গাড়িটা ছেড়ে-দিয়ে?’

‘হ্যাঁ, গাড়িটাও তো সাময়িক আশ্রয় ছাড়া কিছু নয়। চলুন না ঐ সিনেমায়
লবিতে গিয়ে আমরা দাঁড়াই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবি, আমাদের বাড়ি নেই গাড়ি
নেই, বাড়ি ফেরবার রাস্তা নেই, কতক্ষণে বৃষ্টি থরবে তাও আমরা জানি না—’

‘তুমি কী ছেলেমানুষ!’

‘যাক, তবু মর্বিড বলেন নি।’ জানলার কাঁচ আবার আখখানা নামিয়ে দিল কাকলি।

‘সে কি’, অবাধ্যপনায় একটু বা বিরক্ত হল বরেন : ‘আরো ভিজলে নির্ধাত অস্থ করবে।’

‘খুব জর হয়ে বিছানা নিতে ইচ্ছে করে একেক সময়—’

‘এবার কিন্তু মর্বিড বলব।’

‘ছেলেমানুষ বলবেন না?’ মিষ্টি করে হাসল কাকলি। বললে, ‘সমস্ত গা ভরে স্ততীত্র একটা আকাঙ্ক্ষার মত জর মন্দ লাগে না কিন্তু। কত দিন ভারি হাতে অস্থ হয় নি। সবাই কেমন উদ্বিগ্ন হবে, সেবা করবে, দেখা করতে আসবে, জরো চোখে সব কেমন অবাস্তব দেখব, চিনলেও চিনতে পারব না— খুব মর্বিড, তাই না?’

‘ভীষণ।’ বরেন ড্রাইভারকে গাড়ি ফিরিয়ে নিতে বলল।

আস্তে-আস্তে কাঁচের জানলাটা তুলে দিল কাকলি।

‘চলো তোমার মাকে গিয়ে বলি।’

‘এখন বুঝি মা গার্ডিয়ান?’

‘হ্যাঁ, বড় জোর আপিলের পিরিয়ডটুকু।’

শান্তিতে পিঠটা ছেড়ে দিল কাকলি।

কাটল খানিকক্ষণ চুপচাপ।

বরেনই ফের কথা পাড়ল। বললে, ‘দীপঙ্করকে চাকরিতে ফের বহাল করতে গেলে একটা অস্থবিধে আছে।’

‘কী অস্থবিধে?’

‘যে উড়ে এসে ওর জায়গায় জুড়ে বসেছে সেই স্বকাস্তকে তাড়িয়ে দিতে হয়।’

‘দিন তাড়িয়ে।’ উৎসাহে উজ্জল হল কাকলি : ‘খুব মজা হয়।’

‘মজা হয়?’

‘মানে জর হয়। খেঁতো মুখ ভোঁতা হয়।’

‘তা হলে তুমি খুশি হও?’

‘বা, খুশি হই না? শত্রুর অপমান উপভোগ্য নয়?’ কাকলি প্রায় হাততালি দিতে চাইল : ‘সুন্দর হবে, সম্মীচীন হবে। দীপঙ্কর পুনর্জীবন হবে আর আপনার বন্ধু— কী জানি নাম— হবে পুনর্মুখিক। শ্রাণ্ডল পায়ে উড়ুনি উড়িয়ে আবার গাইডেট টিউশনি করে বেড়াবে—’

‘তুমি এইরকম নিষ্ঠুর !’

‘আহাহা, দুঃশাসনের উপর সদয় হবে জ্যোপদী ! কীচককে রান্না করে খাওয়াবে ! তা যদি বলেন তবে আমি বলব আপনাই মর্ষিড !’

‘বা, একটা লোক বেকার হয়ে যাবে তাতে উল্লাস করবে তুমি ?’ কেমন যেন অস্বস্তি মনে হল বরেনের ।

‘কত শত লোক বেকার হচ্ছে, কোথায় জ্ঞানতে পাচ্ছি ? যদি জ্ঞানতে পাই চেনা কোনো কেউ ছাঁট হয়েছে নিশ্চয়ই দুঃখিত হই । কিন্তু যে শত্রু যে বন্ধশূল সে যদি পড়ে তা হলে মনে মনেও একটু নাচব না এ আপনি আশা করতে পারেন না—’

‘কিন্তু ও আর শত্রু কই ? ওর সঙ্গে তো মিটে গিয়েছে মামলা । ও তো এখন ভদ্রলোক—’

‘আপনার কাছে হতে পারে, আমার কাছে নয় ।’ কাকলি কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকাল বাইরে : ‘মিটে গেলেও জ্বালা যায় না । ঘা শুকিয়ে গেলেও দাগ থাকে । যাক গে, এ নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার কিছু নেই । আমার শুধু এইটুকু বক্তব্য ও যেন না দীপঙ্করের পুনর্বহালের বাধা হয়ে ওঠে ।’

‘না, তা হবে না । দীপঙ্করকে তো নিতেই হবে মামলার শর্তে । কিন্তু ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে করি কী ! একই পোস্টে দু-জনকে রাখতে দেবে না কোম্পানি ।’

‘দয়া করুন । এ নিয়ে আমার সঙ্গে কিছু বলতে আসবেন না ।’ মুখ সরিয়ে নিল কাকলি ।

‘বা, তুমি এখন আমার মস্ত্রীর সমান । তোমার সঙ্গেই তো পরামর্শ করব ।’

‘আমি তো বলেছি, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে শোজা বার করে দিন । আপনার তো তাতে ভদ্রতায় বাধে । মানবিক করুণার দুধ ওখলায় !’

‘না, তার চেয়েও স্পষ্টতর অস্ববিধে আছে ।’

‘কী ?’

‘ডিসমিস করলে ও না আবার মামলা করে ! আবার না ঝকঝাকির মাশুল জোগাই !’

ড্রাইভারের সামনে কাঁচের উপরে ওয়াইপার দুটোর ওঠা-নামার দিকে চোখ রেখে কাকলি বললে, ‘তা হলে ওকে অল্প কোথাও ঢুকিয়ে দিন—’

‘হ্যাঁ, এটা মন্দ বলো নি । এইটেই সং পরামর্শ ।’

‘মোটাই সং পরামর্শ নয়। সং পরামর্শ ছিল ওকে কোনোরকমে বেকায়দায় ফেলা—’

‘কেন, ও তো কিছু দোষ করে নি। ও তো ভালো কাজই করেছে। বউ ছেড়ে দিয়েছে। যাতে আমি পেতে পারি! ওকে তো বরং পুরস্কৃতই করা উচিত।’

বরেনের সঙ্গে সঙ্গে কাকলিও হেসে উঠল। বললে, ‘হ্যাঁ, সেটা খেয়াল হয় নি। তবে ওকে পুরস্কৃতই করবেন।’

হাসতে হাসতে নামল কাকলি। গায়ত্রী সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসেছে আগ বাড়িয়ে। গাড়িতে থাকলেও যে ভিজ়েছে, মায়ের কাছে ধরা পড়তে চায় না বলেই কাকলি ছুটতে-ছুটতে উঠে গেল উপরে।

বরেন আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। উঠতে-উঠতে বললে, ‘আপনার মেয়ে ভারি ছেলেমানুষ।’

‘ভীষণ।’ দিব্যি সায় দিল গায়ত্রী : ‘তুমি ওকে একটু শাসন কোরো।’

যেন অবধারিত। যেন দেয়ালে লেখা আছে বড় অক্ষরে। যেহেতু উনি জ্ঞান করেছেন সেহেতু ওঁকেই প্রাণ সঁপে দিতে হবে। যিনি মোচনকর্তা, সন্দেহ কি, তিনিই ভোজনকর্তা হবেন।

হ্যাঁ, সেইটেই সংগত। শোভন। সেইটেই বৈধ।

শুধু নীতির দিক থেকেই নয়। লোকটাকে নিজের গুণে দেখ। সমাজের শীর্ষ-সনের ছেলে। বলতে পারো এয়ারকন্ডিশান্ড পাত্র। এ যদি এমনিও আসে চৌকাঠ ডিঙিয়ে, রেখে দিতে হয় বন্দী করে। আর এ তো দুর্বীর শক্তিতে দস্যুর মত এসেছে, নিজের দাবিতে টাইফুনের মত।

বনবিহারী কেমন আছেন, খোঁজ নিতে গেল বরেন।

‘বেড়িয়ে ফিরলে বুঝি?’ চোখের সামনে অবধারিতকেই দেখছেন এমনি চোখে তাকালেন বনবিহারী।

‘কই আর বেড়াতে পেলাম! যা বৃষ্টি নামল।’

‘কিন্তু কাকলিকে ভিজে-ভিজে দেখলাম না?’

‘নামে নি গাড়ি থেকে। নতুন বৃষ্টি দেখে জানলার কাঁচ নামিয়ে রেখে ভিজল ইচ্ছে করে। ছেলেমানুষ।’

‘একেবারে। কিছু বোঝবার ক্ষমতা নেই।’

কিন্তু এটুকু তো বোঝা যায়, যাই করুক, কাকলিকে ফের বিয়ে দিতে হবে। আর বরেনের মত এ-ক্লাশ পাত্র আর কোথায়? স্ততরাং বরেনকে যদি-সে অভিমুখী করে

তুলতে পারে তা হলে আর কাকলিকে ছেলেমানুষ বলা যাবে কী করে? বলা যাবে বেশ চালাক, পটু, ঘোড়েল মেয়ে।

তাই নিয়তির মত অবধারিত। অনিবার্য।

গায়ত্রী চা না খাইয়ে ছাড়বে না।

আর শুধু এক দিন নয়, ঘন-ঘন।

৪২

গায়ত্রী বরেনকে জিজ্ঞেস করল, ‘তোমাদের আর দেরি কত?’

‘এই তো তিন মাসের কটা দিন আর বাকী আছে।’ দেয়ালে ক্যালেন্ডার আছে মনে করে বরেন দেয়ালের দিকে তাকাল। ক্যালেন্ডার না থাকলেও এ কটা দিনে হিসেব করতে কিছু বেগ পাবার নেই। মুখস্থ আছে বরেনের।

‘তবে লেগে যাই তোড়জোড়ে।’

‘এ আবার তোড়জোড় কী। একটা নোটিশ দেওয়া তো শুধু। আর রেজিস্ট্রারের খাতায় সই করা।’

‘তা হোক। তবু একটা উৎসব তো করতে হবে। ঠাঁর কতদিনের শখ।’

‘মিছিমিছি কতগুলি টাকা নষ্ট। খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয়ই একটা হবে। সে আমিই স্ট্যাণ্ড করব। কোনো হোটেলে, না হয় বাগানবাড়িতে।’ প্রস্তাবটা কনের মায়েব মন-ভরা হচ্ছে না বুঝতে পারল বরেন। তাড়াতাড়ি বললে, ‘ওসব খুঁটিনাটিতে আটকাবে না। আসলটা তো হোক। কই, কোথায়?’ সমস্ত ঘরে সমান রাজত্ব করছে এমনি একখানা দরাজ গলা ছাড়ল বরেন।

‘ঘরে শুয়ে আছে বোধ হয়।’ বলে গায়ত্রী বনবিহারীর দিকে গেল।

আলোচনাটা বরেনের সঙ্গে করাই বরং সোজা। ইদানীং বনবিহারী কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছেন। দুর্বীর নিয়তির হাত থেকে আর জ্ঞাণ নেই—এই অবশ্যসম্ভাবিতাতেই তিনি সায় দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ নেই, উৎসাহ নেই—যা হবার তা হবে, হতে দিতে হবে। আলো জলুক চাই না-ই জলুক।

রায় আর জবানবন্দির নকল নিয়ে এসে পড়েছেন বনবিহারী। বিবাহ-বিচ্ছেদটো কেন হল, কী উক্তি? কাকলি লড়ে নি মামলা, মেনে নিয়েছে সব পাপ কথা।

খোলা ঘায়ের মত পাগকে থাকতে দেওয়া হবে না। বিয়ের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে আচ্ছাদন না করে আর উপায় কী।

তাই যা হবার তাই হোক। বনবিহারীর প্রতিবাদও নেই উৎসাহও নেই।

‘তোমার উৎসাহ থাকবে না কেন?’ গায়ত্রী তাকে উত্তেজিত করতে চায় : ‘তোমার মনের মত পাত্র। নিজেদের বাড়ি গাড়ি, শুনতে পাই বাগানবাড়িও কিনেছে একটা।’

‘বাগানবাড়ি?’ একটু বুঝি বা চমকান বনবিহারী।

‘ক’ বিঘে ফল-ফলারির বাগান, সবজির খেতও আছে, আর মাঝখানে ছোট একটা একতলা বাড়ি—তারই নাম বাগানবাড়ি।’

‘নইলে এমনিতে বাগানবাড়ি নামটা শুনতে ভালো নয়।’ মুখ ককণ করলেন বনবিহারী।

‘কে বললে নয়? সবদিক থেকে শুনতে ভালো। কত বড় ফার্মের পার্টনার। বাবা বেঁচে, কত বড় রবরবা—এক ডাকে সকলে চেনে।’

‘আর মা?’

‘মা নেই। কত বড় শাস্তি!’

‘তাই-বোন?’

‘কে জানে কে আছে!’

‘একটু খোঁজ-টোজ নেবে না?’ বলেই বনবিহারী কিরকম উদাস হয়ে গেলেন : ‘আর খোঁজ নেবারই বা কী দরকার। যখন বিয়ে দিতেই হবে তখন অগ্নি জিহ্বাসা অবাস্তব।’

‘তাইটাই নেই শুনেছি। দুই বোন আছে, বিয়ে হয়ে গিয়েছে।’ ঘনিয়ে এল গায়ত্রী : ‘বিয়ে দিতেই হবে মানে? জোর নাকি?’

‘নীতি।’ সংক্ষেপে বললেন বনবিহারী।

‘নীতি—কিসের নীতি?’

‘যাকে ব্যাভিচারী বলে স্বীকার করা হয়েছে তাকে বর বলে বরণ করার নীতি। নইলে ঐ কলঙ্কের মোচন নেই।’

‘কলঙ্ক? তুমি কাকে কলঙ্ক বলছ? ও তো একটা অবাস্তব বন্ধনের থেকে মুক্তি পাবার জন্তে ছলনা।’

‘তা মেনে নেবে না সংসার। তোমাকে একজন কলঙ্কিনী বলে ঘোষণা করেছে আর তুমি তাই স্বীকার করে নিয়েছ—এ অবস্থাটার থেকে আর ত্রাণ নেই। আর

যদি চলনা করে থাকে সে চলনাও কলঙ্ক ।’ স্তবরাং ধরধর করে কাঁপতে লাগলেন বনবিহারী : ‘বিয়ে দিয়ে দাও । স্বামী-ছাড়া মেয়েটার কলঙ্কী মুখ আর দেখতে পানি না ।’

হাত বুলিয়ে দিতে লাগল গায়ত্রী : ‘তুমি ওরকম করে দেখছ কেন ? তুমি কে ? জানোই মেয়েটা নির্দোষ আর বরেন সব দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় । এমনিতে দেখতে গেলে এ বিয়ে প্রার্থনা করে পাবার মত ।’

‘কেউ অস্বীকার করছে না । কিন্তু বিয়েটা এখানে আসছে প্রার্থিত হয়ে নয়, নিক্ষিপ্ত হয়ে ।’ বনবিহারী নির্লিপ্ত মুখে বললেন ।

‘সব বিয়েই ভাগ্যের নিক্ষেপ ।’

‘এ ক্ষেত্রে, বলতে পারো, নির্বাচিত নয়, আরোপিত ।’

‘নির্বাচন একেবারেই নেই তা বলা কী করে ?’ গহন সংকেতে ঘনিয়ে এল গায়ত্রী : ‘নইলে বরেন মোকাবিলা-বিবাদী সাজতে রাজি হয় কেন ? আর কেনই বা তাতে সায় দেয় কাকলি ? মনস্তত্ত্ব কী বলে ?’

‘মাই বলুক, এখন তাড়াতাড়ি ঘর ছেয়ে দাও । নরকে ডাকো । খোলা মাঠে আর বেশি দিন থাকতে দিও না ।’

কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাকলির আপত্তি ।

বললে, ‘একটু হাত-পা খালি হয়ে থাকতে দাও না আরামে ।’

গায়ত্রী বিরক্ত হবার ভাব করল : ‘যখন ঠিকঠাকই আছে তখন দেয়ি করার মানে কী ? হাত-পা খালি হয়েই বা থাকবি কেন ?’

‘তা ছাড়া বিয়ে তো তোয় অভ্যেসই হয়ে আছে ।’ কোথেকে নরকাকা এসে জুটেছে, টিপ্পনী কাটল : ‘এ তো আর তোয় নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয় ।’

‘তুমি বুঝি বিয়ের গন্ধ পেলেই আসো ।’

‘কি আর করি না এসে ! তোয় একেকটা বিয়ে একেকটা বিপদ ।’

‘বিপদ !’

‘তা ছাড়া আর কী ! শখ করে বিয়ে করলি, বিয়ে দেওয়ালাম কত কাঠখড় পুড়িয়ে । আবার শখ করে তা ভেঙে দিলি—’

‘শখ করে ভেঙে দিলাম !’

‘তা ছাড়া আর কী ! শখের বিয়ে, শখের ভিত্তি !’

‘শখের ?’

‘ছোট ছেলে ঘড়ি পেলে যেমন সে আছড়ে-আছড়ে ভাঙে, কী করে পৌছনো

যায় কলকল্যায়, তেমনি তোরা বিয়েটা পেয়ে সমানে আছড়াতে লাগলি কী কৌশলে পৌছনো যায় ভিভোর্সে।’

‘যাক, এ নিয়ে তোমাকে গবেষণা করতে ডাকা হয় নি।’ গায়ত্রী বললে, ‘যা হয় গেছে তার আর চারা নেই। এখন যা হবার তাই উদ্ধার করে দাও।’

‘উদ্ধার তো হয়েছে আছে। তা নিয়ে ভাবনা কী। কিন্তু আমি বলছি, কী এমন হয়েছিল যে শেকড় স্বল্প উপড়ে তুলে ফেলতে হল সমূলে?’

‘আবার সেই কথা!’ ধমকে উঠল গায়ত্রী: ‘অতীত দিয়ে কী হবে? এখন ভবিষ্যৎ সামলাও।’

‘গতস্ত শোচনা নাস্তি হতে পারে, গতস্ত আলোচনা নাস্তি নয়।’ হাসল নরনাথ: ‘কী হয়েছিল?’

‘কিছুই হতে লাগে না।’ কাকলি গম্ভীর হল।

‘ঝগড়া? মারপিট? নাকি শুধু একটু মনকষাকষি?’

‘কারণ এর চেয়েও তুচ্ছ হতে পারে। সামান্য মতবিরোধ।’ কাকলি হাতে ধরা নইয়ের দিকে তাকাল: ‘যাকে বলা যায় ইনকমপ্যাটিবিলিটি। অসংগতি। বৈসাদৃশ্য।’

নরনাথ হাঁ হয়ে রইল: ‘এসব আবার কী কথা?’

‘কথাগুলি কঠিন কিন্তু ব্যাপারটা সোজা। মানে মিশ না খাওয়া। দাঁতে দাঁত না পড়া। এ বলে পূর্ব, ও বলে পশ্চিম। এ বলে ভালো, ও বলে যাচ্ছেতাই। এ বলে যাবে না, ও বলে যাবে। এমনি পদে-পদে। শাসনের সঙ্গে স্বাভাবিক লড়াই।’

‘তাই নিয়েই ফাটাফাটি?’

‘ফাটাফাটি যাতে না হয় তারই জগ্রে সরে পড়া।’ কাকলি পৃষ্ঠা ওলটাল: ‘স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে সিউচ্যুয়াল কনসেন্টে বিচ্ছিন্ন হবার বিধান আছে। সংযুক্ত একটা দরখাস্ত করলেই হল। কোনো কারণ দর্শাবার দরকার নেই। স্বামী নাক ডাকায়, না স্ত্রীর গায়ে গন্ধ, কার কী ব্যক্তিগত কদাচার, কেউ জিজ্ঞেস করতে আসে না। হিন্দু অ্যাক্টে নেই সুরবিধে নেই। কিন্তু হিন্দুর ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত অমিলের জগ্রে জীবন দুঃসহ হতে পারে। তখন ঐ ঘোরালো পথেই পারস্পরিক সম্মতি খুঁজতে হয়। এ ছাড়া আর পথ কই?’

‘কিন্তু পাঁচজনে অগ্নি কথা বলে।’ নরনাথ ইঙ্গিতের বিষবাণ ছুঁড়ল।

‘কী বলে?’ জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

নরনাথ হঠাৎ থেমে গেল। বললে, ‘না, থাক। অতীত দিয়ে কী হবে?’

‘আমিও তো তাই বলি।’ বললে গায়ত্রী, ‘এখন শুধু ভবিষ্যৎকে ঠেকাও।’

‘না, বলো, কী বলে ।’ কাকলি চোখ তুলল ।

‘বলে,’ নরনাথ চেয়ার টেনে বসল : ‘যে একবার প্রেম করে সে বার-বারেই করে । বিয়েও তাকে নিরস্ত করতে পারে না । তাই প্রেমের বিয়ে করেও কাকলি আবার প্রেম খুঁজছে, প্রেম করেছে । মানে নতুন করে ভালোবেসেছে বরেনকে । আর তারই জন্তে বিয়েটাকে নশ্তি করে দিয়েছে ।’

‘তা হলে তো স্থূল, গায়া একটা কারণ আছে বিচ্ছেদের ।’ কাকলি উঠে পড়ল : ‘তা হলে শখের ডিভোর্স বলছিলে কেন ?’

‘শখের ডিভোর্স, যেহেতু বরেনের বিয়েটাও টেকসই হবে না ।’

‘আগে হোক তো বিয়েটা ।’ ব্যস্ত হল গায়ত্রী ।

‘তার মানে বরেনবাবুকে বিয়ে করে, যেহেতু গোড়ায় একবার প্রেম করেছি, আবার হরেনবাবুর সঙ্গে পটব । হরেনবাবুকে বিয়ে করে নরেনবাবুর সঙ্গে—’ না চটে উঠে হাসল কাকলি : ‘বিচ্ছেদের কোনো তামাদি নেই আইনে । এক বার কি দু বার কি দশ বারের বেশি চলবে না এমন কথা লেখে না । মন্দ কি, চলবে শোভাযাত্রা । কিন্তু কথাটা কে বললে ?’

‘আহা, লোকে স্পষ্ট কিছু নাই বলুক ।’ নরনাথ হেরে-ঘাওয়া তর্কিকের মত বিষয় পালটে বললে, ‘কোটের রায়-ডিক্রিতেই বোঝা যাবে বরেনের প্রতি কেন তোর পক্ষপাত ।’

‘ও, সেই কথা ?’ বইটা হাতে করেই দরজার দিকে এগুল কাকলি । বললে, ‘বাভিচারী আর প্রেমিক এক বস্তু ?’

‘হরে দরে হাঁটুজল ।’ নরনাথ বললে, ‘যা চালভাজা তাই মুড়ি ।’

‘কিন্তু যাই হোক, যে নামই দাও, বিয়েটা তো চটপট সেরে ফেলতে হবে ।’ গায়ত্রী চেয়ারের পিঠ ধরল : ‘আবরণ তো দিতে হবে মেয়েকে ।’

‘নিশ্চয় । এক শো বার ।’ নিজেই উঠে পড়ল নরনাথ : ‘আর উপস্থিত ক্ষেত্রে ঐ তো একমাত্র আবরণ ।’

‘এত যখন করতে পারলাম এটুকুও করতে পারব ।’ যেতে যেতে থামল কাকলি ।

‘কিন্তু তাড়াতাড়ি সারতে হবে । তোমার মতে পাত্র কেমন ?’ গায়ত্রীর প্রশ্ন ।

‘দ্বিখিজয়ী । খোলা তলোয়ারে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ।’ বললে নরনাথ, ‘দেয়ি করার তার সময় নেই । আর যখন হরে দরে, এরই জন্তে এত, দেয়ি করার দরকারই বা কী ।’

বা, আইনের সময়টুকু তো রাখতে হবে?’ কাকলি মার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাল।

‘এ ক্ষেত্রে তারও দরকার ছিল না।’ চিন্তিত মুখ করল গায়ত্রী : ‘দেরি দেখলে পাত্র না বিরক্ত হয়!’

‘কত বড় গণ্যমান্ন সম্ভ্রান্ত পাত্র— বিরক্ত তো হতেই পারে। এ না ভেবে বসে মেয়ে আমাকে খেলাচ্ছে।’ গায়ত্রীর মুখে নরনাথ আরেক পৌচ চিন্তা মাখাল : ‘সরে পড়ার না ছুতো ধরে। তাই সরার আগে সেরে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ।’

‘ও ফসকে গেলে এমন পাত্র পাব কোথায়?’

‘এমন পাত্র মানে?’ নরনাথ চোখ প্রায় কপালে তুলল : ‘ও ফসকে গেলে আর কোনো পাত্রই জুটবে না।’

বিশ্ময়ে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল গায়ত্রী। কাকলিও কম চমকাল না।

‘আদালত ওর চরিত্রে যে সিল দিয়ে দিয়েছে তা কিছুতেই মুছে যাবে না। এ শুধু একটা লোকমুখের অপবাদ নয়, এ আদালতের বিচারের সিদ্ধান্ত—সর্বকালে সমস্ত বিশ্বে এর ঘোষণা— এর খণ্ডন নেই, ভঙ্গন নেই, নিরাকরণ নেই—’

‘চরিত্রে সিল—কী সিল?’ আতঙ্কিত মুখ করল গায়ত্রী।

‘যে, বিবাহিত স্ত্রী হয়ে কাকলি জনৈক বরেন চট্টোপাধ্যায়ে আসক্ত, তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত, যার দরুন তার স্বামী তাকে দূর করে দিয়েছে, ছিন্ন করেছে বিবাহের গ্রন্থি। স্ততরাং বিয়ে-ছুট কাকলিকে বরণ করতে পারে বা আবরণ করতে পারে একমাত্র ঐ ব্যভিচারী বরেন চট্টোপাধ্যায়, আত্মোপাস্ত যার সঙ্গে তার ঘটনা। অত্ৰ কোনো পাত্র এগোবে না এ বাজারে, এ ব্যাপারে। স্ততরাং শুভশ্রু শীঘ্রং। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন যখন ভালো তখন সকলে মিলে এর দ্রুত উদ্ঘাপনের ব্যবস্থা করাই বিধেয়। যাই দেখি দাদা কী বলে!’ নরনাথ পাশের প্যাসেজ ধরল।

মেয়েকে উদ্দেশ করে গায়ত্রী বললে, ‘সুনলি তো?’

‘সুনলায়। সব জানা কথা। বাসি কথা।’ কাকলি এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে চাইল।

‘তবে দেরি করছিস কেন? তিন মাসের আর বাকি কত?’

‘জানি না। হিসেব রাখি নি।’ তারপর শাস্তমুখে বললে, ‘তিন মাস তো কিছুই না। দেখতে-দেখতে কেটে গেল। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করা ভালো।’

‘না, না, অপেক্ষা কেন! অপেক্ষা করতে গেলে ও ঠিক পালিয়ে যাবে।’ গায়ত্রী হাঁপিয়ে উঠল।

‘যাক পালিয়ে। ও পালিয়ে গেলেই পৃথিবী ছোট হয়ে যাবে না। আমি চাকরি-
বাকরি করব, উন্নতি করব, বড় হব। সংসারের দুঃখ ঘোচাব।’ জানলার বাইরে
তাকাল কাকলি।

‘কিন্তু নিজের কলঙ্কের সিল ঘোচাবি কী করে?’

‘যা মিথ্যে তা সময়ের জলে মুছে যাবে, মা। আর যদি নাই যায়, যদি কলঙ্কিনীই
থাকি, তবু পৃথিবীর মমতায় কলঙ্কিনীরও স্থান আছে।’

‘কিন্তু ও পক্ষ যখন প্রস্তুত তখন তোর আর কিসের প্রতীক্ষা?’

‘প্রতীক্ষা ভালোবাসার। দেখি ভালোবাসা জাগে কি না।’

‘আবার সেই কথা?’ দীর্ঘকণ্ঠে চেষ্টা করে উঠল গায়ত্রী।

কাকলি হাসল। বলল, ‘আগাগোড়াই সেই কথা। পুরোনো কথা। পাখুরে
মাটি খুঁড়ছি, চেষ্টা করছি খুঁড়তে। দেখি একটা ফোয়ারা পাই কি না।’

‘আগের বারও তো ঐ ফোয়ারাই খুঁজেছিলি—’

‘সেবার পেয়েও ছিলাম। ফোয়ারাটা জল পেল না, ফুরিয়ে গেল। তাই বলে
আবার ফোয়ারা দেখতে হবে না এ হতেই পারে না। মাটির শস্তে খাত্ত হতে পারে,
হুষ্টি-পুষ্টি হতে পারে, কিন্তু ফোয়ারার জল না পেলে পিপাসাই মিটবে না। পিপাসার
জল না থাকলে কিসের খাত্ত, কিসের হুষ্টি-পুষ্টি।

বড় চাকুরে মেয়ে, বেশি তাড়ন-তর্জনের দিন নেই—আর করলেই বা কত শুনবে।
তাই খাটের পাশে বসে মেয়ের চুলে হাত দিল গায়ত্রী। বললে, ‘জাগবে, জাগবে
ফোয়ারা। এমন সমর্থ-সুন্দর ছেলে, মেয়ে আর মা যা চায় সেই রূপ আর বিস্ত যথানে
একত্র, তাকে ভালো না লেগেই পারে না। মিশতে-মিশতেই ভালোবাসা আসবে।’

‘যেমন কাঁদতে-কাঁদতে শোক আসে।’ হাসল কাকলি।

‘চিরকাল তাই হয়ে এসেছে। ঘর করতে-করতেই জেগেছে আদর-অহুরাগ।
কাকলির চুলের ভার পিঠময় খুলে দিল গায়ত্রী।

‘সেই যে অহুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নতুন হোয়।’

‘হ্যাঁ, তিলে-তিলে নতুন হবে। তাকে কত সুখে রাখবে। পরিবারের কত বড়
সম্বল, কত বড় মুকুবি হয়ে দাঁড়াবে। তুই মিছিমিছি ভয় পাচ্ছিল। মিছিমিছি দেরি
করছিল—’

‘না, চমৎকার লোক। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। আর কত উপকারী।’ মায়ের
স্নেহের মধ্যে মাথাটা ছেড়ে দিল কাকলি : ‘না, দেরি করব না। তোমাদের যখন
এত হচ্ছে—’

ক্রুত পায়ে ফিরে এল নরনাথ ।

বললে, ‘কই, এ বিয়েতে তো আমাকে দরকার হবে না ?’

‘কেন ?’ কাকলি-গায়ত্রী একসঙ্গে বলে উঠল ।

‘সুনছি প্যাণ্ডেল হবে না, আলো জ্বলবে না, সানাই বাজবে না—নো ডেকোরেশান : যদি এসব না হয়, যদি কনস্টেবল দাঁড় করিয়ে না ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করতে পারি তা হলে আমি কেন ?’ নরনাথ হতাশ-হতাশ মুখ করল : ‘সুনছি দলিলী বিয়ে আর হোটেলী ডিনার । তা যেমন খুশি হোক, বিয়েটা তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই শান্তি । এক দলিল দিয়ে আরেক দলিল খারিজ করা ।’

‘সর্বত্রই দলিলের লীলা ।’ মুখ টিপে হাসল কাকলি : ‘জন্মের দলিল, মৃত্যুর দলিল এবাবরই ছিল, এইবার বিয়ের দলিল হল । বলতেই বলে জন্ম মৃত্যু বিবাহ—’

‘তাই দেখছি ।’ নরনাথ চলে যাবার উত্তোগ করল ।

বাধা দিল গায়ত্রী । বললে, ‘না, না, আমাদের দিক থেকে একটা উৎসব করবে বৈকি । সব ভি-আই-পি-দের ডাকবে, কাগজওয়ালাদের, ঘাতে খবরটা বেরোয় ফলাও করে । খবরের মত খবর ।’

নামতে-নামতে নরনাথ বললে, ‘দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের আবার ফলাও ! যা না কনে তার ছু পায়ে আলতা । বরেন ঠিকই বলে নমো নমো করে লক্ষ্মীপূজো । ঘট-প্রতিমা নয়, সরা দিয়েই কাজ সারা ।’

গায়ত্রী উঠে তাড়াতাড়ি ছুটে গেল পিছনে । বললে, ‘মোটাই তা নয় । এটাই প্রথম, এটাই আসল । সেভাবেই খবর বেরোবে, চিঠি যাবে নেমস্তল্লের ।’

‘আর আগেরটা ?’ পিছনে তাকাল নরনাথ ।

‘আগেরটা দুঃস্বপ্ন ।’

‘তাই হোক, পরেরটা হৃথস্বপ্ন হোক—অন্তত শেষ স্বপ্ন ।’ নিচে পৌছে হাঁক চাড়ল নরনাথ : ‘যখনই ডাকবে তখনই পাবে । উৎসবেও পাবে, দুর্ভিক্ষেও পাবে । চলি ।’ চলে গেল নরনাথ ।

বরেন ঘরে ঢুকল ।

‘এ কি, শুয়ে আছ ? ছুটির দিন, সকালবেলা—’

‘এটাই তো শুয়ে কাটাবার প্রশস্ত সময় ।’ শৈথিল্যকে শাসন করতে করতে উঠে বসল কাকলি ।

‘চলো কোথাও বেরুই ।’

‘কোথায় যাবেন ?’

‘তুমিই বলা।’

হু চোখে উজ্জল খুশি নিয়ে কাকলি বললে, ‘চলুন চিড়িয়াখানায় যাই।’

‘মাথা খারাপ!’ প্রায় মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার মত ভাব করল বরেন।
‘আমরা কি বাচ্চা? ছেলেমানুষ?’

আশ্চর্য, কোনো কথাই বলতে পারে না কাকলি। যেন আগে থেকেই হেরে বসে আছে। সব জোর ফুরিয়ে ফেলেছে নিঃশেষে।

হ্যাঁ, ছেলেমানুষ তো বটেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তো এক চিরন্তন শিশু আছে। এটুকু অস্তত তো বলা যেত। কিংবা, পশুপাখি তো কেবল বাচ্চারাষ্ট দেখে না, বুড়োরাও দেখে।

কিন্তু সাধ্য নেই প্রতিবাদ করে। স্বপ্নের বুঝি আর এক কণাও বাকি নেই। নাকবোধ গুরু হয়ে চলেছে যেমন টানছে। নাক যখন বিধতে দিয়েছে, দড়ি চুকিয়ে তো টানবেই যেখানে-সেখানে।

যার স্বপ্ন নেই তার দখলও বুঝি আর বহাল থাকে না।

কিন্তু মুখের একটা ফাঁকা কথায়ই কি চলে যায় স্বপ্ন? আমার এ বাড়িঘর তোমার, মুখে বললেই এ বাড়িঘর তোমার হয়ে যাবে? আমি যদি দলিল করেও বলি যে তোমাকে এ বাড়িঘর বিক্রি করলাম তা হলেও এ বাড়িঘর তোমার হবে না যদি না তুমি মূল্য দাও। মূল্যের অভাবে দলিল ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কী মূল্য দিল বরেন এ পর্যন্ত? খালি মনিব্যাগই খুলল। মূল্য কি মনিব্যাগ থাকে?

সোজানুজিই জিজ্ঞেস করি, ‘বরেন কি ভালোবাসা দিল?’

মাথা খারাপ! বরেনের উত্তরটা ঠিক অসুমান করতে পারে কাকলি। ভালোবাসা আবার কী! ভালোবাসা কি আগুন নেই ধোঁয়া, কাম নেই সন্তান?

বরেনের শরীরে একটা লুক্কাতা স্তম্ভিত হয়ে আছে। সেটাও কি ভালোবাসা নয়? ছিঁড়েখুঁড়ে কেড়ে খাবার যে হিংস্র ক্ষুধা সেটাও কি ভালোবাসা থেকে আসে না? ভালোবাসা মানে কি পাথরের গ্লাসে সান্ধিক মিছরিপানা? কাঁচের ডিকেন্টারে রাজসিক মদ নয়?

কি জানি কী! মন খালি ভয় পায়। বরেন এসেছে সুনলে মন ছুটে যায় না, গুটিয়ে যায়। খুশির আবির্ভাব উড়ায় না, বরং রঙ দিতে এসেছে ভেবে দরজায় খিল চাপায়।

বলতে পারত, শরীর ভালো নেই। কত সোজা ছিল, অথচ কিছুতেই, বলতে

পারল না। সব সময়েই যেন একটা জোর দিয়ে চেপে রেখেছে। প্রায় বুড়ো
আঙুলের তলায়। কোথায় যাবে? যদি যাবে তো ধার শোধ করে দিয়ে যাও।
আর ধার শোধ দিতে এসেছ কি, চিরদিনের মত ধরা পড়ে গেছ।

সব সময়ে সতর্ক থাকতে হয়। সব সময়ে কৃত্রিম। ভালোবাসা কি একটা
কৃত্রিম অস্তিত্ব?

নয় কে বললে? ভালোবাসা মানেই তো তুমি যা এক বেলার, তাই চিরদিনের
মতন করে দেখাবার কারসাজি।

কিন্তু তাই বলে কি তা স্পষ্ট ভয়? নিজেকে অলজ্য্য করে রাখবার সদা-জাগ্রত
চেষ্টা? ভয় আর পরিহার এই কি ভালোবাসার দুই গোল পোস্ট?

‘কোথায় তা হলে যাব?’

চলো কোথায় কী ইংরেজি নাটক হচ্ছে। কোথায় কী বিদেশী ছবির প্রদর্শনী।
যেসব জায়গায় গেলে তোমার বৈদগ্ধ্য আপসে বিঘোষিত হবে সেসব জায়গায়।

একদিন কাকলি বললে, ‘ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে যাবেন?’

হা-হা করে হেসে উঠল: ‘তার চেয়ে বরং চলো না কালীঘাট যাই।’

স্নান হয়ে গেল কাকলি। সত্যি গুটা কি একটা বলে-কয়ে যাবার মত জায়গা!

‘কলকাতার বাইরে চলুন কোথাও।’ আরেকদিন বলে ফেলেই কাকলি পাংশু
হয়ে গেল।

‘কেন, কলকাতা কি দোষ করল? প্রেমে-অপ্রেমে কলকাতার মত কি জায়গা
আছে?’

‘চলুন তা হলে গঙ্গার দিকে।’

‘কী মামুলী।’

‘বেশ, তবে মাঠে চলুন, ঘাসের উপর বসে গল্প করি।’

‘মাঠেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু ঘাসের উপর নয়, বসবে চাঁদোয়ার নিচে,
সব চেয়ে দামী গ্যালারির সিটে।’

‘সে কোথায়?’

‘ইডেন গার্ডেনে। ক্রিকেট খেলা দেখতে।’

‘ক্রিকেটের আমি বুঝি কী!’

‘ইংরেজি সিনেমা-নাটক সম্বন্ধেও তুমি এই কথা বলো—বুঝি কী! শোনো,
সবটা আমিও বুঝি না। কিন্তু কথাটা বোঝা নয়। বোঝানো। বোঝানো যে
আমি খুব বুঝি, আমি একজন সমজদার। তেমনি ক্রিকেট মাঠে যাওয়া খেলা দেখতে

নয়, খেলা দেখাতে। ই্যা, তোমার খেলা। শাড়ির খেলা, রঙ-চঙের খেলা, বলতে পারো খাবার খেলা। জীবন শুধু দেখতেই নয়, দেখানোতেও। যেমন আমি এখন ক্রিকেটের টিকিট দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।’

‘কেন, সামান্য টিকিটে কী আছে?’

‘সামান্য? এ টিকিট যার হাতে, জানবে সেই দেশের প্রধান। মুখ্যমন্ত্রীদের একজন। যে সাধনা করে নারীর হৃদয় পেতে হয় সেই সাধনা করে এই টিকিট।’

একদিন কাকলি বললে, ‘দিশি সিনেমাতে আপত্তি আছে? চলুন একটা বাঙলা বইয়ে যাই। ব্যালকনিতে বসি। স্বন্দর একটু নিরিবিলি দেখে।’

হা-হা করে হাসল বরেন। এটা যেন বিদ্রূপের হাসি নয়। লোলুপতার হাসি।

‘নিরিবিলির জগ্গে সিনেমার ব্যালকনি কেন?’ দু-এক পা করে যেন এগিয়ে এল বরেন: ‘আমার বাগানবাড়িই তো আছে। তুমি তো সেখানে কোনোদিন যাও নি।’

চোখে ব্যথিত কটাক্ষ নিয়ে তাকাল কাকলি। মহতের কাছে প্রার্থনার স্তর এনে বললে, ‘সেটা বুঝি স্বন্দর নিরিবিলি হল?’

সেই অদ্ভুত হাসিটা আবার হাসল বরেন। বললে, ‘স্বন্দর তো নিশ্চয়ই। তবে নিরিবিলি না বলে বলতে পারো মধুরালি।’

কাকলি মুখ ফিরিয়ে নিল চকিতে। কী বিস্ত্রী শোনাল কথাটা। কী বীভৎস দেখাল বরেনকে।

এখন মুখ সরিয়ে নিলে চলবে কেন? এবার বরেন মনে-মনে হাসল। আদালতের কাগজে নিজের হাতে সই করে দিয়েছ। স্বীকার করেছ আমি ব্যভিচারী, আমার সঙ্গেই তোমার চূড়ান্ত সংশ্লেষ, তোমার সঙ্গে আমার। এখন তেমন কিছু ব্যবহার দেখলে কেউ আশ্চর্য হবে না, বিবেকাহত হবে না। পরিণাম সম্বন্ধে সকলেই প্রজ্ঞয়শীল। বাইরে আদালত তো বটেই, ভিতরে তোমার এই গৃহ, তোমার বাবা-মা। কঠিন লাগছে তা বুঝি, কিন্তু অগ্নায় বলতে পারো না, অত্যাচার বলতে পারো না। বলতে পারো না কুৎসিত। তোমার বাজতে পারে, তোমার বাজছে, তাই তো আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে চাচ্ছি। তুমি পরস্মী বলেই তো পরস্মী—পরমস্মী। সেই পরস্মে, সেই পরকীয়স্মেই তো তোমার ঐশ্বর্য। তাই তো তোমার এত লাভণ্য, তোমাতে এত লোভ। তবে তুমি তাড়াতাড়ি হতে দিচ্ছ না কেন! তিন মাস চলে গেল তবুও তুমি গড়িমসি করছ। খালি সময় নিচ্ছ। কিসের সময়? বলছ, প্রস্তুত হবার সময়। বিচ্ছেদ-মামলার আর্জি দাখিল করবার দিন থেকেই তো তুমি প্রস্তুত।

অন্তত যেদিন আর্জির নকলসমেত সমন জারি হল তোমার উপর, তুমি সই করে সমন নিলে, সেদিন থেকে। এখন তানানানা করলে শুনব কেন? কে শোনে? জানি জোর করে দেঁড়েমুখে নিতে গেলে আনন্দ পেলেও আনন্দের স্বগন্ধ পাওয়া যায় না। আর স্বগন্ধই সমস্ত। তাই তো জোর খাটাতে চাই না। তোমার মন কিসে খুশি হবে তারই চেষ্টা করি। ভোগ তো শুধু দেহের নয়, ভোগ মনেরও। শুধু খিদে পেলেই খেয়ে তৃপ্তি হয় না যদি না খাওয়া স্বাচ্ছন্দ্য হয়, পরিবেশনে না শ্রী থাকে। তাই তোমার বিশ্রামে-আলসে সায় দিয়ে যাচ্ছি। বিয়েটাকে আবশ্যিক করবার জন্তে আইনদস্ত অধিকার খাটাচ্ছি না। তুমি স্বথী হও। স্বয়মগতা হও। আমি জানি মন যদি চাক্ষু হয় কাঠের কটোরার জলেও গঙ্গা খেলে। তাই তোমার মন চাক্ষু করবার জন্তে পথে-পথে ঘুরছি, সময়ের বালি পড়তে দিচ্ছি ঝরে-ঝরে।

‘জানো, আজ তোমার দীপঙ্কর রিজিউম করল।’

‘সত্যি?’ উৎফুল্ল চোখে তাকাল কাকলি।

‘বেশ হাসিখুশি হয়ে সহজভাবেই কাজ করছে।’

‘আপনারা?’

‘আমরাও স্পোর্টসম্যান স্পিরিটেই নিয়েছি। মিটিয়ে দিয়েছি ব্যাক-পে।’

‘দিয়েছেন? কী ভালো!’ প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল কাকলি: ‘এবার তা হলে এক ফাঁকে কিছু ইনক্রিমেন্ট দিয়ে দিন।’

‘দেব। আমাদের বিয়েটা আগে হোক। ওকে তখন সেটা বকশিশ দেব।’

‘উপহার দেব বলুন। কী মজা! ও ভীষণ অবাক হয়ে যাবে।’

বরেন সেদিন আর বেশীক্ষণ বসল না। একা-একা চলে গেল তাড়াতাড়ি। এই নতুন স্থান নিয়ে কাকলি একটু নাড়াচাড়া করুক। আরো একটু রুতস্ত হোক। আরো একটু বিগলিত। স্বয়মগতা হবার জন্তে আরো এক ধাপ নিচে নামুক।

বরেন চলে গেলে কাকলি চঞ্চল হয়ে উঠল। ছুটে এল জানলার কাছে। তাকাল বাইরে। গাড়িটা দেখা গেল না। তবে কি বরেন এখনো যায় নি? কই, বাড়ির কাছেও তো গাড়ি নেই। চলে গিয়েছে।

আরো, আরো যে একটা খবর জানবার ছিল।

বা, সেটা আর এমন কী না জানা। নিশ্চয়ই ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, পথ দেখ। তা হলেই তো কাকলি স্বথী হয়। তাইই তো কাকলি বলেছে বলতে।

কাকলি ভেবেছিল দীপঙ্কর নিজে থেকে এসেই খবর দেবে। অস্তুত একটা টেলিফোন করতে কী বাধা ছিল! কেন, বাড়িতেই বা আসবে না কেন? সে তো আর এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বাড়িতে নেই। তার নিজের বাড়িতেই মানে বাবার বাড়িতে আছে। সেখানে তো দরজা নিষ্কণ্টক। এলেই হয়। জানাতে পারে কোথাকার জল কোথায় এসে দাঁড়াল।

কদিন অপেক্ষা করে নিজেই হুতরাং গেল কাকলি।

গিয়ে দেখে, ভেঁ ভেঁ, কেউ কোথাও নেই।

সে কি? গেল কোথায়?

ওরা বাড়ি বদলেছে। কোঠাবাড়িতে উঠে গেছে।

সত্যি? স্বপ্নের সত্য হবার আলোতে ঝলমল করে উঠল কাকলি।

ঠিকানা নিয়ে গেল তখুনি নতুন বাড়িতে। গলির মধ্যে ছোট একটা একতলার টুকরো কিন্তু দিব্যি ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে, জানলায় পর্দা। দিব্যি সম্ভ্রান্ততার চাদর দেওয়া গায়ে।

দিব্যি কড়ানো দরজা। শব্দ করতেই বেরিয়ে এল দীপঙ্কর।

‘আরে, আপনি? কী ভীষণ কথা!’ দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়ার মত চোখ করল।

‘কেন, এর আগে আসি নি কোনোদিন?’

‘বা, কত এসেছেন। যখন আমরা বস্তুতে ছিলাম।’

‘আর এখন বুঝি কোঠাবাড়িতে আসতে পারি না?’

কুণ্ঠিত হবার ভাব করল দীপঙ্কর : ‘তখন আপনি বন্ধুর স্ত্রী ছিলেন—’

‘আর এখন?’

‘এখন বস-এর স্ত্রী—’

‘হই নি তো এখনো।’

‘হতে আর বাকি কী! বন্ধুপত্নী তবু ঘরোয়া কিন্তু বস্পত্নী, ওয়ে বাবা, ততস্থ হয়ে থাকবার মত।’

‘কিন্তু এখনো তো জলে পড়ি নি কাঁপ দিয়ে। নিজেই এখন তটস্থ আছি,’ কষ্টে হাসল কাকলি : ‘কি, বাড়িঘরদোর দেখাবেন না ? বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন ?’

‘সে কি, আসবেন ভিতরে ?’

‘কি আশ্চর্য ! আমার কি শুধু আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ?’ নিজেই পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল কাকলি।

মুহূর্তে যেন আলাদিনের প্রদীপ জলে উঠল। আনন্দের কলরব পড়ে গেল চারদিকে। ছেলেবুড়ো সবাই ছুটে এসে ঘিরে ধরল কাকলিকে। বিষ্টু পর্যন্ত দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে।

অভ্যাসের দেশে যেন অভাবনীয়ের আবির্ভাব।

অভাবনীয় শুধু কাকলি নয়, অভাবনীয় এই কোঠা কথানা, জিনিসপত্রগুলি একটু গোছগাছ করে রাখা, দীপঙ্করের বাবার মাটি ছেড়ে তক্তপোশে এসে বসা, আর চারদিকে এই কটা ইলেকট্রিক আলো। চারদিকে তাকাল কাকলি। ইলেকট্রিক আলোতেই প্রফুল্ল দেখাচ্ছে সব কিছু। সকলের মুখ চোখ চেহারা।

‘সব, সব মা, তোমার জন্তে।’ হুর্গাবালা অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় বললে গদগদ হয়ে, ‘তুমি, তুমি না সাহায্য করলে এসব কিছুই হত না।’

‘এ তো সামান্য।’

‘এই আমাদের কাছে স্বপ্নের মত। তুমিই মাস-মাস টাকা দিয়েছ বলেই না—’

‘রাখুন।’ বসবার জন্তে আগেকার সেই মোড়াটার খোঁজে তক্তপোশের নিচে তাকাল কাকলি।

কিন্তু মোড়ায় আজ আর তাকে কে বসতে দেবে ! সবাই তাকে ধরাধরি করে একটা চেয়ারে এনে বসাল।

‘কই, মোড়াটা গেল কোথায় ? মাদুর ? শতরঞ্জি ?’

‘এখন কি আর আপনাকে মোড়ায়-মাদুরে মানায় ? আপনার এখন সিংহাসন।’ দীপঙ্কর চিপটেন কাটল।

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে কাকলি বললে, ‘ফের অমনি বলবেন তো মেঝের উপর, মাটিতে বসে পড়ব।’ কিন্তু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় কাকলির সাধ্য কী। ছেলেমেয়ে সবাই মিলে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে রেখেছে।

‘মা, এই চেয়ারখানাও তোমার জন্তে।’ বললে হুর্গাবালা।

‘মানে আপনার মহাহুভবতার জন্তে, আপনার অভ্যর্থনার জন্তে।’ আবার টিপ্তনী কাটল দীপঙ্কর।

‘না, মা, তোমাকে অভ্যর্থনার জন্তে চেয়ার হবে কেন, তোমার আসন আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে।’ স্নিগ্ধ শাসনের চোখে ছেলের দিকে তাকাল দুর্গাবালা : ‘ওকে অভ্যর্থনা কি শুধু একথানা চেয়ারে বসিয়ে, না পাখার হাওয়া খাইয়ে?’ কেননা ইতিমধ্যে ছেলেমেয়েরা একটা হাতপাখা কুড়িয়ে এনে কাড়াকাড়ি করে হাওয়া করছে কাকলিকে।

‘তা যদি বলে মা, ভাষা দিয়েও নয়। এমন ভাষা নেই মানুষের যা দিয়ে সেই স্তব্ধতাই তৈরি হয়।’

দীপঙ্করের মুখে শ্লেষের ছায়া আছে কি না দেখবার জন্তে তাকাল কাকলি।

‘এমন কাণ্ড হয় না, এ ঘটে নি কোনোদিন। শোনে নি কেউ কোনোখানে।’

এ আবার কী আতঙ্কের কথা বলে। কাকলির চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

‘জানেন, ব্যাক-পে হিসেবে মোটা একটা টাকা পেয়েছি বলেই ভাবি হাতে মেলামি দিয়ে এই ক্ল্যাটটা ভাড়া নিতে পেরেছি।’ দীপঙ্করের মুখে নির্মল সত্যের সারল্যা : ‘নইলে ঐ খাটালের মধ্যেই পচতে হত। আর এই ব্যাক-পেটা জমতে পারল, এক খোঁকা খাবার মধ্যে আসতে পারল, কিসের জোরে, কার অহুগ্রহে? শুধু আপনার জোরে, আপনার অহুগ্রহে। মাস-মাস আপনি এই দুঃস্থ পরিবারকে সমানে অর্থনাশায্য করেছেন বলে। আগে আগে নিজে এসে দিয়ে গিয়েছেন, পরে যখন আপনার নানা বিপদ যাচ্ছে, তখনো মনে করে মার নামে পাঠিয়েছেন মনি-অর্ডার।’

‘থাক—’ কাকলি চোখ নামিয়ে নিল।

‘না, থাকবে কেন? বলতে দিন। আর কিছু করতে পারি আর না পারি গুণ ভরে জানাতে দিন কৃতজ্ঞতা।’ দীপঙ্করের কণ্ঠে সেই প্রশ্ন স্বাচ্ছন্দ্য : ‘আজকের দিনে পরোপকার করা উঠে গেছে কিনা জানি না, কিন্তু কৃতজ্ঞতা বলে আর কিছু নেই সংসারে। অস্তুত মুখের কৃতজ্ঞতটুকু জানাই অকপটে।’

‘আহা, কী আর অমন করলাম। কটা টাকাই বা সাহায্য!’

‘কটা টাকা? এক বুড়ি টাকা।’ বললে দুর্গাবালা।

কাকলি শব্দ করে হাসল : ‘পঞ্চাশ টাকায় এক বুড়ি হয়?’

‘এক বুড়ির বেশি হয়।’ বললে দীপঙ্কর, ‘মাস-মাস পঞ্চাশ টাকা। নিঃস্বের কাছে এ এক সাম্রাজ্যের সমান। বলেছি তো এমন কাণ্ড হয় না, এ ঘটে নি কোনোদিন। শোনে নি কেউ কোনোখানে।’

‘আমার টাকা বেশি ছিল, খরচ ছিল না, দিয়েছি—’ যেন গায়ে লাগে না এমন করে কাকলি বললে।

‘টাকা যেন কাক বেশি হয় ! যা লোকের বেশি হয় তা টাকা নয়, তা অহংকার ।’ ছোট একটা ভায়ের চুলে আঙুল বুলিয়ে আদর করতে করতে দীপঙ্কর বললে, ‘আপনার ঐ পঞ্চাশ টাকা কতখানি আসান ছিল সংসারে তা মা জানে আর আমি জানি । দেখুন তরুণপোশের উপর থেকে বাবা পর্যন্ত সায় দিচ্ছেন । তারপর বাকি টাকা আমি টিউশানি করে প্রফ দেখে বিজ্ঞাপন লিখে, কতরকম উজ্জ্বল করে জোগাড় করবার চেষ্টা করেছি । কখনো পেয়েছি জোগাড় করতে, কখনো পারি নি । কিন্তু আমার সমস্ত সংগ্রামের উৎসাহ আপনি আর আপনার ঐ কটা টাকা । ঠিক সময়ে ঐ টাকা কটা এসে আমাকে টেনে তুলেছে অবসাদ থেকে নৈরাশ্র থেকে—সমস্ত তিক্ততা থেকে । বঞ্চনার কথাই জেনে এসেছি, এ যে দেখি অল্পরকম । একেবারে অহেতুক ।’

‘মোটাই অহেতুক নয় ।’ হাসতে গিয়ে গম্ভীর হল কাকলি ।

‘যাই হোক, আপনার এ টাকা আমি শোধ করে দেব ।’

‘মস্ত বড় কাজ করবেন ।’

‘ই্যা, মস্ত বড় কাজ । উপকারীর ঋণ শোধ করাই আজকের দিনে মস্ত বড় কাজ ।’

‘কিন্তু আমি কি আপনাকে ধার দিয়েছি যে আপনি শোধ দেবার কথা বলছেন ?’ কাকলির চোখ মমতায় কোমল দেখাল ।

‘আপনি তবে কী দিয়েছেন ?’

‘আমি মেয়ের কাজ করেছি ।’

‘মেয়ের কাজ ?’

‘ই্যা, ঐ যে আপনার মা, উনি আমারও মা ।’ দুর্গাবালার তৃপ্তনীতল মুখের দিকে তাকাল কাকলি : ‘কাঁচা সঁাতসঁতে মাটির থেকে একটা গোটা পরিবারকে পাকা সিমেন্টের মেঝের উপরে নিয়ে আসব এ আমার স্বপ্ন—’

‘কী যে বলো !’ দুর্গাবালা পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, থামল । ‘দ্রুত দ্রুত, পরশ পর, আমরা তোমার কে ? আমাদের জন্তে কেন তোমার এত মায়া হবে ?’

‘মায়া কেন হয় তা কি কখনো বলা যায় ?’ কথাটা কাকলির নিজের কানেই বৃষ্টি জ্বল শোনাল ।

‘তুমি মাছুষ নও, তুমি দেবী ।’ পাশের ঘরে চলে গেল দুর্গাবালা : ‘মাছুষে এতটা করে না ।’

‘দেবীরাও করে না ।’ ফোড়ন দিল দীপঙ্কর ।

‘তা হলে অমাহুষ্য করে।’ লঘু হতে চাইল কাকলি।

‘শুন্ন, আমাদের দুঃস্থতায় আপনার দয়া হয়েছিল।’ দীপঙ্কর বললে, ‘আপনি করুণায় অকাতর হলেন। আপনি অমাহুষ্য কিনা জানি না। কিন্তু আমাকে দয়া করে অমাহুষ্য হতে দেবেন না। সত্যি কথা বলছি এক থোকে পারব না, আস্তে আস্তে কিছু কিছু করে আপনার টাকা শোধ করে দেব—’

‘না।’

দৃঢ়তাটা কতখানি গভীর প্রথমটা বুঝতে পারল না দীপঙ্কর। আপন মনে বলতে লাগল, ‘বরেন আমার সঙ্গে এখন সাংঘাতিক ভালো ব্যবহার করছে। এও আশ্বাস দিয়েছে অচিরেই আমার মাইনেটা বাড়িয়ে দেবে। তখন তো কোনো কষ্টই হবে না, বাড়তি টাকাটাই স্বচ্ছন্দে দিতে পারব আপনাকে। ব্যাক-পের থেকে একটা অংশ আপনাকে দিতে পারতাম বটে, কিন্তু তা হলে এই সিমেন্টের বাড়িটা ভাড়া নেওয়া যেত না।’

‘না, টাকা-ফাকা পারব না নিতে।’ কাকলি এবার আরও স্পষ্ট হল : ‘আমি কোনো দানখ্যান করি নি, আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি।’

‘কর্তব্য ? ঐ যে বলছিলেন মেয়ে— সেই মেয়ের কর্তব্য ?’

‘না, কাল্পনিক নয়, বাস্তব কর্তব্য। এক বিবেকবুদ্ধিমন্স ভদ্র নাগরিকের কর্তব্য।’ কাকলি শরীরে কাঠিন্দ্র আনল।

ঐা হয়ে গেল দীপঙ্কর। বললে, ‘এমন আপনার কোন কর্তব্য ?’

‘যদি অন্মায়রকম কাক ক্ষতি করে থাকি, তার ক্ষতিপূরণের কর্তব্য।’

‘আপনি স্কাস্তুর কথা ভাবছেন ?’

‘না, কাক কথা ভাবছি না। কিন্তু ধরুন, যদি কেউ অন্মায় করে কাক চাকরি কেড়ে নেয়, আর সে যদি দৈবযোগে আপনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়, আর আপনার বিচারে যদি আপনি মনে করেন ঐ কেড়ে নেওয়াটা অধর্ম হয়েছে, তা হলে আপনি কী করেন ? যদি আপনার স্বাধীন শক্তি থাকে, তা হলেও কি বসে থাকেন নিষ্ক্রিয় হয়ে ? অবিচারের প্রশ্রয় দেন ? অন্মায়ের শোধান করেন না ? ক্ষতিগ্রস্তকে দেন না পুষ্টিয়ে ?’

‘জানি না কী করি।’ যেন ফাঁপরে পড়ল দীপঙ্কর।

‘কিন্তু আমি জানতাম আমার কর্তব্য। তাই আমি অবিচারের প্রতিবাদে নিজে জরিমানা দিয়েছি।’

‘আপনার কী দায় !’

‘উক্ত বিচারককে শিক্ষা দেবার দায়। নীতিগত দায়। এক ইংরেজের কোর্টে সিভিলনের আসামীর জরিমানা আরেক ইংরেজ দিয়ে দিয়েছে নিজের পকেট থেকে এইটে বোঝাতে যে, এটা বিচার নয়, এটা গ্রহসন।’

‘এমনি গ্রহসন তো কত আছে সংসারে—’

‘এ গ্রহসন আমারই এক নিকট আত্মীয়, আমারই এক গহনতম লজ্জা। তাই এর শাসনে-সংশোধনে আমার সেই স্বাভাবিক প্রতিজ্ঞা।’

‘কিন্তু এখন— এখন কী করবেন? এখন কার ক্ষতিপূরণ করবেন?’

‘তার মানে?’ যেন চমকে উঠল কাকলি।

‘এখন আমার চাকরি দিয়ে স্বকাস্তর চাকরিকে রদ করা হচ্ছে—’

‘তার আমি কী জানি।’ কাকলি তাকাল অগ্নি দিকে। পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে বললে, ‘কিন্তু আপনি কি আমার নিকট আত্মীয় যে, আপনার অগ্ন্যয়ের খেসারত আমি দিতে যাব?’

‘বা, আমি আসি কোথেকে? আমি তো আর স্বকাস্তর চাকরি খাচ্ছি না। আমি শুধু আমার পুরোনো চাকরিতে গিয়ে বহাল হচ্ছি। চাকরি খাচ্ছে স্বয়ং বরেন। আর বরেন আপনার নিকট আত্মীয়।’

‘মোটাই নয়।’ উঠে পড়ল কাকলি।

‘হয় নি, হবে।’

‘যখন হবে তখন ভাবা যাবে ক্ষতিপূরণের কথা।’ কাকলি চলে যাবার উত্তোগ করল : ‘কিন্তু যাই বলুন, বরেনের বিচারটা তো অগ্ন্যয় হবে না। যে অনধিকারী জোর করে দখল করে নিয়েছে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া কি অগ্ন্যয়?’

‘একটা পাওয়া-চাকরি নিয়ে নেওয়াই ঘোরতর অগ্ন্যয়। যে-কোনো অবস্থায় অগ্ন্যয়।’

কোথায় যাবে কাকলি, দুর্গাবালা খাবারের থালা নিয়ে তাকে আটকাল। বললে, ‘তোমার মুখ এমনিতেই মিষ্টি, তোমার মিষ্টি মুখ কী করব, এ শুধু তোমার খাওয়া দেখে আমাদের চোখ মিষ্টি করা।’

খেতে-খেতে কাকলি জিজ্ঞেস করল, ‘সত্যিই ছাড়িয়ে দিচ্ছে ওকে?’

‘হ্যাঁ, শুনছি, তাই নাকি আপনার অর্ডার।’

‘বা, আমার অর্ডার! আমি কি কোম্পানির কেউ?’

‘শুনছি ওকে ডিসমিস করলেই নাকি আপনি খুশি হন। আর আপনাকে খুশি করতে বরেন বহুদূর যেতে পারে।’

‘বাজে কথা ।’

‘কিন্তু জানেন, ‘গুর যদি চাকরি যায় তা হলে ও ভীষণ বিপদে পড়বে ।’

‘কেন, বিপদ কেন ? টিউশানি করবে, স্কুল-মাস্টারি করবে ।’

‘তাতে হবে না । কষ্ট হবে । ও বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসেছে ।’

‘কেন, আলাদা কেন ?’

‘ঠিক জানি না । তবে অহুমান করতে পারি ।’

অহুমান তো কাকলিও করতে পারে । তবু জিজ্ঞেস করল, কী অহুমান ?’

‘অবনিবনা হয়েছে ।’

এটা এমন আর কী বেশি কথা । তবু একটু মস্তব্য করবার লোভ হল কাকলির : ‘চিরকাল এই অবনিবনাতেই ওস্তাদ ।’ সিঁড়াটা গুঁড়ো করতে লাগল অন্ত মনে : ‘আলাদা হয়ে থাকে কোথায় ?’

এটা কি মাজাতিরিক্ত কোতুহল নয় ? মনে মনে নিজেকে শিক্কার দিল কাকলি ।

‘হোটলে । কোন হোটলে, কী ঠিকানা, এখুনি আপনাকে বলতে পাচ্ছি না ।’

‘কে চায় ঠিকানা ?’ জলে উঠল কাকলি : ‘তার ঠিকানা দিয়ে আমার কী হবে ।’ হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিল জলের মাস ।

‘তা ছাড়া আরো এক তার ভীষণ অসুবিধে হবে চাকরি গেলে—’

দীপঙ্করের কথায় আর কান দেবে না কাকলি । কে না কার কী অসুবিধে হবে তার কী যায় আসে । দুনিয়ার লোকের দুঃখের ইতিবৃত্ত শোনবার তার সময় নেই, কুচি নেই ।

কাকলি উঠে শিশুগুলিকে আদর করতে লাগল ।

‘অসুবিধে হবে মানে,’ পিছু নিল দীপঙ্কর : ‘তার বিয়েটা পিছিয়ে যাবে ।’

‘বিয়ে ?’ না হেসে উঠে আর পারল না কাকলি : ‘আবারও সে বিয়ে করবে নাকি ?’ পরমহুঁর্তে, বিবেকে বিহীন খেলতেই বললে, ‘তা কেনই বা করবে না ? বিয়ে করতে আর দোষ কী । বিয়ে তো ভালোই । তা পাত্রী ঠিক হয়ে গেছে ?’

এ কি একটা প্রশ্ন ? দীপঙ্কর কি বিয়ের ঘটকালি করে ?

‘সুনেছি তো হয়েছে ।’ দিবা উত্তর দিল দীপঙ্কর ।

তা হোক । কোথাকার কে মধ্যবিস্ত পাঁচি-খোঁদি, জেনে কাকলির দরকার নেই । ঈশ্বর করুন যেন একটা ঝগড়াতে বুড়ি হয় । ঝগড়ার সময় হাতের সামনেই যেন কাঁটাগাছটা কুড়িয়ে পায় ।

‘আপনি তাকে চেনেন।’ দরজার কাছে ঘেঁষে এসে প্রায় কানে-কানে বলার মত করে বললে দীপঙ্কর।

‘চিনি?’

‘হ্যা, আপনার বন্ধু।’

‘বন্ধু?’

‘হ্যা, বিনতা।’

‘মিথ্যে কথা।’ কাকলি হঠাৎ ঝলসে উঠল। পরমুহুর্তে, বিবেকে বিছাৎ খেলতেই ভাবলে, বা, মিথ্যে হতে যাবে কেন? একজনের সঙ্গে আরেকজনের বিয়ে—এর মধ্যে মিথ্যের আছে কী! নিজেকে দমন করে মুখে স্বচ্ছন্দ হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, ‘আপনি কী করে জানলেন?’

‘বা, স্বকাস্তই বলেছে আমাকে। আপনি বরং আপনার বন্ধু বিনতাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন।’

‘আমার বয়ে গেছে! কার না কার বিয়ে হচ্ছে, কার না কার সঙ্গে, তাতে আমার আরি মাথাব্যথা।’ কাকলি ঘাড় ফেরাল দীপঙ্করের দিকে: ‘বরং এবার আপনার কবে বিয়ে হচ্ছে বলুন।’

পিছন থেকে ছুঁগাবালা বললে, ‘ঠিক তোমার মত একটি মেয়ে দেখে দিতে পারো না—ঠিক তোমার মত স্ত্রী, তোমার মত স্বভাব—’

কী সর্বনাশ! হেসে উঠল কাকলি।

দেখাদেখি দীপঙ্কর।

কলিং বেল টিপল বয়েন। বেয়ারা আসতেই বললে, ‘বোস সাহেবকে, স্বকাস্তবাবুকে খবর দাও।’

স্বকাস্তর সঙ্গে এতদিন যা সম্পর্ক ছিল, এতটা ঘটনা না করলেও হয়তো চলত। পাশের ঘরেই তো স্বকাস্ত বসে। মাঝখানের পার্টিশনের দেয়ালটা তো সিলিঙ পর্যন্ত ওঠে নি। এমনি গলা ছেড়ে নাম ধরে ডাকলেই বেশ চলত। এতদিন তো তাই চলছে। ঘটনা বাজিয়ে দূত পার্টিয়ে ডাকবার দরকার হয় নি। ইচ্ছে করলে অক্লেশে

নিজেও যেতে পারত ও ঘরে। কতদিন তাই গিয়েছে। হয় ওখানেই জমেছে, নৱ তো নিয়ে এসেছে টেনে।

কে জানে, সম্পর্কের স্বর বুঝি বদলাচ্ছে ক্রমশ।

কী একটা লেখা নিয়ে মগ্ন আছে বয়েন, ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্বকাস্ত।

হঠাৎ মুখ তুলে বয়েন বললে, ‘দীপঙ্কর তো ফিরে এল।’

‘তাই তো দেখছি।’ গা না লাগিয়ে বললে স্বকাস্ত।

‘এখন তোমার—তোমার কী হবে—ও কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো।’ বয়েন ব্যস্ত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল।

আর বুঝি ‘তুই’ নয়, ‘তুমি’। ‘তোয়’ নয়, ‘তোমার’। ‘বোস’ নয়, ‘বোসো’।

চেয়ার টেনে বসল স্বকাস্ত। বললে, ‘আমার কী হবে মানে?’

‘মানে, দীপঙ্কর তো তোমার জায়গায় এল।’ চোখের কোণটাকে একটু কুটিল করল বয়েন।

‘আমার জায়গায় আসবে কেন? সে নতুন অ্যাপয়েন্টেড হল।’

‘চেহারাটা সেরকম নয়। বলতে পারো, সে নিজের জায়গায় বহাল হল।’

‘তা হোক। তাতে আমার সঙ্গে তার ক্ল্যাশ কোথায়?’ অসহিষ্ণু হয়ে চেয়ারটা আরো কাছে টানল স্বকাস্ত: ‘সে তার পুরোনো পোস্টে, আমি আমার নতুন পোস্টে।’

করুণার অবতারের মত হাসল বয়েন। বললে, ‘আসলে পোস্টটা এক। তুমি এলে ও যায়, ও এলে তুমি যাও।’

‘বা, আমি যাব কেন?’ টেবিলের ধারটা শক্ত করে ধরল স্বকাস্ত: ‘তোমাদের বিজিনেস দিনে-দিনে কত এক্সটেণ্ড করছে, একটা বাড়তি চাকরি আমার জন্তে অনায়াসে তোমরা প্রোভাইড করতে পারো। যাকে বলে ডেভলাপমেন্ট অফিসার, অস্তুত তেমনি ধারা একটা কিছু—’

‘ডিরেক্টার্স মিটিঙে তাই বলব আমি।’ আশ্বাসে প্রশস্ত হল বয়েন।

‘ওসব মিটিং-কিটিং ফালতু কথা। তোমার বাবাকে যদি তুমি বলো তা হলেই হয়ে যায়।’ যেন অব্যক্ত এক সিক্ত স্বর বেজে উঠল প্রার্থনায়: ‘যেমন গোড়াতে হয়েছিল

‘সেটা একজনের ভেকেসিতে আরেকজনকে নেওয়া। সেখানে বাবার কথাই চূড়ান্ত। কিন্তু,’ সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানতে চাইল বয়েন: ‘কিন্তু এটা হচ্ছে বাড়তি লোক নেওয়া, কোম্পানির খরচ বাড়ানো। এটা তাই বোর্ডে যাওয়া উচিত।’

‘কিন্তু বোর্ড যদি উলটো সিদ্ধান্ত করে?’ স্বকান্তকে কেমন শুকনো-শুকনো শোনাল।

‘উলটো সিদ্ধান্ত মানে?’ অবোধের মত মুখ করল বরেন।

‘মানে, যদি আমাকে ছাড়িয়ে দেওয়া তাড়িয়ে দেওয়াই ঠিক মনে করে?’

‘তা হলে’, কথা যেন হঠাৎ খুঁজে পেল না বরেন, আমতা-আমতা করে বললে, ‘তা হলে, তুমি তা মেনে নেবে কেন? নেবে না মেনে। তুমি ফাইট করবে। মামলা করবে।’

‘মামলা করব!’

‘হ্যাঁ, দীপঙ্কর যেমন করেছিল।’

‘আবার মামলা!’ শূণ্ণে হাত ঝাড়ল স্বকান্ত।

‘কেন, মামলায় তো তুমি বরাবর জেতো। মামলায় তোমার ভয় কী! আর, এ তো কোনো সাজানো মামলা নয়, এ সত্যি মামলা। বোর্ড যদি তোমাকে ডিসচার্জ করে তবে সে ডিসচার্জ গ্রাচারেল জাঙ্গিসের পরিপন্থী। সহজেই তোমার জিত হবে মামলায়।’ বরেন সিগারেটটা ধরাল।

‘মামলায় জিততেও আমার আর কুচি নেই।’

‘সে কী?’ চমকে উঠল বরেন। এক মুহূর্ত তাকাল স্বকান্তর দিকে। তাকে একটা সিগারেট দেব-দেব করেও দিল না। বললে, ‘তা হলে কী করবে?’

‘আমি আমার নিজের লাইনে ফিরে যাব।’

‘নিজের লাইন। ট্রাম-লাইন, না রেল-লাইন?’

‘লেখাপড়ার লাইন। মাস্টারি করব। অধ্যাপকি।’

‘ও কি লাইন? ও পট-হোল। বড় জোর বলতে পারো গরুর গাড়ির নিক। গাইন অক টিমে তেতাল!।’

‘তা আর কী করা যাবে! যার যেমন সামর্থ্য।’ স্বকান্ত উঠি-উঠি করতে লাগল।

‘না, না, অত নিরাশ হবার কী হয়েছে? দেখি না কতদূর কী করতে পারি! আমিই তো আছি।’ সিগারেটটা ঝাঁ হাতে চালান দিয়ে ডান হাতে কলম ফের তুলে নিল বরেন।

আর কোনো কথা নেই। প্রশ্ন নেই, পরামর্শ নেই। নেই কোনো গুপ্ত মন্ত্রণার আত্মীয়তা। সব কিছুই সমাধান হয়ে গিয়েছে। সমস্ত জিজ্ঞাসা শুদ্ধ। কোতুল নিরস্ত। সংশয় দূরীকৃত। অভিলাষ চরিতার্থ। কিছুই আর ধরবার করবার নেই।

আর তবে বসে রয়েছ কী ! এবার ওঠো ।

‘উঠি ।’ নিঃসীম নিঃশ্বের মত উঠে পড়ল স্বকান্ত ।

অহুকম্পায় মন্থর চোখ তুলে তাকাল বরেন : ‘আচ্ছা, দেখি । এখনি হাল ছাড়বার কিছু হয় নি ।’

ধীরে ধীরে চলে গেল স্বকান্ত । পিছন থেকে তার যাওয়াটা বরেন দেখল আহাহা, স্মৃতি পরেছেন । সাহেব হয়েছেন । পেটে ভাত নেই, গাঁফে তা !

কেমন শীর্ণ দেখাচ্ছে পিছনটা । কেমন বা চৌল-খাওয়া । বরেনের মনে হল কে যেন পিছন থেকে স্বকান্তকে লাথি মেরেছে । বরেন ছাড়া আর কে মারবে ? ই্যা, বরেনই মেরেছে । তার বউ কেড়ে নিয়েছে । এবার চাকরি কেড়ে নেবে ।

কাকলি বলেছিল, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে । পিছন থেকে কেউ এসে ঘাড়ধাক্কা দিয়েছে বৃষ্টি । বরেন ছাড়া আর কে দেবে ? ই্যা, বরেনই দিয়েছে । ইউ ইমবেসিল ফুল, নিনকমপুপ ! নির্বীৰ্য ! নিস্তেজ, নিশ্চৌক্য । ক্লিয়ার আউট । বেরিয়ে যাও । কী, গেলে না ? যাও বলছি । হটো, ভাগো, নিকালো ।

সেদিনের ধূলোমাখা মক্ষ্মলের ছেলে সিমেন্ট বাঁধানো কলকাতায় এসে তড়াপেছিল । ঝিলিক মেরেছিল । শহুরে ভাষায় যাকে ডাঁট বলে সেই ডাঁট দেখিয়েছিল । কোথায় ভোঁতা-ভোঁতা ভারি-ভারি দা-কাটারি হয়ে থাকবে, তা না, শান-দেওয়া ফিনফিনে তরোয়াল হয়ে উঠেছিল । দেখলে, মুখে হাসি-হাসি ভাব রাখলেও গা জলে যেত বরেনের । গাফিলতি করতে করতে ঢিকোতে ঢিকোতে কোনোরকমে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে বেরো—তোদের যা অবস্থা, অত ঠাটবট কিসের, পড়া ছেড়ে দিয়ে কোথাও একটা পুঁচকে কেরানিগিরি চাকরি নে—তা না, পাহাড়ের গা ঘেঁষে-ঘেঁষে না, একেবারে চূড়া থেকে চূড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে তুঙ্গতম শিখরে এসে উঠলি—সহের অতীত এই দাহ । একটা কোলকুঁজো ঘুঁটে-কুড়োনে ছেলে, গলায় সোনার মেডেল ঝোলালি ! শৃঙ্গে যেখানে তুবার জমেছে, বলমলাছে সোনালি রোদে, সেখানে সেই খ্যাতির স্তম্ভতায় ঠাঁই নিলি জগজ্ঞানের সপ্রশংস সোনার দৃষ্টির প্রসাদে । তাও না হয় সহিত, ক্ষমা করা যেত, কিন্তু কী বলে কোন সাহসে কাকলির মত মেয়েকে বিয়ে করলি ? বানর হয়ে পরলি মুক্তোর মালা ? সামান্ত পাঁচালি লিখে বসলি গিয়ে কবিলমারোহে ! শোন, এতটা হয় না, সন্ন্যাস, দৃষ্টিকটু লাগে । কাকলির মত মেয়ে তোর মত হজগজ-র জন্তে নয়, তোর জন্তে নয় রাজা-রাজদার প্রতীতি । পাড়ার ছেলে পাড়ায় গিয়ে টহল দে । কেমন সুন্দর বললে কাকলি ! উড়ুনি উড়িয়ে শ্রাওল পায়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে টিউশানি করে বেড়াবে । যাব

যেমন কাজ ! যার যাতে হজম ! বিশ্বস্থিতিতেও একটা নিয়ম আছে, রাজা আছে ।
বৈদ্যদৃষ্টকে সে বরদাস্ত করে না । বামন হয়ে চাঁদ ধরাটা সেখানকার এটিকেট নয় ।

আঙুল ফুলে কলা গাছ বরং দেখা যায়, কিন্তু তুই আঙুল ফুলে অশ্বখ গাছ হতে
গিয়েছিলি । তাই তোর আঙুলও গেল, গাছও গেল । বউও গেল, চাকরিও
থাকল না ।

উপভোগের প্রচ্ছন্ন জিভ দিয়ে মনের সর্বাঙ্গ চাটতে লাগল বরেন ।

‘বউ নিয়েছে নিক, কিন্তু চাকরি নিতে দেব না ।’

‘বউ নিয়েছে মানে ?’ দীপঙ্করের মুখের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল স্বকান্ত ।

‘বউ মানে কাকলি মিত্রের কথা বলছিলাম ।’

‘ও কি আমার বউ ?’

‘আই অ্যাম সরি । এক্স-বউ । প্রাক্তননী ।’ বিশেষ আর কোনো সঙ্কান্ততার
অপেক্ষা রাখে না বলে একটু বা নিশ্চিন্ত হল দীপঙ্কর । বললে, ‘প্রথম পক্ষী ।’

‘তা মিস মিত্রকে কী করেছে বরেন ?’ একটু যেন বা উন্নয়নের মত তাকাল
স্বকান্ত ।

‘একটা মেয়েকে আর কী করতে পারে ? বিয়ে করতে পারে ।’ বুঝি বা একটু
হাসল দীপঙ্কর : ‘কাকলিকে বিয়ে করেছে বরেন ।’

‘তা করুক না ।’ মুখ ফিরিয়ে নিল স্বকান্ত । ‘সী ইজ ফ্রি টু ম্যারি—’

‘ই্যা । দেশে দেশে কলজানি । কিন্তু বরেন এমন একখানা ভাব করেছে যেন মস্ত
এক দাঁও মেরেছে—’

‘কেন, আছে কী গুর মধ্যে ?’

‘কার মধ্যে ?’

‘ঐ তোর, কী না-জানি নাম— কাকলির মধ্যে ।’ সঘণ কটাক্ষ করল স্বকান্ত :
‘ও তো নষ্ট ।’

‘নষ্ট ?’ ভিন্ন অর্থে চমকে উঠতে চাইল দীপঙ্কর ।

‘ই্যা, নষ্ট ।’ সম্যক অর্থে আকৃষ্ট করতে চাইল স্বকান্ত । সঙ্গে আরো দুটো
বিশেষণ জুড়ল : ‘দষ্ট । চর্বিত ।’

‘তা, গকরাই তো চর্বিত-চর্বণ করে ।’ যুহু স্বরে হাসল দীপঙ্কর : ‘মুখরাই তো
পরের বউকে বিয়ে করে জাঁক করে বেড়ায় ।’

‘পরের ব্যবহৃত বউকে ।’ সংশোধনী জুড়ল স্বকান্ত । উত্তেজনায় জোরালো
শোনাল কণ্ঠস্বর ।

‘এই, আস্তে।’ যদিও আফিসে ঠিক-রয়েনের পাশের ঘরেই এরা এখন বসে নেই, তবু কে জানে, দেয়ালের কান আছে, পিপড়ের মত কথা হাঁটে অলক্ষ্যে, তিলকে তান করে স্তনতে পারে বরেন। স্তনলে, আর যাই হোক, রাগের মাথায় চাকরিটা না খসায়। বউ গেলে বউ পাবে, কিন্তু চাকরি গেলে চাকরি দূরস্থান।

‘বা, আস্তে কেন? তুমি বলছ দাঁও মেয়েছে এমনই এক ব্যাপার। তা হলে তো উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি দেওয়াই সমীচীন।’

‘না। তুষ্ট করেছ তুষ্টই করে যাও।’ দীপঙ্কর গস্তীর হল: ‘চাটিয়ে লাভ নেই। চাকরিটা না যায়।’

‘গেলে যাবে।’ হাল ছেড়ে দিল স্বকান্ত।

‘এ বউ নয় যে গেলে যাবে বলে হাত তুলে নেবে—’

‘আমার বউ গেল কোথায়?’ তপ্ত হয়ে উঠল স্বকান্ত: ‘আমি তো তাকে ফেলে দিয়েছি। ছুঁড়ে দিয়েছি জানলা দিয়ে। আমার তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর ও কুড়িয়ে নিয়েছে। ছিবড়ে কুড়িয়ে নিয়েছে। তুমি বলছ ঐ ছিবড়ে নিয়েই ওর দেমাক!’

‘কেন নয়? অমূকের ডিভোর্সড স্ত্রীকে বিয়ে করেছি এও আজকাল এক জলুস। আগে আগে স্তনেছি নিজের স্ত্রীতে পরিচিত, প্রসিদ্ধ হত স্বামীরা। আধুনিক কোনো কোনো স্বামী—তাদের গো-স্বামী বলতে পারো—পরের স্ত্রীতে, মান, পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীতে, তকমা আটে। অমূক স্ত্রীলোকের স্বামী শুধু এই আখ্যায় স্বথ নেই, অমূকের বজিত স্ত্রীর স্বামী এই পরিচয়ে স্বথ। শুধু স্বথ নয়, গৌরব। ভাবখানা এই, যেন কত বড় আবিষ্কারক। পূর্বতন স্বামী মূর্খ, অকিঞ্চিৎ, তাই ধরতে পারে নি স্ত্রীর তাৎপর্য। আমি পারঙ্গম, বুঝতে পেরেছি ঠিক-ঠিক মহিমা, তাই গজমুক্তার হার দাঁতে না কেটে গলায় পরেছি। এমনি ভাবের থেকে সমাজের কাছে মূল্য নেবার চেষ্টা, ডকা মেয়ে বেড়ানো।’ বিজ্ঞপের ঝাঁজ মেশাল দীপঙ্কর।

‘বেড়াক ডকা মেয়ে।’ স্বকান্ত উদাসীনের মত বললে।

‘ভাবখানা এই, স্বকান্তটা অপোগণ্ড, সাধ্য নেই কাকলির মানে বোঝে, তার মান রাখে। তাই আমি, বিদগ্ধ ও বিদ্বান, প্রবল ও সমর্থ, ওকে নিয়ে এসে ওর যোগ্য আসনে বসিয়েছি। তা ছাড়া নীচ স্বকান্তের ঘরে যে অবহেলা ও অবিচার ওকে সহ্য করতে হয়েছে তারও নিরাকর্তা আমি। এমনি এক চাক পিটিয়ে সমারোহ করা।’

‘তাতে আমার আপত্তি কী! যে চাক্রে এত শব্দ সে আমারই বর্জিত এই স্বকৃত্যই আমার চরম উত্তর। আর, অনেক সময় জানো তো,’ স্নিগ্ধ চোখে তাকাল স্বকাস্ত : ‘চাকের বাজনা থামলেই মিষ্টি। কিন্তু, কিন্তু—’ স্বান হাসল এখানে : ‘এত কথা তুমি জানলে কি করে?’

‘এত কথা মানে? কথা তো খুবই সামান্য।’

‘ই্যা, অতি সামান্য কথা। মানে ওদের বিয়ের কথা। ওরা বিয়ে করছে এ তোমাকে বললে কে?’

‘বা, কাকলিই বলেছে।’

‘ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?’

‘বা, আমাদের বাড়ি এসেছিল যে। প্রায়ই তো আসে।’

আসুক। এতে কার কী বলবার আছে? কেন আসে—এতে কারই বা কী কৌতুহল!

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল স্বকাস্ত। পরে হঠাৎ বললে, আশ্চর্য, মুখ দিয়ে কথাটা এসে গেল অজানতে; ‘তা হলে বেশ আনন্দেই আছে।’

‘তা আর বলতে। কত বড় স্বামী!’

‘ই্যা, এই নিয়ে কার কিছু বলবার-কইবার নেই। সমাজে-আইনে সে এখন স্বাধীন, যাকে তার মন চায় তাকেই সে বিয়ে করতে অধিকারী। তাই করুক।’ সহসা সমস্ত মন তুলে নিল স্বকাস্ত : ‘ও স্বথী হোক, শাস্তি পাক।’

‘কিন্তু যদি এই কাণ্ডটা ইন ওয়েডলক ঘটত?’ দীপঙ্কর উল্কে দিতে চাইল।

‘তার মানে?’

‘যদি, যদিই তোমাদের বিয়েটা ছিল, তার মধ্যে ঘটত এই দুষ্কাণ্ড?’

‘মানে, বলতে চাও, আদালতে বিচ্ছেদের কারণ যেটা বলা হয়েছিল সেটা ছিল না হয়ে যদি বাস্তব হত?’

‘ই্যা, বর্জিত হবার পরে নয়, বিবাহিত থাকবার মধ্যেই, যদি ঘটত এই অভিশ্রম?’ দীপঙ্কর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল।

‘তা হলে? তা হলে শব্দের মাছের লেজের খোঁজ করতাম।’

‘সে লেজে কাকে সংবর্ধনা করতে?’

‘নিশ্চয়ই নারীকে নয়। পুরুষকে। যে আমার অধিকারকে লুণ্ঠন করতে এসেছে সেই আততায়ীকে।’

‘এখনো তো আরেকবার খোঁজ করলে পারো।’

‘না, না, এখন আর আমার অধিকার কোথায়? দাড়ি কামিয়ে ফেলবার পর সে দাড়িতে আর অধিকার থাকে না।’

‘আহা, তোমার প্রাস্তনীর কথা কে বলছে?’

‘তবে কার কথা বলছ?’

‘চাকরির কথা বলছি।’ দীপঙ্কর ষড়যন্ত্রীর মত ঝুঁকে এল সামনে: ‘দেওয়া চাকরি যদি আবার ফিরিয়ে নেয় তবে—’দাঁতের সঙ্গে দাঁত ঘষল দীপঙ্কর। হাতের মূঠো দৃঢ় করল।

কীণকণ্ঠে হাসল স্ফাস্ত। বললে, ‘এর জন্তে চাবুক চলে না। যদি চলেও তাতে চাকরি হয় না, শ্রীঘর হয়।’

‘তুমি একটা কাওয়ার্ড।’

‘তা যদি বলো, মেনে নেব।’ নিশ্বাস ফেলল স্ফাস্ত।

‘না হলে মামলা করো। আমি যেমন করেছিলাম।’

‘তুমি কোথেকে টাকা পেয়েছিলে জানি না, কিন্তু আমার টাকা নেই। কেউ সাহায্য করবার নেই। আমি একা, বিচ্ছিন্ন—’ নিজেই নিজেকে সহসা চাবুক মারলে স্ফাস্ত, অবসাদ থেকে তুলল ধাক্কা মেরে: ‘আসল কথা, মামলা ব্যাপারটাতেই কেমন একটা ঘেমা ধরে গেছে। আদালত তো নয়, নরককুণ্ড। যেখানে গোটা একটা মিথ্যা নিরেট ইমারত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে—’

‘তা আদালতের দোষ কী! ইমারতের কারিগর তো তোমরা।’

‘না, কার দোষ ধরছি না।’

‘মামলাও যদি না করো তা হলে করবে কী?’

‘একা মাহুশ, করবার দরকারই বা আছে কী! লেখাপড়া নিয়ে থাকব।’

‘মানে ডঃ হবে?’

প্রথমটা বুঝতে পারে নি স্ফাস্ত।

‘আগে ডঃ ছিল এখন ডঃ হয়েছে। ডক হয়েছে। ঠিকই হয়েছে। ডকে জাহাজ থাকে তেমনি তোমরাও বিশ্বের জাহাজ পুষবে এক গাদা—’

‘সে সব ছুরাকাজ্ঞা আর নেই। স্কলারশিপ-টিপ কবে গেছে।’

‘আর সেই যে—সেদিন যে বলেছিলে—’ দীপঙ্কর মনে করিয়ে দিতে চাইল।

‘কী বলেছিলাম?’

‘সেই বিনতার কথা—’

‘হ্যাঁ, বেচারী, তাকেও বলব। নইলে সে যদি আসে আর মাঝপথে হঠাৎ

দেখে আমার চাকরি নেই, তাকেই খাওয়াতে হচ্ছে আমাকে, তার কমিটমেন্টস পুরোপুরি রাখতে পারছে না, তা হলে, কে জানে, হয়তো বিরক্ত হবে, খেপে যাবে—’

‘হয়তো আবার কোর্টে ছুটোছুটি করবে!’ হাসল দীপঙ্কর।

‘বলা যায় না।’ হাসল স্বকান্ত : ‘বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। তেমনি ভিভোর্সে ছুঁলে আঠারো বিয়ে। তাই তাকে আগেই বলে রাখব।’

‘কী বলে রাখবে? বাঘের কথা?’

‘না। বলে রাখব সে যে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে সেটা তাসের ঘর। এক ফুঁয়ে শূত্রে মিলিয়ে যাবার মত। এক উপরিয়ালার মর্জির উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত বনেদ টলমল করছে—’

‘না, হবে না কিছু বলতে।’ দৃঢ় হল দীপঙ্কর।

‘হবে না?’

‘না। এখনো তো যায় নি চাকরি। বিনতাকে তবে মিছিমিছি ভয় পাইয়ে দেবে কেন?’

‘যায় নি, যাবে অচিরে। ভয়ের কী আছে? তবু সম্ভাবিত বাস্তবের ছবিটা আগে থেকে দেখিয়ে দেওয়া কি ভালো নয়?’

‘না, নয়। কেননা চাকরি যাবে না। যেতে দেব না আমরা।’ উঠে দাঁড়াল দীপঙ্কর।

‘এ তুমি কী করে বলছ? এখানে ইউনিয়ন নেই, ষ্টাইক নেই, শঙ্কর মাছেব লেজ নেই, ঘৃষ পাঠাবার মত লালস নেই—নির্ধাত বিদায় হয়ে যাব।’

‘না। যে আদালতকে নরককুণ্ড বলে বিদ্রূপ করতে চেয়েছ সেই আদালতই আবার হতসর্বস্ব একলা মাহুঘের আশ্রয়। স্বতরাং আর কিছু আপাতত না পারি মামলা করার তোমার হয়ে। তোমার টাকা না থাকে সে টাকা আমি জোগাব, আমরা জোগাব। আর সে মামলায় আমরাই জিতপার্টি—’ দরজার কাছে এগিয়ে গেল দীপঙ্কর। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, ‘স্বতরাং বউ নিয়েছে নিক, চাকরি নিতে দেব না।’

ক্লান্তের মত নিজের একলা ঘরে, হোটেলের শুয়ে আছে স্বকান্ত! টুক টুক করে দরজায় আঙুলের গিঁটের মৃদু-মৃদু শব্দ হল।

‘এসো, দরজা খোলা আছে।’

একটা চিতাবাঘের মত ঝলমল করতে করতে দ্রুত ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকল

বিনতা। ভীষণ চমকে উঠেছিল স্বকান্ত। এতদূর চমকেছিল যে, উঠে বসেছিল বিছানায়। পরমুহূর্তেই হাসল আপন মনে। ভক্তিটা শিথিল করে দিল। কাকনি কি কখনো অমনি, অতথানি সাজগোজ করে? নাকি তার সাজগোজে স্বর-স্বহার স্পর্ধা থাকে?

ছিটকিনির উপর দুঃসাহসী হাত রাখল বিনতা।

‘ছিটকিনি দিতে হবে না। দরজাটা শুধু ভেজানো থাক।’ বিছানা থেকে নামতে নামতে বললে স্বকান্ত।

•৪৫

সেই থেকে, স্বকান্তের বাড়ি ছেড়ে হোটেলে আসার পর থেকেই, বিনতা তার পিছু নিয়েছে। ছি ছি, অমনি করে ভাবছে স্বকান্ত? পিছু নিয়েছে? তুমি নিজে পথ না দিলে সাধ্য কী কেউ পিছু নেয়! পিছু নিয়েছে তো বুক ঠুঁকে কণ্ঠে দাঁড়াও না। সমকক্ষসংঘাতে দাঁও না তাড়িয়ে।

পিছু নিয়েছে! যে দুর্বল, যার প্রতিরোধের ক্ষমতা কম, রোগ তারই পিছু নেয়।

হোটেলে আসার সামান্য কয়েক দিন পরেই একদিন বিনতা এসে হাজির।

বন্ধ দরজার উপরে আঙুলের গিঁটের মৃদু-মৃদু শব্দ। যেন চমকে দেবে তারই অল্পচ গভীর ইশারা।

চমকে দেবারও অনেক স্তর আছে, পাপড়ি আছে। একেকটি পাপড়ি মেলো, একেকটি চমক ফোটাও। চমক ছাড়া জীবন কী! কবিতা কী!

‘আরে, আপনি?’ দরজা খুলে চমকে উঠেছিল স্বকান্ত। সংকীর্ণ বেশবাস বিস্তীর্ণ করতে-করতে বলেছিল, ‘ভাবতেই পারি নি।’

‘একেবারে ভাবতেই পারেন নি!’ কটাক্ষ করবার চেষ্টা করল বিনতা।

‘কী করে পারব বলুন। সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, নিলুম না সাহায্য। ভাবলুম চটেই গেলেন বুঝি।’

‘সাহায্য?’ চোখ দুটো একটু কপালে তোলবার চেষ্টা করল বিনতা : ‘আপনার সেই মামলার কথা বলছেন?’

‘হ্যাঁ। দেখলেন তো আপনার বিনা সাহায্যে, মানে, আপনার অপ্রতিবাদিষেই, কেমন ডিক্রি পেয়ে গেলাম।’

‘তাই তো অভিনন্দন জানাতে এসেছি।’

‘অভিনন্দন?’

‘হ্যাঁ, যে মুক্তি খুঁজে নিতে পেরেছে সে-ই অভিনন্দনের যোগ্য।’

একটু বা সুগোল চোখে তাকাল সুকান্ত : ‘আপনি তা হলে আমার পক্ষে ? আপনার বন্ধুর পক্ষে নয়?’

‘আমি দু-জনেরই পক্ষে। কেমন দু-জনেই আপনারা সংগ্রাম করে মুক্ত হয়েছেন— আমি স্বাধীনতার পক্ষে। আমি স্বাধীনতাকেই সংবর্ধনা করছি। স্বাধীনতা জিন্দাবাদ।’

‘কী আশ্চর্য, বন্ধন।’

ভক্তিকে বিলোল করে, চেয়ারে না গিয়ে, সোফায় বসল বিনতা।

দরজা বন্ধ হল না। ভেজানোও না। শুধু পর্দাটা আধখানা টেনে দিল সুকান্ত।

চুলটা ঠিক করতে-করতে বিনতা বললে, ‘এখন কাকলি তার মনোনীত জীবনে গিয়ে ঢুকবে, আপনি আপনার।’ বহুপ্রাঞ্জের মত সূক্ষ্ম রেখায় হাসল : ‘অতীতে একবার সাহায্য নেন নি বলে ভবিষ্যতেও নেবেন না এ আপনি বলতে পারেন না জোর করে।’

‘না, তা বলতে পারি কই? কেউ পারে না। কোনো অহংকারই টেকে না সংসারে।’

‘হ্যাঁ, জীবন প্রকাণ্ড, দড়ি কেলে আর কোনোদিন তার সরজমিন তদন্ত হয় না।’ বিনতাও কথায় তত্ত্বের স্বর আনতে পারে : ‘কেউ মাপজোক করে বার করতে পারে না তার সরহঙ্গসীমানা। যে হারাবার নয় সেই হারিয়ে যায় আর যে স্বপ্নের অগোচর সেই একদিন অনায়াসে হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসে।’ তেমনি সেও এসেছে এমনি হেলে-ঢেলে নড়ে-চড়ে উঠল বিনতা।

মুঠের মত তাকিয়ে রইল সুকান্ত।

‘কী করে আপনার ঠিকানা পেলাম জানতে চাইলেন না তো!’ মদালসার মত চোখ করে তাকাল বিনতা।

‘সত্যিই তো, আশ্চর্য, একদম মনে আসে নি। সত্যি, কী করে পেলেন ঠিকানা?’

‘যার জন্তে আমরা ব্যাকুল সেই ঈশ্বিতকে যদি পাওয়া যায়,’ বিনতা আবার তত্ত্বের স্বর আনল : ‘তবে তার সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত কৌতূহল অবাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। সে এসেছে, তাকে পেয়েছি, শুধু এই কথাটাই একমাত্র হয়ে ওঠে।’

‘সত্যি, কী করে পেলেন?’

‘অতুমান করুন।’

‘আমার আফিসে গিয়েছিলেন?’

‘আপনার আফিস? সে আবার কোথায়?’

‘তবে বয়েনের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?’

‘আমি কি কাকলি, যে বড়লোকের ভঙ্গনা করব?’ অন্তরে কোথায় একটা জ্বালা আছে বিনতার, কণ্ঠস্বরে উঠে এল।

‘তবে?’

‘পারলেন না তো অতুমান করতে। আমি আপনার বাড়িতে গিয়েছিলুম।’

‘আমার বাড়ি!’ ধূলিসাৎ করে দিতে চাইল স্বকাস্ত।

‘মানে আপনাদের বাড়ি।’ রাস্তার নাম-নম্বর বললে বিনতা।

‘গিয়েছিলেন?’ পলকের জন্তে প্রফুল্ল না হয়ে পারল না স্বকাস্ত। বললে, ‘কী দেখলেন?’

‘দেখলাম তেতলায় ঘর উঠছে।’

‘ওসব ঘরদোরে আমি ইনটারেস্টেড নই।’

‘আমিও না।’ নিম্পৃহ মুখে সায় দিল বিনতা : ‘একটা মৌমাছির চাকে নিরর্থক ফোকর বাড়ছে তাতে কার কী মাথাব্যথা!’

‘ও তো বাইরে থেকে দেখলেন। ভিতরে কিছু দেখলেন?’

‘দেখলাম।’ মিটিমিটি হাসতে লাগল বিনতা।

‘কী দেখলেন?’

‘দেখলাম আপনার ঘরে আপনার টেলিফোনটা নিয়ে সবাই কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে।’

‘কী সর্বনাশ!’ আতঙ্কে মুখ কালো করল স্বকাস্ত : ‘ওটা এখনো ডিসকনেকটেড হয় নি বুঝি? আফিস তো জানে আমি এখানে। তবে?’ তারপর চোখ ফেরাল বিনতার দিকে : ‘কে, কারা কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে?’

‘আপনার বউদি বন্দনা আর কাকিমা বিজয়া। যেখানে যা পাচ্ছে, সম্ভব-অসম্ভব দূর-অদূর সমস্ত সম্পর্কের বাড়িতে টেলিফোন করে চলেছে। কখন নিয়ে যায় ঠিক নেই, মাগনা পাওয়া গিয়েছে, মনের স্বখে চাকতি ঘোরাও—ডায়াল করো। শেষকালে বিজয়া এক অপরিচিত বাড়িতে রিং করে বলল। বললে, বাড়ির মেয়েদের চাই। মেয়ে একজন এসে বললে, কী চাই? বিজয়া বললে, দুপুরবেলা ঘুম আসছে

না, তোমার সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে চাই ভাই। ভালো আছ সকলে ?
বলছে আর হাসছে।’

‘কী সর্বনাশ ! মা কিছু বলছেন না ?’

‘তিনি কী বলবেন ! তাঁকে বলা হয়েছে নিরভিভাবক ফোন, পয়সার খিরকিচ
নেই, তাইতেই তাঁর শাস্তি। শুধু একজনই যা একটু বাধা দিচ্ছিল—’

‘একজন—কে একজন ?’

‘সেন্টু।’

‘কেন, সেন্টু কী বলছিল ?’ চোখমুখ উজ্জ্বল হল স্বকান্তর।

‘ও নিজের স্বার্থেই বাধা দিচ্ছিল। মানে ওও চাচ্ছিল ফোন করতে। আপনাকে
ফোন করতে।’

‘আমাকে ?’

‘হ্যাঁ, বারে-বারে ও জানতে চাচ্ছিল কাকা কবে কাম্বাকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে।’

‘ওকে বুঝি করতেই দিচ্ছিল না ফোন !’

‘আপনার মা ওকে বারে-বারে সংশোধন করছিলেন—’

‘সংশোধন ?’

‘হ্যাঁ, বলছিলেন, কাকা আর কাম্বাকে নিয়ে ফিরবে না, কাকিমাকে নিয়ে
ফিরবে।’

সম্মিত চোখোচোখি হল দু-জনের।

‘ভিতরের এত খবর আপনি পেলেন কোথেকে ?’

‘একেবারে ভিতরে ঢুকতে পেলুম যে। শুধু বাড়ির ভিতরে নয়, আপনার মার
হৃদয়ের ভিতরে। আমিও জাহ্নু জানি।’

‘জাহ্নুটা কী ?’

‘আমি দেখতে সুন্দর।’ বলে নিজের মনেই হাসল বিনতা : ‘শুধু এতেই হত না।
আমার ব্যবহার নম্র, মৃদু, লজ্জালু। শুধু এতেও হত না। আমি আপনার বন্ধু—
পড়তুম একসঙ্গে—’

‘পড়তেন ?’ প্রতিবাদ করে উঠল স্বকান্ত।

‘ওটা বানালুম। মাঝে মাঝে কিছুটা বানিয়ে বলতে হয়—’

‘তা হয়।’ সায় দিল স্বকান্ত : ‘কিন্তু কিছুটা।’ সঙ্গে আবার সাবধান করে দিল।

‘যেটা বিশ্বাস সে ক্ষেত্রেই বানানো চলে। আসলে আমি হয়তো আপনার চেয়ে
বয়েসে কিছু বড়—’

‘বয়েস যায়। আত্মার বয়েস নেই।’

‘আকাক্ষারও নেই। তা ছাড়া, মেয়েদের বয়েস কে ধরে? আসলে চল্লিশ, দেখার চব্বিশের মত। তাই আমি যে আপনার একবয়সী, পড়তুম একসঙ্গে—এ বিশ্বাস করতে মায়ের বেগ পেতে হল না। আর যখন আপনার সহপাঠী তখন আমি কাকলিরও সহচরী। আর, আমি আর কাকলি যে বন্ধু, এক হস্টেলে থাকি, এ তো সত্য কথাই।’

‘ও কথা মা তুললেন, না আপনি তুললেন?’

‘আমি তুললাম। আর তুলেই আছাড় মারলাম।’

‘আছাড় মারলেন?’

‘হ্যাঁ, ঠেসে নিন্দে করলাম। যাকে তুলো-ধোনা বলে তেমনি।’

‘বা, নিন্দে করতে গেলেন কেন?’

‘নিন্দে করব না? কী একথানা প্রশংসার কাজ করে গেছেন তুমি? একটা সংসার তছনছ করে দিয়ে চলে গেল! খুব ভালো কাজ?’

‘বা, আমিই তো তাকে তাড়িয়ে দিলাম!’

‘তা তো দেবেনই। আর নিন্দে না করলেই বা আমি মায়ের মন পাই কী করে?’ সরল মুখে হাসল বিনতা : ‘মন-প্রাণ ঢেলে নিন্দে করলুম আর মা আমাকে নিমেষে আপনজন বলে স্থির করলেন। আপনার ঠিকানা দিয়ে দিলেন। আর বলে দিলেন, যেন আবার আপনার খবর নিয়ে এসে তাঁকে জানিয়ে যাই। যোগাযোগের সেতু করলেন আমাকে।’

‘যাকে বলে লিয়াজ’ অফিসর।’ মুখ টিপে হাসল স্ককাস্ত : ‘কথাটার কিছু আরেকটা মানে আছে। মানেটা খুব সম্ভাস্ত নয়।’

আদৌ নয়। মানেটা খারাপ। অবৈধ। কিন্তু, যাই বলুন, ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন।’ কপালে হাত তুলে সেই অল্পপস্থিতের উদ্দেশে নমস্কার করল বিনতা।

‘বাঁচিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ, আমাকে আপনার মামলায় ব্যাভিচারিণী সাজতে হয় নি, আপনার মামলায় বাইরে আমি যেমন ভদ্র, যেমন বৈধ, যেমন পবিত্র, তেমনি ভদ্র আর বৈধ আর পবিত্র হয়েই দেখা দিয়েছি। আমার পথ ঘুরপথ নয়, আমার পথ সরল সদ্‌বের পথ। মা কি আর সোজা আপন বলে ভাবলেন! ঠিকানা দিলেন আপনার। তলব তাগাদা করার সুবিধে করে দিলেন!’

ইচ্ছায় আর এর চেয়ে কী বেশি অভিব্যক্ত হওয়া যায়! স্বকান্ত চূপ করে রইল।

চা আর চিংড়ির কাটলেট খেয়ে চলে গেল বিনতা। বললে, ‘আবার আসব। মার কথামতই আসতে হবে।’

‘মার কথামত!’

‘বেশ তো, বলুন না, আপনার কথামত! তা হলে তো আরো ভালো!’

আবার কদিন পরে এল ঠিক বিনতা। নিজের হাতেই এবার সে পর্দা টানল। আর আধখানা নয়, সম্পূর্ণ।

‘এ কি, ফোন পান নি এখনো?’

‘না। হোটেলটা পার্মানেন্ট রেসিডেন্স নয়, আপত্তি করছে আফিস।’ বললে স্বকান্ত।

‘ঠিকই করছে।’ চেয়ারটা একটু এগিয়ে নিয়ে বসল বিনতা।

‘মোটাই ঠিক নয়। হাইলি টেকনিক্যাল। সংসারে কিছুই পার্মানেন্ট নয়। আর আমি যেখানে থাকব সেটাই আমার রেসিডেন্স।’

‘তাই বলে জঙ্গলে মাচা বেঁধে থাকবেন বা নদীতে নৌকোর পাটাতনে, ওটা আপনি মাহুঘের আবাস বলতে পারেন না।’ দুই চোখে তিরস্কার ভরে তাকাল বিনতা: ‘হোটেলের একক ঘর একটা কী! পর্বতের গুহাও এর চেয়ে ভালো। এর চেয়ে নির্বিল।’

‘না, না, একা লোকের পক্ষে হোটেলই আইডিয়াল।’

‘একা লোকের পক্ষে! কিন্তু কোনোদিন যদি গেস্ট আসে?’

‘তেমন গেস্ট এলে, এখানে, এ ঘরেই থাকবে।’

‘এক রাজির গেস্ট নয়, সারা জীবনের গেস্ট।’

‘সারা জীবন ধরে থাকলে সে আর গেস্ট নয়, সে গোস্ট।’ হাসল স্বকান্ত: ‘নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, তেমন ভূতে আর আমাকে ধরবে না।’

‘মোটাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। ভূতের হাতে ধরা না দিলে নিজেই কখন ভূত হয়ে যাবেন। সেটাও হতে দেওয়া ভয়ের কথা।’

‘সব সময় ভূতই ভয় দেখায় না, মাঝে মাঝে ভূতও ভয় পেয়ে সটকান দেয়। তেমনি আমাকে দেখে ভয় পাবে ভূত।’ একটু বা আত্মস্থ হল স্বকান্ত: ‘আমার অনেক দোষ। আমি অসহিষ্ণু, সন্দ্বিগ্ন, ক্ষুদ্রদৃষ্টি। আমাকে দেখে ভূতের সাবধান হওয়া দরকার।’

‘আপনি তো আমাকে সাবধান করছেন। আমি কি ভূত?’ ঝটকা মেরে উঃ দাঁড়াল বিনতা : ‘দেখুন, ছুঁয়ে দেখুন, আমি কি অশরীরী?’

হ্লাদিনীকে দেখ, কিন্তু খবরদার, ছুঁয়ো না। শুধু দেখলেই আপাতকুল হবে না, কিন্তু ছুঁয়েছ কী, পড়ে গিয়েছ। সেই শক্তি তোমাকে স্পন্দিত করেছে।

স্বকাস্ত দ্বিধা করতে লাগল।

‘কী, বলুন, আমি কি ভূত?’ পরাস্তের মত বসে পড়ল বিনতা। কিন্তু পড়েও মাটি ছাড়ল না। বললে, ‘আমি ভূত নয়, আমি ভবিষ্যৎ। আর ভবিষ্যতেও জলবায়ুতে আপনার দোষত্রুটি কিছু থাকবে না। আপনি উদার হবেন, সহিষ্ণু হবেন, চোখের থেকে ক্ষুদ্রতা আর সন্দেহ চলে যাবে। কী জানি সেই গানটা—নয়নের দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো—’

‘বলিহারি। আর যখন একদিন গর্জে উঠে ছকুম করব, বেরিয়ে যাও বাড়ি ছেড়ে—তখন, তখন কী করবেন?’

এমন প্রত্যক্ষ বাস্তবের সুরে উচ্চারণ করল কথাটা যে শুনেই মুহূর্তে বিনতা পাংশু হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল অভিনয়টা কৃত্রিম, তার ইঙ্গিত যেহেতু বর্তমানে নয়, অতীতে। বুঝতে পেরেই স্নান রেখায় হাসল। বললে, ‘অমন একটা গর্জনের অবকাশই রাখব না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে যে তাড়াবেন, আগে বাড়ি হোক। মার কাছে যে গিয়েছিলুম, মারও সেই কথা।’

‘কী কথা?’ চোখ বড় করল স্বকাস্ত।

‘বললেন, ও যদি সংসারে ফিরে না আসতে চায়, নাই আসুক। ও আলাদা ক্ল্যাট নিয়ে থাকুক। শুধু একখানা বাড়িতি ঘর রাখে যেন আমার জন্তে। আমি মাঝে মাঝে যাব।’

‘আর ঝগড়া করব।’

‘মোটাই ঝগড়া করবে না। ঝগড়াটা অনেকটা হাঁচির মত। এলাজিঁ খেদে হয়। গোড়াতে সেটা করেক্ট করে নিতে পারলেই পরিষ্কার। তা ছাড়া মাঝে মাঝে তো থাকবেন। অসুবিধে বুঝলে নিজেই চলে যাবেন অগ্নি বাড়ি। সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। সেসব আমি বুঝব। টেকনিক আমার। আপনি শুধু একটা বাড়ি নিন—আই মিন—ক্ল্যাট নিন।’

‘আমি বরাবরই ক্ল্যাটের পক্ষপাতী। কিন্তু—’ হঠাৎ থেমে পড়ল স্বকাস্ত।

‘কিন্তু—কিন্তু কী?’

‘কিন্তু, ক্ল্যাটটা খুব নিরাপদ নয়। একা হোক ফাঁকা হোক সব সময়ে গুণ্ডামির ভয়।’

‘আহা, ভয়েই মোলো।’ টিটকিরি দিয়ে উঠল বিনতা : ‘জীবনের প্রতি পদে ভয়, তাই বলে জীবনধারণই করব না? দুর্ঘটনার ভয়, তাই চড়ব না ট্রেনে-প্লেনে, হাটব না রাস্তায়? সংসারে-শ্মশানে কত দায়িত্বের ভয়, তাই বলে নেব না ব্রহ্মবাদ?’

‘একটু ভয় থাকা ভালো।’ ভয়ে-ভয়ে স্বকান্ত বললে।

‘সে তো মিষ্টি।’ ইঙ্গিতটাকে গহনে নিয়ে গেল বিনতা। বসল কের চেয়ারে। ‘বেশি ভয় হলেই সমস্ত নোনতা। তা, আমি বলি কি, এই গিরি-গুহা ছেড়ে সংসারী ক্ল্যাট নিন—’

‘কত টাকার মধ্যে?’

‘আমাদের দু-জনের মাইনে একত্র হলে অনায়াসে আড়াই শো পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে।’

এরকমভাবেও পারে লোকে বলতে। স্বকান্ত এক নিশ্বাস থমকে গেল। আপনার কত মাইনে—জিজ্ঞেস করতে লোভ হল একবার। কিন্তু দমন করে স্নিগ্ধমুখে বললে, ‘আপনিও থাকবেন বুঝি সেই ক্ল্যাটে?’

‘আজ্ঞে ই্যা, মামলায় ব্যতিচারিণীর শর্তে নয়—উঃ, ঈশ্বর আমাকে বাঁচিয়েছেন—থাকব সম্মানিত স্ত্রীর দাবিতে। আমি নইলে মায়েস ছেলেকে রক্ষে করবে কে!’

যেন মরিয়ার মত বলছে। এরকমভাবে খোলাখুলি বলার মধ্যেও দীপ্তি আছে। মুগ্ধের মত তাকিয়ে রইলো স্বকান্ত। চোঁক গিলে বললে, ‘তা হলে তো ক্ল্যাট নেওয়া দরকারই একান্ত।’

‘এবং যথানীতি। আপনি খুঁজুন, আমিও খুঁজছি।’

‘আমি আর খোঁজাখুঁজিতে নেই।’

‘নেই?’

‘না। আপনি এলার্জি বলছিলেন না? আমার লেথার্জি। আমাকে লেথার্জিতে পেয়েছে। আলস্তে পেয়েছে। জড়ত্বে ধরেছে।’

‘খুব খারাপ রোগ।’

‘যাকে বলে, স্লিপিং সিকনেস।’ হতাশের মুখ করল স্বকান্ত : ‘ব্যবসাবাগিজ্য সব দেউলে হবার দাখিল।’

‘ভয়’ নেই, সারিয়ে দেব। ব্যবসাতে স্লিপিং-পার্টনার পেলেই স্লিপিং সিকনেস

সেবে যাবে।' উচ্ছল কণ্ঠে বললে বিনতা, 'বেশ, আমিই একা খুঁজব। লোক লাগাব।'

'স্থানের সঙ্গে-দুগ্গে পাত্রও যদি একটু খোঁজেন!' ভয়ে-ভয়ে তাকান স্ফকান্ত !

'আর সেই সঙ্গে কালও খুঁজব না?'

'আহা, কাল তো অকাল। সমস্ত খোঁজাখুঁজির বাইরে।'

'দেখুন আপনাকে যদি আলস্তে পেয়ে থাকে আমাকে পেয়েছে ক্লান্তিতে—' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে নিশ্বাস ছাড়ল বিনতা।

'মানে আমাকে যদি জড়ছে পেয়ে থাকে আপনাকে পেয়েছে বড়ছে। মানে আপনার বড় হবার ব্যয়ে হবার অর্ধেক।'

'যা বলেন।' আরো পাণ্ডুর শোণাল বিনতাকে।

'তাই যা পেয়েছেন হাতের কাছে, তাই চাচ্ছেন আঁকড়াতে। কিন্তু আমি কি একটা পাত্র?'

'আপনি তবে কী?'

'আমি একটা খুরি।'

'কথা কইব না আপনার সঙ্গে।'

'খেলো, সস্তা, ঠুনকো। অল্প ধরে, তার উপরে, ব্যবহার হয়ে গেলেই ছুঁড়ে কোণ দেয় রাস্তায়।'

'অল্প ধরে! আপনার কত মাইনে, কত বড় চাকরি, কত আপনার লেখাপড়া, ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি—'

'বলুন কত আপনার উন্নতির ছাই!'

'আর যারা এক ত্র্যাকেটে বিবাদী হয়, যারা অবৈধে তৃপ্তি খোঁজে তারাই রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যাক, আমার নির্বাচন আমি বুঝব।' টানটান হয়ে বসল বিনতা : 'তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।'

অথচ সে নিজে নির্বাচ্য কিনা, সে প্রশ্নে এ পক্ষের মাথা স্বেদাক্ত হতে পারে কিনা, তা নিয়ে এতটুকু সংশয় প্রকাশ নেই। এতটুকু বিনয়বয়ন নেই। নেই বা এক তত্ব লঙ্কার কুশাশ। যেহেতু উনি শিক্ষিকা অভিভাবকত্বা, গুরু নিক্ষেপ মানতেই হবে। যেহেতু স্ত্রী আর স্বামীর বন্ধু এক ত্র্যাকেটে গিয়েছে, সেই হেতু স্বামী আর স্ত্রীর বন্ধুকেও এক ত্র্যাকেটে যেতে হবে। এই বৃষ্টি বিধির বিধান। নিয়তির প্রতিশোধ

তবু, এত সব বিরাগ-বিরক্তির মধ্যে মনে পড়ল স্ফকান্তর—মনে পড়াকে সে

করে রোধ করতে পারে—কাকলি যেন প্রথমেই এমনতর ছিল না, একটু-বা মৃদু ছিল, নম্র ছিল, যিমে আঁচের ছিল, ছিল বা একটু লজ্জার-লতা-পাতা। এমন তপ্তখোলা ছিল না।

কিন্তু যাই বলো, উগ্রচণ্ডী স্পষ্টতার আকর্ষণও কম নয়। লজ্জার মত নির্লজ্জতাও স্রব্দর হতে জানে।

কথাটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল স্বকাস্ত। বললে, ‘আজ কী থাকেন বলুন?’

‘আজ উঠি। আজ কিছু খাব না।’

‘তা কি হয়? আজ কিছু কারি-কোমী সিদ্ধ-সিদ্ধ খাওয়া যাক। আজ আর শুকনো নয়। কী বলেন?’

‘মন্দ কী।’ অনায়াসে মত বদলাল বিনতা : ‘তা হলে রাত্রে হোস্টেলে আর কিছু খাব না।’

থেতে-থেতে স্বকাস্ত বললে, ‘একটা কথা বলি।’

‘বলুন।’

‘আমাকে একবার মায়ের ছেলে বলছিলেন না?’

‘বলছিলুমই তো। আপনি তো মায়েরই ছেলে।’

‘না, এবার আর মায়ের ছেলে নয়, এবার মায়ের বউ।’

ইঙ্গিতটা সহজেই বুঝতে পারল বিনতা। হেসে বললে, ‘তা আর আমাকে বলতে হবে না।’

‘স্বতরাং মাকে বশীভূত করুন।’

‘আর আপনাকে?’

‘আমাকে বশীভূত।’ রজ্জুবদ্ধ হবার ভাব দেখাল স্বকাস্ত।

ঝোলে-মাংসে একমুখ হেসে উঠল বিনতা।

কদিন পরেই আবার সন্দের দিকে হাজির।

নিজেই পর্দা টেনে বসল। বললে, ‘আপনাদের বাড়ি থেকে আসছি। মা ডেকে পাঠিয়েছিলেন।’

‘কেমন আছে সকলে?’ উদাসীন স্বর আনল স্বকাস্ত।

‘ভালো। ডেকে পাঠিয়েছিলেন পরামর্শ করতে।’

‘পরামর্শ?’

‘হ্যাঁ, একগাদা মেয়ের ফোটো দেখাচ্ছিলেন, কোনটা আপনার জন্তে পছন্দ করা যায়।’

‘একগাদা!’

‘হ্যাঁ, লিভিয়ন! ঘাসে-বসা, সিঁড়িতে-বসা, চেয়ারে-বসা এক রাজ্যের ছবি চিবুকে-গালে তাজিলোর রেখা ফোটাল বিনতা : ‘সব কলেজের ছুকরি। কেউ আয় করে না এক পয়সা, সবাই ব্যয়ের রঙমশাল। সবাইকে বাতিল করে দিলুম।’

‘পথে বসালেন বলুন।’

‘প্রায় তাই।’ খিলখিল করে হেসে উঠল বিনতা। এবং উচ্চ হাসি আশেপাশে শ্রুতি-শোভন হবে না বিবেচনা করে দরজাটা আন্তে আন্তে ভেজিয়ে দিল : ‘মাকে বললুম, এসব স্বকাস্তর পছন্দ হবে না। স্বকাস্ত চাকুরে রোজগেরে মেয়ে চায় প্রত্যেক বুদ্ধিমান স্বামীই চায়। আর প্রথমে যখন একবার তাই চেয়েছিল, দ্বিতীয়েও নির্ধাত তাই চাইবে।’

‘মা কী বললেন?’

‘বললেন, বেশ তো, স্বকাস্তর যদি তাই পছন্দ, তেমনি কাউকে বাছুক। আমি কিছু বলতে আসব না।’

‘শেষে টাকা-পয়সা নিয়ে লাগবে!’

‘না, এবার তাও লাগবে না। মনটা ভিজ্ঞে আছে তো, তাই বললেন, যেভাবে ওদের খুশি সেইভাবে থাকবে, আয়-ব্যয় করবে, আমি কিছুই বলতে আসব না। ছেলের টাকা কি আর টাকা? স্ত্রীলোকের স্বামীর টাকাই টাকা।’

‘শাস্তির কথা। সেই সময় তাক বুঝে নিজেকে অফার করলেন না কেন?’

‘অফার—কিসের অফার?’

‘ঐ যে চাকরির দরখাস্ত লেখে,’ হাসতে লাগল স্বকাস্ত, ‘নোইং ছাট এ ভেকেন্সি হাজ ফলেন আই অফার মিসেলফ অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট—’

বিনতাও হাসল সশব্দে। বললে, ‘মোটাই ভেকেন্সি ফিল-আপ করতে যাচ্ছি না।’

‘না, পদের, কোনো অঙ্কের শূন্যতা নয়, এ আত্মার শূন্যতা।’ বিনতার চোখে দিকে তাকাল স্বকাস্ত : ‘মাকে বললেন না কেন?’

‘আমি বলব? বা রে, এ তো আপনি বলবেন।’

‘হ্যাঁ, আমিই বলব।’ খাটে হেলান দিল স্বকাস্ত : ‘কিন্তু জানেন তো লেখার্জি—লেখার্জি—আলস্ত্রাই আমাকে পেয়ে বসেছে।’

‘বা, এই ব্যাপারে আলস্ত্র করলে চলবে কেন?’

‘না, বলব, বলব শিগগির। কিন্তু কবে বলব? ও বাড়িতে তো আর যাই না—’

দু পা এগিয়ে এল বিনতা। শ্রোনদৃষ্টিতে তাকাল। বললে, ‘মাকে বলতেই বা

হবে কেন ? হবে না বলতে । মা বলেছেন, স্বহৃৎ এবার যাকেই নিয়ে আসুক, বুড়ি-
ছুঁড়ি, ধলী-কালী, মেথরানী-রাজরানী, যাই হোক, তাকেই তিনি নেবেন হাসিমুখে ।
ততরাং এ ব্যাপারে আপনার উত্তোষই বলবান হবে ।’

‘হবে ।’ সায় দিল স্বকান্ত : ‘আর কটা দিন যাক ।’

‘কেন, দেরি কেন ? আপিলের মেয়াদ তো কবেই চলে গিয়েছে ।’

‘না, না, তার হিসেব কে করে ?’

‘তবে, আনন্দকে পিছিয়ে দেওয়া কেন ?’

হাসল স্বকান্ত । বললে, ‘আনন্দের জন্তে দেরি করাতেও আনন্দ ।’

‘সব কিছুই তো তৈরি ।’ আরো এক পা এগুল বিনতা ।

‘শুধু এখনো ভালোবাসাই তৈরি নয় । তারই এখনো সাজগোজ হয় নি । রঙ্গমঞ্চে
প্রবেশ হয়নি তার ।’

‘দেখি তার কতদূর হল !’ দরজার দিকেই এগুল বিনতা : ‘কিন্তু প্রথম অঙ্কের
প্রথম দৃশ্যেই কি তার প্রবেশ ? আপনি ঠিক জানান ?’

‘বোধ হয় নয় । কিছু পরেও হতে পারে ।’ আশ্বাস দিল স্বকান্ত : ‘আপনি
দেখবেন বইটা ?’

‘আমি দেখেছি । এ নাটকে তার পার্টই নেই । ক্লাস্টি, প্রতীক্ষা, প্রলোভন,
প্রতিশোধ— এসবই এ নাটকের কুশীলব ।’

‘না, না, সেও আছে । হয়তো বা দেরিতে আছে । ভালোবাসার জন্তে দেরি
করাও ভালোবাসা ।’

বিনতা চলে গেল ।

কিন্তু দেরি করল না । সাজগোজ করতে বসল । অগ্নিশিখাকে নগ্ন করে তোলার
সাজ । দেখি জাগে কিনা, জলে কিনা । একরাশ স্তূপীভূত আলস্তের খড় পুড়ে ছাই
হয় কিনা নিমেষে ।

ও মা, তুই কোথেকে ? ধূসর ছায়া পড়ল আয়নায় । কী মনে করে ? কার
কাছে ?

‘তোমার কাছে ।’ কাকলি স্বচ্ছ মুখে বললে ।

‘আমার দাঁড়াবার সময় নেই, বেকছি এখুনি ।’

‘সে তো আমারও নেই । নিচে গাড়ি দাঁড়িয়ে ।’ কাকলি রুদ্ধ হল ।

‘তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে ?’ উঃ, গডসেও । আমাকে একটু তবে দে না
পৌছিয়ে ।’

‘কোথায় ?’

‘সে দেখতেই পাবি।’ ঠোট কুঁচকিয়ে হাসল বিনতা।

‘তবু শুনি না।’

‘এক হোটেলে।’

‘কিন্তু এ কী বিচ্ছিরি সেজেছিস! আমাকে ডাকলি না কেন, সাজিয়ে দিতাম।’

‘মানে শোধ তুলতিস। কিন্তু আমার তো মোহিনীর সাজ নয়, মোহিনীর সাজ।’

‘তাই বল।’ ফিরে দাঁড়াল কাকলি : ‘এ সাজে গাড়ি চড়বি কী? ঢাকা একটা রিকশা করে চলে যা।’ বলে দ্রুত পায়ে নেমে গেল নিচে।

বারান্দায় এসে মুখ বাড়াল বিনতা। কই, গাড়ি কোথায়! পায়ে হেঁটেই গলিটা পার হয়ে যাচ্ছে কাকলি।

এ যেন তার সমারোহে আসা ছিল না, ছিল বা বুঝি প্রচ্ছন্ন আসা। এখন যটি সে, ক্ষণকালের অন্ত্রে হলেও, ব্যাহত হয়ে থাকে, তাতেই বিনতা চরিতার্থ।

কিন্তু স্বকাস্ত সহসা এত ব্লান কেন? তার ঘরের আলোর পাওয়ারটাই কি আজ কমে গেছে?

‘জানেন কাকলি মিত্রকে দেখলুম।’ বললে বিনতা। যদি অস্তুত এ কথাটা শুনে স্বকাস্তের রক্ত লাল হয়ে ওঠে।

স্বকাস্ত উড়িয়ে দিল কথাটা। বললে, ‘আমি আপনাকে দেখছি।’

‘সত্যি?’ সমুহ কটাক্ষ ছুঁড়ল বিনতা : ‘কেমন মনে হচ্ছে?’

‘অপূর্ব।’

‘বাড়ি গিয়েছিলেন?’

‘গিয়েছিলুম।’

‘মা কি বললেন?’

‘কী বলবেন! তিনি তো এক কথায় রাজি।’

‘তবে?’ আবার কটাক্ষ বিলম্বিত করল বিনতা।

তবে আরো একটু বিনতা অল্প কথা বলে না কেন? যদিও শুনতে গায়ের রক্ত আশ্বিন হয়ে উঠবে, হাতের মুঠো দৃঢ় হতে চাইবে, দাঁতের পাটি একত্র হবে, তবু একটু বলুক না ওর কথা। কোথায় দেখা হল? কী করছিল? কেমন আছে?

‘তবে, তবু আর আপনি নিস্তেজ কেন?’ বিনতা খাটের প্রান্তে এসে বসল।

এই বুঝি চিতাবাঘ বাঁপিয়ে পড়ে। অন্ধকারের চিতাবাঘ।

‘কিন্তু এদিকে একটা হুঃসংবাদ আছে।’ স্বকাস্ত বুঝি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

‘দুঃসংবাদ !’

‘হ্যা, আমার চাকরিটা গেছে ।’

‘গেছে ?’ যেন সব গেছে, এমনি আত্ননাদ করে উঠল বিনতা ।

‘হ্যা, বরেনরা তাড়িয়ে দিয়েছে আমাকে ।’ মুম্বুঁ রেথায় হাসল স্ককাস্ত : ‘আমি বলেছি না দেবি করা ভালো ! সর্বনাশের চেয়ে দেবি বাস্থনীয় । এখন আবার ঘোরো, দেয়ালে-দেয়ালে মাথা কোটো, চাকরি জোটাও—’

কিছুক্ষণ চূপচাপ করে রইল বিনতা ।

স্ককাস্তর চোখ বোজা । এত ক্লান্ত, এত অলস, অপূর্বকে দেখবারও বুঝি আর উৎসাহ নেই ।

‘আপনার মন খারাপ, আজ তা হলে আসি ।’ উঠে পড়ল বিনতা ।

‘সে কি, চা খেয়ে যাবেন না ?’

‘অকারণে আপনার হোটেলের বিল বাড়িয়ে লাভ কি !’ বিশ্বস্তের মত ধীরে ধীরে চলে গেল বিনতা ।

এক কথায় চলে গেল ।

সে-সে দিন হলে, স্ককাস্ত স্থির মনে করতে পারল, কাকলি এ অবস্থায় নিশ্চয়ই চলে যেত না ।

বেল টিপল স্ককাস্ত । বেয়ারা আসতে বললে, ‘কি রে, খাবার দিবি নে ?’

‘দিচ্ছি ।’

‘হু-জনের মত খাবার ।’

‘আরেকজন কোথায় ?’

‘আরেকজন নেই । হু-জনের মতই খিদে পেয়েছে আজকে ।’ হাসতে লাগল স্ককাস্ত ।

•৪৬

আশ্চর্য, দীপঙ্কর কিনা স্ককাস্তের অহুক্লে !

‘আপনি যে কী বলে ওর পক্ষ টেনে কথা বলেন ভেবে পাই না ।’ দীপঙ্করের বাড়ি এসেছিল কাকলি, অভিযোগ করল ।

‘বা, আমি আবার কার পক্ষ টেনে কথা কইলাম !’ দীপঙ্কর বিন্মিত হবার ভাব করল ।

‘ঐ যে এতক্ষণ যার কথা কইছিলেন—চন্দ্রকান্ত না কৃষ্ণকান্ত !’

‘যাক, নামটা এখনো ভুলতে পারেন নি। কিন্তু তার পক্ষ টানলুম কোথায় ?’

‘টানলেন না ? তার চাকরিটা যাওয়া উচিত নয়, যদি যায় খুব অল্পায় হবে, এমনি ভাবের কথা বলছিলেন না এতক্ষণ ?’

‘বলছিলামই তো। এখনো বলছি।’

‘কিন্তু তার জন্তে আপনার এত শোক কেন ? সে আপনার কে ?’

‘বলেন কী ! সে আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছিলাম কলেজে।’

‘আহা, কত সে আপনার বন্ধুর কাজ করেছিল ! কত সে হিতকারী আপনার !’

এক মুহূর্ত চুপ করে গেল দীপকর। ঘৃণার দাহ এখনো এত তীব্র থাকতে পারে ভাবতে পারে না।

‘আপনার চাকরিটা যে খেয়েছিল তা মনে নেই ?’

‘বা, তাতে গুরু দোষ কী !’

‘গুরু দোষ নয় ?’ প্রায় গালে হাত দিয়ে বসল কাকলি : ‘তবে কার দোষ ?’

‘যদি দোষ না ধরেন, বলি, বরেনের দোষ। যে ওকে চাকরি দিয়েছে তার দোষ।’

‘তার দোষ ?’

‘এক শো বার তার। যে চাকরি দেওয়ার ফলে আরেকজন বেকার হয়ে যাবে সে চাকরি সে দেয় কেন ?’

‘আর যে লোক চাকরি চাইল ? আবেদন করল ?’

‘সে তো চাইবেই। সে ‘নিভি’, অভাবী, সে চাইবে না কেন ?’

‘মোটাই তখন তার চাকরির দরকার ছিল না।’ কাকলি অতীতের দিকে তাকাল।

‘আপনি বললে তা আমি মানব কেন ? যার দরকার সে বোঝে। দরকার ছিল না তো আবেদন করল কেন ? আবেদনই দরকারের প্রমাণ।’

‘কিন্তু আবেদন করবার সময় সে জানত, যদি চাকরি হয়, আপনাকে ভিসমিস করিয়ে তবে হবে।’ কাকলি আবার ঘৃণার কাঁজ ছড়াল : ‘এই তো আপনার বন্ধুর নমুনা।’

‘বা, কিসে কী হবে, কত ধানে কত চাল, অফিসিয়ালি তা তার জানবার কথা নয়। তার চাইবার কথা, সে চেয়েছে। যে দেনেওয়াল সে অমন করে না দিলেই পারত। যখন দেখল ওতে আমার চাকরি যায়, তখন নামঞ্জুর করলেই পারত ওর

আবেদন। তাই,' বলতে দীপঙ্কর ভড়কাল না : 'যদি দোষ না ধরেন, সব দোষ ঐ দেনেওয়ালার।'

'চমৎকার।' এবার বিদ্রূপের কশা হানল কাকলি : 'যে লোকটা জলন্ত মশাল হাতে তুলে দিল তার দোষ নয়, যে লোক জলন্ত মশালটা ব্যবহার করে ঘর পোড়াল দোষ তার?'

'নিশ্চয়। মশাল হাতে পেলেই পরের ঘরে আগুন দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই।' দীপঙ্কর স্বর দৃঢ় করল : 'মশাল হাতে পেয়েও ফেলে দেওয়া যায় মাটিতে। আমি হলে তাই দিতাম।'

'তা হলে যে ওর চাকরি হয় না।'

'হত না! কিংবা ইচ্ছে করলে বরেন ওর অগ্রত চাকরি করে দিতে পারত। তাই বলে অকারণে একজনের চাকরি খেয়ে সে জায়গায় আরেকজনকে বসাতে হবে এটা ভীষণ অবিচার। আপনিই বলুন, অবিচার নয়? সুতরাং যে চেয়েছে দোষ তার নয়, যে দিয়েছে দোষ তার।'

তবু যেন মানতে চায় না কাকলি। বললে, 'কিন্তু যখন ও চোখের উপর দেখল ওর চাকরি নেওয়ার নীট রেজাল্ট হচ্ছে আপনার ডিসমিস তখন ও চাকরি ফেরত দিতে পারত। ডিক্লাইন করতে পারত। আমিও কত তাকে বলেছিলাম। বলেছিলাম এ ক্ষেত্রে চাকরি নেওয়া নীচতা হবে। কিন্তু ও শুনল না। দিবা বন্ধুর পোড়া বাড়ির কাঠ দিয়ে নিজের ঘর তৈরি করল। বুঝুন কতখানি নিচু মন, কত বড় স্বার্থপর—'

স্বচ্ছ মুখে হাসল দীপঙ্কর : 'বা, তার খেসারত তো আপনি দিয়েছেন।'

'সে আমি দিয়েছি। কিন্তু ওর মনটা তো দেখলেন।'

'দেখলাম। এবং দেখছি। অনবরতই দেখছি।'

'ঈ্যা, তাই ওর চাকরি গেলে কারু ক্ষোভের কারণ হওয়া উচিত নয়। যেমন লোক তেমনি তার শাস্তি হওয়া দরকার।'

'তবু চাকরি চলে যাওয়া অসহ্য।' দীপঙ্কর আত্মমুখে বললে, 'এ যেন কারু চোখ চলে যাওয়া। লোকটা মন্দ, তাই বলে তার চোখ চলে যাবে এ কোনো কাজের কথাই নয়। হাত-পা গেলে তবু যেন সওয়া যায় কিন্তু অন্ধ হয়ে গিয়েছে এ অসম্ভব।'

'তাও হয় লোকে সংসারে।' কাকলি মুখ ফেরাল : 'যাক গে, যা হবার তা হবে। বোর্ডের মিটিং হয়েছে জানেন?'

‘জানি না। বোধ হয় হয় নি। স্বকান্ত তো অফিসে বেরুচ্ছে।’

‘বা, বোর্ডের মিটিং হয়ে যাবার পরেও তো বেরুতে পারে।’

দীপঙ্কর চমকে তাকাল কাকলির মুখের দিকে : ‘তার মানে?’

‘তার মানে মিটিংয়ে বোর্ড ডিসাইড করতে পারে যে ওর চাকরি থাকুক, আর হয়তো তারই জোরে বেরুচ্ছে অফিসে।’

‘তেমন কিছু হলে জানতে পারতাম বোধ হয়।’

‘তা একটু জাছন না।’ বলেই নিজেই আবৃত করল কাকলি : ‘আর কিছু নয়, সামান্য একটা কৌতূহল।’

‘তা, বরেনকে জিজ্ঞেস করুন না। সেই তো হালের মাঝি, নাটের গুরু।’

‘আমার বয়ে গেছে।’ ঝাপটা মারল কাকলি : ‘ভারি তো কথা, তাই নিয়ে ওকে আবার বিরক্ত করব! কথা এমনি উঠে পড়ে, আলাদা কথা!’

‘এমনি সরাসরি জিজ্ঞেস করা যায় না বুঝি?’ দীপঙ্কর চোখের মধ্যে চোখ ফেলল।

‘তা যাবে না কেন? তবে পাছে ভুল বোঝে, কী দরকার! পুরুষের মন তো!’ তাকিল্য ফুটিয়ে হাসল কাকলি।

‘আচ্ছা, আমি খোঁজ নেব। জানাব আপনাকে।’

‘আজ চলি।’

বাড়িতে এসে অফিস-ফেরত কাকলি টান হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। জামাকাপড় ছাড়ল না, জুতো খুলল না, সর্বসমেত শুয়ে পড়ল।

‘শুয়ে পড়লি?’ গায়ত্রী কাছে এসে দাঁড়াল।

‘টাটকা-টাটকা গরম-গরম বিশ্রাম খানিকটা করে নিই। পরে বাথরুম থেকে এসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ঠাণ্ডা স্নরে বিলম্বিত বিশ্রাম তো আছেই।’

গায়ত্রী পাশে এসে বসল খাটে। বললে, ‘বিয়ের পর এবারও চাকরি করতে হবে নাকি?’

‘কে জানে কী হবে!’ ঝোলানো পা দুটো সোজা খাটের উপর টেনে আনল কাকলি। হতাশায় লম্বা করল।

‘আবার চাকরি কিসের?’ গায়ত্রী প্রতিবাদ করে উঠল : ‘চাকরিতে নিভা এমনি ক্লিষ্ট ক্লান্ত হয়ে থাকলে জীবনসম্ভোগ হবে কী করে? বয়েনের কি মত আছে চাকরিতে?’

‘এখনো জিজ্ঞেস করে দেখি নি।’ গায়ের উলটো দিকে কাত হল কাকলি।

বললে, ‘অমত করবার তো কারণ দেখি না। ব্যক্তিস্বের যত বৈচিত্র্যে চাকচিক্য থাকে ততই ভালো। ততই মেয়েরা সুন্দর পুরুষের কাছে। যত নতুন তত মধুর।’

‘আগে-আগে তো রিয়ের পর মেয়েদের চাকরি করা পছন্দ করতিস না—’

‘আগে-আগে? সে তো ভালোবাসার কালে—’ যেন সে অনেক দিনের ওপারে দূর কোন রূপকথার দেশের কথা এমনি নিশ্বাস ফেলল কাকলি।

‘আহা, কালের আবার বদল হল কোথায়! সবাই তো সেই তেমনই আছে।’ মেয়ের গায়ে হাত বুলুতে লাগল গায়ত্রী।

‘তখন, সেই সর্বাধার আনন্দের সময় সব কথাই বলা সাজে।’ পাশ ফিরে মায়ের মুখের দিকে চাইল কাকলি : ‘তখন তো আর ভীতি নয়, তখন শুধু ভাতি। তখন চাকরি করব না, এ কথাও বলা যায়; চাকরি পেলে কেন করব না, এ কথাও বলা যায়। তখন সাজসজ্জার কী দরকার, এ কথাও বলা যায়; সাজব গুজব না তো এ দেহ ধরেছি কেন, এ কথাও বলা যায়। তখন সেই উদ্বেলতার সময় কিছুই প্রগল্ভ মনে হয় না। কিন্তু এখন—’

‘কেন, এখন কী?’

‘এখন শুধু অন্ধ, শুধু গণিত, শুধু আয়-ব্যয়ের হিসেব। সুখ-স্ববিধের জমা-খরচ। আদায়-উত্তল।’ কাকলি উঠে বসল : ‘এখন ফেলো কড়ি মাথো তেল।’

‘আচ্ছা, বরেন কদিন আসছে না কেন?’ এর পরে এই প্রশ্নটাই কি গায়ত্রীর মনে প্রবল হবে না?

‘আসবে, শিগগিরই আসবে।’ হাসল কাকলি : ‘না এসে যাবে কোথায়?’

‘কোন করেছিল?’

‘ও না করলে আমি করি।’ কাকলি উঠে দাঁড়াল : ‘দরকারে অদরকারে আছে ও নাগালের মধ্যে।’

তবু যেন পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারে না গায়ত্রী। বললে, ‘কিন্তু আর দেরি কেন?’

‘না, আর দেরি কোথায়। কটা কাজ নিয়ে ও এখন একটু ব্যস্ত বলছিল, তার মধ্যে একটা—’

অসহিষ্ণু মুখে বললে গায়ত্রী, ‘শেবে না দেরি দেখে পিঠটান দেয়।’

‘পিঠটান দিয়ে যাবে কোথায়? ওর টিকি আমার কাছে বাঁধা।’

‘কিন্তু কী এমন ওর এখন কাজ—’

‘সস্ত্রিতি আমাদের নিচের ভাড়াটেকে তাড়ানো। তুমি জানো না?’

‘জানি বৈকি। কিন্তু ও কি যাবে?’

‘যাবে না?’

‘খালি যাব-যাব করবে।’ অদ্ভুত স্বরে বললে গায়ত্রী।

কাকলি শব্দ করে হেসে উঠল। কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে: ‘যাব-যাব করবে। উড়-উড় করবে। ধানাই-পানাই করবে। কিন্তু এ বরেন। এ নাছোড়। একগুঁয়ে, ওঠাবে তবে ছাড়বে। রেহাই পেতে দেবে না কিছুতেই।’

‘আজকাল ভাড়াটে তোলা মুখের কথা?’

‘বরেনের কিছুই অসাধ্য নয়। মুখের কথাতেই তুলবে।’

‘মুখের কথায়? মামলা-মকদ্দমা লাগবে না?’

প্রাথমিকভাবে হালকা হচ্ছে কাকলি। জুতো-জামা খুলছে। খুলতে-খুলতে বললে, ‘মামলা-মকদ্দমা তো নাগবন্ধন। এই পাঁচ খুলেছ তো ঐ আরেক পাঁচ। এই পাক কাটিয়েছ তো ঐ আরেক পাক। ডালের পরে আবার ফেঁকড়ি। তারপর যুদ্ধের শেষে প্রাপ্তির বেলায় ঢু-ঢু। কুরুক্ষেত্রের মাঠ। বিষয়সম্পত্তির কিছু নেই, শুধু আদালতের রায়-ডিক্রির নকল।’

‘মুখের কথায় ভাড়াটে উঠে যায় এ কি সত্য যুগে ফিরে এসেছি নাকি?’

‘বরেনের চাতুরি। শুধু চাতুরি নয়, সামর্থ্যও। ভাড়াটেকে বললে, ‘এ বাড়ির বড় মেয়ে ফিরে এসেছে, অফিসার-মেয়ে, নিচেটা এখন দরকার। আমি আপনাকে আরেক বাড়ি দেখে দিচ্ছি। আরেক বাড়ি? হ্যাঁ, এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে এমিনিটিস বেশি। ভাড়া কম, নয়তো বড় জোর সমান। আপনার অরাজি হবার কিছু নেই। তা ছাড়া, বুঝতেই পাচ্ছেন, কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে জলে বাস করা স্বথের নয়। বেশ, দেখুন। ভাড়াটে রাজি হয়েছে। এখন থেকে-থেকে বরেন তাকে বাড়ি দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটার মজা মন্দ নয়। বরেনের গাড়িতে চড়ে দিবা সান্ধ্যভ্রমণ সারছে।’ যেন খুব ঈর্ষিত, কুপিত হবার কথা এমনি ভাব করল কাকলি: ‘কার গাড়ি কে চড়ে!’

‘কোনো বাড়ি কচল ভ্রলোকের?’

‘প্রথম-প্রথম ভাঁড়াতে চেয়েছিল, এখন শুনছি, চাপে পড়ে ‘না’ করতে পারছে না। একটা বাড়ি পছন্দ করেছে। উঠে যাবে শিগগির। তারই তোড়-জোড়ে বরেন কদিন অল্পপস্থিত। এলেও লোয়ার হাউসে আসছে, ভাড়াটের ব্যাপারে, আপনার হাউসে টু-লেট টাঙানো।’ মা তার কতদিনের বন্ধু এমনি লম্বুতায় কথা বলছে কাকলি, বলতে কত আরাম পাচ্ছে।

*

‘উনি সব জানেন?’

‘তুমিও তো জানো।’

‘কিন্তু লোকটা সত্যি উঠে যাচ্ছে এত দূর জানি না।’

‘বাবা কী খুশি! গোটা বাড়িটা আবার নিষ্কলুষ বনবিহারী মিত্রের বাড়ি হচ্ছে, বাবার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।’

‘আহা, আনন্দ তো কত!’

‘আমি যেমনি রাহুমুস্ত হয়েছি, তেমনি বাড়িটাও হতে যাচ্ছে। স্বনামপরিচিত।’

‘কিন্তু বাড়তি আয় যে একটা আসছিল, তার কী হবে?’

‘কেন, আমি দেব।’ ঘরের মধ্যে হাঁটাচলা করছিল, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল কাকলি।

‘তুই কোথেকে দিবি?’

‘আমি চাকরি করছি না? এক লাফে আমার মাইনে কত হয়েছে তুমি জানো?’ মায়ের দিকে এক পা এগিয়ে এল কাকলি: ‘আমার কাজে-কর্মে, ব্যবহারে-ব্যক্তিত্বে আফিস এত খুশি, তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি একটা ডিপার্টমেন্টের হেড হয়ে উঠেছি। দেখবে এসো, আমারই তাঁবে কত কেবানি-কর্মচারী খাটছে। অফিসের জীলিন্দে যেমন আমাকে অপসরী বলে, তেমনি বড়-বাবুর জীলিন্দে কেউ-কেউ বলে বড়বিবি। তুমি আমাকে কী ভেবেছ?’ আরো এক পা এগোল কাকলি: ‘মেয়ে হয়ে বাবাকে এ কটা টাকা সাহায্য করতে পারব না?’

‘মেয়ে হয়ে! তারপর তুই বউ হয়ে যাবি না পরের ঘরে?’

বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ধাক্কা খেল কাকলি। আবার সেই পুরোনো নাটক অভিনীত হবে, মা বুঝি তারই ইঙ্গিত করল। মেয়ে বউ হয়ে টাকা রোজগার করলে সে রোজগারের জন্তে কে হাত বাড়াবে, তার দুঃস্থ স্বস্তরবাড়ি, না তার দুর্গত বাপের বাড়ি? আবারও বুঝি সেই সমস্তার মেঘাভাস।

‘ভাগ্যবলে এবার এমন একজনের সঙ্গিনী হচ্ছি যে কুদ্রাস্থ্য নয়, ছরাশয় নয়, যে জানে, টাকা যখন আমি উপায় করছি, টাকা আমার, আর আমার যেমন অভিক্রটি, তেমনি খরচ করবার আমারই স্বাধীনতা, যতক্ষণ সেটা দুর্ভুতি নয় বা দুর্নীতির এলেকায় আসে না। তাই টাকা আমি পিতার আশ্রমে দিই, না অনাথ আশ্রমে দিই, এ নিয়ে বরেনের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। তার অনেক টাকা।’

‘তবু’, মুখ নিচু করল গায়ত্রী: ‘তবু বিবাহিত মেয়ে যত বড়লোকই হোক, পারতপক্ষে তার থেকে বাপ-মায়ের সাহায্য না নেওয়াই সমীচীন।’

‘বেশ তো, ভাড়ার কটা বা টাকা, ঐ টাকা দাদা বোজগার করবে গল্প-
ভরা ক্ষুধা নিয়ে কাকলি বললে।

‘কে, দেবনাথ?’ গায়ত্রী যেন অঙ্ককারে চোখ মেলল।

‘হ্যাঁ, দাদার জন্তেও হুবিধেমত চাকরি দেখছে বরেন। যা কথা দিয়েছে, সব
সে রাখবে একে-একে।’ ভক্তিতে দৃষ্টি আনল কাকলি : ‘সব রাখবার মত জোর
রাখে সে-শরীরে।’

‘দেবনাথ যদি ফেরে, যদি সে পাকা কাজ পায়, তা হলে আর ভাবনা কী
কিন্তু যদি তার একটা হিলে না হয়, আর তুই বিয়ে-হয়ে চলে যাস, তা হলে দেখিস,
তোর বাবা আবার নিচেটা ভাড়া দিয়েছে।’

‘সে ভবিষ্যতের কথা দেখা যাবে ভবিষ্যতে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদি
আমি যেমন আস্ত কাকলি মিত্র, তেমনি বাড়িটাও আস্ত বনবিহারী মিত্র হয়ে থাক।
নইলে আমারই বাড়ির একাংশে থেকে ভাড়াটে গেটে তার নেমস্টেট ঝোলাবে
এ অসহ্য। উদার সদর তাকে ছেড়ে দিয়ে অমি ক্ষীণ খিড়কি দিয়ে যাওয়া-আসা
করব, ঐ দৈন্ত থেকে ঈশ্বর আমাদের ত্রাণ করুন। তাই তাঁর কাকলি ফিরে এসেছে,
সমস্ত বাড়ি উপর-নিচ তাঁর একলার হয়ে থাক, আর সমস্ত বাড়ি উপর-নিচ তাঁর
কাকলি ভরে রাখুক, এই তাঁর আকুল অভিলাষ—বলো, তাই না? উচিত না তাঁর
সেই অভিলাষ আমাদের পূরণ করা?’

‘উচিত।’ দয়াজি চোখে সায় দিল গায়ত্রী : ‘অল্প কদিনের জন্তে হলেও উচিত।
তাঁর কাকলি এসেছে, আর তাঁর অভাব নেই, শূন্যতা নেই—’

‘তা ছাড়া বরেন যাই বলুক, বিয়েতে মেয়ের বাড়িতে একটা উৎসব হবেই।
বাবার কত দিনের সাধ, সমস্ত বাড়িটা আলো দিয়ে সাজাবেন।’ চোখ-মুখ উজ্জ্বল
হয়ে উঠল কাকলির : ‘তার উপর-নিচ, ছাদ-উঠোন লোকে, জন-কোলাহলে
গমগম করবে। সেই উৎসবের দিনে বাড়ির আধখানা যদি বেহাত হয়ে থাকে,
নিমস্তিতরা সদর দিয়ে ঢুকতে না পায়, তা হলে তো কেলেকারির চরম—’

‘বরেন রাজি হবে সেই উৎসবে?’

‘এক শো বার হবে। লাল-নীল আলো দেখবে না, শুনবে না সানাই?’ খেলন-
পাওয়া ছেলোমাস্থবের মত আহ্লাদ করে উঠল কাকলি : ‘যতই এমনিতে মুখ দেখুক,
দেখবে না নতুন মুখচন্দ্রিকার মুখ? যে মুখ—বিনতাকে ভাকব, আবার সাজিয়ে
দেবে নতুন করে।’

‘কে বিনতা?’ গায়ত্রী মনে করতে চাইল।

‘আমার বন্ধু। তুমি দেখ নি, আমাকে আগের বার সাজিয়ে দিয়েছিল ?’

‘না, না, তাকে ডাকতে হবে না।’ অপরা ভেবে গায়ত্রী প্রতিবাদ করতে চাইল।

‘না, সাজাক বা না সাজাক, ডাকতে হবে বৈকি। সে আসবে আর হিংসের ঝাঞ্জন তার বুক চচ্চড় করবে। যতই চোখ বড় করে দেখবে, তার ঘোড়া মরাথেকো, ছ্যাকড়াটানা আর আমার ঘোড়া পক্ষীরাজ।’

‘তা হলে আসবে না।’

‘না-ই আসুক। উৎসব না-ই হোক। তবু নিচেটা দরকার।’

‘দরকার ?’

‘হ্যাঁ, একটা ড্রিংকুম এসেনশিয়াল। নইলে যে কেউ আসে, সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে যায়, সেটা ঠিক নয়।’

‘আহা, না বলে কয়ে উপরে উঠে পড়ার মত লোক তো শুধু একজন—’

যেন তাকে সহসা চিনে উঠতে পারছে না, এমনি চোখ করল কাকলি।

‘আর ড্রিংকুম দেখিয়ে তাকে বসিয়ে রাখা যাবে, এমন অবস্থা আর কই ? আগের কথাটা সম্পূর্ণ করল গায়ত্রী।

‘না, একটু বসে থাকতে শেখা ভালো।’ চুল খুলতে লাগল কাকলি। গম্ভীর মুখে বললে, ‘দুর্ব্বারের মত সব সময়ে নিজেকে হাজির করাটা ঠিক নয়।’

‘আহা, এ আবার কী কথা !’ কটাক্ষে শাসন করতে চাইল গায়ত্রী।

‘তুমি প্রস্তুত বলে আমিও প্রস্তুত, এ একটু বাড়াবাড়ি।’

‘তার মানে ? বিয়ে আরো পিছিয়ে দিতে চাস ?’

‘আহা, সে কথা কে বলছে ? মানে, ধরো, এটা তো আমার শোয়া-বসা, সাজা-গোজা সব কিছুর একার ঘর, আমি হয়তো শিথিল আছি, অন্তর্ক আছি, হৈ-হৈ করতে করতে ও অকস্মাৎ ঢুকে পড়ল—সেটা কি ঠিক ? শোভন ?’ সরল মুখে প্রশ্ন করল কাকলি।

‘কেন, সিঁড়িতে জুতোর শব্দই তো যথেষ্ট ওয়ানিং।’

‘যথেষ্ট ? কী যে বলো তার ঠিক নেই।’

‘পর্দাটা টেনে দিলেই হয়।’

‘তার চেয়ে বলো না কেন, দরজা বন্ধ করে দিস। সে আরো বেশি নির্লজ্জতা। শুধু কি শারীরিক আলাস্ত ? মানসিক আলাস্তও তো মানুষের আছে। মেজাজ-মর্জি আছে। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিও আছে। বলো, নেই ?’

‘তা ও ড্রয়িংরুম মানবে কিনা—’

‘না, মানবে। শত হলেও ভদ্র, মার্জিত তো বটে। অস্তুত অভ্যস্ত তো বটে। ড্রয়িংরুম দেখলে সে বসবে, খবর পাঠাবে। আমি প্রস্তুত হব। উপযুক্ত প্রতিশ্রুতি করব। ও যে সরাসরি উঠে আসে উপরে, তার মানে, আমাদেরই ক্রটি, আমাদের ড্রয়িংরুম নেই। আমার সেই স্বস্তরবাড়ির মত—’

‘সে আবার কী?’

‘জানো মা, আমার স্বস্তরবাড়িতেও ড্রয়িংরুম নেই। স্বস্তরের যেটা বৈঠকখানা, সেটা মক্কেলের মজলিশ, যত টাইম-বেটাইমের বাজে লোকের আস্তানা, সেটা আর যাই হোক, বসবার ঘর নয়। এমনি আত্মীয়-বন্ধু কেউ যদি কারু সঙ্গে আসে দেখা করতে,’ কাকলির কণ্ঠ হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল : ‘সদরে প্রথমে বাছাই হবে কোন ঘরের, কোন পোর্সিফিসের লোক—তারপর সেই ঘরে সেই খোপে—সেখানে তখন কার কী অবস্থা বিবেচনা করবার সময় নেই—সে লোককে সোজা ছুঁড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে—আর-এম-এস-এ সার্টিং-এর মত—’

‘ওখানকার কথা অত বিতং করে বলবার কী হয়েছে?’ গায়ত্রী ঝিকারের সঙ্গে শাসিয়ে উঠল।

মুহূর্তে সংবৃত হল কাকলি। বললে, ‘না, আমি বলছিলাম বাইরের একটা বসবার ঘর অত্যাবশ্যক। বাইরের ঘরে যে কথা জমে, তা অন্তঃপুরের ঘরে বলা যায় না। না গাড়িতে, না বা হোটেলে, না বা দোকানে-পসারে, থিয়েটারে-সিনেমায়। মার্টিন-ঘাট তো মানচিত্রেই নেই।’ বাথরুমের দিকে এগুল কাকলি। মাকে আরো বাঁচিয়ে দিল। বললে, ‘তা ছাড়া আজকাল আফিসের কত লোকই তো আসতে পারে দেখা করতে। ড্রয়িংরুম না হলে বসবে কোথায়?’

ড্রয়িংরুম যে কত দরকারি, তা বোঝা গেল, কিছুদিন পরে ভাড়াটে উঠে গেলে যখন দীপঙ্কর এল দেখা করতে। দস্তুরমত কলিং বেল আছে। অতটা সাহস না হয়, কাগজের প্যাড আর পেন্সিল আছে টেবিলের উপর। তা ছাড়া সমস্ত নিচেটাই যখন বাড়ির মধ্যে এসেছে, তখন নিচেই কোন না লোকজনের, চাকর-বাকরের ক্রত নাগাল পাবে।

দস্তুরমত লিখিত চিরকুট নিয়ে এল চাকর। নাম দেখল দীপঙ্কর।

এখন কাকলি ঠিক করবে, নিচে নামবে কি নামবে না। যদি দেখা না করতে চায়, কী ওজুহাত দেবে। আর যদি দেখা করতেই চায়, কত স্বরিতে না মশুরে প্রস্তুত হবে। একটু সাজগোজ করে নেবে, না যেমন আছে, তেমনি ছুটে খালি পাবে।

হুচ্ছ হয়ে, হুন্দর হয়ে নামল কাকলি।

প্রথমটা, যেমন হয়, আজ্ঞে-বাজ্ঞে কুশল কথায় কাটল। কিন্তু কিছু একটা নাতে এসেছে নিশ্চয়ই, তারই ঔৎসুক্যে কান খাড়া করে রাখল কাকলি। দ্বিতীয়টি গায়ে পড়ে খবর জানবার তার উৎসাহ নেই। কতদিন খবরের গল্পটা চোখের সামনে মেলে ধরেও শাসালো খবরটাই তাকে এড়িয়ে গেছে।

জানি বলবে। ঠিক গলা থাকবে বললে দীপঙ্কর, ‘বোর্ডের মিটিংটা ঠিক হল কিনা?’

‘বা, আমি জানব কোথেকে?’

‘যদি বলেন কিছু বলে থাকে।’

‘আর রাজ্যে কথা নেই, বোর্ডের মিটিং!’ কাকলি ভঙ্গিটা ঝাঁক করল: ‘কেন, আপনি ভিতরের লোক, বোঝেন না কিছু? ও বেরোচ্ছে এখনো?’

‘তা বেরোচ্ছে, কিন্তু বোধ হয় আভাস পেয়েছে ও থাকবে না।’

‘সে তো সবাই পেয়েছে, সেটা আর বেশি কথা কী! কিন্তু আপনার অনুমান কিসের?’

‘ও বললে।’

‘কী বললে?’

‘বললে, বিনতাকে চলে যেতে বলতে হল।’

‘কারণ?’

‘কারণ, বললে, চাকরিটা আর থাকল না।’ দীপঙ্কর সহানুভূতির ভাব আনল: ‘চাকরিই যখন থাকল না, বললে, বিনতাকে কষ্ট দেবার আমার অধিকার নেই। কেন ওকে স্তোক দিয়ে ভুলিয়ে রাখি, কেন ওর স্বপ্ন শুধু নয়, আরামের ঘুমটুকুও নষ্ট করে দিই? তাই, বললে, ছেড়ে দিলাম বিনতাকে। আর চাকরি নেই শুনে বিনতাও নাকি পত্রপাঠ বিদায় হল।’

‘পত্রপাঠ বিদায় হবে না তো কি একটা বেকারভূষণকে সারা জীবন পোষণ করবে? তাও ঐ তো মাইনে মাস্টারনীর।’

‘অথচ সরকারিভাবে চাকরি এখনো যায় নি।’ দীপঙ্কর দ্বিধাগ্রস্তের মত বললে, দ্বিধা কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু কেন যে ওর এই প্রিয়নিশান কে বলবে। এতটা ওর বিশ্বাস, কুঠার না পড়তেই গাছের কাঠ ও বেচে দিল। চাকরি না যেতেই ছেড়ে দিল প্রণেয়াকে।’

‘আপনিও যেমন!’ পরিস্রবের ঠোঁটের বক্ষিমাকে প্রথর করল কাকলি: ‘ও ছাড়বে

কেন? বিনতাই ছেড়ে দিয়েছে। এখনো যখন ও চাকরি করছে, চাকরি যাবার ওজুহাত অচল। আসলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, বিনতা টের পেয়েছে ওর মেজাজে ঝাঁজ, উপহার পেয়েছে বা এক টুকরো ঝগড়া, আর অমনি কেটে পড়েছে। তাবো যতই জোয়ার আসুক, গোয়ারের সঙ্গে আটবে কে? বুদ্ধিমতী বিনতা।’

‘কিন্তু, যাই বলুন, স্বকুর এই ধারণা, প্রিমিনিশান যাতে মিথ্যে হয়, তার চেয়ে আপনাকে করতে হবে।’

‘কী ধারণা?’

‘যে ওর চাকরিটা থাকবে না।’

‘তা আগে চাকরিটা যাক। বোর্ড ডিসাইড করুক। রাম না হতেই রামায়ণ কী না, আপনাকে বলে রাখছি। বোর্ডের ডিসিশন যদি ওর পক্ষে যায়, কোন কথা নেই। যদি না যায়, আপনাকে বিহিত করতে হবে। আপনি ছাড়া কেউ নেই।’ উঠে পড়ল দীপকর : ‘মামলা-মকদ্দমা করা বড় টিডিয়স। জরাগ্রস্ত হ্যাং রোগশয্যায়, ধূলিশয্যায় পড়ে আছি প্রাণ বেরোচ্ছে না—তেমনি হচ্ছে মামলায় যন্ত্রণা।’

‘তা আপনার এসব প্রিজিও তো প্রিম্যাচিওর।’ কাকলিও উঠে পড়ল ‘চাকরিটা আগে যাক। এ যেন গাছে ফুল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলছেন। গাছের ফুল আগে ছেঁড়া হোক।’

‘আচ্ছা, আসি।’ চা খাবার পর চলে গেল দীপকর।

কিন্তু কদিন পরে আবার এসে সে হাজির। এত চঞ্চল যে, কলিং বেল টিং বসল।

সে ঘণ্টার উত্তর দিল কাকলি নিজে : ‘কী ব্যাপার? বসুন।’

বসবার মত যেন স্বৈর্য নেই, দীপকর বললে, ‘দেখুন, বোর্ডের ডিসিশন বোধহয় হয়ে গেছে।’

‘তা হবে। সোফায় বসল কাকলি।

‘আর তা বোধহয় স্বকুর বিরুদ্ধে।’ তবু বসতে পাচ্ছে না দীপকর।

‘তা আর আশ্চর্য কী!’ কার্পেটে চটি ঘষল কাকলি : ‘কী করে বুঝলেন?’

‘কদিন ধরে স্বকু আফিসে আসছে না, বেশ কদিন ধরে।’

‘হয়তো ছুটিতে আছে।’ সোফায় ভক্তিতাকে আরামময় করল কাকলি : ‘বসুন।

না বসে উপায় কী, বসল দীপকর। বললে, ‘ছুটি নেয় নি। আমি খোজ করছি আফিসে। ছুটির কোনো দরখাস্তই নেই।’

‘তা হলে, গেছে।’ পরম পরিতোষের সঙ্গে বললে কাকলি, ‘কিন্তু ওর বাড়িতে খোঁজ করেছিলেন?’ একটু কি আবার উদ্বিগ্ন শোনাল?

‘ও তো বাড়িতে থাকে না।’

‘হ্যাঁ, গৃহ-বিভাঙিত, আফিস-বিমর্দিত, প্রেমসী-প্রত্যাখ্যাত—’

‘হোটলে থাকে। ঠিকানাটা জেনে রাখি নি।’

‘বন্ধুর কাজ করেছেন।’

‘না, ঠিকানাটা হয়তো বার করা যায়। কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করে তো চাকরির কোনো ব্যবস্থা হবে না।’

‘ব্যবস্থা তা হলে কী করে হবে?’

‘আপনার সঙ্গে দেখা করলে।’

‘আমার সঙ্গে?’ বললে উঠল কাকলি: ‘আমি কি বোর্ডের উপরওয়ালী?’

‘তা জানি না। কিন্তু আপনি প্রভাব বিস্তার করলে যে ‘না’ ‘হ্যাঁ’তে পরিণত হতে পারে তাতে সন্দেহ করি না।’

‘প্রভাব বিস্তার করলে মানে?’ শরীরে গর্বের ঢেউ তুলল কাকলি।

‘মানেটা আপনি করুন।’

‘মানে মনুষ্যের মত পেশম বিস্তার করলে?’

‘প্রায় তাই।’

‘কিন্তু যার জন্তে বিস্তার করব সে কোথায়?’ কার্পেটে পা ঘষল কাকলি: ‘সে নিজে এসে উমেদারি করবে না?’

‘তার যেন চাকরিতে স্পৃহা নেই।’

‘স্ট্রাঙেল পায়ে উড়ুনি উড়িয়ে প্রাইভেট টিউশানি করবার স্পৃহা। তবে আপনার কেন খোঁড়া ঘরে ঝাড় টানানোর চেষ্টা?’

‘এটা রাগের কথা নয়।’

‘রাগের কথা নয়, তবে অহুঁরাগের কথা? বেশ বলেছেন।’ কাকলি মুখিয়ে এল: ‘কিন্তু আমি যে ওর জন্তে বলব ও আমার কে?’

‘ও কেউ নয়। কেউ না হলে কি কিছু করা যায় না? ধরুন ও এক ছঃ্ছ অপমানিত যুবক।’

‘যে বক জু-তে থাকবার উপযুক্ত।’ পরিহাস করেও হাসল না কাকলি।

‘ধরুন, ও আমার বন্ধু। তার মানে আপনার এক বন্ধুর বন্ধু। আমিও তো একদিন আপনার বন্ধুরই বন্ধু ছিলাম। কত দয়া করেছেন আমাকে: তেমনি আজ

আপনার আরেক বন্ধুর বন্ধুর জন্তে কিছু করতে আপনি হুঁত্বিত হবেন কেন ? দয়া হে
আপনার শুকিয়ে যায়নি । কাক কোনোদিন যায় বলেও শুনি নি কখনো ।’

‘জানেন না, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যায় ।’ কাকলি ওঠবার ভঙ্গি করল :
‘আপনার সঙ্গে তুলনা করবেন না । আপনার উপরে প্রকাণ্ড একটা পরিবার নির্ভর
করে ছিল । আর ওর কী ? আপনি আর কোপনি । এক স্ত্রী ছিল তাকে :
অকারণে খেদিয়ে দিয়েছে । এখন খাই দাই কাঁসি বাজাই । এমন যে দায়িত্বশূন্য
তার জন্তে আমার দয়া হবে কেন ?’ উঠে পড়ল কাকলি : ‘কাউকে কিছু পারব
বলতে ।’

‘সবটাই দায়িত্বের কথা নয়, মর্যাদার কথাও তো আছে ।’

‘মর্যাদা ! চটিজুতোর আবার ফিতে ! দেখুন, যা পারব না তা করতে বলবেন না
‘তবু—’

‘তবু আবার কী !’ সোফাসেটির ধার থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে কাকলি
বললে, ‘আমি নিজেই তো চাই ওর শাস্তি হোক, ও বেকার হয়ে যাক । প্রাইভেট
টিউটর কি বেকার ? কী বলে সেনসাসে ?’

‘জানি না ।’ তবু আশা ছাড়ে না দীপঙ্কর । যেতে-যেত বললে, ‘কিন্তু আমি
আবার আসব ।’

‘তা আসবেন ।’ এতক্ষণে একটা কোমল সুর বের করল কাকলি ।

কদিন পর, আফিসফেরত ঘরে বিশ্রাম করছে কাকলি, পর্দার আড়াল থেকে
চাকর বললে, ‘বাবু এসেছেন ।’

‘কে ?’ কাকলি উঠল কাকলি ।

‘বড়বাবু এসেছেন ।’

‘বরেনবাবু এসেছেন ?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, বরেনবাবু ।’

‘বলো যাচ্ছি ।’

কেমন বসে রয়েছে নিচে । না বসে করে কী । নিজেই সব পছন্দ করে
কিনিয়েছে । সাজিয়েছে গুছিয়েছে । তারপর নিজেই কেমন মাকড়সার মত বন্দী
হয়েছে নিজের জালে ।

আর সাধ্য কী, অনিবার্য দুর্যোগের মত নিষ্ঠুরতার উপর কাঁপিয়ে পড়ে । মর্ষিত
করো শাস্তিকে । এই সুন্দর । বাসনাকে প্রতীকার দীপে-ধূপে আরতি করো । সেই
ভাগ্যের জন্তে সৌন্দর্যের মঞ্চলাচরণ ।

‘চলো একটু বেরুই।’ কাকলি আসতেই প্রস্তাব করল বরেন : ‘কী, যাবে?’
মৃদু হাসল কাকলি : ‘মন্দ কী! একটু বহন, তৈরি হয়ে নি। চা-টা পাঠিয়ে
দিই।’

‘না, না, চা-টা বাইরে থাক। এই তো বেশ আছে—’

‘অজ্ঞানে আছি। অজ্ঞান থেকে জানে আসি, তমসা থেকে জ্যোতিতে, সেপ্টে-
প-উভারে—’ জোরে হাসল কাকলি।

‘মোটাই তা নয়। বরং বিকৃতি থেকে প্রকৃতিতে। কৃত্রিম থেকে আদিমে।’

‘এবং তা সূধীরে।’

কী অরুণ্ডদ যন্ত্রণা এ ধৈর্যের, কী বা আনন্দ। চলে যাচ্ছিল কাকলি, বরেন
চুকল। বললে, ‘একটা থবর ছিল—’

‘কী?’

‘বোর্ডের সেই মিটিংটা হতে দিলাম না।’

‘কেন, কী হল?’ থমকে দাঁড়াল কাকলি।

‘বোর্ড ওর ডিসমিস্তালই চাইবে বুঝতে পাচ্ছিলাম। তাই ওকে অগ্রত চাকরি
পাইয়ে দিলাম।’

‘চাকরি পাইয়ে দিলেন?’ প্রায় একটা মূঢ় আত্ননাদ করে উঠল কাকলি।

‘হ্যাঁ। গোড়ায় মাইনেটা খুব স্ববিধের হল না কিন্তু পরেই একটা পরীক্ষার পর
ভালো গ্রেডে ওঠবার সম্ভাবনা আছে।’

‘ও নিল চাকরি?’

‘পশ্চাতে যখন উন্নতি আছে তখন কেন নেবে না? ভবিষ্যতে ওখানে কী হবে
জানি না কিন্তু এখনকার, এখানকার আনপ্লেক্টেনেস তো এড়ানো গেল। ওকে
তো একেবারে অখুশি করে বিদায় দেওয়া হল না—’

‘খুব অন্তায় করলেন।’

‘অন্তায় করলাম?’

‘হ্যাঁ, ওকে বিমুখ করাই উচিত ছিল। উচিত ছিল শিক্ষা দেওয়া।’

‘কী দরকার! আমরা কেন ক্ষুদ্র হই? শত হলেও আমাদের কেন সৌজন্তের
অভাব হয়? তা ছাড়া, তুমি একবার বলেছিলে ওকে আর কোথাও যেন চুকিয়ে
দিই। ঠিকই বলেছিলে। ওর প্রতি আমাদের একটু কৃতজ্ঞতাও তো থাকা উচিত।’

‘কৃতজ্ঞতা?’

‘হ্যাঁ, ওই তো মাধ্যম, ওই-ই তো আমাদের মিলনের সেতু।’

‘ষাক গে যা হয়েছে। মাইনেটা তো কম—’

ক্ষিপ্ত পায়ে উপরে উঠে গেল কাকলি। ক্ষিপ্ত হাতে সাজগোজ সমাধা করলে।
ঝরনার মত নেমে এল লাবণ্যধারায়। বললে, ‘চলুন।’

গাড়ির মধ্যে ঘন হয়ে বসল বরেন। স্পার্শে ব্যাকুল হয়ে উঠতে চাইল। বোধ হয়
চুষন করবে। করুক। কী হয় চুমু খেলে?

শাস্ত্রস্বরে বললে, ‘নোটিশ তো সই করা হল না—’

‘ও, হ্যাঁ, কী আশ্চর্য, ফর্মটা পকেটে করে এনেছিলাম।’ নিবৃত্ত হল বরেন। পকেট
হাটকাতে লাগল।

‘হু-জনেই সই করতে হবে?’

‘হ্যাঁ, সংযুক্ত নোটিশ। উই ইনটেণ্ড টু ম্যারি—। দেখি, দাঁড়াও, দেখি কিরকম
না জানি বয়ানটা। আমি আগে ভেবেছিলাম আমার একার নোটিশ দিলেই বৃষ্টি
হবে।’

‘এত ব্যস্ত?’

‘শেষে দেখলাম হু-জনেরই সই চাই।’

‘নোটিশের কদিনের মধ্যে বিয়ে করতে হবে?’

‘তিন মাসের মধ্যে।’

‘তিন মাস!’

‘হ্যাঁ, এক মাস পর্যন্ত অবজেকশানের মেয়াদ, সেটা পেরিয়ে গেলেই কনজাংশান।’

কতক্ষণ কাটল চুপচাপ।

বরেন আবার উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইতেই কাকলি বললে, ‘নোটিশটা আগে সই
করি বাড়ি গিয়ে।’

‘ঠিক বলেছ। নোটিশ!’ শিশুর মত হেসে উঠল বরেন। হু’হাতে সিগারেট
ধরাল।

বাস-এই আফিস যায় কাকলি। ফেরেও বাস-এ।

যথারীতি বাস-এই ফিরছিল।

‘লেডিজ—’ হৈকে উঠল কণ্ঠস্বর।

এক রাজ্যের লেডিজ সিট। তার মধ্যে দু-পাশের দুটো পুরুষেরা দখল করে আছে।

মেয়েছেলেই তো—শাপাস্ত করছে পুরুষেরা। কিন্তু এখন সমস্তা দেখা দিয়েছে চু দল পুরুষের মধ্যে কারা আগে সিট ছাড়ে।

জানলার বাইরে রাস্তার দিকে মুখ করে গ্যাট হয়ে বসে রইল স্বকাস্ত। পাশের লোককে বললে, ‘চুপ করে বসে থাকুন। ওরা ছাড়ুক।’

ও সিটের লোকেরাও সমান নাছোড়বান্দা। ওরা ছাড়ুক।

স্বকাস্তের পাশের লোকটা বোধ হয় মিনমিনে, হাবাগোবা। স্বকাস্তকে বিশ হাত জলের নিচে ফেলে লোকটা উঠে পড়ল।

অগত্যা স্বকাস্তকেও ছাড়তে হল জায়গা।

আর সে সম্পূর্ণ বেরিয়ে না এলে ভদ্রমহিলা সিটের গলিতে ঢোকে কী করে।

সংকুচিত হয়েই বসল কাকলি। পাশে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে। যে কেউই বসতে পারে অনায়াসে। কাকলি অবুঝ নয়, অহুদার নয়। একটা পুরুষ তার পাশে বসলে তার গায়ে কোন্স পড়ে না। গায়ের সঙ্গে গা লাগলেও মরে যায় না লজ্জায়।

এই মাছপাতুরি ভিড়ের মধ্যে সিট একটা খালি থাকবে এও বুঝি অস্বস্তিকর। নৈব্যক্তিক ভিড়ের দিকে তাকিয়ে কাকলি বললে, ‘একজন বসুন না।’

যত হাবাগোবা ভেবেছিল, তত নয়। সেই মিনমিনে লোকটাই বসে পড়ল বেমালুম। এখনো কী রাগ! কী উপেক্ষা! একবার তাকিয়ে দেখছেও না, এদিকে। সে তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া ছিল, বাস-এর ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঝগড়া কী। যাই বলো, আসলে অসত্য। নইলে বুশ-শার্ট পরে রড ধরে দাঁড়িয়েছে!

কিন্তু এদিকে তো কই কোনোদিন দেখি নি। আফিসকেরত বাস-এ তো এ

নতুন যাচ্ছি না, কই এর আগে ঘটে নি তো এমন দুর্ঘটনা। তবে কি কাকলির আফিসের কাছাকাছি এলাকায় চাকরি হয়েছে? কোন আফিস, কোন ডিপার্টমেন্ট—অত খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করা যায় না বরেনকে। কাকলির যে স্বন্ধ কৌতূহল, নিরাসক্ত সন্ধান—এটুকুই যদি না বুঝতে চায়। কী দরকার পরের কথা ঘরে এনে।

কে না কে লোক, তার কুলকুষ্টির খবর নাও!

সাহেব হয়েছিল বলে কত একদিন লম্বাই-চওড়াই করেছিল। আস্তে-আস্তে কথা বলা ধরেছিল, ধরেছিল সুপ খাওয়া। বেচারা! মাইনে কমে গিয়েছে। আহা, কোট নেই, টাই-শার্ট নেই। এখন কী একটা জন্মুলে জামা পরে আসরে নেমেছে। হাতের লোম-দেখানো জামা, কারু কারু বা বুকের, যাদের বুক গলা থেকেই শুক; ছি ছি, এ জামাটা যে কী করে সম্রাস্তের সভায় পাড়ন্তেয় হল কে বলবে। জ্বরকোটটা তবু সহ করা যায়—ওটার নিচে গা-হাত-ঢাকা আস্ত-মস্ত পাঞ্জাবি থাকে। কিন্তু এই বুশ-শার্ট? যেমন চরিত্র তেমনি নাম। ঝোপঝাড়েরই যোগ্য জামা।

তার মানে অবস্থা পড়ে গিয়েছে। সেই জেলাজমক নেই। নেই সেই উঁচু নাকের তীক্ষ্ণতা। জামাকাপড়ও ময়লা-ময়লা মনে হল। আয় কমে গিয়েছে, দেখাবেই তো অমন শাদাসিধে ময়লা-ময়লা। কত কমে না জানি চার্ট নিল! কী দরকার ছিল অল্প মাইনেতে রাজি হওয়ায়। অবস্থা বরেন যেটা মাইনে দিচ্ছিল সেটা কৃত্রিম—এখন বোঝা যাচ্ছে, সেটা বরেনের শয়তানি, ঝগড়ার আগুনটা যাতে ভালো করে জলে তার ইন্ধন। ঝপ করে গোড়াতেই অত মাইনে হয় না—সেটা বুঝেছে বলেই হয়তো কম মাইনেয়, গায্য মাইনেয়, রাজি হয়েছে। গ্রেডটা হয়তো ভালো, পরে উন্নতি আছে, এই হয়তো আকর্ষণ।

তবু সমূহ টাকাটা তো কমল। সোনার জল তো ধুয়ে গেল। তাই বোধ হয় কিরকম একটু বিষন্ন দেখাচ্ছিল। পলকাংশের তো দেখা, তা নিয়ে আবার গবেষণা কী! বিষন্ন না হাতি! বোধ হয় রোগা-রোগা দেখাচ্ছিল। ও কি এখনো হোটেলেই আছে? হোটেলে না থেকে যাবে কোথায়? হোটেলে থাকলেও, যেহেতু রোজগার কম, খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে—সেকেও ক্লাশ করিয়ে দিয়েছে।

আর, বিনতা তো সেকেও ক্লাশই মেয়ে, চাকরির গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক আবার এসে হাজির হবে, ধরনা দেবে দরজা ধরে। আর এবার নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যাত হবে না। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্য মিলবে, ক্লাশের সঙ্গে ক্লাশ, যেমন দাদা গুণমণি তেমনি বউ রাসমণি!

যাক গে, মরুক গে। কে কখন উঠছে আর নেমে যাচ্ছে তাকে নিয়ে যত রাজ্যের মানসিক বালপ্রলাপ!

কে জানে দেখতে পায় নি হয়তো। কেমন ল্যালাখাপা টাইপ। তাকিয়ে একটু বা তারিয়ে-তারিয়ে দেখবে এমন ধাতই নয়। যাকে বলে সৎ ছেলে, লক্ষণ ছেলে। বলত মেয়েদের মুখের দিকে তাকাই না, পায়ের দিকে তাকাই। খুব অন্ডায় কাজ করো। মেয়েরা এত যে মুখের প্রশাধন করল, কপালের ঠিক উপরে চলে কার্ল দিল কিংবা চোখের পালকগুলোকে লম্বা করল সে তো পুরুষদের দেখাবার জন্তে। এখন বরং না দেখাটাই অসৎ, অস্তত অশালীন। এখন যে পুরুষ দেখে না, সে হয় খাপা, নয় ভণ্ড।

নয় সে শত্রু!

ড্রয়িংরুমেই ডাকল বরেন।

কাকলির একবার ইচ্ছে হল, বলে পাঠাই, শরীরটা ভালো নেই। হয়তো গতেও নিশ্চিস্ত একলা থাকা যাবে না। অস্থখ? কী অস্থখ? বাস্তব হয়ে উঠে আসবে উপরে। মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া অসম্ভব। আর যখন শরীরে অস্থস্থতার তপ্ত প্রমাণ পাবে না, বাইরে বেকবাব জন্তে পিড়াপিড়ি করবে, আর দোষ দেব কাকে, ক্রমশই নির্ধারিতের দিকে প্রধাবিত হতে চাইবে।

কোথাও যদি একলা চলে যাওয়া যেত। নির্জন কোনো পাহাড়ের দেশে, অনেক পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট একফালি সবুজের উপর ছোট্ট একটি কাঠের ঘরে, পাশ দিয়ে বয়ে যেত একটি কালো জলের ঝরনা, পাথরে বাধা পেলেই ফেনায়িত শাদা—আর চারদিকে স্তব্ধ আনন্দের মত উদার-উত্তাল পাহাড়। চুপটি করে মুখ বুজে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে শুয়ে থাকত কাকলি, কেউ তার খোঁজও পেত না, জানতও না ঠিকানা। যদি বা কেউ আসতও শেষ পর্বস্ত, দেখত, যার ঝরনা হবার কথা, সে পাথর হয়ে রয়েছে।

শরীর যে খারাপ তা নিজে গিয়েই জানানো উচিত।

‘এই নিন, ফর্ম নিয়ে এসেছি।’ কাকলি নামতেই একটা কাগজ বরেন এগিয়ে ধরল।

কাগজটা পড়ে মিষ্টি করে হাসল কাকলি। বললে, ‘নোটিশ অফ ইনটেণ্ডেড ম্যারেজ। কি, সহঁ করতে হবে?’

‘হ্যাঁ, আর দেবির করে লাভ কী!’ বরেন পকেট থেকে কলম বের করল।

কাকলি বসল। বললে, ‘এই নোটিশ দেবার তিন মাসের মধ্যে বিয়ে করতে হবে?’

‘তার আগেও হতে পারে।’

‘আগেও হতে পারে?’ হাসিটা আরো একটু প্রস্ফুট করল কাকলি।

‘আসলে নোটিশটা একমাসের নোটিশ। ম্যারেজ অফিসর এই নোটিশের পর এক মাস অপেক্ষা করবে কোনো আপত্তি পড়ে কিনা। যদি আপত্তি পড়ে, আরেক মাসের মধ্যে তার বিচার করে দেবে অফিসর। যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, পরে আরো এক মাস। আর যদি আপত্তি না পড়ে, তা হলে তো নোটিশের এক মাস অস্তেই—’ বরেন আগের জায়গা ছেড়ে কাকলির পাশে এসে বসল।

‘আপত্তি—আপত্তি কিসের?’ একটু বা ভীত-ব্রন্ত মুখ করল কাকলি : ‘কে আপত্তি করবে?’

‘কেউ না—আপত্তির কোনো স্কেপই নেই। যা-তা আপত্তি করলেই চলবে না। আপত্তি চলতে পারে যদি আমরা কেউ ইডিয়ট হই—’

‘তা, ইডিয়ট? ইডিয়ট কে নয়?’ কাকলি হাসল : ‘স্থলবিশেষে কমবেশি সকলেই তো ইডিয়ট। বিশেষত যারা বিয়ে করে।’

জোরে হাসল বরেন। বললে, ‘সে অর্থে নয়। শরীরিক অর্থে। মানে যদি আমরা কেউ জড়বুদ্ধি হই, কিংবা উন্মাদ হই।’

‘উন্মাদ!’ চোখে আবার টলটলে হাসি আনল কাকলি।

‘মানে, জীবনের সঙ্গে জীবন যুক্ত করবার জগ্রে উন্মাদ নয়, উন্মাদ মানে বায়ুরোগগ্রস্ত। যাকে বলে, ক্ষিপ্ত। বাতুল।’

‘আর কী আপত্তি চলতে পারে?’

‘যদি আমরা রক্তের আত্মীয় হই, মানে যদি গ্রহিবিটেড ডিগ্রির মধ্যে পড়ি।’

‘সে তো এ জগ্রে অসম্ভব।’

‘কিংবা যদি আমার বয়েস একুশ আর তোমার বয়েস আঠারোর কম হয়।’

‘বয়েস? এখন তো ফাঁকা মাঠ। গাছও নেই পাথরও নেই।’

‘কিংবা যদি আমার পূর্বতন কোনো স্ত্রী বা তোমার পূর্বতন কোনো স্বামী বেঁচে থাকে।’

‘বেঁচে থাকে!’ মুহূর্তে কাকলির মুখ স্নান হয়ে গেল : ‘কিন্তু ও তো এখনো বেঁচে আছে।’

‘কে বেঁচে আছে?’ জীবন-মৃত্যুর কথা নিয়েও বরেন দ্বিবি লঘু হতে পারে : ‘ভূমি কার কথা বলছ?’

‘আপনার বন্ধু—সেই—’

‘তুমি স্বকান্তর কথা বলছ?’

মুচের মত তাকিয়ে রইল কাকলি।

‘সে কি আর তোমার স্বামী?’ শিশুর মুখে ভুল অথচ গম্ভীর কথা শুনে লোকে ঘেমন হাসে, তেমনি হেসে উঠল বরেন।

সে হাসিতে যোগ দিল কাকলি। শিশুর মতই মুখ করে বললে, ‘সত্যিই, আমি কী বোকা!’

একটু বা ককুণা হল বরেনের। বললে, ‘কী ছেলেমানুষ!’

নিজেকে শাসন করল কাকলি। হাসি মুছে ফেলে মুখে রাগ আনল। বললে, ‘কথাটা আমি প্রথমে ঠিক বুঝতে পারি নি। সত্যিই তো, ও তো এখন একটা রাস্তার লোক আমার কাছে। ও তো ক্রস্‌ড-আউট, ক্যানসেল্ড।’ ছোট গোল টেবিলটা টেনে নিল সামনে। বরেনের হাত থেকে কলমটা কুড়িয়ে নিল। টেবিলে ফর্মাটা পেতে ঝুঁকে পড়ে বললে, ‘বলুন কোথায় সই করতে হবে। আমিই আগে সই করব? না, বাধা নেই। উই হিয়ারবাই গিভ ইউ নোটিশ—’

বরেন আগের কথার জের টানল : ‘তুমি যতই কেননা ক্রস মারো, ওর স্বামিত্ব যায় নি।

‘যায় নি মানে?’ কুখে উঠল কাকলি : ‘কোটের ডিক্রি নেই?’

‘স্বামিত্ব মানে স্বামী হবার কর্তৃত্ব। শুনছি নাকি ওও বিয়ে করছে।’

‘তা আর বিচিত্র কী। কংসরাজের বংশধর গঙ্গারামও তো বিয়ে করেছিল।’

‘আর বিয়ে করছে তো তোমার বন্ধুকে। বিনতাকে।’

‘কাকে?’

‘বিনতা সেনকে।’

‘বিশ্বাস করি না। বিনতা এত বোকা নয় যে, সামান্য চাকুরে এক আফিসের কেরানীকে বিয়ে করবে। আগের মাইনেপত্র থাকত, তবু না হয় কথা ছিল।’

‘যেখানে গেছে সেখানে আগের মাইনেপত্র পেতে কোনো বাধা নেই। তা ছাড়া’, সিগারেট ধরাল বরেন : ‘তা ছাড়া বিনতার লক্ষ্য স্বামী তত নয় যত পুরুষ। অর্থ তত নয় যত সামর্থ্য। স্বকান্তর চাকরিটা একদম চলে গেলে কী দাঁড়াতে বলা যায় না। যা হোক একটা চর্লনসই যখন জুটেছে, তখন আর তাকে নিরস্ত করে কে! বোকা তো নয়ই বিনতা, ঝাঙ্ক মেয়ে, মহাঝাঙ্ক, ঘুঘুদের মহারানী। নইলে ভাবতে পারো কোনো মেয়ে সাধ করে ব্যভিচারিণী সাজতে চায়?’

‘আপনি শুধু ওকে ছুঁছেন কেন?’ ঝলসে উঠল কাকলি : ‘আপনার গঙ্গারাম

বন্ধুই বা কী ! ঐ মেয়েকেই তো দিব্যি পছন্দ করছে । কী আছে ওর মধ্যে । ঐ তো রূপের ছিঁরি, দেখলে হরিভক্তি পালিয়ে যায় । তারপর যে নিজের থেকে তেড়ে আসে হস্তের মত—’

‘কাকে কার ভালো লাগে তুমি কিছুই বলতে পারো না । যে তেড়ে আসে, তাকে হয়তো একজনের ভালো লাগে আর যে নড়েও বসে না, তাকে হয়তো আরেকজনের ।’ হাসিভরা দীর্ঘ দৃষ্টিতে কাকলিকে স্পর্শ করল বরেন ।

‘যাক গে । মরুক গে ।’ আবার কর্মের উপর ঝুঁকে পড়ল কাকলি : ‘পরের কথায় মাথা ব্যথা করে লাভ নেই । বলুন কোথায় সই করব ।’

‘দাও আমিই আগে করি ।’ কলমটা টেনে নিতে চাইল বরেন ।

‘কেন, আপনি আগে কেন ?’

‘শত হলেও আমি পুরুষ । আমারই দায়িত্ব বেশি ।’

‘দায়িত্ব-সমান সমান । আমি আগে যেহেতু আমার আগ্রহ বেশি ।’ প্রায় ঠোকাঠুকি লাগে বোধ হয় ।

বরেন ছেড়ে দিল । বললে, ‘বেশ, তুমিই আগে করো । শত হলেও তুমি সিনিয়র ।’

‘সিনিয়র ?’

‘সিনিয়র ইন এক্সপিরিয়েন্স ।’

হাসতে লাগল কাকলি । কিন্তু সই করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল । বললে, ‘আজ দিন কেমন ?’

‘দিন কেমন মানে ?’

‘না, ভালো দিন না হলে সই করব না । অয়মারস্ত: শুভায় ভবতু । শুভদিন দেখেই এর আরস্ত হোক ।’ উঠে পড়ল কাকলি : ‘দাঁড়ান, মায়ের জ্যোতিবীকে ডাকাই । পাজিপুঁথি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে দিক । অদিনে-অক্ষণে সই করলে কে জানে হয়তো স্কল ফলবে না—’

‘তুমি এসব মানো ?’

‘যুক্তি দিয়ে মানি না । কিন্তু যুক্তিই তো সব নয় । শেষে একটা কিছু হোক তখন খুঁতখুঁতুনির অন্ত থাকবে না—’

গায়ত্রী কাছেই ছিল, ঘরে ঢুকে বললে, ‘আমি আজই ডাকাছি জ্যোতিবীকে ।’ যদিও মেয়ের এই বাজে কথাটায় তার রাগ হচ্ছিল, কিন্তু কথাটা যখন উঠেই পড়েছে তখন সাধ্য নেই যে সেটাকে অতিক্রম করে ।

‘ঠিক আছে।’ উঠে পড়ল বরেন : ‘সেই সঙ্গে দিনটাও ঠিক করিয়ে নেবেন।’

‘সে তো নোটিশের এক মাস পরে।’ গায়ত্রী বললে, ‘আচ্ছা দেখছি। যত নিগগির হয়—’

‘আজ চলি।’ উঠে পড়ল বরেন। একবার তাকাল কাকলির দিকে। মনে হল যেন একটা অচেনার স্বর ওকে আঙুঠে জড়িয়ে রেখেছে। আশ্চর্য, ওয় এই ক্রমহতাটুকুও সুন্দর। এই আলস্যের স্তূপের মধ্যেই ঘুমন্ত বিদ্যুৎ। না, আর দেরি নেই। যোচন-মস্থনের আসবে সেই কালো রাত।

দরজা পর্যন্ত এগিয়েছে, গায়ত্রী কাকলিকে লক্ষ্য করে বললে, ‘তুই যাবি নে?’

‘আজ আমার একটু অগ্রজ কাজ ছিল।’ গাড়িতে বেরিয়ে গেল বরেন।

মেয়ের উপর ঝাঁজিয়ে উঠল গায়ত্রী : ‘তুই আবার দিনক্ষণ দেখতে শিখলি কবে? রেজিস্ট্রি করা বিয়েতে আবার দিন কী! তাও বিয়ের দিন না, নোটিশের দিন!’

‘লোকে কোনো কারবারে নামবার আগে দিন দেখে না?’ যদিও দুর্বল শোনাচ্ছে তবুও বললে কাকলি, ‘কোর্টে আর্জি দাখিল করতেও দিন দেখে। যে কোনো কনট্রাক্ট সই করতে।’

‘একবার তো দেখেছিলি কত! শালগ্রাম সাক্ষী রেখেছিলি।’

‘সত্যি, কোনো মানে হয় না। কিন্তু কী জানি কেন, মনটা হঠাৎ কুট করে দংশন করল। কেন বা একটু ক্রটি থাকবে। যাই বলো সংস্কার বড় আস্তে মরে। কই, তুমিও তো পারলে না ঝেড়ে ফেলতে।’

‘আমার ভয় দেরি দেখে না সরে পড়ে।’

‘আর আমার আশা, দেরিতে না ভালোবাসা জেগে বসে। যাবে কোথায়?’ উপরের সিঁড়ি ধরল কাকলি : ‘আর যদি একবার ভালোবাসা জাগে, তবে পাহাড়েও নৌকো চলে।’

সকাল-সকাল, তিনটে বাজতেই আফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল কাকলি। জয়ন্তীদের ইস্কুল সে জানে। চারটের ছুটি হবার আগেই দাঁড়াল গিয়ে গেটের সামনে। কতদিন সেন্টুর খোঁজ নেওয়া হয় নি। কত বড়টি না জানি হয়েছে। ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই এতদিনে।

সব এক রঙের পোশাক মেয়েদের। কোমরের বেণ্টে বোতামেও এক রঙ। চুলের রিবনেও। চট করে বেছে নেওয়া মুশকিল।

ইস্কুলের বাস-এ যাওয়া-আসা করে না জয়ন্তী। ইস্কুল তো আর খুব দূরে নয় বাড়ি থেকে, হেঁটেই যায়-আসে।

‘এ কে, ছোট বউদি না?’ জয়ন্তীই চিনতে পেরেছে প্রথমে।

হেসে এগিয়ে এল কাকলি। বললে, ‘ও সম্পর্ক যে আর নেই জানো না?’

‘জানি বৈকি। তবে তোমাকে কী বলে ডাকব? কাকলি-দি?’

‘কিছু বলে ডাকতে হবে না।’

‘তুমি এদিকে কী মনে করে?’

‘এমনি এসেছিলাম একটা কাজে। হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।’

বাড়ির সকলে ভালো আছে?’

‘আছে।’

‘তুমি?’

একটু লজ্জিত হল জয়ন্তী: ‘আমি তো ভালোই।’

‘সেন্টু?’

‘ভীষণ দুষ্ট হয়েছে। ভর্তি হয়েছে ইন্সুলে। এতক্ষণে এসে গিয়েছে ওর বাবা।
পিঠে ব্যাগ বেঁধে কী ভারি কি চালে ওঠে-নামে যদি একবার দেখে।’

‘আমার কথা আর কিছু বলে?’

‘কিছু বলে না।’

‘কিছু বলে না?’ ছাইয়ের মত মুখ করল কাকলি।

‘ভুলে-টুলে গিয়েছে সব। ছোড়দাও আর বাড়িতে থাকে না কিনা। কথা
আর নেই তোমাদের সম্বন্ধে। ওর এখন নতুন জগৎ হয়েছে, ইন্সুল, ইন্সুলের বন্ধ
বই খাতা রঙ পেইন্টিং বক্স। তাইতেই মশগুল হয়ে আছে ছেলেটা। তবে তোমার
দেখে কী করে, বলা যায় না।’ কোতুহলে উজ্জল চোখ তুলল জয়ন্তী: ‘যা
একবার বাড়ি? সেন্টুকে দেখবে?’

‘না।’ ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাকলি বললে।

‘আমাদের বাড়ির চেহারাটা বদলে যাচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে চট করে
চিনতে পারবে না।’

‘কেন?’

‘তেতলায় ঘর উঠেছে। সব নতুন করে মেরামত চুনকাম হচ্ছে।’

‘তেতলায় বিনতা থাকবে বুঝি?’

‘কে বিনতা?’ বেশি কপালে চোখ রাখতে হল না জয়ন্তীর: ‘ও! যা
সঙ্গে ছোড়দার বিয়ে হচ্ছে! মা যাকে বিনীতা বলে। বলে, আগের বউ ছি
পাখির ডাক, কৈচকেঁচি—এখন কেমন বিনীতা, শান্ত-শিষ্ট—’

‘তোমার মাকে খুব পটিয়েছে বুঝি।’

‘তাই হবে।’

‘আর, তারই জন্তে তাকে বুঝি তেতলার ঘরে মাথায় করে রাখছে!’

‘কী বলো, নতুন বউদি এখানে থাকবে কোথায়?’

‘এখানে, তোমাদের বাড়িতে থাকবে না?’

‘না। ছোড়াটা নতুন ক্যাট নেবে। সেখানেই থাকবে।’ বিজ্ঞের মত মুখ করল জয়ন্তী : ‘এখানে থাকতে গেলেই তো অ-স্বথ। গোলমাল।’

‘তবে তেতলার ঘরে থাকবে কে?’

‘মা বলছেন, মা। কাকিমা বলছেন, কাকিমা। দু-জনে টানাটানি চলছে। চলো না,’ কাকিলির আঁচলটা চেপে ধরতে চাইল জয়ন্তী : ‘এই মোড়টা ঘুরলেই তো আমাদের বাড়িটা দেখা যাবে—’

‘আমার অগ্রজ কাজ আছে।’ পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে গেল কাকলি।

জয়ন্তী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দেখল কাকিলির ভিড়ের মধ্যে গাড়ির মধ্যে মিশে যাওয়া।

কিন্তু জয়ন্তীর সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে বাড়ির দোরগোড়ায় এলেও কাকলি ভিতরে ঢুকতে পারত না। ভদ্রমহিলারূপেও না। ছল করে জয়ন্তীদের ইন্ধুলের নতুন মাস্টারনী সেজেও না।

কেননা, ভিতরের পরিবেশ ঠাণ্ডা নয়। মৃণালিনীর গলার তখন চড়া রঙ।

‘ছোট ভাই বড় ভায়ের মাথার উপরে থাকবে এ কোন দিশি শিষ্টাচার! এ কিছুতেই চলবে না, পারে না চলতে।’

‘তার মানে তুমি আমাকে তেতলায় উঠতে বলো?’ ভূপেন প্রবলতর আপত্তি করল : ‘আর নিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমার হার্ট পটোল তুলুক?’

‘তা, তুমি দোতলায় থাকো, আমি তেতলায় উঠি। কতদিন আমার সাথ নিজের মনের মত একথানা নিরিবিলি ঘর পাই।’ শীতের দিনে কার্পেট, গ্রীষ্মের দিনে খসখসের বেড়া আর শীতলপাটি—বই আর বই, রেডিও, ফোন, আর ফ্রিজিভেয়ার—তা যা আমার সাধের সোয়ামী—কানাকড়িরও মুরোদ দেখলাম না।’

‘তার মানে তুমি বলতে চাও নিজের পরসায় যে এই ঘর তুলল, সেই হেমনে যেমন-কে-তেমন তার নিচের ঘরেই থাকবে?’ ভূপেনের স্মারবুদ্ধিতে বাধল বোধ হয়।

‘থাকলই বা। নিজের খরচে একটা ঘরই না হয় তুলে দিল দাদাকে। মানুষ দেয় না? দেয় না ছোট ভাই?’

‘কিন্তু দাদা তো চায় না তেতলা। বরং তোমারই তো ড্রয়িংরুমের শখ। হেমন তেতলায় গেলে নিচের ঘরটা ড্রয়িংরুম হতে পারবে। লোকজন আসে, দাঁড়িয়ে থাকে, শোবার ঘরে ঢোকালে আক্রমণ—এসব তো তুমিই নিবারণ করতে চাইতে।’

‘তাই বলে আমি তেতলা ছাড়ব কেন? তোমার ড্রয়িংরুমের দরকার হয় তুমি সেখানে বসে ড্রয়িং করো গে—’

‘ঘর যদি আমার টাকায় হত,’ ভূপেন তবু ছাড়ে না। ওকালতি : ‘তুমি তা দাবি করতে। আর এখন যখন আমার টাকায় হচ্ছে না, তখনো তুমি তা দাবি করবে, এটা কোনো শাস্ত্রই ঠিক নয়।’

‘তোমার টাকায় হচ্ছে না কেন? কথা ছিল বাড়িওলা নিজের খরচে করে দেবে— বাড়িয়ে নেবে বাড়িভাড়া, সে কথা কেন রইল না?’

‘বাড়িওলা রাজি হল না। আর আমারও হাতে নতুন ঘর তৈরির পয়সা নেই।’

‘পয়সা নেই তো নতুন ঘর তৈরির অসুবিধা দিলে কেন?’

‘হেমনের ইচ্ছে পরিবারকে থিতু করে, বড় করে, বিস্তারিত করে।’ ঝড়ের মধ্যে পড়েছে, জলের ঝাপটাকে আর ভয় করে না ভূপেন : ‘আস্তে আস্তে আরো ঘর তোলে তেতলায়—’

‘আহা, কেমন সবাইকে থিতু করছে সংসারে! স্বন্দর ছেলেটাকে বাড়ির বার করে দিলে।’ মৃণালিনী কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠল।

‘একটা ছেলে বাড়ির বার হয়ে গেলেই পরিবার ভেঙে যায় না। ভূপেন শুকনো গলায় বললে, ‘কত ছেলে বিদেশে যায় চাকরি করতে, তা সত্ত্বেও সাবেক বাড়ি এজমালিই থাকে।’

‘থাকো তোমাদের এজমালি নিয়ে।’ আঁচলে মুখ ঢাকল মৃণালিনী : ‘আমি স্বকুর কাছে চলে যাব।’

‘সে কোথায়? সে তো হোটেল।’

‘না, না, সে ক্ল্যাট নেবে, তার বিয়ে দেব, মেয়ে প্রায় ঠিক।’

‘সে তো ভালো কথা। কিন্তু তাদের দু-তিন কুঁঠুরির ক্ল্যাটের একটা ঘর তুমি মারবে কী!’ ভূপেন হতাশাসের মত নিশ্বাস ছাড়ল : ‘আবার ওদের জায়গা কম পড়ে যাবে। হৃদয়ের সমস্ত সংকীর্ণতা স্থানান্তরের জগ্নে। স্বকুর আর বউমার যে

ঝগড়া হত, তারও মূলে ঐ ছোট ঘর, একখানি ঘর, স্থানের অনটন। তাই স্বকূর যদি ফের সংসার হয়—তুমি তোমার ফোন রেডিও ফ্রিজিডেরার নিয়ে সেখানে ঢুকো না, ওদের শান্তিতে থাকতে দিও।’

‘এখানেও দেখব তোমার কেমন শান্তি।’ কাম্মার মধ্যেই শামাল মৃণালিনী।

‘আমার আবার অশান্তি কী! তুমি তেতলায় ঘর নেবে, মক্কেল নেবে এক তলায়, আর আমি সিঁড়িতে বার কতক ওঠা-নামা করতে করতেই খুঁষসিসে প্রাণ ফারাব।’

বিজয়া হেমনকে ফোন করল আফিসে। বটঠাকুরের শরীরটা খারাপ হয়েছে, শিগগির চলে এসো।

ডাক্তার এসে বললে, মাইন্ড হার্ট-অ্যাটাক। ভয়ের কিছু নেই। কদিন পরিপূর্ণ বিশ্রামেই সেরে যাবে। ওঠানামা বন্ধ।

‘আমি বুঝি বুঝি না চালাকি?’ ঘরের মধ্যে বিড়বিড় করছে মৃণালিনী : ‘মাত্রে আমি তেতলার ঘর দাবি না করি, তার জন্তে এই ছলনা। নচেৎ স্বস্থ মানুষ, অমনি একেবারে বিছানায়।’

‘কিন্তু কী অধিকারে উনি তেতলার ঘর দাবি করেন! কোন আইনে!’ কঙ্কঙ্কার সঙ্গে হেমনকে বলছে বিজয়া, ‘টাকা যখন আমাদের, ঘরও আমাদের।’

‘এক শো বার।’ সায় দিল হেমন।

‘ও ঘরে আমি থাকব।’

‘এ সম্বন্ধে কথা কী!’

‘যখন উনি কতান্তিতে পারেন না তখন উনি দিদি সাজেন!’ ব্যঙ্গের টান দিল বিজয়া : ‘আমি এত বড় দিদি, আমি শ্রদ্ধা পাব না, সেবা পাব না? উলটে তখন আমিও তো বলতে পারি আমি এত ছোট বোন, আমি একটু স্নেহ পাব না, প্রশ্রয় পাব না? বুঝলে না, নিজের বেলা আঁটিসাঁটি পরের বেলা চিমটি কাটি।’

‘তা, দেখি না, পরে না হয় আরো একখানা ঘর তুলব তেতলায়।’

‘আরো একখানা?’

‘মন্দ কি। যত বাড়ানো যায় ততই তো ভালো। বাড়ানোই তো বড় হবার প্রমাণ। পাশাপাশি দুই ঘরে তোমরা দুই বোন তখন থাকবে। বউদি আর তুমি। লোকে বলবে লক্ষ্মী আর সরস্বতী।’

‘পুতনা আর সূর্যপনা।’ বিজয়া মুখ ফেরাল : ‘কিন্তু বাড়িওলা এত সব অ্যালাউ করবে?’

‘করবে।’

‘ভেঙে-চুরে নতুন করে তৈরি করলেও কিছু বলবে না?’

‘না।’

‘না?’ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বিজয়া। হেমেনের চোখতরা হাসির থেকে বুঝে নিল উত্তর। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ‘সত্যি?’

স্বর শ্রুত করল হেমেন : ‘সত্যি। বাড়িওলার থেকে গোটা বাড়ি কিনে নিয়েছি।’

‘সত্যি? সমস্তটা বাড়ি আমার? আমাদের?’

‘আমাদের।’ হেমেন আরো শ্রুত করল কণ্ঠ : ‘তুমি এখন তা দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দিও না। যদি পেট ফেটে মরে যাচ্ছ বোঝো, মাটিতে গর্ত করে বোলো, ভূমি-কম্প ঘটিও, তবু পাঁচজনকে এখন জানতে দিও না।’

‘না, না, বলব না কাউকে। কিন্তু,’ হেমেনের হাত চেপে ধরল বিজয়া : ‘সত্যি?’

‘সত্যি?’ কাকলির ফোন পেয়ে বরেনেরও সেই সানন্দ বিস্ময়।

‘সত্যি। জ্যোতিষী বলে পাঠিয়েছেন আজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে নটা ভালো সময় আপনি আসবেন। কর্ম সই হবে।’

‘সত্যি?’

‘হ্যাঁ, আর কাল দুপুরেই ম্যারেজ অফিসারের কাছে ফাইল করে দেব।’

ঠিক সময়ে হাজির হল বরেন। এসে দেখল কজন নিমন্ত্রিতও এসেছেন। সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কাকলি। নরুকাবাবকে তো চেনেনই, আর ইনি আমার কাকিমা। আর এরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু, এখন বলা যায় আফিস-পাড়ার চিত্রা, মীনাক্ষী, শকুন্তলা।

না, লুকোছাপা কী! নোটিশ দেওয়াই তো রাষ্ট্র করা, দেশময় সকলের কর্ণগোচর করে দেওয়া, হ্যাঁ, তোমরাও জানো। বিয়ের নোটিশ দিচ্ছি আমরা।

বরেনই আগে সই করল। নিচে কাকলি। তারপর চলল খাওয়া-দাওয়া। অনেক হাসাহাসি। অনেক মার্জনীয় চাপল্য।

বরেনের ইচ্ছে ছিল মোটরটা ছোটায় এখন একবার রাস্তা দিয়ে। কিন্তু কাকলির আফিস-পাড়ার বন্ধুগুলো কী! কিছুতেই উঠতে চায় না, ছাড়তে চায় না কাকলিকে। চাকরি করে করে বুদ্ধিগুণ্ডিও ভোঁতা করে ফেলেছে। কাকলিকে যে এখন একটু একা থাকতে দেওয়া দরকার এটুকুও মাথায় আসে না কারো।

‘এখন উঠি।’ আবার তাড়া দিল চিত্রা।

‘বোস আরেকটু।’ কাকলি আবার বাধা দিল।

ভদ্রতায় খাতিয়ে কাকলি তো বাধা দেবেই। কিন্তু তুই ভদ্রলোকের মেয়ে, তুই উট্টস না কেন? তুই কেন বসে থাকিস? শেকড় গজাস?

তারপরে যা এতক্ষণ ভয় করছিল বরেন—যদি দয়া করে আপনার গাড়িতে ওদের একটু পৌঁছে দেন বাড়ি—

পরমরসিক ভাগ্যের দিকে নির্মম চোখে তাকাল বরেন।

পিছনের সিটে গদাগাদি করে মেয়ে তিনটে বসল। আর বরেন ড্রাইভারের পাশে।

পরদিন সকালে, আফিস-টাইমে, বরেন এসে তুলে নিল কাকলিকে। ম্যারেজ-অফিসে গিয়ে ম্যারেজ অফিসরের হাতে দিয়ে দিল নোটিশটা।

আফিস-টাইমের রাস্তা। ভিড় দিয়ে স্বরা দিয়ে রোদ দিয়ে ভরা। সাধা নেই শিথিল হও, গা এলাও। জিজ্ঞাসার চিহ্নের মত সর্বক্ষণ বসে থাকো উচ্চকিত হয়ে।

আফিসের কাছে কাকলিকে নামিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল বরেন।

কাকলি ছুটতে-ছুটতে এগুল। লিফ্টটা উঠতে যাচ্ছিল, কাকলিকে দেখে থামল। মতল করল। খুলে দিল দরজা।

লিফ্টের মধ্যে তখন শুধু একজন যাত্রী। আর সে সুকান্ত।

•৪৮•

জনের বৃকের মধ্যেই টুক করে শব্দ হল সমস্তরে।

জলে-স্থলে এমন অসম্ভবও হয় নাকি? এটাকে কী বলা যাবে? এটা অন্তরীক্ষে সম্ভব।

বিধাতাপুরুষ বলে যদি কেউ থাকে—এখন ভাবতে মন্দ লাগছে না যে তেমন কেউ একজন আছে—তা হলে অদৃষ্ট থেকে নিশ্চয়ই এখন চোখ পিটপিট করে এসেছে। নইলে এত রসিকতা কার!

দেয়ালের দিকে সরে গেল সুকান্ত। আর দরজার কাছে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে দিল কাকলি।

সুকান্ত ভাবছিল, কতটুকুই বা ব্যবধান। কিন্তু মধ্যখানে এক সমুদ্র জল। শুধু নয়, ঝড়বৃষ্টি। আকাশছেঁড়া বিদ্যুতের বেত। সাধা নেই এ ভূমি ডিঙোও হত্মীবনে। সাধা নেই।

কোথায় একটা সুইচ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট রাজপ্রাসাদ অন্ধকার। কোথায়

যে সে হুইচ কারু জানা নেই। হাতড়ে-হাতড়ে মরলেও আর তাকে পাওয়া যায় না খুঁজে। শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। অথচ যদি দুটো স্তম্ভ তার একত্র করা যেত, এর মুখের সঙ্গে মেলানো যেত ওর মুখ, তা হলে আলোতে উথলে উঠত দশ দিক ঘরে-বারান্দায় ঝলমল করে উঠত রাজপ্রাসাদ।

নেই, নেই আর সেই কারিগরের হাত। জাদুকরের হাত।

কয়েক সেকেন্ডের তো মামলা, দেখতে-দেখতে এসে যাবে দোতলা, যেখানে স্বকায় নামবে। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার হুড়ু দিয়ে বেগে ট্রেন ছুটেছে, আর সে হুড়ুয়ের যেন শেষ নেই কোনোদিন।

সেই সেদিনের মত লিক্‌টটা না বিগড়ে যায়। তা হলেই রসিকতাটা বোল করা ভরে ওঠে।

হুড়ুয়ের শেষে আলোর আভাসে যেমন স্বস্তি আসে তেমনি দোতলাটা আসতে আরাম পেল স্বকায়। লিক্‌টম্যান দরজা খুলে দিল। আর পরিচ্ছন্ন অম্পর্শে, স্বহঃ কুণ্ঠায়, স্বকায় বেরিয়ে গেল। আঁচলের দূরতম নিখাসও গায়ে লাগল না। যেতে যেতে ফিরেও তাকাল না একবার।

খুব বাহাদুরি দেখিয়েছে। মনে মনে নিজের জিভ কামড়াতে লাগল স্বকায় একটা নমস্কার করা তো উচিত ছিল, অন্তত শূণ্ণে ছোট করে একটু কপাল ঠোক শত হলেও সম্ভাস্ত একজন অফিসর তো। পদস্থকে সম্মান দেখানোই তো শালীনতা আর যদি পদস্থ বলে তার জানবার কথা না-ও থাকে, অনন্ত উচ্চশিক্ষিত ভক্তমহিমা বলে তো সে জানে। সে ক্ষেত্রে নম্র চোখে মুখের দিকে তাকাতে কী বাধা ছিল। আর, মুখের দিকে না তাকিয়েই বা কী করে স্থির করল যে এ কাকলি। হাওয়া উপর ভাসা-ভাসা দেখেই কি সিদ্ধান্তে আসা যায়? অমন স্নিগ্ধতার ভঙ্গি তো বিরল নয় সংসারে। ধ্যানমুগ্ধে যা আছে কোথাও তার অম্পষ্ট প্রতিচ্ছায়া দেখলেই যে কাকলি হবে?

উচিত ছিল সোজাসৃজি তাকানো। একটু বা তীক্ষ্ণ চোখে দেখা, নতুন প্রেমের আলো কেমন ফেলেছে মুখের উপর, নতুন স্বখে কেমন জ্বলছে সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য, এতদূর তার সাহস হল না, নিজেই কেমন গুটিয়ে গেল, যেন যত অপরাধ সমস্ত তার। কী কেমন আছেন? এইভাবেও তো, নির্ভীক নির্মল সম্ভাষণ করতে পারত। কেমন ফেলতে পারত বেকায়দায়। কিংবা, ব্যঙ্গের একটু অদৃশ্য টান দিয়ে জিজ্ঞেস কর পারত, কী, চিনতে পারেন? যেন গজা দিয়ে কিছুমাত্র জ্বলই বয়ে যায় নি। নিম্পৃহ মুখে আবহাওয়া নিয়েও ছোটো মামুলি কথা বলতে পারত। কদিন ধরে।

বিল্পী গরমই না পড়েছে ! কিংবা, বাস-এ ট্র্যামেই আসা-যাওয়া করেন নাকি ? গাড়ি কেনেন নি এখনো ? কিংবা বরেনের কী খবর ? নিশ্চয়ই কোনো উত্তর দিত না । তার মানে ওই হেরে যেত । অনায়াসে অপরাধী করে রেখে আসতে পারত এক ।

মুখ—এত বড় স্বযোগ কি আর আসবে কোনোদিন ?

কথা বলতে সাহস করে নি, নাই করেছিল, কিন্তু চোখের দিকে তাকাতে চাইল না কেন ? চোখের দিকে তাকাতে আর কোন সাহসের দরকার ! চোখ এত জিনিস দেখতে অভ্যস্ত, দেখতে ইচ্ছুক, এখানেই বা তার কার্পণ্য হল কেন ? বেশ তো, মজা দেখত । দেখত তার চোখে কী লেখা ! রাগ, না ঘৃণা : বিতৃষ্ণা, না বিরক্তি । নাকি তবু উপেক্ষা, ভদ্রতর ঔদাস্য । নাকি শুদ্ধ অমনোযোগ । স্বকান্ত তাকালে কী হবে, ও মুখই ফেরাত না, তুলতই না চোখ । নমস্কার করলে কী হত ? ফিরিয়ে দিত নমস্কার ? তখন কি একটু চোখোচোখি হত না, ভক্তির বহর দেখে হাসত না চোখের কোণে ? কে জানে, নমস্কারও লক্ষ্যের মধ্যে আনত না । যারা খুব বেশী সম্ভ্রান্ত, উচ্চাকাঙ্ক্ষ ও মহংকারী, তারা জনসাধারণের নমস্কার গ্রাহ্যও করে না ; তুমি যে নমস্কার করলে গাতে তুমিই ধ্বংস এমনি উদার ভাব করে থাকে । নমস্কার অপ্রত্যাশিত থাকলে গায়ে গড়ে নতুন অপমান নেওয়া ছাড়া আর কিছুই হত না । তা ছাড়া, কে জানে, যেমন শ্রদ্ধাভিষেক মেয়ে, হয়তো স্বচ্ছন্দে ফিরিয়ে দিত নমস্কার কিন্তু ফিরেও তাকাত না । লোকটা যে নমস্কার করছে তা লক্ষ্য না করেও অনেকে নমস্কার ফেরাবার কৌশল জানে । তার চেয়ে যদি বলত, ‘শুভুন !’ তা হলে চোখে চোখ না রেখে থাকতে পারত কাঠ হয়ে ? কোনো অজানা কথা শোনবার জন্তে উৎসুক হয় নি, কান খাড়া করে নি এমন মেয়ে আছে নাকি সংসারে ? বেশ তো, আচমকা ‘শুভুন’ শুনে চমকে চাইত না হয় একবার, না হয় চোখের মধ্যেই চাইত, কিন্তু কী শোনাত জিজ্ঞেস করি ? কী শোনার আছ ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে যেত দোতলায় ।

নামবার সময় একটা ধাক্কা দিয়ে গেলে কেমন হত ? তাড়াতাড়িতে, আফিস-টাইমে, এমন এক-আধটু ঠোকাঠুকি হয়েই থাকে । খুব সাবধান হবার ভঙ্গি দেখিয়ে অসাবধানে গা লাগাবার কায়দা তো বাস-ট্র্যামের ভিড়ে হরদমই দেখা যাচ্ছে । কী হত তা হলে ? চেষ্টা করে উঠত ? লিফ্টম্যানটাকে দিয়েই ধরাত ? আউটরেজিং মডেস্টি বলে কেস করত ? কী সাফাই গাইত স্বকান্ত ? বলত, নামবার সময় অসাবধানে আমার হাতের একটা আঙুলের সঙ্গে ওর হাতের একটা

আঙুলের শুধু মূহু কথোপকথন হয়েছে। বিশ্বাস করত কেউ, বিশ্বাস করত কাকলি নিজে ?

কতরকমভাবে জন্ম, নাকাল, নাস্তানাবুদ করতে পারত। অটল অহংকারের দিতে পারত গুঁড়ো করে। চাই কি, টুঁটি টিপে ধরে খুন করতে পারত। তারপর যা হয় তা হত, এমন স্বযোগ তো আর আসত না। এমন সঙ্গহীন সন্নিহিত-স্বযোগ। ছি ছি, জীবনের কত বড় একটা শুভক্ষণ সে ধুলোয় ফেলে দিয়েছে। এর পর লিফ্টে উঠতে কত সতর্ক হবে কাকলি। অগ্রপশ্চাৎ দেখে নেবে। চাই কি, আফিস থেকে মেয়ে-অর্ডালি নেবে। নয়তো পুলিশ এস্টেট।

কিন্তু যতই কেননা স্মৃতি-সমৃদ্ধ হোক, খুব টান-টান খটখটে দেখাচ্ছে না তো। বরং ছায়া-ছায়া, ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে। কে জানে, অহংকার দেখাবার এ এক নতুন রীতি। ভিতরে আসলে সোঁভাগ্য-গর্বের মহীৰুহ, বাইরেতে ভূগমম। তুমি বাইরে লোক, তুমি আমার সোনার খনির কী খবর জানবে, তুমি দেখে আমার এত নিরাভয়গ সারল্য। আমি জানি আমি কী খাই, কী পরি, কার গাড়িতে ঘুরে বেড়াই, কোন স্বথের ঘরে আমি রূপের আলো। কোন কাকলি-কক্ষমে আমি সন্তোষের ব্রততী।

ছি, ছি, দৈবযোগে সন্নিহিত হয়েছিল বলে মনে-মনে গবেষণা করছিল এতক্ষণ আহা, কত নমস্ত, চেয়েছিল নমস্কার করতে। চোখে কত পুণ্য ঝরছে, চেয়েছিল দেখতে। আর গা ভরা কত পবিত্রতা, চেয়েছিল আঙুলের ডগায় তুলে নিয়ে এক কণা।

ক্ষত পায়ে কোন কক্ষের গহ্বরে মিলিয়ে গেল স্ফাস্ত।

ও এখানে কেন ? কী মনে করে ? কোনো কাজে-কারবারে এসেছে ? নাকি ওর চাকরিটাও এই আফিসেই ? এই আফিসে তো মাইনে কত ? ঐ তো চেহার, নিশ্চয়ই অফিসার গ্রেডের নয়। অফিসার গ্রেডের নয় তো কী সাহাস লিফ্টে ওঠে ? হঠকারিতা এখনো গেল না ? মাইনেটা কপালে লেখা থাকে না বসেই এত স্পন্দা ?

কাকলির সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল। এত কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল যেন জুপিঙে ছুরি মারবে কিংবা শাড়ির খোলটা দেখবে হাত বুলিয়ে। কিন্তু আজ সেই কাছে দাঁড়িয়েও কত দূর। সাধ্য কী কথা কয়, একটু বা মুখের দিকে তাকায় সাহস করে। কেমন ছায়া পর্যন্ত না ছুঁয়ে দেয়ালের খার দিয়ে পালিয়ে গেল ইচ্ছার মত। দাঁড়াও, খোঁজ করতে হয়। বাজে লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠবে।

একটা ফুলপ্যাণ্ট আর বুশশার্ট পরলেই মাত্রগণ্য দেখায় না। তা ছাড়া সেদিনের চেয়েও পোশাকটা ময়লা আর কুঁচকোনা মনে হল। চেহারাটা যোগা-যোগা। আধপেটা-খাওয়া। লিফ্টমানের আপত্তি করা উচিত ছিল। বলা উচিত ছিল, আপনাদের জন্তে সিঁড়ি। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরকে বলা দরকার, এদিকে কড়া নজর রাখা বিধেয়। কত মেয়েও তো কাজ করে এ আফিসে, লিফ্টে চড়ে। আজেবাজে লোক ঢুকে পড়াটা ঠিক নয়। মাঝপথে কারেন্ট অফ হয়ে গেলেই কেলেঙ্কারি।

সেদিন সন্দের দিকে কাকলি একাই বেকল।

গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, ‘কোথায় যাচ্ছিস?’

হাসল কাকলি। গায়ত্রী বললে, ‘উত্তরটা আমার জন্তে নয়। বরেন কদিন আসছে না। যদি আজ আসে, তোর দেখা না পায়, জানতে চায় তুই কোথায়, তখন একটা কিছু বলতে হবে তো?’

‘তার জন্তেই তো বলছি না।’ মা যাতে কিছু না মনে করে তার জন্তে অদ্ভুত করে হাসল কাকলি: ‘বলবে কিছু বলে যায় নি। ওর যা খুশি ও অহুমান করে নেবে।’

কথা শুনে গায়ত্রীর স্বস্তি হলেও স্থখ হল না।

সন্দের কাছে গিয়ে আবার ফিরল কাকলি। বললে, ‘বোলো ওর ওখানেই গিয়েছি। মাঝে মাঝে ওর ওখানেও তো আমার যাওয়া উচিত। ওর বাবা, ওর বাড়ির লোকজনও আমাকে একটু দেখুক।’

এবার নিঃসন্দেহ স্থখী হল গায়ত্রী।

কাকলি সটান বিনতার হস্টেলে এসে হাজির হল।

তীরে ঠেকা নোঙরের নৌকোর মত মনে হচ্ছে বিনতাকে। বল নেই, ভরসা নেই, গা-ভাসানো চেহারা। ঘরে আলোটা যে জালবার জন্তে তাও যেন তার জানা নেই।

কাকলি আলো জালতেই হকচকিয়ে উঠল বিনতা। শুয়ে ছিল, উঠে বসল। ‘এ কী, তুই?’

‘সেদিন কী ঝগড়া করলাম বল তো—’ কাকলি তক্তাপোশে বসল মুখোমুখি।

‘সত্যি, কোনো মানে হয় না।’ হাসিভরা মুখে সায় দিল বিনতা।

‘আমি এলাম তোর কাছে আর তুই কিনা বললি তোর দাঁড়াবার সময় নেই।’

‘আর তুই কিনা গাড়ি দেখালি!’ হাসিটা ঝাচিয়ে রেখেছে বিনতা। বললে, ‘যাক, আবার না ঝগড়া হয়। আজ তোর গাড়ি নেই তো?’

‘আর তোরও আজ তাড়া নেই নিশ্চয়ই।’ হৃদয়তরঙ্গ স্বর আনল কাকলি : ‘এক ঘরে অঙ্ককারে কী ভাবছিল?’

‘একটা সমস্তায় পড়েছি।’ বিনতাও প্রতিধ্বনি করল : ‘তুই পরামর্শ দিতে পারিস?’

‘যদি গোপন কিছু না হয়, যদি আমাকে বলতে আপত্তি না থাকে—’

‘আহা, আমার যেন কিছু গোপন আছে!’

‘কিন্তু যাই বল গোপনই স্ত্রের আধার।’ কাকলি হাসল : ‘কথায়ই বলে, চোরি পীরিতির লাখগুণ রঙ্গ—’

‘এক রঙ্গই হল না, তায় লাখ!’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিনতা : ‘কিন্তু সমস্তাটা তা নয়—’

‘তবে?’

‘শিলিগুড়ি ইস্কুলে একটা চাকরি পেয়েছি।’

‘কেন, সেখানে চাকরি পেতে গেলি কেন?’

‘অ্যাপ্লাই করেছিলাম।’

‘তা হলে তো যাবিই। কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে গেলি কোন স্ত্রে?’

‘কোন ছুঃখে বল। এখন কথা হচ্ছে চাকরিটা নেব কিনা—’

‘কেন, শিলা গুঁড়ো করতে অত দূর কেন? কলকাতায় কি শিলা নেই?’

সশব্দ হাসিতে কেটে পড়ল বিনতা। পরে গম্ভীর হয়ে বললে, ‘শিলা হয়তো আছে কিন্তু গুঁড়ো করবার অস্ত্র নেই।’

‘নিষ্ঠাই অস্ত্র।’

‘তার মানে?’

‘শুধু লেগে থাকা, ঘেঁষে থাকা, ছেড়ে না দেওয়া।’ নিজেই বুঝি একটু ঘেঁষে এল কাকলি। বললে, ‘শোন, একটা স্ত্রবর আছে।’

‘সত্যি? তোর বিয়ে হচ্ছে?’ উলসে উঠল বিনতা।

‘তা তো হচ্ছেই।’

‘হচ্ছে? কবে?’

‘নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অবজেকশান না পড়লে মথানীত্র।’

মুখের কথা কেড়ে নিল বিনতা : ‘অবজেকশান আবার কী!’

‘জানি না। তবে তার মেয়াদ এক মাস। তাও ফুরিয়ে এল।’

‘তা হলে আসছে মাসেই তোমার বিয়ে? তা হলে আর আমি শিলিগুড়ি যাই কেন?’

‘সুখবর সেটা নয়। সুখবর অল্প।’

‘অল্প?’ সুখবরও যেন কত ভয়ের হতে পারে তেমনি মুখ করল বিনতা।

‘সুখবর মানে তোমার বিয়ে।’

‘আমার?’ হাসির ঘায়ে বিনতার আবার বিদীর্ণ হবার জোগাড় : ‘কারণ সন্দেহ?’

‘শোন’, লঘুতার হাওয়া একদম উড়িয়ে দিল কাকলি : ‘তুই যা খবর পেয়েছিলি তা ঠিক নয়। স্বকাস্তবাবুর চাকরিটা যায় নি।’

‘যায় নি?’

‘বরেনবাবুদেরটা গেলেও অল্প পেয়েছে। তার মানেই যায় নি। শার্টে-প্যাণ্টে টিকি আছে।’

‘মাইনে কত?’ গলাটা নামাল বিনতা।

‘তা ঠিক বলতে পারব না। তবে যখন নিয়েছে চাকরি, তখন নিশ্চয়ই তা ফেলনা নয়। শত হলেও ভদ্রলোক এম-এ তো। তা ছাড়া গুনতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতেই উন্নতির সম্ভাবনা আছে। সুতরাং, প্রায় মিনতির স্বর আনল কাকলি : ‘ওকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানে হয় না।’

‘আমি ওকে ছাড়লুম কোথায়,’ করুণ করে তাকাল বিনতা। ‘ওই আমাকে ছাড়ল।’

‘ও ছাড়ল?’ প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মত করল কাকলি : ‘ও ছাড়বে কেন?’

‘মনে হচ্ছে ও আর বিয়ে করতে চায় না।’

‘ও বিয়ে করতে চায় না?’ অবিশ্বাসের হাসি হাসল কাকলি : ‘ওর সর্বাক্ষ চায়। ও তো বিয়ের জন্তেই তৈরি, পরিবার প্রতিপালনের জন্তে। পাখির যেমন আকাশ ওর তেমনি বিয়ে।’

‘তা তুইই ভালো জানিস।’

‘তাইই তো বলছি তোকে। ও চায় আরাম, আদর, আলস্য। উত্তপ্ত শয্যা আর শীতল ঘুম। এক কথায় যাকে বলে গার্হস্থ্য সুখ।’ একটু বুঝি বা অগ্নমনস্ক হল কাকলি : ‘হোটেল-ফোটেল ওকে পোষাবে না। স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। বেশে-বাসে স্ত্রীর নামগন্ধও থাকবে না। বিয়ে করতেই হবে তাকে, যদি বাঁচতে চায়। ও বিয়ের জন্তেই তৈরি।’

‘কিন্তু আমার জন্তে নয় ।’ বিনতা জানলার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকান
‘কে বললে ?’

‘ও ভালোবাসায় এখানো বিশ্বাস করে ।’

‘আর তুই ?’

‘আমি আসক্ত বিশ্বাস করি ।’

‘ও একই কথা ।’ নিশ্চিন্ত-প্রসন্ন মুখ করল কাকলি : ‘আসলে আসক্তের
জন্তে যে সঙ্গ তারই নাম ভালোবাসা । কিংবা বলতে পারিস রত্নির জন্তে যে
আরতি ।’

‘স্বন্দর বলেছিস কিন্তু । কিন্তু যাই বলিস, আমি ওকে আমার প্রতি যথেষ্ট
আগ্রহান্বিত করতে পারলুম না ।’ বিনতা আবার জানলার বাইরে তাকান ।

‘সে ক্রটি ওর নয়, তোর ।’

‘তাতে আর সন্দেহ কী ।’

‘তোর মানে তোর আর-কিছুর নয়, তোর আঙ্গিকের, টেকনিকের । তোর
প্রকার-প্রণালীর ।’

‘তাই হবে ।’

‘অত হতাশ হয়ে বলবার কী হয়েছে !’ যেন শাসন করে উঠল কাকলি : ‘আসলে
তোরা ক্রটি হচ্ছে ধৈর্যের অভাব, লেগে থাকার দৃঢ়তার অভাব । মাটির কলসীর
ছোঁয়ায় পাথর ক্ষয়ে যায়, ক্ষুদ্র জলের ফোঁটায় পাহাড় ধসে ; আর তুই বলছিস কিনা
তুই ওতে ফাট ধরাতে পারলি না, তুই হেরে গেলি—’

চুপ করে রইল বিনতা ।

‘শোন, তুই সেদিন বলছিলি, তোর মোহিনীর সাজ নয়, তোর মোহিনীর সাজ ।
তোকে ওসব কিছুই সাজতে হবে না, তুই সহজ হয়ে যা । কিংবা যদি সাজতেই চাস,
সেবিকার সাজ নে । সেবা থেকেই স্নেহ জাগবে । আর স্নেহ-দেহ একত্র হলেই
ভালোবাসা । তাই বলছি এ নতুন রাস্তায় চেষ্টা করে যাখ ।’

‘কী হবে চেষ্টা করে !’

‘অন্তত ওকে তো পরীক্ষা করে দেখতে পারি । দেখতে পারি কত খাঁটি ওর
নিশ্চয়তা, কত খাঁটি ওর ভালোবাসায় বিশ্বাস ।’ কাকলি চোখ নামান ।

আবার চুপ করল বিনতা ।

‘তা ছাড়া তোকে ও প্রত্যাখ্যান করবে আর তুই তা মেনে নিবি ? তুই তার
প্রতিশোধ নিবি নে ? তোর তুণে ব্রহ্মাস্ত্র থাকতে তুই তাতে মরচে পড়তে দিবি ?’

একে জড়াবি নে নাগপাশে ? তারপরে সেই দেখবি, বিয়ে এসেছে, বাসা এসেছে, পরে ভালোবাসাও এসেছে ।’

হাসল বিনতা : ‘তা হলে বলতে চাস শিলিগুড়ি যাব না ?’

‘ককখনো না। কলকাতায় শিলি গুড়ো করতে পেলো কে যায় শিলিগুড়ি ?’ কাকলি উঠে পড়ল : ‘যা স্বকাস্তবাবুর খোঁজ কর গিয়ে। ছাখ আমার সংবাদ ঠিক কিনা। ও মনোযোগ পাবার বিষয় কিনা। তারপর, একটু ধৈর্য ধরলেই দেখবি ওও বেঁচেছে তুইও বেঁচেছিস—’

হাসতে হাসতে চলে গেল কাকলি।

আফিসফেরত শুয়ে আছে, কলিং বেল বাজল। যখন ডবল বেজেছে তখন নির্ঘাত করেন।

চাকর এল নিচের থেকে, গায়ত্রী পাশের ঘর থেকে।

‘শুনেছি। যাচ্ছি ধীরে হচ্ছে।’ কটে-ফটে উঠল কাকলি : ‘বস্ক। বসতে বসো।’

ফিটফাট হয়ে নিচে নামতেই বরেন বললে, ‘বিপদ হয়েছে।’

‘কী বিপদ ?’ মুখ পাংগু হয়ে গেল কাকলির।

‘কে এক অপর্ণা বিশ্বাস আমাদের বিয়েতে অবজ্ঞেকশান দিয়েছে।’

‘কে অপর্ণা বিশ্বাস ?’

‘কী করে বলব ?’

‘কী বলছে আপত্তিতে ?’ কাকলি বসল মুখোমুখি।

‘বলছে তোমার আগের বিয়েটা নাকি চালু আছে। মানে তোমার স্বামী বর্তমান।’

খিলখিল করে হেসে উঠল কাকলি : ‘এই আপত্তি ? এতে অত ঘাবড়াবার কী আছে ?’

‘ঘাবড়াবার কিছু নেই। কেননা আপত্তি গ্রাউণ্ডলেস, নিরর্থক। কিন্তু, বরেনের মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল : ‘দেখি তো করিয়ে দিলে।’

‘তা কটা দিনেরই বা দেখি। ও দেখতে দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি কে এই শত্রু ?’

‘সেই আপত্তিকারিণী অপর্ণা বিশ্বাসকে তো ম্যারেজ অফিসারের কাছে আসতে হয়েছে সশরীরে।’

‘আসতে হয়েছে ? তবে এ অপর্ণা বিশ্বাস কাল্পনিক কেউ নয় ?’

‘কী করে হবে ? আইন বলছে, যে আপত্তি করবে তার আপত্তি ম্যারেজ নোটিশ বইয়ে লিপিবদ্ধ হবে আর সে তা পড়ে নিজের হাতে বই দস্তখত করে দেবে।’ স্বতরাং অপর্ণা বিশ্বাস বলে কোনো মহিলা সশরীরে এসেছিল আফিসে তাতে আর সন্দেহ নেই।’

‘এসেছিল না হাতি, স্বকাস্তই পাঠিয়ে দিয়েছিল।’

‘হতে পারে। কিন্তু তাতে স্বকাস্তর লাভ কী!’

‘লাভ শত্রুতাসিদ্ধি।’ জলে উঠল কাকলি : ‘আমি একটা ভালো ঘরে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হই এ ওর অসম্ভব।’

‘কিন্তু এ আপত্তি ও টেকাবে কী করে?’ বললে বরেন, ‘তারপর যখন অফিসর দেখবে আপত্তি মিথ্যে তখন ঐ অপর্ণা বিশ্বাসকে ছেড়ে দেবে নাকি ? মিথ্যে আপত্তি দেওয়ার জন্তে তার শাস্তি হয়ে যাবে।’

‘ও মা, তাই বুঝি?’

‘হ্যাঁ, হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা। ভাবছি ঐ রিস্ক স্বকাস্ত নিতে যাবে কেন?’

‘ঐ যে বলেছেন দেরি করিয়ে দেওয়া, পাগলের গো-বধে আনন্দ—’ কী যেন চিন্তা করল কাকলি : ‘তবে এ কি বিনতার কাণ্ড ? অপর্ণা বিশ্বাস নাম যে ফিকটিশাস তা তো বুঝতেই পাচ্ছি, কিন্তু মেয়ে একটা তো ঠিক এসেছিল আফিসে। কী দুর্দান্ত সাহস। স্বয়ং বিনতাই নয় তো—ঠিকানা, ঠিকানা দেয় নি?’

‘ঠিকানা দিলেও সঠিক দেবে নাকি ? বরানগর কি যাদবপুর—একটা দিয়ে দিলেই হল।’

‘তাই বলে মিথ্যাবাদী পার পেয়ে যাবে?’

‘তাকে ধরবে কোথায় ? কে সনাক্ত করবে ? সে হয়তো আর দেখাই দেবে না।’

‘মারখান থেকে আমাদের দেরি।’

‘তা আর কী করা!’ বরেন গাঢ় চোখে বিদ্ধ করল কাকলিকে : ‘যত দেরি ততই আবার খিদে। যত বস। ততই আবার বাসনা। তোমার ভয় নেই। বার করব এই অপর্ণাকে। দেখি—’ আস্তে আস্তে উঠে একাই চলে গেল বরেন।

কথাটা বনবিহারীর কানে তুলল গায়ত্রী।

‘চারদিকে যে কত শত্রু তার ঠিক নেই। এমন সবল বিয়ে, তাতে কে আবার অবজ্ঞেকশান তুলেছে।’

‘তুলেছে?’ আনন্দে উথলে উঠলেন বনবিহারী : ‘আমি তখনই জানতাম কেউ না কেউ আপত্তি জানাবেই। এ হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না।’

‘কী হতে পারে না?’ গায়ত্রী ধমকে উঠল।

নিজেকে সামলালেন বনবিহারী : ‘কেউ আপত্তি করবে না এ হতে পারে না। যেহেতু একদা তুমি আমার উপকার করেছ সেহেতু তুমিই আমার উপাস্ত্র হয়ে থাকবে—তুমি ত্রাণ করেছিলে বলে তোমার হাত থেকে আমার ত্রাণ নেই—এ অত্যাচারের কোথাও একটা প্রতিবাদ হবে না এ হতে পারে না। আপত্তি না টুক, তবু আপত্তি একটা হওয়া দরকার।’

‘তোমার ইচ্ছে দিয়েই তো আর সংসার চলছে না।’ গায়ত্রী আপত্তি করল : ‘এখানে মেয়ের ইচ্ছেই একমাত্র গ্রাহ্য।’

‘আর তার মায়ের ইচ্ছে।’ ব্যঙ্গ মেশালেন বনবিহারী।

‘যেটা সকলের আনন্দের ব্যাপার সেটায় তোমার কেন অনিচ্ছা?’ মুখিয়ে উঠল গায়ত্রী।

‘তোমাদের কাছে পুণ্য হতে পারে কিন্তু আমার কাছে পাপ—মহাপাপ।’ বললেন বনবিহারী, ‘এই অত্যাচারই ব্যভিচার।’

‘যা আমাদের পুণ্য তা তোমারও পুণ্য।’

‘তা হয় না, হতে পারে না। সূর্য পদ্মের কাছে পুণ্য, পোঁচার কাছে পাপ। তোমরা হয়তো বেশি দেখছ তাই তোমাদের ক্ষুতি, কিন্তু আমি দিবাক্ষ, আমি অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখছি না।’

কদিন বরেন আসছে না দেখে কাকলিই গেল তার সন্ধানে। আপত্তিটার কী গোত্র-চরিত্র তার কোনো নির্ণয় হল কিনা তার সন্ধানে। তা ছাড়া দেবনাথের কী যাবস্থা হল সে ব্যাপারের একটু তাগিদ দেওয়া দরকার।

গিয়ে শুনল বরেন বাড়ি নেই।

‘কী বলতে হবে?’ জিজ্ঞেস করল বেয়ারা।

হাসল কাকলি। বলবে, ‘মিস মিত্র এসেছিল।’

‘কে এসেছিল?’ হোটলে ফিরে নতুন বয়টার উপর ঝলসে উঠল হৃকান্ত।

‘বললাম তো এক মেয়েছেলে—’

‘খুব তুই বোঝালি আমাকে। বলি দেখতে কেমন?’

‘দেখতে?’ চৌক গিলল চাকর : ‘এই চ্যাঙা মতন পাতলা মতন—কিন্তু না, অত চ্যাঙা হবে না বোধ হয়, একটু বেঁটেসেঁটেই বোধ হয় হবে।’

‘গায়ের রঙ ?’
‘বেশ ফর্সা—দাঁড়ান, একটু কালচে-কালচেও হতে পারে—’
‘নাম—নাম বলে নি কিছু ?’
‘বলেছে ।’
‘কী নাম ?’
‘দাঁড়ান । কী যেন—ব, ব, ব—’
‘মোটাই ব-ব-ব নয় । দেখ ভেবে, ব-এ আঁকড়ি আছে কিনা ।’
‘আঁকড়ি ?’ হু হাতে মাথা চুলকোতে লাগল বয় ।
‘হ্যা, দেখ, সেটা ক-ক-ক কিনা ।’
‘হ্যা,’ লাকিয়ে উঠল বয় : ‘হ্যা, ক-ক-কই হবে । আরে, নামটা তিনি কাগজে লিখে দিয়ে গেছেন যে । আমার তাই এতক্ষণ মনে ছিল না ।’
কাগজটা নিয়ে এল ভিতর থেকে ।
স্বকাস্ত দেখল বিনতা সেন ।
এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে খেল সমস্তটা । বললে, ‘আমি এখন আবার বেকছি ।’
বিনতাই এতকাল এসেছে । এখন স্বকাস্ত একবার যাক । ঝড়ে যে কোলে বন্দরই আশ্রয়নীয় ! সংসারে প্রেম না থাক, কারুণ্য তো আছে ।

৪৯

মন আবার দুর্গমের পথ ধরে ।

মন শুধু মধুর রসেরই ঝরনা নয়, মন আবার কঠিনের উপত্যকা ।

কী উপেক্ষা আর গুদাস্ত দিয়ে ভরা । এমন একথানা ভাব করে দাঁড়িয়েছে যেন পায়ের তলার পৃথিবী একটা মৃৎপাত্র ছাড়া কিছু নয় । যেন সর্বাক্কে লোহার বর্ষেক জামা আঁটা । যেন কোথাও একটা আঁচড় পড়ে নি, একেবারে নিদাগ, নির্ভাল । পৃথিবীর কোনো ক্ষুধাতৃষ্ণার খবর রাখে না, দুঃখ কী দারিদ্র্য কী কামনা কী কলঙ্ক কী এসব জন্মেও শোনে নি । যেন জীবনের কোন এক নিষ্কর জমি ভোগ করছে । তুমি যে এত সামনে দাঁড়িয়ে আছ, তুমি মাহুষ না অশরীরী ছায়া, জ্রাক্ষেপ নই এতটুকু ।

অহংকারে মটমট করছে। অনেক টাকা হয়েছে, অনেক গরমাই। অথচ এ পথে স্বকাস্তই টেনে এনেছিল, মন্দিরার পাত্র স্বকাস্তই প্রথম ধরেছিল মুখে। স্বকাস্ত না থাকলে কোনো স্বাধীনতাই তো হত না, না টাকা রাজগারের স্বাধীনতা, না খোলা হাওয়ায় হাঁক ছাড়ার স্বাধীনতা। স্বকাস্তের ছায়ায়ই তো খোলসছাড়া সাপের মত জলজল করতে পারছে। অথচ এতটুকু সৌজন্ম নেই। মৃতের প্রতিও তো লোকে নম্র হয়, শ্রদ্ধালু হয়। স্বকাস্ত মৃত ছাড়া আর কী।

‘আরে, আপনি এখানে?’ ইন্সুলফেরত বিনতা হস্টেলে আসছে, দরজার সামনে স্বকাস্তকে দেখে খুশির ফুলঝুরি হয়ে উঠল।

‘আর কার জন্তে নয় নিশ্চয়ই।’ স্বকাস্তও হাসল।

‘আমি বলেছি আর কার জন্তে? আমি ছাড়া আর কে আছে? কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।’ বিনতা ত্বরান্বিত হয়ে উঠল।

ইতস্তত করতে করতে স্বকাস্ত বললে, ‘কিন্তু ভিজিটার্স লিস্টে আমার তো নাম নেই।’

‘আমার ভিজিটার্স লিস্টই নেই। আমিই আমার ভিজিটার। আসুন।’

ভিতরের ঘরটা, অর্থাৎ ভিজিটার্স রুমটা, বাইরে থেকে খানিক দেখা যাচ্ছে। স্বকাস্ত বললে, ‘ভিজিটার আর ভিজিটেড কেমন সব মুখোমুখি বসেছে। সবাই আর খাট গার্ডিয়ান নয়, কী বলো, ফন্সও আছে।’

‘ফন্সই বেশি। যাদের কপোতের ভঙ্গি দেখছেন, তারাই সব অলক-দা, অশোক-দা—’

‘না, না, দা আজকাল নেই! দা সেকলে, এক যুগ আগের। এখন নিরুপাধি। এখন শুধু অলক-অশোক দীপক-অলোক। না, না, ওখানে ওদের দলে বসে আলাপ করতে পারব না। আমাদের আলাপ অনেক উচ্চগ্রামের।’

‘ওখানে বসে আপনাকে আলাপ করতে বলছে কে? আপনি শুধু একটু ওয়েট করবেন। আমি চেষ্টা করে আসব।’

‘আসুন। আমি রাস্তার ঐ পোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে পারব।’

‘রাস্তায় কেন?’ একটু বুঝি বা ভুরু কঁচকোল বিনতা।

‘রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতাই বেশি ভালো লাগে।’

‘আচ্ছা, তাই। আমার বড় জোর পাঁচ মিনিট—কে বলবে শিক্ষিকা, ছাত্রীর মতই ছুট দিল বিনতা।

‘না, অত তাড়া কিসের? আস্তে-হাস্তে আসুন। আমি দাঁড়াচ্ছি। দাঁড়িয়ে-

দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছি। চলতে-চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে রাস্তা দেখতে নে লাগে।’

অত কথা কানে ঢুকল কিনা কে জানে।

অগ্রমনস্কের মত দাঁড়িয়ে ছিল স্বকান্ত, পাশে দাঁড়িয়ে কে বললে, ‘এই যে।’

চমকে উঠল স্বকান্ত।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিনতা বললে, ‘দশ মিনিট লেগে গেল।’

‘দশ মিনিট!’ স্বকান্ত হাসল : ‘আমি ভাবছিলাম, গেলেন আর এলেন। আরো দশ মিনিট লাগালেও টের পেতাম না বোধ হয়। তা,’ বিনতাকে একটু খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল স্বকান্ত : ‘তা, এর মধ্যে মন্দ সাজগোজ করেন নি।’

‘কী যে বলেন ! তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে যা পেলাম তাই পরে এলাম।’

‘তাড়াতাড়িতে হাতের কাছে নিক্কের রঙিন শাড়িই তো পাওয়া যায় অহরহ।’

‘তা রঙিন পরলামই বা ! শিক্ষিকা বলে আমি কি ঠাকুমা ?’

‘না, না, এখন আর আপনি শিক্ষিকাই বা কোথায় ? আপনি তো এখন ছাত্রী।’

‘ছাত্রী ?’

‘হ্যাঁ, পাঠশালার ছাত্রী।’

‘পাঠশালার ? কোন পাঠশালার ?’

‘প্রেমের পাঠশালার।’

‘তার মানে প্রমোশন আর পাচ্ছি না। গ্রাইমারি সেকশানেই পড়ে আছি।’

‘তবে অপেক্ষা করে থাকতে পারলে কী হয় বলা যায় না।’ আশ্বাসভরা চোখে তাকাল স্বকান্ত।

‘কিছুই বলা যায় না।’ সায় দিল বিনতা : ‘হ্যাঁ, জোর করে কিছু হবার নয়। রাতারাতিই আর ফুল ফোটে না।’

হাঁটছে দু-জনে।

‘বা, ফুল তো রাতারাতিই ফোটে।’ বললে স্বকান্ত, ‘যদি গাছ তৈরি থাকে। বলতে পারেন গাছই রাতারাতি তৈরি হয় না। গাছ তৈরি হলে অস্থি বকল ফল পুষ ভস্ম নির্ধাস সব তৈরি।’

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি ?’ জিজ্ঞেস করল বিনতা।

‘জানি না।’

‘ভিড় কাটিয়ে-কাটিয়ে যেতে হচ্ছে।’

আমাকে খবর দিলে আমিই তো যেতে পারতাম আপনার হোটেলে।’ ভিড়ের
লায় দূরে ছটকে গিয়েছিল, আবার

মতা

‘সে তো এখনো যেতে পারেন কিন্তু বারে-বারে একই পরিবেশ ভালো লাগে
। বলুন, লাগে?’

‘না, লাগে না। বেশও বদলাতে হয়, পরিবেশও বদলাতে হয়। তাতেই
ত্রের বাজনা। আকাশে কখনো শাদা কখনো নীল কখনো কালো। কখনো
রা কখনো বিছাৎ কখনো রামধনু।’

ভিড়ের মধ্যে কি কথা জমে?

মোড়ের মাথায় ট্যান্ডি পাওয়া গেল।

উঠল দু-জনে। বসল পাশাপাশি। কাটল অনেকক্ষণ নির্বোধ স্তব্ধতায়।

মনে হচ্ছে ট্যান্ডিতেও জমছে না। কী যেন কী একটা নেই। কিংবা কী
একটু বেশি থাকার জন্তে কেটে যাচ্ছে। ছবিতে কোথায় যেন রঙ পড়ে নি,
ংবা কে জানে রঙটা বোধ হয় বেশি উচ্ছন্ন।

ফাঁকায়-ফাঁকায় আলিপুর-খিদিরপুর ঘুরলে কি স্থর আসবে? কিংবা হুদে-
দীতে? লেকে-গঙ্গায়?

‘আপনি তো ছেড়ে দিয়েছিলেন, আবার এলেন কেন?’ জিজ্ঞেস করল
কান্ত?

‘ছেড়ে দিয়েছিলুম মানে?’

‘বা, সেই যে চলে গেলেন আমার চাকরি নেই শুনে—’

‘চাকরি নেই শুনে? একদম বাজে কথা।’

‘বা, তাড়াতাড়ি চলে যান নি সেদিন?’

‘না গিয়ে করি কী! আপনি নিজেই বললেন, চাকরি থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে
ছে। আপনি মুখ ম্লান করে বসে আছেন। কিরকম ভগ্ন কণ্ঠ বিধ্বস্ত চেহারা
পনার। সেই শোকের মুহূর্তে সব কিছু বিশ্বাস লাগতে বাধ্য। তাই না ফিরে
র কী! নইলে সেদিন কত আশা করে গিয়েছিলুম আপনার কাছে—’

‘জানেন আমার চাকরি আবার হয়েছে।’

‘জানি।’

‘কী করে জানলেন? কে বললে?’

‘কে আবার বলবে! হাওয়াতে কান পেতে থাকলেই শোনা যায়। আরি
পনাতে ইনটারেস্টেড—আপনার খবরে স্বভাবতই আমার আগ্রহ।’

‘তাই বুঝি আবার আমার দরজায় আপনার সদয় পদার্পণ হল।’

‘মোট্টেই তার জন্তে নয়। আপনাকে ছাড়লুম কবে যে ফিরলুম বলছেন ?
ছাড়া আপনার বর্তমান চাকরিতে মাইনেটা তো কম।’

‘তাও জানেন ?’

‘জ্ঞানেছি।’

‘আর এ শোনে নি যে, কদিন বাদেই সিলেকশান কমিটির সামনে আ-
ভাইভাভোসি টেস্ট হবে। সে টেস্টে যদি উত্তরোই তা হলে স্থপিরিয়র ৫
পেয়ে যাব। শোনে নি সেটা ?’

‘জুনি নি তো।’ চৌক গিলল বিনতা : ‘যদি উত্তরোতে না পারেন ?’

‘তা হলে, হে বন্ধু, বিদায়।’

‘বন্ধু কে ? আমি ?’

‘না, চাকরি। হে চাকরি, বিদায়।’

শুধু চাকরি-বাকরি ইনটারভিউর কথা। অগ্ন কত কথা কত স্তব্ধতা আ-
সংসারে। সেসব পাখিরা কোথায় ? কোন দেশে উড়ে পালাল ঝাঁক বেঁধে
কোন দিগন্তে ?

‘আমরা কোথায় যাচ্ছি ?’

‘চলুন পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে, গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটা।’

‘তাই চলুন।’ তা হলে যেন একটা অস্বস্তি থেকে বিনতাও রেহাই পায় এরা
চাঞ্চল্যে বলে উঠল।

কিন্তু সেই অল্প-অল্প আলো গা-ছমছম নিভৃতিতেও কোনো কথা কেউ কুড়ি
পেল না।

‘এই সম্পর্কটাই তো মধুর।’ বললে স্বকাস্ত।

‘কোনটা ? এই একসঙ্গে পা মিলিয়ে মিলিয়ে হাঁটা ?’

‘হ্যাঁ, এই সহচরণ।’

‘তা আর বলতে। কিন্তু পথ যদি দীর্ঘ হয় ? যতটা ভাবি নি তার চেয়েও বে-
হয় ? দীর্ঘতর হয় ?’

‘হোক। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্বতলজ্জননম।’

‘কিন্তু পথ শেষ হবার আগেই যদি ক্লান্ত হয়ে চলে পড়ি আর যদি সহচর সঙ্গে
ছ বাহুতে তুলে নেন ?’

‘তা হলে সেই তো পর্বতলজ্জনন। সেই তো মধুমত্তম।’

যে যা বলতে চেয়েছিল কিছুই যেন বলতে পারল না। স্বকাস্ত বলতে চেয়েছিল, যত্নে-যত্নে ভালোবাসা যদি জাগে—আর, ভালোবাসা জাগাবার জন্যই পথ—তা হলে সেই জাগরমুহূর্তেই তো অর্পণ-প্রাপণ। আর বিনতা চেয়েছিল তে, যদি পথের কোনো ক্রান্ত বিন্দুতে অর্পণ-প্রাপণ ঘটে যায়, তা হলে সেই তো লোবাসা।

তা হলে দুটোর একটা আসুক। হয় ক্রান্তি, নয় প্রেম।

কিন্তু পারল কি একে অন্তের কাছে বাজতে সেই ইশারায়? যেন সমস্তই স্থল গেল।

‘চলুন কাছেই চীনে হোটেল আছে। কিছু খাই।’ চলতে-চলতে বললে স্বকাস্ত।

‘তাই চলুন। বড্ড খিদে পেয়েছে।’

‘খিদে পেয়েছে?’

‘হ্যাঁ, হস্টেলে তখন খেতে দিলেন কই? টেনে বার করে নিয়ে এলেন।’

‘তা, এতক্ষণ বলেন নি কেন? পেটে খিদে মুখে লাজ এখনো?’

‘সেই তো ট্র্যাজেডি।’

খেতেও ভালো লাগল না। কী যেন মশলা বাদ পড়েছে রান্নায়। কী যেন ঝটি খোয়া গেছে। কী যেন সুরটি এসে লাগছে না খিদেতে।

সত্যিই খুব খিদে পেয়েছে বিনতার। দেখে স্বকাস্তর মায়া হল।

‘ইচ্ছে করছে হাত দিয়ে মেখে খাই।’ কক্ষণ চোখে তাকাল বিনতা।

‘একদিন আমার হোটেলে আপনাকে নেমস্তন্ন করে থাওয়াব।’

‘সত্যি?’ খুশিভরা চোখে বিনতা তাকাল: ‘খুরোখাচরা থাওয়া নয়, পুরোপুরি থাওয়া। মানে ভাত থাওয়া। খুচ খুচ করে কেটে-গেঁথে থাওয়া নয়, হাত দিয়ে খেঁগরস পাকিয়ে থাওয়া।’

‘নিশ্চয়ই। নইলে নেমস্তন্ন কী।’

‘ভাজা থেকে শুরু, দইয়ে-মিষ্টিতে শেষ। দেখছেন তো আমার খিদে।’

‘ধাবার পরে পান, না?’

‘নিশ্চয়ই, মুখভরা পান। নইলে কি মশলা? দুটো সুপুঁরির কুচো আর কটা চটদানা? মুখভর্তি পান না হলে আর নেমস্তন্ন কী? আর শুছন, নেমস্তন্ন কিন্তু ত্র।’

‘তা আর বলতে।’

‘আর, শুছন, সন্ধের দিকে যাব আর অনেকক্ষণ থাকব।’

স্বপ্ন বুঝি আবার কেটে গেল।

কিংবা স্বপ্ন বুঝি এবার জোর করেই কাটিয়ে দিতে হয়। স্বপ্ন কাটিয়ে দিনে যদি স্বপ্ন বাজে। তার ছিঁড়ে গেলেই যদি ঝংকার ওঠে।

বাস-এই ফিরে গেল বিনতা। স্বকাস্ত ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভার বললে, ‘কোথায় উত্তর দিল না। স্বকাস্ত সিগারেট ধরাল।

ড্রাইভার ভাবল গন্তব্যস্থান জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হচ্ছে না। নাকবন্ডাবই গ চালাল।

কতক্ষণ পরে তন্ময় মধ্য থেকে বলে উঠল স্বকাস্ত, ‘কোথাও যেতে হবে না ফাঁকায়-ফাঁকায় ঘোরো খানিকক্ষণ।’

ফাঁকায়-ফাঁকায় ঘুরবে তো সঙ্গের লোক কই? কতরকম মজার লোকই যে গা ট্যাক্সিতে।

হোটেলে ফিরে এসে আলো নিবিয়ে বাসি বিছানাতেই শুয়ে পড়ল স্বকাস্ত চাকরেরও এসে কিছু বিরক্ত করবার দরকার নেই, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। না, ত কী, আজকেই তো আর বিনতার নেমস্তন নয়।

চারদিকে স্তূপীকৃত জঞ্জাল, বিশৃঙ্খলা—মশারিটা পর্যন্ত খাটানো নেই। জাই ক্লিনিং থেকে আসা আর ডাইং ক্লিনিং-এ যাব-যাব সব কাপড়চোপড় বুঝি তালগা পাکیয়ে আছে। সিগারেটের ছাই গাদা হয়ে আছে কদিন থেকে। কাগজপত্র সব এলোমেলো, ছত্রখান। চাকরটাকে ডেকে যে সব সজুত করবে যেন তার স্পৃহা নেই দিন কেটে যাচ্ছে যাক। যখন যেটুকু দরকার তখন সেটুকু হাতের কাছে পেরেই হল। যাকে দরকার নেই, সে থাক বিস্মৃতির জঞ্জালে।

চায়ের একটা পেয়ালা-পিরিচ বুঝি মেঝের উপর নামানো ছিল, নেয় নি চাকর আর ইঁদুর বুঝি এখন সে ছোটোর উপর হামলা করেছে।

শব্দ হতেই চমকে উঠল স্বকাস্ত।

কেউ এল নাকি ঘরে?

একটা কী গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? ফুলের গন্ধ কি, না শরীরের? নারী স্মৃগনাভির সৌরভ? কোন এক তপ্ত ঘনিষ্ঠতার মুহূর্তে যে সৌরভ স্বকাস্তের পরিচিতি ছিল এ যেন তাই। কেউ কি ঘরের মধ্যে নড়ছে-চড়ছে? আস্ত মাহুয, নাকি জ ছুখানি হাত? সে হাত কি ঘরের সমস্ত আবর্জনা ক্ষিপ্ত লাগিত্যে দূর করে দিচ্ছে সংশোধন করছে সমস্ত অনিয়ম? সে হাত কি আরো এগিয়ে আসছে? জা কপালের উপর বসে গলে-গলে পড়ছে?

সে হাত কি বিনতায় ?

স্বপ্ন দেখছিল বৃষ্টি, ধড়মড় করে উঠে বসল স্বকান্ত । ভোর হয়ে গেছে । ঘরময় বিশ্বালা তার দিকে চেয়ে হাসছে তার নৈফল্যে ।

আজ বেশেবাসে কোনো বিচ্যুতি রাখতে দেবে না স্বকান্ত । আজ কেতা-হরন্ত দরকারি পোশাক পরবে । আধাখেঁচড়া কিছু নয়, পুরো সাহেবি পোশাক । আজকে অফিসে তার ইনটারভিউ ।

সিলেকশান কমিটিতে দু-জন উঁচু দাঁড়ের অফিসার । আর কজন মেয়ে-কেরানির কেসও বিবেচিত হবে বলে কাকলিকেও নেওয়া হয়েছে কমিটিতে । সে অফিসরদের সাহায্য করবে । প্রাথমিক কাগজপত্র সেই দেখে রেখেছে । লালনীল পেন্সিলে রেখেছে দাগিয়ে ।

বর্ণানুক্রমিক ডাকা হচ্ছে নাম । পদবীর বর্ণ ।

গোড়ার দিকেই ডাক পড়ল স্বকান্তের ।

‘ডাকো বস্ব স্বকান্তকুমার ।’

ঘরে ঢুকে স্বকান্ত নমস্কার করল । তিনজনকেই এক নমস্কার ।

তা ককক । কিন্তু দাঁড়িয়ে রইল । যতক্ষণ না টেবিলের ওপার থেকে ইঙ্গিত হচ্ছে ততক্ষণ সে বসতে পারছে না । ভদ্র নয় হয়ে সমীচীন ভঙ্গিতে থাকতে হচ্ছে দাঁড়িয়ে ।

কাকলিই বললে, ‘বসুন ।’

এ কাকলির কথা নয়, এ কমিটির নির্দেশ । স্বকান্ত বসল ।

অবিশ্বাস্য প্রকাণ্ড টেবিল, অনেকখানি চওড়া । সমুদ্রের এপার ওপার । চূপ করে প্রশ্নের প্রত্যাশায় বসে রইল আড়ষ্ট হয়ে ।

বোধ হয় প্রাসঙ্গিক ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছে না । তাই জিজ্ঞাসাবাদে দেবি হচ্ছে !

পাশের পুরুষ অফিসর, মাদ্রাজী, বুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল কাকলিকে, ‘এর ফাইলটা তোমার কাছে আছে ?’

‘আই অ্যাম নট কনসার্নড ।’ নির্লিপ্তের মত বললে কাকলি, ‘আমার কাছে শুধু মেয়েদের ফাইল ।’

ও প্রশ্নের তৃতীয় অফিসর বাঙালী । তার নথি ঘেঁটে সেও কিছু পাচ্ছে না খুঁজে ।

স্বতরাং আরো কতক্ষণ চূপচাপ । আর স্তব্ধতাই অতীতের চেতনিতা । নিষ্ক্রিয় শরীরে কতক্ষণ চূপচাপ বসে থাকলেই পুরোনো দিনের কথা ভিড় করে কাছে আসে, হেঁটে-হেঁটে বেড়ায় চোখের সামনে ।

কলিং বেল বাজল। বেয়ারা এসে দাঁড়াল। যাও ডিলিং ক্লার্ককে ডেকে আন
এল ডিলিং ক্লার্ক। সংশ্লিষ্ট ফাইলটা বার করুন খুঁজে।

কোনো স্মরাহা হল না। তবে এবার হেড অ্যাসিস্ট্যান্টকে খবর দাও।

ঠায় বসে আছে স্বকান্ত। ঠায় বসে আছে কাকলি। কেউ কার দিকে একদা
ভুলেও তাকাচ্ছে না। মানুষ লক্ষ্য করে তাকানো দূরের কথা, সামনা-সামনি
তাকাচ্ছে না। কাকলির চোখ তার সামনের খোলা ফাইলে, আর স্বকান্তের চোখ
দূরে জানলার ওপারে।

ভারি মজা লাগছিল স্বকান্তের। ঐ দু-জন পুরুষ অফিসর, বাঙালী আর মাদ্রাজী,
বয়সে প্রোট, তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ঐ সম্ভ্রান্ত সূদূর ভদ্র-মহিলাটিরও এমন ভার
যেন তার সঙ্গে তাঁর ঘুণাক্ষরেও পরিচয় নেই। স্বকান্ত যেন কোন অজানা অজ্ঞাতনামা
পথের লোক। উনি যেন কোন পাহাড়ের চূড়াতে বসে অধরা, আর স্বকান্ত কোন
এক দীনহীন সমতলের বাসিন্দে।

কোন এক মামলার কথা শুনেছিল স্বকান্ত। এক সন্ন্যাসী বহু বৎসর পরে স্বদেশে
ফিরে এসে এক অভিজাতবংশীয়া বিস্তবতী মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে দাবি করেছিল।
প্রমাণ কী, তুমিই তার স্বামী? অনেক প্রমাণের মধ্যে একটি প্রমাণ যা দিয়েছিল
তা সাংঘাতিক দুঃসাহসিক। বলেছিল, শরীরের প্রচ্ছন্নে এমন একটা চিহ্নের কথা
বলছি যা স্বামী ছাড়া আর কার জ্ঞানবার কথা নয়। এখন সাহস থাকে তো পরীক্ষা
গরে দেখ। লেডি-ডাক্তার ডাকো।

যতদূর শুনেছে, পরীক্ষা করাতে রাজি হন নি মহিলা। বরং প্রস্তাবের হীনতা দেখে
ক প্রতিবাদ করেছিলেন। অবশি পরীক্ষায় সে চিহ্ন পাওয়া গেলেও সেটা কিছু
নেচ্চাঙ্গ প্রমাণ হত না। কিন্তু যাই বলো, খুব একটা খুঁকি নিয়েছিল সন্ন্যাসী।
যদি, ধরা যাক, মহিলা রাজি হতেন, আর পরীক্ষায় সেই চিহ্ন পাওয়া না যেত ?
তা হলে ? তা হলে ফের সন্ন্যাসীকে যেতে হত জঙ্গলে।

টেবিলের ওপারে ঐ ভদ্রমহিলাটির সম্পর্কে তেমনি একটা কথা এখন গুঠে
না ? তা হলে, সবিনয়ে, যত্ন স্বরে, এমন দু-একটি চিহ্নের কথা স্বকান্ত বলে দিতে
পারে যা শুনে ঐ মাদ্রাজী ও বাঙালী অফিসর যুগপৎ আতকে উঠবে। কী
ভয়ংকর কথা ! আপনি কী করে জানলেন ? বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে যত্ন-যত্ন
হাসবে স্বকান্ত। বলবে, আমি শুনেতে পারি। আমি সব দেখতে পারি দর্পণের
মত।

সেই পাশাপাশি দুটি ছোট কালো তিলকে স্বকান্ত বোখায়া আর সমরখন্দ

বন্দ। ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, বলত কিনা। মনে হয়, স্ফাক্সই যেন সেই ছই দেশ আবিষ্কার করেছিল। নইলে বাস্তব, বস্তাবৃত কাকলির সময় কোথায় নিজের হৃদয়ের মধ্যে চোখ ফেলে।

কাঠ হয়ে আছে। আশ্চর্য, কেউ কি জানে একদিন ঐ কাঠে কী মস্ত হয়েছিল মঞ্জরীরঞ্জন। শীতে-গ্রীষ্মে যত গান লেখা আছে ঐখানে, কেউ কি জানে, একমাত্র স্ফাক্সই জানত তার স্বরলিপি।

কেউ জানে না। ঐ বীণে কত আলাপন হয়েছে, কে সে বীণকর—এ কথা কোথাও আজ আর লেখা নেই।

কেউ মরে গেলে তার ভালোটাই শুধু মনে পড়ে। তেমনি কাকলি তো আজ মৃত। তাই তার কিছু-কিছু ভালো যে মনে পড়বে তা আর বিচিত্র কী। এখন তো চোখ না হয় ফিরিয়ে রেখেছে কিন্তু কোনো-কোনো মুহূর্তে সেই চোখে কী আশ্চর্য আলো জ্বলেছিল—যে আলো মাটিতেও নেই, সমুদ্রেও নেই—তা কি আর মুছে যাবার? ঈশ্বর বলেছিল, আলো হোক, অমনি আলো হল। ভালোবাসারও বুঝি সেই কথা। বললে, আলো হও, অমনি, মুহূর্তে এক পিণ্ড মর্ত্য কাদা আলো হয়ে উঠল। সেসব কথা কি কেউ আর বিশ্বাস করবে? কত ছোট চোখ কিন্তু একসঙ্গে কতখানি দেখে ফেলে। কত ছোট বুক কিন্তু একসঙ্গে কতখানি তুলে নেয়, চায় ধরে রাখতে। কত স্বপ্ন, কত স্বপ্ন, কত মিথ্যে। একমাত্রই তো মিথ্যে নয়। পাথরের গায়ে সে প্রত্নলিপি কি ঝাপসা-ঝাপসা এখনো পড়া যায় এক-আধটু?

আর যায় না। মুছে গেছে, ঘুচে গেছে।

সব কিছুই শেষ হয়। ভালোবাসারও শেষ হয়।

ফাইল চলে এসেছে আফিস থেকে। প্রান্তের অফিসর দেখে মধ্যের অফিসরের দিকে এগিয়ে দিল, আর মধ্যের জন ঠেলে দিল কাকলিকে।

নোটে লেখা আছে, ক্যাণ্ডিডেট এম-এ, পরীক্ষা পাসের তালিকায় স্থান উচু, পূর্ণ-অভিজ্ঞতাও কিছু আছে। রেফারেন্সসও ভালো। কাজ-কর্মও সন্তোষজনক। এর সম্পর্কে আপত্তি হবার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

‘তবে আর কী প্রশ্ন করবার আছে?’ মধ্যের অফিসরকে বললে কাকলি।

মধ্যের ও প্রান্তের অফিসর নিজেদের মধ্যে কী একটু বলাবলি করল, পরে মধ্যের জন স্ফাক্সের উদ্দেশ্যে বললে, ‘ইউ মে গো।’

উঠে দাঁড়াল স্ফাক্স। কথার ইঙ্গিতটা বুঝল সহজেই। তার প্রমোশন ও কনফার্মেশনটা হবে। তা হলে খুশি মনে একটা উদার নমস্কার করতে হয়।

এবার, কেউই সতর্ক ছিল না, প্রস্তুত ছিল না, হঠাৎ কাকলি ও স্বকাস্তের ছোট্ট একটু চোখোচোখি হয়ে গেল। কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে কাকলি বুঝি একটু হাসল। আর কে জানে সত্যি না মিথ্যে, চোখের কোণে স্বকাস্ত বুঝি ফোটাটল একটু কৃতজ্ঞতার নম্রতা।

চোখের কাজ হচ্ছে দেখা। কিন্তু শুধু দেখেই সে তৃপ্ত নয়। সে কথা কইবে। সে হাসবে। সে ভাববে। সব শেষে সে কাঁদতে বসবে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল কাকলি।

নিচে, সিঁড়ির কাছেই দেখতে পেল দেবনাথকে।

বললে, ‘দাদা, তোমার কিছু হল?’

‘পুরোপুরি হয় নি এখনো, তবে হব-হব হচ্ছে।’

‘কি, চাকরি?’

‘না, চাকরি আর কোথায়! সেই সোনার চাকরিটাই চলে গেল।’

‘সে কি? তোমার আবার কবে চাকরি গেল?’

‘সেই তোর স্বস্তরবাড়িতে গিয়ে তোর কাছে হাত পাতা। মূঠোভর্তি কিরে আসা। সে কেমন স্বস্তর চাকরিটা ছিল বল তো?’

‘এখানে বুঝি হাত পাততে সুবিধে পাও না?’ ড্রয়িংরুমে চলে এল ছ-জনে।

‘কী করে পাব? এখানে যে তোর দয়া-মায়া কম।’

‘আমার কবে আবার দয়া-মায়া ছিল?’

‘ছিল, যখন তুই সেই স্বস্তরবাড়িতে ছিলি তখন ছিল। তখন দূরে ছিলি, বাবা-মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কাউকে দেখছিস না, মনটা নরম ছিল। তখন বাবার অসুখ কি মার অসুখ বলে টাকা চাইলে দ্বিকুন্তি করতিস না, দিয়ে দিতিস। এখন সব দেখতে পাচ্ছিস চোখের উপর, মায়া-দয়াও তাই আর দেখা যাচ্ছে না—’

‘যত কম দেখা যায় ততই ভালো। বরেনবাবু কী বলছেন?’

‘চাকরি করব না বলে দেওয়াতে তিনি আর চাকরি দেখছেন না। একটা বিজ্ঞেস—’

‘কী বিজ্ঞেস?’ বিরক্ত মুখে প্রশ্ন করল কাকলি।

‘ফার্মিং। পৌলট্রি—’

‘সে আবার কোথায়?’

‘দক্ষিণের দিকে বরেনবাবুর একটা বাগানবাড়ি আছে না? সেইখানে।’

‘সেখানে কী ? সেটা তো একটা বাড়ি।’

‘তুই দেখিস নি বুঝি ?’

‘না, যাই নি এখনো। কী আর আছে ওখানে ?’

‘বাড়ি-পুকুর ছেড়ে দিই, আশেপাশে বিস্তর ডাঙা জমি পড়ে আছে। জমি মানেই ইমেনস পসিবিলিটি। সেই জমিতে এখন চাষবাস করি, না হাঁস মুরগি পালি তাই নিয়ে ভাবা হচ্ছে।’

‘ভাবাটা তাড়াতাড়ি শেষ করে যা হোক কিছুতে হাতে-কলমে লেগে যাও।’

‘ভাবাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করা সোজা নয়। জমিটা যদি দেখতিস।’

‘বেশ, একদিন দেখিয়ে নিয়ে এসো।’ উপরে চলে গেল কাকলি।

কতক্ষণ পরে বেল বাজল। সম্পূর্ণ ঘরোয়ায় এখনো এসে পৌঁছয় নি, এরই মধ্যে উৎপাত। কাণ্ডজ্ঞান ক্রমশই লোপ করে দিচ্ছে।

‘কে ?’ ঝাঁজালো মুখে জিজ্ঞেস করল কাকলি।

চাকর বললে, ‘একটি মেয়েছেলে।’

‘মেয়েছেলে ?’ আরামে নিশ্বাস ফেলল কাকলি : ‘আসতে বলো।’

আফিস-পাড়ার বন্ধু চিত্রা এল ছুটতে-ছুটতে। ঘরে ঢুকেই, যেমন ডুবন্ত লোকে ধরে তেমন করে কাকলির হাত চেপে ধরল : ‘বাবা, বাঁচলাম এতদিনে।’

‘কেন, নির্বিঘ্নে এক মাস পেরিয়ে গেল ?’ হাসল কাকলি।

‘বাবাঃ, কী ভয়ে-ভয়ে যে দিন কেটেছে। কেবলই মনে হয়েছে পুলিশ আসছে, এই বুঝি পুলিশ এল।’

‘পুলিশের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, অপর্ণা বিশ্বাসের খোঁজে বেরুবে ! কে অপর্ণা বিশ্বাস ? চোর নয়, ডাকাত নয়, খুনে নয়, জালিয়াত নয়, কোনো সেক্সুয়াল ক্রাইমের ভিকটিম-গার্ল নয়, অ্যাবেটর নয়, এক বিয়ের নোটিশের অবজেক্টর ! তাকে ধরবার জন্তে কলকাতাকে চিকনি দিয়ে আঁচড়াবে পুলিশ ! তাদের জানাবেই বা কে ?’

‘যদি জানাত ! যদি ধরত আমাকে !’

‘শ্রেফ অস্বীকার করতিস। তোর ছবি আর তুলে রাখে নি। বলতিস, আমি যাই নি, ও সই আমার নয়।’

‘মিথ্যে বলতাম ? পারতাম নাকি সত্যি ?’

‘পারতেই হত। অনেক সময় মিথ্যে বলাটা মহাপুণ্য। ধর, এখন যদি ছোরা হাতে কেউ তোকে খুন করতে আসে, তুই ভয় পেয়েই খাটের নিচে লুকোস আর

লোকটা যদি ঘরে ঢুকে আমাকে জিজ্ঞেস করে, এই ঘরে চিত্রা এসেছে, আমি তখন সত্যবাদী হয়ে ‘হ্যাঁ’ বলব? ককখনো না। একটা মিথ্যে যখন একজনের প্রাণ বাঁচাচ্ছে তখন স্পষ্ট ‘না’ বলব, বলব আসে নি। মিথ্যেয় যদি কাক উপকার হয়, মিথ্যেই সত্যি।’

‘উপকার!’

‘বা, উপকার করলি নে? অবজেকশান দিয়ে মাসখানেক পিছিয়ে দিলি নে?’

‘কিন্তু এখন—এখন কী হবে?’

‘অবজেকশান নট প্রেস্‌ড, নট পাস্‌ড। অবজেকশানটা বাতিল হয়ে যাবে। আর কী হবে!’

‘আর কিছু নয় তো?’

‘আবার কী! বিয়ের পথে সাময়িক একটা বাধা এসেছিল, সরে গেল। পথ নিষ্কণ্টক হল। তখন থেকে বাড়ল আবার তাগাদার যন্ত্রণা। ও কি, উঠবি? একটু চা খাবি নে?’

‘না। একেবারে যন্ত্রণা নিবারণের দিন এসে মিষ্টিমুখ করব।’ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভীতু মুখে চিত্রা বললে, ‘কিন্তু যদি ভাই হাতের লেখার নমুনা নিয়ে গিয়ে ঐ সইয়ের সঙ্গে মেলায়?’

‘মিলবে না। ও সই তো বাঁকা হাতে করেছিস। এখন তা নিয়ে আর ভাবনা কী। অবজেকশানই নেই তায় অপর্ণা বিশ্বাস! ঘরই নেই তার আবার উত্তর শিয়র!’

‘ঘর বলে ভেঙে দে, বিয়ে বলে জুড়ে দে।’ হাসতে হাসতে নেমে গেল চিত্রা।

ঘর অন্ধকার করে দিয়ে চূপচাপ শুয়ে আছে কাকলি।

জানে ঠিক আসবে আজ বরেন।

ঠিক বেজেছে ডবল বেল।

নিচের থেকে চাকর আর পাশের ঘর থেকে গায়ত্রী এসেছে।

মাকে বললে, ‘বলে দাও, ভীষণ মাথা ধরেছে, শুয়ে আছে, উঠতে পাচ্ছে না।’

‘সে কী?’ একটু বুঝি থমকাল গায়ত্রী।

‘সে কী আবার কী! সত্যি, মাথাটা ফেটে যাচ্ছে, জ্বর আসছে কিনা কে জানে। যা বলছি তাই বলো গে।’

অগত্যা গায়ত্রী তাই বলতে গেল।

‘ভীষণ ঝেঁইন হচ্ছে, কদিন ওর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।’ লোকা থেকে উঠে দাঁড়াল বরেন: ‘এখন আর ওকে ডিস্টার্ব করব না। শুয়ে আছে, থাক শুয়ে। শুধু

স্বসংবাদটা ওকে দিয়ে আসি।’ বলে গায়ত্রীর পাশ কাটিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে।

ঘর অন্ধকার। ছ-একটা অশ্রুত আর্তস্বরের টুকরোও বুঝি শোনা যাচ্ছে।

‘খুব কষ্ট হচ্ছে?’

‘চোঁচির হয়ে ফেটে যাচ্ছে মাথা। আলো একেবারে সহিতে পারছি না।’

‘না, না, জালব না আলো। খুব বেশি কষ্ট হলে আমি বলি কি, ডাক্তার নিয়ে আসি।’

‘না, না, ডাক্তার লাগবে না। অন্ধকারে কতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলেই সেয়ে যাবে আশা করি।’

‘হ্যাঁ, আমি যাই তবে। খবরটা বলে যাই। অবজেকশান রিজেকটেড হয়ে গেছে।’

‘গেছে? তা তো যাবেই, সে আর বেশি কথা কী। বাজে রান্দি অবজেকশান।’

‘এখন তবে—’

‘হ্যাঁ, মার জ্যোতিষীকে ডাকাই, দিনক্ষণ ঠিক করে দিক।’

‘হ্যাঁ, আর দেরি করার মানে হয় না।’

‘না।’ পাশ ফিরল কাকলি। সংকেতে দৃঢ় হল।

নেমে গেল বরেন।

আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার উঠে এল চাকর।

ঘরের পর্দা সরিয়ে বললে, ‘বাবু এসেছে।’

গভীর একটা তন্দ্রার ঘোরের থেকে জেগে উঠে ধমকে উঠল কাকলি: ‘আবার এসেছে? সঙ্গে ডাক্তার আছে বুঝি?’

‘ডাক্তার? ডাক্তার তো মনে হল না।’

‘বলে দে, দেখা হবে না। দিদিমণি ঘুমিয়ে আছে।’

চাকর নিচে নামল।

আগন্তুককে বললে, ‘দেখা হবে না।’

‘হবে না?’

‘না। বললেন ঘুমিয়ে আছেন।’

‘আচ্ছা।’ ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেল স্বকান্ত।

হৃদয়দয় হয়ে কাকলির ঘরে ছুটে এল গায়ত্রী। আলো জ্বালাল।

‘কে, কে এসেছিল নিচে? নতুন লোক। কে ও? কে চলে গেল?’

‘বা, আমি কি দেখেছি ? কে ?’ ধড়মড় করে উঠে বসল কাকলি : ‘দীপঙ্কর ?’

‘না, না, মনে হল, আর কেউ। আমি কদিন আর দেখেছি ওকে। কিন্তু কেমন এমন চেনা-চেনা মনে হল। কিন্তু ওর কী স্পর্ধা ! ও কেন আসে ?’

‘বা, আমি তো দেখা করি নি। তাড়িয়ে দিয়েছি।’ বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল কাকলি।

‘ঠিক করেছিল। দৈব ঠিক করেছে। কিন্তু ওর স্পর্ধাকে বলিহারি। কী সাহসে ও আসে ? কত বড় শত্রু, আবার এমুখো হয় ?’ জ্বলতে লাগল, কাঁপতে লাগল গায়ত্রী।

‘এসেছে তো স্বকান্তকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।’ টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছেন বনবিহারী : ‘আমি ওকে গুটিকতক প্রশ্ন করব আগে। বিয়ে করাটা এত কঠিন আর বিয়ে ভাঙটা এত সোজা। সোজা হলেই ভাঙতে হবে ? কঠিনকে কঠিন সাধনায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে না ? কই, পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। আগে আমার কথার উত্তর দিক।’

কিন্তু কোথায় কে।

নিচে নেমে এল কাকলি। সদরের কাছটাও একটু দেখল। তাকাল রাস্তার দিকে। তারপর ছাদে উঠল। তাকাল আকাশের দিকে।

কেউ কোথাও নেই।

• ৫৫ •

এটা কিরকম হল ? এটার মানে কী ? এটা কি একটু বেশি হয়ে গেল না ?

ইনটারভিউ সেরে উঠে যাবার আগে কর্তব্যক্তির চোখের দিকে একবার তাকাতেই হয়। সেইটেই স্বাভাবিক। ডোন্ট কেয়ারি ভাব দেখিয়ে হট করে চলে যায় না কেউ। বরং সেই শেষ চাউনিটাতে একটি মিনতি এঁকে রাখে, যেন মঞ্জুর হয় প্রার্থনা। কিংবা একটি ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখে, কিরকম ছাপ রাখলাম না জানি। কিংবা আদৌ পারলাম কিনা রাখতে। ঐ মুখগুলি দেখে সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা যে, আমারও কিঞ্চিৎ আশা আছে। নাকি মুখগুলি নিতান্তই তোলোহাঁড়ি ! নিষ্ঠুরতার নামাস্তর !

সারাক্ষণ মুখ নামিয়েই বসে ছিল কাকলি। প্রথম থেকে শেষ, আবার শেষ থেকে প্রথম, কী একটা কাইলের গৃষ্ঠা ওলটাচ্ছিল। সরাসরি ওর মুখের দিকে না তাকালেও স্বকান্ত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বৈরাগ্য, ওর বৈতুষ্য, ওর অনীহা। নির্মম অনাসক্তি। কিন্তু, এখন স্বকান্তের যাবার সময়, নিঃসম্পর্ক মাহুঘের ভিড়ের মধ্যে তার হারিয়ে যাবার আগে, এটা কী করে বসল কাকলি? নত মুখখানি তুলল ধীরে-ধীরে, আর নিজেবও অজানতে, চোখের কোণে ছোট্ট একটি হাসির ঝিলিক দিল।

আর স্বকান্তই বা তার শেষ চাউনিটা রাখবার জন্তে, ঐ তিনটে মুখের মধ্যে ঐ ছোট, নিরীহ, একেজো মুখখানিই বেছেছিল কেন? আসল কর্মকর্তা তো ঐ বাঙালী মাদ্রাজী অফিসর দু-জন, ওরাই তো কেইবিষ্ট, ‘ডেলিভার দি গুডস’ যদি কেউ করতে পারে তো ওরাই। ওদের দিকে না তাকিয়ে ও কিনা দেখতে গেল পড়তে গেল কাকলির মুখ, যা কিনা অবস্ফ, অবস্ক, অন্তমনস্ক। যা কিনা আগাগোড়া নিস্পৃহতার ইম্পাত দিয়ে মোড়া।

আশ্চর্য, ইচ্ছে করে ফেলে নি চোখ, যেন মধুকর আপনা থেকেই উড়ে গিয়ে বসল ফুলের উপর।

আশীর্বাদের মত হৃদয় মুখখানি তুলল কাকলি। ঈশ্বর যে মুখ দিয়েছিল, এ সে মুখ নয়। এ মুখ কাকলি নিজে সৃষ্টি করেছে। এ মুখে রাগ নেই, ক্ষোভ নেই, জ্বালা নেই, হিংসে সেই, শুধু দুঃখের লাভণ্য দিয়ে ভরা। ঈশ্বর দুঃখের কী জানেন! তাই তাঁর সাথী নেই, এসব মুখ তিনি আনেন কল্পনায়।

এ মুখ কাকলির একার তৈরি। কে জানে হয়তো এতে স্বকান্তেরও কিছু হাত আছে। কিছু হয়তো কান্ন করেছে ওরও রঙ-তুলি-জল।

তাকিয়েছিল তাকিয়েছিল, কিন্তু হাসল কেন? দুটি চোখ যেন দুটি নীরব প্রার্থনার নিরীলা কুটির। সহসা তাতে দুটি দীপ জলে উঠল কেন? কী বলতে চায় সে হাসি?

পৃথিবীতে কত তারা, কত ফুল, কত আলো, কত গান, কত মণি-মুক্তো—তার উপরে আবার এই হাসির টুকরো। এটিও পৃথিবী রেখেছে জমিয়ে। হারিয়ে ফেলে নি। ধুলোয় দেয় নি ধুলো করে।

অনেকক্ষণ বসে আছেন, এবার প্রতীক্ষার শেষ হল, যন্ত্রণার শেষ হল, বাড়ি যান নিশ্চিত হয়ে—এই হাসি কি শুধু তাই বলছে? এ হাসি কি শুধু এক সমাপ্তির রেখা? শুধু এক উপশমের ইঙ্গিত? নাকি, আপনার আবেদন মঞ্জুর হবে, শুধু সেই এক আশার মূলিক? মঞ্জুর হবে কী, মঞ্জুর তো হয়েছে, এই তো বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত—



তবে সেই হাসি কি তার সাকল্যে মামুলি অভ্যর্থনা ? শুধু ঐটুকু ? তার বেশি আর কিছু নয় ?

তার অনেক অনেক বেশি । তোমার পদোন্নতি হল, এতে তোমার আনন্দকে শুধু সংবর্ণনা করা নয়—তোমার পদোন্নতি হল, এতে আমার আনন্দকেও লিপি-বদ্ধ করলাম । তোমার স্বখে নিজেকেও স্বখী বলে অনুভব করলাম । তোমার যে জয় হল, প্রচ্ছন্নে এটা আমারও জয় । তোমার উন্নতিতে আমার গৌরব ।

এমন আশ্চর্য কথা হিসেবের খাতায় লেখে না । আমার শোকে-দুঃখে সমবাণী হয়তো পাব, কিন্তু আমার স্বখে স্বখী হবার লোক কই । আমার যারা স্বখে বাহ্যিক অভ্যর্থনা করতে আসে, আসলে তারা ঈর্ষী, অন্তরে তাদের দাহ । কিন্তু কাকনি এখন যে হাসি হাসল, সেটি হৃদয়ের বিদ্যুৎ, জ্বালা দিয়ে নয়, তৃপ্তি দিয়ে ঝাঁক । এমন তো কোনো কথা ছিল না । আমি স্বখী হলে, আমি জয়ী হলে তার কী ! পক্ষান্তরে আমি পরাস্ত হই, অপমানিত হই, তাতেই বা তার কী এসে যায় !

জনেছে, মাহুষের মনের দর্পণ চোখ । হাত ভঙামি করতে পারে, কিন্তু চোখ ছলনা জানে না, মনের ঠিক ছবিটি তুলে ধরে হুবহু । অন্তরের চিঠি পড়বার ভাষাই তো চোখ । মন যদি অনুপস্থিত, চোখও অনুপস্থিত । দুটি চোখই মনের আকাশের চন্দ্র-সূর্য ।

যে হাসিটি হাসল এখন কাকলি, তার কী ব্যাখ্যা হতে পারে সারাক্ষণ তারই বিচার করছে স্বকান্ত । হয়তো কিছুই নয়, স্বকান্তের দেখবার ভুল । কিংবা হয়তো বা ওটা পরিহাসের ছটা । কেমন পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করছি । বিশেষত যে পুরুষ একদিন শাসন-পীড়ন করত, করবার অন্তত যার ছাড়পত্র ছিল, ভাগ্যের বিধানে সেই দুর্জন আজ রূপাপ্রার্থী । কিংবা হয়তো বা একটু করুণার আমেজ ঐ হাসিতে । তুমি দীন-হীনের মত দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ, রূপণের মত নাই বা দিলাম ফিরিয়ে । তোমার আকাজক্ষা অল্প, নাও এই এক মুঠো ।

মন মানতে চায় না স্বকান্তের । যদিকেই তাকাক, যে কথাই ভাবুক, মনের মধ্যে সেই চকিত-স্মরিত হাসিটিই শুধু ভেসে ওঠে । সে হাসিটি দুই নয়নের বাইরে, আরেক নয়নের, তৃতীয় নয়নের ভাষা । যেন বলছে, আমি তোমার হিতকামী । তোমার ভালো হোক, তোমার কুশল হোক, আমার এই শুধু বাসনা । তুমি ভালো থাকলেই আমার ভালো থাকা । তোমার কুশলেই আমার কুশল স্বীকার ।

হিত কামনা কে করে ? হিত কর্ম করা বরং সোজা, কামনা করাই কঠিন । তোমার অস্থখ করেছে, কয়েকটা তোমার সেবার কাজ করে দিলাম, হিত কর্ম লম্পর

হল। একস্তু তোমার ভালো হোক, তুমি শিগগির ভালো হয়ে ওঠো, সর্বাস্তঃকরণে এই হিত কামনা কি করতে পারো? ককখনো না, বুকটা ফেটে যাবে, যদি তুমি না নিতান্ত অস্তরের স্বহৃদ হও, আত্মজন হও। তবে স্বকাস্তু কি কাকলির অস্তরের স্বহৃদ, আত্মজন? তাই যদি না হবে, তবে ঐ হাসির ব্যাখ্যা কী?

কোনোই ব্যাখ্যা নেই। অকারণে মাহুয অমনি অনেক হাসে। অকারণে মরীচিকা অমনি অনেক জল দেখায়।

পথে আর দেরি কোনো না, গুটি-গুটি ফিরে যাও ঘরে। আর পথ নেই। পথ বন্ধ।

পথ বন্ধ হবে কেন? স্বহৃদের পথ বন্ধ হতে পারে, নিম্নতন কেরানির পথ সব সময়ই খোলা আছে। ঐ ইনটারভিযুর ফল কী হল, অফিসিয়াল চিঠি ইস্ত হতে দেরি হচ্ছে কেন, এ তো বৈধভাবেই স্বকাস্তু জানতে চাইতে পারে। সেই অর্ডার বেরোবার সঙ্গে স্বকাস্তের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, স্বার্থ মানেই টাকা, তাই তার এই ব্যাকুলতা। বিবেকের কাছে নিজেকে মোটেই তাই অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে না। সন্ধানটা আফিসেও করা যেত বটে কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে এতখানি যখন এসেই পড়েছে, তখন আর ঐ বাকিটুকু কী দোষ করল? তার হাতে ওজুহাত নেই এমন কথা তো কেউ বলতে পারবে না। অধস্তন হয়ে উপরতনের বাড়ি গিয়ে গাফিলতির কৈফিয়ত চাওয়া এমন কী অত্যাশ?

আচ্ছা, ঐ হাসিটাতে কি একটি আত্মানের স্বর নেই? তা কি নিরস্তর বলছে না, আমার টাকায় স্বথ নেই, খ্যাতিতে স্বথ নেই, শক্তিতে প্রতাপে স্বথ নেই, শুধু তুমি একবার এসো। সেই তুমি কে, তা কেউ বলতে পারে না। তবু তুমি এসো।

সেই পরিচিত পথ। সেইসব বাড়িঘর, দোকানদানি, রিকশা-স্ট্যাণ্ড, 'লাইট পোস্ট'—সেই লোকচলাচল। ঐ তো অদূরে কাকলিদের বাড়ি, ছাদ, সেই বন্ধুর মত কদম গাছ। আশ্চর্য, গাছটাও মাহুযের মত চোখে চাইতে পারে। আর আরো আশ্চর্য, তার চোখে সেই কাকলির হাসি। হে বন্ধু, আছ তো ভালো?

তবু দ্বিধা যায় না পা ছেড়ে।

যদি দেখে, বরেন বসে আছে। থাক না, ভালোই তো, গল্পের পরিঘিটা বাড়িয়ে নিতে পারবে। অপ্রতিভ হবার আছে কী। বরং অবস্থাটা এমন হোক, বরেনই অল্প কাজের ছুতো করে বেরিয়ে যাক রাস্তায়। আর যদি বসে থাকতে চায়, শুধু ক তাদের আফিসের কেছা। তাদের বাজার-দরের আলোচনা।

আর যদি বরেন না থাকে! কেউ না থাকে!

হাসতে-হাসতে নামবে কি কাকলি ? দু-চারটে বেসরকারি কথা কইবে ? অসহ্য রাজনীতি নিয়ে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার চেহারা নিয়ে ? চা দেবে খেতে ? আবার একদিন আসবেন, বলবে কি যাবার সময় ?

বাড়ির দিকে আরেকবার তাকাল স্বকান্ত । কাকলি কোন ঘরে আছে ? যে। ঘরটায় আলো জ্বলছে, সেই ঘরে ? নাকি যেই ঘরটা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে ?

কিংবা কে বলবে, হয়তো বাড়িতেই নেই ।

‘আছে ।’ স্বকান্তর প্রশ্নের উত্তরে চাকর বললে ।

‘শোনো, আমি বাড়ির গিনি মাকে চাই না । চাই তাঁর বড় মেয়েকে, ি মিত্রকে । বুঝেছ ? যিনি—’

‘হ্যাঁ, বুঝছি । যিনি আফিসে কাজ করেন ।’ জাস্তা মুখ করল চাকর ।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাঁকে খবর দেবে ।’

‘কী নাম বলব ?’

এক মুহূর্ত কী ভাবল স্বকান্ত । বললে, ‘না, নাম লাগবে না ।’

‘ইচ্ছে করলে এই স্লিপেও নাম-ঠিকানা লিখে দিতে পারেন ।’ চাকর কাগজ পেঙ্গিল এগিয়ে ধরল ।

‘দরকার নেই । তুমি গিয়ে শুধু বলো, একজন ভদ্রলোক এসেছেন ।’

চাকর তাই বলতে গেল ।

ব্যাডমিন্টনের শাটল-ককণ্ড বোধ হয় এত তাড়াতাড়ি ফেরত আসে না । চাকর ফিরে এসে বললে, ‘দেখা হবে না বলে দিলেন ।’

‘হবে না ?’ কোনো মানে হয় না, তবু নিশ্চয় কঠে পুনরুক্তি করল স্বকান্ত ।

‘না । বললেন ঘুমিয়ে আছেন ।’

আর, শাটল-কক নয়, ফুটবলের মতই বেরিয়ে গেল মাঠ পেরিয়ে ।

খুব হয়েছে ! নিজেই ধর্ম দেখছে এখন । ছি ছি, গাল বাড়িয়ে কেমন চড়া খেলে ! খোঁতা মুখ কেমন ভোঁতা হল ! ধানও গেল ধুকড়িও গেল । কাকলি তো গেছেই, আত্মসম্মানটাও গেল ।

মন বলে বাদশা হবি, খোদা বলে মেগে খাবি ।

ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবার জগ্গে উদ্দাম আকাজ্জা হল স্বকান্তের । নিজেকে ভুলে যেতে, মুছে ফেলতে নিঃশেষে । নিজেকে অগ্নি সত্তায় নিয়ে যেতে । এখান দিয়ে এখন যদি একটা মিছিল যেত ঠিক ভিড়ে যেত দলে । কিংবা রাস্তার মোড়ে জমত কোনো জটলা, ওও তার শ্রোতা হয়ে বসত ।

একটা ভিড়-ভর্তি চলতি ট্রামে উঠে পড়ল স্বকান্ত। কোথাকার ট্রাম জিজ্ঞেসও করল না। কোনোক্রমে এ অঞ্চল থেকে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হয়তো পিছন থেকে সবাই ওকে দেখছে, দেখছে বা ঘেঁষাঘেঁষি করে জানলার দাঁড়িয়ে, কিংবা ছাদের রেলিঙ ধরে, ঝুঁকে পড়ে। দেখছে লাঠির ভয়ে কেমন লিকলিকে লেজে পালিয়ে যাচ্ছে নেন্টি ইদুর।

এদিকে কাকলিও নিজেকে বিলুপ্ত রেয়াত করছে না। থিকারে শতধা হয়ে যাচ্ছে। সত্যিই তো, কলিং বেল তো বাজায় নি—সেই ডবল আওয়াজ! তবে কোন আইনে আগন্তুককে বরেন বলে সাব্যস্ত করল? খুব অহংকার হয়েছে, তাই একবার নিচে নামতে পর্যন্ত পারল না। কোতুহল পর্যন্ত হল না সে নামহীন লোকটি কে? খুব ড্রয়িংরুম করেছে, খুব খুলেছে সে সোফা-সেটির শো-রুম। খুব কার্পেট বিছিয়ে সে ধুলো ঢেকেছে। খুব রেখেছে সে চাকর, কাগজ-পেন্সিল, খুব বসিয়েছে সে কলিং বেল! এত বাড় যে বাড়ি, তাকে ঝড় ভাঙবেই ভাঙবে। একেই বলে অতিমেঘে অনাবৃষ্টি। আশ্চর্য, তুই কাকলি, নিজে থেকে নিজে সে তিরস্কার করছে, তুই এত হিল্লি-দিল্লি করিস, সামান্য কটা সিঁড়ি ভেঙে তুই নিচে নামতে পারিস না? সাত ঘাট ঘুরে এসে তুই তোর নিজের পুকুরে ডুবে মরিস! তোর কী হয়েছিল? কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী।

এখন ছাদে ওঠবার কোনো মানে হয়? আর সব জায়গা ফেলে সে ছাদে এসে রয়েছে? কোন পথ দিয়ে এল শুনি, কোন সিঁড়ি বেয়ে? কে জানে। তবু একা-একা ছাদেই খানিকক্ষণ পায়চারি করল কাকলি। যে আসতে জানে, সে স্বত্বির পথ দিয়েই আসতে পারে, আসতে পারে অল্পভবের সিঁড়ি ভেঙে। অন্ধকারেই তার আলোকিত উপস্থিতি।

বেজায়গায় ট্রামে উঠে পড়েছে, খানিকদূর যেতেই টের পেয়ে নেমে পড়ল স্বকান্ত। আচ্ছা, দেখা হবে না যে বলল, কার সঙ্গে দেখা হবে না—এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পেরেছিল কাকলি? তবে ক্ষুর মুখে অমনি চটপট উঠে আসার কোনো মানে হয়? সে তো কথায় বা লেখায় মোটেই এমন জানান দেয় নি যে স্বকান্তই এসেছিল। তবে কাকলির প্রত্যাখ্যানের অগ্র অর্থ, নির্দোষ অর্থও তো হতে পারে। আশ্চর্য, সে নিজে প্রত্যক্ষরূপে সত্যাসত্য নিরূপণ করল না কেন? বেশ তো, কাকলি এসে দাঁড়াত সামনে, সামনে না হলে অন্তত সিঁড়ির রেলিঙ ধরে, বলত, না হবে না দেখা, আমি বাজে লোকের সঙ্গে দেখা করি না। কেন যাচাই করে দেখল না স্বচক্ষে, রূঢ় ভাষাটা শুনল না স্বকর্ণে। সে তো আর পকেটে করে

পুরোনো দিনের ককাল নিয়ে আসে নি, সে নতুন সম্পর্কের, আফিস-সম্পর্কের ছাড়পত্র নিয়ে এসেছে। তবে অত পালাই পালাই কেন? বসে থেকে এপার-ওপার কেন দেখে গেল না? কথায়-লেখায় জানান দেয় নি, একবার গলা ছেড়ে সেই 'কলি' বলে ডেকে উঠতে কী হয়েছিল? দেখত সে ডাক কী প্রতিধ্বনি নিয়ে আসে! গেট আউট, ক্লিয়ার আউট বলায় কিনা।

খুব কেরদানি দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে টিটকারি দিল স্বকাস্ত। এখন হোটেলের ছেলে হোটেলের ফিরে যাও।

হ্যাঁ, হোটেলের যেতে দোষ কী। ইনটারভিউর সময়ে ঠিকানাটা তো চোখে পড়েছিল কাকলির। আর চোখে পড়া মাত্রই কোনো-কোনো ঠিকানা কারু কারু মনে যদি গাঁথা হয়ে যায়, তবে আর কী করা যাবে? হোটেলের মানুষ তো কহ কাজেই যেতে পারে, শুধু লোক খোঁজবার জগ্গেই বা হবে কেন? ঘর থালি আছে কিনা, কিরকম রেট—এই অনুসন্ধান তো খুবই সাধারণ। অত কথায় কাজ কী। হোটেল যখন, তখন অন্যায়সে সেখানে খাওয়া চলে, বাইরের লোক নিষিদ্ধ নয় নিশ্চয়ই। অত যাচাই কিসের? সোজা হুজি স্বকাস্তের খোঁজ করলেই বা কী দোষ। শত হলেও প্রমোশন পাবার পর ও তো এখন তার 'কলিগ', সমান-সমান, আফিস এটিকেটেই তো রিটার্ন-ভিজিট দেওয়া চলে। আকস্মিক যখন এসেছিল, তখন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি ঠেকা ছিল, অন্তত সেটুকু জেনে নেওয়াও তো ভদ্রতা।

যাক, খুব কর্মদক্ষতা দেখিয়েছ। নিজেকেই নিজে গল্পনা দিচ্ছে কাকলি। দশ হাত কাপড়েও কাছা দিতে শেখো নি, তুমি খুব বুদ্ধিমতী! লোকটা কে খোঁজ না নিয়েই চলে যেতে বললে। পাখিটা খাঁচায় এসেছিল, দরজা বন্ধ করলে না, উড়ে পালাল। এখন বলছ, বন থেকে তাকে খুঁজে আনবে। বলি, চাকরিতে তোমার প্রমোশন হয় না?

ক্রিং-ক্রিং, ডবল বেল বাজল।

তবু, কে জানে কে, নিজের চোখে দেখি গে। এমনও হতে পারে, আবার আজ এসেছে, চাকরের অপেক্ষা না করে নিজেই বেল টিপেছে। আর, কিছু না জেনেই, সাধারণভাবেই দুটো আঙুরাজ করেছে।

শব্দ শোনা মাত্রই ছুটে নেমে এসেছে কাকলি।

না, আর কেউ নয়, বরেন বসে।

খুব স্বরাস্বিত হয়ে এসেছে, আর খুব আনন্দিত মুখ, কাকলিকে দেখে উথলে উঠে বরেন : 'এখন পথ নিষ্পটক। অবজেকশান বাতিল হয়ে গেছে। এবার দিনটা ঠিক করে ফেলো।'

মুহূর্তে নিবে কালো হয়ে গেল কাকলি। দুর্বলের মত শ্রাস্ত ভঙ্গিতে বলল। বললে,
'আমি বলছিলাম কী—'

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম, আমার শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে, কয়েকদিন ছুটি নিয়ে চেঞ্জ যাব
ভাবছি। তাই বলছিলাম, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে হত না?'

বরেন এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একটু বুঝি বা কী চিন্তা করল। নিচের
ঠোঁটটা একটু কামড়াল দাঁত দিয়ে। বললে, 'বা, অপেক্ষা করা যাবে না কেন? কিন্তু
এ নোটিশটা তা হলে ল্যাপ্স করে।'।

'তা করুক না।' মুহূর্তের জন্তে আবার উজ্জ্বল হল কাকলি: 'পরে আবার
নোটিশ দেব।'।

'আবার যে তার তিন মাসের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে না তার ঠিক কী।' পাশের
ঘর থেকে গায়ত্রী এসে বললে গস্তীর মুখে, 'তোমার এমন কিছুই এখন অসুস্থ করে
নি। একটু বুক কাঁপা বা মাথাধরা—সে একটা কিছু অসুস্থই নয়।'।

মিনতি-ভরা চোখে মার দিকে তাকাল কাকলি।

গায়ত্রী বললে, 'ছুটি নিতে চাস, নে। সেটা বিয়ের ছুটি।'।

'আমিও ছুটি নেব।' বললে বরেন, 'তারপর হনিমুনে যেখানে বলো সেখানে
গুরতে যাব। দেশে বলো দেশে, বিদেশে বলো বিদেশে।'।

'সেইটেই তো চমৎকার চেঞ্জ হবে।' সায় দিল গায়ত্রী।

কথা কয় না কাকলি তবু।

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে আয়ত্ত করে নিল বরেন। নিয়ে এল নথ-
দর্পণে। বুঝল, যে কোনো কারণেই হোক, কাকলির মধ্যে অনিচ্ছা জেগেছে।
সে অনিচ্ছাকে বাড়াতে দেওয়া হবে না, সবল হাতে উপড়ে ফেলতে হবে—আর
সম্ভব হলে, আজই, এন্টুনি। এমন একটা কিছু করতে হবে, যাতে ওর মধ্যে
আর দ্বিধা না থাকে, আড়ষ্টতা না থাকে। যাতে অকূঠ আগ্রহে ও-ই বিয়েতে
অগ্রণী হয়, ওর নিজের স্বার্থে, নিজের মঙ্গলে। বিয়েটাকে আবশ্যিক করে তুলতে
হবে। ওর জীবনে এঁকে দিতে হবে বলিষ্ঠ স্বাক্ষর। দাগি করে দিতে হবে
দলিল।

এইখানে একটু সতর্ক হল বরেন। বললে, 'শরীর যদি ভালো না থাকে, শুভ
কাজ পিছিয়ে দিতেই হবে। তার আর কথা কী। শরীরমাঝে—'

'একজন স্পেশালিস্ট তা হলে দেখাও।' গায়ত্রী বললে।

‘তা হবে’খন। ব্যস্ত কী।’ বরেন কাকলির দিকে তাকাল। বললে, ‘চলো
বেরিয়ে আসা যাক। দেবনাথের ফার্মের জায়গাটা দেখবে চলো।’

‘হ্যাঁ, চলুন,’ স্বথে আর সবলতায় ঝলমল করে উঠল কাকলি : ‘ও জায়গাটা
আমার দেখা হয় নি।’

‘তা হলে চট করে তৈরি হয়ে এসো।’

যেতে-যেতে পিছন ফিরল কাকলি। হাসিমুখে বললে, ‘আর ঐটেই বুকি
আপনার বাগানবাড়ি?’

উদাসীনের মত মুখ করে বরেন বললে, ‘হ্যাঁ, আছে একটা চালাঘর।’

৫১

‘চলুন।’ ঝুলন্ত আঁচলটাকে শাস্ত করতে করতে এগিয়ে এল কাকলি।

জুত চোখে আত্মপূর্বিক দেখল একবার বরেন। অবোধ, মুক্ত, অনর্গল। একতাল
নির্ভর আর দুর্বলতা। কোথাও বন্ধন নেই, গ্রন্থি নেই, নেই কোথাও নিশ্চয়ই
লুকোনো বাঘনখ।

‘চলো।’ এক লাফে উঠে পড়ল বরেন।

গায়ত্রী চলে গেল ভিতরে।

কাকলি আগে উঠল গাড়িতে। বরেন তার পাশে বসেই ফের নেমে পড়ল।
বললে, ‘মাকে একটা কথা বলে আসি।’

প্রায় ছুটে ঢুকল অন্তঃপুরে। কাকে কী বললে কে জানে, আবার অমনি
চলে এল বাইরে। গাড়িতে উঠেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে শব্দ করে
দরজা বন্ধ করলে। আর, কোনোদিন যা করে না, তক্ষুনি-তক্ষুনি সিগারেট
ধরাল।

‘কী বলতে গেলেন?’ চোখে নির্মল কোতুহল, জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘কিছু নয়।’ একমুখ ধোঁয়ার মধ্যে থেকে বললে বরেন।

ধরনটা ভালো লাগল না। মার সঙ্গে কী এমন কথা থাকতে পারে যার মধ্যে
কাকলি নেই। তবু, ষাঁটিয়ে দরকার নেই, চুপ করে রইল। বিয়েটা পিছিয়ে দিতে
চাইছে, ও কথা বলাতে বরেন সাংঘাতিক বিরক্ত হয়েছে, তাকে আরো খোঁচা মারা

উচিত হবে না। বরং তার বিরক্তির উপর একটি প্রশান্তির প্রলেপ দেওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। একটু কথা, একটু ভঙ্গি, একটু বা প্রশ্রয়।

কিন্তু এমন তো কোনোদিন হয় না। এতক্ষণ এই চূপ করে থাকা। চূপ করে বাস নিজের মনে সিগারেট টানা। কতক্ষণ ধরে কাকলির এক পাশে ফেলে রাখা প্রাণতানি তুলে না ধরা। যেন, শুধু প্রতিবেশিতা নয়, সমস্ত অস্তিত্বকেই উড়িয়ে দেওয়া।

কী যেন ভাবছে। একটা নিরবয়ব চিন্তার পাথরে সংকল্পের ক্ষুরকে শান দিচ্ছে ধীরে ধীরে।

কথা তা হলে কিছু কাকলিকেই বলতে হয়। সন্ধে হয়ে গেল, এখন কি কিছু ভালো করে দেখা যাবে—এমনি ধরনের মামুলি কিছু। কিংবা কতক্ষণের পথ? নেভেল-ক্রসিং পড়ে নাকি? জায়গাটা কি বড় রাস্তার ধারেই, নাকি গাঁয়ের মধ্যে?

কতক্ষণ চলবে এমনি একটানা? এই নিঃশব্দতার জলস্রোত?

ড্রাইভারকে একটা রেস্টোর্যান্টের নাম করল বরেন।

‘ওখানে কী?’ কাকলি চমকে উঠল।

‘ওখানে থাওয়া। ওখানে কিছু খেয়ে নেব দু-জনে।’ বরেনের গলায় কেমন যেন প্রভুত্বের স্বর।

কী হল বরেনের? আগে হলে একটি বা মিনিতির স্বর রাখত। বলত, চলো না কোথাও দু-জনে থাই গে। কিংবা অস্থমতি চাইত, যাবে অমুক রেস্টোর্যান্টে? খাবে কিছু? আজ যেন ওর নিজের ইচ্ছেই স্বপ্রধান। কাকলির সম্মতির কোনো প্রয়োজন আছে এ যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

তবু কাকলি প্রতিবাদ করে উঠল : ‘না, না, আমি কিছু খাব না। আমার একটুও খিদে নেই।’

নিম্পৃহের মত হাসল বরেন : ‘তোমার খিদে নেই বলে জগৎসংসারে আর কারুরই খিদে থাকবে না এতটা ভাবা ঠিক হবে না। তোমাদের বাড়িতে যে গিয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলে? দিয়েছিলে খেতে?’

‘ও মা, ছি ছি, সত্যি, বলেন নি কেন?’ আত্মধিকারের স্বর তুলল কাকলি : ‘আপনার খিদে পেয়েছে জানলে মা ককখনো আপনাকে ছেড়ে দিতেন না।’

‘মাকে টানো কেন? তুমি হলে কী করতে? কী করতে সত্যি-সত্যি?’

‘আমি হলেও ছাড়তাম না ককখনো। পেট ভরে খাইয়ে দিতাম।’ সরলতার চবি হয়ে কাকলি বললে।

‘ককখনো না। তোমার যা স্বভাব, তুমি শুধু বসিয়ে রাখতে। টালমাটাল করতে।’

‘আপনি তখন বাইরে বেরুবার এমন এক রব তুললেন—’

‘না তুলে উপায় কী। দেখলাম, বসে থেকে চেয়ে-চিন্তে পাওয়া যাবে না। নিজের বাহর জোরে ভাঁড়ার লুট করে ছিনিয়ে নিতে হবে। যারা লুটেরা, যারা ডাকাত, তারাই রব তোলে, জানান দেয়—’

গহনে একটা ইঙ্গিত রেখেছে এ বেশ বুঝতে পারছে কাকলি, তবু সংকীর্ণ অপেক্ষে উদরের দিকে একেবারেই দৃষ্টি নেই এ নাও হতে পারে। কে জানে সত্যিই হয়তো খিদে পেয়েছে বরেনের। আর আত্মীয়-পরিচিতের খিদের কথা শুনলে কোন মেয়ে না কোমল হয়।

‘বেশ, যেতে চান, চলুন।’ কাকলি বললে, ‘আপনি কিন্তু একা-একা থাকেন। আমি বসে বসে দেখব।’

‘জগৎসংসারে তেমন যদি কোনো ব্যবস্থা থাকে, তবে তাই হবে।’ বরেন বললে উদাসীনের মত।

রেটোর্যাণ্টে ঢুকে সবিস্তার অর্ডার দিল বরেন। আর, সবই দু-জনের মত।

‘এ কী, রাত্রে খাওয়াই সেরে নিচ্ছেন নাকি?’

‘না, আরম্ভ করছি।’ বরেন তাকাল কাকলির দিকে : ‘আমার খিদে কি এতটুকু? আমার বাসনা কি শুধু বাসনে ধরবার?’

তবু কাকলি এগোয় না।

বরেন বললে, ‘উপস্থিত খাণ্ডকে অশ্রদ্ধা করতে নেই।’

‘খাণ্ডের মূল্য শুধু খিদের প্রেরণায়।’ কাকলি বললে, ‘খিদে না থাকলে স্নাত্তও বিষ হয়ে ওঠে।’

‘বলা যায় না। কখন আবার খেতে-খেতে খিদে পায়। অভ্যাস থেকে অহুরণ আসে। তখন আগে যা মনে হয়েছিল বিষ তাই অমৃত মনে হয়।’

একটু বৃষ্টি বা হাত লাগাতে হয় কাকলিকে। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়। তা না হলে তাড়াতাড়ি করবে না বরেন। বসে বসে স্নাত্তটাকে শুধু লগা করবে। রাত করে ফেলবে। ফিরতে দেরি করিয়ে দেবে কাকলির।

‘নিন, আমিও খাচ্ছি।’

‘হ্যাঁ, কী যেন বলেছে—ক্ষয় টুমরো উই ডাই।’

‘টুমরো? হাতে খানিকটা সময় রেখেছে বুদ্ধিমান।’ হাসল কাকলি : ‘স্বভাব

কথাই যখন ভাবছে তখন আগামী কাল কেন, হোয়াই নট টু-নাইট, দি নেক্সট মোমেন্ট ?’

কাকলির মুখের এতগুলো শব্দের মধ্যে থেকে ‘টু-নাইট’ কথাটা লুফে নিল বরেন। দীপ্ত কণ্ঠে বলল, ‘টু-নাইট ? আজকের রাত কি মরণের রাত ? আজকের রাত বরেনের রাত।’ বলে হেসে উঠল শব্দ করে।

তবু ভড়কাল না কাকলি। বললে, ‘তার আগে বরণের রাত আসা উচিত।’

‘ও কিছু নয়। কোনো ব্যবধান নেই দুই রাতে ! ওরা একই রাত, একাত্ম। বরেনের মধ্যেই বরণ আছে লুকিয়ে। আর এ-কারটা একত্র হবার এ-কার।’ ফেলে ছাড়িয়ে উঠে পড়ল বরেন। উচ্ছল হাতে বিল চুকোল।

পথে নেমে কাকলি বললে, ‘এখন তো দিব্যি রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে কী দেখব !’

‘দেখা কি আর পায়ে হেঁটে ঘুরে-ঘুরে দেখা ? একটা আইডিয়া নেওয়া। চলো। গটো।’ তাড়া দিল বরেন।

‘আরেক দিন গেলে হয় না ?’ করুণ মুখ করল কাকলি।

‘আবার আরেক দিন ?’ প্রায় তিরস্কারের মত করে বললে বরেন, ‘কথায় বলে আজকের ডিম কালকের মুরগির চেয়ে বেশি দামি। তা ছাড়া তুমি তো মাঠঘাট দেখছ না, দেখছ আমার চালাঘর। দেখবে চलो পছন্দ হয় কিনা।’

ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে এটা ভাবতেও ভালো লাগছে না কাকলির। আর বাড়ি যেতে হলেও তো এই বরেনের গাড়িতেই যেতে হবে। মিছিমিছি তবে এখুনি পেছুই কেন ?

‘চলুন।’ দৃঢ় ভঙ্গি করেই কাকলি উঠল গাড়িতে।

হাতে জলস্ত সিগারেট, বরেন বললে, ‘চেঞ্জে যেতে চাইছিলে না ?’

‘হ্যাঁ, একটু চেঞ্জ একরকম মন্দ হত না। বহুদিন এক জায়গায়, এক ভাবে আছি—’

‘চেঞ্জে একাই যেতে ?’

‘কেন, আপনি যেতেন ? বা, তা হলে তো ভালোই হত। আমার খরচ বেঁচে যেত। এখন বলতে আর কী দোষ, বললে কাকলি।

‘সত্যি বলছ ?’

‘বা, এখুনি চলুন না বাড়ি। পরামর্শ করে জায়গা, যাবার তারিখ, থাকবার হোটেল না ঘর—যা হয় সব ঠিক করে ফেলি।’ চতুর চোখে হাসল কাকলি।

‘তা এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই দু-জনেই যাচ্ছি। সেই চেঞ্জই হচ্ছে। জায়গাটার আর কিছু না থাক দুটো স্বাস্থ্যকর সম্পদ আছে—এক নির্জনতা, আরেক অন্ধকার।’

‘অন্ধকার?’ গা কেমন ছমছম করে উঠল কাকলির।

‘অন্ধকার মানে দোকান-বাজার লোকালয় নেই ধারে-কাছে। বাস-ট্রাক-মোটর যায় অনেক দূর দিয়ে। তাই শব্দ-টক্কর বিশেষ শোনা যায় না। চেঞ্জের পক্ষে আইডিয়াল জায়গা। মাঝরাতের কাছাকাছি একটা ট্রেন যায় বটে পাশ দিয়ে, যদি জেগে থাকো, এঞ্জিনের সিটিটা ঝাঁশির মতই মিষ্টি লাগবে। তবে, মাঠের মধ্যে ঘুম এমন গভীর হবে যে সিটিটা শুনতেই পাবে না। আর শেষ রাতের দিকে হঠাৎ যদি ঘুম ভেঙে যায় তখন মনে মনোরম একটি দ্বিধা জাগবে ট্রেনটা আমাকে না জানিয়েই চলে গেল নাকি, নাকি এখনো যায় নি। আর সেই দ্বিধার মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু ভোরবেলা?’ জয়ে, আনন্দে বরেন শিশুর মত হয়ে গিয়েছে: ‘ভোরবেলা মানে সূর্য ওঠবার অনেক আগে থেকেই গাছ-ভর্তি শুনতে পাবে পাখিদের পাখা-ঝাপটানি, তারপরই ডাক—মনে হবে এ যেন শব্দ নয়, এ রঙ ফুটেছে, নীল, সবুজ, হলদে—’

‘রাতে মাঝে মাঝে থাকেন বুঝি ওখানে?’ কাকলির নিজের স্বর নিজেরই কানে মুহু শোনা।

‘কোনোদিন থাকি নি এ পর্যন্ত। তবে থাকলে ওরকমই মনে হবে অসুস্থ করতে পারছি। স্তব্ধতা বুঝতেই পারছ, চেঞ্জের পক্ষে খুব ভালো জায়গা। তোমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে বলছিলে না?’ ঠিক পাশেই না পেয়ে কাকলির কোলের থেকে একটা হাত কুড়িয়ে নিল বরেন: ‘কেন, কী হয়েছে, কিসে খারাপ বুঝছ?’

কাকলি নিজেই টের পেল তার যে হাতে গোড়ায় প্রবোধের ভঙ্গি ছিল এখন সে হাতে অলক্ষ্যে একটা প্রতিরোধের ভঙ্গি ফুটেছে। বললে, ‘কোথায় কোন স্নায়ুতে স্নায়ু ছন্দপতন চলেছে বোঝে কার সাধ্য? আর তারই জন্তে সমস্ত শরীর মন্থর, বিষন্ন।’

‘ও কিছু নয়, একটা মানসিক অসাম্য।’ কাকলির কাঠ-কষ্ট হাতটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিল বরেন: ‘দু-চার দিন অমনি নিরিবিলিতে থাকতে পারলেই শরীর ভালো হয়ে যাবে। ঝরঝরে হয়ে যাবে।’

‘চলুন দেখে আসি।’ একটা ফিরে আসার পথ রাখতে চাইল কাকলি।

যতই দূর ভেবে ঝাপসা-ঝাপসা ভয় পেয়েছিল কাকলি তেমন কিছু দুর্গম নয়।

শহর পেরিয়ে খানিকটা শহরতলি, আর শহরতলিতে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ সায়ে বাঁক নিয়ে ফাঁকা গলি পথে ঢুকে একমাঠ অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটা ঘর।

হর্নে হেড-লাইটে জানান দিতেই পাশের চালা থেকে মালী বেরিয়ে দরজার তালা খুলে দিল। ইলেকট্রিক কনেকশান আছে। আলো জ্বালাল বরেন। কাকলির উদ্দেশে বললে, ‘এসো।’

মেঝে-দেয়াল পাকা, বাংলা ধাঁচের ছোট ঘর, চাল টালি না আসবেসটোস কে জানে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই তাক লেগে গেল কাকলির। সামনে একফালি একটা বায়ান্দা, বেত-বাঁশের তৈরি হালকা কটা বসবার চেয়ার, তা পেরিয়ে ভিতরে ঘরে প্রকাণ্ড খাট পাতা, তাতে ঢালাও বিছানা করা। নেটের মশারির কোণটুকু থেকে শুরু করে বালিশের অড়ের কুঁচিটুকু পর্যন্ত নিখুঁত। এক স্তূপ বালিশ—মাথায়, বুকে, পায়ে, পাশে, পিঠে, যখন ঘেরকম দরকার, এলাহি ব্যবস্থা। চুধের ফেনার মত শাদার শতদল।

কাকলির ভারি লোভ হল বিছানা দেখে। ইচ্ছে করল হাত পা ছড়িয়ে চতাকার হয়ে শুয়ে পড়ে। হাত পা ছুঁড়ে বালিশের জঞ্জাল দূর করে দিয়ে বিছানাটাকে নিৰ্বাণ্ট করে নিয়ে ঘুমোয়। কত দিন এমনি দিলদরিয়া দরাজে বিছানায় শোয় নি, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত ভ্রমণ করতে করতে ঘুমোয় নি নিশ্চিন্ত হয়ে। না, তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল একবার কাকলি, না, বেড-হুইচ নেই, তা হলে তো আরো নির্বাধ আরো উদাস্ত। কী আশ্চর্য, কোনো একাকী মেয়েরই যেন এত বড় বিছানা হতে নেই জীবনে। ক্লশ শরীরটাকে ক্লশ একটা শয্যার পরিমিতিতে আটকে রেখেছে চিরদিন। এত বড় এক বিছানা রাখাই একটা সন্দেহকে বিস্তৃত করে রাখা। অতথানি শূন্যতা আবৃত করে রাখবার মত কার অত দুঃসাহস!

নিজের মনেই হাসল কাকলি। এ বাড়িঘর তার নয়। বিছানাটা তার নয়। তার কিছুই জুঁম করবার নেই। তার পাঠ আজ পালন করবার। অহুগত থাকবার।

কিন্তু কী মজা হত যদি বরেন বলে কেউ না থাকত দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকার আর নিঃশব্দতা আর এই অচেল বিছানা তার যদি একলার হত! তবে পেরু থেকে কামস্কাটকা কী অঘোর ঘুমোত আজ কাকলি।

‘এই দেখ এপাশে খাবার ঘর।’ বরেন গর্বের ভঙ্গিতে দেখাতে লাগল : ‘আর এই বাথরুম।’

টবে-ড্রামে জল টলমল করছে, তোয়ালে সাবান আনকোরা, আরো অনেক সব টুকিটাকি। যদি ঘুমুতে যাবার আগে স্নান করবার রেওয়াজ থাকে, গা ভাসিয়ে সিন্ধু হতে পারো।

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল বরেন। হাত দিয়ে একটা ঘের দিল শূন্যে। বললে, ‘এই সমস্ত জমিটাই এ বাড়ির লগ্ন। মানে আমার জমি। মানে,’ হাসল বরেন : ‘ফার্মের জমি।’

‘ঐ চালাঘরটা?’

‘ওটাও আমারই মধ্যে। ওখানে মালী থাকে। বাড়ি-জমির তদারক করে। কী এক্সপার্ট দেখেছ, কেমন সুন্দর ঝকঝকে তকতকে করে রেখেছে।’

‘নাম কী?’ কী জানি কী মনে হল কাকলির, নামটা জেনে রাখা ভালো।

‘নাম জানি না। মালী বলেই ডাকি।’ বরেন তাকাল বাইরে : ‘চালাটা ছোট। তাই পরিবার আনতে পারে নি। আর সবচেয়ে অসুবিধে, গারাজ করতে পারি নি এখনো। যার থেকে সম্পত্তিটা কিনি তার গারাজ ছিল না। তাই এই বিপদ—’

‘মালীর পরিবার থাকলে বেশ হত, গল্প করা যেত।’

কথাটা বরেন কানেও নিল না। বললে, ‘তাই সবীগ্রে একটা গারাজ করতে হবে। ভাবছি তোমাকে এবার একটা নতুন মোটর কিনে দেব।’

‘আমাকে?’ হাসল কাকলি : ‘আর সেই গাড়ি আমি চালাব?’

‘চালালে ক্ষতি কী!’

‘এক নাগাড়ে পথে চাপা দিতে দিতে এগোব, বলছেন, ক্ষতি কী!’

‘কিছু লোক তো চাপা পড়ে মরবেই।’

‘মরবেই?’

‘হ্যাঁ, এখন তো শুধু দুই কারণে মানুষের মৃত্যু হবে। এক গাড়িচাপা পড়ে, দুই থ্রুসিস হয়ে। ডাক্তারদের পসার শেষ। কেউ আর তাদের ডাকবার সময়ই দেবে না। পড়বে আর মরবে।’

বেশ হাওয়া আসছে। এই হাওয়াটুকুর মতই লঘু স্বরটুকু বজায় থাকে কথাবার্তায় এই সর্বক্ষণ এখন চাইছে কাকলি। কিন্তু তা বুঝি হবার নয়।

আবার ঘরের মধ্যে চলে এল বরেন।

বললে, ‘দেখছ চারদিকে কেমন অন্ধকার!’

‘হ্যাঁ, সাংঘাতিক। চাঁচালে কেউ শুনতে পাবে এমন মনে হয় না।’

‘আর কিরকম নিঝুম। টু” শব্দটি কোথাও নেই।’ বরেন বললে তন্নয় হয়ে,
‘কলকাতার ঘড়িতে এখন আটটা, কিন্তু এখানে এখন নিশ্চিতি রাত।’

‘সত্যি মনে হচ্ছে যেন কোন স্তম্ভর বিদেশে এসেছি।’

ঘরে ফ্যান ঘুরছে, তবু হঠাৎ, দুই টানে টেনিস শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল
বরেন। অবশেষ গেঞ্জিটাও খুলে ফেলা যায় কিনা ভাবতে ভাবতে বললে, ‘এ কী,
দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো। নাকি বারান্দায় বসবে?’

ঘরের মধ্যে বিছানারই অদূরে কতকগুলি চেয়ার পাতা আছে, তারই একটা
বেছে নিয়ে বসল বরেন। হাত দিয়ে তুলে কাকলিরই কাছে দিল একটা এগিয়ে।

কাকলি বসল না। বললে, ‘সবই তো স্তম্ভর দেখা হল। এবার চলুন ফিরে
যাই।’

বরেন বললে, ‘আজকে আর ফিরে যাওয়া নেই। আজকের রাতটা আমরা এখানে
কাটাব।’

‘আমরা?’

‘হ্যাঁ, আমি আর তুমি।’

‘সে কী?’

‘এতে আর অবাক হবার কী আছে?’

‘বা, বাড়িতে ভাববে না?’

‘না। তোমার মাকে বলে এসেছি।’

‘মাকে কখন বললেন?’

‘ঐ যে গাড়িতে উঠতে যাবার আগে ভিতরে গেলাম—’

‘মিথ্যে কথা।’ কাকলি ক্রুখে উঠল : ‘কোনো মাকে বলা যায়, আপনার মেয়েকে
নিয়ে বাইরে রাত কাটাতে চললুম? অসম্ভব।’

‘তা হলে কী বলা যায়?’ সিগারেট ধরাল বরেন।

‘বড় জোর বলা যায়, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হতে পারে, আপনারা
ভাববেন না।’

‘বেশ তো, তা হলে ঐটুকুই বলেছি। তা এখনো দেরি তো কিছু হয় নি।’
হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল বরেন : ‘স্বতরাং অনায়াসে আরো কতক্ষণ বসে যেতে
পারি। চাই কি, এক চমক ঘুমিয়েও নিতে পারি দু-জনে।’

‘আপনি ঘুমান। আমি বসে আছি চেয়ারে।’ কাকলি একটা চেয়ার টেনে
নিয়ে বসল।

নিজের চেয়ারটা কাকলির মুখোমুখি ঘুরিয়ে নিল বরেন। বললে, ‘খুব ইচ্ছে ছিল বিয়ের প্রথম রাতটা দু-জনে এখানে কাটা’ব।’

‘তা কাটাবেন।’

‘ম্যারেজ অফিসারের সামনে পাকা দলিল সই করে দু-জনে সটান চলে আসব এখানে। যেদিন খুশি, সন্দেশসজ্জি। খাওয়া-দাওয়া আগেভাগে সেয়ে নেব হোটেল। ঠিক আজকের মত। তারপর ঘরে ঢুকে সেই যে দরজায় খিল দেব—’বরেন উঠে দরজায় খিল দিল।

ছটফট করে উঠল কাকলি। আত্মমুখে বললে, ‘বা, সেই রাতটা আগে আত্মক।’

বরেন ফের চেয়ারে এসে বসল : ‘সেই রাতটাই তো এসেছে।’

‘আজকে কি আমাদের বিয়ের রাত? আমাদের বিয়ে কি হয়েছে বলতে চান?’

‘বিয়ের আর বাকি কি। নোটিশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। কী একটা অবজেকশন পড়েছিল তাও গিয়েছে বাতিল হয়ে। এখন শুধু একদিন—তাও যত শিগগির সম্ভব—নোটিশের মান রাখতে হলে তার তিন মাসের মধ্যে—আর সে হিসেবে আজ থেকে দিন পনেরো কুড়ি মোটে আছে—ম্যারেজ অফিসারের কাছে গিয়ে সাক্ষী রেখে ডিক্লারেশন ফর্মটা সই করে দিয়ে আসা। আর চং করে মন্ত্র উচ্চারণ করা—আশ্চর্য, সেখানেও মন্ত্র—আমার বলা, তোমাকে নিচ্ছি আমি আমার বৈধ স্ত্রীরূপে, আর তোমার বলা, তুমি নিচ্ছি আমাকে বৈধ স্বামীরূপে—বাস, তা হলেই পূর্ণ স্বরাজ—’

ডুবন্ত লোকের কুটো ধরার মত বললে কাকলি, ‘তা তো এখনো বাকি।’

‘সে কাল পরশু তরশু—ঐ বাকি মেয়েদের মধ্যে—যে কোনোদিন হতে পারে। তারিখ পেরিয়ে যায়, ব্যাক-ডেট করে নেওয়া যায় ঘুষ দিয়ে। নিতান্ত একটা কাগজে ব্যাপার। আসল ছুটো হার্ডল—নোটিশ আর তার অবজেকশন—তা নির্বিয়ে পাব হয়ে গিয়েছে—’

‘সেটুকু এখানো বাকি আছে, ঐ সই আর মন্ত্র, যাকে আপনি কাগজে ব্যাপার বলেছেন—যা না হলে বিয়েটা সম্পূর্ণ হবে না—সেটুকু আগে হয়ে যাক।’ কাকলিরই কানে দুর্বল ছলনার মত শোনা’ল বুঝি কথাটা।

‘সেটুকু আর আগে হবে না। আমি জানি তুমি গড়িমসি করবে। পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যেতে চাইবে। সে আর হতে দিতে আমি প্রস্তুত নই। বরং আমি জানি যদি এ রাত তোমার সঙ্গে এখানে কাটিয়ে যেতে পারি তা হলেই তোমার ঐ সইয়ে আর মন্ত্রে চাড় আসবে! তখনই তুমি দলিলে ঢাকতে চাইবে নিজেকে।’ বরেন উঠে

দাড়া, উদ্ধত ও নিঃশব্দ : ‘আর যদি অল্প রাতেই বাড়ি ফিরতে চাও তাতেও আমার আপত্তি নেই।’ বলে বরেন সহসা স্নাইচ অফ করে অন্ধকার করে দিল।

অন্ধকারের প্রথম প্রতিক্রিয়া একটা ক্ষীণ আর্তনাদ বেরুতে চাইল কাকলির থেকে। কিন্তু কাকলি সেটাকে হাসিতে বদলিয়ে দিল। বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপের জগ্রে প্রতীক্ষা না করেই হেসে উঠল। বললে, ‘ও কী, অন্ধকার করছেন কেন? যা আনন্দের তা কি চোখ দিয়ে একটুও দেখবার নয়?’

বরেনের পরবর্তী পদক্ষেপে দ্বিধা এল।

কাকলি বললে, ‘আলো জ্বালান। আপনার সঙ্গে আমার আরো অনেক কথা আছে।’

বরেন স্নাইচটা অন করল।

‘কী কথা?’ এক পা এগুল বরেন।

‘ভুলুন। বসুন শান্ত হয়ে।’ চেষ্টা করে ক্ষীণ রেখায় হাসল কাকলি।

‘বেশ। বসলাম।’ চেয়ারটা বরণ আরো কাছে টেনে নিয়ে বরেন বসল।

‘অস্থির হবেন না।’ যেন শোকার্তকে সারহীন সান্ত্বনা দিচ্ছে ‘কাকলির নিজের কানেই এমনি বাজে শোনাল।

‘না, না, আমি খুব স্থির।’

—‘স্থির?’

‘হ্যাঁ, সংকল্পে স্থির। আমার প্রাপ্য আমি আজ কিছুতেই ছেড়ে দেব না।’

‘প্রাপ্য?’ রুক্ষ হবার মত সাহস নেই, করুণ রেখায় আবার হাসল কাকলি।

‘এক শো বার প্রাপ্য। আদালত তাই সাব্যস্ত করে দিয়েছে।’

‘বা, আদালত আবার কী সাব্যস্ত করল?’ কাকলি অবাধ হবার ভাব করল। যতটা সাধ্য দীর্ঘ করা যাক কথাবার্তা। যদি দীর্ঘ করলে ইতিমধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক জুটে যায়।

‘স্বাকামো কোরো না।’ ধমকে উঠল বরেন : ‘আদালত বলে দিয়েছে তুমি আমার। গায়ে না হোক অন্তত অগায়ে। স্মরণ—’

‘আদালত কি ওভাবে কিছু বলেছে?’ চোখের দৃষ্টিটাকেও একটু দীর্ঘ করল কাকলি।

‘ভাব যাই হোক, বলে দিয়েছে তুমি আমার সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত।’ বরেন চেয়ারে হেলান দিতে চাইল, পারল না : ‘ও কথার শুধু একটা মাত্রই মানে। স্মরণ—’

কাকলি এবার চোখেও হাসল। বললে, ‘মোটাই নয়। ব্যভিচার কথাটার একাধিক মানে। যে কোনো অশ্লীলচরণই ব্যভিচার।’

‘রাখো।’ আবার ধমকে উঠল বরেন : ‘কথাটা বাঙলা নয়, কথাটা ইংরিজি। অ্যাডালটারি। ও কথাটার একটিমাত্রই মানে। সেই লিভিং ইন অ্যাডালটারি। স্বতরাং আমার সঙ্গে রাত কাটালে তোমাকে এমন কিছু যোগদ্রষ্ট দেখাবে না। তুমি যদি আদালতেও যাও, আদালত বলবে, বা, এতে আবার নালিশ কী, এ তো জানা কথা। এ তো ঠিকই হয়েছে, এরকমই তো হবে, হওয়া উচিত।’

‘আদালত তার নিজের বুদ্ধিতে কী বলবে তাই মেনে নিতে হবে?’ কাকলি আবার একটু গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

‘নিশ্চয় নিতে হবে। আদালত যে ভিত্তিসেঁঁর ডিক্রি দিয়েছে তা মেনে নাও নি?’ মুখিয়ে উঠল বরেন : ‘তা যদি নিয়ে থাকো তবে যে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সেই ডিক্রি তাকেও মানতে হবে।’ চেয়ারটা আরো একটু কাছে, পাশে, টেনে এনে বরেন কাকলির একটা হাত মুঠো করে চেপে ধরল : ‘স্বতরাং ওঠো, চলো!’—

‘আদালতের বিচারে কি ভুল হয় না?’ হাসি-হাসি মুখ করল বটে কাকলি, কিন্তু কান্না-কান্না শোনা।

‘না, কী করে হবে! সেই আদালতের বিচার তোমার নিজের স্বীকৃতিতে। তা তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন? স্বতরাং এসো।’ হাত ধরে টানল বরেন : ‘আর তোমার এখন ফিরে যাবার পথ নেই।’

‘তার মানে বলতে চান আদালতের মান রাখতে এখন প্রাণ দেব?’

‘শুধু প্রাণটুকুই দেবে না, আর বাকি সমস্ত কিছু দেবে।’

‘কিন্তু,’ হাতটা ধীরে ছাড়িয়ে নিল কাকলি, ‘আদালতের বিচার যাই হোক, আপনার বিচারে ভুল থাকে কেন?’

‘ভুল?’

‘হ্যাঁ, ভুল বৈকি। আদালতের মামলায় আমার না হয় সম্মতি ছিল কিন্তু আপনার এ বর্তমান মামলায় আমার বিন্দুমাত্র সম্মতি নেই।’ একটু বা কঠোর শোনা। কাকলিকে : ‘স্বতরাং সে ক্ষেত্রে—’

‘তোমার সম্মতি-অসম্মতি অবাস্তব।’ উঠে দাঁড়াল বরেন, কাকলির কাঁধের উপর দৃষ্ট হাত রাখল, বললে, ‘ওঠো। নয়তো জোর করে, কোলে করে তুলে নিয়ে যাব।’

মূর্তি দেখে ভয় পেল কাকলি। বহুতায় বিশাল দেখাচ্ছে বরেনকে। উদগ্র

উদ্ধৃত। অপ্রতিবার্য। খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়া ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত। হয়তো বা বঞ্চিত বলে আহত বলে বেশি ক্রুদ্ধ।

কিন্তু এখন কাকলি কী করবে? কী করতে পারে?

কাঁদবে? যেমন করে নিপীড়িতারা কাঁদে? নাকি পায়ে পড়ে মিনতি করবে? যেমন করে অসহায়ারা ভিক্ষে চায়?

ভাবতেও সমস্ত শরীর যি-রি করে উঠল কাকলির।

নইলে কি চৈঁচাবে? চৈঁচিয়ে লোক ভাকবে? কে কোথায় আছে আমাদের বাঁচাও, এই বলে রব তুলবে? নয়তো, চোর, চোর, ~~জু~~জু, ডাকাত, ডাকাত—এমনি একটা ঢালা চিংকার?

এ আরো লজ্জাকর।

তা ছাড়া মিনতিতে ভিজবে বা কান্নায় গলবে বরেনের এই এখন চেহারাই নয়। বরং ঐ বিগলিত ভঙ্গিতে তার স্ববিধে-স্বযোগ আরো বেড়ে যাবে। আর চৈঁচিয়েই আন্ত কোনো ফল হবে এমন মনে হয় না। গলার পর্দা কত উচুতে তুলতে পারবে? টেজে রিহার্সেল দেওয়া থাকলে বরং সহজ ছিল। আর স্বর উচ্চগ্রামে তুলতে পারলেও বা শুনছে কে? যারা আশেপাশে আছে, মালী বা ড্রাইভার, তাদের কানে যদি আওয়াজ ঢোকেও, শুনেও শুনবে না। তা ছাড়া এখন বুঝি জোরে হাওয়া দিয়েছে বাইরে। ঝোড়ো হাওয়া। বৃষ্টি-বৃষ্টি আকাশ, কে কার অর্তনাদ শোনবার জন্তে কান পেতে আছে?

নখে-দাঁতে লড়তে পারে অবশিষ্ট। তা না হয় লড়ল। কিন্তু ঘেরকম ভয়ানক দেখতে হয়েছে বরেনকে, শারীরিক শক্তিতে ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে এমন ভরসা হয় না। শেষ পর্যন্ত নিরস্ত্র তো করতে পারবেই না, মাঝখানে নিজে জখম হবে, প্রকাশে মুখে-গালে রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন হয়ে বেড়াবে—সে আরেক কলঙ্ক, দ্বিগুণ কলঙ্ক। হাতহাতি ঝটাপটি শুরু হলে শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে উঠবে বরেন, আর যেমন দুর্বীর তার মূর্তি, কোনো কিছুতেই সে পেছপা হবে না। যে মুহূর্তে সে সন্দেহ করেছে কাকলির সরে পড়ার মতলব সে মুহূর্তে সে হঠকারিতার তুঙ্গে এসে উঠেছে। চাই কি, গলা টিপে মেরেও ফেলতে পারে। অতদূর না যাক, মাঝামাঝি আঘাত করতে কল্প করবে না।

তবে উপায় কী?

এখানে এসেছে বলে অত্মতাপ হচ্ছে কাকলির। ঘটনা এমন একটা বিলম্ব চেহারা নেবে আঁচ করতে পারে নি। বাধা সরে যাওয়া সঙ্গেও বিয়ে পিছিয়ে দিতে

চাইছে এতে খুব বেশি ক্ষুণ্ণ না হয় তারই জন্তে বরেনকে প্রশস্ত সঙ্গ দেবার খাতিরে ফার্ম দেখতে রাজি হয়েছিল। ভাবে নি আজই, একুনি-একুনি, এমনি উদ্দাম হয়ে উঠবে। এমনি একটা বিপন্নয় মুহূর্ত না আসে তারই জন্তে সজাগ থাকতে-থাকতে কখন একটু হঠাৎ শিথিল হয়ে পড়েছিল, আর তারই জন্তে এই লাহুনা।

এখন করে কী কাকলি ?

চারিদিক আর্ত চোখে তাকাল নিঃশ্বের মত। কোনো পথ নেই, উপায় নেই। রাজিই বোধ হয় হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

‘শেষকালে গায়ের জোর দেখাবেন ?’ করুণ চোখে তাকাল কাকলি।

‘হ্যাঁ, তাই তো দেখাব। গায়ের জোর ছাড়া আমার আর কী আছে ! এখন তো একমাত্র গায়ের জোরেই আমি পুরুষ তোমার কাছে।’

‘কিন্তু গায়ের জোর কি সম্ভাস্ত ?

‘সম্ভাস্ত হবার মত বোকা আর আমি নই। গায়ে যে এখনো গেঞ্জিটা আছে এই যথেষ্ট। একটানে এটাও খুলে ফেলব। শোনো,’ কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বরেন দাঁড়ান মুখোমুখি : ‘যে অ্যাডালটারার সে আবার সম্ভাস্ত কবে ?’

‘ভিক্রি হয়ে যাবার পর আর অ্যাডালটারি কোথায় ?’ কাকলি আবার হাসিমুখ করল : ‘বিয়েই যেখানে নাকচ হয়ে গেল সেখানে আর অ্যাডালটারির অবকাশ নেই। সেখানে অ্যাডালটারিও নাকচ হয়ে গেল। স্ততরাং—’

‘তোমার ওসব স্কন্ধ তর্কে আমি আর ভুলতে রাজি নই। নাও, ওঠো।’ বরেন আরো ঘেঁষে এল : ‘অ্যাডালটারির কেস আর না থাক, বিয়ের কেসটা তো আছে। তুমি নিজের হাতে নোটিশে সহ করে দিয়েছ। কি, সেটা তোমার সম্মতি-দলিল নয় ? বর্তমান মামলায় তোমার সম্মতি নেই, তোমার এ কথা আর খাটে না।’

‘বা, বিয়ের মত তো আমার আছেই। তাই বলে বিয়েটা ঘটবার আগেই—’

‘রাখো।’ হুমকে উঠল বরেন : ‘তোমার আর কোনো ছলনাতে আমি ভুলছি না। আমার জাতও যাবে পেটও ভরবে না, এ অসম্ভব। বদনাম কিনব অথচ বিয়ে দিয়ে চাকতে পারব না, দুই ইনিংসেই আমি গোলা খাব—এ সম্বন্ধে বাইরে ! স্ততরাং—’ বরেন বাহ ধরল কাকলির।

‘ম্লিজ—’ মিনতি মাথানো সজল চোখে বললে কাকলি।

‘ওসব পুরোনো হয়ে গিয়েছে।’ জোরে কাকলিকে আকর্ষণ করল বরেন : ‘স্বাভাবিক করে লাভ নেই। ওঠো, চলো।’

‘কোথায় যাব ?’ উঠে পড়ল কাকলি।

‘ঘুমুতে চলো।’

কাকলি ফের বসল চেয়ারে। গভীর হয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, ‘এ হয় না।’

‘এক শো বার হয়।’ বরেন এবার দুই বাছ ধরে সবলে কাকলিকে দাঁড় করিয়ে
।

‘আমি যেখানে ‘না’ বলছি আপনি সেখানে পাশবিক জোর দেখাবেন?’

‘পাশবিক জোর আছেই তো দেখাবার জন্তে!’

‘তা হলে আপনি আমাকে ভালবাসেন নি একটুও?’

‘যেন তুমিই আমাকে বেসেছ! শোনো,’ বরেন আরো নিবিড়ে আকর্ষণ করতে
হল কাকলিকে: ‘তোমার সকল স্রবিধে একে-একে আদায় করে নিয়ে তুমি সরে
ডবে, আর আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব এ ভালো-বাসায় আর বিশ্বাস
নই।’

‘তবে এখন কিসে বিশ্বাস?’

‘এখন বিশ্বাস শুধু পৌঁকবে। পাশবিকতায়।’ বরেন কাকলিকে আলিঙ্গন করে
হল।

চোখে অন্ধকার দেখল কাকলি। অগুভব করল শরীরে এমন শক্তি নেই যে
ধর্ম বরেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে মাটিতে। গলায় এক তন্তু আওয়াজ আনতে
।

উপায় নেই। রাজিই হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

‘বাবাঃ, তুমি কী জ্বরদন্ত! কিছুতেই ছেড়ে দেবে না।’ লোলকটাক্ষে তাকাল
কলি: ‘সাদ্য কী তোমার কাছে হার না মানি। সব না দিয়ে দিই তোমাকে।’

সস্তাষণের মদিরতায় অভিভূত হয়ে গেল বরেন। গদগদ স্বরে বললে, ‘তবে—’

‘যাও শোও গে,’ স্থির নিষ্কম্প স্বরে বললে কাকলি, ‘আমি ওখান থেকে একটু
আসছি।’

‘কোনখান থেকে?’

‘আহা—বাথরুম থেকে!’

‘বরেন ছেড়ে দিল আলিঙ্গন। আর তক্ষুনি স্রবিত পায়ে কাকলি ঢুকে পড়ল
ধরুমে। দরজায় ছিটকিনি দিল।

গভীর করে নিশ্বাস ফেলল আরামের। আর তাকে পায় কে! দরজার ওপার
কে শত ধাক্কা দিলেও কিছুতেই খুলবে না কাকলি। একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করবে
যাতে বরেনের সন্দেহ হয় কাকলি ভয়ানক কিছু করেছে, হয়তো আত্মহত্যা

করেছে। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে বেশ তাকে ভাবতে হবে, জড়ো করতে হলে লোকজন, হয়তো বা খবর দিতে হবে পুলিশে। আর পুলিশের সামনে, লোকজনের সামনে দরজা ভাঙা হলে তার আর ভয় কী!

সমাধান আরো সহজ মনে হল। কাকলি দেখল বাইরের দিকে বাথরুমের একটা দরজা আছে। ঐ দরজা দিয়েই বোধ হয় মেথর আসে পরিষ্কার করতে।

ঐ দরজা খুলেই পালাবে কাকলি।

ড্রাইভারকে বললে তাকে বড় রাস্তায় পৌঁছে দেবে না? কিংবা বাসটার্মিনা কিংবা যতক্ষণ না নাগাল পাই একটা ট্যাক্সির?

কী বললে একা কাকলিকে নিয়ে ড্রাইভার গাড়ি চালাতে রাজি হবে তাও বুঝে একটু ভাবা দরকার।

সে পরে হবে। আসল হচ্ছে বেরিয়ে পড়া।

যদি ড্রাইভার রাজি নাও হয়, পায়ে হেঁটে, ছুটেই, এগোবে কাকলি। অন্ধকার পথ করে নেবে।

বাইরে নিশ্চয়ই বরেন আর তাকে তাড়া করবে না। আর যদি পিছু নেয়ও, পার না আয়ত্তে আনতে। হামলায় মাততে, হাত ধরে টানাটানি করতে। আর যদি বা পরিস্থিতি চলে আসে, সে অল্প ভূমিকায়, অল্প পরিবেশে। অন্তত ভক্তলোকের জামাকাপড়

টুক করে বাইরের দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়ল কাকলি। অন্ধকার, তবু গাড়ীর মধ্যেই ঘুমুচ্ছে ড্রাইভার।

‘এই। শোনো।’ কাকলি যতদূর সম্ভব আতঙ্কময় করল কণ্ঠস্বর।

চটকা ভেঙে উঠে পড়ল ড্রাইভার।

‘কাছাকাছি কোথাও একটা ডাক্তারখানা আছে?’ দরজা খুলে তড়িৎ নিজেই ভিতরে ঢুকে পড়ল কাকলি: ‘শিগগির। বাবুর একটা হার্ট-আট হয়েছে। বিছানায় খানিকক্ষণের জন্তে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি। ডাক্তারখানা পেলে ডাক্তারের হৃদিস পাওয়া যাবে নিশ্চয়। শিগগির।’

আচ্ছন্নের মধ্য থেকে কী বুঝল ড্রাইভার, গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হর্নও বুঝি দিতে হল কয়েকবার।

সন্দেহ কি, ধড়মড় করে উঠে পড়েছে বরেন। আর, যতই গাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া ততই বরেনকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, এ সহজ সত্য ভুলে গিয়ে নিঃশব্দে শিউরে উঠছে কাকলি, এই বুঝি বরেন তার পিছু নিল। ধরে ফেলল! আটকাল সামনে দাঁড়িয়ে।

‘ঐ ট্যাক্সিটা আসছে, ওটাকে আটকাও।’ চোঁচিয়ে উঠল কাকলি।

ট্যাক্সিটা দাঁড়াল।

গাড়ি ছেড়ে দিল কাকলি। ড্রাইভারকে বললে, ‘আমি এই ট্যাক্সি করেই ক্লার আনতে যাচ্ছি। তুমি ফিরে যাও গাড়ি নিয়ে। দেখ গিয়ে বাবুকে। এ য় বাবুর কাছে একজনের থাকার দরকার।’

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা মানেই একটা পাপের বিবর থেকে বেরিয়ে আসা। স্ত গা থেকে মালিগের শেষ পুরুটুকু মুছে ফেলা।

কিন্তু গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া বুঝি বুদ্ধিমানের কাজ হল না। গাড়িটা পেয়েই বরেন দ্রুততর অন্তরঙ্গের স্রোত পাবে। পথে ধরতে না পায় একেবারে কলিদের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হবে, হাজির হবে মায়ের প্রাণের খাসমহলে। জানে, কোথায় না জানি আছে শর্টকাট, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বরেন তার চেয়ে অনেক শি রপ্ত, ট্যাক্সির আগেই গিয়ে হাজির হবে। ট্যাক্সিকে সে তাদের পাড়া, খুব হলে দের রাস্তার নাম শুধু বলতে পারে। আর, ট্যাক্সিদের যা স্বভাব, ‘যতদূর সাধ্য টাকে দীর্ঘ করতে চাইবে, মুখ দিয়ে না খেয়ে নাক দিয়ে খাবে। তাই বাড়িতে আর আগে আর কোথাও যাওয়া যায় না? যাতে মার কাছে নালিশ করতে গিয়ে ন দেখে বাড়িতেও কাকলি ফেরে নি।

সেই ভালো। একটা অভিভাবকত্বের অধীনে আশ্রয় নিতে পারলে কাকলি আরো দ্রুত নিরাপত্তায় চলে আসে। তখন লড়াইয় ভূমিকা আর তার হাতে থাকে না। হাতে যায়, তার সামান্য সান্নিধ্যই তখন বোধ হয় বিরাট দুর্গের কাজ করে।

ট্যাক্সিওয়ালাকে স্বকাস্তের হোটেলের ঠিকানা বললে কাকলি।

হাতবড়িতে সময়টা এবার দেখে নিল। না, এমন কী রাত হয়েছে!

দোতলায় চলে এল কাকলি।

ঐ স্বকাস্তের ঘর। দরজা খোলা। পর্দা ঝুলছে। আলো জ্বলছে ভিতরে।

পর্দার কাছে কী এক আধেক-দেখা-না-দেখা ছায়া ছলে-ছলে উঠল।

‘আহ্ন।’ তপ্ত অন্তরঙ্গতায় ডেকে উঠল স্বকাস্ত।

দরজা আর পর্দার মাঝখানে যে ফাঁক হয়ে আছে তারই কাছে ছায়া বুঝি ঘন এল।

‘আশ্চর্য, আমি তারিখটা একদম ভুলে গেছি। সত্যি, আজই কি আপনার সেই সন্তানের দিন?’ তত্ত্বপোশে বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল স্বকাস্ত : ‘তা হোক, যখন যখন তখনই নিয়ন্ত্রণ।’

কী বুঝল কে জানে, ছায়া ঘরের মধ্যে শরীরিণী হয়ে উঠল।

‘এ কি, আপনি?’ স্তব্ধীভূত হয়ে গেল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার রিটার্ন-ভিজিটটা দিয়ে আমি কাকলি স্বচ্ছমুখে বললে, ‘আপনি কারু অপেক্ষা করছেন বোধ হয়। আচ্ছা, আমি নমস্কার।’

৫২

‘ওহুন! ওহুন! চলে যাচ্ছেন কেন?’ ডাক দিল স্বকান্ত।

প্রস্থান-উত্তত ভক্তিকে নিবৃত্ত করে স্বস্থানে নিয়ে এল কাকলি।

‘যখন দয়া করে এসেছেন, তখন একটু বসে যান।’ দিবি চোখের উপর চোখে বলতে পারছে স্বকান্ত, ‘শুধু দাঁড়িয়ে গেলে রিটার্ন-ভিজিট হয় না। অফিসিয়াল ডিকোরাম-এর বইটা আপনি পড়ে দেখবেন।’

‘ভিতরে এসে একটু বসে যেতে হয় বুঝি?’ কাকলি দিবি চোখের পাতা পার নাচাতে।

‘নিশ্চয়। আপনি যদি এসে দেখতেন আমি বাড়ি নেই, আমার ঘর বন্ধ, হলেও আপনার রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড হত না। আপনার শুধু আসাটা সাক্ষিসিয়েন্ট নয়। চিরকুট বা একটা কার্ড রেখে গেলেও নয়।’

‘তা হলে আপনি বলতে চান, রিটার্ন-ভিজিটটা ভ্যালিড করতে হলে আমার আপনার ঘরে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে যেতে হবে?’

‘হ্যাঁ। কিন্তু শূন্য ঘরে স্ট্যাচুর মত বসে থাকলে হবে না। ঘরওয়ালার সঙ্গে একটু গল্পও করে যেতে হবে।’

‘তাই নাকি?’ কাকলি ঘরে ঢুকে ভালো করে দেখতে লাগল কোথায় বসে যদিকে তাকায় সেইদিকেই স্তূপাকার এলোমেলো। একরাশ কাপড়, ধোয়া অ আধোয়া, কাঠের চেয়ারটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে, প্রথমটা হৃদিস পায় নি। প ঠাহর করতে পেয়ে নিজেই উত্তোঙ্গী হয়ে কাপড়ের জঞ্জালটাকে বিছানার উপর নিক্ষেপ রাখল : ‘যদি কিছু মনে না করেন, চেয়ারটাকে মুক্ত করি।’

নয়তো বিছানাটাও আছে। চেয়ারে না কুলোলে বিছানায় বসেও গল্প

যায়। প্রায় বলতে যাচ্ছিল স্বকাস্ত। কিন্তু আফিস-কলিগ্ ভদ্রমহিলাকে এভাবে বলাটা মোটেই সংগত হবে না। তাই দ্রুত সামলে নিল।

চেয়ারে বসে কাকলি বললে, ‘কিন্তু গল্প—কী গল্প করব?’

‘ছুই আফিস-কলিগ্ কী আর গল্প করতে পারে বলুন। তাদের তো শুধু এক গল্প।’ হাসল স্বকাস্ত। বিছানায় পা তুলে বসল।

‘এক গল্প?’

‘হ্যাঁ। শুধু শপ-টক। মানে আফিস নিয়ে আলোচনা। আফিসের চিট-চ্যাট, শাদা বাঙলায়, কেছা। কিন্তু আপনার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দর্শন, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, যা আপনার খুশি, গল্প করতে পারেন। দেখছেনই তো, আমি তো আর আপনি নই।’

‘আমি নন মানে?’ কাকলির চোখের দৃষ্টি ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

‘মানে, আমি চাকর দিয়ে অতিথিকে তাড়িয়ে দিই না বাড়ি থেকে।’ স্বকাস্ত মেঝের দিকে তাকাল : ‘তাকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে এনে বসাই।’

‘দেখুন ছি ছি, সেদিন তারি ভুল হয়েছিল, অগ্গায় হয়েছিল।’ অহুশোচনায় উষেল হয়ে উঠল কাকলি : ‘আমি মোটেই বুঝতে পারি নি।’

‘কী বুঝতে পারেন নি?’

‘যে, আপনি এসেছেন।’

‘বুঝতে পেলেন কী করতেন?’ দৃষ্টিটাকে তুলে স্বকাস্ত একফালি জ্যোৎস্নার মত কাকলির গায়ের উপর রাখল।

‘বুঝতে পেলেন নিচে নামতুম, দেখতুম—’

‘দেখেন নি বলে যা হোক চাকরকে দিয়ে পরোক্ষে তাড়িয়েছিলেন, দেখতে পেলেন প্রত্যক্ষে তাড়াতেন।’ চোখের দৃষ্টিটাকে নির্লিপ্ত করে কাকলির মুখের উপর রাখল স্বকাস্ত।

‘মোটেই নয়। আফিস-কলিগ্কে কি কেউ তাড়ায়? শুনেছেন কোথাও?’ হাসতে চেয়েও হাসল না কাকলি : ‘কিন্তু আপনিই বা কেমন! এসেছেন যখন, নামধামটা তো বলতে হয়। নইলে ভিতরের লোক কেমন করে বুঝবে?’

‘ভিতরে কোথায়, আপনি তো উপরে ছিলেন। তাই ভিতরের লোক না বলে উপরের লোক বলুন।’

‘ও একই কথা। স্লিপ ছিল, পেন্সিল ছিল, তাতেও তো লিখে দিতে পারতেন।’

‘পার্পস অফ ডিজিটটাও লিখতে হয়, না?’

‘সে তো আফিসের স্লিপে। বাড়ির স্লিপে ওটা না হয় ব্র্যাক রাখতেন।’ নড়ে-চড়ে উঠল কাকলি : ‘পুরো নাম না লিখে শুধু ইনিশিয়ালস লিখলেও নিশ্চিত হতে পারতাম।’

‘আরো সংক্ষেপে, একজন ভদ্রলোক এসেছেন দেখা করতে, শুধু এটুকু বললে হত না?’

‘কী করে হবে? জীবনে অবাঞ্ছিত ভদ্রলোকও তো আসে ধুমকেতুর মত।’

‘যা বলেছেন!’ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল স্বকান্ত : ‘আমার জীবনেও যেমন এসেছে এক অবাঞ্ছিত।’

‘অবাঞ্ছিত?’ ভাসা-ভাসা সরল-দীঘল চোখে তাকাল কাকলি : ‘যার জন্তে আপনি অপেক্ষা করছিলেন? যার এখানে নেমস্তম্ভ?’

‘আর বলেন কেন!’ আহতের মত মুখ করল স্বকান্ত : ‘জীবনে এসেছে বললাম না? বলা উচিত কপালে জুটেছে।’

‘কিন্তু যার জন্তে আপনার অপেক্ষা, যাকে আপনার নেমস্তম্ভ, সে কি কখনো অবাঞ্ছিত হতে পারে?’

‘সেইই তো ট্রাজেডি। শুধুন তা হলে অবস্থাটা—’ আসনে আরো দৃঢ় হল স্বকান্ত।

‘একজন আফিস-কলিগ্কে বলবেন আপনার প্রাইভেট কথা? সেটা কি ঠিক হবে?’

‘কেন, বলা যায় না কলিগ্কে?’ অসহায় মুখ করল স্বকান্ত : ‘যদি কলিগ্ছাড়া সম্প্রতি আর কেউ তার না থাকে?’

‘তা হলে বোধ হয় বলা যায়।’ কাকলিও আঁট হল চেয়ারে : ‘আগে তবে বলুন ভদ্রমহিলাটি কে?’

সিলিঙের দিকে তাকাল স্বকান্ত : ‘তাকে কি আপনি চিনতে পারবেন? ধরুন একজন শিক্ষিকা। বেশ কথাটা এই শিক্ষিকা—তাই না?’

‘হ্যাঁ, আগে যে শিক্ষয়িত্রী চলত তার চেয়ে ভালো।’

‘তার আগে যা চলত সেটা ভয়াবহ।’

অবাক হবার মত মুখ করল কাকলি : ‘সেটা কী?’

‘মিসট্রেস। কখনো-কখনো বা হেড-মিসট্রেস! শিক্ষিকা শব্দটা সম্ভ্রান্ততা এনেছে। বলা যায় অর্থের পুনর্বাসন ঘটিয়েছে। তেমনিধারা নার্স কথাটার জন্তেও একটা কুলীন প্রতিশব্দ দরকার। কেউ যদি শোনে, ঘরে নার্স এসেছে, তা হলে কেউ কপ্পীর খোজ করবে না, উলটে ঐ আসাটারই একটা কল্প মানে করে বসবে।’

‘নার্স-টার্স জানি না, কিন্তু যে শিক্ষিকার কথা বলছেন, অহুমান করছি, সে তো আগে-আগে আরো এসেছে আপনার হোটেলে, আর নিশ্চয়ই তা আপনারই নিয়ন্ত্রণে।’

‘ঐ দেখুন, ঐ আরেকটা শব্দ—হোটেলে আসা। তেমনিধারা বাগানবাড়িতে গাওয়া, কিংবা ডাকবাংলোয় ডাকা। বাড়লা ভাষায় ঐ কথাগুলোর প্রশ্ৰুতান দরকার। যদি কোনো মহিলা হোটেলে আসেন, কিংবা কোনো মহিলাকে বাগানবাড়ি নিয়ে যাই কিংবা ডাকবাংলোয় ডেকে আনি, বাড়লা করে বললেই লোকে তার হয় অর্থ করবে। কী, বলুন, করবে না?’

‘করবে।’ যতদূর সাধ্য মৃতু করে বললে কাকলি।

‘যেমন আপনি এখন করছেন। যেহেতু শিক্ষিকাটি আমার ঘরে এসেছেন সেই হেতু ছুয়ে-ছুয়ে চার ছাড়া কিছু হবার নয় ভাবছেন। কিন্তু তার এই আসাটা যে উৎপাত হতে পারে, নিয়ন্ত্রণটাই যে নিগীড়ন, তা ধারণাই করতে পারলেন না।’

‘কিন্তু কেন, উৎপাত কেন?’

‘শিক্ষিকাটির বিশ্বাস যে তাঁর সঙ্গে মেলামেশাটা দীর্ঘ হয়ে উঠলেই একদিন তিনি আমার স্ত্রী হয়ে উঠবেন। বলুন, তা কি হয়?’

‘কেন হয় না? খুব হয়।’

‘আপনি কিছু জানেন না। শুধু মেলামেশাতেই কি ভালোবাসা জাগে? আর ভালোবাসা না জাগলে বিয়ে কী।’ দিদি চোখে চোখ রাখল স্বকাস্ত : ‘বলুন, ঠিক নয়?’

‘বললেনই তো, আমি কিছু জানি না।’ কাকলি চোখ নামাল।

‘আপনার জীবনে তেমন কিছু হয় নি বোধ হয় অভিজ্ঞতা। সকলের জীবনে হয় না। যেমন সকলের গলায় গান আসে না। সকলের চিত্তে জন্মায় না রসবোধ। যার আসে তার মহাভাগ্য।’

‘আপনার এসেছিল?’

‘ই্যা, একদিন এসেছিল, কিন্তু সে কথা থাক। শিক্ষিকার কথাটাই বলি।’

‘বলুন।’

‘শিক্ষিকার ধারণা যেন গাধা পিটিয়েই ঘোড়া করা যায়। জোর করেই আনা যায় স্বর, লেখা যায় কবিতা। অভ্যাস থেকেই আসা যায় আশ্চর্যে। স্বর্ষের তাপে ফল ফোটে কিন্তু যেহেতু স্বর্ষ নেই সেহেতু আগুনের দাহেই ফুটে। তা কখনো হয়! বলুন না, আপনিই বলুন না। গায়ের জোরে চাষ করতে পারি, কিন্তু বৃষ্টি

আনতে পারি গায়ের জোরে? আর বৃষ্টিই যদি না ঝরল, ফসল কোথায়? কী, আপনার মত কী?’

খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল কাকলি। বললে, ‘আমি কী বুঝি! আমার কতটুকু জীবন, কী বা হয়েছে আমার জীবনে!’

কথায় বলে, রাস্তা ধরে শুধু হেঁটে যাও, এগিয়ে যাও, ঠিক মিলবে সরাইথানা। শিক্ষিকার বোধ হয় তাইতেই বিশ্বাস। কিন্তু রাস্তা যে সব সময়ে সরাইয়ে গিয়েই শেষ হয় না, কখনো কখনো শূণ্য প্রান্তরে এসে মেশে, তা তার জানা নেই।’

‘কিন্তু নদী ধরে চললে, কোনো ভুল নেই, ঠিক সমুদ্রে এসে পড়া যায়।’ কাকলি বললে।

একটু বুঝি চঞ্চল হল স্নকাস্ত। বললে, ‘আচ্ছা, আপনাকে যদি একটু চা এনে দি, থাকেন?’

হাসল কাকলি : ‘এটা অফিসিয়াল কোডে পড়ে তো?’

‘এক কলিগ্, আরেক কলিগ্কে চা খাওয়াবে এতে বারণ তো কিছু দেখি না।’

হাতের ঘড়ি দেখল কাকলি : ‘সময়ের বারণ।’ আবার দেখল চারদিকের ছন্নছাড়া চেহারা : ‘স্থানের বারণ। তা ছাড়া রিটার্ন-ভিজিটের মেয়াদ বুঝি পেরিয়ে গেছে এতক্ষণে। এবার তবে উঠি।’

‘উঠবেন কী! বৃষ্টি নেমেছে।’

‘সত্যিই তো।’ জানলার বাইরে থেকে চোখ ঘরের মধ্যে আনতেই স্নকাস্তের চোখের উপর এসে পড়ল। সামলে নিল কাকলি। বললে, ‘কিন্তু আপনার কী! আপনার তো মজা। পৌষ মাস। দ্বিবি নিজের জায়গায়, নিজের ঘরে আছেন। আর আমি! আমি কতদূর যাব বলুন তো?’

‘আপনাকে তবে একটা ট্যান্সি ডেকে দি।’ তক্তপোশ থেকে নেমে পড়ল স্নকাস্ত।

‘তাই দিন। সো কাইণ্ড অফ ইউ।’

‘হ্যাঁ, রাত বাড়বে বৈ কমবে না। আর আপনার অভিভাবকেরা ভাববেন।’

‘অভিভাবক দেখি এক দঙ্কল করে দিলেন।’ স্বচ্ছ মুখে হাসল কাকলি।

‘আপনার মা বাবা আছেন নিশ্চয়ই। তদতিরিক্ত আরো একজন কোন না আছেন! মেয়েদের সব সময়েই এক দঙ্কল অভিভাবক। নিরভিভাবক যদি কাউকে বলতে চান তো আমি। কেউ নেই আমার জন্তে ভাবে।’

‘আপনার কথা জানি না। কিন্তু তদতিরিক্ত লোকের কথা যা আপনি বললেন সেটাও অতিরিক্ত বললেন।’

‘মানে, বানিয়ে বললাম?’

‘বানিয়ে ঠিক না হোক, বাড়িয়ে বললেন।’

‘সে কী, তার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে না?’ মুহূর্তে তপ্ত হয়ে উঠল স্বকান্ত। সহকর্মীর নৈর্ব্যক্তিক সীমা সহসা অতিক্রম করে ফেলল।

‘কী করে হয়, বলুন। ঐ যে সুন্দর করে বললেন কথাটা ঐটেই সত্যি কথা।’ হাসতে শুরু করে শেষে গম্ভীর হল কাকলি।

‘বা, আমি আবার কী বললুম!’

‘ঐ যে বললেন, শুধু মেলামেশাতেই কি ভালোবাসা হয়? আর ভালোবাসা যদি না জাগে কিসের বিয়ে কিসের বাজনা! গায়ের জোরে চাষই করা যায়, বৃষ্টি ঝরানো যায় না। আর বর্ষণ না হলে সব নিষ্ফল।’

চাকর অনেকক্ষণ গেছে ট্যাক্সি আনতে, কিন্তু ফেরবার নাম নেই।

স্বকান্ত দুশ্চিন্তায় ফেলল। বললে, ‘বৃষ্টির মধ্যে ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। তারপর কোন রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে, ট্যাক্সি পেলেও আসে কিনা ঠিক কী। ট্রাম অচল, বাস দুারোহ।’

‘তা হলে কী হবে?’ ভয়-পাওয়া পাখির মত তাকাল কাকলি।

‘রিকশা করে যেতে হবে।’

‘আমি একা-একা কী করে যাব রিকশাতে! কতটা পথ তার খেয়াল আছে?’

‘কী করে থাকবে! তা ছাড়া দুই কলিগ্ এক রিকশা চড়েছে এমন কোনো প্রিসিডেন্ট নেই। বিশেষত দু-জনের মধ্যে একজন যখন অনাস্থীয় মহিলা।’

‘বিপদে নিয়ম নেই।’ করুণ করে বললে কাকলি।

‘কিন্তু স্ত্রীলোকে সব সময়েই নিয়ম। স্ত্রীলোক মহাবিপদ।’

‘তা হলে পায়ে হেঁটে চলুন।’ বাস্তব হয়ে উঠল কাকলি: ‘ছাতা-কাতা যোগাড় করুন হোটেল থেকে।’

‘তা করছি। কিন্তু আমি যাব কেন?’

‘বা, আমাকে একা ছেড়ে দেবেন? একজন আফিস-কলিগের নিরাপত্তা দেখবেন না?’

‘যখন বলছেন, বেশ, ততটুকু না হয় দেখব।’

‘ই্যা, বলুন, আমার কী অপরাধ! আপনার কাছে রিটার্ন-ভিজিট দিতে এসেই

তো আমার এই দশা। আপনার তো উচিত আমাকে এই পরিবেশে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া।

‘কোডে যদি থাকে তবে দেব পৌঁছে। কী, মাখায় ছাতা ধরে?’ হাসল স্নকাস্ত।

আরো হাসল যখন দেখলে এত সব ভয়জন্মনাকে ধূলিসাৎ করে চাকর ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হয়েছে।

এগিয়ে দিতে নামল স্নকাস্ত। দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়াই শিষ্টাচার।

কিন্তু ড্রাইভারের চেহারা দেখে পাংশ হয়ে গেল কাকলি। একা ড্রাইভার নয়, তার পাশে বসা সঙ্গী। দুইই দুর্ধর্ষ।

‘আপনিও চলুন।’ আবুল অশুটে মিনতি করল কাকলি।

কোড-ফোড আর দেখতে চাইল না স্নকাস্ত: ‘চলুন’।

ম্যানোজারকে বললে, ‘ঘর খালি রইল। দেখবেন।’

ওদিকে গাড়ি ফিরে আসবার আগেই বরেন সব টের পেয়েছে, বুঝে নিয়েছে। যত রাগ গিয়ে পড়ছিল ড্রাইভারের উপর। কিন্তু ড্রাইভার ফিরে এলে তাকে আর বকল না। তস্বি করল না। ড্রাইভারের চেয়ে সে যে বেশি বোকা তর্ক উঠলে মে কথটাই তো স্পষ্টীকৃত হবে।

বরেনের উচিত ছিল বাথরুমের বাইরের দরজাটা বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা। আর ভিতরের দরজাটার ছিটকিনি উড়িয়ে দেওয়া। যেমন গারাজ হয় নি, এগুলোতেও তেমনি ক্রটি থেকে গেছে। এতেই যন্ত পণ্ড হত না নিশ্চয়।

চোর পালাবার পর বুদ্ধি বাড়িয়ে লাভ নেই।

কিন্তু কতদূর পালাবে? কতবার?

ড্রাইভার ফিরে এসে যে গল্প বললে তা বরেন কোনো অংশে খণ্ডন করল না। সব মেনে নিল। প্রচারিত হয়েছে এ প্রচারিত করে গৌরব কোথায়!

‘আমি এখন অনেক ভালো আছি। ডাক্তার লাগবে না। চলো, বাড়ি চলো।’ বরেন উঠল গাড়িতে।

রাস্তায় নেমে থানিক ঘোরাঘুরির শেষে নির্দেশ দিলে কাকলিদের বাড়ি যেতে।

‘খুকি কোথায়? কাকলি?’ বরেনকে একা নামতে দেখে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল গায়ত্রী।

‘সে কি! এখনো ফেরে নি বাড়ি?’ বলে বরেন ছোট্ট একটি কাহিনী ফাঁদল। দু-জনে একসঙ্গে ফিরছিল—সে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—কাকলি গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল। বললে, আফিসের কোন এক বন্ধুর বাড়ি যাবে, কী এক জরুরি

দরকার আছে। আরো বললে, বরেন যেন প্রতীক্ষা না করে, সে একাই ফিরতে পারবে। দায়িত্বজ্ঞান আছে বলে বরেন খোঁজ নিতে এসেছে সে ঠিকমত ফিরল কিনা।

‘তুমি সে বন্ধুর বাড়িটা চেনো?’ গায়ত্রী অধীর হয়ে উঠল।

‘দরকার হলে বার করা যাবে নিশ্চয়ই। কে জানে সেখান হতে হয়তো আর কোথাও গেছে। ভাববেন না, এসে পড়বে এক্ষুনি।’ আশ্বস্ত করল বরেন।

কী বিচিত্র রাত, ট্যান্ডিতে কতদূর আসতেই দেখা গেল, আর বুষ্টি নেই, শুকনো খটখট করছে পথঘাট।

‘বাঃ,’ উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠল কাললি : ‘বুষ্টির পথে খানিকটা এগিয়ে আসবার পরেই আবার শুকনো।’

‘আবার কে জানে শুকনো পথে খানিকটা এগিয়ে গিয়েই আবার জল।’ হাসল স্বকান্ত।

‘তেমন দু-জন একসঙ্গে থাকলে ঘোর বর্ষাই থর।’ কাকলি বললে।

‘আবার ঘোর থর। বর্ষা।’ বললে স্বকান্ত, ‘কিন্তু এ কি ঠিক কলিগের মত কথা হচ্ছে?’

‘হচ্ছে না বুঝি? না যদি হয় তা হলে চুপ করে থাকুন।’

চুপ করল দু-জনে।

‘তেমন দু-জন হলে স্তব্ধতাও কথা।’ স্বকান্ত টিপ্সনী ঝাড়ল।

‘আবার কথাও স্তব্ধতা।’ সায় দিল কাকলি।

‘স্বতরাং কথা বলুন।’

‘স্বতরাং চুপ করে থাকুন।’

‘ও একই কথা।’ একসঙ্গে বলে উঠল দু-জনে।

বাড়ির কাছাকাছি ট্যান্ডিটা আসতেই কাকলি বললে, ‘তুমিও চলো।’

‘ই্যা, যাব বৈকি। তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব।’

‘কি, অভিভাবকের মত?’

‘না। আফিস-কলিগের মত।’

ট্যান্ডি-ভাড়াটা স্বকান্তই দিল। এটা কি আফিস-কলিগের মত হল? তাকাল কাকলি। একরকম একটা হল। হাসল স্বকান্ত।

বরেন আর গায়ত্রী একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল বারান্দায়। কিন্তু ট্যান্ডি থেকে কাকলি এ কার সঙ্গে নামল? কে তাকে দিয়ে গেল বাড়িতে?

‘এই আমার মা।’ আফিস-কলিগ্কে যেমন আলাপ করিয়ে দেয় তেমনি ভক্তিতে বললে কাকলি।

কোডে নমস্কারের কথাই বলেছে, স্বকাস্ত একেবারে পায়ে লুটিয়ে প্রণাম করতে গেল।

কী সর্বনাশ! আতকে উঠে কয়েক পা পিছিয়ে যেতে দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল গায়ত্রী।

‘আর ইনি বয়েস্‌বাবু—’

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই কেটে পড়ল বরেন। এমন ভাব যেন সে থানায় গেল পুলিশে খবর দিতে।

‘আর উপরে বাবা আছেন—’

‘হ্যাঁ, আছি, আছি। মরি নি এখনো।’ উপর থেকে বনবিহারী আনন্দধ্বনি করে উঠলেন : ‘দেখবার জন্তে বেঁচে আছি। আমার বাড়ি, আমি বলছি, উঠে এসো উপরে।’

‘আরেক দিন আসব। সবার সঙ্গে আলাপ করে যাব। আজ অনেক রাত হয়েছে। আজ চলি।’

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়েছে। পায়ে হেঁটেই ফিরে চলল স্বকাস্ত।

• ৫৩

কাকলির পিছু-পিছু গায়ত্রী প্রায় ছুটতে-ছুটতে উপরে উঠে এল।

‘এসবের মানে কী?’ প্রায় চড়াও হল মেয়ের উপর।

কাকলি একেবারেই তর্কের ভক্তি নিল না। শরৎকালের সরল প্রভাতের মত হেসে ফেলল। বললে, ‘মানে আমিই কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।’

কিন্তু না বুঝিয়ে ছাড়বে না গায়ত্রী। বললে, ‘ওটাকে আবার কোথেকে জোটালি?’

‘কোনটাকে?’ কাকলি খিলখিল করে হেসে উঠল।

‘ঐ কাস্তটাকে।’ রাগে তোতলাতে লাগল গায়ত্রী।

‘যদি শুধু কাস্ত বলো, মানেটা অগুরুকম দাঁড়ায়।’ পরম শান্তির স্বরে কথা

বলছে কাকলি, ‘তা’ হলে আর জোটানোর প্রশ্ন ওঠে না। কেননা যে কাস্ত, যে স্বামী, সে আগে থেকেই জুটে রয়েছে। তবে যদি স্বকাস্তকে মীন করো—’

‘হ্যাঁ, ঐ স্বকাস্ত, ঐ জুতোকাস্তকেই মীন করছি।’

বুকের মধ্যে যা খেল কাললি। মুখের হাসিটুকু উড়ে গেল এক ফুঁয়ে। কোনো কথা কইল না।

কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয় গায়ত্রী। বললে, ‘ঐ স্বকাস্তকে জোটালি কোথেকে?’

‘সেই তো আশ্চর্য।’ কাকলি কথা বলল।

‘ওর বাড়ি গিয়েছিলি?’ কথা তো নয়, যেন চাবুক মারছে গায়ত্রী।

‘ও তো বাড়িতে থাকে না।’

‘কোথায় থাকে?’

‘হোটেলে থাকে।’

‘হোটেলে? হোটেলে থাকে? সেই হোটেলে গিয়েছিলি তুই?’

‘বা, হোটেলে যেতে বাধা কী! সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। কত লোকে যাচ্ছে।’

‘হোটেলে যেতে ওর সঙ্গে দেখা হল, না, ওর সঙ্গে দেখা করবার জগ্গেই গিয়েছিলি হোটেলে?’ ঝালু উকিলের মত জেরা করছে গায়ত্রী।

‘হোটেলে যেতেই কি অমনি-অমনি কারু সঙ্গে দেখা হয়?’ মুহু মুহু হাসল কাকলি : ‘কারু সঙ্গে দেখা করবার জগ্গেই যায় হোটেলে।’

‘ওর সঙ্গে তোর দেখা করতে যাবার ঠেকা কী?’

‘না, ঠেকা কী! একটা শিষ্টাচার!’

‘শিষ্টাচার?’

‘মানে অফিসিয়াল এটিকেট। ও তো আমার সহকর্মী, আমরা এক আফিসে কাজ করি। তারই জগ্গে—’

‘তারই জগ্গে কী?’ গায়ত্রী আবার হুমকে উঠল।

‘তার জগ্গেই ও সেদিন এসেছিল এ বাড়ি। সেই যে সেদিন, মনে নেই?’ কাকলি মনে করিয়ে দিতে চাইল।

‘কিন্তু, কেন, কেন আসে?’

‘সেও বোধ হয় শিষ্টাচার।’ বেশেবাসে কাকলি এতক্ষণে অনেক আটপোরে হয়ে গিয়েছে, এখন সাবান-তোয়ালের দিকে হাত বাড়াল।

‘আফিসের শিষ্টাচার তো বাড়িতে কেন?’

‘সে কথার উত্তর আমি দিই কী করে?’ তাকের থেকে সোপকেসটা হুড়িয়ে
নিল কাকলি : ‘সে কথার উত্তর স্বকাস্ত দিতে পারে।’

‘স্বকাস্ত দিতে পারে?’ মেয়ের মুখে স্বকাস্ত নামটাই যেন গায়ত্রীর অসহ
লাগছে।

‘হয়তো ওও পারবে না। কেউই দিতে পারে না সে উত্তর।’ বাস্তব হতে চাইল
কাকলি।

‘কিন্তু সেদিন তুই তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলি বাড়ি থেকে?’

‘সেটা যে সত্যি তাকে নয় সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।’ কাকলি
বাথরুমের দিকে ধাওয়া করল।

‘তার মানে বরেনের সঙ্গে তোর বিয়েটা হবে না?’ গায়ত্রী বাধা দিতে
চাইল।

নিজের থেকেই খামল কাকলি : ‘বা, তার মানে কি তাই দাঁড়ায়? এর সঙ্গে
বিয়ের সম্পর্ক কী?’

‘সম্পর্ক নেই তো বরেনকে অমনি একা-একা চলে যেতে দিলি কেন?’

‘কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে আমি ঠেকাই কী করে?’

‘ঐ আগন্তুকটার সঙ্গে অহেতুক তাকে দেখলে না গিয়ে সে করে কী?’

‘বা আমি আমার আফিসের সহকর্মীর সঙ্গে সামান্য মিশতে পারব না?’ পিছনে
তাকাল কাকলি : ‘আমার সঙ্গে আমার কোনো সহকর্মীকে একত্র দেখলেই উনি
চটে যাবেন এ তো ভীষণ কথা। এ তো তা হলে স্ত্রুপাতেই বজ্রপাত।’

‘তার মানে তুই ঐ স্বকাস্তর কাছেই ফিরে যাবি? যে তোর অত বড় শত্রু, যে
তাকে অত বড় অপমান করল—’

‘বা, একজনের ভিজিট ফিরিয়ে দেবার মানে সেই ভিজিটারের কাছে ফিরে
যাওয়া?’ নিজেই একটু ফিরল কাকলি : ‘এত সোজা? এত সস্তা?’

তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করল কাকলি। উঃ, চারদিকে কী
অগাধ, অবোধ নিশ্চিন্ততা! উন্মুক্ত শান্তি! সর্বদে জল ঢালতে লাগল অঝোরে।
জলের জল, মুক্তির জল, শক্তির জল। শুধু ক্লান্তি প্রকালন করছে না, দেহকে ধুয়ে
করছে, তপ্ত করছে, আকাজক্ষায় আনছে নির্মল তীক্ষ্ণতা। যে জল অতলের দিকে
টানে, ঢেলে দিয়ে সঁপে দিয়ে আপনাকে ফুরিয়ে দিয়ে যাব স্বথ, এ যেন সেই জল,
সেই প্রবল প্রাণের প্রতিনিধি।

অগত্যা গায়ত্রী বনবিহার্য্য কাছে গেল।

‘বাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠল—’ মুখ চোখ গলা একসঙ্গে ভার করে বললে গায়ত্রী।

এতটুকু চঞ্চল হলেন না বনবিহারী। যেমনি শুয়ে ছিলেন তেমনি শুয়ে রইলেন।
‘শু শুধোলেন, ‘কী হল?’

‘বরেন চলে গেল।’

‘কেন?’

‘কী অজায়, ঘোরতর অজায়।’ বিছানার পাশে বসল গায়ত্রী : ‘কাকলি আবার দই পশুটাকে জুটিয়ে এনেছে।’

পশু? পশু আবার কে?

‘ঐ যে—কী না জানি নাম—স্বকাস্ত। স্বকাস্ত-পশু।’

‘বলো কী? এনেছে, না, এসেছে?’ একটা ঝড়ে-পড়া গাছ যেন তার আপন হিমায়, তার বিস্তীর্ণ শাখা-প্রশাখায় উঠে বসল : ‘এমন গোলমালে হয়ে যায় জিনিসটা—আনা না আসা ঠিক বোঝা যায় না। তুমিই ডেকে আনলে, না আমিই এলাম থেকে—এ ছটোকে আর আলাদা করা যায় না। কিন্তু স্বকাস্তকে তুমি পশু লছ কোন হিসেবে? ও তো স্বকাস্ত-পশু নয়, ও তো স্বকাস্ত বহু।’

‘ওটাকে সেদিন তাড়িয়ে দিয়েছিল কাকলি—’ ঘুণায় বললে গায়ত্রী।

‘তাড়িয়ে দিয়েছিল তো আবার ধরল কেন? তার মানেই তো যায় না তাড়িয়ে ওয়া। জীবনে একটা কিছু আছে যার জড় ফেলা যায় না উপড়ে।’

‘ছি ছি, কী লজ্জা, কী ঘেন্না—

‘কে কাকে তাড়ায়! স্বকাস্ত তাড়াল কাকলিকে, কাকলি তাড়াল স্বকাস্তকে। কিন্তু কেউ ওরা ভালোবাসাকে তাড়াতে পারল? শত কাটা-ছেঁড়া করেও পারল মূল লে ফেলতে? পারল না। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে পারল না।’

‘তার মানে তুমি চাও কাকলি আবার ঐ অপদার্থের সঙ্গে গিয়ে মিলবে?’

হাসলেন বনবিহারী : ‘আমার চাওয়ায় কী হবে? কথা হচ্ছে কাকলি চায় কিনা।

কাকলি চায় তা হলে আর অপদার্থতা কোথায়? তাহলে কাকলির চাওয়ার লোহাও সোনা, চিরন্তন সোনা।’

‘এ অসম্ভব।’ দৃঢ় হল গায়ত্রী : ‘যে কোর্টে গিয়ে জীব নামে জঘন্য বদনাম দিয়ে দিয়ে বিচ্ছেদ করে নেয় তাকে সেই স্ত্রী, যদি তার বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান থাকে, ফের মালা দেয় না, না, ককখনো না—’

‘কিন্তু যদি ভালোবাসা না মরে, যদি ভালোবাসা থেকে যায়, তা হলে কিসের

বন্ধনাম, কিসের বিচ্ছেদ ? অপমানের জ্বালা খেসারতে পূরণ হয় না, পূরণ হয় ভালো-
বাসায়। রক্ত কি জ্বলে যায় ? যায় না। যন্ত্রণা লেগে থাকে। যন্ত্রণাও ভালোবাসাই
ধুয়ে নেয়। আমিও একদিন বিমুখ ছিলাম ওদের উপর, যখন ওদের বিয়ে হয় নি—
বনবিহারী আবার বিছানায় চলে পড়লেন : কিন্তু শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ওদের
ভালোবাসা যখন বিয়েতে বিকশিত হল তখন মনে মনে সংবর্ধনা করেছি ওদের,—আর
প্রার্থনা করেছি, যত দুঃখ পাক, ওদের সংযোগ যেন স্থায়ী হয়, ওদের সংসার যেন
স্বথের হয়—’

‘কই আর হল !’ বললে গায়ত্রী, ‘বিচ্ছেদ করাতে আদালত বসাল।’

‘হ্যাঁ, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদ এখনো বাকি। বোঝো সেই শক্তি যে আইন মানে :
দেশকাল মানে না, রাজসম্পদকে তুচ্ছ করে। সব চেয়ে বড় কথা, বিচ্ছিন্নকে যুক্ত
করে দেয়।’

‘তুমি যাই বলো, উঠে পড়ল গায়ত্রী : ‘যে বিয়ে একবার ভাঙা হয়েছে তা আর
জোড়া যাবে না।’

‘ভাঙাকে কে জুড়তে চাচ্ছে ? এ পুরোনোকে নতুন করে চেনা, নতুন করে
পাওয়া। যেমন শেষ অঙ্কে দুয়স্তের শব্দগুলিকে। নতুন চোখে নতুন
মুখ-চন্দ্রিকা।’

‘ও একই কথা। এ আমি ঘটতে দেব না। কিছুতেই না।’

‘ঘটতে দেবে না—কী করবে ?’

‘স্বকান্তকে ঠেকাব। আর যে করে পারি কাকিলির নিজের হাতের সই-করা
বিয়ের নোটিশের মান রাখব।’

‘তার মানে, তুমি বলতে চাও রক্তের দস্তখতের চেয়ে কালির দস্তখতের দাম বেশি
হবে ?’

‘নিশ্চয় বেশি হবে। ওদের রক্ত কতক্ষণ ? দু দিন পরে আবার যে কান্না সেই
কান্না। সেই ঝগড়া, সেই মারামারি, সেই সন্দেহপনা।’

‘আর বরেনের বেলায় তার আশঙ্কা নেই ?’

‘না, নেই। বরেন চের বেশি সম্মান।’

‘আর তুমি—তুমি সম্যক ভ্রান্ত !’

‘দেখা যাক কে হারে কে জেতে—’ রাগ ফলিয়ে চলে গেল গায়ত্রী।

‘সবটাই গায়ের জোর ?’ নিজের মনে বলে উঠলেন বনবিহারী : ‘গায়ের জোরে
উপরে প্রাণের জোর কি জয়ী হবে না ?’

কাকলিকে ডেকে পাঠালেন । একটু যদি গোপনে পরামর্শ করা যেত তার সঙ্গে ।
খবর এল, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে ঘুমুচ্ছে কাকলি ।

আহা, ঘুমুক । বিশ্রাম করুক । কত ক্লান্ত না জানি, মগ্ন হোক, স্নিগ্ধ হোক ।
ঘুমুচ্ছে তো কত, চোখ বুজে ইচ্ছে করে একটা আগুনের ছবি আঁকছে কাকলি ।
স্বপ্ন দেখছে । অন্ধকার কোথায় যেন আগুন লেগেছে, লাল হয়ে উঠেছে আকাশ ।
গুন নয়, হয়তো বা সমুদ্রে স্নান করে সূর্য উঠছে । কিংবা কে জানে রুক্ম প্রাস্তরে
গাং কোথাও বা গুচ্ছ-গুচ্ছ পলাশের সমারোহ । টকটকে লাল । আরো অনেক-
একাগ্র চোখে মনোযোগ করে দেখতে লাগল কাকলি । না, আগুন নয়, সূর্য নয়,
পশুবক নয়, কী লজ্জা, স্বকাস্তের সামারকুল গেক্টিটা তার প্রথম সিঁথির সিঁথুরে
খামাখি হয়ে গেছে ।

আর, কী তোমার কীর্তি, জনে জনে সবাইকে বলে দেব, এই অভিযোগের সঙ্গে,
হ্যাঁ, কি তুমি সুন্দর, আনন্দময়, এ কথা কি বলা যার আর কাউকে, এই আশীর্বাদ-
রা দুটি মদির-লাজুক চোখ সর্বক্ষণ অন্ধকারে জ্বলতে দেখছে স্বকাস্ত ।

ঘুম ভাঙবার পর স্বকাস্তের মনে হল এমন রাতও ঘুমে ফুরিয়ে দিতে হয় !

আর কাকলির মনে হল, ছি ছি, কত বেলা হয়ে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে
গাবার আফিসে বেরুতে হবে । হ্যাঁ, বেরুতে হবে আফিসে । আফিসে না বেরুলে
গর সঙ্গে আবার একটু দেখা হবার সম্ভাবনা কোথায়, গুজুহাত কোথায় ?

সকাল হতে বনবিহারী কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছেন, কিছুতেই কাছে পাচ্ছেন
। কাকলিকে । সব সময়ে গায়ত্রী তাঁকে ঘিরে রয়েছে, আড়াল করে । আর
ন গায়ত্রী কাছে নেই, তখন কাকলিকেও ধারে-পারে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ।

আর এমনি কাউকে দিয়ে ডাকাতে গেলে এমন হৈচৈ তুলছে যে গায়ত্রী নিজেই
লে আসছে তামিল করতে । আর মেয়েরও এমন একটা ভাব নেই যে বাবার
। ছে গিয়ে নিরিবিলা একটু বসি, বন্ধুর মত নিভুতে দুটো কথা কই । কেবল
স আর আফিস, কেবল ছুটিহীন ছোট্ট ছুটি ।

না, একটা জরুরি কথা তাকে বলতে হয় গোপনে । আজই, এখনি । দেরি
গেলে বিপদ হতে পারে ।

ছটকট করতে লাগলেন বনবিহারী ।

খেয়েদেয়ে উপরে উঠেছে কাকলি, আফিসের সাজ ধরবে এবার, বারান্দাতে
, বনবিহারীর সঙ্গে তার ছোট্ট চোখোচোখি হল । বনবিহারী ছোট্ট হাতছানি
তাকে ডাকলেন ।

জুত চলে এল কাকলি।

‘তোমার মা কোথায়?’

‘নিচে।’

‘শোন, কাছে আয়। তোকে আমার ছোট্ট একটি উপদেশ আছে।’ বনবিহারী কাকলিকে আরো একটু কাছে টেনে নিলেন : ‘তুই তো আবার উপদেশ শুনিস না।’

‘বা, সে কী কথা? কে বললে শুনি না?’

‘হ্যাঁ, উপদেশ না বলে বলতে পারি পরামর্শ। এক বয়োবৃদ্ধ অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ।

‘বা, বলো না—’

‘শোন, আফিসে একা-একা যাবি না, কাউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবি। আর ফেরবার সময়—’

‘আফিসে তো আমি বাসে-ট্রামে যাই। বাসে-ট্রামে তো গাদা-গাদা লোক।’

‘কিন্তু স্টপ পর্যন্ত যেতে কিংবা স্টপ থেকে বাড়ি পর্যন্ত আসতে বেশ খানিকটা হাঁটা পথ। একা-একা হাঁটবি নে রাস্তায়।’

‘কেন, কী হবে?’

‘কিছু হবে না। তবু, আমার অনুরোধ, একটা লোক সঙ্গে রাখবি। বললে আফিস থেকে পারি না একজন আদালি?’

‘কেন, লোক দিয়ে কী হবে? আমাকে কেউ কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে?’ কাকলি কুখে দাঁড়াল : ‘আমি কি ছেলেমানুষ?’

‘ঐ নাও। মেয়ের আবার তক্ষুনি লেগে গেল। আমি বলছি, সাবধান থাকা ভালো। কটাক্ষগর্ভ চোখে তাকালেন বনবিহারী : ‘সাবধানের মার নেই।’

‘না, আমি খুব সাবধান আছি।’ কথাটাকে উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল কাকলি।

আফিসের সাজগোজ সেরে নিচে নামছে কাকলি, একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। একা ট্যাক্সি চড়াও হয়তো ঠিক হবে না। কে জানে কার তাঁবেদার হয়তো ট্যাক্সিওয়ালা। কিন্তু ট্যাক্সিটা কি খালি আছে? আফিস-টাইমে খালি ট্যাক্সি পাওয়া হাতে স্বর্গ পাওয়ার চেয়েও বড় সাধনা। কিন্তু না, লোক আছে। কে যেন নামছে ট্যাক্সি থেকে।

‘এ কি, আপনি?’ বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে কাকলি বললে।

আফিসের পোশাকে, আনন্দে, ঝলমল করতে লাগল সূকান্ত। বললে, ‘উঃ, কী ভাগ্যি, ধরতে পেরেছি আপনাকে। আমি ভাবছিলাম বেরিয়ে গেছেন বুঝি। না, পেরেছি ধরতে। চলুন, যাবেন না আফিসে?’

‘বা, যাব বৈকি ! যাব বলেই তো তৈরি হয়ে বেকচ্ছিলাম—’

‘হ্যা, আমি যখন যাচ্ছি, ভাবলাম আপনাকেও নিয়ে যাই। একই যখন পথ, আর একই যখন গন্তব্য। ভাবলাম আপনার আর একা-একা যাওয়াটা ঠিক হবে না।’

‘দাঁড়ান, বলে আসি।’ কী করবে কী বলবে যেন দিশে পাচ্ছে না কাকলি।

‘কাকে আবার বলবেন ? স্বকাস্ত থ হয়ে রইল।’

‘বাবাকে বলে আসি। দাঁড়ান। প্লিজ। এক মিনিট।’ উর্ধ্বাঙ্গে উপরে ছুট দিল কাকলি।

বনবিহারীর কাছে গিয়ে বললে হাঁপাতে-হাঁপাতে, ‘উনি নিজেই একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন—’

‘উনি—কে উনি ?’ ব্যাকুল চোখ মেলে তাকালেন বনবিহারী।

আফিসের আদালি—কাকলির ইচ্ছে হল তাই বলে আনন্দে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কিন্তু না, নামটা ঘোষণা করতেই বোধ হয় বেশি স্থখ পাবে এই মুহূর্তে। তাই দ্রুত, দীপ্ত স্বরে বললে, ‘স্বকাস্ত—স্বকাস্তবাবু। উনি আর আমি এক আফিসেই কাজ করি কিনা—’

‘বা, স্বকাস্ত এসেছে ? নিজে থেকে নিয়ে যেতে এসেছে ? তা হলে আর ভাবনা কী। তা হলে আর ভয় কিসের ?’ লাঠিতে ভয় দিয়ে বনবিহারী উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন : ‘আমি একটু দেখি দৃশ্যটা। যদিও মনে মনে আমার জানা, তবু একবার দেখি চোখ মেলে। পৃথিবীর কত দৃশ্য দেখি নি, দেখব না, শুধু এটা দেখি—’

কখন আবার স্মরিত পায়ে নিৰ্ব্বরের মত ‘নেমে গিয়েছে কাকলি, আর গোলমাল শুনে যদিও গায়ত্রী বেরিয়ে এসেছে, তাকে ব্যাপারটা আত্মপূর্বিক বুঝতে না

ই, ট্যাক্সিতে স্বকাস্তের পাশে উঠে বসেছে। দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে স্টার্ট-াওয়া গাড়ির ভরপুর আনন্দে বলে উঠেছে, ‘চলুন।’

গাড়িটা কতদূর যেতেই স্বকাস্ত বললে, ‘আজ আফিস না গেলে কেমন হয় ?’

‘খুব ভালো হয়। এই গাড়িতে করে একটানা—’ দিবা সায় দিল কাকলি।

‘পাগল !’ কাকলির চোখের উপর চোখ ফেলল স্বকাস্ত : ‘আফিস কামাই করলে কি চলে ?’

‘সর্বনাশ।’ হেসে উঠে সায় দিল কাকলি : ‘সবার উপরে আফিস সত্য তাহার উপরে নাই।’

প্রায় দুটো, কাকলির ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।

সামান্য চা-টোস্টে নিরীহ টিফিন করছে কাকলি, তাতে পর্যন্ত বিস্ম। বাজুক পে-
তুলবে না রিসিভার।

বা হাতে আধখাওয়া টোস্ট, ডান হাতে ডাঁটিধরা চায়ের পেয়ালা—টেবিলের উপর
মেল-ধরা পত্রিকাটার পৃষ্ঠায় চুপচাপ চোখ রেখে বসে রইল কাকলি।

বাজুক কত বাজতে পারে। একসময় নিজেই ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেবে। অন্তিম
করে নেবে ঘরে কাকলি নেই। অগ্নজ গিয়েছে।

হয়তো বাজে ডাক কিন্তু টেলিফোনটা বেজে-কেঁদে এমন একটা ভাব দেখাবে যেন
কত জরুরি। যেন কান পেতে কথাটা না শুনে নিলে রাজ্য ভেসে যাবে। একটা
জ্যাস্ত লোক মশরীরে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করলে কেউ গ্রাহ্য করে না, কিং
ফোন বেজেছে কী, তক্ষুনি তার তাঁবেদারি করতে ছোটো। রেহাই দেবে না,
প্রাণ ঝালাপালা করে ছাড়বে। দশ দিক থেকে দশটা লোককে ছুটিয়ে আনবে হে-
মত। এতটুকু ভদ্রতা নেই, নীরবে এতটুকু প্রতীক্ষা করবার শালীনতা জানে না

টেলিফোনটা একেকসময় বেআক্র যন্ত্রণা।

বাজুক যত খুশি। কান দেবে না।

সাধ্য কী উদাসীন থাকো। দরজার পাশে চাপরাসি মোতায়েন, সে উঠে এল,
মেমসাহেব কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? নাকি অগতাবে ব্যস্ত?

রিসিভারটা তুলে নিল কাকলি।

‘হ্যালো।’

‘আমি কি মিস মিত্রর সঙ্গে কথা বলছি?’ ওপার থেকে প্রশ্ন এল।

‘হ্যাঁ। মিস মিত্র। বলুন।’

‘সেই ফতেচাঁদ নাথমলের ফাইলটা নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ছিল।’

‘কার ফাইল?’

নামটা ওপার থেকে পুনরুক্ত হল।

‘কী বললেন ? লালচাঁদ জেঠমল ? বেশ তো, আপনার যা বক্তব্য, নোট দিয়ে দিন না ।’ বললে কাকলি ।

‘শুধু নোট দিলে হবে না । একটু ডিসকাশন দরকার ।’

‘যদি ডিসকাশন দরকার বোঝেন ফাইলটা নিয়ে চলে আসুন ।’

‘এখুনি যাব, না অল্প সময় ?’

‘বিষয়টা যখন জরুরি তখন এখুনি বৈকি ।’ কাকলি একবার অবশিষ্ট চায়ের পরিমাণ ও টোস্টের আয়তন দেখে নিল : ‘যদি অস্থবিধে না হয় এই মুহূর্তে ।’ টোস্টের বাকি টুকরোটা মুখে পুরে বাকি চাটুকু এক ঢোঁকে শেষ করে ছিমছাম হয়ে বসল কাকলি ।

চারদিকের দেয়ালগুলোকে ঠিক শোনানো হয়েছে । ঠিক শোনানো হয়েছে আদালি চাপরাসিকে । আর যদি কারু আড়ি পাতা অভ্যাস থাকে সেও শুনে রাখো ।

ফাইল হাতে স্বকাস্ত কাকলির ঘরে ঢুকল । সসজ্জমে পথ ছেড়ে দিল চাপরাসি ।

মুখোমুখি চেয়ারে বসল স্বকাস্ত । একরাশ গান্ধীর্ষ দিয়ে মুখের মূহু হাসিটি চাপা দিল কাকলি ।

‘আপনার টিফিন হয়ে গিয়েছে ?’ জিজ্ঞেস করল স্বকাস্ত ।

‘হ্যাঁ । আপনার ?’ কাকলি চোখ তুলল ।

‘না । এবার যাব ক্যান্টিনে ।’

‘কেন, আপনার হোটেল থেকে আনিয়ে নিলেই তো পারেন ।’

‘হরে দরে সেই একই কথা । যা হোটেল তাই ক্যান্টিন । যা মেকি তাই ভেজাল ।’

‘হ্যাঁ, যখন বাড়ি হবে, তখনই আসবে বাড়ি থেকে ।’

‘আর, তখন, যদি আপত্তি না করেন, ঐ সঙ্গে আপনারটাও আসবে ।’

হাসি উকি দিতে চাচ্ছিল, আবার তা ঢেকে দিল কাকলি । বললে, ‘ডিসকাশন তো হল, ফাইলটা রেখে যান ।’

উঠতে চেয়েও উঠল না স্বকাস্ত । বললে, ‘কিন্তু দেখবেন মেন পয়েন্টটা যেন মিস করবেন না ।’

‘হ্যাঁ দেখছি । কী বলুন তো পয়েন্টটা ?’

হঠাৎ গলা নামাল স্বকাস্ত । প্রায় ধূসর বর্ণের করে তুলল । বললে ‘ছুটির পর হু-জনে একত্র কিরব ।’

কাকলি কথা না বলে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিল।

উঠে চলে যাচ্ছিল স্বকান্ত। দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরল। বললে, ‘ই্যা, আরো একটা পয়েন্ট আছে। মাইনর মনে হতে পারে কিন্তু অল দি সেম—’

‘কী বলুন?’

টেবিলের প্রতিকূলে না দাঁড়িয়ে একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল স্বকান্ত। অক্ষুটে বললে, ‘এই আপনাকে আপনি করে বলতে খুব মিষ্টি লাগছে।’

মধুতে মুখ-চোখ ভরে গেল কাকলির। পরিহাসের দীপ্তিটুকু বাঁচিয়ে রেখে বললে, ‘বেশি আপনার হলে অমনি করেই বোধ হয় বলতে হয়। তেমনি বোধ হয় নিয়ম বাঙলা ভাষার।’ বলেই বন্ধু চৌচৌর উপর কাকলি তর্জনী রাখল। যেন শব্দ করে না হেসে ওঠে স্বকান্ত।

আফিস ছুটির পর দু-জনে, স্বকান্ত আর কাকলি, একত্র হল। গাড়িঘোড়া দূর স্থান, দু-জনে চলল পদব্রজে।

‘জগজ্জন আমাদের দেখছে।’ চলতে-চলতে বললে কাকলি।

‘তার চেয়ে বড় কথা, আমরা আমাদের দেখছি।’ স্বকান্ত দূরে ছিটকে পড়লেও ভিড়ের ব্যবহারে আবার কাছে সরে এল।

‘দেখছি আমাদের অফুরন্ততা। আমাদের অনেক স্থান, অনেক আশা, অনেক ভবিষ্যৎ। দেখছি বিচ্ছেদের শেষ আছে কিন্তু মিলনের শেষ নেই।’

‘আর ভালোবাসার?’ ভালহৌসি স্কোয়ারের মত জায়গায় এ প্রশ্ন চলে কিনা ভেবেও দেখল না কাকলি।

‘প্রহরের শেষ আছে কিন্তু মধুরের শেষ কই। শুনুন—’

‘শুনছি।’

‘আমার হোটেলে আপনার বন্ধু বিনতার যেদিন নেমস্তন্ন, আমার ইচ্ছে সেদিন আপনিও থাকেন সেই আসরে।’

‘মানে সেদিন আমারও নেমস্তন্ন?’ খুশিতে উছলে উঠল কাকলি : ‘সে নেমস্তন্ন তো রাতে।’

‘আমার ইচ্ছে আপনি সেদিন সন্ধ্যা থেকেই আমার হোটেলে থাকেন।’

‘সন্ধ্যা থেকেই?’

‘মানে, বিনতার পৌছবার আগে থেকেই। ধরুন’, কাকলিকে একটা জায়গায় দাঁড় করাল স্বকান্ত : ‘ধরুন, বিনতাকে সময় দেওয়া হল আটটা, আর আপনি এক ঘণ্টা আগে থেকে, সাতটা থেকেই, উপস্থিত।’

‘কেন, আমিও তো আগন্তুক, বাইরের লোক, আমিও আটটার সময়ই আসব।’ বললে কাকলি।

‘না, না, সেদিন আপনার অনেক কাজ, আপনি আগে না এলে চলবে না।’
স্বকান্তের স্বরে মিনতি স্বরতে লাগল : ‘আপনি এসে ঘরদোর সাফস্বতরো করবেন, খাবার টেবিলটা একটু সাজাবেন-গুছাবেন, মানে ঘরের একটু কাজকর্ম করে দেবেন আর কি।’

‘বুঝেছি।’ মুচকে হাসল কাকলি।

‘কী বুঝেছেন?’

‘বুঝেছি, যাতে বিনতা এসে বুঝতে পারে আমিই আগে থেকে ঘর জুড়ে রয়েছি— তার চুঁ মারা বুঝা।’

‘ঠিক বুঝেছেন।’ উল্লসিত হয়ে উঠল স্বকান্ত : ‘আপনি কী বুদ্ধিমতী! বুদ্ধিমতী না হলে এত উন্নতি হয় আপনার?’

‘কিন্তু, না, সেটা ঠিক হবে না।’ আবার চলতে শুরু করল কাকলি।

‘না, না, ঠিক হবে, সুন্দর হবে।’ কখনো রাস্তায় কখনো ফুটপাথে নেমে-উঠে উঠে-নেমে পথ করতে লাগল স্বকান্ত : ‘আমাকে তা হলে আর বক্তৃতা করে বোঝাতে হয় না। ছোট্ট নীরব দৃশ্যটি থেকেই ও সব বুঝে নিতে পারে। যেমন সেদিন আপনাদের বাড়ির দরজায়, কিছু বলতে-কইতে হয় নি, কাঠখড় পোড়াতে হয় নি, চক্ষের নিমেষে বুঝে নিয়েছিল বরেন।’

‘বরেনবাবুর কথা আলাদা।’ নিজেই এবার দাঁড়াল কাকলি : ‘বরেনবাবুর জন্তে সে দৃশ্য দৈব রচনা করেছিল। তার উপর কার হাত নেই। আর বিনতার জন্তে এ দৃশ্য আমরা নিজেরা রচনা করতে যাচ্ছি। মানে ওকে ডেকে এনে আঘাত দিতে যাচ্ছি। এ রুঢ়তাটা ঠিক নয়। কী দরকার এই রুঢ়তার?’

‘মানে, বোঝানোটা নির্বিবাদ করা যেত।’

‘কী দরকার! আমি নিজেই গিয়ে বলব সব ওকে।’

‘আপনিই বলবেন? কী বলবেন?’

‘বলব,’ একমুখ হাসল কাকলি : ‘বলব যে রাম মরেও মরে না। ভালো-বাসাকে তাড়িয়ে দিলেও যায় না চলে। দরজার কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে।’

হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে চলে এল মার্কেট।

ছেলেমাছবির হাওয়া লাগল দু-জনকে।

‘জীবনে ভোগ্য কী জানেন?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘জানি।’

‘কী?’

‘জীবনে ভোগ্য সহজ স্থ।’

‘আপাতত কী?’

‘আপাতত ভালমুট কিনে খাওয়া।’

‘ছাত্র হিসেবে আপনি বরাবরই ত্রিলিয়াস্ট। কী সুন্দর পারলেন বলুন তো।’

একই ঠোঙা থেকে তুলে-তুলে দিবি এণ্ডতে লাগল দু-জনে। বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ চোঁচিয়ে উঠল কাকলি, ‘এ কি, ভুলে যাচ্ছেন কেন? ওজন নিতে হবে না?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ,’ পরিপূর্ণ প্রতিধ্বনি করল স্কাস্ত : ‘সেই সেবার বিয়ের আগে ওজন নিয়েছিলাম, এবার আবার বিয়ের আগে ওজন নিতে হয়।’

আর দরকার নেই। মাথায় আলোর টুপি-পরা গাড়ি পাওয়া গিয়েছে একটা। দু-জনে ছুটে গিয়ে উঠে বসল।

‘সেবারে ওজন কমে গিয়েছিল।’ বললে কাকলি।

‘এবারে নির্ধাত বেড়েছে।’ স্কাস্ত বললে।

ট্যাক্সিটা কাকলিদের বাড়ির কাছে এসেই থামল। নামবার আগে স্কাস্ত বললে, ‘তা হলে বিনতার নেমস্তলটা ক্যানসেলড হল?’

‘হ্যাঁ, ক্যানসেলড। ওর নেমস্তলটা এ বাড়িতে হবে। আমিই ওকে বলে বুঝিয়ে এখানে নেমস্তল করে আসব।’ তদগত হয়ে বললে কাকলি, ‘ও কেন অস্বার্থী হবে! আমি আমার নিজের জিনিসই ফিরে পাচ্ছি। এতে ওর ঈর্ষা করবার কিছু নেই। ও ভালো মেয়ে। ও ঠিক খুশি হবে দেখবেন। আসবে নেমস্তলে। ও আমাকে আবার সাজিয়ে দেবে।’

‘দিক। মনে রাখবেন ওর নেমস্তলটাই ক্যানসেলড। আপনারটা নয়।’ বললে স্কাস্ত, ‘তাই আপনি আসবেন—’

‘হ্যাঁ, যতক্ষণ কলিগ্‌ আছি যাব মাঝে-মাঝে।’

‘আর যখন কলিগ্‌ থাকবেন না? কিংবা কলিগ্‌ ছাড়া আরো কিছু হবেন?’

‘তখন আর যাব কী! তখন থাকব।’

দু-জনে একসঙ্গে নামল আর নেমেই দেখল সামনে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী। স্তব্ধ ক্রুদ্ধ উদ্বেজিত মূর্তি। যেন ওদেরকে দেখবার জেগেই রয়েছে দাঁড়িয়ে।

‘বাবা জেগে আছেন?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি।

‘না, ওর শরীর ভালো নেই এ বেলা। ওকে ডিস্টার্ব করাটা ঠিক হবে না।’

‘আমি তা হলে আরেক সময় আসব।’ ট্যান্সি ছেড়ে দেয় নি, ওটা নিয়েই ফিরে গেল স্বকান্ত।

কতক্ষণ পরে বনবিহারী কাকলির খোঁজ করলেন।

কাছেই বসে ছিল গায়ত্রী, বললে, ‘এখনো ফেরে নি।’

‘ফেরে নি? সে কী? রাত কত হল?’

ঘরে মূহু নীলাভ আলো জ্বলছে, ঘড়ি দেখা যায় না। ‘কে জানে কত!’ গায়ত্রী বিরক্তিতে বিধিয়ে উঠল : ‘কোথায় কোথায় ঘুরছে!’

‘আহা, ঘুরুক। কতদিন পরে বালিতে-পোতা পরশমণির টুকরোটা ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে, যা কিছু ছুঁচ্ছে সোনা করে দেখছে। আহা, তাই দেখুক, সমস্তই সোনা করে দেখুক।’ নড়ে-চড়ে উঠলেন বনবিহারী : ‘কিন্তু স্বকান্ত একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না কেন? ওর বিয়ে, ওরই তো তোড়জোড় করার কথা। ঝাঁধন ও-ই ছিঁড়েছে, ও-ই তো উদ্বোধন করে এসে গ্রন্থি দেবে। বিয়ের পর কাকলিকে নিয়ে কোথায় উঠবে, ক্ল্যাটে না বাড়িতে—সব আমার সঙ্গে পরামর্শ করবে তো! শোনো, কালকেই নরনাথকে ডাকাও, দেবনাথকে পাঠাও ওর কাছে। নরু এসে না পড়লে কিছু হবে না।’

কাউকে পাঠিয়ে কাজ নেই, গায়ত্রী পরদিন নিজেই গেল নরনাথের কাছে। বললে, ‘ঠাকুরপো উদ্ধার করো।’

‘কেন, কী হল?’ হাসতে হাসতে নরনাথ বললে, ‘কোনো বিয়ে সংক্রান্ত ব্যাপার হয় তো, বলুন, ঠিক ম্যানেজ করে দেব।’

‘কাকলি সেই বিয়ের নোটিশ দিয়েছিল না—তুমি তো জানো—’ ইন্দিরা এসে গিয়েছে, তাকে লক্ষ্য করল গায়ত্রী : ‘সেই বরেনের সঙ্গে বিয়ে।’

‘বা, জানি বৈকি।’ ইন্দিরা গবের ভাব করল, ‘আমি তো ছিলাম যখন নোটিশ সহ করে ছু-জনে। কেন, এখন কী হয়েছে?’

‘কাকলি টালবাহানা শুরু করেছে। ঐ নোটিশে এক্ষুনি-এক্সুনি বিয়ে করতে চাচ্ছে না।’

‘কী বলছে?’ নরনাথ গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল।

‘বলছে, শরীর খারাপ, মন, অস্থির—হেন-তেন, যত সব ছেঁদো কথা।’ গায়ত্রী গলা নামাল : ‘আসল কারণ যা আন্ডাজ করছি, ঐ লোকটা, আগের ঐ স্বামীটা ওর পিছু নিয়েছে। তাইতেই ওর মনটা নরম হতে চাইছে, সময় চাইছে, বলছে, ঐ নোটিশটা যাক, দরকার হয় আবার না-হয় নতুন দেব।’

‘ছি ছি ছি, আবার ঐ স্বকাস্তটার সঙ্গে মিলবে?’ নরনাথ থিকার দিয়ে উঠল : ‘তা হলে তো আবার ঝগড়া, আবার কোর্ট, আবার ডিভোর্স। যে দু’কাঠি একবার বাজে, বারে-বারেই বাজে। তা ছাড়া বরেনের কাছে স্বকাস্ত একটা পাজ! কুমিরের কাছে টিকটিকি!’

‘তা হলে তুমি একটা বিহিত করো।’ গায়ত্রী উৎসাহে এগিয়ে এল।

‘তা করে দিচ্ছি। নোটিশের আয়ু আর কতদিন?’

‘যতদূর শুনেছি দু-চার দিন আরো আছে।’

‘বেশ, কাল শনিবার, কালকেই বিয়েটা লাগিয়ে দিতে হয়।’

‘কালকেই?’

‘হ্যাঁ, দেরি করা চলবে না। একবার একটা নোটিশ ল্যাপস করে গেলে দ্বিতীয় নোটিশে বরেনকে পাওয়া যাবে এ মনে হয় না। তার বয়ে গেছে অপেক্ষা করতে।’ নরনাথ পায়ের উপর পা তুলে গ্যাট হয়ে বসল চেয়ারে : ‘যে নোটিশটা দেওয়া হয়েছে সেটা তো আসলে বরেনকেই আটকাবার ফাঁদ। ওটাকে কিছুতেই ফসকাতে দেওয়া নয়। স্বতরাং শুভম্ভ শীঘ্র, হ্যাঁ, কাল, কালই বিয়েটা হয়ে যাবে।’

‘হয়ে যাবে!’

‘কঠিনটা কী! ম্যারেজ আফিসে গিয়ে ফর্মটা সই করে দেওয়া। আর তিন জন সাক্ষী হওয়া। সে আমি, তুমি আর ইন্দিরাই হতে পারব।’

‘কিন্তু কাকলিকে সেখানে নেবে কী করে?’

হাসল নরনাথ : ‘সে আমি দেখব।’

‘আর নিলেই বা কী! সই করাবে কী করে?’

‘যদি নিয়ে যেতে পারি, সই করাতে বেগ পেতে হবে না!’ নরনাথ অহুতাপের স্বর আনল : ‘ও জানে না ও কী হারাতে বসেছে! ওর যা দ্বিধা তার মূলে একটা প্রাচীন সংস্কার শুধু কাজ করছে। কলমের নিবের এক আঁচড়ে কেটে যাবে সেই দ্বিধা, আর যখন পরিচ্ছন্ন অক্ষরে ও দলিল সই করে উঠবে, দেখবে সমস্ত কিছু পরিচ্ছন্ন। আরেক আকাশে আরেক সূর্য। কিন্তু দাদা, দাদা কী বলেন?’

‘যার পক্ষাঘাত দেহে তার পক্ষাঘাত মনেও!’

‘বুঝেছি। তুমি কিছু ভেবো না। সব ব্যাধি সেরে যাবে।’ নরনাথ পা নামাল : ‘তুমি বাড়ি যাও। চুপচাপ থাকো। আমি সব ব্যবস্থা করছি। ব্যবস্থা তো ভারি! শুধু ফর্মে কাকলির একটা সই! তা আর করিয়ে নিতে কতক্ষণ! এমন সোনার নোটিশ অবহেলায় বা ঔদাসীন্যে বরবাদ করে দেওয়া যায় না।’

বরেনের আফিসে খবর নিয়ে জানল বরেন কদিন আসছে না আফিসে। না, তেমন কোনো অসুখ-বিসুখ নয়, এমনি আসছে না। বাড়িতেই আছে। বিশ্রাম নিচ্ছে।

বেশ, ওকে ওর বাড়ি থেকেই তুলে নিতে হবে। বেশ একটা বিশ্বয়ের ব্যাপার হবে ওর কাছে। বিরাট আনন্দের ব্যাপার।

সন্দের দিকে নরনাথ গেল বনবিহারীর কাছে।

‘ডেকেছেন?’

‘হ্যাঁ, এবার তাড়াতাড়ি লাগিয়ে দাও বিয়েটা। তুমি এসে না পড়লে কিছু হবে না।’ স্বপ্নের চোখে বলতে লাগলেন বনবিহারী: ‘এবার ছাদ জুড়ে প্রকাণ্ড প্যাণ্ডুল তোলা, আলো জ্বালাও। নহবত বসায়। খরচের এন্টিমেট করো। নিমন্ত্রণের লিষ্টি—’

‘ইন এনি কেস, বড় করে নেমস্তু তো একটা করতেই হবে।’ বললে নরনাথ।

‘তা তুমি খরচের জন্তে ভেবো না। সেই দশ হাজার টাকা যা একবার কাকলিকে দিয়ে ফের ফিরিয়ে নিয়েছিলাম তা তোলা আছে।’ বললেন বনবিহারী, ‘সেই টাকা এবার কাজে লাগবে।’

‘তা সব করে দিচ্ছি ঠিকঠাক। অর্থাৎ যা মহামায়া করাচ্ছেন।’ বিজ্ঞের মত হাসল নরনাথ: ‘কই, বউদি কই, কাকলি কই! কালকে দুপুরে আমাদের ওখানে নেমস্তু তোমাদের।’

‘কেন, কাল কী?’ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল গায়ত্রী।

‘কালকে আমাদের বিয়ের আনিভার্সারি।’ অলঙ্কারের মত হাসল নরনাথ: ‘এ উৎসব তো ঢোল সহরত করে করা যায় না। একটু গোপনেই করতে হয়। তাই নেমস্তুটা বাড়িতে নয়, হোটеле। লাঞ্চার নেমস্তু।’ কাকলিকে দেখা গেল বাইরে, তাই এবার তাকে লক্ষ্য করল নরনাথ: ‘বারোটার মধ্যেই ফিরে এসো বাড়ি; বেশ, সাড়ে বারোটা। আমি আর ইন্দিরা আসব গাড়ি নিয়ে। তৈরি থেকে, হ্যাঁ, কাল, শনিবার। শনিবার ভাঙা আফিস ফেলে চলে আসতে বেগ পেতে হবে না।’

কাকলি বললে, ‘বিয়ের বার্ষিকীতে কী উপহার চলে—’

‘ফুল, ফুল, যে কোনো অবস্থাতেই ফুল। জন্মদিনে মৃত্যুদিনে বিয়ের রাত্রে।’

‘বিয়ের রাতের কথা কে বলছে? বিয়ের দিনে, মানে বিয়ের বার্ষিকীতে?’

‘সিঁছুর—সিঁছুরের কোঁটো।’ গায়ত্রীর দিকে তাকাল নয়নাথ।

পরদিন আফিসে গিয়ে সকালের দিকেই স্বকাস্তকে ফোন করল কাকলি।

‘আমি আজ বারোটায় ফিরে যাচ্ছি বাড়ি। আমাকে আর মাকে লাঞ্চে নেমস্তন্ন করেছেন নরুকাকা। নরুকাকার বিয়ের অ্যানিভার্সারি আজ। না গেলেই নয়। আপনি তাই আজ একাই ফিরবেন।’

‘একাই ফিরব! ভবসংসারে একা এসেছি একাই ফিরব।’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্বকাস্ত।

‘ওহুন, আজ ছপুরে, একটা নাগাদ আপনি আহুন এ বাড়ি, বাবার সঙ্গে দেখা করুন। আজই স্থবিধে, মা থাকবে না ছপুরে। চলে আহুন—’

‘আপনিও তো থাকবেন না।’

‘তার মানে কোনো বাধাই থাকবে না আপনার।’ হেসে উঠল কাকলি: ‘আমি বাবাকে বলে রাখব। বাবা আপনার জন্তে জেগে থাকবেন।’

সেই অহুসারে ছপুরে চলে এসেছে স্বকাস্ত। দরজা খোলা পেয়েছে। সোজা উঠে এসেছে বনবিহারীর কাছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে চলতে-চলতে। কোনো দিকে কোনো বাধাই দেখতে পাচ্ছে না।

প্রণাম করে বিনম্র মুখে দাঁড়াল স্বকাস্ত।

বনবিহারী উঠে বসে একেবারে হাতে ধরে তাকে বসালেন পাশটিতে। অনেকক্ষণ সানন্দ স্নেহে তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর কথা শুরু করলেন। অনন্ত কথা, অবাস্তর কথা, অনন্ত আনন্দের অবাস্তর কথা।

‘তোমাকে একটু চা দেবে কে?’

‘আমি আছি।’ খাবারের প্লেট আর চায়ের ডিশ নিয়ে পত্রালি বেরুল।

‘কাকলি আর ওর মা নেই বুঝি বাড়ি?’ বলে মুখে উষ্মেগের রেখা ফোটালেন বনবিহারী: ‘কাকলি একা-একা বাইরে থাকে এ আর আমার এখন পছন্দ নয়। বাইরে যতক্ষণ তোমার জিহ্বাদারিতে আছে ততক্ষণই আমি নিশ্চিন্ত। শোনো, তুমি ওকে বাইরে থাকতে দিও না একা-একা।’

‘ও তো এখন মার সঙ্গে আছে, নরুকাকার সঙ্গে। এখন আর ভয় কী।’ যুহু রেথায় হাসল স্বকাস্ত।

‘না, না, কাউকে বিশ্বাস নেই। পুরোপুরি কেউ জাগ্রত নয় তোমার মত।’

‘কাকলি নিজেই জাগ্রত।’

‘হ্যাঁ, আরো শোনো, তোমাদের বিয়েটার আর দেয়ি হচ্ছে কেন? টাকার কথা ভাবছ? টাকা আমি দেব। কাকলির দশ হাজার টাকাই আমার কাছে মজুদ আছে।’

‘না, না, টাকার কথা নয়।’

‘তবে ? বিয়ের পরে বাসস্থানের কথা ?’

‘না, সেটা আবার সমস্যা কী।’

‘তবে ?’

‘আইনের একটু বাধা আছে সামান্য।’

‘আইনের বাধা ?’

হ্যাঁ, ডিভোর্সের ডিক্রির পর এক বছর না যেতে প্রাক্তন স্বামী-স্ত্রী ফের বিয়ে করতে পারে না।’ হাসল স্বকান্ত : ‘তা, বছর ঘুরতে আর দেরি নেই। দেখতে-দেখতে কেটে যাবে কটা দিন। আপনি তার জন্তে ভাববেন না।’

‘ততদিন আমি যদি না বাঁচি ?’ ক্লান্ত চোখ বুজে শুলেন বনবিহারী।

. . . ৫৫

পথে যেতে-যেতেই নরনাথ বললে, ‘আরেকজনকে পিক আপ করে নিতে হবে।’

‘আগে থেকে বলা আছে তো ?’ মুখে বিরক্ত ভাব আনবার চেষ্টা করে গায়ত্রী বললে।

‘আগে থেকে বলা না থাকলেই বা কী !’ ড্রাইভারের পাশে বসা নরনাথ বললে, ‘পুরুষমানুষ তো, এক ভাকে তৈরি হয়ে নেবে।’ তারপরে কথাটা একটু চলুক, কথার পিঠে কাকলি কিছু বলুক, বলতে-বলতে একটু অগ্নমনস্ক হয়ে থাক, সেই আশায় নরনাথ বললে, ‘এ তো আর মেয়ে নয়। মেয়েদেরই তো হয় না। হয় না, হয় না, হয়ই না। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার পর সিনেমায় ঢোকে।’

প্রতিবাদ যা এল, কাকলির থেকে নয়, ইন্দিরার থেকে।

‘পুরুষদের কথা আর বলতে হবে না। বেরিয়েও বেরুনো হয় না, ফিরে আসে। সেদিন বেরিয়েছে সেজেগুজে, ও মা, কতক্ষণ পরে দেখি ফিরে এসেছে। কী ব্যাপার ? না, পকেটে কমাল নেই !’ হাসতে লাগল ইন্দিরা।

‘উঃ, সে কী ট্রাজেডি, পকেটে কমাল না থাকা। সঙ্গে পার্স না থাকলেও হয়তো মানেজ করা যায়, কিন্তু কমাল না থাকলে ! জেখর রক্ষা করুন। পকেটে কমাল নেই মানে বুকে জুপিঙ নেই।’

‘তারপর সেই কমাল খোঁজা মানে প্রায় সীতা-খোঁজা—প্রায় কিঙ্কিণী-কাণ্ড।’ ইন্দিরাই বললে, ‘সব দেখা গেছে। পুরুষেরও কম দেয়ি হয় না তৈরি হতে। বেকুব আর হস্তো দাড়ি কামাতে বসল, নয়তো জুতোয় কালি দিতে—ওসব বালাই মেয়েদের নেই—’

‘ওসব নন-এসেনশিয়াল, ওসব পুরুষ অনায়াসে বাদ দিয়ে দিতে পারে। কে বা তার মুখ দেখে, কে বা তাকায় পায়ের দিকে। কিন্তু মেয়েদের শুধু ম্যাচ করতে করতেই জীবন কাটল। স্ট্রাণ্ডেলের স্ট্র্যাপের সঙ্গে ব্লাউজের হাতার, ব্লাউজের হাতার সঙ্গে শাড়ির পাড়ের। আবার সেই রঙের এক ঝাঁক প্লাসটিকের চুড়ি। এদিকে জীবনে আসল ম্যাচেই হয়তো ফাট হয়ে গিয়েছে।’

ঘাড় বেকিয়ে তাকাল নরনাথ। কাকলি এতটুকু হাসছে না। যেন কানেই নিচ্ছে না কথা। বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘যে ঘাই বলুক, কবরস্তস্তকে চুনকাম করা মেয়েদের পক্ষে এসেনশিয়াল—’

‘কথাটা কী বললে?’

‘কবরস্তস্ত।’

‘সে আবার কী?’

‘যতদিন মেয়েদের স্বাস্থ্য শ্রী যৌবন থাকে ততদিন পলস্তারার দরকার হয় না। কিন্তু যখন ওগুলো চলে যায় গোরস্থানে তখন মুখখানি শুধু স্মৃতিস্তস্ত, কবরস্তস্ত হয়ে থাকে। তখন তার কলি না ফিরিয়ে আর উপায় থাকে না। লজ্জায় মুখ চুন করার একটা কথা আছে বাঙলা ভাষায়। ঘুম যখন আগে থেকেই চুন তখন আর লজ্জার দরকার কী! তাই লজ্জাও উঠে গিয়েছে দেশ থেকে।’

এ দস্তুরমত আঘাত করার মত কথা। তবু কাকলির এতটুকুও চাঞ্চল্য নেই।

আরেকজন পুরুষকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে অথচ সে কে মা বা নরুকাকিমা কেউই কিছু ভাঙতে চাইছে না; আর নরুকাকা চেপে যাচ্ছেন এটা তার কাছে কেমন বিসদৃশ লাগল। পরিকার করা উচিত। সে কি এক টেবিলে পড়ে, এক সংস্রবে?

‘হ্যাঁ, পুরুষদের বেলায়ও ঝামেলা কম নেই।’ যত আজোবাজে কথার জের টানছে নরনাথ: ‘হয়তো পাটভাঙা কাপড়টা খুলতে যেতেই ছেঁড়া বেকুল। আরো মারাত্মক, বাইরে বেকুবের পর হাঁটুর উপর নজরে এল ছেঁড়াটা। তখন সেটাকে চাকবার কী দুশ্চেষ্টা। হাঁটুর উপরে হাঁটু তুলে বসার স্টাইল করা। কিংবা ধরো, ধোপদস্ত পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলে একটাও বোতাম নেই, বোতাম লাগাবার লোক নেই—’

‘না, তোমার বোতাম কি আর লাগিয়ে দেওয়া হয়!’ উত্তর দিল ইন্দিরা।

‘মানে, ঠিক সে সময়টায় হয়তো প্রস্তুত নেই। তিনি থাকলেও ছুঁচ স্নতো হয়তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন গোটা দুই আলপিন কুড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়া—’

‘যেন আলপিনই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে!’

‘হ্যাঁ, তাই তো বলছি। পুরুষেরও অনেক শ্রায়া বাধা আছে, তবু সব সম্বন্ধেও পুরুষ মেয়ের চেয়ে ক্ষিপ্ত—’

কিস্ত এ কোন এলেকায় এসে পড়ল গাড়িটা?

গাড়িটা বেশ বড় জোগাড় হয়েছে, পিছনের সিটে মেয়ে তিনজন বসেছে আরাম করে, আগন্তুক ভদ্রলোককে অনায়াসে ধরবে ড্রাইভারের পাশে, তাতে কিছু ব্যস্ত হবার নেই। আর এ এলেকাতেই যে ভদ্রলোকের বাড়ি গাড়ি, মন্থর হয়ে আসাতেই তা বোঝা যাচ্ছে।

‘এক মিনিট!’ গাড়িটা থামতেই সামনের দিকের দরজা খুলে দ্রুত নেমে পড়ল নরনাথ : ‘বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসি।’

নরনাথ পাশের একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই বিহ্বলবেগে নেমে পড়ল কাকলি : ‘যাই আমিও একটু ঘুরে আসি, কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে।’

ক্ষিপ্ততা আর কাকে বলে। নেমে পড়েই চোখের পলকের মধ্যে তীরের মত কতটা পথ বেরিয়ে গিয়েছে কাকলি। কে তাকে ধরে! কে তার পিছু নেয়।

‘এ কী, কোথায় যাচ্ছিস তুই?’ হাওয়ায় কীণ কণ্ঠ তবু পাঠাল একবার গায়ত্রী। কাকলি ফিরেও তাকাল না।

‘ওদিকের গলিটার মধ্যে ঢুকল।’ ইন্দিরা বললে।

‘ওখানে ওর কে আছে?’ ভাবনা ধরল গায়ত্রীকে : ‘তবে ও পালাল নাকি?’

‘না, পালাবে কেন? পালাবে কোথায়? ফেরবার সময় ঐ গলির ভিতর দিয়ে যাব—হর্ন দিলেই কাকলি বেরিয়ে আসবে।’

‘ঐ গলির মধ্যে গাড়ি ঢুকবে না।’ ড্রাইভার বললে।

‘আচ্ছা, এটা যে রবেরেনর বাড়ি সেটা কাকলি বুঝতে পেরেছে?’ অসহায়ের মত বাড়িটারদিকে তাকাল গায়ত্রী।

‘তা কোন না পেরেছে! এত পরিচয়ের মধ্যে এক দিনও কাকলিকে নিজের বাড়িঘর দেখায় নি এ কী করে কল্পনা করা যায়!’

‘তাই আমার ইচ্ছে ছিল না, সবাই একসঙ্গে এসে তুলে নিয়ে যাই বরেনকে। ম্যারেজ আফিসে বরেন দিব্যি আগে যেত, আমরা পরে গিয়ে शामिल হতাম।’ কনক

আক্রোশে ফুঁসতে লাগল গায়ত্রী : ‘তখন দেখতাম কী করে পালিয়ে যেত ঝটকা মেয়ে !’

‘বা, কাকলি যদি অনিচ্ছুক হত, বিয়ের ফর্মে সই করত না। জোর করে সই করতে কী করে?’ ইন্দিরা বললে, ‘ধরতই না কলম। কী সব বলতে হয় মন্ত্র, উচ্চারণই করত না। বিয়ে পাশ করত না অফিসার।’

‘রাখো,’ নড়ে-চড়ে আঁট হয়ে বসল গায়ত্রী : ‘আমি জানি কী করে ফর্মে ওর নিতে হয় সই, কী করে—’

‘হ্যাঁ, সবই হচ্ছে সই, দলিলী ব্যাপার।’ ইন্দিরা আরো গভীরে গেল : ‘আর যখন দলিলী ব্যাপার তখন জোর-জবরদস্তিতে যাওয়া কেন? সরকারি লোকদের ঘুষ দিয়ে এত সব কাণ্ড হচ্ছে আর একটা বিয়ে হবে না?’

‘বিয়ে?’

‘বিয়ে মানে বিয়ের দলিল তৈরি হবে না? তিন সাক্ষী আর বরের সই তো মজুদই আছে, শুধু এক কনের দস্তখত। তা একটা মেয়েলি সই কারচুপি করা বাবে না? আর টাকায় এত সার্টিফিকেট হয় একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট হতে দোষ কী।’

‘ঠিক বলেছ।’ ক্রোধে আরো সংকীর্ণ হল গায়ত্রী : ‘ঠাকুরপোই তা ম্যানেজ করতে পারবে। তখন দেখব, উলটো গলিটার দিকে শ্রেনদৃষ্টি ছুঁড়ল : ‘কোথায় পালায়? কে ওকে আশ্রয় দেয়?’

দুপুরে ঘুমুচ্ছে বরেন, তাকে ঠেলে তুলতেই প্রলয়কাণ্ড।

‘উঠুন, চলুন চটপট—এখনো জামাই হন নি তাই তুমি বলছি না।’ দরজার ছিটকিনি খুলে দিতেই ঝড়ের মত ঢুকে পড়ল নরনাথ : ‘না, দেয়ি করবার সময় নেই। যতদূর সম্ভব, সংক্ষেপে তৈরি হয়ে নিন। এই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল তৈরি হয়ে বেরুতে কে বেশি দ্রুত—’

‘সে কী? কোথায় যাব?’

‘ম্যারেজ অফিস।’

‘সেখানে কী?’

‘সেখানে চণ্ডীপাঠ। ঝাঁজিয়ে উঠল নরনাথ : ‘সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভারী। সেখানে বিয়ে। বলুন, কার বিয়ে? তারও উত্তর দিচ্ছি, আপনার। বলুন, কার সঙ্গে? বলুন, তারও চাই নাকি উত্তর?’

‘বা, সেই তো আসল জিজ্ঞাসা।’

‘আমার ভাইঝি কাকলির সঙ্গে। কী, চিনতে পারলেন? নাকি দেখতে চান একবার?’

বরেন হাসল। চেয়ারে বসল। মুখোমুখি চেয়ারটাতে নরনাথকে ইশারা করল বসতে।

‘বসবার সময় নেই। দেরি হলে ম্যারেজ আফিস বন্ধ হয়ে যাবে।’

‘কিন্তু কাকলিকে আমি বিয়ে করি কী করে?’ বরেন সিগারেট বার করল : ‘কাকলি যে বিবাহিত।’

‘বিবাহিত?’ খেপে উঠল নরনাথ : ‘কে বললে? কই, কোনো রিম্যারেজ তো হয় নি।’

‘আহা, রিম্যারেজ হতে যাবে কেন? নরনাথের দিকে সিগারেটের কেসটা বাড়িয়ে দিল বরেন। নরনাথ নিল না বলে নিজেই একটা ধরাল একা একা। বললে, ‘ওর বিয়েটা হয়েছিল, সেটাই এখনো চলে আসছে।’

‘সেটা চলে আসছে কী!’ নরনাথ তর্জে উঠল : ‘সেটা কোট নাকচ করে দেয় নি? ওদের বিয়ে ডিজলভড্ হয়ে যায় নি?’

‘এমন এক ভালোবাসা আছে যা অল্প বিয়ে হয়ে গেলেও যায় না।’ করুণ করে হাসল বরেন : ‘তেমনি আবার ভালোবাসা আছে যা স্বক্ষেত্রে বিয়ে হয়ে সেই বিয়ে ভেঙে গেলেও বেঁচে থাকে।’

‘তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পাচ্ছি না।’

‘আমিও পাচ্ছি না। এ কাগজ-কলমে হিসেবের অঙ্ক নয় যে বোঝানো যায়। এ বুদ্ধির অগম্য। রক্তের গভীরে এক প্রচ্ছন্ন ব্যাধি।’

‘আমরা অত শত বুঝি না।’ নরনাথ দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল : ‘আমরা বুঝি সজ্ঞানে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে করেই হোক তার মান রাখতে হবে।’

‘তার মানে, ছলে বলে কৌশলে যে উপায়েই হোক বিয়েটা ঘটাতে হবে?’ জিজ্ঞেস করল বরেন।

‘নিশ্চয়ই। যি যখন আমার আর সে যি যদি সোজা আঙুলে না ওঠে—’

‘তখন আঙুল ঝাঁক করে যি তুলতে হবে? না।’ একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল বরেন : ‘ঝাঁক আঙুলের যিয়ে শ্রম বেশি, স্বাদ কম। জোবের মধ্যে শুধু জেল্লাই আছে, ক্ষুণ্ণ নেই। কী হবে উৎসবের আলো জ্বলে যদি প্রতিমায় না প্রাণ আনবার মজ্ঞ জানি। এ কথা শুধু আমি কেন, পুরাকালের সেই রাবণেরও জানা ছিল।’

‘কার জানা ছিল?’ হকচকিয়ে গেল নরনাথ।

‘রাবণের।’ রামের সীতাকে যে চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল বনের মধ্যে সে কি জোর করে সীতাকে বলীভূত করতে পারত না? শারীরিক, পাশবিক, শক্তি কি তার কম ছিল?’

‘রাবণ তো মূর্থ।’ উড়িয়ে দিল নরনাথ।

‘রাবণ মহান। কামে ক্রোধে মদে দর্পে অন্ধ হলেও রাবণ বুঝেছিল সেই আদিম সত্য কথা, যে কবিতা স্বয়ম্ভাগতা না হলে রস নেই! সীতাকে বললে, পরস্মীহরণ বা পরস্মীগমন রাক্ষসের স্বধর্ম, কিন্তু সীতা, আমি তোমার অনিচ্ছায় তোমাকে স্পর্শ করতে চাই না। তুমি নিজে থেকে আসবে তারই আশায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।’

সশব্দে হেসে উঠল নরনাথ : ‘বা, নিজে থেকেই তো এসেছে।’

‘নিজে থেকে এসেছে! কে নিজের থেকে এসেছে?’ বরেন মুচের মত স্থির হয়ে রইল।

‘সীতা নয়, আপনার কাকলি।’

‘কাকলি?’

‘শুধু এসেছে নয়, নিচে গাড়িতে বসে আছে।’

‘বাজে কথা।’ সিগারেটের ছাই ঝাড়ল বরেন।

‘শুধু কনে একা নয়, তার বিয়ের তিন হবু সাক্ষী। এক সাক্ষী আমি আর সাক্ষী তার মা ও কাকিমা। এখন দয়া করে বর গাত্রোত্থান করলেই হান্ধামা চুকে যায়।’

‘বলেন কী! ওঁরা সব বাইরে বসে আছেন? সে কী কথা? ওঁরা ভেতরে এসে বসুন।’ বরেন উদ্বেল হয়ে উঠল। পোড়া সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে দিল বাইরে। নিচে নামবার জন্তে উন্মুখ হল।

বাধা দিয়ে নরনাথ বললে, ‘একেরায়েই বেকনো যাক চলুন। ম্যারেজ আফিসে, হিজিবিজি কাজটা সেরে সোজা হোটেলে। সেখানে লাঞ্চ তৈরি। তারপর আর সব।’

‘না, না, তবু নিজের থেকে আগেই একবার দেখে নিই স্বচক্ষে।’ ঘরোয়া পোশাকেই নেমে চলল বরেন। পিছনে নরনাথ।

দরজায় গাড়ি একটা দাঁড়িয়ে আছে বটে। ছইলে ডাইভার। ভিতরে দু-জন মহিলা—কাকলির মা আর কাকিমা। কিন্তু এ কী গান্ধবী মায়া! কাকলি কোথায়?

‘সে কি! কাকলি কোথায়?’ রাস্তায় নেমে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করল নরনাথ।

‘এই তো এতক্ষণ ছিল গাড়ির মধ্যে ।’ গায়ত্রী বললে, ‘গাড়ি থামতেই নেমে পড়ল । এই একটু ঘুরে আসছি বলে চলে গেল ঐ দিকে, ঐ গলির মধ্যে—’

‘এই এখুনি আসবে ।’ স্তোকেব মত বললে ইন্দিরা, ‘নয়তো যাবার সময় ওখান থেকে ওকে তুলে নেব ।’

সকলের উদ্দেশ্যে করজোড়ে নমস্কার করল বরেন । তারপরে সদর, যেটা সাধারণত এ সময় খোলাই থাকে, বন্ধ করল নিজের হাতে, শশঙ্কে । তারপর উপরে, নিজের ঘরে চলে এল । বিছানাটার দিকে তাকাল । মনে হল এখনো কিছু ঘুমিয়ে নেওয়া যায় । তৃপ্তির শব্দ করে শুয়ে পড়ল আবার । পাশবালিশটা বুকে জড়িয়ে চোখ বুজল । বাকি ঘুমটুকুকে ডাকল, ডাকতে লাগল ।

... ৫৬

যত দূর সাধ্য জোরে পা চালিয়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করে বাড়তে লাগল কাকলি । দু-একটা খালি ট্যাক্সি কোন না চোখে পড়ল এখানে-ওখানে । লোভ হলেও ডাকতে সাহস হল না । কে জানে কোন চক্রান্তে মানুষ বইবার সোজা গাড়ি না হয়ে পাখি ধরবার ফাঁদ হয়ে এসেছে । কোন পথ দিয়ে ছুটিয়ে কোন আন্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলবে তার ঠিক কি ।

তার এখন কাজ হবে কি জালে পড়া আর জাল থেকে বেরিয়ে আসা ?

বড় রাস্তা পেতে দেরি হল না । কিন্তু কোথাও কি একটু ছায়া নেই যে শান্তিতে দাঁড়ায় ? দেখে-শুনে বাস ধরে ?

বাণবৈধা যন্ত্রণার মত লাগছে এখন এই ছপুরটাকে । যদি তেমন একটা দরজা-জানলা-আঁটা ছায়া-ছায়া-করা ঘর পাওয়া যেত আর একটা শীতলপাটির ঢালা বিছানা, তা হলে নদীর জলের উপর যেমন সন্ধ্যা পড়ে উপুড় হয়ে তেমন কাকলি একরাজ্যের ঘূমের উপরে একরাজ্যের ক্লাস্তি হয়ে উপুড় হয়ে পড়ত । নিজের মনে হাসল কাকলি । কেন, তেমন ঘর তো একথানা তার নিজের বাড়িতেই আছে । নির্জনতা দিয়ে তৈরি, নিঃসঙ্গতা দিয়ে ছায়া-করা । সেই ঘরের দরজা-জানলা এঁটে দিবি ঘুমোনো যায় গা ঢেলে । আর ঘুমিয়ে পড়লে পর শীতলপাটি না শীতল মাটি

এ কে খেয়াল করে ? তবে বাড়ি ফিরে গিয়েই তো যজ্ঞগায় লাগব করা যায় । কে আর টো-টো করে রোদ্ধুরে ?

কিন্তু এখন এমন পরিস্থিতি ঘুমবার সময়ও গ্রহরী দরকার । বেশ বিশ্বাসী, মজবুত, সতর্ক গ্রহরী । ঘরের মধ্যে নিজের কাজকর্ম, পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, অগ্রমনস্ক থাকবে, আর পরিপূর্ণ অর্পণে স্তর থেকে স্তরে, তল থেকে তলে, ঘুমের সমুদ্রে নেমে যাবে কাকলি । কতদিন ঘুমোয় নি এমন নিশ্চিন্তে, অল্পকূল পাহারার অধীনে । নিশ্চিন্ত না হতে পারলে আর ঘুম কই, ঘুমের স্মৃতি কই ?

সুন্দর ব্যবস্থা । নিজের মনেই আবার হাসল কাকলি, আর আরো একজন হাসছে সৌজন্যমিষ্ট স্তব্ধতার অক্ষরে, তাও বেশ বুঝতে পারল । তুমি ঘুমবে আর আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকব ? এদিকে ঘর অন্ধকার ।

অন্ধকারে পড়া যায় এমন গ্রন্থও কিছু আছে হয়তো পৃথিবীতে ।

তাই নাকি ? পড়া যায় আর অগ্রমনস্কও থাকা যায় !

কটা বাস ছেড়ে দিয়ে আরেকটা বাস-এ উঠে পড়ল কাকলি । এতক্ষণে যদি বুদ্ধি করে গিয়ে থাকে বাবার কাছে । কথাটা যদি পেড়ে আসে । তারপর কাকার কাছে পাঠাব । তা হলেই পাকা হবে বন্দোবস্ত । পূর্ণ হবে বৃত্তবলয় ।

‘বিনতা আছিস ?’ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হাঁক পাড়ল কাকলি ।

‘আছি । এইমাত্র আসছি ।’ ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল বিনতা : ‘এত তীব্র স্বর ? আনন্দ, না আর্তনাদ ?’

‘আনন্দও নয়, আর্তনাদও নয় । এ প্রতিবাদ । এ ক্রোধ ।’

‘কার উপর ? আমার উপর ?’

‘না । মার উপর ।’ ঘরের মধ্যে চলে এসে তক্তপোশে বসে পড়ল কাকলি ।

‘মার উপর ? কেন, কী হল ?’

‘সেই চিরন্তন হস্তক্ষেপ—’

‘কেন, কী বলছেন মাসিমা ?’ উৎসুক হল বিনতা । বসল মুখোমুখি ।

‘এদিকে বলছেন মেয়ের ইচ্ছেই একমাত্র গ্রাছ । আসলে তাঁর ইচ্ছের সঙ্গে মেয়ের ইচ্ছের মিশ খেলেই তবে তা গ্রাছ । নইলে ভেবে ছাথ আমি এত বড় ধাড়ী একটা মেয়ে, আমার একটা স্বাধীনতা নেই—’

‘মায়ের কাছে মেয়ে কখনো বড় হয় ? ডাক-নাম খুকিই থাকে ।’

‘খুকি ? আমি খুকি ? তোকে বরং খুকি বলা যায়, আমাকে নয় ।’ গর্বের ভাব করল কাকলি : ‘আমি বিবাহিত ।’

‘আর বিবাহিত কোথায় ?’ মুখ টিপে হাসল বিনতা।

‘আর বিবাহিত কোথায় মানে ? আমি কি তবে এখন প্রবাহিত ?’

‘প্রবাহিত !’ বিনতা এবার শব্দ করে হাসল।

‘মানে, আমি এখন শুধু বয়ে যেতে এসেছি ?’

‘বয়ে যেতে এলেই বা। প্রবাহিণীরই তো বেশি স্বাধীনতা।’

‘হ্যাঁ, সেই কথাটা বল। নদী কি পরের হাতে জাঁকা রেখা ধরে চলবে ? শুধু জলের নদী নয়, রক্তের নদী, হৃদয়ের আদি গোমুখী থেকে যার উৎসার—’

‘বা, সে কী কথা ? হৃদয়ের উপর হাত দেবে কে ? কেন, মাসিমা বলছেন কী ?’

‘বলছেন যার-তার সঙ্গে প্রেম করা চলবে না।’ বিনতার হাত চেপে ধরল কাকলি : ‘বল, এ কথা আমার মত সাবালক মেয়েকে কেউ বলতে পারে ? নিজের পায়ে দাঁড়ানো রোজগারে মেয়েকে ?’

‘বা, তা কী করে বলা যায় !’

‘ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান যার সঙ্গে আমার ইচ্ছে প্রণয় করব। বল, এতে আইন আমার পক্ষে নয় ? সমাজ ? ধর্ম ?’

‘এ কথা এতদিন পরে ওঠে কী করে ?’

‘উঠতেই পারে না। স্পষ্ট, শক্ত, দৃঢ় হয়ে আছে।’

‘তা ছাড়া যার সঙ্গে প্রেম করছিস সে তো মাসিমার মনোনীত। বিরোধ তা হলে বাধে কিসে ?’

‘না, মনোনীত নয়। তারই জন্তে বিরোধ।’

‘সে কি, মনোনীত নয় ?’ চমকে উঠল বিনতা।

‘মার কথা হচ্ছে, গোস্বামীকে ভালোবাসো, ভূস্বামীকে ভালোবাসো, ঠিক আছে, কিন্তু খবরদার, শুধু-স্বামীকে পাবে না ভালোবাসতে।’

‘কাকে ? মুখুস্বামীকে ?’

‘না, না, কোনো মাস্তানীকে নয়। শুধু-স্বামীকে। মানে পরের ভূতকে নয়, পূর্বের ভূতকে। সংক্ষেপে ভূতপূর্বকে।’ হাত ধরে ঝাঁকি মারল কাকলি : ‘বল, এমন কোনো গ্যাগ চলে— মানা যায় তেমন বন্ধন ?’

‘কী বলছিস !’ উছলে উঠল বিনতা : ‘তোমার কাছে ফিরে এসেছে স্বকাস্ত ?’

‘ফিরে আসার কথা নয়। স্বাধীনতার কথা। ফিরে আসতে পারার কথা, পথের কথা। ঘর বাঁধতে হবে বলে নতুন জমিতে নতুন শাজপাটে তুলতে হবে, পুরোনো ভাঙা ঘর মেরামত করে নেওয়া যাবে না সাবেক বনেদে এমন নিবেশ অচল।’

‘এক শো বার অচল ।’ গাঢ় সমর্থন করল বিনতা : ‘যদি মেরামত করে নেওয়া যায়, যদি মেরামতের মশলা থাকে, তবে তার মত শ্রেয় তার মত প্রেয় আর কী আছে, কী হতে পারে ? যা শ্রেয় তা সব সময়ে প্রেয় নয়, যা প্রেয় তা সব সময়ে শ্রেয় নয়, চিরদিন এই দ্বন্দ্বের কথা শুনে এসেছি । কিন্তু এইখানে নিষ্পন্দ, এইখানে শ্রেয়-প্রেয় একসঙ্গে ।’

কী স্থল্লর করে প্রশান্ত মুখে বলছে বিনতা । আর অমন নিপুণ করে কথাটা কাকলি সাজিয়েছিল বলেই না পেল অমন করে বলতে ।

‘হৃদয়ের কোন আকরে কোন মশলা যে লুকিয়ে আছে উপর-উপর বোঝা যায় না । গভীরে যখন যা লাগে তখনই কঠিনের শয্যা রসের ঘুম ভাঙে ।’

‘কিন্তু এতে মাসীমার অপ্রসাদ কেন ?’

‘আর তোর ?’ ভয়ে-ভয়ে তাকাল কাকলি ।

‘সোনার বাসন ভেঙে গিয়েছিল, আবার তা জোড়া পড়বে, এতে আমার আনন্দ, কার না আনন্দ, সকলের আনন্দ । আর তা ছাড়া যে পুরাতন ছিল, ছিন্নমূল হবার পর ফের স্বস্থানে তার পুনর্বাসন হচ্ছে এ প্রসঙ্গের কাছে বিনতা-বরেন অবাস্তর, তুচ্ছ । যেমন হৃদয়ের কাছে দেহাভ্যাস তুচ্ছ । যদি স্বকান্তকে আনতে পারিস তবে তো তুই জয়ী, তোর প্রেম জয়ী । সে ক্ষেত্রে মাসীমার তো উচিত তোকে সংবর্ধনা করা ।’

‘মার ধারণা আমি স্বকান্তকে আনছি না, স্বকান্তই আমাকে টানছে । সুতরাং আমার মান ইজ্জত থাকল না কিছু ।’

‘স্বকান্ত আনীত, না তুই টানিত, এ প্রসঙ্গও অনর্থক । মরুভূমির হাওয়া শুকনো তার মধ্যে জল নেই, তাই মেঘ এলেও তার থেকে বৃষ্টি সে আদায় করতে পারে না ।’ শাস্ত্রী মুখে মেখে বিনতা বললে, ‘কিন্তু যেখানে মেঘও জল হাওয়াতেও জল সেখানেই বর্ষণের আশীর্বাদ । যদি আবার তাদের মিলন হয়, আনন্দবর্ষণ হয়, এরই জন্তে হবে যে তোর প্রাণের এক কোণে একটুকু ভালোবাসা ওরও প্রাণের এক কোণে একটুকু লেগে ছিল । সে খুনী রঙ গেল না কিছুতেই । সেই ক্ষেত্রে ভালোবাসারই তো জয় দেব সবাই ।’

‘যদি বিয়ে হয়, যাবি তো ?’

‘এক শো বার যাব ।’ বলেই জিভ কাটল বিনতা : ‘না, এক শো বার নয় । এক বার যাব । গিয়ে প্রাণ ভরে সাজাব তোকে । দুর্গার মতন সাজাব !’

সেখান থেকে ফের বাস-এ করে স্বকান্তের হোটেল এল কাকলি । বললে, ‘শিগগির কিছু থাওয়ান । লাঞ্চ ভেঙে গিয়েছে । সাঁরাদিন প্রায় অভুক্ত আছি ।’ নিজেই

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল : ‘কই, ডাকুন কাউকে । মোগলাই পরোটার মত মুখ করে থাকবেন না ।’ বসল চেয়ারে ।

‘জানেন, আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।’

‘খেতে দিয়েছিল ?’

‘প্রচুর ।’

‘আর আপনি আমাকে দিচ্ছেন না কিছুই—’

‘আর সব চেয়ে যা প্রচুর, আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল ।’

‘হল ? কেমন দেখলেন ?’

‘খুব ভালো । হিতৈষী । আপনার জন ।’

‘বিকেলে আরেক বার যাবেন, মাকে দেখে আসবেন । জরুরে তো ডরাই না, কাপুনিকে ডরাই ।’ আতঙ্কগ্রস্তের মত মুখ করল কাকলি ।

‘কাউকে ডরাই না । কিন্তু আপনাদের লাঞ্চটা ভেসে গেল কেন ?’

‘তার মানে, আপনার মতলব, আমি সেই বিরাট কাহিনী বিশদ করে বলি, আর বলতে বলতে তবু এখনো কোনোরকমে টিকে আছি, শেষ পর্যন্ত না খেতে-খেতে টেসে যাই । আপনার সর্বসম্ভার সমাধান হোক ।’

ব্যস্তসমস্ত হয়ে স্বকাস্ত বয়কে ডেকে বিস্তীর্ণ অর্ডার দিল : ‘আমি কিন্তু কিছু খাব না ।’

‘একটু একটু খাবেন ।

‘একটু একটু ? কেন, আমি কি পাখি ? চক্কুভোজী ?’

‘তবে—’

‘কেন, আমি গোপ্রাসে খেতে পারি না ?’

‘আপনি—আপনি সব পারেন ।’

টেবিল সাজিয়ে দিল বয় ।

খেতে খেতে কাকলি বললে, ‘এখন আরেকটা কাজ বাকি ।’

‘মোটো আরেকটা ?’ উসখুস করে উঠল স্বকাস্ত ।

‘হ্যাঁ, আরেকটা ।’ গম্ভীর হল কাকলি ।

‘কী, বলুন ।’

‘এখন একবার আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার বাবাকে বলা—’

‘আমার বাড়ি ! আমার বাড়ি-টাড়ি কিছু নেই ।’ মুহূর্তে প্রতীহত হল স্বকাস্ত ।

‘সে তো কাকুরই কিছু নেই’ দায়া পুত্র পরিবার, তুমি কার কে তোমার—

এসব ভাব তো আছেই। এসব ভাব তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না। কিন্তু যেখানে আপনার বাবা-মা, আপনার ভাই-বোন, আপনার—’ দু’ চোখে আনন্দের আয়ত দুটি দীপ জ্বলল কাকলি।

‘কে আমার?’

‘আপনার সেন্টু—’ দীপশিখা কাঁপতে লাগল উজ্জ্বল হয়ে।

‘ও! সেন্টু! আপনি মনে হাসতে লাগল স্ফুটন্ত।

‘যেখানে ওরা রয়েছে সেখানেই আপনার বাড়িঘর। তা আপনি শখ করে দূরেই থাকুন বা আলাদাই থাকুন—’

‘আপনি আবার শখ করে ঐ বাড়ির মধ্যেই ঢুকতে চান নাকি?’

কাকলি হাসল: ‘তার আমি কী জানি! আপনার বাড়ি, আপনি জানেন দেবেন কিনা ঢুকতে। কিন্তু এখন ঢোকান কথা হচ্ছে না। এখন বলার কথা হচ্ছে, ঘোষণার কথা হচ্ছে। তাই যান একদিন, বাবাকে গিয়ে বলুন সবিনয়ে।’

‘উরে বাবা:, এ অসম্ভব। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।’

‘সবাই সবাইকে তাড়িয়েছেন। আপনার বাবা আপনাকে, আমার বাবা আমাকে। আপনি আবার আমাকে, আমি আপনাকে! দুই মা বুঝি দু-জনকেই। মনে হচ্ছে যেন অরাজক রাজত্বে ছন্নছাড়া প্রজার মত বাস করছি। কিন্তু না, রাজা একজন আছে ঠিক বসে, শত বিক্ষোভে-উপদ্রবেও তাকে তার সিংহাসন থেকে নামানো যায় নি, যায় না নামানো।’

‘সিংহাসন আবার কোথায়?’

‘সবই জানেন তবু জিজ্ঞেস করছেন!’

‘সবই তো জানি তবু শুনেতে হচ্ছে হয়। শোনা দিয়ে জানায় আবার নতুন অর্থ আসে, আনন্দ আসে।’

‘সে সিংহাসন অন্তরে, আর সে রাজার নাম ভালোবাসা।’

‘তার হাজার নাম থাক, কিন্তু আসল কথা, আমি গিয়ে বলতে পাব না, আপনি গিয়ে বলুন।’

‘আমি গিয়ে বলব কী! আমার কোনো লোকাস স্ট্যাণ্ডি নেই।’ কাকলি হেসে উঠল: ‘বিয়ের আগে কনে স্বস্তরবাড়িতে গিয়ে বলবে আমি আপনাদের বউ এলাম। এ কোনোদিন কেউ শুনেছে?’

‘তার চেয়ে আমি ভাবছিলাম একেবারে কাজ-টাজ সেরে সাজসজ্জা করে যুগলে গিয়ে হাজির হই, সবাইকে চমকে দিই একসঙ্গে—’

‘কাজ-টাজ আগেই সেরে ফেললে লোকে চমকাবে কখন ! আর কাজ তো শুধু দু-জনের নয়, দুটো বাড়ির কাজ ।’ ঝোলে-মাথা আঙুল চুষতে লাগল কাকলি : ‘দুটো বাড়িকে যদি আলোয় বাজনায়ে গানে হাসিতে মুখর করে দিতে না পারি তা হলে আর কী হল ।’

‘উঃ, ওসব প্যারাকার্নেলিয়া কী কঠিন ক্লাস্তিকর !

‘গ্রাম মেলে খেয়ে নেওয়া তো সোজা কিন্তু তার পিছনে আয়োজনটা একটু দেখুন । সেই উহুন ধরানো থেকে শুরু করে বাজার করা, কুটনো কোটা, মশলা পেঁসা, রান্না করা—হাজার রকমের অন্তঃসঙ্গ । তবেই আপনার থাওয়া, আপনার স্নিগ্ধতা ।’

‘শুধু স্নিগ্ধতা বলছেন কেন ? আমার তুষ্টি, আমার পুষ্টি ।’

‘তবে কঠিন ক্লাস্তিকর বলছেন কেন ?’

‘কিন্তু যাই বলুন, বাড়ি গিয়ে অমন নাটকীয় পোজে বাবার সামনে দাঁড়াতে পারব না । আর কিছু ভাবুন ।’

‘ভেবেছি । তবে কাকার কাছে গিয়ে বলুন ।’ ঝোলে আবার হাত ভোবাল কাকলি ।

‘এটা বয়ঃ সম্ভব । আর তার জন্তে বাড়িতে না গেলেও চলবে ।’

‘হ্যাঁ, আফিসেই পারবেন বলতে । আর আফিসে যখন, কথাবার্তা সংক্ষেপে হবে । কণ্ঠস্বর নিম্ন ।’

‘সে আবার আরেক হাঙ্কাম । আকস্মিক অল্প কথাই বা কী বলা যায় ভদ্রভাবে ।’

‘খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করবেন, মুখটা লাজুক-লাজুক, বুকে নেবেন কাকা ।’

‘সঙ্গে আপনিও চলুন ।’

‘মাথা খারাপ ! আমি তো তখন পিকচারেই নেই, ফিল্মেই নামি নি । আপনাদের খুড়ো-ভাইপোর প্রাইভেট পরামর্শের মধ্যে আমার স্থান কই ?’

‘কী পরিশ্রমের মধ্যে যে ফেললেন !’

‘উপায় নেই ।’

‘তা না থাক, কিন্তু মাংসের ঝোলমাথা আপনার মুখখানা দেখে আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন ?’

‘জানি । স্ত্রতরাং ইচ্ছাকে অব্যক্ত রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ ।’ হাসতে-হাসতে উঠে পড়ল কাকলি । বেশি হাত ধুতে গেল ।

তোয়ালে দিয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে কাকলি বললে, ‘চলুন সিনেমায় যাই ।’

বেলা চলে পড়েছে অনেকক্ষণ ।

‘চলুন আবার তেমনি ব্যালকনিতে সেই এসকেপিস্ট হয়ে বসি ।’

‘না, এসকেপিস্ট নয় ।’ কাকলির হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল স্বকান্ত ।
বললে, ‘বলো আমার একটা অম্বরোধ রাখবে ?’

মুখ নিচু করে কাকলি জিজ্ঞেস করল, ‘কী ?’

‘সিনেমার পর আবার তুমি আসবে এখানে—’

‘বাড়ি ফিরতে তবে দেরি হয়ে যাবে না ?’

‘হোক দেরি । এখানে থেকে যাবে কিছুক্ষণ । আমার কাছেই তো থেকে যাবে । কিছুক্ষণ মানে বেশ কিছুক্ষণ ।’

স্বকান্তর চুলে একটু হাত বুলিয়ে দিল কাকলি । বললে, ‘এতদিন হল, আর কটা দিন অপেক্ষা করা যায় না ?’

‘যায় । কিন্তু তুমি তো জানো আমার সেই কৌমারহর হবার সাধ—’

হো-হো-হো করে হেসে উঠল কাকলি : ‘আমি কি কুমারী ?’

‘তা ছাড়া আর কী ! আপনি তো মিস মিত্র ।’

‘চলুন, চলুন উঠে পড়ুন । শো শুকু হতে আর দেরি নেই ।’

হলস্থল করে বেরিয়ে পড়ল দু-জনে ।

শোর শেষে ট্যান্ডি করে কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে এল স্বকান্ত ।
আর বাড়ি ফিরে এসে মাকে কী ভাবে দেখবে তাই ভেবে সারা পথ ম্লান হয়ে রইল কাকলি ।

গাড়ি থামতেই গায়ত্রীকে দেখা গেল না । পত্রালি বেরিয়ে এসেছে । স্বকান্তকে লক্ষ্য করে বললে, ‘বাবা আপনাদের ডেকেছেন ।’

‘মা কোথায় রে ?’ কাকলি জিজ্ঞেস করল ।

‘বাবার কাছে বসে ।’

দু-জনে, কাকলি আর স্বকান্ত, বনবিহারীর কাছে এসে দাঁড়াল ।

বনবিহারী বললেন, ‘ট্যান্ডিটা ছেড়ে দাও । পরে আবার একটা ডাকিয়ে দেব । রাত্রে এখানে থেয়ে যাবে ।’

বাবা থাওয়াচ্ছেন কী, মার আনুকূল্য ছাড়া—কাকলি গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাল । আশ্চর্য, গায়ত্রীর মুখে হঠাৎ নতুন রঙ, কোমলতার রঙ, কমনীয়তার রঙ ।

‘জিজ্ঞেস করুন ভীষণ খেয়েছি দু-জনে ।’ স্বকান্ত সহাস্ত প্রতিবাদ করল : ‘আজ আর চলবে না কিছুই ।’

‘তা হলে কালকে এসো।’ গায়ত্রী বললে, ‘একেবারে আফিস থেকেই চলে এসো। নেমস্তন্ন রইল। ভুলো না।’ কাকলিকে বললে, ‘তুই বরং কাল আফিসে একবার মনে করিয়ে দিস।’

কাকলি হাসল, হাসতে লাগল।

...৫৭.....

হেমন বাড়ি ফিরে চোরের মতন হয়ে গেল। মন বেশ ভালো করে এসেছিল, এবং তারই জন্তে হয়তো একটু আগে-আগে এসেছিল কিন্তু ঘরে পা দিতেই শুনতে পেল উপরে একটা কোলাহল হচ্ছে। কান তীক্ষ্ণ করতেই টের পেল একটি কণ্ঠস্বর বিজয়ার। আরেকটি কার বলে দিতে হবে না।

দেখল নিচে বসে প্রশান্ত চা খাচ্ছে।

‘কী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে?’ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল হেমন।

‘প্রথম কী নিয়ে লেগেছিল জানি না, এখন তো দেখছি ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কথা হচ্ছে।’ প্রশান্ত শান্ত স্বরে বললে।

‘ইলেকট্রিসিটি নিয়ে?’

‘মানে, কার ঘরে অকারণে কত লাইট-ফ্যান খরচ হচ্ছে তার খুঁটিনাটি হিসেব।’

‘তারপরেই বিষয়টা বদলে যাবে।’

‘গেল বলে।’ জলখাবারের তদারক করছিল বন্দনা, তার মুখের দিয়ে চেয়ে প্রশান্ত বললে, ‘এক্সুনি শাড়ি-টাড়ি নিয়ে শুরু হবে।’

‘মানে, কার কথানা আছে তা নিয়ে নয়, কাকে কবে কে দেয় নি কিংবা কে কবে কারটা পরতে নিয়ে ফেরত দেয় নি তার ইতিহাস।’ হেমন সমর্থন করল।

বন্দনার মুখ খমখম করছিল, কথা শুনে একটু হাসল। ওটুকু হাসিতে মেঘভার কাটল না সম্পূর্ণ। তার মানে যে বিবাদটা চলছে তাতে বন্দনাও একেবারে অপক্ষ নয়।

‘তারপর কথা হয়তো বাপের বাড়ির দিকে চলে যাবে।’

‘ধর্মের দিকেও যেতে পারে, মানে, ধর্মে কার কত গভীর বিশ্বাস সেই দিকে।’

‘হ্যাঁ, যে কোনো দিকে।’ বিরক্ত হয়ে ঘরে ঢুকল হেমন।

তারই জন্তে আদালতের কলহে ‘ইস্’ ধার্য করে নিতে হয়। কোনো পক্ষকেই ‘ইস্’র বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। যা ‘ইস্’তে নেই তাকে নিয়ে বিতণ্ডা

বেআইনি। কিন্তু মেয়েদের বেলায় কোনো ‘ইস্’ নেই, কেবল ‘টিস্’—স্বতোর পরে স্বতোর বুনন, স্বস্ব থেকে স্বস্বতর। খেলার মাঠে বল লাইনের বাইরে চলে গেলে খেলা স্থগিত থাকে যতক্ষণ না বল ফের মাঠে আসে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় বল লাইনের বাইরে চলে গেলে মাঠও লাইনের বাইরে চলে যায়। মানে, মাঠও বিস্তীর্ণ হতে থাকে। তা ছাড়া এ বেলার বচসা এ বেলার ঘটনাতেই আবদ্ধ থাকে না, তিন সন আগে কী ঘটেছিল সেইসব মরা কথা রক্তবীজের মত বেঁচে ওঠে। মেয়েদের ঝগড়ায় কথার তামাদি নেই।

‘কোথায়?’ হাঁক ছাড়ল হেমন।

এক ডাকেই যা হোক ক্ষান্ত হল বিজয়া। রাগে ভর-ভর দীপ্ত মুখে নেমে এল।

‘কই, সেই কথাটা বলবে না এখন?’

‘কোন কথা আবার?’ খাটে বসে উপুড় করে রাখা ম্যাগাজিনটা মুখের উপর মেলে ধরল বিজয়া। পড়তে-পড়তে কোথাও সাময়িক ডাক পড়ল বা উঠে যেতে হল তখন পড়া বন্ধ করতে হলে বইয়ের ঐ দশা হয়। পড়া বন্ধ হোক, বই যেন বন্ধ না হয়। হাতের কাছে সব সময়েই চুলের কাঁটা জাতীয় পেজমার্ক কোথায়, পৃষ্ঠা খুঁজে শেষ পাঠরেখা বার করবারই বা দৈর্ঘ্য কোথায়, কেমন সব উত্তেজনা ছত্রে-ছত্রে, তাই পত্রিকারই বিপরীত শয়ন।

‘যে কথাটা ঝগড়ার পরেই বলতে নির্ধারিত?’

‘কী বলতাম?’

‘যে, চলো এই বাড়ি ছেড়ে, ক্ল্যাট দেখ।’

‘বা, সেই কথা বলার আর কী দরকার!’ শরীরে গর্বের চেউ তুলল বিজয়া।

এক মুহূর্তে অচপল চোখে তাকিয়ে রইল হেমন। বললে, ‘ঝগড়ার মুহূর্তে চরম কথাটা মোক্ষম কথাটা বলে ফেলো নি তো?’

‘সেটা আবার কোন কথা?’

‘যে, মিছে কেন চোপা করছেন, এই বাড়ি তো আমার, আপনারা তো আমার ভাড়াটে, এক নোটিশেই উৎখাত—’

‘ওসব কথা মনেও ছিল না।’ পত্রিকায় আবার মুখ ঢাকল বিজয়া।

‘ই্যা, মনে আসতেও দেবে না। আমি মনে করিয়ে দিলেও না।’ জামাকাপড় ছাড়তে-ছাড়তে হালকা হতে-হতে হেমন বললে, ‘আগামী যুদ্ধে যে পক্ষ হারো-হারো হবে সেই নাকি প্রথম অ্যাটম বোম ছুঁড়বে। ঝগড়ায় তুমি কখনো হেরে গেলে বা বেকায়দায় পড়লেও তুমি কখনো ছুঁড়বে না সেই অ্যাটম বোম, কখনো না।’

সর্ব শরীরে গরিমার ভরিমা নিয়ে বিজয়া বললে, ‘আমি আর হারি না ।’

এও তো এক মারাত্মক ভঙ্গি ।

‘কেন, কী করো ?’

‘টু দি পয়েন্ট গোটা কয়েক কথা বলেই চূপ করে যাই ।’

‘টু দি পয়েন্ট ?’ হাসল হেমন : ‘সে তা হলে ভীষণ পয়েন্টেড ?’

‘তা জানি না । তবে কথা কমিয়ে আনছি । কথা কমিয়ে আনা ভালো ।’

‘কথা কমিয়ে আনতে আনতে শেষে এক কথায়, চূড়ান্ত কথায় না চলে আসো ।’

‘বারে-বারে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছ কেন ? চাও নাকি যে বলে ফেলি ?’

‘রক্ষে করো ।’ পরে মুখে নির্লিপ্ততা আনল হেমন : ‘তবে ঝগড়ার মধ্যে মৌখিক কথাটা শুনলে চমকাবে মাত্র, বিশ্বাস করতে চাইবে না । বেশি কিছু বললে দলিল দেখতে চাইবে । তা যাক গে, আজ কথাটা কী নিয়ে ? তেতলার ঘরে কে থাকবে ?’

‘তেতলার ঘরে কে থাকবে তা তো ঠিক হয়েই আছে ।’

‘ঠিকই হয়েই আছে ? কে থাকবে ?’

‘কে আবার ! আমি ।’ পা ছড়াল বিজয়া : ‘বাড়ির নীচতা আর সইব না কিছুতেই ।’

‘নীচতা মানে নিচে, নিচের তলায় থাকা তো ?’

বিজয়া কথা কমাল । চোখের দৃষ্টিটাকে খোলা পৃষ্ঠায় রাখতে চাইল স্থির করে ।

‘আর যিনি সম্পর্কের উচ্চতার খাতিরে থাকতে চান উপরে ?’

‘তারই তো পরীক্ষা আজ সংসারে । মান বড়, না ধন বড় ?’ চোখ না তুলেই সংক্ষেপে বলল বিজয়া ।

‘যাক গে, সে নিয়ে যখন আজকের ঝগড়া নয় । বলো না আজকের ঝগড়াটা কী নিয়ে ?’

‘দিদি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন আমাদের কোন গুণ নেই । যেহেতু আমরা বি-এ এম-এ-নই, চাকরি করে পয়সা রোজগার করতে পারি না, যেহেতু আমরা না জানি নাচতে বা গাইতে বা ছবি আঁকতে বা সভা-সমিতি করতে—’

‘তাই বড় বউমার মুখখানা ম্লান দেখলাম । একসঙ্গে তোমাদের দু-জনকে ত্রাকোট করেছে—’

যত গুণ শুধু তাঁর নিজের আর তাঁর ছোট বউয়ের !’

‘তোমার গুণ নেই, রূপ কিছু আছে তো ? আজকাল তো রূপও গুণ । রূপ

লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। কিন্তু তোমার গুণ নেই এ কে বলে? বাংলা দেশের সংস্কৃতির প্রধান ধারক তুমি, যত সিনেমা হয় সব তুমি দেখ, যত সিনেমার কাগজ বেরায় সব তুমি পড়ো, যত ফ্যাশন হচ্ছে সর্বত্র তুমি টিকিট কাটো, তোমার গুণ নেই? এর নিদারুণ প্রতিবাদ করা উচিত।’

কথা বলল না বিজয়া।

‘কিন্তু ছোট বউয়ের কথা কী বলছিলে?’ হেমন মনোযোগে তীক্ষ্ণ হল: ‘তাকে তো বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তার আবার গুণ কী!’

‘কাকলির কথা কে বলছে?’ আবার পা গুটোল বিজয়া: ‘এ হচ্ছে বিনতার কথা। যিনি ছোট বউ ছিলেন তিনি নন, যিনি ছোট বউ হবেন তিনি।’

‘বিনতা! ও, হ্যাঁ, কিন্তু তার গুণ কেন?’

‘দিদির মতে যারা আফিসে কাজ করে তারা সব খারাপ! খারাপ মানে রুক্ষ, দুর্বিনীত। কিন্তু যারা ইন্সুলে মাস্টারি করে তারা বেশ ভদ্র, বাধ্য। পবিত্র পরিবেশে মহৎ ব্রত উদযাপন করছে বলে ওদের বাক্য ও ব্যবহারে স্নিগ্ধতার লাভ্য ঝরে পড়ছে। ওরাই সত্যিকার গুণী। সংসারকে স্বর্গ করবার সত্যিকার কারিগর। গুণের ফিরিস্তি দিয়ে পঞ্চমুখে শেব করতে পারছে না দিদি। আমি বললাম, মাস্টারের কত গুণ তা জানা আছে। মাস্টারও যা ব্ল্যাক বোর্ডের ডাস্টারও তাই।’

‘ও! এই বিয়ের কথাই বুঝি বলতে এসেছিল স্কু—’ বেশ উচ্চধোষেই বলল হেমন।

কোথায় বলতে এসেছিল?’

‘আমার আফিসে। আজ— এই তো, এই কতক্ষণ আগে।’

‘কী বললে স্কু?’

বললে, তার বিয়ে ঠিক হয়েছে, কনেকে আমরা যেন একদিন আশীর্বাদ করে আসি। বলতে বলতে ইচ্ছে করেই ঘরের বাইরে চলে এল হেমন।

‘তুমি কি বললে?’ উত্তেজনায় বিজয়াও বাইরে এল।

‘আমি ওর কথায় বেশি গা করলাম না। বললাম, তুই বিয়ে করছিস তো করবি, তাতে আমাদের সংস্রব কী! আমাদের কাছে আবার সাহায্য কিসের! তোর নিজের বাছা মেয়ে, তোর একার দায়িত্ব—এতে সংসারকে টানা কেন?’

‘ও মা, সে কী কথা!’ প্রত্যাশিত পদক্ষেপে নেমে এল যুগালিনী: ‘এ ওর নতুন বিয়ে, এ বিয়েতে সংসার আসবে না তো কী!’

‘কেন, হোটেল, ওর হোটেল কী করতে আছে!’ টিটকিরি দিয়ে উঠল হেমন।

‘যে অবস্থার জন্তে হোটেল সে তো শেষ হয়ে গিয়েছে! এখন নতুন বিয়ে, নতুন পন্তন। তাই সংসারও আবার নতুন করে আরম্ভ।’

‘তা হলে বলতে চাও এই বাড়ি থেকেই স্বহস্তে বিয়ে হবে?’

‘নিশ্চয়, এক শো বার।’ মুণালিনী গলা চড়াল: ‘আর বিয়ে করেও বউ নিয়ে উঠবে এই বাড়িতে। তেতলার ঘর নিয়ে খুব স্বন্দে পড়েছিলে না? এই তেতলার ঘরে স্বহস্তে থাকবে নতুন বউ নিয়ে।’

‘কোন নিয়মে?’ ফৌস করে উঠল বিজয়া: ‘ঘর তৈরি করবার টাকা দিলাম আমরা আর তাতে বাস করবেন নতুন বউ! আর রাজ্যে বামুন নেই—’

‘টাকা সমস্ত দিলিই বা, কিন্তু স্বহস্তে তোমার নিজের ছেলের মত, সে বিয়ে করে বউ আনছে তাকে একটু স্বথশাস্তি দিতে তোমার বুকটা ফেটে যাবে?’

‘স্বহস্তে দিতে ফাটবে কেন?’ পালটা জবাব দিল বিজয়া: ‘কিন্তু তার নতুন বউ উড়ে এসে জুড়ে বসবে মাখার উপরে, এ সহাবে না। যদি কাকলি আসত হাসিমুখে ছেড়ে দিতাম।’

‘তার কথা আলাদা।’ বন্দনাও স্বীকার করল একবাক্যে।

‘যা হয় না, হবার নয়, তা ভেবে লাভ কী! যা ছাই হয়ে গিয়েছে তাকে উড়িয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।’ বললে মুণালিনী, ‘যে নতুনের নামজারি করতে আসছে তাকেই উচিত সংবর্ধনা করা।’ ততক্ষণে কোর্ট থেকে ভূপেনও চলে এসেছে। তার দিকে একবার আর হেমনের দিকে অনেকক্ষণ করুণ চোখে তাকিয়ে রইল: ‘যদি আবার ও বউ নিয়ে ঐ ছোট ঘরটাতে থাকে তা হলে আবার ওদের ছাড়াছাড়ি হবে। তোমরা আপনার লোক হয়ে, অভিভাবক হয়ে, ওর মঙ্গল দেখবে না?’

কার আবার বিয়ে, কার আবার ছাড়াছাড়ি! ভূপেন হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

‘স্বহস্তে আবার বিয়ে করছে—সেই কথা।’ হেমন ব্যস্ত হয়ে উঠল: ‘আপনি হাতমুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে শান্ত হোন, আমি সব বলছি।’

‘স্বহস্তে—স্বহস্তে কোথায়?’ ঝাপসা গলায় জিজ্ঞেস করল ভূপেন।

‘বাড়ি আসে নি এখনো। আসবে। আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আমার আফিসে—হ্যাঁ, আজ, দুপুরবেলা—’

‘কই, কই কাকা!’ তার বেড়াল তাড়াবার ছোট লাঠিটা নিয়ে নেমে এসেছে সেক্টু: ‘আমি তার ঠ্যাং ভেঙে দেব। কথা ছিল একজামিন হয়ে গেলে কান্নাকাতি

নিয়ে আসবে। তা কাম্মাকে না এনে বউ নিয়ে আসছে! কোথায় বউ? দাঁড়াও—
লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এগুতে লাগল সেন্টু।

হাত বাড়িয়ে বিজয়া তাকে লুফে নিল। বললে, ‘তোয় কাকা আর তার নতুন
বউ কেউ আসে নি।’

‘কিস্ত কাম্মা? কাম্মা আসবে না?’

‘আসবে।’

‘কবে আসবে?’

‘তার একজামিনটা আগে শেষ হোক—’

‘কবে শেষ হয়ে গেছে! একজামিন বুঝি এত দিন ধরে চলে! তুমি কিছু জানো
না।’ বিজ্ঞ মুখে বিবাদ মাখাল সেন্টু: ‘আন্টি ইঙ্কলে আমাদের একজামিন নিলে—
ওয়ান থেকে টেন লেখো—এক দিনেই তো শেষ।’ বিজয়ার চিবুক ধরে মুখটা
ঘুরিয়ে নিল নিজের দিকে: ‘সেই যে সেবার আমাকে কাম্মার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে,
অমনি আবার আরেক দিন নিয়ে চলো না—’

‘তার বাসা এখন কত দূরে তা কে জানে।’

‘বেশ, আমাকে না নাও, তুমিই একদিন নিজে গিয়ে জেনে এসো না কবে তার
একজামিন শেষ হবে, কবে আসবে বাড়ি, কবে আমাকে কোলে নেবে।’ আবার
বিজয়ার চিবুক ঘোরাল সেন্টু: ‘যাবে একদিন বিজু?’

‘যাব।’

নিরিবিলিতে বৈঠকখানায় ভূপেনের কাছে গিয়ে বসল হেমন। বললে সমস্ত কথা।

নিজের ঘরে আফিসে বসে কাজ করছে, বেয়ারা কার্ড নিয়ে এল। কে? ভুরু
কুঁচকে নাম দেখল হেমন। এ কোন স্বকাস্ত বসু? আর কে! আমাদেরই শ্রীমান।
ঘরে ঢুকে নত হয়ে প্রণাম করে বসল চেয়ারে।

‘তুই? তুই কী মনে করে? ভালো আছিস?’ হেমনের সংবর্ধনাটা খুব
মোলায়েম শোনাল না।

খানিকক্ষণ আমতা-আমতা করে স্বকাস্ত বললে, ‘একটা ব্যাপারে আপনার কাছে
এসেছি—’

‘কী ব্যাপার?’

তবুও বিশদ হয় না স্বকাস্ত। গাঁইগুঁই করে।

‘মানে, কোনো বিপদ? চাকরি নিয়ে গোলমাল? অর্থাভাব? বলবি তো
বিপদটা কী!’

‘ঠিক বিপদ নয়। বিয়ে।’

‘বিয়ে? তোর বিয়ে? তোর বিয়ে তো এখানে কী! কার সঙ্গে বিয়ে?’

‘সেই যে কাকলি মিজ—’

‘কে কাকলি মিজ?’ খেকিয়ে উঠল হেমেন।

‘সেই যে আপনার ছোট বউমা।’ মাথা চুলকোতে লাগল স্বকান্ত।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছোট বউমা। কই, এসেছেন এখানে?’ চঞ্চল হয়ে চেয়ার ঠেলে উঠতে চাইল হেমেন।

‘না, না, আসে নি।’ গম্ভীর স্বরে নিরন্ত করল স্বকান্ত।

উদ্বেগমাখানো মুখ নিয়ে হেমেন বললে, ‘কেন, তার কী হয়েছে?’

‘কিছু হয় নি।’

‘তবে তার কথা ওঠে কেন?’

‘ওঠে’, আবার কান চুলকোতে লাগল স্বকান্ত, ‘তার সঙ্গে আমার বিরোধটা মিটে গেছে।’

‘তা তো যাবেই।’ চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল হেমেন : ‘তা ছাড়া বিরোধ কোথায়? শুধু তো একটা জেদ, গোঁয়ারতুমি, শুধু ঘাড়টা মোটা করে শক্ত করে থাকা। শুধু একটা সাময়িক সংকীর্ণবুদ্ধি। মিটে গেছে! বেশ, ভালো কথা। টুটলেই বিব, মিটলেই মধু। তা এখন, মিটে যাবার পর?’

‘আমরা মিলতে যাচ্ছি।’

‘সে তো খুবই স্বাভাবিক। তা আমাকে কী করতে হবে?’

‘কিছু করতে হবে না। আপনাকে জানিয়ে দিলাম।’ ওঠবার ক্ষীণ চেষ্টা করল স্বকান্ত।

‘শুধু একটা সংবাদ দিলি? বেশ, স্বখের কথা। বিয়েটা হবে কোথায়?’

‘কাকলির বাপের বাড়িতে। ওদের সঙ্গেও বিরোধটা মিটে গেছে।’

‘বা, চারদিকেই মেটামিটি। তারপর বিয়ে করে বউ নিয়ে উঠবি কোথায়? থাকবি কোথায়?’

‘তা একটা ভালো ক্ল্যাট দেখে নেব। এখন দু-জনের চাকরি—’

‘ছোট বউমাকে নিয়ে ক্ল্যাটে উঠবি? তুই এই খবর দিতে আমার কাছে এসেছিস? গেট আউট। গেট আউট। আমার সমুখ থেকে এখনি বেরিয়ে যা বলছি—’

লোকজন ছুটে আসতে চাইল চারপাশ থেকে। স্বকান্ত একেবারে থ।

‘তুমি এবার সত্যি-সত্যি ভাঙবি আমাদের একান্তবর্তী পরিবার। আর তোর জন্মে তোদের জন্মে আমরা বাড়ি কিনছি, তেতলায় ঘর তুলছি।’

‘তেতলায় ঘর?’ উঠি-উঠি করছিল স্ককাস্ত, বসে রইল।

‘হ্যাঁ, সকলের মাথার উপরে। হ্যাঁ, পৃথিবীর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাথার উপরে আমাদের, ভারতবর্ষের এই একান্তবর্তী পরিবার। সেই প্রতিষ্ঠানে তোরা কুড়ল মারবি? কই, ছোট বউমা কোথায়? তাঁকে নিয়ে এলি না কেন সঙ্গে করে? তাঁরও কি সেই মত? ছোট একটা স্বার্থের অঙ্ককূপে হাত পা গুটিয়ে বাস করা? এমন একটা গাছ পোতা যার শুধু কাণ্ডটাই আছে, শাখাপ্রশাখা নেই, পুষ্পপল্লব নেই, যার কোলে ছায়া নেই একবিন্দু। বল, সেই সংসারে থাকবি যেখানে সেণ্টু নেই, নাতি-নাতিনি নেই, নাতিনাতিনির আনন্দ নেই। ক্ষমা নেই, উদারতা নেই, স্বার্থত্যাগ নেই, অক্ষমকে রক্ষা করবার, অমানীকে মান দেবার সাধনা নেই! তবে বসে আছিস কেন? উঠে যা। একটা শূণ্য পুরীতে আজকের দুই যুবক-যুবতীর দুটো অঙ্কপ্রায় জরাজীর্ণ বুড়ো-বুড়ি হয়ে অঙ্ককার হাতড়ে বেড়াবার স্বপ্ন ছাথ। ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়ে বাসা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে আর তোরা দু-জনে অশক্ত অর্থব হয়ে বুক চাপড়াচ্ছিস—’

‘কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলেই তো ক্ষুদ্রতা—’

‘ক্ষুদ্রতা না থাকলে উদারতা দেখবার অবকাশ কোথায়? আঘাত-অপমান আছে বলেই তো ক্ষমার অস্তিত্ব। শত্রুতা আছে বলেই তো পরোপকারের মহিমা। কার্পণ্য আছে বলেই তো আত্মত্যাগের ঔজ্জ্বল্য। বিরোধ আছে বলেই তো নিষ্পত্তির শাস্তি। নইলে ওসব মহৎ গুণ মানুষ দেখাবে কোথায়? মানুষ বড় হবে কি করে?’

‘তবে যখন বলছেন, স্ককাস্ত আবার মাথা চুলকোল : ‘বাড়িতেই ফিরে যাব। এখন তবে উঠি।’

তখন আবার স্ককাস্তকে ধরে রাখতে চায় হেমন। কি করে কী হবে তার খুঁটিনাটি পরামর্শ করে। সন্দেহ এনে খাওয়ায়। নিজেও গোটা দুই একসঙ্গে মৃখে পোরে।

‘ঠিক করেছি আগে আমরা মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাব।’ ভূপেনকে বললে হেমন, ‘পরে বিয়ের দিন পাকা হলে স্ককাস্ত বাড়ি আসবে।’

ভূপেন হাসতে লাগল।

বিজয়াকে ঘরের নিরিবিলিতে নিয়ে হেমন বললে : ‘তুমি জিজ্ঞেস করছিলে না,

ধন বড় না মান বড়, তারই পরীক্ষা হবে সংসারে ? পরীক্ষা হয়ে গেছে । সকলের চেয়ে সব কিছুই চেয়ে বড় হচ্ছে ভালোবাসা ।’

‘ভালোবাসা ?’

‘হ্যাঁ, তেতলার ঘর । তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়েছে । কে বলে তোমার গুণ নেই ?’

‘কেন, কী হয়েছে ?’

‘স্বকাস্ত কাকলিকে নিয়ে আসছে ফের বিয়ে করে ।’

‘সত্যি ?’ আনন্দে বিহ্বল হল বিজয়া : ‘শাঁখ বাজাব ?’

‘হুঁ কী, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করবে না । আগে মেয়েকে পাকা দেখে আসি । বউদিকে দেখাই । কি, কি গো, কার এখন তেতলার ঘর ?’

‘ভালোবাসার । স্বকাস্ত-কাকলির ।’

কোথায় তবে এই উদারতা দেখাবার অবকাশ ! অন্ধকে বলিয়ে দিয়ে আনন্দিত হবার !

৫৮

এখানেও নরনাথই এসেছে তদবিরে ।

‘আমার দাদা বনবিহারী মিস্ত্রির পাঠালেন আমাকে ।’ ভূপেনের বৈঠকখানায় চুকে নমস্কার করে বললে নরনাথ ।

বনবিহারী কোনো জুনিয়র উকিল-টুকিল হবে এমনি আঁচ করল ভূপেন । ‘কে বনবিহারী ?’

‘আপনার দ্বিতীয় পুত্র যাকে বিয়ে করছে তার বাবা ।’

‘আরে কী আশ্চর্য, আহুন, বহুন ।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভূপেন । তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ডেকে আনল হেমেনকে ।

‘শুভদিন তাড়াতাড়ি ঠিক করে ফেলতে হয় এবার ।’ বললে নরনাথ ।

‘হ্যাঁ, যত শিগগির হয় ।’ বললে হেমেন, ‘মানে, যত শিগগির পাত্রপাত্রীরা ঠিক করে ।’

‘তা তো ঠিকই । আরেক কথা,’ নরনাথ ঘাড়ের উপর হাত বুলাল : ‘দাদা বলছিলেন আপনাদের কোনো দাবি-দাওয়া আছে কিনা ।’

গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেমেন : ‘পাঞ্জপাঞ্জীরা যেখানে স্বেচ্ছায় মিলিত হচ্ছে সেখানে আবার দাবি-দাওয়া কী ! ভজনও করবে আবার ভোজনও মারবে এ হয় না ।’

‘কিছু বলা যায় না মশাই ।’ গম্ভীর হল ভূপেন : ‘সব আমার জ্ঞী জানেন । তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানাব আপনাদের ।’

‘জানাবেন । আরেকটা কথা ।’ নরনাথ নাকের ডগা চুলকোতে লাগল . ‘আপনারা কি মেয়েকে আশীর্বাদ করতে যাবেন ?’

ভূপেন আর হেমেনের মধ্যে দ্রুত একটা চোখ তাকাতাকি হল । প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল দু-জনে : ‘কী দরকার !’

হেমেন আরো একটু বিশদ হল : ‘ওদের নির্বাচনে আমরা যখন সম্মতি দিলাম তখনই তো হয়ে গেল আশীর্বাদ ।’

‘বেশ । এখন, আরেকটা কথা, বলতে পারেন, শেষ কথা ।’ নরনাথ এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল : ‘বিয়ের পর ওরা কি এ বাড়িতে থাকবে ?’

‘তা না হলে কোথায় থাকবে ?’ হেমেনকে কেমন কাঠখোঁট্টা শোনাল ।

‘এ বাড়িটাতে যথেষ্ট জায়গা নেই বলে শুনেছি ।’

‘রাখুন ।’ হেমেন নিজের বুকের উপর হাত রাখল : ‘যদি প্রাণ থাকে তা হলে স্থানও আছে । কেন, ওরা কিছু বলছিল নাকি ?’

‘না, তেমন কিছু শুনি নি পক্ষাপক্ষি ।’ নরনাথের হাত এবার উঠে এল কানের পিঠে : ‘তবে আধুনিক ছেলেরা বিয়ের পর আলাদা হয়ে যেতে চায় তো ।’

‘আমরা দেব না যেতে । যতদিন পারি ততদিন পরিবারের একান্তবর্তিতা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করব । আমাদের সব ঐতিহ্য সব বৈশিষ্ট্য চলে যেতে বসেছে কিন্তু পারিবারিক সংহতির যে আদর্শ এতদিন চলে আসছিল তা আমরা পারতপক্ষে ক্ষুণ্ণ হতে দেব না ।’

‘কী করে রাখবেন ?’ নরনাথ বললে, ‘অর্থ নৈতিক কারণেই তো ভেঙে যাচ্ছে ।’

‘অর্থ নৈতিক কারণে তত নয়, যত স্বার্থনৈতিক কারণে । অকর্মণ্য হয়ে একজন আরেকজনের ঘাড়ে বলে থাকবে এ অগ্রায় সন্দেহ নেই, কিন্তু একজন অক্ষমকে আর সকলে সাহায্য করবে না, পৃথক করে দেবে, এ অগ্রায়ের চেয়েও অগ্রায় ।’

‘তা হলে বার্ষিক্যে আমরা পুত্রবধূর সেবা পাব না ?’ ভূপেন বললে ।

‘পাব না নাতিনাতিনির মাধুর্য ? গৃহ শুধু একটা গুহা হয়ে থাকবে ? দুপুরবেলা

খাওয়া-দাওয়ার পাট উঠে যাওয়ার পর অতিথি এলে তাকে ছোটো ফুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকবে না?’

‘না, না,’ কথা পালটে নিতে চাইল নরনাথ : ‘যৌথ পরিবার বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তো ভালোই। সবাই যদি মিলে-মিশে থাকতে পারে তা হলে আর কথা কী!’

‘যাকে আধুনিক রাজনীতির ভাষায় বলতে পারেন সহাবস্থান।’ হেমেন বললে।

‘পঞ্চশীল?’

‘পঞ্চশীল তো নয়, পঞ্চশূল। আর সব চেয়ে দীর্ঘ শূলটার নামই ক্ষুদ্রতা। চিন্তাদারিদ্র্য।’ হেমেনের স্বর তপ্ত হয়ে উঠল : ‘যে জ্যেষ্ঠ সেই কর্তা হবে নিঃসন্দেহ, যদি সে, অভিযানে নয়, সানন্দে না দাবি ছাড়ে। যে কর্তা সে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা পাবে সকলের, কিন্তু শ্রদ্ধা, জানেন তো, আপনাআপনি আসে না, আকর্ষণ করে নিতে হয়। আর সে আকর্ষণ সহজ হয় সেই ক্ষেত্রে যেখানে কর্তা উদার, ত্যাগস্বীকারে সম্মত। এখানে কর্তা কথাটা কিন্তু জেনারেল ক্রজেজ অ্যাক্ট অহুসারে বুঝতে হবে। কর্তা ইনক্লুডস কর্ত্রী। নইলে কর্তা যদি ক্ষুদ্রাত্মা হয়, যদি একা তার পাতেই মাছের মুড়ো পড়ে, মানে যদি নিজের কোলের দিকেই অনবরত সে ঝোল টানে, নিজের ছেলেটিকে নন্দহুলাল ভেবে জায়ের ছেলেটিকে নাড়ুগোপাল ভাবে—তা হলেই সর্বনাশ। তা হলেই সংসারে আর লক্ষ্মী নেই, আছে শুধু তার বাহনের চিংকার।’

‘এই লক্ষ্মীর সংসার হবে কিসে?’ উঠতে উঠতে নরনাথ শুধোল।

‘শুধু বউয়ের গুণে।’ বললে হেমেন।

‘শুধু বউয়ের?’ উঠে পড়ল নরনাথ।

‘হ্যাঁ, ছেলে যতক্ষণ একা থাকে ততক্ষণ সমস্তা কোথায়? বউ নিয়ে এলেই তখন স্থান সংকুলানের কথা। যে এতকাল দ্বার হয়ে দীর্ণ করেছে ভেদ করেছে, সে এখন দ্বার হয়ে রক্ষা করবে, রোধ করবে। কিছুতেই ছেড়ে দেবে না, হেরে যাবে না। এই হবে তার হাতের লোহা, মাথার সিঁদুর।’

‘তেনন মেয়ে কোথায় আর আজকাল?’ নরনাথ টেবিলের ধার থেকে সরে এল।

‘না, না, আছে, আছে।’ ভূপেন বলে উঠল : ‘ঐর্ষ্যের প্রতিমা। স্নিগ্ধ অথচ তেজস্বিনী। আছে, আছে।’

‘থাকুক বা না থাকুক, সে আমাদের কোনো সমস্যা নয়।’ হেমেনও উঠে পড়ল : মোটকথা, আমরা কিছুতেই আমাদের দুর্গ, আমাদের যুক্ত পরিবার ভাঙতে দেব না। যদি ভাঙেও কোনোখানে, তা আবার জোড়া লাগাব। নাতির সঙ্গে সোনার থালায় ভাত খাব আমরা। নইলে আমাদের কিসের কেরামতি।’

‘বেশ, ভালো কথা, স্বথের কথা।’ নমস্কার করে বেরিয়ে গেল নরনাথ।

হেমনও বেরুচ্ছিল, তার আগেই ঢুকে পড়ল মৃণালিনী।

‘মেয়ের বাড়ির অভিভাবকদের কেউ এসেছিল বুঝি?’

‘হ্যাঁ, কাকা এসেছিল।’ হেমন কেটে পড়তে চাইল।

‘আশীর্বাদের কথা কী বলছিল?’ ভূপেনের দিকে সরাসরি নিক্ষিপ্ত হল মৃণালিনী।

‘বলছিল আশীর্বাদ করতে যাব কিনা।’

‘আর শুনলাম তুমি ‘না’ করে দিলে।’

‘হ্যাঁ, কী দরকার আর ওসব হাঙ্গামার। ওরা যখন পরস্পরে সম্মত হয়েছে—’

‘না,’ ধমক দিয়ে উঠল মৃণালিনী : ‘আশীর্বাদ করতে হবে বৈকি। তুমি দিন ঠিক করে ওদের খবর পাঠাও, হবে আশীর্বাদ। এইসব অহুষ্ঠান হয় না বলেই পরে সব নষ্ট হয়ে যেতে চায়। আশীর্বাদের বদলে দেখা দেয় অভিশাপ হয়ে।’

‘তা বেশ, খবর পাঠাব। আমি আর হেমন গিয়ে পাকা দেখে আশীর্বাদ করে আসব।’ ভূপেন বলল।

‘সঙ্গে আমিও যাব।’

‘তুমি যাবে কী! শান্তুড়ী কখনো যায় পাকা দেখতে?’

‘রাখো। ছাড়ো ওসব সেকলেপনা। পারলে শান্তুড়ি বরযাত্র যায়, আর এ তো শুধু পাকা দেখা। জানো সেদিন নীয়েনবাবুর ছেলের বউভাতে গিয়েছিলাম, শান্তুড়ির ডিরেকশানে ছেলের বউ অন্ন-নৃত্য নাচল—’

‘অন্ন-নৃত্য?’ হেমন হাঁ হয়ে রইল।

‘তুমি তো কোনোখানে যাও না, গেলে দেখতে পেতে।’ মৃণালিনী হাত-মুখ ঘুরিয়ে বলতে লাগল, ‘স্ত্রী-পুরুষ খেতে বসেছে, সামনে স্টেক বাঁধা। যে বউ হয়ে এসেছে সে নামকরা নাচুনী, বিজয়া নাম বলতে পারবে। নিমন্ত্রিতদের সেই নাচ না দেখালে চলে কি করে, কি করে শান্তুড়ির মান বাড়ে! শান্তুড়ি বললে, যদি দুর্ভিক্ষ-নৃত্য হতে পারে, অন্ন-নৃত্য হবে না কেন?’

‘ঠিকই তো।’ সহজেই সায় দিল ভূপেন।

‘স্বতরাং ওসব সেকলে নিয়ম চলবে না। আমিই যাব অগ্রণী হয়ে। সোনার সাত লহর হার দিয়ে আশীর্বাদ করব। কী যেন তুমি প্রশংসা করছিলে মেয়েটির!’ ভূপেনের দিকে তাকাল মৃণালিনী : ‘কিসের যেন প্রতিমা বলছিল?’

‘প্রতিমা? কিসের প্রতিমা?’ সাহায্যের জন্তে হেমনের দিকে তাকাল ভূপেন।

‘ও, ই্যা, লক্ষীর প্রতিমা।’ ঝুগালিনী নিজেই মনে করতে পারল : ‘নামটিও বিনতা। স্বন্দর নাম।’

‘বিনতা?’ আতকে উঠল হেমন : ‘সে তো মহাবিহঙ্গমের মা।’

‘মা?’ ঘা খেয়ে যেন বসে পড়ল ঝুগালিনী : ‘সে কুমারী। কী জানি মেয়ে-ইঙ্কলটার নাম, সেখানে সে চাকরি করে। একটা ভদ্র উচ্চশিক্ষিত মেয়ের নামে যা-তা একটা কলঙ্ককথা বললেই হল?’

‘আহা, ঠাট্টা বোঝো না কেন?’ ভূপেন বললে, ‘মহাবিহঙ্গম মানে বড় পাখি। সব চেয়ে বড় পাখি কে? গরুড়। আর ঐ গরুড়ের মায়ের নামই বিনতা।’

‘এ যে গাঁট্টা মেরে ঠাট্টা। এরকম ঠাট্টা ভালো নয়। যে বাড়ির বউ হয়ে আসবে তার সম্বন্ধে এসব কী কথা! আর শোন,’ ঝুগালিনীর মুখ থমথমে হয়ে উঠল : ‘আরেকটা কথা বলে রাখছি।’

‘বলো।’ ভূপেন ঘাড় কাত করল।

‘তেতলায় যে ঘর উঠেছে—’

‘এখনো সম্পূর্ণ ওঠে নি, প্রায় হয়ে এসেছে বলতে পারো।’ হেমন সংশোধন করতে চাইল।

‘ঐ হল। বিয়ে হতে হতে তৈরী হয়ে যাবে। ঐ ঘরে কিন্তু নতুন বউ থাকবে।’

‘কোন আইনে?’ প্রায় কুখে উঠল ভূপেন।

‘আইন তুমি বোঝো গে যাও। আমার ইচ্ছে সমস্ত আইনের চেয়ে বড়। যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ এ বাড়িতে একমাত্র আমার কথাই চলবে। আর কারো কথা নয়।’

‘না, না আগে যেমন ছিল তেমনি স্বকু আর তার বউ থাকবে দোতলায়।’ ভূপেন দৃঢ় হবার চেষ্টা করল।

‘তা হলে তেতলার ঘরে? সেখানে তুমি থাকবে?’ দাঁতে দাঁত লাগাল ঝুগালিনী।

‘না।’ কঠিন হল ভূপেন : ‘যাদের এ বাড়ি তারা থাকবে।’

‘কাদের এ বাড়ি? মানে, বাড়িওলারা?’

‘বা, তা কি করে হয়? যারা এ বাড়িটা কিনেছে, মানে হেমন আর বিজয়া, তারা থাকবে।’

‘মানে, ঠাকুরপো এই সম্পূর্ণ বাড়িটা কিনে নিয়েছে?’ চোখে যেন অন্ধকার দেখল ঝুগালিনী : ‘শুধু তেতলায় ঘর তোলবার খরচ দেওয়া নয়, সমস্ত বাড়িটাই শাকুল্যে কিনে নিয়েছে?’ অসহায় চোখ ফেলল হেমনের উপর।

‘সমুদয় কিনে নিয়েছে। মোট দাম আশী হাজার।’ ভূপেনের চোখমুখ উজ্জল হয়ে উঠল : ‘কত বড় কথা ! হেয়েন বাড়ির মালিক হয়ে গেল।’

‘আর তুমি ?’ দুহাতের দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মৃণালিনী মুখ খিঁচিয়ে উঠল : ‘তুমি কী হলে ?’

‘আমার কোন পরিবর্তন নেই। যা ছিলাম তাই রইলাম। নিষ্পৃহ গলায় ভূপেন বললে, ‘যে ভাড়াটে সেই ভাড়াটে।’

‘আমরা ঠাকুরপোর ভাড়াটে হয়ে গেলাম ?’ শোকের স্বর বার করল মৃণালিনী।

‘তাতে আমাদের ক্ষতিবুদ্ধি কী হল ?’ ভূপেন আশ্বস্ত করতে চাইল : ‘ওপর-ওপর স্বস্তির কী আদল-বদল হয় না হয় তাতে আমাদের কী এসে যায় ? আমরা যেমন গুনছিলাম তেমনি ভাড়া গুনে যাব। আগে ভাড়া দিতাম এক জমিদারকে, এখন থেকে দেব হেয়েনকে। আমাদের পক্ষে একই কথা। হরে দরে হাঁটুজল।’

‘তা হলে,’ আতঙ্কে চোখ কপালে তুলল মৃণালিনী : ‘ঠাকুরপো যদি উচ্ছেদের নোটিশ দেয় আমাদের উঠে যেতে হবে ?’

‘উপায় কী তা ছাড়া ? তাই যাতে ঝগড়া-টগড়া না করো, কর্তৃত্ব একটু কম ফলাও, ওদের একটু মন মজিয়ে চলো—’

‘অসম্ভব। তুমি এখনি অল্প বাড়ি দেখ। নোটিশ দেবার আগেই যাতে মানে মানে সরে পড়তে পারি।’

‘আমরা বেঁচে থাকতে কি আর নোটিশ দেবে ? ছোট থেকে বড় করে তুলেছি, মাহুত্ব করে তুলেছি, ও কি রুতন্নতা করবে ? কি রে, করবি ?’ হেয়েনের দিকে তাকাল ভূপেন।

হেয়েন মৃদু-মৃদু হাসতে লাগল।

‘কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আজকের শুভবুদ্ধি কালকে দুষ্টবুদ্ধি হয়ে যেতে পারে। স্বতরাং এ বাড়ি ছেড়ে অন্তত চলো।’

‘আগে ওরা অন্তত যেতে চাইত, এখন উলটে তুমি চাইছ।’ ভূপেনও হাসল : ‘কিন্তু আমাদের সাধনা একত্র হয়ে থাকবার সাধনা। ব্যক্তির স্বার্থকে সমষ্টির মঙ্গলে পরিণত করার সাধনা। দায়ে পড়ে নয়, শুধু আনন্দে প্রীতিতে নিজের ক্ষুদ্রতাকে বিসর্জন দেওয়া।’

‘রাখো।’ আবার ধমকে উঠল মৃণালিনী : ‘সংসারে যার যেমন হাতের তাস। ভাগ্যের খামখেয়ালিতে কারু হাতে বা টেকা, কারু হাতে বা ছুরি-তিরি। রঙের টেকা কেউ পাশায় না, পাশানো যায় না। না চাইলেও টেকার গুণেই পিঠ উঠে

আসে। ভাইয়ের তুলা যেমন মিত্র নেই তেমনি আবার ভাইয়ের তুলা শত্রু নেই।
সুতরাং ভাইয়ের উপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াও।’

‘আমার একার সামর্থ্য কোথায়?’ হাত-পা-ছাড়া গলায় ভূপেন বললে।

‘তা হলে স্বকূকে ডাকো। ও যেখানে ওর বউকে নিয়ে থাকবে সেখানেই এক
পাশে আমি ঠাঁই করে নেব। তুমি থাকো তোমার ভাইয়ের গোয়ালে।’

‘তোমার ছেলে, তুমিই তাকে খবর দাও।’ ভূপেন মুখ ফেরাল।

‘তাই দেব।’

দুর্ধর্ষ ঘাই মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মৃণালিনী, হেমন পথ আটকাল।
হাসিমুখে বললে, ‘শোনো, সব কথা বলা হয় নি। দাদা কিছু কম করে বলেছেন।’

মৃণালিনী থামল।

হেমন বললে, ‘বাড়িটা সতি কেনা হয়েছে নগদ আশি হাজারে। কিন্তু ক্রেতা
শুধু একা আমি নই, ক্রেতা আমি আর দাদা দু-জনে, সমানংশে।’

‘সতি?’ মৃণালিনী দশ দিক আলো করে ঝলমল করে উঠল।

‘তোমাকে দলিলটা দেখাই। দলিল না দেখলে তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না।’

পাশের ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে দলিল বার করে আনলে হেমন। মৃণালিনীর
হাতে দিয়ে বললে, ‘এই দেখ ক্রেতাদের নাম, অংশ আট আনা করে। পড়ে তর্জমা
করে বুঝিয়ে দেব তোমাকে?’

‘বুঝেছি, যখন বলছ। কিন্তু উনি চল্লিশ হাজার টাকা পেলেন কোথায়?’

‘শোনো। মূল সমস্ত টাকাটাই আমার। ধরো আমি ঠুঁকে এই চল্লিশ হাজার
টাকা দান করেছি—ছোট হয়ে বড়কে কি দান করা যায় না? খুব যায়। দেবতাকে
যদি দেওয়া যায় তা হলে দাদাকেও। কিংবা ধরো ঐ টাকাটা উনি আমার কাছ
থেকে ধার করেছেন। যদি ছেলেরা পারে যেন শোধ দিয়ে দেয়। যদি না পারে
তাতেও ক্ষতি নেই। যেহেতু ঐ ছেলেরা আমারও ওয়াশিশ। আমার যা থাকবে
না-থাকবে শেষ পর্যন্ত ওরাই পাবে।’

‘কিন্তু আসলে দলিলে লিখেছ কী?’ বাস্তবের গলায় জিজ্ঞেস করল মৃণালিনী।

‘লিখেছি, আমিই চল্লিশ হাজার টাকা ধারতাম দাদার কাছে। এই কবালার
সেই ঋণ থেকে মুক্ত হলাম আর সমান অংশে দু-জনে, দাদা আর আমি, স্বত্ববান হলাম
বাড়িতে। কি, এই ব্যবস্থাটা ভালো হল না? সমান অধিকারের ব্যবস্থা। কেউ
কারো অহুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকবে না, সবাই এক নোকোর সোনারী হয়ে পাল তুলে
দেবে। উঠবে নতুন আরেক সমৃদ্ধির বন্দরে।’

‘কিন্তু যদি বেনামীর কথা ওঠে?’ অনেক তলাতে পারে মৃণালিনী।

‘কে তুলবে সেই প্রশ্ন? আমার অবর্তমানে বিজয়া তুলবে? তুলে তার লাভ কী, যাবে কোথায়? তার নিজের বলতে তোমরা ছাড়া, প্রশান্ত-স্বকান্ত ছাড়া আছে কে? তোমাদেরকে আঁকড়েই তাকে বাঁচতে হবে যদি অবশ্য পুণ্যবলে সধবা না যায়। তার জীবদ্দশায় তাকে নিশ্চিন্ত করার জগ্গেই এই বাড়ি কেনা, সকলকেই নিশ্চিন্ত করার জগ্গে। আর আমাদের কে হটায়, কে আমাদের ঘর ভাঙে?’

‘আর বাড়িভাড়া?’

‘কে দেবে? কাকে দেবে? ভূপেন বললে, ‘বাড়িভাড়ার দফা রফা।’

‘তা হলে তো খুব ভালো।’ উথলে উঠল মৃণালিনী। মমতাময় চোখে তাকাল হেমেনের দিকে : ‘এতই যখন ছাড়লে তখন তেতলার ঘরটা স্বকু আর তার বউকে ছেড়ে দিতে পারো না?’

‘যে ঐ ঘর দাবি করছে সেই বিজয়াকে জিজ্ঞেস করো।’

বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী। দরজার বাইরে প্যাসেজের কাছটায় বিজয়া এসে দাঁড়াল। মৃণালিনী তার কাঁধে হাত রাখল। রাখতেই দু-জনে আট আনা আট আনা হয়ে গেল। মৃণালিনী বললে, ‘আমাদের দু-জনেরই যখন সমান স্বত্ব তখন ঐ তেতলার ঘরের দাবি আমরা একত্রে ছেড়ে দিলাম। ঐ ঘরে স্বকু আর বিনতা থাকবে।’

‘বা, স্বকু আর তার বউয়ের জগ্গেই তো ঐ ঘর উঠেছে।’ সোহাগে গলে গিয়ে বললে বিজয়া।

হেমেন বললে, ‘স্বকুকে খবর পাঠাব?’

মৃণালিনীর মুখ স্বচ্ছ হয়ে গিয়েছে : ‘আর কী দরকার!’ তারপর স্পষ্ট প্রশংসাতা ফুটে উঠল : ‘সর্বসমস্তার সমাধানই তো হয়ে গেল।’

‘হ্যাঁ, হয়ে গেল, তবু—’ মাথা চুলকোল হেমেন : ‘তার বিয়ে নিয়ে কিছু বলতে পারত তোমাকে।’

‘তোমাকেই তো বলেছে। তোমরা এখন যা ঠিক করবে তাই হবে।’

‘হ্যাঁ, আট আনা আট আনা।’ হাসল ভূপেন।

‘চল’, বিজয়াকে ডাকল মৃণালিনী : ‘চল, তেতলার ঘরটা দেখে আসি।’

‘যাচ্ছি।’ হাতে কী একটা কাজ আছে এমনি ভাব দেখাল বিজয়া।

মৃণালিনী একাই সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

হেমেন বললে, ‘প্রকাণ্ড একটা জট কিন্তু থেকে যাচ্ছে। খোদ পাত্রী নিয়েই

গোলমাল।’ ভূপেনের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল হেমেন : ‘হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব নাকি ?’

‘সর্বনাশ।’ সাপ দেখার মতন লাফিয়ে উঠল ভূপেন : ‘এখন কিছু ভাঙতে গেলে তুমুল করবে। সমস্ত তছনছ ওলটপালট করে দেবে। হয়তো, শেষকালে যেমন যায় সব শাণ্ডি, কানী কি পুরী পালাবে। ভরাডুবি হবে।’

‘হ্যাঁ, আমিও বলি, এখন চেপে যাওয়া ভালো।’ বিজয়া বললে স্থির স্বরে, ‘পাকা দেখার সভায় প্রথম দেখবে, আশীর্বাদ করতে বাধ্য হবে, তখন আর রাগ দেখিয়ে করবে কী। যদি বা রাগ দেখায়, তা হলেও আশীর্বাদ তো পণ্ড হবে না, যেহেতু আপনারা আছেন। আর আশীর্বাদ একবার হয়ে গেলে সর্বত্র অভয়।’ হৃন্দর করে হাসল বিজয়া : ‘বরং সেদিন স্বকুকে ও বাড়িতে হাজির থাকতে বলুন। দিদি যদি কিছু গোলমাল করতে চায় স্বকুই সামলাতে পারবে।’

‘হ্যাঁ, তাই ভালো।’ ভূপেন উদার উচ্ছ্বাসে সায় দিল : ‘স্বকুই সামলাবে তার মাকে। আমরা কেন মাথায় লাঠি থাই।’ বলে নিজের টাকে হাত রাখল।

কদিন পর এক রবিবার পাকা দেখার দিন ঠিক হল আর ক্ষণ ঠিক হল বেলা দশটা।

সাজতে বসল মুণালিনী।

জয়ন্তী জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ, মা ?’

যাড়ে গলায় বুকে পাউডার ঢালতে ঢালতে মুণালিনী বললে, ‘তোমার ছোড়দার বউকে পাকা দেখতে।’

‘কাকে ? বিনতাদিকে ?’

‘হ্যাঁ। হস্টেল থেকে কোন এক কাকার বাসায় এসে উঠেছে, সেইখানে।’

‘কিন্তু তুই ভদ্রমহিলাকে বিনতাদি বলিস কোন স্ববাদে ?’ ঘরে স্ববীর ছিল প্রতিবাদ করে উঠল : ‘তোদের ইস্কুলে পড়ায় ?’

‘নাই বা পড়াল।’

‘নাই বা পড়াল ? তা হলে দুনিয়ার সমস্ত শিক্ষিকাই তোমার দিদি ?’

‘বা, সম্মান করে কথা কইতে হবে না ?’ জয়ন্তী ফোস করে উঠল।

‘তার জন্তে তুই দিদি বলবি ? আমরা মাস্টারদের দাদা বলি ? যখন ঘরে আসবে তখন তো বউদিই বলবি ?’

‘এখন ?’

‘এখন কিছুই বলবি না। ওসব নাম মুখে উচ্চারণও করবি না।’ স্ববীর ভারিকি চালে বললে, ‘তুই আদার ব্যাপারী, তোর জাহাজের খোঁজে কী দরকার?’

খাচল এলিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে নেমে গেল মৃণালিনী। বিজয়াকে ডাকল।
ঝণ্টু গেল তার মাকে খবর দিতে। বললে, ‘ঠাকুমা কাকার নতুন বউ আনতে গেল—’

কচি আঙুলে কর গুনে গুনে ছোট-ছোট যোগ করছিল সেণ্টু। সে হঠাৎ তার লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ঝণ্টুর উপরেই তেরিয়া হয়ে উঠল : ‘ভালো হবে না বলছি। ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।’

‘কেন, ওর ঠ্যাং খোঁড়া করবি কেন?’ বন্দনা নিবৃত্ত করল ছেলেকে : ‘যে আসবে তার ঠ্যাং খোঁড়া করবি। ও কী করেছে?’

যুক্তিটা বোধ হয় মনে নিল সেণ্টু। লাঠি সরিয়ে রেখে আবার সে পেন্সিল নিয়ে বসল! হাতে রেখে যোগ করতে শেখে নি এখনো। তাই রিক্ত ঝাঁ হাতখানি পেতে এক রতি আঙুলে দুইটি বিচ্ছিন্ন সংখ্যার যোগফল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

‘ছোড়দিদিও গেল সেই সঙ্গে।’ ঝণ্টু আরেকটু জুড়ল।

‘সে কি! বিজুও গেছে? আমাকে নিয়ে গেল না কেন?’ খাতা পেন্সিল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লুটিয়ে পড়ল সেণ্টু : ‘আমরা কান্নার খোঁজ নিয়ে আসতে পারতাম। এতদিনে নিশ্চয়ই তার পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছে।’

‘হ্যাঁ, অগ্নিপরীক্ষার পর এবার তার পাতাল প্রবেশ। প্রশান্ত ঘরে ছিল, ছেলেকে তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল বইখাতার সামনে : ‘আর সে আসবে না।’

‘না, না, আসবে।’ আবার সেণ্টু চেষ্টা করে উঠল।

‘হ্যাঁ, আসবে।’ সেণ্টুকে স্তোক দেবার জন্তে বন্দনা বললে, ‘আর এসে একবারে সকলের মাথার উপরে বসবে। বিচারটা একবার দেখ।’ স্বামীকে এবার সে লক্ষ্য করল : ‘সিনিয়রের প্রমোশন নেই। ওপেন মার্কেট থেকে কোন একটাকে ধরে এনে টঙে বসিয়ে দিলে।’

‘আজকাল এই রেওয়াজ।’ প্রশান্ত বললে, ‘শুধু খাতিরের শ্রীক্ষেত্র।’

‘বলে কিনা আমাদের গুণ নেই। আর যে মাস্টারনী আসছে সে একেবারে গুণের গম্বুজ। যে আবিষ্কার করেছে সে নিজেও একটি স্তম্ভ। টিকলে হয় ঝড়ে-জলে। হ্যাঁ, কাকলি হত, মুখে যাই বলি, মনে মনে মানতে হত এক শো বার।’

‘কিসে গেল ওরা?’ বন্দনাকে ধামাবার জন্তে ঝণ্টুকে জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

ঝণ্টু বললে, ‘ট্যান্ডিতে।’

ট্যান্সিতেই হেমন জিজ্ঞেস করলে মৃণালিনীকে, ‘হারটা নিয়েছ?’

বিজয়া বললে, ‘নিয়েছি।’

পথেই কিন্তু একটা আভাস দিয়ে রাখা ভালো, নইলে ব্যাপারটা কিরকম বোলাটে থেকে যাবে, হয়তো বা দেখাবে প্রতারণার মত! যেন কারে ফেলে মজা দেখা হচ্ছে এমনি একটা শক্ততার ভাব। এটা ঠিক নয়।

‘আচ্ছা বউদি,’ হেমন আবার লক্ষ্য করল মৃণালিনীকে, ‘আমরা যদি গিয়ে দেখি এ মেয়ে তোমার বিনতা নয়—’

“বিনতা নয় মানে?’ মৃণালিনী রুক্ষ মুখে বললে, ‘তবে আবার কে?’

‘ধরো আর কোনো প্রণতা?’ হেমনের দু’চোখ কোঁতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

না, না, আর কেউ হতে যাবে কেন? বিনতাই প্রণতা। তোমরা তো জানো না এর মধ্যে কতবার ও এসেছে আমার কাছে, কত বলেছে ঘর-সংসারের কথা—’

‘কিন্তু স্বকু তো কিছু বলে নি।’ বললে হেমন, ‘ও তো আর আসে নি তোমার কাছে।’

‘না আসুক, না বলুক।’ বিজয়ের মত মুখ করল মৃণালিনী: ‘এক দিকের কথা শুনেই আরেক দিকের কথা বেশ বোঝা যায়। বিনতার ভাব-সাব থেকেই বোঝা গেছে স্বকুর মতি-গতি, স্বকুর পছন্দ।’ তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাণ ছুঁড়ল: ‘তবে তোমরা মেয়ে কে ঠিক না জেনেই চলেছ পাকা দেখতে?’

‘আমাদের জানবার কী দরকার!’ ও পাশ থেকে বললে ভূপেন।

‘জানবার কী দরকার মানে?’ ঝলসে উঠল মৃণালিনী: ‘তাই বলে যা-তা একটাকে ধরে নিয়ে আসবে?’

‘আসবে—আমরা তার কী করব?’ ভূপেন উদাসীন ভঙ্গি করল। পরে একটু জেরার মত করে প্রশ্ন করল: ‘প্রথম বার যে ধরে এনেছিল, জানিয়েছিল আমাদের? মত নিয়েছিল? যা সংসারে এনে নিক্ষেপ করেছে তাই আমরা বিনা আক্ষেপে গ্রহণ করেছি। এবারও তাই যা ছুঁড়ে মারবে তাই তুলে নেব। ওর যাতে পছন্দ তাতেই আমাদের সমর্থন। শত হলেও ছেলে। সেই ছেলে আর ছেলের বউকে কে পারে ফেলে দিতে?’

‘বিশেষ করে কৃতী রোজগারে ছেলে।’ ফোড়ন দিল হেমন।

‘বা, সেই যে মেয়ের কাকা এল বাড়িতে, পাকা দেখার দিন ঠিক করতে, তার খেকেও ব্যাপারটা স্পষ্ট করে নিলে না—কে মেয়ে, কী পরিচয়?’ মৃণালিনী যেন ফাঁপরে পড়ল : ‘এটা কোন ধরনের কথা?’

‘অত্যন্ত আধুনিক ধরনের।’ বললে হেমন, ‘পাত্রীর মনোনয়নে বাবা-কাকার যখন কোনো কথা খাটবে না, ভূমিকা থেকে পরিশিষ্ট কোনোখানে না, তখন পাত্রী কে, এ সম্পর্কে বাপ-কাকার কোঁতুহল অবাস্তব। শুধু অবাস্তব নয়, অসংগত। শুধু এসে বললে, বিয়ে করছি, বললাম ঠিক আছে। আগন্তুক তত্ত্বলোক এসে বললে, আমি পাত্রীর কাকা, নিমন্ত্রণ করতে এসেছি আপনাদের, বললাম ঠিক আছে, ঠিকানাটা রেখে যান। এর বেশি আমাদের বক্তব্য নেই, থাকতে পারে না—’

‘এর বেশি কিছু বলতে কইতে গেলেই একসারসাইজিং এ জুরিসডিকশন নট ভেস্টেড ইন কোর্ট হয়ে যাবে।’ হাসিমুখে লেজুড় জুড়ল ভূপেন।

‘তবে যেখানে পাত্রী জানা নেই সেখানে আশীর্বাদের ঘটা কিসের?’

‘শুধু স্বকুর অহুরোধে।’ ড্রাইভারের পাশে বসার দরুন বারে-বারে ঘাড় ফিরিয়ে মুখের দিকে তাকাতে হচ্ছে না এই হেমনের আরাম।

‘এসব ঘটা হয় নি বলেই প্রথম বারেরটা ভেস্টে গিয়েছিল।’ ভূপেন বললে, ‘তাই দ্বিতীয় বারের বেলায় সাবধান হয়েছে।’

‘তা ছাড়া যে পাত্রীকেই স্বকু মনোনীত করবে তারই উপর আমাদের আশীর্বাদ। তা সে পাঁচিই হোক আর খেঁদিই হোক।’ হেমন উদার স্বরে বললে।

‘বললেই হল?’ বিজয়ার হাসি ছাপিয়ে ধমকে উঠল মৃণালিনী।

‘না বললেও হবে।’ গম্ভীর হল হেমন : ‘পাঁচি হলেও আমাদের আদরের, খেঁদি হলেও আমাদের আদরের। স্বকুর বউকে ফেলব কোথায়? এ তো তবু যদুর বুঝি বাঙালী বিয়ে করছে, কিন্তু যদি ধরো বিদেশে গিয়ে অজাতকুজাত এক মেম বিয়ে করে আনত, ‘শেম’ ‘শেম’ করতে পারতাম না, ঠিক বরণ করে নিতাম—’

‘আর সে মেম গাউন ছেড়ে শাড়ি-ব্লাউজ না ধরলেও, শাঁখা-সিঁদুর না পরলেও—’ ভূপেন মাথা নাড়তে লাগল।

‘বলো কী ভীষণ কথা!’ মৃণালিনীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

‘আমাদের কোর্টের উকিল মহীতোষবাবুর বড় ছেলে করল কী! বিদেশ থেকে মেম বিয়ে করে আনল।’ বলতে লাগল ভূপেন, ‘মেমশাহেব যদিও শাড়ি-ব্লাউজ পরতে রাজি, শাঁখা-সিঁদুর পরতে, কিন্তু মহীতোষবাবুর ছেলে কিছুতেই তাতে রাজি

নয়। বলে, তুমি যদি ওসব পরে বাঙালী মেয়ে সাজতে চাও, তা হলে তোমাকে বিয়ে করলাম কেন! ষ্ট্রাইট বাঙালী মেয়ে বিয়ে করলেই তো হত। তা ছাড়া, তুমি যদি ওসব পরো, তোমাকে সড়ের মতন দেখাবে। ইংরেজও নয়, বাঙালীও নয়, হয়ে দাঁড়াবে 'বাংরেজ'। তোমার সমস্ত গ্যামার ধুয়ে যাবে, তোমাকে ভাউডি দেখাবে—'

'সে আবার কী!' আতকে শিউরে উঠল মৃণালিনী।

'মানে, তুমি বোদা, বিশ্বাস হয়ে যাবে, লেশমাত্র আকর্ষণ থাকবে না।' বিশদ হল ভূপেন: 'তোমার রূপ তোমার পোশাকে চুলে, গয়না-টয়না না-পরায়, হাঁটা-চলায়, কথা বলায়, সর্বোপরি তোমার ভাষায়। তুমি আধো-আধো বাঙলা শিখে আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করবে এ দুশ্চেষ্টা কেন! যদি বাঙলাতেই আলাপ করব তবে ষোল আনা বাঙালী মেয়ের স্বাস্থ্য হতে দোষ কী ছিল!'

'তারপর হল কী?' অস্থির হয়ে উঠল মৃণালিনী।

'যাও না, মহীতোষবাবুর বাড়িটা দেখে এসো না। দোতলাটা ছেলে-বউকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন। আর সামনের রাস্তা থেকেই দেখবে দোতলার বারান্দায় হাঁটু-ছোঁয়া ক্রক পরে মেমসাহেব, মহীতোষবাবুর পুত্রবধূ, পাইচারি করছে আর সিগারেট ফুকছে। ছেলের ইচ্ছায়, গ্যামারের খাতিরে সব মেনে নিতে হয়েছে মহীতোষবাবুকে। ফেলবে কোথায়!'

'কী সাংঘাতিক!' মৃণালিনীর হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে গেল!

'এ তো ধুমাবতী দেখলে,' হেমন বলল, 'এবার ছিন্নমস্তা দেখবে চলো।'

'সে আবার কী?' উদ্ভিগ্ন হল বিজয়া।

'ছিন্নমস্তা মানে আমাদের আকিসের স্বথময়বাবুর ছেলের বউ।'

'সে আবার কী করল!' ভূপেন কোঁতুহলী হল।

'স্বথময়বাবুর' ছেলে বিধবা বিয়ে করেছে।' বলতে লাগল হেমন, 'কিন্তু বিয়ে করার পর বউকে সাজতে-গুজতে দিচ্ছে না, পরতে দিচ্ছে না গয়না। শুধু তাই নয়, সিঁথিতে সিঁদুর আঁকতে দিচ্ছে না, পায়ে আলতা, ঠোঁট রাঙাতে দিচ্ছে না পান খেয়ে। বলে তুমি যদি উদগ্র সধবা সাজবে, তা হলে তোমার চার্ম কোথায়? যাকে আমি ভালোবেসেছি সে কোথায়? এ সাজাগোজা মহিলা তো আরেক লোক, স্ততরাং আগে যেমন ছিলে, তেমনি বিধবা সাজো। ই্যা, স্বামী বেঁচে থাকলেও বিধবা। আর সেই যে করুণ-করুণ মুখ করে থাকতে, যে মুখ আমাকে মুগ্ধ করেছে, সেই করুণ-করুণ মুখ করে থাকো। নচেৎ যদি রক্তে-রসে হাসিতে-আনন্দে প্রগল্ভ হও, তা হলে

তোমার জাত মারা যাবে, তোমাকে অঙ্গীল দেখাবে, অঙ্কুচি দেখাবে, তোমাকে আর ভালোবাসা যাবে না—’

‘তারপর?’ ভূপেনই জিজ্ঞেস করল।

‘তারপর আর কী! আগের সেই বৈধব্যবেশই ধরল বউ। ছেলে বলে কিনা, শাদা থান না পরলে, কপাল-মাথা শাদা না রাখলে, ভালোবাসা যাবে না। ভাবতে পারো বউদি, ছেলে বেঁচে, অথচ তার বউ পাড়-ছাড়া শাদা শাড়ি পরে করুণ-করুণ মুখ করে সংসারি করছে।’

‘উঃ, কী দিনকালই পড়েছে!’ অস্তুরে-অস্তুরে শিউরে উঠল মৃণালিনী : ‘আমার স্বকু না জানি কী কাণ্ড করে বসেছে!’

‘যাই করুক, যে মেয়েকেই পছন্দ করুক, যুগের যেমন হাওয়া,’ ভূপেন বললে, ‘তাকেই আমরা আশীর্বাদ করব।’

মনে-মনে গুরুদেবের শরণাপন্ন হল মৃণালিনী। কিন্তু জোর পেল না। তাই গেল কালীঘাটে মা কালীর দুয়ারে। হে মা কালী, স্বকু যেন বিদ্যুটে কিছু করে না বসে। বিনতা হোক প্রণতা হোক, একটি বাঙালী মেয়েই যেন ওর বউ হয়। আর কিছু চাই না, যেন বয়সে বড় না হয়। বুড়ি না হয়। যেন কুমারী হয়। আর, ভগবান, যেন অস্ত্রত ম্যাট্রিকটা পাশ থাকে। আমার আগের বউকে তো জানো। সে কত বিহুসী ছিল। কত গুণী। একেবারে হেজিপেজি না হয়। একেবারে আজোবাজে হলে লোকে ধর্ম দেখবে। আমার খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে।

দুয়ারে ট্যান্ডি এসে দাঁড়াতেই বাড়িভর্তি লোক কলধ্বনি করে উঠল। বহু মুখে বেজে উঠল শব্দ। আর এত বড় একটা সম্ভ্রান্ত জনতা দেখে মৃণালিনী কিছুটা আশ্বস্ত হল, হয়তো পাত্রী একেবারে পরিত্যক্তা হবে না। সর্বত্রই দেখছি খোলা মাঠের হাওয়া, সারল্যের জল, কোথাও এতটুকু লুকোলুকি ঢাকাচুকির কুয়াশা নেই।

তবু বিধাতাপুরুষ যে এক সাংঘাতিক রসিক ব্যক্তি এ জ্ঞান ছিল বলেই মৃণালিনী স্তব্ধ হয়ে রইল, বিনীত হয়ে রইল।

কেউ কারু প্রত্যক্ষ পরিচিত নয়, গায়ত্রী আর ইন্দিরা মেয়েদেরকে অভ্যর্থনা করল, আর নরনাথ পুরুষদের। ‘দাদা অস্থস্থ, বিশেষ হাঁটতে-উঠতে পারেন না, নিজের ঘরে আছেন বন্দী হয়ে।’ বনবিহারীর অল্পপস্থিতির সাক্ষ্যই দিল নরনাথ।

‘হ্যাঁ, যাবার আগে দেখা করে যাব।’ ভূপেন বললে।

কাকলির ঘরেই জিনিসপত্র সরিয়ে প্রকাণ্ড ফরাস পাতা হয়েছে। বরপক্ষীয়েরা

বসল তার উপর। তাকিয়ে রইল মুখোমুখি দরজার দিকে। কখন কী মূর্তিতে দেখা দেবে কল্যা, বিকটদর্শনা না কি অমিয়ময়ী অগ্নানলস্বী!

পাশের ঘরে সাজছে কাকলি। সাজছে মানে সাধারণভাবে একটু ফিটফাট হচ্ছে। গায়ত্রীর ইচ্ছে একটু গয়না-টয়না পরে ভরা-ভর্তি সাজে; গায়ে দামি রঙিন শাড়ি দোলায়, চুলে বিনোদ বেণী তৈরী করে। আর কবে দেখতে পাব সেই সাবেকী ঠাট—একটু বা আপসোস করে।

‘মাথা খারাপ!’ হাসিমুখে সমস্ত প্রস্তাব উড়িয়ে দেয় কাকলি: ‘চেনা বাম্বনের পৈতের দরকার কী: যেমনটি আছি তেমনটি গিয়ে দাঁড়াব।’

এখন কথা উঠেছে খালি মাথায় দাঁড়াবে, না মাথায় একটু তুলে দেবে আঁচলের প্রাস্তটা। কিসে ফুটে শালীনতার ভাব।

এ নিয়ে আবার কথা কী! আমি তো এখন মিস মিত্র। নবজাত।

কিন্তু ঘরে ঢুকতেই দরজার কাছে প্রথমেই ভূপেনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল কাকলি। এতক্ষণ আড়ালে ছিল, ভূপেন এসেছে বুঝতে পারে নি। এখন চকিতে, চোখাচোখি হতেই, মাথায় কাপড় টেনে দিল কাকলি। আর, মাথায় কাপড় দেওয়া অবস্থায় দাঁড়াল সভাস্থলে।

কল্লার সঙ্গে যেমন একজন বাহিকা আসে, কাকলির সঙ্গে তেমনি আসছিল ইন্দিরা। ইন্দিরা তো প্রকটরূপেই বিবাহিতা, কিন্তু সঙ্গে অপর একজন যে এগুচ্ছে, স্বর্ণাকরে খুব রক্তিম না হলেও তারই তো সমগোত্রীয় মনে হচ্ছে। বিবাহিতা না হলে আর মাথায় ঘোমটা কেন? কেন ভঙ্গিতে এত গাভীর্য!

আতকে উঠল ঝণালিনী। পাশে বসে বিজয়ার একটা হাত ধরে ফেলে দিশেহারায় মত বললে, ‘এ আবার কার বউ বিয়ে করছে হুঁ?’

‘ভালো করে দেখুন না তাকিয়ে।’ হাসিভরা মুখে বললে বিজয়া।

সকলের আগে নিচু হয়ে ঝণালিনীকেই প্রণাম করতে এগুল কাকলি।

‘জ্যা! তুমি? আমাদের ছোট বউমা?’

‘পরের বউকে কোন হুঁথে বিয়ে করতে যাবে?’ বিজয়ার হুঁ চোখে খুশি উপচে উঠল: ‘নিজের বউকেই বিয়ে করছে হুঁ।’

‘খুব ওরিজিণাল।’ টিপ্পনী কাটল হেমেন।

‘তুমি আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ।’ কাকলির চিবুকে একটু হাত বুলোল ঝণালিনী: ‘উঃ, আমি কত কী আবোলতাবোল ভাবছিলাম, আমার বুকটা এখনো চিপচিপ করছে। বাবাঃ, পাথর নেমে গেছে বুক থেকে। চলো, ঘরের লক্ষী

ঘব আলো করবে চলো। কই, সব সরঞ্জাম কই? ধানছুবো কই?’ বিজয়ার দিকে সাগ্রহ হাত বাড়াল : ‘দে, হারটা দে।’

বাক্সটা এগিয়ে দিল বিজয়া।

সাতলহর হারটা শূণ্ঠে একবার ছলিয়ে মৃণালিনী কাকলির গলায় পরিয়ে দিল।

মৃণালিনীকে আবার প্রণাম করল কাকলি। এবং ক্রমে-ক্রমে আর সকলকে।

ভূপেনের দিকে তাকিয়ে মৃণালিনী বললে গদগদ হয়ে, ‘স্বকুর যে এমনতর কীৰ্তি বুঝতে পারি নি—’

‘আমরাও কি পেরেছি?’ সায় দিল ভূপেন।

‘যদি একজনকে দেখতাম, বাড়িটা ঠিক ধরতে পারতাম।’ কাকলিকে লক্ষ্য করল মৃণালিনী : ‘তোমার সেই দাদা কোথায়? তাকেই তো একমাত্র চিনি।’

দেবনাথের খোঁজ শুরু হল। দেবনাথ বাড়ি নেই। কোথায় ঘুরতে বেরিয়েছে।

‘আরেকজনকে দেখলেও হয়তো ধরতে পারতে।’ হেমেন বললে, ‘কই, সে আসে নি?’

সবাই ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল চারদিকে। সে কে?

‘স্বকু।’

‘ও মা, সে কেন আসবে?’ বিজয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আরো সকলে হেসে উঠল।

‘সেও দেখবে নাকি পাকা করে?’

চারদিকে আনন্দের হুল্লোড় পড়ে গেল। শুরু হল খাওয়া-দাওয়া। বনবিহারীর সঙ্গে দেখা করা। দিনক্ষণের হিসেবে আসা।

‘সেন্টুকে নিয়ে এলেন না কেন?’ বিজয়ার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল কাকলি।

‘যাও না, দেখে এসো না সেন্টুকে।’ বিজয়া বললে হাসতে-হাসতে, ‘সে একটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাকার ঠ্যাং ভাঙবে বলে।’

‘কাকার অপরাধ?’

‘কাকা তার কান্নাকে ফিরিয়ে না এনে আবার বিয়ে করছে বলে।’

কথা শুনে হাসতে লাগল কাকলি। কিন্তু হাসির রোদে জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠল।

একটু আড়ালে কাকলিকে ডেকে নিল মৃণালিনী। গলা নামিয়ে অন্তরঙ্গের মত বললে, ‘তোমার চাকরিতে উন্নতি হয়েছে?’

‘আপনাদের আশীর্বাদে কিছু হয়েছে।’

‘মাইনে বেড়ে কত হয়েছে এখন?’ গলার স্বর আরো ঝাপসা করল মৃণালিনী।

‘তা নেহাত মন্দ নয়।’ ভয়ে-ভয়ে শুকনো মুখে কাকলি বললে।

‘তা মন্দই হোক আর ভালোই হোক, সব টাকাই তোমার। তোমার ইচ্ছেমত তুমি খরচ করবে, তোমার বুদ্ধিমত, বিবেকমত। আয়েও যেমন তোমার স্বাধীনতা, তেমনি ব্যয়েও। কারও কিছু বলবার-কইবার নেই, দাবি করবার নেই। যার উপর দাবি করবার আছে সে স্বকু— তা, শুনেছি তারও নাকি রোজগার বেড়েছে। তাই তুমি খোলসা মনে কাজ করে যাবে, যতদিন অবশি তা সম্ভব রাখেন ভাগবান, তা কেন, যতদিন তোমার খুশি।’

বিগাঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাকলি।

এই অন্তরঙ্গ দৃষ্টটুকু হেমেনের চোখ এড়াল না। সে বলে উঠল, ‘আর কিছু নয়, হুনিয়ায় শুধু মিষ্ট মুখেই ইষ্ট লাভ।’

আনন্দের হাটে তাঁটা পড়ল, বরপক্ষীয়েরা যখন চলে গেল ট্যান্ডি করে। কিন্তু আশ্চর্য, তাদের একজন এখনও বাকি।

‘এ কী, তুমি কোথেকে?’ চোখ প্রায় কপালে তুলল কাকলি।

‘ও পাশের ছোট ঘরটায় ছিলাম এতক্ষণ বন্দী হয়ে!’ কাঁচমাচু মুখে বললে স্বকাস্ত।

‘সে কী? তুমিও আমাকে পাকা দেখবে নাকি?’

‘না, আমার তোমাকে নিরস্তর কাঁচা দেখা। পাকা করে দেখতে গেলেই তো শেষ হয়ে যাবে। আমার কাঁচা দেখায় শেষ নেই, পুরোনো হওয়া নেই। সে সব সময়েই নতুন করে দেখা, আরেক রকম করে দেখা। তাদের রম্য রুচির নব নব—’

‘নব নব পরে হবে। কিন্তু পাকা দেখার সময় তুমি কী করে এখানে আসো, কোন নিয়মে? কোনো হাইকোর্টে এর নজির আছে?’

‘আমরা বে-নজির।’ উদার হাস্তে উজ্জ্বলিত হল স্বকাস্ত : ‘এ মামলা অফ ফাস্ট-ইম্প্রেশন। আসলে আমার উপস্থিতি তোমাকে রক্ষা করতে—’

‘আমাকে?’

‘হ্যাঁ, সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হতে। আর তা কাকার আদেশে। মানে পাজী নিয়ে যদি কোনো হেঁচক হয় তা শাস্ত করতে।’

‘মানে, মন্দেই ভঞ্জন করতে।’

‘বলতে পারো সম্ভাব্যবিধান করতে।’

‘কই, লাগল না তোমাকে?’

‘পরে লাগবে।’

‘ছাই লাগবে ! আমি একাই জিতে নিলাম।’

‘এক কিছুই হবার নয়। আমার শানাইয়ের পোঁ আছে বলেই তো মনোহারা করতব।’

গায়ত্রী এসে বলে গেল এখানেই থেয়ে যাবে স্বকাস্ত।

‘তা হলে আর কথা কী ! চলো ঘুরে আসি।’ আনন্দের ঢেউ তুলল কাকলি :
‘চলো’

• ৬০

বাইরে বেরিয়ে ট্যান্ডি নিল দু-জনে।

কাকলি বললে, ‘চলো কিছু কেনাকাটা যাক।’

‘না, না, কেনাকাটা নয়, অস্তুত এখন নয়।’ বললে স্বকাস্ত, ‘এখন শুধু একটু ঘোরা, নিরুদ্ধশে বেড়ানো। আমরা যে নতুন, চিরন্তন নতুন, আলোতে-হাওয়াতে এ নতুন করে অহুভব করা। সৌন্দর্যে নতুন, যৌবনে নতুন।’

‘তা হলে বলতে চাও এ মিলন শুধু স্বকাস্তর সঙ্গে কাকলির নয়, এ মিলন চিরন্তন স্বন্দরের সঙ্গে চিরন্তন যৌবনের।’ বললে কাকলি।

‘আর এই মিলনের মন্ত্র ভালোবাসা। চিরন্তন নবীন থাকবার মন্ত্র।’ বললে স্বকাস্ত, ‘এমনিতে প্রতিদিনের অভ্যস্ত পৃথিবী তো জীর্ণ ধূলিধূসর কিন্তু যেই খবর আসে যাকে ভালোবাসি তার সঙ্গে আজ দেখা হবে অমনি সমস্ত শ্রীহীন স্বন্দর হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—’

‘আর,’ কথার জের টানল কাকলি : ‘মরা কাঠে যৌবনের মঞ্জরী জাগে, মরা নদীতে যৌবনের জোয়ার।’

‘তোমাকে যদি এখন দু বাহর মধ্যে জড়াতে পারতাম,’ স্বকাস্ত ছেলে-মাম্বরের মত মুখ করল, ‘তা হলে বলতে পারতাম চিরস্বন্দরের বাহুপাশে চির-যৌবন বাঁধা পড়ে আছে।’

‘তা বলা না যত খুশি।’ কাকলির শৈশব-সরল মুখ করল : ‘মুখে বলতে দোষ কী। কাজে না করলেই হল।’

‘আমরা-চলেছি কোথায়?’ হতাশের মত জিজ্ঞেস করল সুকান্ত।

‘চলো আমাদের সেইসব পুরোনো দৃশ্যগুলি আবার দেখি।’

সুকান্ত তেমনি নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। কতদূর যেতেই বলল, ‘আর্যে! এই সেই স্বাতী চিত্রগৃহ, যেখানে একদা এক বর্ষাসিন্ত সন্ধ্যায় আপনি আমার জন্ম প্রতীক্ষা করিবার ভান করিয়াছিলেন—’

কতক্ষণ পরে সুকান্ত আবার বললে, ‘আর্যে, অবলোকন করুন, এই সেই ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, যার দ্বারদেশে আমি আপনার জন্ম তৃষ্ণার্ত নয়নে অপেক্ষা করিতাম আর নির্ধারিত সময় অস্তেও আপনি আসিতেন না—’

‘আর অদূরে ঐ যে মাঠ দেখিতেছি?’

‘উহাই প্রসিদ্ধ গড়ের মাঠ। কতদিন ঐখানে বসিয়া আমরা একত্র পাঠ্য-পুস্তক নিয়া আলোচনা করিয়াছি আর পথচারীরা আমাদের গৃহহীন উদ্বাস্ত মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছে—’

তারপর ওরা একদিন বেড়াতে এল জুতে।

‘বরাননে, এই সেই বিচিত্র পশুশালা, যেখানে কেন কতককে খাচায় পোয়া হইয়াছে ও কেন কতককে হয় নাই এই প্রশ্ন চিরবিস্ময়ের চিহ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—’

আবার একদিন লেকে।

‘চাকরনেত্রে! রবীন্দ্রনাথ আমাদের মার্জনা করুন, এই সেই রবীন্দ্র-সরোবর, যার জলে আমরা একত্র নিমজ্জিত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—’

‘মিথ্যে কথা।’ ছোট্ট চিমটি কাটল কাকলি।

তারপর আকাশে একদিন নবীন বর্ষার মেঘ করে এলে, সন্ধ্যাকালে ওরা দু-জনে ছাদে চলে এল।

কদম গাছের কাছে এসে কাকলি বললে, ‘দেখ আনন্দে কেমন রাশি-রাশি ফুল ফুটেছে। প্রতি বছরেই ফোটে, প্রতি বছরেই মনে হয় এই বুঝি প্রথম। জগতের পাত্রের এক কণা অমৃতেরও ক্ষয় নেই।’

‘তেমনি জীবনের পাত্রেরও যেন এক কণা না কম পড়ে!’

‘দেবতার কাব্য দেখ। মরেও না, জীর্ণও হয় না।’

‘তেমনি করা যায় না জীবনের কাব্য? ন জীর্ণতি না মমার।’

‘আজ কিন্তু চেয়ার নিয়ে উঠছে না চাকর।’

‘আর কদম ফুল চিনি না বলে কেউ বলছে না, কে ড্যাম ফুল !’

হু-জনে হেসে উঠল একসঙ্গে ।

হু তরফ থেকেই বিয়ের সরকারি নিমন্ত্রণপত্র ছেপে এসেছে । ঠিক হয়েছে ওদের যারা সমান বন্ধু তাদেরকে একসঙ্গে গিয়ে নিমন্ত্রণ করবে । আর যারা একক বন্ধু তাদেরকে বিচ্ছিন্নভাবে ।

সমান বন্ধু বলতে আফিসের কজন আর বাইরের বলতে দীপঙ্কর ।

দীপঙ্করের বাড়ি একদিন চলল হু-জনে ।

সন্ধ্যাশেষে গলিটা অন্ধকার মত । ওরা ঢুকছে, দেখল কে একটি মহিলা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গলি থেকে ।

‘চিনতে পারলে ?’ জিজ্ঞেস করল কাকলি ।

‘লক্ষ্য করি নি ।’

‘যতদূর মনে হচ্ছে, বিনতা ।’

‘তা—এখানে ?’

‘বোধ হয় দীপঙ্করের কাছে এসেছিল ।’

‘দীপঙ্করের কাছে আসবে কেন ?’

‘কে জানে হয়তো কোনো গোপন ষড়যন্ত্রে ।’ চিন্তিত মুখ করলে কাকলি : ‘মুখের গ্রাস কেড়ে নিলাম, হয়তো বা সেই যন্ত্রণায় । আর যার উপকার করেছে সেই দীপঙ্কর যদি এখন শত্রুতা করে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই ।’

‘চলো যাই না, জিজ্ঞেস করি না দীপঙ্করকে ।’

ঘরে ঢুকেই দীপঙ্করের চমকের চেউটা না কাটতেই কাকলি বলে উঠল, ‘কে এসেছিল ? একটি মহিলাকে দেখলাম ।’

‘আরে, সে তো আপনারই বন্ধু, আপনারই নাম করে এসেছিল, বিনতা সেন—’

‘বক্তব্য কী ?’

‘বক্তব্য আর কী ! বক্তব্য মার্স্টারি আর ভালো লাগে না, যদি অস্ত্র আর কোনো একটা চাকরি তাকে জোগাড় করে দিতে পারি ।’ দীপঙ্কর হাসল : ‘বললাম, আমিই নিধিরাম সর্দার, আমি কোথেকে কী যোগাড় করে দেব ? তবে ভদ্রতা করে যা বলতে হয়, তাই বললাম । বললাম, দেখব চেষ্টা করে । দেখবেন জুলবেন না, আমার আসব খোঁজ নিতে, বলে চলে গেল ।’

‘চলে কী আর যায় ! ওঠেই না ।’ বিরক্ত মুখ করে দুর্গাবালা বললে, ‘শেষকালে আমি তাড়া দিতে উঠল ।’

‘এমন তাড়া যে আমাদের দেখেও দেখল না।’ কাকলির ক্ষুধা স্বর।

‘তার মানে ধরা পড়তে চায় না।’ দীপঙ্করের স্বরে সমবেদনার হোয়া।

‘মেয়েদের সব চেয়ে বড় চাকরি হচ্ছে বিয়ে।’ বললে দুর্গাবালা, ‘আসলে সেই চাকরির খোঁজ। মধুর অভাবেই গুড়ের ডাক। তা তোমাদের তো ফের বড় চাকরি জুটে গেল।’ দুর্গাবালার গলায় একটু বা খোঁচা মারা।

‘হ্যাঁ, শুনেছেন তা হলে।’ হাসল কাকলি।

‘হ্যাঁ, এই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল শুনলাম, আবার এরই মধ্যে বোঝাবুঝি হয়ে গেল?’

‘সোজাসজির আবার বোঝাবুঝি কী।’ হাসির পর্দা আরো উচুতে তুলল কাকলি : ‘তাই মিলতে দেরি হল না।’

‘মাই বলো, তুমি অস্থিরচিন্ত।’ প্রায় ভৎসনা করল দুর্গাবালা : ‘এই হস্তদস্ত হয়ে বিয়ে করলে, কদিন যেতে না যেতেই বিয়ে ভাঙলে, আবার ব্যস্তসমস্ত হয়ে সেই সোয়ামীতেই বিয়ে বসতে চলেছ? সেই মাটিতেই আবার মৃদঙ্গ তৈরি? মাহুবে বলবে কী!’

‘মাহুবে কবে কী ভালো বলল! ভাঙলেও নিন্দে, গড়লেও নিন্দে।’ কাকলির হাসি আর থামে না।

‘এই অস্থিরতার ফল হবে আবার এই বিয়ে ভেঙে যাবে—’ দুর্গাবালাকে রুড় শোনাল।

তাই বুঝেই হয়তো দীপঙ্কর বললে, ‘বা, এই বয়সটাই তো অস্থির হবার। যেমন ভাঙবার তেমনি ভালোবাসাবার।’

‘যদি ভেঙে যায়, অস্থির হাওয়ার দরুন, পারব না বিচ্ছিন্ন থাকতে। আবার মিলব।’ সমস্ত মেঘ উড়িয়ে দিল কাকলি : ‘অস্থিরতার শেষ হচ্ছে শান্তি। আর কে না জানে, শেষের সুখই সুখ। শেষের ঘুমই ঘুম।’

কাকলির হাত ধরে আড়ালে টেনে নিল দুর্গাবালা। নিচু গলায় বললে, ‘যখন একবার ছেড়ে ছিলে তখন আবার ঐ ঝগড়াটে বাড়িতে ঢুকছ। কোন সাহসে? আর কোনো ঠাণ্ডা বাড়ি খুঁজে পেলো না?’

‘ভবিষ্যৎ।’ কপাল দেখাল কাকলি।

‘এত আমাদের উপকার করলে, আরেকটা উপকার করলে কী হত! দীপঙ্কর তো এমন অযোগ্য ছেলে ছিল না!’

কাকলি হাঁ হয়ে রইল।

‘এখন তোমার অতগুলি টাকা কী করে তুলে দিই সংসার থেকে ? কী করে শোধ করি ?’

‘শোধ করতে হবে না। এই নিন নেমস্তন্ত্র চিঠি। যাবেন সকলকে নিয়ে।’ স্বকাস্তকে প্রায় টেনে ফ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

বেরিয়ে আসতে-আসতে স্বকাস্ত বললে, ‘তুমি কী স্বন্দর বললে বো! তো! শেষের স্বখই স্বখ।’

এখন বয়েনের কাছে কে যায় ? সে কি উভয়ের বন্ধু, না একলা একজনের ? কোনো কথা হয় নি। কিন্তু তার নিমন্ত্রণ হবে না এ ভাবনার অতীত। কে না জানে সে ছিল বলেই এই মিলন সম্ভব হয়েছে। নিমন্ত্রণ-সভায় যদি কেউ অগ্রগণ্য থাকে তবে সে বয়েন ছাড়া কেউ নয়।

এখন সে যদি একলা একজনের বন্ধু, তবে কার বন্ধু ?

একলা কাকলিই গেল তাকে চিঠি দিতে। দিনের বেলা, তার খোলা-মেলা বাড়িতে, দোতলায়। দিব্যি চাকরের হাতে কার্ড দিল। ঘরে বাবু একা। হলই বা না, ভয় কিসের ! বলে দাও আমিও একা।

নিচু সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে বয়েন। উঠল না, শাস্ত নিষ্পৃহ চোখে তাকাল এক মুহূর্ত। বললে, ‘আপনাকে আবার এভাবেই দেখতে পাব কল্পনা করি নি।’

‘আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।’

এবার বয়েন একটু মনোযোগী দৃষ্টি ফেলল। কিন্তু সেই তার সর্বাঙ্গলেহী হাড়মাস বিদ্ধ করা তীক্ষ্ণ চাউনি কোথায় ? চোখে একটু বা উদাসীন ছায়া নিয়ে বললে, ‘নিমন্ত্রণ করতে এসেছেন, কথাটা ঠিকমত বলেন নি। চট করে শুনলে অন্তরকম মানে হয়।’

‘আমার বিয়ে। আমার বিয়েতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।’ আগের বাক্যটা ফ্রুত সংশোধন করল কাকলি। দাঁড়াল দৃঢ়দৃষ্ট হয়ে।

‘বুঝেছি। ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।’ নিচু চোখে আবার পড়ায় মন দিল বয়েন।

চিঠিটা হাত বাড়িয়ে নিল না দেখে, সামনে যে মোড়ার উপর ছাইদান সে মোড়ার উপর রেখে কাকলি বললে, ‘যাবেন। শত হলেও আপনি বন্ধু—’

‘চেষ্টা করব।’

‘আচ্ছা, আসি। ধীরে চলে গেল কাকলি।

সিঁড়ি প্রায় ধরেছে, বরেন ডাক দিয়ে উঠল, ‘শুমন।’

যাই কি না যাই, আবার ধীরে ফিরল কাকলি। নির্মল মুখে দাঁড়াল কাছে গিয়ে।

‘শুমন। একটা কাজ আমার করে আসা হয় নি। মনের মধ্যে তাই খুঁত-খুঁতুনি রয়ে গেছে—’ চোখ না তুলেই বরেন বললে।

‘কী কাজ?’

‘আপনার দাদা দেবনাথবাবুর জন্তে একটা চাকরি জোগাড় করে দেওয়া। নতুন করে সিগারেট ধরাল বরেন : ‘দেখুন, জোগাড় হয়েছে একটা। যদি আপত্তি না থাকে ঠুকে আমার আফিসে পাঠিয়ে দেবেন—’ আবার কাগজে মন দিল বরেন।

‘বলব দাদাকে।’ সিঁড়িতে ধাপে ধাপে জুতোর শব্দ করতে-করতে নেমে গেল কাকলি।

সেখান থেকে বিনতার হস্টেল। বিনতা যে কাকলির একলার বন্ধু তাতে আর সন্দেহ কী।

এসে দেখল বিনতার জ্বর। রুম্ফ চুলে রোগা মরাটে চেহারায় শুয়ে আছে।

‘এ কী, আমার বিয়েতে যাবি না? সাজাবি না আমাকে?’

জ্ঞান হেসে বিনতা বললে, ‘দেখছিস তো! এখন আমাকে না কেউ সাজিয়ে দেয়!’

‘হ্যাঁ, আমিই সাজিয়ে দেব। কিন্তু যা ভাবছিস, খাটে নয়, পাটেই দেব তোকে সাজিয়ে। হ্যাঁ রে, তুই চাকরি খুঁজছিস? মাস্টারি ছেড়ে দিবি?’

‘হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে বনছে না।’

‘তা চাকরি খুঁজছিস তো দীপঙ্করের কাছে কেন?’

‘আমার আবার মুরুবি কোথায়?’ দীর্ঘশ্বাস চাপল বুঝি বিনতা : ‘সত্যি কথা বলতে, আমার তো তোর নাম ধরে যাওয়া।’

‘যাবি তো রাজার বাড়ি যাবি। বড় গাছে গিয়ে বাসা বাঁধবি।’

‘বড় গাছ?’

‘হ্যাঁ, বরেনের কাছে যাবি। আমার নাম করে যদি দীপঙ্করের কাছে যেতে পারিস, তবে বরেনের কাছে যেতে বাধা কী!

‘বা, তার সঙ্গে তো তোর ঝগড়া হয়ে গেছে।’

‘আমার সঙ্গে ঝগড়া হলে কী হয়, আমার নামের সঙ্গে তো হয় নি।’ কাকলি বিনতার হাতে একটু হাত বুলিয়ে দিল : ‘আমার নাম বললে নিশ্চয়ই সে তোর একটা ব্যবস্থা করে দেবে। তুই ভালো হয়ে একবার গিয়ে দেখা করে ত্যাখ না—’

‘যাব, যখন তুই বলছিস—’

সেই বরেনের কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে আবার স্বকাস্ত এসে হাজির।

‘আরে, আয়, আয়—’ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বরেন।

‘আমার বিয়েতে নেমস্তন্ন করতে এলাম।’

‘কবার নেমস্তন্ন ? সেই যে সেদিন—’ বলতে-বলতে চেপে গেল বরেন। বুঝল কাকলির নেমস্তন্ন করতে আসার খবরটা স্বকাস্ত জানে না। স্বকাস্তের কাছ থেকে যদি তা কাকলি গোপন করে রেখেছে, বরেনও তাই রাখতে পারবে।

‘তুই তো এই মিলনের সেতু।’

‘কিংবা বলতে পারিস হেতু।’

‘একই কথা। যাস কিন্তু।’

‘চেষ্টা করব।’

স্বকাস্ত চলে যাচ্ছিল, ডাকল বরেন। বললে, ‘শোন, আবার যদি কোনোদিন আমাকে দরকার হয়, খবর দিস—’

সশব্দে হেসে উঠল দু-জনে।

রাত্রে’ ট্যান্ডিতে, সশব্দে হেসে উঠল কাকলি আর স্বকাস্ত। অকারণে। অবারণে। এবার কান্না-কান্না ভাব আনল স্বকাস্ত। বললে, ‘আর তিন দিন মোটে আছে। এখন একটু নিয়মভঙ্গ করলে দোষ কী।’

‘তিন দিন দেখতে-দেখতে কেটে যাবে।’

‘কাল আমি বাড়ি চলে যাব। তারপর দু-দিন আর দেখাই হবে না। উঃ, কী নিদারুণ।’

‘দুঃস্বস্ত-দুঃসহ।’

‘একটু কাছে এসো না সরে। ড্রাইভারের আয়না ? ড্রাইভারে কী আসে যায় !’

‘রাস্তায় পাহারাওয়াল দাঁড়িয়ে। ভুলে যাচ্ছ কেন, ময়দানের কাছাকাছি ঘুরছ। কী সব মারাত্মক নাম ! লাভার্স লেন। ফিল্ম স্টার্স গ্রোভ। নির্ঘাত থানায় ধরে নিয়ে যাবে।’

‘আমরা ঠিক বর্তমান মুহূর্তে না হই, অদূর অতীতে একদিন স্বামী-স্ত্রী ছিলাম, এই ডিফেন্স চলবে না ?’

‘তত্ত্বমাত্র না।’

‘নো ফাণ্ডামেন্টাল রাইট অ্যাজ ম্যান অ্যাণ্ড ওম্যান ?’

‘নান্।’

‘তবে লম্বা মুখ করে বসে থাক। ছাড়া আর উপায় কী!’

কতক্ষণ চূপচাপ কাটাবার পর হঠাৎ তপ্ত গাঢ় গলায় বলে উঠল কাকলি : ‘এসব কি চেয়ে-চিন্তে হাত পেতে ভিক্ষে করে সেধে কেঁদে পাওয়া যায়? ঝাঁপিয়ে পড়ে জোর করে আদায় করে নিতে হয়।’ বলেই কাকলি পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে স্বকাস্তর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাকুল বাহুতে জড়িয়ে ধরে নিবিড় অধরে বিহ্বল চুমু খেল।

দুই হাতের মধ্যে গুচ্ছ-গুচ্ছ সত্তাকোটা নতুন কদম ফুল, উচ্ছল স্বাস্থ্য আর সমর্পণ, স্বকাস্ত যতদূর সাধ্য দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ করল সেই মদিরতা।

‘তোমার দাম আমার এই আনন্দের মধ্যে।’ বললে কাকলি।

‘আর এই আনন্দ সমগ্রের সুখের মধ্যে, জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে—’

কাকলিকে তার বাড়িতে পৌঁছে স্বকাস্ত হোটেল চলে গেল।

পরদিন বাড়ি, আর পড় তো পড়, একেবারে সেন্টুর সামনে।

‘তুমি একলা যে, আমার কান্না কই?’

হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে নিতে গেল স্বকাস্ত, কিন্তু জবাব পাবার আগে কিছুতেই সেন্টু ধরা দেবে না।

‘তোমার কান্নার কথা তো বিজু জানে।’

‘বিজু জানে? আমার কান্নাকে ফেলে রেখে তোমার একটা নতুন কাকিমা আনবার মতলব। আমি বুঝি জানি না কিছু?’

‘দেখিস না তোমার কান্নার থেকে এই নতুন কাকিমা কত সুন্দর। কত ফর্সা।’

‘কত ফর্সা না হাতি!’ চোখ ছলছল করে এল সেন্টুর।

‘দেখিস না কত তোকে বেশি ভালোবাসবে নতুন কাকিমা। কত তোকে জিনিস দেবে।’

‘তুমি জিনিস নাও গে। আমার জিনিস চাই নে।’

‘চল, আমার তেতলার ঘরটা দেখে আসি—’ আবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল স্বকাস্ত।

‘আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব না, যাব না তোমার কাছে। দেখ না আমি কী করি।’

‘কী করবি?’

‘পুলিশে খবর দেব। পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। যতক্ষণ কান্নাকে না এনে দেবে ততক্ষণ তোমাকে ছাড়বে না।’

‘পুলিশ পাবি কোথায়?’

‘স্বাস্থ্য দিয়ে কত যাত্রা, স্বাস্থ্যজনকে ডেকে এনে ভাব করে নেব।’

‘শেষকালে তোকে পুলিশে দাও ধরে!’

‘ধরুক। তবু তুমি যা না, তোমার চেয়ে পুলিশ ভালো।’

হাসতে-হাসতে তেতলার নতুন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল স্বকান্ত।

নিজের ঘরে বসে দাড়ি কামাচ্ছে প্রশান্ত। আয়নার মুখছায়ায় সোধোদন করে বলছে, ‘তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।’

‘না, না, তিমিরে হতে যাবে কেন।’ বন্দনা এল হাসতে হাসতে : ‘এই দেখ পদোন্নতি।’ বলে হাতভরা এক গোছা চাবি দেখাল। হাতের তালুতে নাচাতে লাগল।

‘তার মানে?’

‘আমিই এখন ভাঁড়ারের মজ্জী, পরিবেশনের থালা আমার হাতে।’

‘বলো কী! মাছ দুধ সব তেতলায় উঠবে না তা হলে?’

‘না। সংসারের ভার মা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়ের বাড়ি থেকে রেডিও গ্রামোফোন রেফ্রিজারেটর দিচ্ছে, আরো কত কী, মা এখন ওসব নিয়ে থাকবেন, তাঁর পাঠ-পূজা নিয়ে, সভা-সমিতি নিয়ে—’

‘আর কাকিয়া?’

‘তাঁর তো ম্যাগাজিন আর ফ্যাশান।’

‘বলো কী, তা হলে তুমিই একমাত্র কর্ত্রী কারয়িত্রী করণগুণময়ী কর্মহেতুস্বরূপা?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাকে তোয়াজ না করলে এক টুকরোর বেশি দু টুকরো মাছ পাচ্ছ না, এক হাতার বাইরে দুধের কড়া ঠনঠন।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গান ধরল প্রশান্ত : ‘মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না।’

স্বকান্ত-কাকলির বিয়ে হয়ে গেল। গাছভরা ফুল, বাড়িভরা আলো, মুখ-ভরা হাসি আর মনভরা মধু।

আর দেহভরা পরমার্শ্বের রহস্য।

নতুন বউ বাড়ি এসেছে, চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙে গেছে, সমস্ত দিকদেশ ব্যাপ্ত করে উৎসবের বাজনা—এমন সময় আঁতরব উঠল, সেক্টুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

‘ওরে সেক্টু, তখ এসে কে এসেছে।’ সকলে ডাকতে লাগল উচ্চরোলে।

কোনো প্রত্যুত্তর নেই।

সকলের মুখে উদ্বেগ, কোথায় গেল সেক্টু? সমস্ত জ্যোৎস্না ঢেকে যেন কালো মেঘের উদয় হল সহসা।

বিজয়াই বাইস্কিট বৃক্ষে তেঁতুলার গুঁড়ি খাটের নিচে নতুন জিনিসপত্রের আড়ালে রাখায় ফেটি বাঁধা লাঠি হাতে বৃক্ষের সাজে চূপ করে বসে আছে সেন্টু। তার শূন্য একসময়ে যে এই দুর্গে প্রবেশ করবে সে তা বৃক্ষে নিয়েছে এবং খাটস্থ হলেই অতর্কিত আক্রমণ করবে তারই আশায় মুহূর্ত গুনছে।

‘এই যে, এইখানে সেন্টু!’ জিনিসপত্র সরিয়ে সেন্টুকে বার করে আনল বিজয়া।

আর তার ডাক শুনে প্রায় সমস্ত সংসার, আর সকলের আগে কাকলি, উঠে এল উপরে।

‘ঐ ঠাথ কে এসেছে।’

তাকবার আগেই মাথার ঘোমটাটা টেনে অনেকখানি নামিয়ে দিয়েছে কাকলি। আর সেন্টুকে ধরবার জন্তে বাড়িয়েছে দুই হাত।

‘আমি যাব না ওর কাছে। ও ভাইনি বুড়ি। ও পেট্রী। শাঁকচুম্বি।’ প্রবলতর প্রতিবাদ তুলল সেন্টু।

তজ্রাচ কাকলি তাকে দুই হাতে টেনে নিয়ে বৃক্ষের উপর চেপে ধরল।

‘আমাকে নামিয়ে দাও বলছি।’ নেমে পড়বার জন্ত হাত পা ছুঁড়তে লাগল সেন্টু: ‘আমি তোমার কোলে যাব না। কিছুতেই না। আমি পুলিশে খবর দেব।’

‘আমাকে পাচ্ছ না চিনতে?’ ঘোমটা-ঢাকা অবস্থায়ই কাকলি বললে, ‘আমি তোমার নতুন কাকিমা।’

আর সকলে, ছেলেমেয়েদের দল, হেসে উঠল খিলখিল করে।

‘আমি নতুন-ফতুন চাই না। কাকিমা, না ফাঁকিমা। আমি আমার কান্নাকে চাই।’ কান্না জুড়ল সেন্টু।

আর সেই মুহূর্তে কাকলির মুখের ঢাকা সরিয়ে দিল বিজয়া।

বিশ্বয়ে বিমূঢ় হয়ে মোহিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেন্টু: ‘এ কী, তুমি, কান্না?’ সহসা অভাবনীয়ক বুক ভরে পাবার যে খুশি সেই খুশিকে কাকলির বৃক্ষের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল অঝোরে।

‘এ কি, কাঁদছ কেন? আমিই তো এসেছি।’

ভালো করে আবার দেখবার জন্তে মুখ তুলল সেন্টু। এবার তার কান্নাভরা চোখে হাসিভরা বোদ্ধুর।

সত্যিই। সত্যিই তার কান্নাই এসেছে।

আবার মুখ লুকোল সেন্টু। আচ্ছন্ন স্বরে বললে, ‘তুমি আর চলে যাবে না?’

‘না, না, আর যাব না ।’ কাকলি তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল :
‘তোমাকে ফেলে আর কি যেতে পারি কোথাও ?’

‘তবে ওরা যে বলছিল নতুন কাকিমা আসছে ।’

‘আমিই পুরোনো, চেয়ে দেখ, আমিই আবার নতুন ।’ বললে কাকলি ।

সেণ্ট বুঝেছে । তার আর দেখবার দরকার নেই ।

